মাসিকসন্দর্ভ ও সমালোচন।

ষষ্ঠ খণ্ড।] ১২৮৮। [১ম সংখ্যা।

বিরাট পুরুষ।

—এই [illegible]বাত্রী ধরিত্রী এক সময়ে এক প্রকা[illegible] বাষ্পপিণ্ড অথবা পিণ্ডীভূত তরল-[illegible]ের ন্যায় শূন্যবর্ত্মে ভ্রাম্যমাণা ছিল। তখন জলে স্থলে প্রভেদ ছিল না; সমস্তই একাকার। তখন হিমাদ্রি কি বিন্ধ্যাচল, ভূমধ্য কি ভারত-সমুদ্র দৃশ্য গোলকে বিভিন্নতা জন্মাইত না; সমস্তই এক। তখন নদী ছিল না এবং নদীর বক্ষে লহরী খেলিত না; তরু লতার উৎপত্তি হয় নাই, সুতরাং তরুশাখায় বসিয়া বনের পাখী গাণ করিত না এবং কুসুমিত লতার সুকোমল অঙ্গ বায়ুভরে দুলিয়া দুলিয়া অলিগুঞ্জনে গুঞ্জিত হইত না। তখন আকাশে তারা ফুটিত,—আকাশের অনন্ত নক্ষত্রমালা সায়ন্তন পুষ্পমালার ন্যায় প্রস্ফুটিত হইত; কিন্তু পৃথিবী হইতে একটি চক্ষুও একবার তাহা চাহিয়া দেখিত না। তখনও সূর্য্যের উদয় হইত, সূর্য্য অস্ত যাইত;—সূর্য্যমণ্ডলের প্রদীপ্ত রশ্মি জগতে ছড়াইয়া পড়িত; কিন্তু পৃথিবীর একটি চক্ষুও তাহা দেখিবার জন্য উন্মীলিত হইত না। তখন গ্রাম নাই, নগর নাই, জীব-জন্তুর সঞ্চার নাই, ভোক্তা নাই, ভোজ্য নাই, দ্রষ্টা নাই, দৃশ্য নাই, সুখ-দুঃখের অনুভূতি কিংবা হর্ষবিষাদের ক্রীড়া নাই;—পৃথিবী শূন্যময়।

সেই শূন্যহৃদয়া পৃথিবী, শতসহস্র যুগ হইতে শতসহস্র যুগ পর্য্যন্ত এইরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া, আজি স্বভাব ও শিল্পজাত বৈভবের অপূর্ব্ব মিশ্রণে কবিকল্পিত অমরাবতীকেও অধঃকৃত করিয়াছে, এবং স্বপ্নও কোন দিন যে সম্পদের ছায়া দেখিতে পায় নাই, আজি পৃথিবী সেই সম্পদে শোভান্বিত হইয়া জ[illegible]ত বিরাজ করিতেছে। আজি উহার অট্টহাস্যময় সমুদ্রকল্লোল [illegible]

অলঙ্কৃত,অভ্রভেদি গিরিশৃঙ্গ বিজয়-দুন্দুভিতে নিনাদিত। উহার কোথাও বৃক্ষবাটিকা, কোথাও বিলাস-বন; কোথাও তপস্যার পবিত্র আশ্রম, কোথাও শান্তির পুণ্য নিকেতন। উহার কোথাও পারীশ ও লণ্ডন প্রভৃতি মহানগরী মনুষ্যের হল-হলায় নভস্তলকে আপূরিত করিতেছে, কোথাও বিহঙ্গবিনোদিত নিভৃত নিবাসের প্রসন্নমূর্ত্তি ও প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে চিত্ত অন্যবিধভাবে অভিভূত হইতেছে। উহার কোথাও প্রীতির পুষ্পিত উদ্যান, কোথাও পৌরুষগুণের পাষাণ-কঠিন ক্রীড়াস্থান; কোথাও বীর-সেনার ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ও অস্ত্রঝঞ্ঝনা, কোথাও বীণার মোহন নিঃস্বন ও বিশ্রব্ধ বন্ধুতার প্রাণপ্রদ সান্ত্বনা। কোথাও সাহিত্য, কোথাও সঙ্গীত; কোথাও পুস্তকালয়ের অতুল ভাণ্ডার, কোথাও যন্ত্রালয়ের অপ্রতিম কারুনৈপুণ্য;—প্রাসাদের ঊর্দ্ধে প্রাসাদ, ভূযানের ঊর্দ্ধে ব্যোমযান; গৃহের অভ্যন্তরে রত্নমালা, গৃহের বহির্ভাগে রত্নোজ্জ্বল দীপমালা;—অক্লান্ত আকাঙ্ক্ষা,অবিশ্রান্ত কার্য্য, অসীম উন্নতি ও অরুদ্ধ গতি।

যিনি এই বৈভব ও এই বিচিত্র সম্পদের প্রতিষ্ঠিত অধিস্বামী,—পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, সকলেই প্রকারতঃ যাঁহাকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করে,—ভূত-শক্তি যাঁহার পরিচারিকা, কোটিযোজন দূরস্থ গ্রহাধিরাজ ভাস্করও যাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য চিত্রকার্য্যে নিয়োজিত হয়, তিনিই বৈজ্ঞানিক কল্পনার বিরাট পুরুষ,—সৃষ্টির প্রধানতম বিকাশ, পার্থিব সৃষ্টির শেষ ফল সমগ্র মানব-জাতিরূপ বিরাট বিগ্রহের প্রত্যক্ষ দেবতা। এই পৃথিবী ইহাঁরই প্রথম শিক্ষার সোপান-মঞ্চ, ইহাঁরই কর্ম্মক্ষেত্র ও প্রমোদগৃহ।

আমরা যখন ফোটা ফোটা করিয়া বারিবিন্দু এবং একটি একটি করিয়া বালু গণনা করি, তখন দ্রব ও ঘন পদার্থের প্রকৃত ভাব আমাদিগের বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয় না। কে দূর্ব্বাদল-বিলম্বি শিশির-বিন্দু দেখিয়া জলরাশির শক্তি চিন্তা করে? কে কুশাগ্রলগ্ন পুষ্পরেণু দেখিয়া পুঞ্জীকৃত রেণুনিচয়ের গুরুত্ব ও ভারবত্তা ভাবিয়া দেখে? কিন্তু যখন সেই বারিবিন্দু অসংখ্য বারিবিন্দুর সহিত পরিমিশ্রিত হইয়া গঙ্গার প্রমত্ত স্রোতে কিংবা সাগরের প্রমত্ত উচ্ছ্বাসে নৃত্য করে,—যখন সেই বালুকণা অসংখ্য বালুকণার সহিত মিশ্রিতভাবে [illegible]ত শৈলস্তম্ভবৎ দণ্ডায়মান হয়, আমরা তখন দৃষ্টিমাত্রই আকৃষ্ট ও আনত হই। মনুষ্য স[illegible]ন্ধেও এই কথা। আমরা মনুষ্যকে চিনি না, মনুষ্যের গৌরব বুঝি না। আমরা একটি একটি করিয়া মনুষ্য দেখি,—একটি একটি করিয়া মনুষ্য লইয়া বিচার বিতর্ক করি। তাহাতেই মনুষ্যপ্রকৃতি ও মানবীশক্তির প্রকৃত মহিমা আমাদিগের চিন্তার আবিল দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় না। মনুষ্যের অভাব ও অপূর্ণতাই আমাদিগের চক্ষে পড়ে;—মনুষ্য কি করিয়াছে, কি করিতেছে এবং ভবিষ্যতে কি করিবে বলিয়া আশ্বাস দিতেছে, তাহা চিন্তায় আইসে না। কাহারও উদরে অন্ন নাই, অঙ্গে বস্ত্র নাই, শরীর নানাবিধ বিকট ব্যাধিতে অকাল-জীর্ণ, আমরা তাহাকে দেখিয়া আর এক দিকে মুখ

ফিরাই; অথবা তাহাকে দূর দূর বলিয়া দূর করিয়া দিয়া একটি পালিত কুকুরকে বুকে টানিয়া লই। কেহ শিক্ষাবিরহে আজও নিকৃষ্ট জন্তুর ন্যায় অতি নিকৃষ্ট জীবন যাপন করিতেছে,—মনুষ্যকুলে জন্মলাভ করিয়াও মনুষ্যলভ্য উৎকর্ষের বহু নীচে পড়িয়া রহিয়াছে; আমরা তাহাকে দেখিয়া ঘৃণায় দৃষ্টিসংকোচন করি। কেহ শিক্ষাবলে সমুন্নত হইয়াও ততোধিক জঘন্যবৃত্তি অবলম্বন করিতেছে,—কখনও প্রয়োজন কি প্রবৃত্তি বিশেষের অসহ্য তাড়নে নীচতার নিম্নতম স্তরে নাবিতেছে, কখনও ক্রোধাদি ভাবের আকস্মিক উত্তেজনায় মনুষ্যত্বের সীমা লঙ্ঘন করিয়া যাইতেছে; আমরা তাহাকে দেখিয়া বিষাদে ও বিদ্বেষে জর্জ্জরিত হই। এইরূপে একটি একটি করিয়া মনুষ্য দেখিলে,—তিল তিল করিয়া মনুষ্যের দোষ গুণ বিচার করিলে, শ্রদ্ধা ও প্রীতির কথা দূরে থাকুক, মনুষ্য সম্বন্ধে আমাদিগের মনে ক্রমশঃই অতি প্রগাঢ় অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা জন্মে; এবং মনুষ্য কেন মনুষ্যের সংসর্গে অবস্থান করে, মনুষ্য কেন মনুষ্যের জন্য লালায়িত হয়, এবং মনুষ্যের ছলনা, মনুষ্যের বঞ্চনা, মনুষ্যের ক্রূরতা ও নিষ্ঠুরতা কেন বিষ-সর্পের মত সমস্ত মনুষ্যকে গ্রাস করিয়া না ফেলে, ইহাই আলোচনার জন্য এক বিষম সমস্যা হইয়া পড়ে। কিন্তু যখন আমরা মনুষ্যকে বিস্মৃত হইয়া মনুষ্যজাতির চিন্তা করি,—যখন সেই আসমুদ্রগিরিব্যাপি বিরাট মূর্ত্তিকে ধ্যান নেত্রে দর্শন করিয়া, আমরা উহার ভূত ও বর্ত্তমানের তুলনা হইতে ভবিষ্যতে উঠিতে যত্নবান্ হই, তখন আমাদিগের বুদ্ধি ও হৃদয় উভয়ই এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে স্তম্ভিত হয়, এবং যে আশা আত্মদুষ্কৃতির অনুতাপবহ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভগ্ন ও অবসন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছিল, তাহাও জীবনের নূতন স্ফূরণে জাগিয়া উঠে।

লোকে যাহারে ইতিহাস বলে, তাহা এই বিরাট পুরুষের জীবন-চরিত। কিরূপে জল-বুদ্বুদ হইতে জীব-সঞ্চারের আরম্ভ হইয়া সৃজনী প্রক্রিয়ার অনন্ত আবর্ত্তে এই বিরাট পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে,—কিরূপে নির্জীব জড়-পরমাণু হইতে উদ্ভিদ্, উদ্ভিদ্ হইতে অনতিবিকসিত প্রাথমিক জীব,—তাদৃশ জীব হইতে পশুজীবন এবং পশুজীবনের পরিণতিতে এই বিস্ময়াবহ মানব-জীবনের ক্রমিক বিকাশ হইয়াছে, ইতিহাস তাহা দেখে নাই। সুতরাং ইতিহাস সে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতে অক্ষম। সেই অতীত-তত্ত্ব অনুমানের অধিগম্য হইলেও ইতিহাসের বিষয় নহে। ভূপঞ্জর-নিহিত ভিন্ন ভিন্নরূপ অস্থির সাদৃশ্য ও বিসদৃশতা এবং ভূতত্ত্বসংক্রান্ত আরও বহুবিধ কথার উপর নির্ভর করিয়া সে বিষয়ে একটা যৌক্তিক উপপত্তি করিবার সময় হইয়া থাকিলেও, তাহা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু কিরূপে অসহায়, অশিক্ষিত, অসভ্য মনুষ্য, জীবনের শৈশব সময়ে বন্য পশুর সঙ্গে বনে বনে বিচরণ করিয়া, এইক্ষণ এই বিরাট বেশ ধারণ করিয়াছে,—যে এক সময়ে শীত-বাতের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য ভূগর্ত্তে কি বৃক্ষকোটরে মাথা লুকাইত, সে

পত্রও বিনা কারণে বৃন্ত হইতে ঝরিয়া পড়ে না,—অতি সামান্য সলিল-কণাটিও বিনা কারণে বিচলিত হয় না,—যে জগতে জ্যোৎস্না, আঁধার, জোয়ার, ভাটা, ঝড়, তুফান, মেঘ, বৃষ্টি সমস্তই কারণের অধীন,—নিয়মের অধীন, সেই জগতে শুধু এই সকল অসামান্য ঘটনাই কারণ-শূন্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলায় বহির্গম্য ?

ইতিহাসের সিদ্ধান্ত এমন নহে। ইতিহাস আর উপন্যাস যখন এক কথা ছিল,—যখন রাজ-বালার শারীশুক এবং রাজ-মহিষীর কপোত-দূত ও প্রণয়লেখ্যের সুবিস্তীর্ণ কাহিনীতেই ইতিহাসের কলেবর পরিপুষ্ট রহিত,—যখন কে কাহাকে মারিল, কে কাহাকে কাটিল, কে কোন্ সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া শঙ্খ বাজাইল এই বই আর ইতিহাসে কিছু থাকিত না, তখন অশিক্ষিত মনুষ্যের মত অশিক্ষিত ইতিহাসও জগতের সমস্ত ঘটনাকেই আকস্মিক জ্ঞানে উপেক্ষা করিত। নভোমণ্ডলের একটি নক্ষত্রের সহিত আর একটি নক্ষত্রের যে সম্বন্ধ আছে মনুষ্য তাহা বুঝিত না, এবং বাণিজ্যের বিস্তার ও যুদ্ধবিগ্রহ, শস্যের হ্রাস বৃদ্ধি ও দেশের নৈতিক উন্নতি, অথবা বিবাহ ও দুর্ভিক্ষ এবং কাব্য ও রাজ-বিদ্রোহ যে, অতি সূক্ষ্ম সূত্রে পরস্পর সম্বদ্ধ রহিতে পারে ইতিহাসও তাহা বুঝিত না। কিন্তু ইতিহাসের সে অবস্থা আর নাই। ইতিহাস এইক্ষণ বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইয়া,—বিজ্ঞানের চক্ষে বিশ্বদর্শন করিয়া,—বিজ্ঞানের অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণের সাহায্যে সমাজযন্ত্রের পরীক্ষা করিতে শিখিয়া সর্ব্বতোভাবে নিয়ম-বাদী হইয়াছে এবং সমাজের সমুদয় ঘটনাই এক অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মের অধীন এই বলিয়াই এইক্ষণ উপদেশ দিতেছে। ইতিহাসের চরম-সিদ্ধান্ত এই যে, জড় শক্তির পরস্পর প্রতিঘাত-জন্য বিপ্লব-নিচয়ও যেমন নিয়মের শাসনে সমুদ্ভূত, নিয়ম কর্ত্তৃক পরিচালিত এবং নিয়মের অভীষ্ট ফলে পরিণত হয় ; মানব-জাতিনিহিত বিরাট শক্তির অভ্যুত্থানজন্য বিপ্লব-পরম্পরাও সেইরূপ নিয়মের শাসনে সমুদ্ভূত, নিয়ম কর্ত্তৃক পরিচালিত এবং নিয়মেরই মঙ্গলময় ফলে পরিসমাপ্ত হইয়া মনুষ্যের ইষ্ট সাধন করে। যে সকল ঘটনা সাধারণতঃ বিপ্লব বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, ইতিহাস সেই সকল ঘটনাকেই জাতীয় উচ্ছ্বাস অথবা জাতিসাধারণ বিরাট-পুরুষের উত্থান-চেষ্টা বলিয়া ব্যাখ্যা করে, এবং অজ্ঞ ও অকৃতী লোকেরা যেখানে উল্কাপাত-ভয়ে অধীর রহে, অতীত-সাক্ষী ইতিহাস সেখানে ভাবি কল্যাণের পূর্ব্বসূচনা ও মানুষী শক্তির সজীব লীলা সন্দর্শন করিয়া আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে।

মনুষ্য যে সোপানের পর সোপানে উঠিয়া,—উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর গ্রামে আরোহণ করিয়া, ধর্ম্মের উজ্জ্বলতর জ্যোতিঃ, স্বাধীনতার উচ্চতর সম্পদ, সামাজিক সুখের উৎকৃষ্টতর উপাদান, পারিবারিক জীবনের মহত্তর আদর্শ এবং জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতর আলোক প্রাপ্ত হইতে পারিতেছে, এইরূপ বিপ্লব ঘটনাই তাহার মূল। বিপ্লবকে কেহ ভালবাসে না অথবা ডাকিয়া আনে না, ডাকিলেও উহা সমাগত হয় না। কিন্তু

যখন কাল পরিপূর্ণ হইয়া আইসে, ঘটনা ঘটনার তাড়নে তাড়িত সঞ্চালন করে, এবং সেই বিরাট পুরুষের নিদ্রাভঙ্গ হয়, তখন উহা বিনা আহ্বানে, বিনা সম্ভাষণে আপনিই আসিয়া আপতিত হইয়া পড়ে।

কোন দেশ সত্যের নামে অসত্যের নিরয়-পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া একবারে অধঃপাতে যাইতে থাকে,—মানব-জীবনের সনাতন সত্যকে কতিপয় বিশেষ ব্যক্তির ব্যবসায়ের বস্তু করিয়া জন-সাধারণকে অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখে, পাপপুণ্য এবং স্বর্গ মোক্ষ লইয়া বাণিজ্য আরম্ভ করে, অথবা ইহা হইতেও অধিকতর জঘন্য অন্য কোন কুৎসিত কার্য্যে প্রবর্ত্তনা দ্বারা দেশের সমস্ত লোককে পুনরায় পশুত্বে নিয়া পৌঁছাইতে যত্ন পায় [illegible] উল্লিখিত রূপ বিরাট বিপ্লব সেই দুরবগাহ অন্ধকারের উপর এক অপূর্ব্ব আলোক ঢালিয়া দিয়া মনুষ্যের অন্ধীভূত চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেয়, মনুষ্যকে স্বচক্ষে দেখিতে শিক্ষাদান করে এবং যে ধর্ম্ম পূর্ব্বে দুরিত দুর্গন্ধের সংসর্গ হেতু সকলেরই ঘৃণার সামগ্রী ছিল, সেই ধর্ম্মেরই অভ্যন্তরস্থিত সার-সুধা বাহিরে আনিয়া মনুষ্য মাত্রকেই তাহাতে অনুরক্ত করিয়া তুলে। কোন দেশের অধিকাংশ অধিবাসী, দাসত্বের লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া, নৈরাশ্যের অন্তর্দ্দাহে আর্ত্তনাদ করিতে রহে, কোথাও দুর্ব্বল সবলের উৎপীড়নে অস্থিতে অস্থিতে ব্যথিত হইয়া বিধাতাকে অভিসম্পাত করিতে থাকে। উল্লিখিত রূপ বিরাট বিপ্লব সেই লৌহ শৃঙ্খলকে বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ করিয়া দাস ও প্রভু উভয়কেই বিচারের আনুগত্যে টানিয়া আনে এবং দুর্ব্বলকে সবলের উৎপীড়ন হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অবৈধ সামর্থ্যের প্রাচীর দুর্গ চূর্ণ চূর্ণ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে। এইরূপে উহা অবনীতে ন্যায়ের স্বর্গীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করে, সামাজিক সাম্যবিধির দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া দেয়, সমাজকে মধ্যে মধ্যেই আগুণে পোড়াইয়া শোধন করিয়া লয়, এবং মনুষ্য যত কেন ক্ষুদ্র হউক না, মনুষ্য জাতির সমষ্টিই যে মানব-জগতের বিরাট পুরুষ এই সত্য প্রচার দ্বারা আপনি কৃতার্থ হয়।

যাঁহারা আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানের উদ্ভাবয়িতা, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপও উপদেশ করেন যে, এই মনুষ্যাত্মক বিরাট পুরুষই মনুষ্যের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। কাব্য ইহাঁর কল্পনার কুসুম, বিজ্ঞানে ইহাঁর বল। যে সকল অলোক-সাধারণ মনুষ্য যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া ইতিহাসের স্রোতে নূতন গতি দেন এবং পৃথিবীতে দয়া, প্রেম, পবিত্রতা ও প্রতিভার প্রখর জ্যোতিঃ বিকীরণ করেন,—মনুষ্য জাতি আগে না জানিয়া, না বুঝিয়া অবমাননা করিলেও, পরিশেষে যাঁহাদিগের নাম স্মরণেই পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া জয়ধ্বনি করিতে রহে, তাঁহারাও ইহাঁরই প্রতিনিধি কিংবা প্রতিবিম্ব স্বরূপ। মনুষ্য আর কাহাকেও জানে না,—আর কাহাকেও জানিতে পাইবে না। মনুষ্যের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সকলেরই আদিস্থান এই বিরাট-পুরুষের অনুগ্রহ এবং শেষ সাফল্য এই বিরাট পুরুষের আরাধনায়। ইহাঁর প্রীতি-লাভ পার্থিব স্বর্গ, এবং ইহাঁর স্মৃতিপটে

অঙ্কিত হওয়াই পারত্রিক সুখ। ইহাঁকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উঠা মনুষ্যেরসাধ্যায়ত্ত নহে।

আমরা এরূপ সাধুপ্রমাদের সঙ্গী নহি। আমরা মনুষ্যত্বের মহিমাময়ী মূর্ত্তি দর্শনের জন্য অভিমানের আশ্রয় লইতে প্রস্তুত আছি। কারণ, অভিমান ঐরূপ স্থলে আত্মার উন্নতি সাধনের অনুকূল হয় এবং মহত্ত্ব ও নীচতায় পার্থক্য দেখাইয়া,—মহত্ত্বের প্রতি অনুরাগ এবং নীচতার প্রতি বিরাগ জন্মাইয়া মনুষ্যকে অধোগতি হইতে রক্ষা করে। কিন্তু অভিমান যখন জ্ঞানের বিকারে গর্ব্বিত অথবা অন্য কোন কারণে উদ্ভ্রান্ত হইয়া সৃষ্ট বস্তুকেই সৃষ্টির পরম পদার্থ ও প্রান্তরেখা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, অপূর্ণকে পূর্ণের আসন দিতে যায় এবং আপনারই সম্প্রসারিত ভাবকে আপনার আরাধ্য বলিয়া পরিচয় দেয়, আমরা তখন আর মুহূর্ত্তের তরেও উহার অনুসরণ করিতে সাহস পাই না। কোথায় এই অনন্ত বিশ্ব, আর কোথায় এই ধূলিকণিকাসমান ধরণীপিণ্ড? কোথায় মনুষ্যহৃদয়ের অনন্ত তৃষ্ণা, আর কোথায় প্রাণ-প্রবাহের তরঙ্গবুদ্বুদ স্বরূপ মনুষ্যের প্রাণ? ফলতঃ মনুষ্যের বুদ্ধি, বিবেক,হৃদয়, মন,—মনুষ্যের আশা, আকাঙ্ক্ষা,—মনুষ্যের প্রাণ, চৈতন্যের প্রথম বিকাশ হইতেই যাঁহাকে চেতনে ও অচেতনে, জীব-দেহে ও জড়সৃষ্টির বিচিত্র সৌন্দর্য্যে অন্ধের ন্যায় অনুসন্ধান করিতেছে,—যাঁহাকে জানিবার জন্য মনুষ্য সাগরে ডুবিয়াছে, পাহাড়ে উঠিয়াছে, সংসারের সমস্ত বন্ধন উচ্ছেদ করিয়া যৌবনে যোগী সাজিয়াছে, রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া গাছের তলায় পড়িয়া রহিয়াছে, এবং বনের পশু অবধি দূরতম গগণের গ্রহ উপগ্রহ পর্য্যন্ত জগতের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, সুন্দর ও কুৎসিত, ভীষণ ও মধুর, পবিত্র ও অপবিত্র এবং মহৎ ও নিকৃষ্ট সমস্ত বস্তুর নিকটই বুকের রক্ত ও চক্ষের জলে অঞ্জলি দিয়া তদ্গত-হৃদয়ে ও তন্ময়-প্রাণে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়াছে, সেই অপরিজ্ঞেয় অনন্তশক্তিই মনুষ্যের আরাধনার লক্ষ্যস্থান ও অন্তিমের গতি। মনুষ্য জানিলেও তাঁহারই জন্য তৃষাতুর রহিবে, না জানিলেও জ্ঞানে ও অজ্ঞানে,—আলোকে ও অন্ধকারে, তাঁহাকেই খুঁজিয়া বেড়াইবে। মনুষ্যপ্রকৃতি যত দিনে না একবারে বিকৃত হইয়া যায়, তত দিনে ইহার অন্যথা নাই; এবং সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, পরিবর্ত্তনের সহিত উন্নতি এবং উন্নতির সহিত অসংখ্য বিষয়ে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকিলেও মনুষ্যজগতে ঐরূপ আমূল-বিকৃতির অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই। মানব-জাতির সঙ্গীত, সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস সমস্তই এ কথার প্রমাণ।

তবে ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি যে, মনুষ্য যখন সামাজিক জীব, যখন সমাজেই তাহার শিক্ষা, সমাজেই তাহার সমুন্নতি এবং সমাজের সামর্থ্যেই তাহার সর্ব্বপ্রকার সামর্থ্য,—যখন স্বার্থ ও পরার্থ, ন্যায় ও প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতির দুশ্ছেদ্য বন্ধনে সে সমাজের সহিত দৃঢ়সম্পর্কবদ্ধ, তখন সহযোগী ও ভবিষ্যবংশীয়দিগের সেবা ও হিত-সাধন দ্বারা সমাজের কল্পিত মূর্ত্তি স্বরূপ বিরাট পুরুষের পরিচ-

র্য্যাতে রত হওয়াই তাহার জীবনের উচ্চতম ব্রত। ইহারই নাম সামাজিক ধর্ম্ম এবং মনুষ্যের সুখ-বর্দ্ধন ও মানব-জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ বিধানের জন্য কায়মনঃপ্রাণে কার্য্যানুষ্ঠানই ইহার নিত্য অনুষ্ঠান। যাঁহারা এই ব্রত ও এই ধর্ম্ম পরিপালনের জন্য আত্মসংযম, আত্মশাসন ও আত্মদান করেন, তাঁহাদিগের ছায়াস্পর্শেও মনুষ্যের হৃদয় শীতল হয়। তাঁহাদিগের স্বাধীনতাতেই পরাধীনতা এবং পরাধীনতাতেই স্বাধীনতা। তাঁহাদিগের জীবন অমৃত-প্রবাহ। উহা যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়, সেখানে সকলেই অমৃতাভিষিক্ত রহে; সেখানে দগ্ধকঙ্করে ফুল ফোটে এবং দুঃখের তামসী নিশাও ক্ষণকালের তরে জ্যোৎস্নাময়ী হয়। পরন্তু, যে [illegible] উচ্চব্রত পরিত্যাগ করিয়া এবং এই উচ্চধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া আপনার অবৈধ ক্ষুধা ও অবজ্ঞেয় ক্ষুদ্রতার কারাগৃহেই বন্দী রহিতে ইচ্ছা করে, তাহার মনুষ্যজন্ম বৃথা। * সে লৌকিক নীতির নিগ্রহ হইতে নির্ম্মুক্ত রহিলেও মনুষ্যত্বের যথার্থ সম্পদ ও ভোগ-বৈভবে বঞ্চিত থাকে। তাহার সুখস্পৃহাও কালে অতিকঠোর দুঃখের নিদান হয়, অথবা তাহার একদিনের সুখই বহুদিনের দুঃখে পরিণতি পায়। কারণ, যেমন শরীরের সম্পর্কে চক্ষু, কর্ণ ও হস্ত পদ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তেমনই মানব-সমাজের সম্পর্কে রাজা, প্রজা ও ধনী, দুঃখী প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ মনুষ্য। চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি অঙ্গনিচয় যদি শারীর যন্ত্রের নিয়মবিরোধী হইয়া স্বতন্ত্র সুখের অনুসরণ করে, তাহা হইলে অচিরেই রুগ্ন ও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া বিনাশের পথে যায়;—মনুষ্যও যদি সমাজ-যন্ত্রের নিয়ম-বিরোধী হইয়া স্বতন্ত্র সুখের জন্য প্রমত্ত হয়, তাহা হইলে সেই অপ্রাকৃত প্রমত্ততা হইতেই তাহার নানারূপ দুঃখ, ক্লেশ, বিড়ম্বনা ও বিপত্তি ঘটে এবং সে আপনারই কার্য্যবিপাকে আপনি বিনাশের মুখে গড়াইয়া পড়ে। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আপনা হইতে সমাজের দিকে চাও কিংবা সমাজ হইতে আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এই সর্ব্বজনীন বিরাট পুরুষের স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রীণন ও পরিপোষণেই মনুষ্যের প্রকৃত মঙ্গল ও প্রধানতম সুখ।

* "I know that all is from all, and that he deserved not to be born, who thinks that he is born for himself alone." Metastatio.

একবর্ষ।

(৩০শে চৈত্র—শৈলশেখরে—সন্ধ্যা,)

একবর্ষ,—জীবনের একবর্ষ আর,
ডুবিছে অনন্ত-গর্ভে ওই রবি সহ!
ওই দেখ তিল তিল,
কেমন পতনশীল
রবি সহ, গ্রাসিতেছে কাল অন্ধকার
একবর্ষ—জীবনের একবর্ষ আর!

২

একবর্ষ—কাল-গর্ভে একটি তরঙ্গ.

জনমি প্লাবিয়া বিশ্ব, দেখিতে দেখিতে
কত সৃষ্টি নির্ম্মাইয়া,
কত সৃষ্টি বিনাশিয়া,
সেই মহাকাল গর্ভে মিশিছে আবার;
একবর্ষ,—ফুরাইল একবর্ষ আর!

৩

তরঙ্গে তরঙ্গে কিবা ছুটেছে ভীষণ,
অনন্ত কালের গর্ভে অনন্ত সংসার!
কি ভীষণ বিলোড়ন,
কি ভীষণ আবর্ত্তন,
অনন্ত হইতে এই অনন্তে প্রস্থান!
অনন্তে অনন্তে এই অনন্ত সংগ্রাম!

৪

অহো কি রহস্য!
এ মহাযাত্রার যাত্রী আমি ক্ষুদ্র নর!
আমিও এ মহাহবে যোদ্ধা একজন!
"অগ্রসর, অগ্রসর,
অগ্রসর নিরন্তর"—
এই মহারণ-আজ্ঞা, সৌর রাজ্যমত,
আমারো মস্তকোপরে ঘোষিছে নিয়ত।

৫

"অগ্রসর, অগ্রসর, নিত্য অগ্রসর"—
কি ভীষণ রণ-আজ্ঞা, সর্ব্বত্রে সমান;
ওই হিমাচল-সানু,
সিন্ধু তলে পরমাণু,
এই মহাশৈল, ওই ক্ষুদ্র পুষ্প আর,
সমভাবে আজ্ঞাধীন, নাহিক নিস্তার।

৬

"অগ্রসর, অগ্রসর, নিত্য অগ্রসর"—
ওই দেখ বৃটনিয়া ছুটেছে কেমন,
উন্নতি-গর্ব্বিত বুকে,
গর্ব্বিত-উন্নতি মুখে;
ছুটেছে জর্ম্মণী অস্ত্র-আসনে আসীন;
বিপ্লব-জলদমুক্ত ফরাসী, মার্কিন!

৭

সদ্যরাজরক্তে রক্ত বিশাল রুশিয়া,
ভীষণ বিপ্লব মুখে ছুটেছে কেমন!
অগ্নিগিরি বিধূমিত,
হতেছে বক্ষে বৰ্দ্ধিত;
যেদিন ফাটিবে এই প্রচণ্ড ভূধর,
অৰ্দ্ধেক পার্থিব রাজ্য হবে রূপান্তর।

৮

নির্জ্জীব, নিশ্চেষ্ট, এই প্রাচীন ভারত,—
কালের তরঙ্গাঘাতে চিহ্নে পরিণত!
দুর্ব্বহ সমাধি বক্ষে,
ঘোর কুজ্ঝটিকা চক্ষে,
ঘোর অবনতি মুখে গতি নিরন্তর;
নাহি ক্ষমা, হইতেছে তবু [illegible]গ্রসর!

৯

"অগ্রসর, অগ্রসর, নিত্য অগ্রসর"—
কোলের সন্তান আজ গিয়াছে ভাসিয়া,
দাঁড়াইয়া এক পল,
মুছি নয়নের জল,
নাহি সাধ্য, থাক্ শোক বুকের ভিতর,
মৃত-পুত্র, জীব-পিতা হও অগ্রসর।

১০

"অগ্রসর, অগ্রসর, নিত্য অগ্রসর"—
বড়ই সুখের দিন আজি হে আমার!
সুখে পরিপূর্ণ বুক,
সুখে পরিপূর্ণ মুখ,
মুহূর্ত্ত সে পূর্ণভাব লভি আমি নর?
'না'—মন্দ্রিল মহাজ্ঞা—'না—হও অগ্রসর'।

১১

তরঙ্গে তরঙ্গে মহাকালের ক্রীড়ায়,

হইয়াছি অগ্রসর মধ্যম জীবনে,
তথাপিও নিরন্তর,—
"অগ্রসর, অগ্রসর,"—
ক্রমে জীবনের সূর্য্য হেলিছে পশ্চিমে,
নহে সন্ধ্যা বহুদূর—ডুবিবে অন্তিমে।

১২

পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি—কালসিন্ধুনীরে
কত সুখ, কত দুখ, কতই বাসনা,
অতীত তরঙ্গ সহ,
মিশি হায়! অহরহ,
কেবল তরঙ্গভ্রষ্ট ফেণরাশি মত,
স্মৃতিমাত্রে হইয়াছে এবে পরিণত!

১৩

কত যে স্নেহের তরী, প্রেমের প্রাসাদ,
আকাঙ্ক্ষার অট্টালিকা, এই স্বল্পকালে
হইয়াছে নিমগন,
নাহি হয় নিরূপণ,
জলের সৃজন যেন হইয়াছে জল,
স্মৃতিতে সমাধি মাত্র রহেছে কেবল।

১৪

আবার সম্মুখে দেখি—সেই সিন্ধুনীর
ভয়াবহ! মরুদৃশ্য! কুজ্ঝটিকাময়!
একটি সুখের রেখা,
আশার একটি লেখা,
নাহি ভবিষ্যত অঙ্গে, সিন্ধুনীলিমায়;—
মহাকাল! কি উদ্দেশ্যে, যাইব কোথায়?

১৫

কি ভীষণ জল-যাত্রা মানব-জীবন!
কালগর্ভে যেই দিন ভাসিল তরণী,
সেই দিন, সেইক্ষণ,
মুদ্রাঙ্কিত—'নিমগন'—
হইল ললাটে তার, অখণ্ড লেখন!
অদূরে অথবা দূরে—নিশ্চয় 'মগন'!

১৬

আশঙ্কায় আশঙ্কায় চলিল তরণী,
প্রতিপদে 'নিমগন' নহে অসম্ভব;
অবস্থার সমীরণ,
অনুকূল প্রতিক্ষণ,
হলো যদি তব ভাগ্যে, হইল তোমার
মানব জীবন-যাত্রা সুখের আধার।

১৭

আপনি কমলা তরী অন্তরীক্ষে থাকি,
বর্ষিবেন সুখশান্তি অজস্র ধারায়।
আনন্দ তরঙ্গে রঙ্গে,
অনন্ত কেতন অঙ্গে,
চলিবে তরণী সুখে নাচিয়া নাচিয়া,
মধুর সঙ্গীত যেন যাইছে বহিয়া।

১৮

কিন্তু যদি প্রতিকূল অবস্থা তোমার,
আমার মতন তব জীবন-তরণী,
ঝটিকায় ঝটিকায়,
হবে বিচূর্ণিত কায়,
অন্তরীক্ষে মহামেঘ করিয়া গর্জ্জন,
অনিবার শিলা বজ্র করিবে বর্ষণ।

১৯

বিস্তীর্ণ আশার পাল গিয়াছে উড়িয়া;
স্নেহের বন্ধন সব গিয়াছে ছিঁড়িয়া;
সুখের কেতন নগ্ন,
হয়েছে হৃদয় ভগ্ন,
পূর্ণ হইয়াছে তরী নিরাশার জলে,
মহাকাল! আর কেন ডুবাও অতলে।

২০

যেই তারা লক্ষ্য করি ভেসেছিল তরী,
এখনো সে তারা উচ্চে জ্বলিছে আকাশে;

অবস্থার ঝটিকায়,
কিন্তু কতদূরে হায়!
আনিয়াছে ছাড়াইয়া সেই লক্ষ্য-পথ!
অবস্থার দাস নর—বৃথা মনোরথ!

২১

অবস্থা! তোমার নাম—অদৃষ্ট! বিধাতা!
তুমি স্রষ্টা, সংরক্ষক, তুমি সংহারক!
তুমি সর্ব্বশক্তিমান্,
বিশ্ব তব ক্রীড়া স্থান,
তুমি পাপ, তুমি পুণ্য, স্বরগ, নরক!
তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমি সর্ব্ব-বিধায়ক!

২২

তুমি বিশ্বনেতা, কাল তোমার বাহন,
তব সনে মহারণ 'বিশ্ব-যাত্রা' নাম;
যুদ্ধ করি, মহাশূর!
আসিয়াছি এতদূর,
যুদ্ধে যুদ্ধে ক্ষত বক্ষে ফুরাল আমার
একবর্ষ—জীবনের একবর্ষ আর!

শিক্ষা।

(৫ম খণ্ড, ৫২৫ পৃষ্ঠার পর।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিক্ষার ফল।

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবে সত্য নির্ব্বাচন করিবার পদ্ধতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। উপস্থিত প্রস্তাবে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বহুকালব্যাপী কঠোর পরিশ্রম ও গভীর চিন্তা দ্বারা কোন বিষয় সম্বন্ধীয় সত্যের আবিষ্কার হইলে, উহাতে জনসমাজের কি উপকার দর্শিতে পারে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, আমরা ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা প্রতিনিয়তই প্রাকৃতিক জ্ঞানের উপলব্ধি করিতেছি। এই জ্ঞানকে আমরা সংস্কার কহি; যথা,–চন্দ্র সূর্য্য বৃক্ষ নদী প্রভৃতি আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলেও উহাদিগের সংস্কার বা ছবি আমাদিগের স্মৃতিতে উপস্থিত থাকে। কিন্তু উহাদিগের বিশেষ জ্ঞান উপলব্ধি করিতে হইলে, অনুসন্ধান, বিচার ও পরীক্ষার আবশ্যক। এই বিশেষ জ্ঞানকে আমরা বিজ্ঞান কহি। বিজ্ঞানশাস্ত্র শত শাখায় বিভক্ত হইলেও উহা দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত; যথা—প্রাকৃতিক ও মনোবিজ্ঞান। এতদ্ভিন্ন কোন কোন [illegible]হাদিগের মতে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু উক্ত শাস্ত্রের বিষয় আমরা এস্থলে উল্লেখ করিতে প্রস্তুত নহি। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রকৃতির সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের বিশেষ-জ্ঞান। মনোবিজ্ঞান, মনুষ্যমনের প্রকৃতি, শক্তি ও উহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ প্রভৃতির বিশেষ-জ্ঞান। মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠত্ব, সভ্যতা, সুখস্বচ্ছন্দতা, ক্রমিক উন্নতি সমস্তই বিজ্ঞানসম্ভূত। সুন্দর উচ্চ অট্টালিকা, নানাবিধ বিলাস-দ্রব্য, নিদারুণ যাতনাদায়ক রোগসমূহ হইতে শান্তি পাইবার উপায় প্রভৃতি বিজ্ঞানশাস্ত্রের ফল। আমরা তাড়িতে দূরস্থ আত্মীয়ের সমাচার অত্যল্প সময়ে পাইতেছি; বাষ্পরথে এক মাসের পথ হয় ত এক দিনে যাইতেছি; অন্ধকারময় পথ সকল গ্যাস

আলোকে আলোকিত করিতেছি; মুদ্রাযন্ত্র সহায়ে স্বদেশ ও বিদেশের সমস্ত সমাচার পাইতেছি এবং জ্ঞানের বিস্তার করিতেছি। ফ্রাঙ্কলিন তাড়িতের আবিষ্কার করেন, সাভেরি, পেপিন, নিউকমেন, কলি, স্মিটন, পটার ও উয়াট প্রভৃতি মহাত্মারা বাষ্পযন্ত্রের সমধিক উন্নতি সাধন করেন। মারডক গ্যাস আলোকের প্রথম সৃষ্টি করেন। এই সকল মহাত্মা কত শত দিনযামিনী কঠোর পরিশ্রম ও গভীর চিন্তা করিয়া আপনাপন নিয়োজিত ও সঙ্কল্পিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া জনসমাজকে চিরঋণি করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের পরিশ্রমের ফল সুখে সম্ভোগ করিতেছি এবং তাঁহাদিগের বুদ্ধির জ্যোতিতে আপনাদিগের চিত্ত আলোকিত করিতেছি। ইংলণ্ডের এক[illegible]ন উচ্চতম বৈজ্ঞানিক হাক্সিলি কহেন জগতের মূর্খতা ও দুঃখ অধিক যাহাতে উভয়ের সীমা অল্প হয়, ব্যক্তি মাত্রেরই তদ্বিষয়ে সতত চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য। উক্ত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সর্ব্বদা সকলের স্মরণ রাখা আবশ্যক; কেন না স্বজাতীর ভ্রম দূর করা বা তাহাদিগের দুঃখভার মোচন করা অপেক্ষা মনুষ্যজন্মের আর কি উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য হইতে পারে? কিন্তু ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভ্রম ও দুঃখের হ্রাস বিজ্ঞান দ্বারাই সম্পাদিত হয়। যদি আমরা অনুর্ব্বরা ক্ষেত্রকে বিজ্ঞান সহায়ে উর্ব্বরা করিতে পারি, যদি যন্ত্রের দ্বারা একশত জোড়া কাপড় একদিনে প্রস্তুত করিয়া অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে পারি, যদি নূতন নূতন ঔষধ সকল আবিষ্কার করিয়া কঠোর ব্যাধিসমূহ হইতে জনগণের পরিত্রাণ করিতে পারি, তাহা হইলে বিজ্ঞান অপেক্ষা কোন্ শ্রেষ্ঠ বিষয় অবলম্বনে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ব্রতী হওয়া উচিত?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভাষাশিক্ষা।

প্রাকৃতিক বা মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রে শিক্ষিত হইতে হইলে, লিখিত ভাষা শিক্ষা আবশ্যক। প্রথমতঃ লিখিত ভাষা কি? আমরা যে সকল শব্দের দ্বারা আপনাদিগের ইচ্ছা বা ভাব ব্যক্ত করি, ঐ সকল শব্দ বর্ণের দ্বারা প্রকাশ করিবার নাম লিখিত ভাষা। বর্ণ দুই প্রকার, স্বর ও ব্যঞ্জন। প্রায় সকল সভ্য জাতিদিগের ভাষাতেই এই দুই প্রকার বর্ণ আছে, এবং উহাদিগের পরস্পর সহযোগে ভাষার উৎপত্তি। যে কোন ভাষাই হউক উহার শব্দ সকল সাধারণ প্রচলিত হওয়া আবশ্যক; যথা, রাত্রি শব্দ। 'রাত্রি' এই শব্দ লিখিলে সূর্য্য অস্ত অবধি পরদিন সূর্য্য উদয় পর্য্যন্ত যে সময় তাহাকে রাত্রি বুঝায়। এইরূপ প্রচলিত শব্দসকল আবার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সংযোজিত হওয়া উচিত। যথা, 'শশী বিমল আকাশে উদয় হইয়াছে।' এখানে তিনটি প্রশ্নের দ্বারা এই পদটি বুঝাইতে হইবে। প্রথমতঃ কি উদয় হইয়াছে? উত্তর, শশী উদয় হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কোথায় উদয় হইয়াছে? উত্তর, আকাশে। তৃতীয়তঃ ঐ আকাশ কিরূপ? উত্তর, বিমল। প্রচলিত নিয়মানুসারে বাক্যের প্রথমে কর্ত্তৃপদ, ক্রিয়াপদ সর্ব্বশেষে এবং বিশেষণ পদ বিশেষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে। কিন্তু ছন্দে শ্রুতিসুখ অ-

স্বরোধে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হয়; যথা,

'উদয় হয়েছে শশী বিমল আকাশে।'

যে যে নিয়মানুসারে শব্দ সকলের যোজনা হয়, সেই সেই নিয়মসমষ্টিকে আমরা ব্যাকরণ কহি। ব্যাকরণে ভাষার গঠন-প্রণালী শিক্ষা হয়।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, শব্দের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিবার নাম ভাষা। মনের ভাব বিশদরূপে প্রকাশ করিতে হইলে, শব্দসকল নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সংযোজিত করা উচিত; কেন না যদি আমি কহি 'কল্য অন্ন রাম খাইবেন,' তাহা হইলে কেহ স্পষ্ট বুঝিবে না আমি কি কহিতেছি। যদি আমি ওরূপ না কহিয়া এরূপ কহি, 'রাম কল্য অন্ন খাইবেন,' তাহা হইলে সকলেই আমার ভাব বুঝিতে পারিবে।

ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে শব্দ, প্রকৃতি, ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয়, বিভক্তি ও পদজ্ঞান হওয়া আবশ্যক।

শব্দ দ্বিবিধ; বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক।

প্রকৃতি দুই প্রকার; ধাতু ও প্রাতিপদিক।

ধাতু। যদ্দ্বারা ক্রিয়ার বোধ জন্মায় তাহাকে ধাতু কহে।

প্রাতিপদিক। যদ্দ্বারা কোন বস্তুর বা বস্তুর অথবা ক্রিয়ার বিশেষণ বুঝায়।

প্রত্যয়। ধাতু ও প্রাতিপদিকের উত্তর যাহা বিহিত হয় তাহাকে প্রত্যয় কহে। প্রত্যয় পাঁচ প্রকার,—বিভক্তি, কৃৎ, তদ্ধিত, স্ত্রীপ্রত্যয় ও ধাত্ববয়ব।

বিভক্তি। প্রাতিপদিকের উত্তর কে, হইতে, র, এ ইত্যাদি এবং ধাতুর উত্তর ইতেছি, ইলাম, ইব, উক ইত্যাদি যে প্রত্যয় হইয়া থাকে তাহাকে বিভক্তি কহে।

কৃৎ। ধাতুর উত্তর তব্যাদি, তৃণাদি যে সকল প্রত্যয় হয় তাহাকে কৃৎ কহে।

তদ্ধিত। শব্দের উত্তর ষ্ণ, ষ্ণ্য, ষ্ণেয় আদি যে সকল প্রত্যয় হয় তাহাকে তদ্ধিত কহে।

স্ত্রীপ্রত্যয়। শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গ বুঝাইবার জন্য আপ্, ঈপ্ আদি যে সকল প্রত্যয় হয় তাহাকে স্ত্রীপ্রত্যয় কহে।

ধাত্ববয়ব। ধাতুর উত্তর সন্, যঙ্ আদি যে সকল প্রত্যয় হয় তাহাকে ধাত্ববয়ব কহে।

প্রাতিপদিক। ত্রিবিধ যথা—রূঢ়, যোগরূঢ় ও যৌগিক।

শব্দ। পঞ্চবিধ; বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, সর্ব্বনাম ও অব্যয়।

বিশেষ্য। যাহাকে বিশেষ করা যায় বা যে সকল শব্দ দ্বারা বস্তু, ব্যক্তি, গুণ, সংজ্ঞা ও ক্রিয়া বোধ জন্মায় তাহাকে বিশেষ্য কহে। সুতরাং বিশেষ্য পঞ্চ বিধ, যথা,—বস্তুবাচক, ব্যক্তিবাচক, গুণবাচক, সংজ্ঞাবাচক ও ক্রিয়াবাচক।

বিশেষণ। যদ্দ্বারা বিশেষ করা যায় বা * যে সকল শব্দ দ্বারা বিশেষ্যের গুণ ও অবস্থাবোধ জন্মায়।

* বিশেষণ দ্বারা বিশেষ্যের যে গুণ নির্দ্দেশ করা যায়, তাহার কিয়ৎ পরিমাণ সাধারণে থাকা আবশ্যক; নচেৎ বিশেষণ পদের কোন বিশেষ অর্থই হইতে পারে না। যথা, রাম একজন ধনবান্ ব্যক্তি। ধনবান্ শব্দে যাঁহার ধন আছে তাঁহাকে বুঝায়। এস্থলে যখন রামকে আমরা ধনবান্ ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, তখন এই অর্থ বুঝাইবে যে, রাম সচরাচর

ক্রিয়া। হওয়া, করা, প্রভৃতিকে ক্রিয়া

ধনবান্ ব্যক্তি দিগের অপেক্ষা ধনী। বিশেষণ পদ সকলের প্রয়োগে সর্ব্বদা পক্ষপাতশূন্য ও সত্যপ্রিয় হওয়া আবশ্যক; কেন না অত্যুক্তি জন্য যেন আমরা সকলের মনে মিথ্যা সংস্কার রোপণ না করি। উপন্যাসাদিতে নায়ক নায়িকাদিগের রূপ ও গুণ বর্ণনাকালে আমরা যেমত বর্ণনা করি না কেন,তাহাতে বিশেষ দোষ হয় না; কিন্তু বিষয় কার্য্যে, ওরূপ করিলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। দৃষ্টান্ত স্থল যথা—ব্যবসা, বিবাহ, শিক্ষা ইত্যাদি।

কহে। ক্রিয়া সমাপিকা, অসমাপিকা ভেদে দুই প্রকার এবং অকর্ম্মক, সকর্ম্মক ও দ্বিকর্ম্মক ভেদে ত্রিবিধ।

সর্ব্বনাম। ভাষার এক শব্দের পুনরুক্তি দোষ পরিহারের জন্য যে যদ্,তদ্ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করা হয়,তাহাকে সর্ব্বনাম কহে। সর্ব্ব নামের পরিবর্ত্ত বসে বলিয়া উহার ঐ নাম।

অব্যয়। যে সকল শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ হয় না, তাহাদিগকে অব্যয় কহে।

এতদ্ভিন্ন ব্যাকরণ বিষয়ে আরও অনেক জ্ঞাতব্য আছে,যথা ক্রিয়ার কাল, বিশেষ্যের কারক, সমাস বাক্য প্রকরণ ও অলঙ্কার।

(ক্রমশঃ।)

নববর্ষ।

আয় আয় নববর্ষ, আয় আয় আয়!
হেসে খেলে নেচে দুলে আয় এ ধরায়!
প্রভাত সমীর ভরে শুভ্রপাল তুলি
চুমি চুমি ঊর্ম্মিমালা, ক্ষুদ্রতরী গুলি
গঙ্গার তরঙ্গে রঙ্গে যথা ভেসে যায়;—
আয়! নববর্ষ, আজ সেই বেশে আয়!

২

আয়! নববর্ষ, আজ আয় আয় আয়!
শীতান্তে বসন্ত যথা আসে পায় পায়;
শ্যামল বসন অঙ্গে, কণ্ঠে ফুলমালা,
সুরভিকুসুমপূর্ণ হস্তে ফুলডালা,
অধরে মধুর হাসি ভাসিয়া বেড়ায়;—
সেই বেশে, নববর্ষ, আয় আয় আয়!

৩

নববর্ষ, আয় আয়! আয় আয় আয়!
যেমন নিশান্তে ঊষা সোণার দোলায়
সোণার তরঙ্গ তুলি পূর্ব্বাসারে বসে,
ধীরে ধীরে অন্ধকার-যবনিকা খসে,
সঞ্জীবন মন্ত্রে যথা জগত জাগায়;—
সেই বেশে, সেই ভাবে, নববর্ষ আয়!

৪

আয় আয়! নববর্ষ, হেসে দুলে আয়!
উজলি বঙ্গের গৃহ কিরণমালায়
যেমন আশ্বিনে উমা দেখা দেন বঙ্গে,
ভাসে বাঙ্গালির গৃহ উৎসব তরঙ্গে,
মনের চাঁদের জ্যোৎস্না সুধা বরিষায়;—
সেই বেশে, নববর্ষ, আয় আয় আয়!

৫

অনন্ত তুষারাবৃত উত্তর মেরুতে
অরধ বর্ষের ঘোর আঁধার নাশিতে,
সহসা গগণে যথা শোভে দিনমণি,
প্রকৃতির আস্যে হাস্য খেলায় অমনি,
তুষার-পর্ব্বত পরে মুকুট মাথায়;—
সেই মত সেজে গুজে, নববর্ষ, আয়!

৬

কত যে উদ্দাম ভগ্ন হইল জীবনে !
কত যে সুখের তারা নিবিল গগণে !
কত যে আশার ফুল ঢলিয়া পড়িল !
কত যে জীবন-স্রোত শুকাইয়া গেল !
সুখময় ভূতচিত্র করিয়া স্মরণ
কত যে রুধিরধারা বর্ষিল নয়ন !

৭

তিন শ পঁয়ষট্টি দিন গণিয়া গণিয়া,
কাতরে আকাশ পানে নয়ন রাখিয়া,
কত যে নিশ্বাস দীর্ঘ ফেলিয়াছি, হায় !
মরীচিকা-মুগ্ধ হয়ে, নবীন শোভায়
কত যে নূতন রাজ্য হেরেছি নয়নে !—
সে সব দুঃখের কথা বলিব কেমনে !

৮

বর্ষে বর্ষে, নববর্ষ, দেখা দাও তুমি,
হস্তে ভর করে হর্ষে উঠে বসি আমি ;
জাগিয়া কতই দেখি আশার স্বপন !
ভাবি, শুভক্ষণে বুঝি দিল দরশন
আমার সে নববর্ষ ! নিরখিতে যায়
বিস্ফারিতনেত্রে উর্দ্ধে চেয়ে আছি, হায় !

৯

কিন্তু শেষে মোহমুগ্ধ বোঝে এ হৃদয়,
আমার এ দুরাকাঙ্ক্ষা পূরিবার নয় !
মায়াময়ী মরীচিকা নিরখি এ সব !
বঞ্চক আলেয়া আলো !—শ্মশান উৎসব।
বর্ষে বর্ষে নববর্ষ পড়ে রহে, হায় !
শূন্য, পুরাতন নব-পঞ্জিকার প্রায় !

১০

আজ তোরে, নববর্ষ, যে করুণস্বরে
ডাকিতেছি ডুবি এই তিমির-সাগরে,
এই মত শতবর্ষে ডাকিয়াছি, হায় !
কিন্তু শুন্য, লতা যথা সাগর বেলায়
তরঙ্গে তরঙ্গে যায় সকলি ধুইয়া,
আমার সে ক্ষীণ স্বর গিয়াছে ভাসিয়া !

১১

একটি বৎসর যায়, অমনি চমকি
হরিষ বিষাদে, হায়, সম্মুখে নিরখি ;
নিরখি অনন্ত ঘোর-তিমির সাগর
উত্তাল তরঙ্গময় !—কাঁপে এ অন্তর !
দুই হস্তে ধরি দুই আশার মশাল
আয় ! নববর্ষ, দলি তরঙ্গ উত্তাল !

১২

শুভক্ষণে শুভ লগ্নে, নববর্ষ, আয় !
জলে যথা জল-বিম্ব মুহূর্ত্তে মিশায়,
এ স্মৃতির শিখা মনে তেমনি মিশাবে !
বিশুষ্ক অধর প্রান্তে হাসি দেখা দিবে !
মুঞ্জরিবে ম্রিয়মাণ আশা-তরু কত !
বহিবে জীবন-স্রোত কোটি দেহে মৃত !

১৩

আয় ! আয় ! নববর্ষ, একবার আয় !
বদ্ধ পিঞ্জরের আমি অন্ধ পাখী, হায় !
একবার খুলে দেরে পিঞ্জরের দ্বার !
একবার চক্ষুদান কর্ রে আমার !
প্রাণভরে উড়ে উড়ে স্বাধীন আকাশে
স্বাধীন অন্তরে গাণ গাইরে হরষে !

১৪

আয় আয় ! নববর্ষ, আয় একবার !
কর্ কোটি মৃত দেহে জীবন সঞ্চার !
নিস্তেজ অনল কিরে ফুৎকারে জ্বলে না ?
বসন্তে কি শুষ্ক তরু পল্লবে শোভে না ?
রবিকরে ঝলমল প্রজাপতি প্রায়,
হেসে খেলে নেচে নেচে নববর্ষ আয় !

শ্রীদীঃ—

গ্রীক এবং হিন্দু।

উপসংহার।

(২)

এক্ষণে উপযুক্ত কার্য্যোপযোগী আমাদিগের সামাজিক জীবনী কতদূর; কি পরিমাণে আমরা কার্য্যনিরত হইতেছি; এবং তদর্থ আমাদিগের আত্ম-প্রকৃতি অনুকূল করিয়া তুলিতে কতদূর পারিয়াছি, তাহার একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সেরূপ আলোচনা সর্ব্বদাই, এবং সর্ব্বত্রই সুফলপ্রদ হইয়া থাকে। অতএব পাঠক মহাশয়, ইহাতে দিক্‌দারি বিবেচনা করিবেন না।

অযথা আত্মঘোষণা করিতে এবং শুনিতে যে নিতান্ত চিত্ত এবং শ্রুতিসুখকর তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; সেইরূপ আবার অন্যদিকেও ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, সেই আত্মঘোষণা সর্ব্বদাই পরিণামে নিপাতনের কারণ হইয়া থাকে। যে দেখিবে আত্মকৃত কার্য্যের প্রতি সাহঙ্কারদৃষ্টি প্রক্ষেপে গরিমায় স্ফীত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনই নিশ্চয় জানিবে তাহার অধঃপাতে যাইবার দশা উপস্থিত। সপদার্থের আত্মগরিমা যখন এরূপ দূষণীয়, তখন অপদার্থের আত্মগরিমা না জানি কি দারুণ ভয়ঙ্কর। অতএব পাঠক, যদি এই প্রস্তাব মধ্যে আত্মগরিমার পরিবর্ত্তে, আত্মধিক্কারের কোন উল্লেখ দেখিতে পাও, তাহাতে তোমার রুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। বিশেষরূপে প্রবুদ্ধ এবং প্রকৃত যে আত্ম-ধিক্কার, তাহা শুভলক্ষণ। যেখানেই তাহার উৎপত্তি, সেই খান হইতেই সুপথগমনের সূচনা বলিয়া জানিও। ভারত সন্তান, এ পর্য্যন্ত তুমি অযথা আত্মগরিমায় অনেক দূর আত্মধ্বংস করিয়া আসিয়াছ, আর কেন? যদি তোমার গুণভাগ কিঞ্চিৎ উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে শূন্য হাঁড়িতে ঘুঁটি ফেলিয়া কড়্‌কড়্‌-শব্দে লোক হাঁসাইবার আবশ্যক কি? প্রকৃত গুণ যাহা তাহা নির্ব্বাক্, প্রকৃত পূর্ণতা যাহা তাহা নিস্তব্ধ। *

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাত্ত্বিক প্রকৃতি সাত্ত্বিক চেষ্টার পূর্ব্বগত উৎসস্থল যেরূপ, প্রসূতফলও সেই প্রকৃতির হইয়া থাকে, বহুচেষ্টাতেও সে প্রকৃতিচ্যুত করিবার সম্ভব নাই। যদি তাহা করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা প্রকৃতি

* এতদিনের পর দেখিতেছি, লেখকটি নিতান্তই উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে, নতুবা আপন ঘরের দোষ কে আপনাপনি বাহির করে! ঘরে যাহা করি না কেন, লোকে তাহা জানিবে কেন? বুদ্ধিমান্ যে সে ঢাকিয়া রাখে। যেহেতু ঢাকিয়া রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য, এ লেখক তাহা করিতেছেন না, অতএব তিনি বুদ্ধিমান্ নহেন, সুতরাং তিনি নির্ব্বুদ্ধি অর্থাৎ নাস্তি হয়েছে বুদ্ধি যার—পাগল, উন্মাদগ্রস্ত! ইতি। —বাঞ্চারাম।

বিরুদ্ধে সংগ্রাম; সুতরাং শ্রমবিধ্বস্ত, বহু-বিভীষিকাবিঘূর্ণিত, ইহাই লাভ হইয়া থাকে, কার্য্য ফলে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ শান্তি ভিন্নলক্ষণ শান্তিতে কখনও রোগনিরসন হয় না। অতএব যে কোন সমল পদার্থের মলসংস্কার, বা যে কোন নির্ম্মল পদার্থের উৎপাদন, সাধন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে উৎসস্থানের নির্ম্মলতা সাধন অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া জানিও। উৎসস্থানকে একবার নির্ম্মল করিতে পারিলে, তাহার পরবর্ত্তী আর যে কিছু উত্তর-কার্য্য তাহা নিতান্তই সহজ হইয়া আইসে; এবং লক্ষণচিকিৎসার শতাংশের একাংশ শ্রমেই সমস্ত ব্যাপার সুনিষ্পন্ন হইয়া যায়।

সাত্ত্বিক চেষ্টায় সাত্ত্বিক প্রকৃতি নির্ম্মাণ করিতে পারে না; সাত্ত্বিক প্রকৃতিই সাত্ত্বিক চেষ্টাকে নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। প্রকৃতি সাত্ত্বিক হইতে আরম্ভ করিলেই, সাত্ত্বিক চেষ্টাও অবশ্যম্ভাবি ফলস্বরূপ তাহাতে আসিয়া সংমিলিত হয়; এবং সেই স্থান হইতেই প্রাকৃতিক নিয়মানুকূলে কার্য্যফলের আশা করিতে পারা গিয়া থাকে। যথায় প্রকৃতি এখনও অসাত্ত্বিক, সেখানে যে কোন সাত্ত্বিকরূপদর্শী চেষ্টা, জ্ঞানতঃ হউক বা অজ্ঞানতঃ হউক, পরসমক্ষে হউক বা আত্মসমক্ষে হউক, ফলতঃ উহা জুয়াচুরী ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং পরিণাম উহার বিশ্বাস বিপর্য্যয় সাধক। এরূপ চেষ্টা সর্ব্বদাই অন্ধ, সুতরাং তাহার কার্য্যফলও বিকৃত হইয়া থাকে; এবং চেষ্টাকারকও আত্মকর্ম্মবিপাক-জালে জড়িত হইয়া ক্ষতবিক্ষত হয়, এবং আত্মজীবনকে পরিণামে কর্ম্মহীন, আত্মদা-হক এবং অশান্তির আধারস্থল করিয়া তুলে। অতএব আবার বলিতেছি, এমন স্থলে সদুপদেশ এই যে, যে কোন বিষয়ের জন্য হস্ত প্রসারণ করিবার পূর্ব্বে, হস্তকে আগে তদুপযোগী সফলসাধকতায় অভ্যস্ত করা কর্ত্তব্য। তাহা কি আমাদের হইয়াছে, না সঙ্কিতই আছে? দেখা যাউক, প্রস্তাব বাহুল্য বা প্রস্তাব অসংলগ্ন হয় হউক তাহাতে ক্ষতি নাই। বারেক দেখা কর্ত্তব্য।

যে কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে, এই দ্বিবিধ প্রকারই প্রশস্ত। এক বাহ্যদৃশ্য ধরিয়া কারণের অনুভব; অপর কারণ ধরিয়া বাহ্যদৃশ্যের অনুভব। পাঠককে এখানে বাহ্যদৃশ্য ধরিয়া কারণের অনুভব করিতে হইবে। দেখ, তোমার সামাজিকবর্গের প্রতি বারেক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখ, কি অদ্ভুত দৃশ্য। দ্বারদেশেই সর্ব্বগুণবিধ্বংসি বিকট কাপট্য উন্মাদবৎ কি অঘোর নৃত্য করিতেছে! দেখিতেছ কি?—তোমার হিন্দুসন্তান কাপট্যভাবের আধারস্থল হইয়া আসিয়াছেন! কাপট্যে ইহাঁর অস্তিত্ব, কাপট্যে ইহাঁর বসৎবাস, কাপট্যে ইহাঁর ভক্তি, কাপট্যে প্রণয়, এবং কাপট্যেই ইহাঁর সর্ব্বকর্ম্ম। ধর্ম্মে এবং লোকাচারে ইনি ঘরে হিন্দু, বাহিরে ব্রাহ্ম, হোটেলে সাহেব এবং আবশ্যকের অনুরোধে কখনও কখনও মুসলমান। ইহাঁর জীবনের সারসংগ্রহ করিলে, মোটের উপর এই কয়টি বিষয় মাত্র পরিলক্ষিত হয়;—ইহাঁর দেবতা উদর, বেদ পেনালকোড, লোকাচার সম্মুখে 'ভাই ভাই' এবং পশ্চাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন। অভ্যন্তরে পরিপূর্ণ শয়তান বিরাজ করিলেও, বাহির

চটক যদি থাকে, তাহা হইলেই মনুষ্য মধ্যে গণনীয় হইতে পারে। যে কেহ এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী হইবে, তাহারই সহিত কেবল ইহাঁদের সুসংমিলনের সম্ভাবনা, নতুবা অন্য কোন রূপে সে সম্ভাবনা নাই। সময় দুরন্ত! স্বভাব এমনই দুরন্ত হইয়া আসিয়াছে যে, যে কেহ সাত্ত্বিকপ্রকৃতিমান্ ব্যক্তি, তাঁহাদিগের তথাবিধ সমাজ হইতে দূরে অবস্থান ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। ইহাঁদের মধ্যে তাহারা পড়িলে হাস্যাস্পদ এবং ঘোর বাতুলের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে,—দারুণ ঘৃণার পাত্র! ইহাঁদের আত্মজীবনের উন্নতি, সামাজিক জীবনের উন্নতি, পোষকাদি বাহ্যদৃশ্যেই পরিসমাপ্ত। বাবু চীনাকোট ব্যবহার করিতেছেন, দেখাদেখি ফরাসডাঙ্গার সুতারেরাও তাহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। বাবু মহাবিপদে পড়িলেন, মান যায়, সম্ভ্রম যায়, ভদ্রতা পর্য্যন্ত লোপ পায়, ছোট লোক সমকক্ষ হইতে চলিল, উপায়?—বাবু কোটের আকার একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন। দেশের ছোটলোকই বা কি দুষ্ট! তাহাদের জ্বালায় বাবুর কোট একটু একটু করিয়া পরিবর্ত্তিত হইতে হইতেও, ক্রমে সাহেবী কোটের কাছাকাছি পর্য্যন্ত আসিয়া লাগিয়াছে! কোটের ব্যাপার যেন যে সে একরূপে নির্ব্বাহ হইল, হউক; কিন্তু ঐ যে সূতার অথবা আরও নিম্নতম ঐ যে চর্ম্মকারপুত্র তোমার সঙ্গে সমকক্ষভাবে বিদ্যালয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতেছে, তাহাকে ছাড়াইয়া যাইবার কি কিছু বন্দোবস্ত করিয়াছ? বাবু সাধারণ শিক্ষার প্রতি বড় চটা; লেখা পড়া শিখিয়া ধোপায় কাপড় কাচিবে না, ক্ষৌরকার ক্ষৌর করিবে না, তাহারা সমকক্ষ হইবে, এই ইহাঁর আপত্তির কারণ! নির্ব্বোধ, মানবের জীবনপ্রবাহ অনন্ত, সুতরাং তাহার গতিও অনন্ত, এবং উন্নতিও অনন্ত। অতএব তাহারা যখন অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তখন তুমি কেন নিস্পন্দ বসিয়া এরূপ বালকের ন্যায় বিলাপরত হইতেছ?—তুমিও আপনার পূর্ব্বতন সমব্যবধানে সমান রাখিয়া অগ্রসর হইতে থাক। সুতরাং লেখা পড়া শিখিয়াও, যদি এরূপে সে সেই লেখা পড়ায় তোমার সমতায় আসিতে না পায়, তবে সেই ধোপায় সেই কাপড় যদি আবার না কাচে, ক্ষৌরকার যদি সেই ক্ষৌর আবার না করে, তবে খাইবে কি? অবশ্য কাপড় কাচিবে, অবশ্য ক্ষৌর করিবে, বরং লেখা পড়ার ফলে পূর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠতর ভাবে; এবং তুমি যে উন্নত হইতেছ, তোমার উন্নতভাবেরও উন্নতি অভাবপূরক রূপে। কিন্তু সেরূপ অগ্রসর হওয়ার কি কোন চেষ্টা হইতেছে? কিছুমাত্র নহে, সে চেষ্টা কেবল নিস্পন্দ শক্তিবিলাপে পরিণত!

প্রতি ব্যক্তিই নিশ্চেষ্ট বা আড়ম্বরচেষ্ট, আত্মঘাতি জীবন অতিবাহিত করিতেছে; আড়ম্বরমুগ্ধ অজ্ঞ তাহাতে করতালি ঘোষে বাহবা দিতেছে। ধনী হুঁকা ছাড়িয়া সভা, সভা ছাড়িয়া হুঁকা,—সভায় বসিয়া, বক্তৃতা করিয়া, চাঁদা দিয়া, রাজদ্বারে মূর্খমণ্ডলে বাহবা লইতেছে; নির্ধন নির্ব্বাক্, আবশ্যক হইলে অকাতরে তাহাতে রক্তারক্তি হইতেছে; সাম্যসাধক মধ্যবিত্ত আপন কার্য্য ভুলিয়া তাহাতে হাততালি দিতেছে। বৃদ্ধ

বায়াতুরে প্রাপ্ত; প্রাচীন বিদায় গ্রহণের পন্থা দেখিতেছেন, এবং দেখিতে দেখিতেও মুরুব্বিবৎ তাঁহার শেষ উত্তম শিক্ষা দিতেছেন—ইহ সংসারে স্বচ্ছন্দতা লাভের বাঞ্ছা থাকিলে, যে কোন উপায়ে হউক সাহেব সুবোকে সন্তুষ্ট রাখিও। অর্দ্ধবয়স্ক নিষ্পন্দ, স্বচ্ছন্দ উদরপূর্ত্তি এবং বিহারাদিই জীবনের মোক্ষধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া, তাহারই আয়োজনশ্রমে জীবন উৎসর্গিত করিতেছেন; ইহারা সংসার বাগিচায় যথার্থই কুষ্মাণ্ডফল! ইহাদের বিশ্বাস যে কোন প্রকারের উদরপূর্ত্তি চেষ্টা হইতেই আর যে কিছু উন্নতি তাহা আপনা হইতে আসিয়া পড়ে; তাহার পর আরও উন্নতি চাও, নবেল লিখিতেছি, নাটক লিখিতেছি, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতেছি, আরও চাই কি? ইহাদের বিশ্বাস জাতির মধ্যে তাহারা শ্রেষ্ঠ নমুনা; এবং ভাবি ফলাফল তাহাদেরই উপর নির্ভর করিয়া থাকে। তাহাই হউক। তৃতীয়তঃ নব্যদল, লক্ষ্যশূন্য, অভিপ্রায়শূন্য, বাতুলবৎ চেষ্টাঘূর্ণনে বিঘূর্ণিত।

ব্যক্তিত্যাগে সমাজের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এ সমাজে সকলেই জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ কেহ নাই; সকলেই তর্ক করিতে উদ্যত, তর্ক শুনিবার জন্য কেহ নাই; অথচ পরস্পর সকলেরই সমাজ সন্তুষ্ট করিতে কি আগ্রহ! সকলেই নেতৃত্ব-অবলম্বী; এবং সকলেই নেতৃত্বমূলোদ্ভব আড়ম্বরে অপরকে বিমোহিত করণে, এবং তাহার প্রশংসা আকর্ষণে উদ্যত। বহু দ্বন্দ্বিপদার্থের একত্র সমাবেশ হইলে যে ফল ফলিয়া থাকে,এখানেও তাহাই ফলিতেছে। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এ সমাজে কখনও পাঁচজনকে একরূপ বসন ভূষণ পরিতে দেখিবে না; পাঁচজনকে একরূপ আহারীয় আহার করিতে দেখিতে পাইবে না; পাঁচজনের পাঁচ রকম রুচি, পাঁচ রকম ধর্ম্ম অর্থাৎ পাষণ্ডপণা; নতুবা প্রকৃত ধর্ম্মের ইহারা কোন ধারই ধারে না। পাঁচজনের পাঁচজনই নূতন নূতন মূর্ত্তিতে, নূতন নূতন ভেক ধরিয়া,পাঁচ জনের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে—উদ্দেশ্য পাঁচজনের উপর টেক্কা দিয়া প্রশংসা আকর্ষণ করিব, অথবা অভাবে তাহাদের প্রীতিভাজনও হইব; কিন্তু পাঁচজনই পাঁচজনকে দেখিয়া পরস্পর গা টিপাটিপি করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে পরস্পরকে উপহাস করিতেছে। অথচ পরস্পর পাঁচজনই বন্ধু অর্থাৎ 'ফ্রেণ্ড'। আজি কালি তালপাত ছাড়িয়াই সাঙ্খ্যদর্শন বা কোম্‌তে দর্শনের অধ্যয়ন বা আলোচনার একটি ফেসিয়ন্ উঠিয়াছে। বোধ করি এ ফ্রেণ্ডসীপের কল্পনা ও ধারণা সেই সাঙ্খ্যদর্শন হইতেই উঠিয়া থাকিবে; কারণ সাংখ্যদর্শনে আমরা দেখিতে পাই পুরুষ প্রকৃতিসংস্রবযুক্ত হইলেই বৈচিত্রময়ী সৃষ্টির প্রকটন হইয়া থাকে, আবার যোগে বা ন্যায়দর্শনে সেই সংস্রব ছেদ করিতে পারিলেই সমস্ত নির্ব্বাণ হইয়া যায়। এ ফ্রেণ্ডসীপও মদ এবং খানার সংস্রবে উৎপন্ন, আবার রোগে বা ব্যায়দর্শনে সে সংস্রব ছিন্ন হইলেই সমস্ত নির্ব্বাণ হইয়া যায়। কিন্তু সে যাহা হউক, 'ফ্রেণ্ড' এই ইংরেজী শব্দটির আবরণ-শক্তি না জানি কতই দিগন্ত প্রসারিত!

এই জ্যেষ্ঠত্ব, এই স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যভাব,ইহা

কি মানবীয় প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্যের অনুসরণে উৎপন্ন? তাহা নহে। প্রকৃতি-স্বাতন্ত্রের যথার্থ অনুসরণক্রিয়ার ধর্ম্ম ওরূপ নহে। কতকগুলি বিষয়-সাধারণের কোন বিশেষ সীমান্ত মধ্যে সর্ব্বত্র পরিচালন হেতু জাতিসমূহের মধ্যে জাতীয়ত্ব বিশেষ সংঘটিত হয়। সেই বিষয়-সাধারণসমূহের উদ্দিষ্ট-ক্রিয়াসাধক যত গুলি, তাহাদের লইয়া জাতি। উদ্দিষ্ট-ক্রিয়ার আবার বিভিন্ন পর্য্যায় আছে। সেই পর্য্যায়-সমূহের মধ্যে পর্য্যায়বিশেষের সংসাধননিমিত্ত বিভিন্ন সমাজ। পুনশ্চ, সেই পর্য্যায়বিশেষ আবার বহুআয়োজন-সংসাধ্য হওয়ায়, সমাজ খণ্ডে খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া, প্রতি বিভিন্নাংশ সাধনোপযোগী, প্রতি বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে পরিণত। ইহার মধ্যে যাহারা কেবল আয়োজনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহারা সমাজে কনিষ্ঠ; এবং আয়োজিত দ্রব্য লইয়া যাহারা উদ্দিষ্ট পর্য্যায়ের মূর্ত্তি রচনা করিয়া থাকে তাহারাই জ্যেষ্ঠ। এ বিশ্বকর্ম্মক্ষেত্রে এইরূপ কার্য্যবিভাগেই, ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তম, সকল কার্য্যই কার্য্যকারকবর্গের দ্বারায় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এখন দেখিতে পাইবে যে, এই বহুলত্ব মধ্যে সর্ব্বত্রই পূর্ণভাবে একতার তার কিরূপ গূঢ় প্রচালিত হইয়া রহিয়াছে। যে সামঞ্জস্য গুণের প্রভাবে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, সামঞ্জস্য গুণের প্রভাবে প্রকৃতির শ্রী; সেই সামঞ্জস্যগুণ যখন মানবেতেও আসিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, তখনই মানবকে যথার্থ প্রকৃতিস্থ বলিয়া গণনা করিতে পারা গিয়া থাকে। যেখানে একত্ব এবং বহুত্ব, উভয়ই প্রণয়সংমিলনে সংমিলিত হইয়াছে; সেখানে প্রতি মানব বিভিন্ন-প্রকৃতি হইলেও সে সামাজিকতা এবং জাতীয়ত্বে এক; সমাজরক্ষা, সমাজতুষ্টি এবং জাতীয়ত্ব রক্ষা, অথচ আত্মপ্রকৃতিস্বাতন্ত্র্যবশে স্বতন্ত্র কর্ম্মানুসরণ, তাহার কিছুতেই একে অপরের প্রতিবন্ধকতা করে না। সর্ব্বত্রই সুরুচির সঙ্গীতবৎ চিত্তমোহকরভাবে সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে; কোথাও কোন বিষয়ের জন্য কাহারও নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হয় না। এবং এইরূপ হইলেই পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের অস্তিত্ব সম্ভবিতে পারে; নতুবা যেখানে পরস্পরের মধ্যে উপহাসের সম্ভাবনা আছে, সুতরাং উভয়তই সরলতার অভাব, সেখানে বন্ধুত্ব কিরূপে সম্ভবিতে পারে?

তবে আমাদের এ স্বাতন্ত্র্যভাব কোন্ শ্রেণির, বলিতে পার? আর যে কেহ উহাকে যে শ্রেণির ইচ্ছা তাহা বলিয়া ধরুক, আমি উহাকে মহাপ্রলয় শ্রেণির বলিয়া থাকি;—যে শ্রেণি হইতে মুসলমান এ খৃষ্টীয় শয়তানের উৎপত্তি হইয়াছে। যথায় বন্ধনী অভাবে নিয়মশূন্য, সংজ্ঞাশূন্য, দর্শনশূন্য পদার্থনিকর যদৃচ্ছা আলোড়িত, বিক্ষিপ্ত, বিলোড়িত, তরঙ্গায়িত, উৎক্ষিপ্ত এবং বিলুপ্ত হইতেছে, ইহা সেই শ্রেণির। ইহা সর্ব্বত্রই বেগবিক্ষিপ্ত, বেগবিলুপ্ত, স্বপদে সংস্থাপিত রাখিবার জন্য কোথাও ইহার আভ্যন্তরীণ একতা সূত্রের অস্তিত্ব নাই। তরঙ্গনিক্ষিপ্ত মলরাশিবৎ যখন যে দিকে ধাক্কা পাইতেছে, তখন সেই দিক অভিমুখে ছুটিতেছে; অবলম্বনভিত্তির সর্ব্বত্রই অভাব। পাঁচজনে পাঁচরূপ মূর্ত্তি, পাঁচরূপ

ভেক ধরিয়া, উপস্থিত হইল; পাঁচ জনেরই প্রত্যেক মূর্ত্তি, প্রত্যেক ভেক নূতন নূতন, অবলম্বন-ভিত্তির অভাবে পাঁচ জনের মধ্যে কোথাও বিষয়সাধারণ ভাবের চিহ্নমাত্রও নাই, সুতরাং পাঁচ জনই পাঁচ জনের নিকট পঞ্চবিধর্ম্মী হওয়ায় পরস্পরের উপহাসাস্পদ হইল। কেবল বাহ্য দৃশ্যে এরূপ নহে, অন্তর্দৃশ্যও অবিকল ঐরূপ। আজি তুমি বলিলে এইরূপ করিলে ভাল হয়, তাহাই করিলাম; কালি তিনি আবার তাহা দেখিয়া নিন্দা করিয়া কহিলেন এরূপ নহে সেরূপ হইবে, তাহাই করিলাম; এইরূপে যে যাহা বলিতেছে, তাহাই করিতেছি, অথচ কাহাকেই সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না। হিন্দুসন্তান হাটের লেড়া; যখন যে দিকে হুজুক তখন সেই দিকে ঝুঁকিতেছে, অথচ কাহাকেই সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছে না। ইহা সমাজশূন্যতা বা মিথ্যাসমাজ, এবং তাহার মূল কারণ অবলম্বন-ভিত্তির অভাবের পরিচায়ক। এরূপ সমাজ ছিন্নসূত্র মালিকাবৎ, এবং সমাজস্থ জনগণের কার্য্যসমূহ সূত্রচ্যুত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, স্তূপীকৃত, ধূলিধূসরিত, পাদদলিত, কোনটা বা লোপ-পথে অগ্রসারিত, বিবিধ পুষ্প সমূহ স্বরূপ। যাহা এত অপূর্ব্ব বৈচিত্রময়ী শোভার আধার, সূত্রচ্ছিন্নে তাহার এই শোককরী বিরূপ দুর্দ্দশা!

কেন এরূপ হইল? জানি না। সকল সৃষ্টির আদি সত্য, অথবা সৃষ্টিই সত্যের বাহ্য প্রচার মাত্র। প্রতি কার্য্যই এক এক পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি স্বরূপ, সুতরাং প্রতি কার্য্যই, সত্যকে তাহার মূল না করিলে, সুসম্পন্ন হইবার কথা নহে। সকল সত্যই ঈশ্বর-প্রতিরূপ। যখন সেই সত্যকে সাত্ত্বিক ভাবে অবলম্বন করা হইবে, তখনই প্রকৃত কার্য্যারম্ভ হইল বলিয়া বলা যায়; ফলতঃ সেইরূপ কার্য্যই কেবল ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং সেইরূপ কার্য্যই কেবল, আমরা অনুভব করিতে পারি বা না পারি, ঈশ্বরপ্রীতি-কামার্থে নিষ্পাদিত। মনুষ্য সমাজে এরূপ মনুষ্যও আছে যে, যাহারা ঈশ্বরকে আশ্রয় না করিয়াও, কেবল মনুষ্যত্বকে আশ্রয় করিয়া, কার্য্য সফলতা লাভ করিয়া থাকে। ঈশ্বরে তাহারা কার্য্যমূল আরোপ এবং কার্য্যফল দান করে না বলিয়া বহুজনে তাহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া থাকে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা নাস্তিক নহে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব যাহা তাহা সত্যে গঠিত, সুতরাং তাহাদিগেরও অবলম্বন-ভিত্তি সত্য, প্রভেদ কেবল তাহারা আমূল প্ররিত্যাগে, তাহার পর্য্যায় বিশেষকে মাত্র আশ্রয় করিয়া কার্য্যনিবিষ্ট হইয়াছে; মূল পর্য্যন্ত তাহাদিগের দৃষ্টি চলে না বা তাহারা চালায় না। এই অবলম্বিত পর্য্যায় বিশেষ, পর্য্যায় সমূহ মধ্যে যে কোন গণনীয় স্থান নিবিষ্টই হউক না কেন, বস্তুতঃ তাহা যদি কোন প্রকৃত সত্যপর্য্যায় হয়, তাহা হইলেই তদবলম্বনে অনুরূপ প্রকৃত কার্য্যফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে কোন স্থানে, যে কোন অবস্থাতেই হউক, কোন প্রকৃত কার্য্যই প্রকৃত সত্যকে অবলম্বন ভিন্ন সংসাধিত হয় না। সত্যকে অবলম্বনের বাহ্য পরিচয়, যাহা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া গৃহীত, তাহার প্রকৃত কর্ত্তব্যতা-ভাবের সততায়

সর্ব্বান্তরীণ রূপে বিশ্বাস, এবং সেই বিশ্বাসকে কর্ম্মফলানুরূপ আত্ম শুভাশুভ প্রদায়ক জ্ঞানে, তদনুযায়ী কর্ত্তব্যের অনুসরণ। এরূপ সাত্বিকভাবপূর্ণ মানব জীবনে কর্ম্ম সমূহ বিবিধশোভাময় কুসুম সমূহ; আত্মাতীত-শক্তি বা পাতৃসমক্ষে কর্ত্তব্য-বোধ তাহাদের অভ্যন্তর পরিচালিত গ্রন্থিসূত্র: হিন্দুসন্তানের জীবনে কর্ত্তব্যবোধ-সূত্র ছিন্ন; সত্যের আশ্রয়, বিশ্বাসকে অবলম্বন, এবং তদনুযায়ি কার্য্যের অনুসরণ গুণের অভাব। এই নিমিত্তই ইহাদিগের জীবন মহাপ্রলয়-সমুদ্র-নিক্ষিপ্ত বাত্যা-বিঘূর্ণিত পদার্থবৎ। এই নিমিত্তই জীবন-জগতে জাগতিক বন্ধনশূন্য, উদ্দেশ্যশূন্য, সুতরাং আগ্রহ এবং চেষ্টারও অভাব; নিস্পন্দ, তবে যে কিছু স্পন্দন দেখিতে পাই, তাহা কালের তাড়নে উদ্ভূত, এবং সুপ্তমনীষার নষ্ট স্বপ্নবৎ ছিন্ন ভিন্ন, বিকট, বা বিভীষিকাময়। হিন্দু সন্তানের বিশ্বাস কোন বিষয়েই নাই; যাহার পর নাই দাম্পত্য প্রণয় ও সুখ, তাহাও পূর্ণ বিশ্বাসে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন কি না সন্দেহ! ইহাঁরা যে বাতুল চেষ্টায় বাতুলবৎ কার্য্যারম্ভ ও তৎসাধনের আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার মূল কর্ত্তব্য-বোধ নহে, বিশ্বাস নহে, তাহা সাময়িক হুজুক। এই জন্যই এক স্থানে বলিয়াছি হিন্দু সন্তান এখন হাটের লেড়া।

যে প্রাচীন ভারত, যাহার গৌরববলেই কেবল আজি পর্য্যন্ত আমরা গৌরবান্বিত; এবং যাহার দোহাই দিয়াই আজি পর্য্যন্ত আমরা বিজাতিসমক্ষে পশুদলের ন্যায় ব্যবহৃত হওয়া হইতে রক্ষা পাইতেছি, সেই প্রাচীন ভারতে এক সময়ে, যে সময়েতেই সেই কথিত গৌরবরাশির সমুদ্ভূত হইয়াছিল, সকল কার্য্যই ধর্ম্মশাসনে সুসম্পাদিত হইত। ব্যক্তিগণ প্রতিকার্য্যেই ঈশ্বরের হস্ত, ঈশ্বরের নির্দ্দেশ দেখিতে পাইতেন; শাস্ত্রকার এবং বিধানকর্ত্তারাও যে কিছু কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং ঈশ্বরের আদিষ্ট বলিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেন। লোকেও, ঈশ্বর ইহলোকে মঙ্গলদাতা এবং পরলোকে মঙ্গলকর্ত্তা; এবং যাঁহার আদিষ্ট সমস্ত কার্য্যই মঙ্গলময় দেখিতেছি এবং তাঁহার মঙ্গল ফল ভোগ করিতেছি, তাঁহার সমস্ত আদিষ্ট কার্য্যই সেইরূপ মঙ্গলময় ও মঙ্গলদায়ক হইবে, এরূপ জ্ঞানে, নিরন্তর প্রাণপণে তাঁহার অনুসরণ করিত,—যেন তাহাদিগের জীবন মরণ একান্তই সেই কর্ম্মের উপর নির্ভর করিতেছে। বস্তুতঃ তাহাদের বিশ্বাসে সেইরূপই নির্ভর করিত। যাহারা এরূপ সর্ব্বান্তরীণ কর্ম্মকারক, তাহাদের প্রতি কর্ম্মনিয়োজক ঈশ্বরেরও করুণা যে অসীম হইবে, তাহা বলিবার আবশ্যক রাখে না। ফলেও সেইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। প্রাচীন জগতে প্রাচীন হিন্দুরা কি না করিয়াই গিয়াছেন, প্রাচীন পৃথিবীর ইহাঁরা সর্ব্বোত্তম রত্ন। অধিক কি, যুগ-যুগান্ত গত, তথাপি আমরা আজি পর্য্যন্ত তাহাদের দোহাই দিয়া খাইতেছি। কিন্তু এ অনন্ত অথচ কালবাহি জগতে সকলই থাকিবে অথচ কেহই স্বমূর্ত্তিতে থাকিতে পাইবে না, তাহা বলিয়াই হউক; বা ব্যক্তিগণের স্বাত্মনিমিত্তভূত কারণেই হউক, অথবা উভয়েরই

যুগপৎ সমাবেশ, বা যে কোন কারণেই হউক, অবস্থান্তরের ক্রমে উপস্থিতি হইল। পূর্ব্বসমস্ত কর্ম্মপরিপাচক জাগতিক কর্ম্ম-কটাহে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

যে শুভসূর্য্য এতদিন ভারত অদৃষ্টক্ষেত্রে সমুদিত থাকিয়া কর-প্রসারণে সকলকেই প্রদীপ্ত করিতেছিলেন, তিনি এক্ষণে মধ্যাহ্ন গগণ পরিত্যাগে অস্তশিখর অবলম্বী হইতে চলিলেন। সময় পাইয়া অন্ধকার ধীরে ধীরে পদ প্রসারণ করিয়া সমাগত হইতে লাগিল। ভারতসন্তানেরা পথভ্রষ্ট হইতে আরম্ভ করিলেন। নববস্তু লাভে বিরত, উপার্জ্জিত বস্তুর ভোগসুখের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। ক্রমে আলস্যজনিত জড়তার আরম্ভ, মানবের আনুষ্ঠানিক জীবন ক্ষীণবল হইয়া আসিল। স্পন্দহীন মানবচিত্ত আত্মদোষোৎপন্ন ফল অদৃষ্টের প্রতি আরোপ করিয়া, আভ্যন্তরিক উত্তেজনা হইতে শান্তিলাভের চেষ্টা করিতে শিখিল। অদৃষ্টবাদ ও মায়াবাদের সৃষ্টি হইল। ধর্ম্মের যে উত্তেজক ও উৎসাহবর্দ্ধক বিমলজ্যোতি তাহা লোপ হইয়া আসিল। ধর্ম্মকেও প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া, চৌকিদার ব্রাহ্মণেরা বহুযত্নে তাঁহার বসনাঞ্চল আকর্ষণে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম এমন স্থানে থাকিবেন কিরূপে? তিনিও মন্ত্রপ্রকরণাদি ছিন্নবসনাংশ তাহাদের হস্তে পরিত্যাগ করিয়া অতর্কিতভাবে অন্তর্হিত হইলেন। এখন কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যজ্য; সংসার দুঃখের মূল; যাহার পর নাই সহধর্ম্মিণী পর্য্যন্ত রাক্ষসী এবং আত্মপথে কণ্টক স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত, এবং সহধর্ম্মিণীও ক্রমে বস্তুতঃ রাক্ষসীমূর্ত্তিতে পরিণত হইলেন। এক্ষণে নিষ্কর্ম্মা মোক্ষই একমাত্র কি ইহ জীবন, কি পর জীবন, উভয় জীবনের উদ্দেশ্য এবং অনুষ্ঠান-স্থল বলিয়া আদৃত হইল। ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠশিক্ষা শেষে এই বলিয়া স্থির হইল যে, যে কেহ কর্ম্মশূন্য হইয়া ব্রহ্মে আত্ম সমর্পণ করিয়া জড়বৎ বসিয়া থাকিতে পারিবে, সেই জীবন্মুক্ত। তবে কি ঈশ্বর যে তোমার সৃষ্টিশ্রমজনিত ক্লেশ স্বীকার করিয়া ছিলেন, তাহা কি এই জড়প্রায় মাটির ঢিবি হইয়া বসিয়া থাকিবে বলিয়া?

এই মায়াবাদ ও অদৃষ্টবাদ উচ্চ হইতে অধমতম সমাজের সকল পর্য্যায়ের ব্যক্তিবর্গেরই হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিল; এমন অবস্থায় কোন রূপে উদর পুষ্টিতে দেহভার বহন ভিন্ন, আর কি কার্য্যের সম্ভাবনা থাকিতে পারে? শাস্ত্র সকলও তদনুসারি হইতে লাগিল। এই নিশ্চেষ্ট অলসভাব এবং এই অনুরূপ শাস্ত্রশাসন, উভয়ে একত্রে মিলিয়া, লোক চরিত্রকে কিরূপ হতচেতন করিয়াছিল, তাহার উদাহরণের কি আবশ্যক হইবে? যদি হয়, তবে লক্ষ্মণ সেনের সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নের ইতিহাস মনে কর। সে পলায়ন লক্ষ্মণ সেনের নহে, তাহা হিন্দু সন্তান মাত্রেরই, লক্ষ্মণ সেন কেবল প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়াছিল এই মাত্র। তাহার পর আরো দেখিতে চাও, তন্ত্রঘটার প্রতি নিরীক্ষণ কর। সে যাহা হউক, এখনও আমরা লোক চরিত্র যত বিকৃত হইয়াছে মনে করিতেছি, তাহা হয় নাই। এখন মানব চিত্ত কেবল কর্ম্মপরিত্যাগরূপ পূর্ণ অলসতায়

আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে মাত্র; নতুবা এখনও কর্ম্ম বৈপরীত্য হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে; তাহার কারণ এখনও উর্দ্ধদেশের সঙ্গে একেবারে সংস্রবশূন্য হইতে পারে নাই। স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও একটি রজ্জু তাহাদিগকে নরক-নিপতন হইতে স্থগিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার পরের দৃশ্য দেখিতে চাও, বর্ত্তমান সময়ের উপর হইতে পরদা অপসারিত কর।

অতি বিকৃত দৃশ্য! বিজাতিপ্রসাদাৎ রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ চলিতেছে, সুখের সাগরে ভাসিতেছি, উর্দ্ধবাহু ঊনবিংশ শতাব্দীর, ঊনবিংশ শতাব্দী যাহারই হউক না কেন, উর্দ্ধবাহু ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিমা গান করিতেছি; কিন্তু এদিকে কি হইয়াছে তাহা দেখিয়াছ? যে একমাত্র অবশিষ্ট রজ্জু এতক্ষণও নরক-নিপতন হইতে রক্ষা করিয়াছিল, তাহা ছিন্ন হইয়াছে! কর্ত্তব্য কাহাকে বলে,—কর্ম্ম কাহাকে বলে? এ সুখসময়ে বাহ্য সম্পদের বহ্বাড়ম্বরে স্বচ্ছন্দ উদরপূর্ত্তি ভিন্ন আর কি শ্রেষ্ঠতর কর্ম্ম হইতে পারে! ঈশ্বর, ঔর্দ্ধদেশিক নিয়োজন, এ সকল কাহাকে বলে? কি জানি বাপু! আর তাহাতে কাজই বা কি, কেহ কখনও তাহা জানিতেও পারে নাই, জানিতেও পারিবে না, অতএব বৃথা কচ্‌কচিতে কিছুমাত্র আবশ্যকতা দেখি না। তোমার ঈশ্বর, ঔর্দ্ধদেশিক নিয়োজন, এ সকল না হইলেও আমরা স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে পারি। পাঠশালার পাঠ্য দর্শন ও বিজ্ঞানলেখকগণ এ যুগের ধর্ম্মগুরু। মিল ও বেন্থাম ইহাদিগের পোপ। এই দর্শন পিশিত মিল, যে ধর্ম্মতত্ত্ব তর্ক করিতে গিয়া ত্রিশসহস্রবর্ষপূর্ব্বগত জরথুস্ত্রের মতের অংশতঃ সমর্থন ভিন্ন আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই; সে ত্রিসহস্র বর্ষ পরে উদ্ভূত অগ্রগামী কালবক্ষোবাহী মানবকে কিরূপে শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবে তাহা মিলশিষ্যেরাই বুঝিয়া উঠিতে পারেন। এখন হইতে সকলই, আত্মিক বিষয় পর্য্যন্তও, কলে নিষ্পাদিত হইবে। ফলতঃ ভারতজীবনে লক্ষ্মণ সেনের সময়কে যদি সন্ধ্যা বলিয়া বর্ণনা করা যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়কে অর্দ্ধরাত্র বলিতে হয়। কিন্তু ইহাও জানিও যেখান হইতে অর্দ্ধরাত্রির পূর্ণতা, সেই খান হইতেই আবার নূতন দিবার সূত্রপাত হইয়া থাকে। (অবশিষ্ট আগামিবারে প্রকাশ্য)

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহম্মদের উত্তরাধিকারিগণ।

(৫ম খণ্ডের ৪৭৩ পৃষ্ঠার পর।)

যখন মৃত্যুকাল নিতান্ত সন্নিকট হইল, তিনি তাঁহার অধীনস্থ কার্য্যকারক ওসমান ইবিন্ এফানকে আহ্বান করিয়া প্রধান প্রধান মুসলমানগণ সমক্ষে এইরূপ লিখা-

ইলেন, "আমি আবু বেকার ইবিন্ আবু কাহাফা আসন্ন সময় উপস্থিত দেখিয়া,—যে সময়ে নাস্তিকও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে, মিথ্যাবাদীও সত্য কথা বলে,—এই আমার অভিপ্রায় মুসলমানগণ সমক্ষে ঘোষণা করিতেছি।" বলিতে বলিতে তাঁহার মূর্চ্ছা হইল, আর কথা বলিতে পারিলেন না। পুনরায় "আমি আমার উত্তরাধিকারী" এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইলে, আর কথা কহিতে পারিবেন না আশঙ্কায়, ওস্মান্ লিখিলেন "ওমার ইবিন্ আল্ খাতাব্কে মনোনীত করি।" আবু বেকার পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া যখন দেখিলেন,তাঁহার ওস্মান্, ওমারের নামলিখিয়াছে, তখন বলিলেন "ঈশ্বর তোমাকে তোমার এই ভবিষ্যৎ জ্ঞানজন্য সুখে রাখুন।" আবু বেকার পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "তাঁহার কথা শুনিও, সকলে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিও। আমি তাঁহাকে যত দূর জানি তিনি মূর্ত্তিমান্ ন্যায় ও ধর্ম্ম। তিনি যে কার্য্যে প্রবেশ করেন তাহাই সম্পাদনে সমর্থ। তিনি ন্যায়পরতার সহিত শাসন করিবেন। যদি তাহা না করেন, ঈশ্বরের নিকট কিছুই অবিদিত রহিবে না, তিনি উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিবেন। আমার অভিপ্রায় সৎ; আমি কাহারও হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ লুক্কায়িত ভাব দেখিতে পাই না। এখন বিদায়। সততার সহিত কার্য্য করিও, ঈশ্বর তাঁহার প্রসাদ তোমাদিগকে প্রদান করিবেন।"

অনন্তর এই চরমপত্রে তাঁহার নামাঙ্কিত মোহর সংযোগ করিয়া দেশ মধ্যে দেওয়ানী ফৌজদারীর কর্ত্তৃপক্ষগণ সমীপে তাহার অনুলিপি প্রেরণ করাইলেন। এবং ওমারকে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়াছেন জ্ঞাপন করিলেন।

ওমার সরল ও কঠিন প্রকৃতির লোক ছিলেন। কোন পদমর্য্যাদার জন্য তিনি লালায়িত ছিলেন না। তিনি বলিলেন "আমি ঈশ্বর প্রেরিতের স্থলবর্ত্তী হইব? আমাকে ক্ষমা করুন, আমি খলিফা সিংহাসনের প্রার্থনা রাখি না।" মুমূর্ষু আবু বেকার বলিলেন "কিন্তু খলিফা সিংহাসন তোমাকেই চায়!'

অনন্তর আবু বেকার বলিলেন "আমার বন্ধুদের অনুরোধে এবং সাধারণের হিতসাধানার্থ তোমার একার্য্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক মিলিত হইয়া এই নূতন সাম্রাজ্য গঠিত, তোমার ন্যায় শাসনক্ষম উপযুক্ত লোক আর দেখি না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, তোমার সময়ে এই নব্য রাজ্যের দৃঢ়তা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।" এইরূপে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনান্তে খলিফা আপন তনয়া আয়েষার ক্রোড়ে অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর। তিনি দুই বৎসর তিন মাস নয় দিন রাজত্ব করেন। মৃত্যু সময়ে তাঁহার পিতা মাতা বর্ত্তমান ছিলেন। পিতার বয়ঃক্রম সাতানব্বই বৎসর ছিল। তিনি আবু বেকারের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে এই মাত্র বলিলেন, "ঈশ্বর দিয়াছিলেন, তিনিই লইয়াগেলেন। ঈশ্বরের মহিমা বিস্তার হউক।"

আবু বেকারের চারিটি স্ত্রী ছিলেন। শেষ স্ত্রী মুতার যুদ্ধে নিহত জেফারের পত্নী। তাঁহার ষাটিবৎসর বয়সের পর এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। তিনি মহম্মদের ন্যায় স্ত্রীদিগের প্রতি তাদৃশ ভালবাসা দেখাইতেন না। তিনি বলিতেন "স্ত্রীলোক বিপদস্বরূপ। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিপদ এই যে, তাহারা আবার নিতান্ত প্রয়োজনীয়।"

আবু বেকারের শোকে দেশস্থ সমস্ত লোক নিতান্ত আকুল হইল। তিনি ঐরূপ ভালবাসা লাভ করিবার উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থ, মিতব্যয়ী, ন্যায়পর, জীতেন্দ্রিয়, উৎকৃষ্ট শাসনকর্ত্তা অতি অল্প দেখা যায়। তাঁহার রাজত্ব এত অল্প কাল ছিল যে, কোন মহৎকার্য্য সাধন করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু ঐ সময় মধ্যে মুসলমান রাজ্য রক্ষা, বিস্তার এবং দৃঢ় করিতে যেরূপ সাহস, সত্বরতা ও ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, মুসলমান রাজ্য নিরাপদ করিতে যে সমস্ত ভীষণ বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারিলে রাজনীতিকৌশল এবং সুবিচার-ক্ষমতার বিস্তর পরিচয় প্রদান করিতে পারিতেন। তিনি একটি নাম রাখিয়া গিয়াছেন, মুসলমান গণ তাহা আদরের সহিত স্মরণ রাখিবে; একটি রাজ্য গঠন করিয়া গিয়াছেন, ওমার বলিয়াছিলেন, অন্যের তাহা অনুকরণ করা সুসাধ্য নহে। মুসলমান ইতিবৃত্ত এবং মুসলমান জাতি আবু বেকারের গুণে-মুগ্ধ এবং তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ের জন্য চিরদিন ঋণী রহিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এই সময়ে মুসলমানদিগের অধিকার সাম্রাজ্যে পরিণত হইল। সরল প্রকৃতি স্থিরমতি বৃদ্ধ আবুবেকার আপনার ধৈর্য্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা মুসলমানগণের যে ভীষণ তেজ কথঞ্চিৎ প্রশমিত রাখিতেন, এক্ষণে আর সে অবস্থা রহিল না। অসাধারণ রণপণ্ডিত দৃঢ়কায় ওমার খলিফা-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স তিপ্পান্ন বৎসর মাত্র ছিল। তাঁহার শরীর দীর্ঘ, বর্ণ কৃষ্ণ, মুখশ্রী গম্ভীর এবং মস্তক টাকযুক্ত ছিল। বীরত্ব ও গাম্ভীর্য্য যেন তাঁহার সমস্ত সরল ও সতেজ স্বভাব ও কার্য্যে বিরাজ করিত।

বুদ্ধিমতী আয়েষা ওমারের সিংহাসনে সংস্থাপিত হইতে সম্পূর্ণ সহায়তা করিলেন। আলী বিবেচনা করিলেন, প্রতিরোধ পক্ষে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইবে, সুতরাং তিনি ও সম্মতি দিলেন।

ওমারের অসাধারণ শারীরিক শক্তি ছিল। তিনি দক্ষিণ হস্ত যেরূপ ব্যবহার করিতেন, অস্ত্রচালনায় বাম হস্তও ঠিক্ সেইরূপ চলিত। তিনি মুসলমান ধর্ম্ম প্রথম প্রবর্ত্তিত হওয়া সময়ে যদিও তাহার এত বিপক্ষ ছিলেন যে, মহম্মদের জীবন হনন একদা তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল; তথাপি তিনি ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে একজন প্রধান অধিনায়ক হইয়া উঠেন। মহম্মদের জীবনে যাহাকিছু প্রধান ঘটনা ঘ-

টিয়াছিল ওমার সে সমস্তে অগ্রগণ্য ছিলেন। বেদার, ওহদ, খাইবার, হোনীন, তাবক নগরীতে অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চালনে, মদীনা রক্ষায় এবং মক্কা অবরোধে তিনি অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ মুসলমান শক্তি অভ্যুত্থান সময়ে তিনিই মূলাধার ছিলেন। তাঁহার কার্য্যে সাহস এবং সত্বরতা এত অধিক ছিল যে, সমস্ত অন্তরায় অনল সমক্ষে তৃণের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যাইত। যে প্রশ্নের জটিল গ্রন্থি তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রে শ্লথ করিতে পারিত না, তিনি তরবারির সাহায্যে তাহা ছিন্ন করিতেন। তিনি প্রকৃত বীরের ন্যায় মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইতেন।

শাসন সংক্রান্ত কার্য্যে তাঁহার ন্যায়-পরতা প্রসিদ্ধ ছিল। স্বয়ং সর্ব্বদা মিতব্যয়ী ও সংযতেন্দ্রিয় থাকিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। জল ব্যতীত অন্য কিছু তাঁহার পেয় ছিল না; খাদ্য সামান্য রুটি ও লবণ-ছিল; কিন্তু সময় সময় ধর্ম্মার্থে লবণও পরিত্যাগ করিতেন। তাঁহার আত্ম জীবনের প্রতি তাদৃশ কঠিন শাসন, নিতান্ত দীন ভাবে অবস্থান, সারল্য, সত্যনিষ্ঠা, এবং বীরত্ব দর্শনে মুসলমানেরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। তিনি বলিতেন "চারিটি বিষয় একবার চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আইসে না;-উচ্চারিত শব্দ, নিক্ষিপ্ত শায়ক, অতীত জীবন, এবং নষ্ট সুযোগ।" এই সমস্ত উপদেশ তাঁহার প্রত্যেক কথায় ও কার্য্যে প্রকাশ পাইত।

ওমারের শাসন সময়ে বহুসংখ্যক মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিচারে যাহাদের দোষ সাব্যস্ত হইত, তাহাদিগকে কারারুদ্ধ রাখিতে তিনিই কারাগৃহ নির্ম্মাণ করান। সামান্য অপরাধের জন্য, অন্যের অপবাদ, কি অকারণ ব্যঙ্গোক্তি প্রভৃতির জন্য তিনি বেত্রাঘাত করিতেন। "ওমারের কথা অপেক্ষা বেত্র ভয়ানক" একথা প্রসিদ্ধ ছিল।

কার্য্যভার গ্রহণ করিলে, সকলে ওমারকে "ঈশ্বর প্রেরিতের উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকারী" বলিয়া স্বীকার করিল। ওমার বলিলেন "এরূপ উপাধি পরবর্ত্তি-গণ-ক্রমে দীর্ঘ হইয়া চলিবে; অবশেষে এত দীর্ঘ হইবে যে, তাহার অন্ত থাকিবে না।" অবশেষে সকলের সম্মতি ক্রমে তিনি "সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নায়ক" এই উপাধি গ্রহণ করিলেন।

নূতন খলিফা প্রথমতঃ সীরিয়ায় প্রেরিত সৈনাগণের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। তিনি যুদ্ধে কৃত-কার্য্যতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন না, খালেদ সর্ব্ব প্রধান সেনাপতির যোগ্য কি না তদ্বিষয়ে গভীর সন্দেহ ছিল। তিনি খালেদকে তাঁহার সমর কৌশল এবং শৌর্য্যের জন্য প্রশংসা করিতেন সত্য; কিন্তু খালেদের দুঃসাহস, অমিতব্যয় এবং রণোন্মত্ততা অনুমোদন করিতেন না। সুতরাং তাঁহাকে প্রধান সেনাপতির উপযুক্ত জ্ঞান না করিয়া বরং একজন সেনাপতির সহযোগী স্বরূপ বিবেচনা করিতেন। তিনি স্থির করিলেন যে, এরূপ অবিমৃষ্য সেনাপতির হস্ত হইতে কার্য্যভার গ্রহণপূর্ব্বক জ্ঞানী, সদয়, ধার্ম্মিক, নম্র প্রকৃতি আবুওবীদার হস্তে সমর্পণ করিবেন। খলিফা তদনুসারে আ-

বুওবীদার নিকট এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন ;—

"আবুবেকার পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাঁহার স্থলে অভিষিক্ত হইয়াছি। আমি আপনাকে সীরিয়ার প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করিলাম। ঈশ্বর এবং মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আরব্ধ কার্য্য সমাপন করুন।"

খালেদ যখন ডামাস্কস্ হইতে পলায়িত গণের অনুসরণে গমন করেন, আবুওবীদা তথনই খলিফার নিয়োগ পত্র প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি অতি নিরীহ ছিল, তাদৃশ পদমর্য্যাদা বা গৌরব ভাল বাসিতেন না। বিশেষতঃ যে খালেদ রণক্ষেত্রে অদ্বিতীয়, যিনি কখনও অকৃতকার্য্য হন নাই, তাঁকাকে বঞ্চি● করিয়া তাঁহার গৌরব খর্ব্ব করিতে আবুওবীদার কোন ক্রমেই প্রবৃত্তি হইল না। তিনি মনে করিলেন, হয়ত ডামাস্কস্ অধিকার করার সংবাদ প্রাপ্ত হইলে খলিফা খালেদকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিবেন, সুতরাং খালেদ প্রত্যাগত হইলে এ সংবাদ গোপন করিলেন।

ওমার সিংহাসনে আরোহণ করিবার অল্পকাল পরেই ডামাস্কস্ হস্তগত হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। মদীনা বাসিগণ উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিল, বিজয়ী সেনাপতি খালেদের প্রশংসাধ্বনিতে গগণ স্পর্শ করিল। এই আহ্লাদের সময় সকলে শুনিতে পাইল খালেদ পদচ্যুত হইয়াছেন। সকলে আশ্চর্য্য এবং দুঃখিত হইয়া সমস্বরে বলিল 'কি? খালেদ এই বিজয় লাভের সময় পদচ্যুত হইবেন? এইরূপ এক সময়ে আবুবেকার যাহা বলিয়াছিলেন স্মরণ করিয়া দেখুন ;—"মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য ঐশ তরবারি নিষ্কোষিত, আমি তাহা কোষ বদ্ধ করিব না।' এই বলিয়া সকলে তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল।

ওমার তাহাদের প্রতিবাদ শ্রবণ এবং মনে মনে আন্দোলন করিলেন। কিন্তু তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি বলিলেন, "আবু ওবীদা সদয় ও সদাশয় অথচ সাহসী। তিনি অনর্থক লুণ্ঠন অথবা দুঃসাহসিকতায় তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণের জীবন নষ্ট করিবেন না, তাহাদের রক্ষায় সর্ব্বদা অবহিত থাকিবেন। জয়লাভের পর সদয় ব্যবহার করেন বলিয়া রণস্থলে অল্প বীরত্ব প্রদর্শন করিবেন না।"

ইতি মধ্যে খালেদের 'আবু বেকার' নামাঙ্কিত দ্বিতীয় পত্র আসিল। তাহাতে নগর হইতে নির্ব্বাসিতগণের অনুসরণে কৃতকার্য্যতার সংবাদ এবং আবু ওবীদার সহিত তাঁহার বিবাদ মীমাংসার প্রার্থনা ছিল। খলিফা এই পত্রে নিতান্ত অসুখ বোধ করিলেন। কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন সৈন্যগণ তাঁহার অভিষেক এপর্য্যন্ত জ্ঞাত হয় নাই, আবু ওবীদাও সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং পূর্ব্ব নিয়োগ বলবৎ রাখিয়া আবু ওবীদাকে পুনরায় পত্র লিখিলেন। তিনি বিবাদ এইরূপে মীমাংসা করিলেন। তাঁহার মতে সন্ধির নিয়ম অনুসারে ডামাস্কস্ হস্তগত হইয়াছে তরবারির সাহায্যে হয় নাই। সুতরাং আদেশ করিলেন যে, সন্ধির নিয়ম প্রতিপালিত হয়। পলায়িতগণের অনু-

সরণ নিতান্ত ন্যায়-বিরুদ্ধ এবং দুঃসাহসিকের কার্য্য হইয়াছে, ঈশ্বর অনুগ্রহ না করিলে তাহার পরিণাম শোচনীয় হইত। সম্রাট্ তনয়াকে নিষ্কপর্দ্দকে ছাড়িয়া দেওয়া তাঁহার মতে অদূরদর্শীর কার্য্য হইয়াছে। যে অর্থ গৃহীত হইত তদ্দ্বারা শত শত দরিদ্র ব্যক্তি প্রতিপালিত হইতে পারিত। তিনি আবু ওবীদাকে তাদৃশ নিরীহ এবং অবনত ভাবে চলিতে নিষেধ করিলেন, এবং কেবল লুণ্ঠন-লোভে সত্যধর্ম্মাশ্রিত মুসলমান জীবন বিপন্ন না করিতে উপদেশ দিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই শেষাংশ খালেদের প্রতি প্রকারান্তরে ভৎর্সনা মাত্র।

আবু ওবীদা ভদ্রতার অনুরোধে এ পত্রও গোপন করিবেন, এই আশঙ্কায় ওমার, সাদৎ ইবিন্ আস্ নামক এক ব্যক্তিকে সীরিয়ায় আপনার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া আদেশ করিলেন যে,মুসলমানগণ সমক্ষে তিনি ঐ পত্রখানি পাঠ এবং ওমার খলিফার পদে অভিষিক্ত হওয়ার বিবরণ ঘোষণা করেন।

সাদৎ ডামাস্কসে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন খালেদ তখনও প্রধান সেনাপতি এবং সকলেই আবু বেক্কারের মৃত্যু বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তাঁহার প্রমুখাৎ সকল বিবরণ জ্ঞাত হইয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহারা প্রথমতঃ আবু বেকারের পরলোক গমন সংবাদে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। তদনন্তর বিজয়ের উজ্জ্বলতম মুহূর্ত্তে খালেদ পদচ্যুত হইলেন দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য এবং দুঃখিত হইল; অধিকাংশ সৈন্য ও সৈনিক গণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রোধ প্রকাশ করিল।

খালেদের প্রতি ঈদৃশ অবিচার বাস্তবিকই শোচনীয়। সত্য যে, খালেদ জয় লাভ করিবার পূর্ব্বে ভীষণত্ব প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু জয় লাভ করিয়া অনেক সময় মহত্বও প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বীর এইরূপে অবমানিত হইয়া আর অস্ত্রধারণ করিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু তিনি প্রকৃত বীরের ন্যায় উদার ভাবে কার্য্য করিলেন। তিনি বলিলেন “আমি জানি, ওমার আমাকে ভালবাসেন না। কিন্তু আবু বেকার জীবিত নাই, ওমার তাঁহার স্থলবর্ত্তী খলিফা সুতরাং তাঁহার আদেশ অবশ্য পালনীয়।” খালেদ ওমারকে ডামাস্কসের খলিফা ঘোষণা করিয়া সেনাপতিত্ব আবু ওবীদার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। আবু ওবীদা ভদ্রতা ও নম্রতার সহিত সেনাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা হইল মর্ম্মপীড়িত খালেদ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবেন, মুসলমানের বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার সহিত অন্তর্হিতা হইবে। কিন্তু তিনি গ্রীক বীররত্ন আল্‌সি বাইডেস্ বা কুরুসেনাপতি কর্ণের ন্যায় নীচত্ব প্রকাশ করিলেন না। খালেদের আচরণে সেনাপতি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন, খালেদের যুদ্ধে অণুমাত্রও অমনোযোগ নাই, তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে খালেদ সর্ব্বদা নিরত; মুসলমান ধর্ম্মবিস্তারে তাঁহার উৎসাহ যে অণুমাত্রও হ্রাস হয় নাই, তাহা প্রদর্শন করিতে সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছেন! তাঁহার এইরূপ নম্রতা দেখিয়া তাঁহার শত্রুগণও তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল, আবু ওবীদা ও

তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস, সম্মান ও সমাদর করিতে ত্রুটি করিলেন না।

এই সময়ে করদ খৃষ্টীয়ানদিগের মধ্যে একব্যক্তি প্রধান সেনাপতি আবু ওবীদার প্রিয়পাত্র হইবার লালসায় প্রস্তাব করিল যে, "এই স্থানের অনতি দূরে ট্রিপলি এবং হারাণের মধ্যবর্ত্তী দেইজ আবিল্ কোদনের মন্দিরে একজন খৃষ্টীয়ান তপস্বী বাস করেন। তিনি ধর্ম্মশীলতা, এবং আপনার অসাধারণ ক্ষমতা গুণে এত প্রসিদ্ধ যে ছোট, বড়, বালক বৃদ্ধ সকলেই তাঁহার প্রসাদ লাভ বাসনায় প্রতিদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ না করিয়া ভদ্রসমাজে কোন বিবাহই হয় না। 'এস্তারের' পর্ব্বদিন উপলক্ষে প্রতিবৎসর একটি মেলা হয়, তাহাতে স্বর্ণ রৌপ্যাদির কারুকার্য্য খচিত বস্ত্র নিচয় এবং নানাবিধ মূল্যবান বস্তু উপস্থিত হইয়া থাকে। সে স্থানে গমন করিলে অবাধে বিস্তর লাভ হইতে পারে।"

আবুওবীদা এই সংবাদ সৈন্যগণ মধ্যে প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে যাইতে ইচ্ছুক। খালেদ এইরূপ আক্রমণ ভাল বাসিতেন, সুতরাং আবুওবীদার চক্ষু আপনা হইতেই তাঁহার প্রতি একবার ন্যস্ত হইল। কিন্তু যিনি এতকাল প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তাঁহাকে আদেশ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তখন আবদুল্লা ইবিনজফর নামক আবুবেকারের এক পুত্র অগ্রসর হইল। অনেক যুদ্ধে সুপরিচিত পাঁচশত অশ্বারোহী এবং একটি পতাকা লইয়া দ্রুতগতিতে যাইতে লাগিল। বিশ্বাসঘাতক খৃষ্টীয়ান অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল। তাহারা এক স্থানে বিশ্রাম করিতে বসিল এবং সেই পথপ্রদর্শককে অবস্থাপরিজ্ঞান জন্য পূর্ব্বে পাঠাইয়া দিল। সে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিল "শীঘ্র পলায়ন কর। ট্রিপলির শাসনকর্ত্তার কন্যার সহিত পাঁচসহস্র অশ্বারোহী, গ্রীক, আমেরিক, কপ্ট, ইহুদি, শত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই স্থানে উপস্থিত;—নববিবাহিত দম্পতী আশীর্ব্বাদ গ্রহণার্থ আগত!"

আবদুল্লা বলিলেন," আমি ফিরিয়া যাইতে পারিব না। আমি পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে ঈশ্বর আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন। নাস্তিকগণের সহিত সংগ্রাম করিব। যাহারা আমার সহায় হইবে ঈশ্বর তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন, যাহারা ভীত হইবে তাহারা পলায়ন করিতে আমার আপত্তি নাই।" একটি মুসলমানও ফিরিল না। আবদুল্লা খৃষ্টীয়ানকে বলিলেন "অগ্রসর হও, মহম্মদের শিষ্যগণ আজ কি সাধন করে একবার দেখিয়া লও।" অনেক বলিতে বলিতে সে সেই ভীষণ ব্যাপারে পথ দেখাইয়া চলিল।

আবদুল্লা আবীলার নিকটস্থ হইয়া রজনী অতিবাহিত করিল। প্রভাতে উপাসনা সমাপনান্তে সৈন্যগণকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া আদেশ দিল যে, ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে এক সময়ে 'আল্লাহো আকবর' বলিয়া সকলে আক্রমণ করিবে, এবং বিজয় লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইবে না। অনন্তর স্থানের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিল। একটি স্থানে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী দেখা গেল। সেখানে নববিবাহিতা রাজপুত্রী ছিলেন, একথা বুঝিতে পাইল।

আবদুল্লা বিপক্ষ সংখ্যা দেখিয়া সৈন্যগণ ভীত না হয় এই মর্ম্মে বক্তৃতা করিল। এবং বলিল "মহম্মদের বাক্য স্মরণ রাখিও, —'স্বর্গ তরবারির ছায়ায় বিদ্যমান।' জয়লাভে ধনলাভ, মরণে স্বর্গলাভ।"

হঠাৎ আক্রান্ত হওয়াতে খৃষ্টীয়ানগণ নিতান্ত ভীত ও উচ্ছৃঙ্খল হইল। অনেকে পলায়ন করিতে লাগিল। বালক ও স্ত্রীলোকের রোদনধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিল। বস্ত্রগৃহাদি বিচ্ছিন্ন হইল, এবং বিক্রেয় দ্রব্যজাত পথিমধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু বিপক্ষসংখ্যা নিতান্ত অল্প দেখিয়া তাহারা সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক বিপক্ষগণকে একবারে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। সমস্ত দিন ভীষণ যুদ্ধ হইল। অল্পসংখ্যক মুসলমান অসংখ্য বিপক্ষ হত্যা করিল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল দেখিয়া, একজন দ্রুত অশ্ব চালনা করিয়া ডামাস্কস উপস্থিত হইল এবং সমস্ত দুর্ঘটনার সংবাদ দিল।

এইরূপ বিষম বিপদ উপস্থিত দেখিয়া আবুওবীদা আর ইতস্ততঃ করিলেন না, একদা খালেদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আপনি এই বিপদের সময় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না, মুসলমানগণকে বিনাশ হইতে রক্ষা করুন"। খালেদ বলিলেন, "ওমার যদি একজন বালকের হস্তেও সেনাপতিত্ব প্রদান করিতেন, আমি তাহার আদেশ প্রতিপালন করিতাম। আপনি আমার পূর্ব্ব হইতে এই সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষিত, আপনার আদেশ প্রতিপালনে আমার আপত্তি কি হইতে পারে।"

অনন্তর বর্ম্ম চর্ম্মে সুরক্ষিত হইয়া আবীলাভিমুখে যাত্রা করিলেন; দিরার তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

এদিকে আবদুল্লার সৈন্য সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইলেও যুদ্ধ বিরত হয় নাই। প্রদোষ সময়ে খালেদের সৈন্যগণ ধূলিরাশি উড্ডীন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে মুসলমানগণ চারিদিক হইতে আক্রমণ পূর্ব্বক জয়লাভে কৃতকার্য্য হইল। দিরার ট্রিপলির শাসন কর্ত্তার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তাঁহাকে নিহত করিয়া তাঁহার অশ্ব ও অশ্বসজ্জা অধিকার করিলেন।

সমর শেষ হইলে দেখা গেল বহুজনসমাকীর্ণ আবীলা নির্জ্জন হইয়াছে, একমাত্র তাপস বিদ্যমান। খালেদ তাঁহাকে হত্যা করিলেন না। অগণ্য লুণ্ঠন দ্রব্য এবং শাসনকর্ত্তার দুহিতাকে তাঁহার চল্লিশ জন দাসীর সহিত বন্দীভাবে ডামাস্কসাভিমুখে লইয়া চলিলেন। একপঞ্চমাংশ সাধারণ ধনাগারের জন্য রাখিয়া সমস্ত লুণ্ঠন দ্রব্য সৈন্যগণ মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। দিরার তাঁহার বিপক্ষ ট্রিপলির শাসনকর্ত্তার অশ্ব ও অশ্বসজ্জা প্রাপ্ত হইয়া তাহা আপন রণরঙ্গিণী সহোদরা কৌলাকে উপহার দিলেন। কৌলা অশ্বসজ্জার মণিমাণিক্যাদি সঙ্গিনীগণ মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং সেই অশ্ব ও অশ্বসজ্জা রাখিলেন।

আবদুল্লা বন্দিনী রাজ-নন্দিনীর পাণিগ্রহণের প্রার্থনা করিলে সেনাপতি খলিফার অনুমতি ক্রমে তাহাতে সম্মতি দিলেন। তদবধি সেই রূপবতী ললনা তাঁহার ভার্য্যা হইলেন।

আবুওবীদা খলিফার নিকট যে পত্র লিখিলেন, তাহাতে খালেদের মহত্ব ও বীরত্বের বিষয় বিস্তর প্রশংসা করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, প্রত্যুত্তর পত্রে তদ্বিষয় উল্লেখ করা হয়। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে, খলিফা খালেদের সম্বন্ধে অনুকূল কোন কথা লিখিলে তাঁহার মনোবেদনা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইবে। কিন্তু খলিফা অন্য সমস্ত কথার সবিস্তার উত্তর লিখিয়াও পত্রের সেই অংশের সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করিলেন না। তখন স্পষ্টই বুঝা গেল আততায়ী ভাবে মুসলমান তরবারি প্রয়োগ তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। খালেদকে উৎসাহ প্রদান করা তিনি স্বপ্নেও আবশ্যক বোধ করেন নাই।

ডামাস্কসে দীর্ঘকাল অবস্থান করাতে মুসলমানগণমধ্যে অনেকে বিলাস-সুখের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। এতদিন তাহারা বিলাস কাহাকে বলে জানিত না,—খাদ্য তণ্ডুল, পানীয় জল মাত্র, এবং পরিচ্ছদ অতিযৎসামান্য ছিল। সুতরাং প্রয়োজনীয় বস্তু একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন সময়ে সঙ্গে বহন করিয়া লওয়ার তাদৃশ প্রয়োজন ছিল না, অনায়াসে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রস্তুত হইয়া তাহারা বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণ করিতে পারিত। এক্ষণে সমৃদ্ধ ডামাস্কস নগরের দৃষ্টান্তে অনেকে ধর্ম্মনিষিদ্ধ মদ্যপান পর্য্যন্ত অভ্যাস করিল। আবুওবীদা এই বিষয় খলিফাকে জ্ঞাপন করিলে, তিনি আলীর পরামর্শানুসারে প্রধান সেনাপতিকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে,যাহারা এই ধর্ম্মবিগর্হিত পাপে লিপ্ত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের পদতলে বিশ বেত্রাঘাত করিতে হইবে।

আবুওবীদা সৈন্যগণকে পাপের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়া মিষ্ট ভর্ৎসনার সহিত পাপ স্বীকার করিতে বলাতে, যাহারা গোপনে পাপ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহারাও স্বীকার এবং ধৈর্য্যের সহিত বেত্রাঘাত সহ্য করিল। যে পাপের দুর্নিবার স্রোত প্রবাহিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, তাহা রুদ্ধ হইল। প্রধান সেনাপতি সকলকে ক্ষমা করিলেন।

আবু ওবীদা ডামাস্কসে পাঁচশত অশ্বারোহী রাখিয়া সমস্ত সীরিয়া রাজ্য অধিকার করণার্থ সমগ্র সৈন্যসহ বাহির হইলেন। সম্মুখে বীরত্বাভিনয়ের উৎকৃষ্ট রঙ্গভূমি। নাতিশীতোষ্ণ বায়ু, স্বাস্থ্যবিধায়ক নির্ম্মল জল,, উর্ব্বরা ভূমি, এ সমস্তে সীরিয়া রাজ্য নিতান্ত সুখকর ছিল। লোকসংখ্যা অধিক, বসতি ঘন, এবং নগরী সমস্ত দৃঢ়নির্ম্মিত ও সুরক্ষিত ছিল। ঐ সমস্ত নগরীর মধ্যে ইমিশা (বর্ত্তমান হেমস্) তত্রত্য রাজধানী এবং সূর্য্যদেবের মন্দির বাল্‌বেক্ নগরী প্রসিদ্ধ ছিল।

ঐ দুই নগরী এবং মধ্যবর্ত্তি অন্যান্য স্থান আবুওবীদার আক্রমণের বিষয় ছিল। তিনি তদনুসারে দিরার এবং রফীইবিন্ ওমীরাকে এবং এক তৃতীয়াংশ সৈন্য সঙ্গে দিয়া খালেদকে ইমিশার সমীপবর্ত্তী প্রদেশনিচয় আক্রমণ করিতে উপদেশ দিলেন। স্বয়ং ধীরে ধীরে জুশেয়া নগরীর সমীপস্থ হইয়া চারিশত সুবর্ণ এবং পঞ্চাশটি রেশমের পরিচ্ছদ গ্রহণ পূর্ব্বক এক বৎসরের জন্য

সন্ধি করিলেন। নিয়ম রহিল যে, ইতি মধ্যে বাল্‌বেক্‌ ও ইমিশা অধিকৃত হইলে জুশেয়াবাসিগণ মুসলমান-হস্তে নগর সমর্পণ করিবে।

আবুওবীদা ইমিশার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, খালেদ সাবহিতচিত্তে নগর অবরোধ করিয়া বসিয়াছেন। নগরের শাসনকর্ত্তা মুসলমানগণের আগমনদিবসে মৃত এবং নগর উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে। অধিক দিন অবরুদ্ধ থাকিতে পারে, নাগরিকগণের এরূপ সম্বলও নাই। নগরবাসিগণ এই নিয়মে এক বৎসরের জন্য সন্ধিপ্রার্থনা করিল যে, তাহারা মুসলমানদিগকে দশ সহস্র স্বুবর্ণ এবং দুইশত পরিচ্ছদ প্রদান করিবে, এবং এই সময় মধ্যে আলেপো, আলহাদীর, কেনেস্‌রীণ নগর অধিকৃত এবং সম্রাটের সৈন্য পরাজিত হইলে, তদনন্তর নগর সমর্পণে তাহারা আপত্তি করিতে পারিবে না। খালেদ অবরোধ পরিত্যাগ করেন এরূপ তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু সৈন্যগণের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ কর্ত্তব্য বিবেচনায়, প্রধান সেনাপতি তাহা করিতে আদেশ দিলেন।

সন্ধি সমাপন হইবা মাত্র নগরতোরণ উন্মুক্ত হইল। অধিবাসিগণ নগরপ্রাচীরপার্শ্বে এক বৃহৎ মেলা বসাইয়া বিস্তর লাভ করিতে লাগিল। মুসলমানগণ পরস্বাপহরণ করিয়াছিল, যে কোন বস্তু মনোজ্ঞ বোধ করিত তাহা ক্রয় করিতে মূল্য যত কেন উচ্চ বা অনুচিত না হউক ইতস্ততঃ করিত না। মুসলমানগণ নগরের বহিঃপ্রাচীরপার্শ্ববর্ত্তি স্থান সমস্ত লুণ্ঠন পূর্ব্বক অশ্ব উষ্ট্রাদি পূর্ণ করিয়া আনিতে লাগিল। তাহাতে লুণ্ঠিতগণের আর্ত্তনাদে ব্যথিত হইয়া আবুওবীদা নিয়ম করিলেন, যাহারা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিবে, তিনি তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিবেন। যে বিধর্ম্মিগণ তাহাতে অসম্মত হইবে, তাহাদের প্রত্যেকে বাৎসরিক কর এবং তদতিরিক্ত প্রতিজনে পাঁচটি স্বুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিবে। অনন্তর তাহাদের সমগ্র সম্পত্তি প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তাহাদের নাম ধাম এক পুস্তকে লিখিয়া রাখিলেন, এবং প্রয়োজন মত তাহারা মুসলমানদিগের পন্থাপ্রদর্শক এবং তত্রত্য লোকের ভাষা বুঝাইয়া বলিতে মধ্যবর্ত্তী হইবে এরূপ বলিয়াদিলেন।

আবুওবীদার সদয় ব্যবহারে তেমন উজ্জ্বল জয়লাভ না হইলেও বিলক্ষণ উপকার হইল। বহুসংখ্যক সৈরিয় গ্রীক করদ হইয়া আপন আপন নাম লিখাইয়া দিল, অনেক নগরী ইমিশার নিয়মে সন্ধি করিল। খালেদ বার বার অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, সন্ধি করিতে যে সময় লাগে তাহা অপেক্ষা অল্প সময়ে নগর সমস্ত অধিকার হইতে পারে। কিন্তু প্রধান সেনাপতি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অল্প সময়ে ইমিশা, আলহাদীর, কেনেস্‌রীন্‌ প্রদেশ লুণ্ঠনহস্ত হইতে অব্যাহতি পাইল। মরুবাসী সৈন্যগণ বিরক্ত হইয়া উঠিল, তাহাদের পক্ষে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকা বড় কষ্টকর। একদা এরূপ একটি ঘটনা ঘটাইল যে, সমস্ত সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল।

মুসলমান সৈন্যগণ কেনেস্‌রীণের সমীপে ভ্রমণ করিতেছিল। নগরের সীমা নির্দ্ধারণ

জন্য খৃষ্টীয়ানগণ সম্রাট্ হিরাক্লিয়সের প্রতিমূর্ত্তি নগরের প্রান্তভাগে স্থাপন করিয়াছিল। মুসলমানগণ চিরকাল মূর্ত্তিবিদ্বেষী। তাহাদের মধ্যে একজন বল্লমদ্বারা হঠাৎ ঐ মুর্ত্তির একটি চক্ষু নষ্ট করিল। গ্রীকগণ ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারা প্রধান সেনাপতির নিকট দূত প্রেরণ করিলে, সেনাপতি গ্রীকগণের ক্রোধ প্রশমিত করিতে যতদূর সম্ভব নম্রতা প্রদর্শন করিলেন। তাহাতে বিপরীত হইল। তাহাদের সম্রাট্ অবমানিত হইয়াছেন, খলিফার কর্ত্তব্য যে আইনানুসারে প্রতিবিধান করেন,—চক্ষুর জন্য চক্ষু, দন্তের জন্য দন্ত, প্রদান করেন! গোঁড়া মুসলমানগণ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল, 'কি নাস্তিকেরা খলিফার একটি চক্ষু চায় না কি?' তাহারা, তৎক্ষণাৎ আবুওবীদা নিষেধ না করিলে, দূতগণকে হত্যা করিত। কিন্তু আবুওবীদা বলিলেন তাহাদের কথা তোমরা বুঝিতে পার নাই। অনন্তর আবুওবীদাই দূতগণকে একপার্শ্বে লইয়া গিয়া বলিলেন, 'তোমরা খলিফার একটি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কাচদ্বারা তাহার চক্ষু প্রস্তুত করিয়া দিয়া প্রতিশোধ স্বরূপ তাহার একটি চক্ষু নষ্ট করিয়া ফেলিও।' বলা বাহুল্য যে অনলপ্রকৃতি খালেদ ও দিরার প্রভৃতি এ অপমান সহ্য করিতে পারিতেন না।

খলিফা এতদিন পর্য্যন্ত বিজয়লাভের কোন সংবাদ না পাইয়া বিরক্ত ও আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি প্রধান সেনাপতির সত্বরতার অভাব এবং শৈথিল্য লক্ষ্য করিয়া ভৎর্সনাপূর্ণ এক পত্র লিখিলেন; তিনি যে অর্থলোভে ধর্ম্মের জন্য নিষ্কোষিত তরবারি কোষবদ্ধ করিয়াছেন,তজ্জন্য তাঁহাকে নিন্দা করিলেন। সৈন্যগণের হৃদয়ে সে ভৎর্সনা বিদ্ধ হইল। তাহারা ক্রোধে ও বৈরক্তিতে কাঁদিতে লাগিল। আবুওবীদার চৈতন্য হইল। একটি সমরসভা আহ্বানপূর্ব্বক স্থির করিলেন যে, খালেদ সৈন্যসহ ইমিশার সন্নিধানে অবস্থান করিবেন; সন্ধির সময়ের একমাস অবশিষ্ট আছে, ঐ সময় অতীত হইলে তিনি নগরীতে প্রবেশ জন্য চেষ্টা করিবেন। আর স্বয়ং অধিকাংশ সৈন্য লইয়া বাল্‌বেক্ নগরাভিমুখে অগ্রসর হইবেন। (ক্রমশঃ।)

প্রতাপসিংহ।

(পঞ্চম খণ্ডের ৩৫০ পৃষ্ঠার পর।)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দেবী-বাক্য।

সায়ংকালে দেবলবর-রাজতনয়া যমুনা দুইটি পাখী লইয়া খেলা করিতেছেন। কখন বা তাহাদের বদন চুম্বন করিতেছেন, কখন বা তাহাদিগকে মস্তকে স্থাপন করিতেছেন, কখন বা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেছেন, তাহারা উড়িয়া আসিয়া তাঁহারই স্কন্ধে বসিতেছে। রাজকুমারী যখন পক্ষিদ্বয় লইয়া ক্রীড়ায় মগ্না, সেই সময়ে হাসিতে হাসিতে কুসুম তথায় আসিয়া বলিল,—

'নির্ব্বোধ বনের পাখি! কিছুই বুঝিস্ না? রাজকুমারীর আদর আর কত দিন?'

যমুনা জিজ্ঞাসিলেন,—

'কেন কুসুম, আমি কি এতই চঞ্চল-চিত্ত? যাহাদের একদিন ভাল বাসিয়াছি, তাহাদিগকে চিরদিনই ভাল বাসিব।'

কুসুম বলিল,—

'কথা সত্য বটে কিন্তু হৃদয় তো একটা। হৃদয় যদি এক স্থানে বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে তাহা স্থানান্তরে যায় কি?'

যমুনা হাসিয়া বলিলেন,—

'হৃদয় বদ্ধ হইয়াছে কি না, সে বিচারে এখন কি প্রয়োজন?'

কুসুম বলিল,—

'তোমার প্রয়োজন না থাকিতে পারে; কিন্তু কুমার রতনসিংহ আমাকে কুমারী যমুনার কাহার প্রতি কিরূপ অনুরাগ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ভার দিয়াছেন। সুতরাং আমার প্রয়োজন আছে।'

'তুমি পরীক্ষা করিয়া কি বুঝিলে?'

'বুঝিলাম কুমারীর অনুরাগ কুমার ব্যতীত আর সকলের প্রতিই যথেষ্ট।'

কুমারী মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

'এত যদি বুঝিয়াছ, তবে এই বেলা কুমারকে সাবধান করিয়া দেও।'

কুসুম বলিল,—

'কুমারের ভাবনা পরে ভাবিলেও চলিবে; এক্ষণে আর এক ব্যক্তিকে সাবধান করা আমার বড়ই আবশ্যক হইয়াছে।'

'কেন, আবার কে তোমায় ভার দিয়াছে?'

কুসুম গম্ভীর ভাবে বলিল,—

'তুমি।'

কুমারী বলিলেন,—

'আমার ভার তো চিরদিনই বহিতে হইবে।'

কুসুম বলিল,—

'হাসিও না, আমি হাসির কথা বলিতেছি না। এখানে বৈস,—যাহা বলি মনোযোগ দিয়া শুন।'

কুমারী সন্দেহাকুল-চিত্তে তথায় উপবেশন করিলেন। তখন কুসুম জিজ্ঞাসিল,—

'আমায় সত্য করিয়া বল কুমারের প্রতি তোমার অনুরাগ কত প্রবল?'

কুমারী অনেকক্ষণ বিনতবদনে চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—

'অনুরাগ কতদূর বাড়িলে তাহাকে প্রবল বলা যায়, তাহা আমি জানি না। আমি এই জানি যে, এ জগতে এমন কোন পদার্থই আমি ভাবিয়া পাই না, যাহার সহিত কুমার রতনসিংহের বিনিময় করিতে পারি। তোমাকে মনের কথা বলিতেছি, আমি ভবানীর পূজা করিতে বসিয়া মন্ত্র মনে করিতে পারি না, কেবল কুমারের নাম মনে পড়ে; দেবীর ধ্যান করিতে বসিয়া তাঁহার মূর্ত্তি হৃদয়ে আইসে না, যত চেষ্টা করি কেবল কুমারের সেই মোহনকান্তিই মনে পড়ে। জগদম্বে! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর; আমার হৃদয়ে আর আমার প্রভুতা নাই।'

কথা সাঙ্গ হইলে কুসুম দেখিল কুমারীর নেত্র অশ্রুসমাকুল হইয়াছে; বুঝিল প্রেম নিতান্ত চপল নহে; বলিল,—

'কিন্তু যমুনে! হৃদয় তো মত্ত করী।

দমন না করিলে হৃদয়ের বেগ তো কতই বাড়িতে পারে—তাহাতে হয়ত অনিষ্টও হইতে পারে। কত লোক কত পারে, তুমি চেষ্টা করিয়া হৃদয়ের বেগ একটু কমাইতে পার না কি?'

কুমারী বলিলেন,—

'তোমায় কি বলিয়া বুঝাইব? তুমি তো জান আমার হৃদয় আমার কেমন আয়ত্ত। জ্ঞানতঃ যুক্তি ও চিন্তার পথ ছাড়াইয়া আমার হৃদয় কখনই যায় না। কিন্তু এবার আমার হৃদয় আর তেমন নাই। আর আমি ইহাকে বশে রাখিতে পারি না। অনেক সময় কুমার ব্যতীত সংসারে যে আরও বহু সামগ্রী আছে, কুমার ভিন্ন চিন্তার আরও বহু বিষয় আছে এ সকল কিছুই আমার মনে থাকে না। ইহাতে আমার দোষ কি? কিন্তু কুসুম কুমারের প্রতি আমার এই যে প্রেম, ইহার আতিশয্যে আমার কি অনিষ্ট হইতে পারে?'

কুসুম বলিল,—

'প্রেম একটু বুঝিয়া, একটু বিবেচনা করিয়া হইলেই ভাল হয়। আগে পাত্রাপাত্র না বুঝিয়া প্রেম করা ভাল নয়—তাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে।'

কুমারী হাসিয়া বলিলেন,—

'তবে আমার আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। পাত্রাপাত্র বুঝিয়া প্রেম করিতে হইলে কুমারের ন্যায় প্রেমের পাত্র আর কে আছে?'

কুসুম বলিল,—

'কুমার যে এতই সুপাত্র তাহা তুমি কি রূপে জানিলে?'

যমুনা হাসিয়া বলিলেন,—

'তাহা আর জানিতে? কুমার বীর, কুমার রাজভক্ত, কুমার দেশহিতৈষী, কুমার বিদ্বান্, কুমার মিষ্টভাষী। মানুষে আর কি হয়?'

কুসুম বলিল,—

'সকলই সত্য; কিন্তু এ সকল তো তাঁহার বাহ্য ভাব। তাঁহার অন্তরের ভাব কেমন তাহা তো তুমি জান না।'

কুমারী বলিলেন,—

'তাহা আবার কি জানিব? সেরূপ দেবশরীরে দোষ স্থান পায় না। যদি তাঁহাতে কোন দোষ থাকে, তবে সে দোষ মানুষের হওয়াই আবশ্যক।'

কুসুম হাসিয়া বলিল,—

'বীর, রাজভক্ত, বিদ্বান্ ও মিষ্টভাষী ব্যক্তি চোর, মিথ্যাবাদী, পরশ্রীকাতর, ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইতেও পারে। যদিই তোমার কুমারের ঐ সকল দোষের এক বা অধিক থাকে, তবে তাহা কি মনুষ্য মাত্রেরই থাকা আবশ্যক? তুমি প্রেমে এতদূর অগ্রসর হইয়াছ, কিন্তু কুমারের এমন কোন দোষ আছে কি না অনুসন্ধান করিয়াছ?'

'আবশ্যক বোধ হয় নাই, সন্ধানও করি নাই।'

'যাহা করিয়াছ তাহাতে হাত নাই। কিন্তু এখনও যদি জানিতে পার যে, কুমার প্রতারক, কুমার অবিশ্বাসী, কুমারের তোমার অপেক্ষাও প্রিয়তমা আছে, তাহা হইলে কি করিবে?'

কুমারী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন, সহসা স্থির হইয়া বলিলেন,—

'প্রথমে সে সংবাদ বিশ্বাস করিব না, প্র-

ত্যক্ষ হইলেও সংশয় হইবে। স্থির বিশ্বাস জন্মিলে, ইষ্টদেবীকে স্বাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আজীবন নিষ্ফল প্রেমানলে পুড়িব, তথাপি কুমারের সহিত কখন কথাও কহিব না।'

কুসুম বলিল,—

'ব্যস্ত হইওনা—উতলা হইও না। আবার বৈস—বলি শুন। সত্য মিথ্যা স্বয়ং বিচার কর। তুমি জান আমি তোমারই কল্যাণ-কামনায় ত্রিকাল-নিয়ন্ত্রী 'আহের মোগরার' পূজা দিতে গিয়াছিলাম। পূজা সমাপ্তির পর দৈববাণী হইল, 'বালিকা—সাবধান। হৃদয়ে স্থান নাই।'

যমুনা কাঁপিয়া উঠিলেন। কুসুম বলিল,—

"দেবীর এই আদেশ শুনিয়া হৃদয় বড়ই ব্যাকুল হইল। তাহার পর প্রত্যাগমন কালে পথে মহারাণীর দ্বাররক্ষিণীর সহিত মিলিত হইলাম। তাহার সহিত মহারাণা-সংসারের বহুবিধ কথোপকথন হইতে হইতে ক্রমে কুমার রতনসিংহের কথা উঠিল। সে বলিল, 'রতন সিংহ স্বর্গীয় চিন্দিনারাজতনয়ার নিমিত্ত উন্মত্ত। মহারাণা কুমারকে তোমাদের কুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। কাজেই কুমারের মনের আশা মনেই রহিয়া গেল।' এই কথা শুনিয়া তখন দেবীবাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম। যমুনা এখন স্থির হইয়া বিবেচনা করিয়া কার্য্য কর।"

কুমারীর তখন বিবেচনা করিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার হৃদয় তখন উদ্বেল হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তখন তিনি নাই। তাঁহার চক্ষু তখন উন্মাদিনীর ন্যায় অস্থির ও আয়ত, তাঁহার দেহ বিকম্পিত। বহুক্ষণ সেই ভাবে থাকিয়া কুমারী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। উভয় হস্তদ্বারা দ্রুতগামি চঞ্চল বক্ষঃকে পেষণ করিয়া বলিলেন,—

'আর কি বিবেচনা? অন্যের কথা বিশ্বাস করিতাম না, কর্ণেও স্থান দিতাম না—দেবীর কথা। কুমার প্রতারক?—অসম্ভব। তবে কি দেবীর আদেশ মিথ্যা? —তদধিক অসম্ভব। দেবি! তোমারই উপদেশ অনুসরণ করিব। যে হৃদয়ে স্থান পাইব না, তাহার লোভ ত্যাগ করিতে অভ্যাস করিব।'

তাহার পর ভগ্নহৃদয়া বালিকা বহুক্ষণ উন্মাদিনীর ন্যায় সেই স্থানে বিচরণ করিলেন। তাহার পর সে স্থান ত্যাগ করিয়া নিজ শয়নপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। কুসুম অবিলম্বে তাঁহার অনুসরণ করিল। আসিয়া দেখিল, মর্ম্মপীড়িতা যমুনা উপাধানে মুখ লুকাইয়া রোদন করিতেছেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ভানু-সপ্তমী।

অদ্য মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী। আজি রাজপুতের চির-সমাদৃত সূর্য্য-পূজার দিন। এই পর্ব্বাহের নাম 'ভানু-সপ্তমী।' সমস্ত রাজপুতানা অদ্য উৎসাহে উন্মত্ত। দেবলবররাজভবনেও অদ্য অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। সমস্ত দিবস বন্ধুবান্ধবে সম্মিলিত থাকিয়া সূর্য্যদেবের গুণগান এবং ত্রিবিধ সময়ে সকলে মিলিয়া সমস্বরে তাঁহার স্তুতিপাঠ ও অর্ঘ্যদান করিতে হইবে বলিয়া আত্মীয় স্বজনগণ কেহ বা পূর্ব্বরাত্রে,

কেহ বা অতিপ্রত্যূষে দেবলবররাজভবনে সমাগত হইতেছেন। সমাগত ব্যক্তিগণকে দেবলবররাজ অতিসমাদরে অর্চ্চনামণ্ডপে লইয়া যাইতেছেন। তথায় উচ্চবেদিকোপরি উপবেশন করিয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সূর্য্য স্তোত্রপাঠ ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন, এবং অদূরে দ্বাদশ জন দ্বিজ পূতপাবককুণ্ডে সূর্য্যোদ্দেশে আহুতি দিতেছেন। নবাগত ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ ভানুদেবের উদ্দেশে, পরে সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া সভাস্থলে উপবেশন করিতেছেন। ক্রমে কুমার রতনসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন পৌর্ব্বাহ্লিক অর্ঘ্যদান উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দেবলবররাজ রতনসিংহকে সভামণ্ডপে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। বীর রাজপুতের পক্ষে সূর্য্যপূজাই সর্ব্বাগ্রে করণীয়। অদ্য প্রণয়বৃত্তি রতনসিংহকে এই চিরকৃত কর্ত্তব্যে শিথিল করিল। তিনি ভাবিলেন অগ্রে যমুনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরে সূর্য্যার্চ্চনায় নিবিষ্ট হইব। এই ভাবিয়া রতন সিংহ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে রতনসিংহ পরিভ্রমণ করিলেন, কিন্তু যমুনার সে স্থির উৎফুল্ল নয়নযুগল তাঁহার নয়নে পড়িল না। অবশেষে রতন সিংহ হতাশ হইয়া বাহিরে আসিতেছেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন, যমুনা সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠের একতম বাতায়নে বসিয়া আছেন। কুমার যমুনার সম্মুখভাগ দেখিতে পাইলেন না। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার উৎকণ্ঠা জন্মিল। তিনি দেখিলেন যমুনার কেশরাশি অবিন্যস্ত, পরিচ্ছদ মলিন, দেহ ভূষণহীন এবং রোগীর ন্যায় কৃশ ও কাতর। কুমার সভয়ে সম্বোধিলেন,—'যমুনে!'

যমুনা ফিরিয়া চাহিলেন—দেখিলেন রতনসিংহ। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ভূত ঘটনাবলী স্মৃতিপথে অবিকৃত ভাবে সমাগত হইল। ইচ্ছা হইল সকলই ভুলিয়া গিয়া রতনসিংহের চরণ ধরিয়া রোদন করেন। তখনই মনে পড়িল—দেবীবাক্য। ভাবিলেন এই রতনসিংহ প্রতারক? তখনি দেবীবাক্য মনে আসিয়া তাঁহাকে জানাইয়া দিল 'হাঁ প্রতারক।' এই বিরুদ্ধ চিন্তা-স্রোতে কোমলহৃদয়া যমুনা অবসন্নপ্রায় হইলেন। ক্ষণেক সংজ্ঞাহীনার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। তাহার পর ক্রমশঃ হৃদয়ের সেই পরুষ ভাব সম্পূর্ণ রূপে পুনরাগমন করিল। তখন স্থির করিলেন চাতুরী যাঁহার সিদ্ধবিদ্যা, অবলার সর্ব্বনাশসাধন যাঁহার অভিলাষ, তাঁহার সহিত কথা কহিব না, তাঁহার মধুমাখা কথায় আর ভুলিব না। যমুনাকে দেখিয়া রতনসিংহও চমকিলেন। সেই প্রফুল্লবদনা, প্রেমপ্রতিমা যমুনার এদশা কেন! হায়! উভয়ের চিন্তার গতি এক্ষণে কি বিভিন্ন! রতন সিংহ আবার প্রশ্ন করিলেন,—

'যমুনে! তোমার কি হইয়াছে?'

যমুনা অবনত মস্তকে বসিয়া রহিলেন। একবার তাঁহার জিহ্বাগ্রে একটা উত্তর আসিল, কিন্তু তখনই যমুনা সতর্কতা সহকারে তাহাকে নিরস্ত করিলেন। তখন রতনসিংহ যমুনার সমীপবর্ত্তী হইয়া উপবেশন করিলেন এবং ঘোর উৎকণ্ঠার সহিত কহিলেন,—

'যমুনে! তোমার এভাব কেন?'

যমুনা ব্যস্ততা সহ দণ্ডায়মানা হইয়া বলিলেন,—

'আমার সহিত কথা কহিতে আপনার আর কোনই অধিকার নাই।'

কথা সাঙ্গ হইতে না হইতে হতাবরোধা নির্ঝরিণীর ন্যায় বেগে যমুনা অন্তর্হিত হইলেন। কুমার রত্ন সিংহ হতবুদ্ধির ন্যায় সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। ভানুসপ্তমী তখন রতনসিংহের মনে নাই। রাজবারা, মহারাণা, মিবার, স্বাধীনতা সকলই তিনি তখন ভুলিয়া গিয়াছেন, হৃদয় তখন অবক্তব্য উৎকণ্ঠায় আলোড়িত। কতক ক্ষণ রতনসিংহ তদ্রূপ ভাবে বসিয়া রহিলেন, তাহা তিনি জানিলেন না। সমাগত লোকগণের সমোচ্চারিতস্তবধ্বনি তাঁহার সংজ্ঞা সংবিধান করিল। তখন তিনি ভাবিলেন আবার একবার গিয়া যমুনার সহিত সাক্ষাৎ করি এবং, তাঁহার চরণে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য্য কি? আবার ভাবিলেন যমুনা তো স্পষ্টই কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছেন। বহুক্ষণ ধরিয়া কতই চিন্তা করিলেন, কোন প্রকার বিগত কার্য্যে যমুনার বিরাগ-ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না চিন্তা করিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। শেষ মনে হইল যমুনার অন্যত্র বিবাহ স্থির হইয়াছে। কেন হইল? কে করিল? তাঁহার পিতাই তো আমার সহিত বিবাহের প্রস্তাবকর্ত্তা। তাঁহার অন্য সম্বন্ধ স্থির করা অসম্ভব। বহুচিন্তাতেও কোন মীমাংসাই তাঁহার সঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। তখন তিনি গাত্রোত্থান করিয়া ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া কহিলেন,—

'ভগবন্ আদিত্য! আমার কোন্ পাপের নিমিত্ত এই শাস্তিবিধান করিতেছ?'

ধীরে ধীরে রতন সিংহ বাহিরের দিকে চলিলেন। একটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিবা মাত্র, কুসুমের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কুমার ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

'কুসুম সত্য করিয়া বল যমুনার এমন ভাব হইল কেন?'

কুসুম বলিল,—

'তাহা বলাই ভাল। যমুনা লজ্জায় বলিতে পারে নাই। কুমারের অপেক্ষা যমুনার অন্যত্র অধিক প্রেমাস্পদ আছে। যমুনা নিতান্ত বালিকা নহে। এখন আর যে কোন ব্যক্তির সহিত নিতান্ত আত্মীয়ভাবে কথোপকথন করা ভাল দেখায় না।'

রতনসিংহ অনেকক্ষণ অটল গিরির ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন,—

'উত্তম।'

রতনসিংহ বাহিরে আসিলেন, প্রখর সৌরকররাশি তাঁহার নয়নে লাগিল। তখন তিনি সেই ভূমিতলে উপবেশন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ভাস্কর! তোমার চিরন্তনসেবক এবার এইরূপেই ভানুসপ্তমী উদ্যাপন করিল। দয়াময়! এ হৃদয়হীন জগতে যেন আর থাকিতে না হয়, যেন শত্রুনিপাতভিন্ন কোন কর্ম্মেই হস্ত বা মন লিপ্ত না থাকে। অন্তিমে, হে পিতঃ, যেন তোমার চরণেই স্থান হয়।

নিতে জানি, দিতে জানি না।

আমার চিরদিনই এই ভাব, চিরদিনই আমার এই রীতি, এই নীতি ;—আমি নিতে জানি, দিতে জানি না।

আকাশে যখন চন্দ্র ফুটে ;—যখন শরতের পূর্ণচন্দ্র সুদূর পূর্ব্বগগণের প্রান্তরেখা হইতে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া, পর্ব্বতের তুষারমণ্ডিত শূন্যশৃঙ্গে, সাগরের তরঙ্গবিক্ষোভিত শূন্যবক্ষে, নদীর দ্রবীভূত সঙ্গীতস্রোতে, নগরের সৌধমালায়, বিপিনের বৃক্ষান্তরালে, লতার কুঞ্জে, বিলাসিনীর মুক্তগবাক্ষে, এবং বিরহীর নিস্তব্ধ নীরব নিভৃত নিবাসে আপনার জ্যোৎস্নারাশি বিকীরণ করিয়া, এই জগৎকে জ্যোৎস্নার হাস্যে হাস্যময় করিয়া তুলে,—যখন প্রকৃতির সেই হসিতচ্ছবি যামিনীর নিদ্রালস গাম্ভীর্য্যে নিস্পন্দ রহিয়া আপনারই আনন্দভরে আপনি ঢলিয়া পড়ে, আমি তখন চকোরের মত তৃষ্ণা পূরিয়া জ্যোৎস্না পান করি এবং জ্যোৎস্নাপ্রবাহে তৃপ্তির পূর্ণমাত্রায় অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হই। চন্দ্রকে এই জ্যোৎস্নার মূল্যে কোন দিনই কিছু দিয়াছি কি ? না, আমি নিতে জানি, দিতে জানি না।

কোকিল যখন সহকার-শাখায় একাকী উপবিষ্ট হইয়া আপনার মনের কি এক দুঃখে হৃদয় ভরিয়া ডাকিতে থাকে,—বুল্‌বুল্ যখন কামিনীর নববিকশিত কুসুমস্তবকের পার্শ্বে বসিয়া বিষণ্ণচিত্তে বিলাপ করে, দয়েল তাহাতে কণ্ঠ মিলায়, ঝিল্লীনিবহ নিবিড় বৃক্ষবাটিকায় সেই তানে তান মিশাইয়া মধু বর্ষণ করে, আমি তখন কর্ণ ভরিয়া ঐ কল-গীত শ্রবণ করি,—পৃথিবীর কোথায় কে কোন্ দিন আমাকে আদর করিয়াছিল, কোথায় কে কোন্ দিন আমাকে অনাদর করিয়াছিল,—অথবা পৃথিবীর কোথায় কি হইতেছে, কোথায় কি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, সকল কথা বিস্মৃত হইয়া ঐ মধুর গীতিতে মোহিত থাকি। কোকিল, বুল্‌বুল্, দয়েল, ঝিল্লী, ইহাদিগের কাহাকেও আমি কোন দিন কিছু দিয়াছি কি ? না, আমি নিতে জানি, দিতে জানি না।

আমার এই সম্বন্ধ সকলের সহিতই সমান। দক্ষিণার শীতল সমীর না যাচিতেও আপনি আসিয়া আমার দগ্ধদেহের তাপনোদন করে,—প্রণয়িজনের স্নেহ-শীতল স্পর্শসুখের ন্যায় আমার সমস্ত শরীরে সঞ্চরণ করিতে রহে। আমি সমীরণকে কিছুই দি না। ভারত-সরসীর সরোজিনী,—সিরাজের গোলাব, নিদাঘের মেঘ,—মেঘ-বিলাসিনী সৌদামিনী, ফুটন্ত নক্ষত্র, পরিস্ফুট ঊষা, ইহারা সকলেই আমাকে কিছু না কিছু বিলাইতেছে। কেহ রূপের ছটায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের এক অপূর্ব্ব আভা অঙ্কিত করিতেছে,—কেহ রূপে গুণে সমুজ্জল হইয়া, অথবা রূপকে গুণের ছায়ায় ঢাকিয়া ফেলিয়া আমার অশিক্ষিত ও উদ্ভ্রান্ত চিত্তকে আধু-

রীর সুক্ষ্ম-স্বাদে শিক্ষা দিতেছে। কিন্তু ইহাদিগের কাহাকেও আমি কিছু দি না। ইহারা অমনিই আমার চক্ষুর চরিতার্থতা জন্মায়,—চিত্তের অন্তর-নিহিত ক্ষুধায় ভোগ্য যোগায়;—কেহই কোন কালে আমার নিকট প্রতিদানে কিছু চাহে না।

তবে মনুষ্য, তোমার নিকট আমি হারি মানিয়াছি। তুমিও আমাকে চিনিয়াছ এবং আমিও তোমাকে চিনিয়াছি। তুমিও সর্ব্বাংশে আমারই সমান। তুমিও নিতে জান, দিতে জান না,—না দিয়া যদি নিতে পার, তাহা হইলে দিতে অগ্রসর হও না; আর একান্তই যদি দিতে হয়, তাহা হইলেও আগে না নিয়া তুমি দিতে চাহ না এবং এক গুণে নয়গুণ না পাইলে তোমার পরিতৃপ্তি হয় না। তুমি তিল-পরিমাণ উপকার করিলে তাল-পরিমাণ কৃতজ্ঞতার জন্য হস্ত প্রসারণ কর,—এক বিন্দু সৎকার্য্য করিয়া একটা সমুদ্রের মাপে সুখ্যাতি ও সুযশ চাও,—শৈশবে সামান্য একটুকু শিক্ষা দান করিয়া চিরজীবন ব্যাপিয়া তাহার দক্ষিণার জন্য লালায়িত রহ,—একদিন একটি মিষ্ট কথা শুনাইলে একযুগ ভরিয়া তাহার প্রতিদান লও,—এবং এক ফোটা ভালবাসা দিয়া একজনের যাহা কিছু আছে না আছে সমস্তই কিনিয়া রাখিতে ভালবাস। তোমাকে ধন্যবাদ! তোমার যোগ,ভোগ,দান,ধ্যান—তোমার প্রেমের অশ্রু, পুণ্যের ধ্বজা,—তোমার সাধনা ও আরাধনা সকলই তোমার আপনার জন্য। তুমি আপনাকে একবারে ভুলিয়া,—আপনাকে একবারে গণনার বাহিরে রাখিয়া, এ জীবনে এক মুহূর্ত্তের তরেও কি পর-চিত্তের প্রীণন করিয়াছ?

অথবা তোমাকে নিন্দা করি বৃথা। আমি আপনিও যখন তোমারই মত বণিগ্‌ধর্ম্মাশ্রিত,—বণিগ্‌বৃত্তির অনুগত, তখন তোমাকে কিছু না বলিয়া আমার আপনাকে আপনি ধিক্কার দেওয়া এবং আত্মচরিতে লজ্জিত হওয়াই উচিত। আমিও ত তোমারই মত প্রতিদানের জন্য অধীর। তাই মনে করিয়াছি,আমার এই স্বার্থ-পিঞ্জর-রুদ্ধ, স্বসুখ-মুগ্ধ, কলুষিত চরিত্রকে একবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন মনুষ্য হইব, এবং প্রকৃতির এই মায়া-কাননে আত্মোৎসর্গের ধর্ম্ম শিখিয়া সংসারে আপনাকে প্রীতির উপহার স্বরূপ অর্পণ করিব। আমাকে কেহ চাহে আর না চাহে, আমি জ্যোৎস্নার মত আপনি গিয়া তাহার গায়ে জড়াইয়া পড়িব, এবং আমার সমস্ত দুঃখ ও সমস্ত বেদনা অন্তরের অন্তরতম স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া তাহারই চিত্তবিনোদনে যত্নবান্ হইব। বলিব, আমি দিতে আসিয়াছি, নিতে আসি নাই, আমাকে উপেক্ষা করিবে কেন? আমাকে কেহ ভালবাসুক, আর না বাসুক, আমি মৃদুবাহি সমীরণের মত তাহার সন্তাপ-দুঃখ দূর করিবার জন্য মৃদু মৃদু বহিব, এবং আমার ক্রোধের উচ্ছ্বাস ও প্রবৃত্তির আবেগ আপনাতে আপনি সংযত রাখিয়া তাহাকে লইয়াই ক্রীড়া করিব। বলিব, আমি দিতে আসিয়াছি, নিতে আসি নাই, আমাকে অবহেলা করিবে কেন? আমাকে কেহ ডাকুক আর না ডাকুক, আমি কোকিলের মত তাহার প্রণয় তরুর ডালে বসিয়া, তাহাকে প্রিয় সম্ভাষণে পুলকিত করিতে প্রাণ

খুলিয়া ডাকিব, এবং সে কর্ণ পাতিয়া একটি কথা না শুনিলেও তাহাকে প্রসন্ন রাখিতে প্রয়াস পাইব। বলিব, আমি দিতে আসিয়াছি, নিতে আসি নাই, আমাকে পায়ে ঠেলিবে কেন? আমাকে কেহ যাচ্ঞা করুক আর না করুক, আমি মেঘের মত তাহার উপর বারিধারা বর্ষণ করিব, এবং তাহার আশালতা যাহাতে পুষ্পিত হয়, তাহার আকাঙ্ক্ষার নির্ম্মল ক্ষেত্র যাহাতে পরিপূর্ণ হইয়া পুনরায় উজ্জীবিত হইয়া উঠে, তদর্থ আপনাকে ঢালিয়া দিব। বলিব, আমি দিতে আসিয়াছি, নিতে আসি নাই, আমাকে দূর করিয়া দিবে কেন? আমাকে কেহ আদর করুক আর না করুক, আমি তরঙ্গিণীর মত আপনার ভাবে ঢেউ খেলাইয়া খেলিতে খেলিতে চলিয়া যাইব,—আকাশ নিবিড় নীরদে আচ্ছন্ন হইলেও আপনার ভাবে আপনি নাচিব, কখনও খল খল করিয়া হাসিব, কখনও আনন্দে ফুলিয়া উঠিব, এবং যে স্থান দিয়া বহিয়া যাইব, সেই স্থানেই সুখ সম্পদের শোভা ফলাইব। বলিব, আমি দিতে আসিয়াছি, নিতে আসি নাই, আমার প্রতি ফিরিয়া চাহিবে না কেন? বল, কে ইহার পর আমার সঙ্গী হইবে? যদি কেহ আমার সঙ্গে সঙ্গী হইয়া, আমার হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া, জীবনের স্রোতে তরী ভাসাইতে অভিলাষী হও, তাহা হইলে "নিতে জানি, দিতে জানি না" এই পুরাতন মন্ত্রকে পুঁছিয়া ফেলিয়া, এইক্ষণ হইতে এই নূতন মন্ত্রকেই হৃদয়ের জপমন্ত্র কর,—

"দিতে জানি, নিতে জানি না।"

পাষাণ-প্রতিমা (নাটক) *

দশ পনর বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিত। নবীনারা দাসু রায়ের পাঁচালী, রসিক রায়ের পাঁচালী, বিদ্যাসুন্দর, রসিকরঞ্জন, কামিনীকুমার প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিয়া সময় কাটাইত। এখন সমাজের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। এখন বিদ্যাসুন্দরের নাম করিলে যুবক যুবতীরা খড়্গহস্ত হন। নদের চাঁদ ব্যাচারা বিদ্যাসুন্দরের নাম করিয়াছিল বলিয়া ললিত তাহাকে কি ভৎর্সনাই না করিল। লীলাবতী ত নাম শুনিয়াই সলাজে প্রস্থান করিল। এই সব বাস্তবিকই উন্নতির চিহ্ন। ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হইবার পর কিছুকাল যে এই উন্নতি-স্রোত চলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু যে দেশের যেটি প্রিয়বস্তু তাহাকে কেহ অধিক দিন চাপাইয়া রাখিতে পারে না। পাঁচালী এ দেশের বড় প্রিয়বস্তু। কিছুকাল চাপা থাকিয়া, ইহা আবার ভিন্ন বেশ ধারণ করিয়া কদর্য্য নাটক ও উপন্যাসের আকারে বঙ্গ-যুবা ও বঙ্গযুবতীর মনোহরণ করিতেছে।

* শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যা প্রণীত।

পাষাণ-প্রতিমা এইরূপ একখানি পরিবর্জ্জিত পাঁচালী। ইহাতেও সেই আদি রসের ছড়াছড়ি, সেই বিরহ-জ্বালা, সেই যৌবন-জ্বালা, সেই সমস্ত অশ্লীলভাবপূর্ণ সঙ্গীত। পাষাণ-প্রতিমার 'Tone' বা 'রুচি' যে শুদ্ধ পাঁচালীর মত, তাহা নহে, অনেক স্থলে ইহার ভাষাও পাঁচলীর মত। যথা,—

"আমি সার ভেবেছি, জন্ম আমার দুঃখে, ভাস্‌ছি এখন দুঃখে, এ জগৎ পরিত্যাগ করব এই দুঃখে" এইটি গ্রন্থোক্ত একটি নবীনা প্রমোদিনীর উক্তি। ৩৮পৃষ্ঠা

"পুরুষেরাও অবলা রমণীর যৌবন-সময়ে নিজ স্বার্থসাধন জন্য দুঃখভোগ করতেও কতক বাধ্য হয়, কিন্তু রমণীর সারধন যৌবন, গত হলে পুরুষ কখনই দুঃখের দুঃখী হ'তে চায় না" সুরপ্রভার উক্তি। ৫১পৃষ্ঠা

"হাঃ হাঃ সুন্দরি! আমি যে কথাটা বল্লেম তা একবার তলিয়ে বুঝ্‌লেও না।··· ··· আমি অনেক দিন হতে তোমার প্রেমভিখারী, আমার বাসনা বিফল করো না"

"পূরাও হে মানস-আশ হৃদয়ে
দিয়ে হৃদয়" ইত্যাদি।

কিন্তু পাষাণ-প্রতিমা যে একা এই বিষয়ে অপরাধী তাহা নয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া আমরা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

একজন জর্ম্মাণ সমালোচক বলিয়াছেন নাটকের দুইটি অংশ আমাদের বিবেচ্য। প্রথম ইহার গল্প রচনা। দ্বিতীয় ইহার চরিত্রবিন্যাস। দেখা যাউক পাষাণ-প্রতিমার গল্প রচনা কিরূপ।

কৌতূহল উদ্দীপন করাই গল্প-রচনার প্রধান উৎকর্ষ। যে পুস্তকের প্রথম কয়েক পত্র পড়িলেই শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া থাকা যায় না, তাহাতেই গল্প-রচনার উৎকর্ষ আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়। কিন্তু পাষাণ-প্রতিমার যেখানে ইচ্ছা সেই খানে পুস্তক বন্ধ করা যায়। গল্পটি এইরূপ। একজন যোদ্ধা কাশ্মীরীয়দের সাহায্যার্থ বিদেশ হইতে কাশ্মীরে যান। রণজিৎ সিংহ তৎকালে কাশ্মীর অধিকার করিবার চেষ্টায় ছিলেন। এই যোদ্ধা রণজিৎসিংহের বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক আহূত হন। কিন্তু ইনি কাশ্মীরে গিয়াই উপর্য্যুপরি চারিটি যুবতীর সহিত প্রণয়পাশে বদ্ধ হন। চারিটি যুবতীকেই প্রণয়ে উৎসাহিত করেন। পরে একটির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের সময় অন্য যুবতীগণ বিবাহের সভায় বক্ষঃস্থলে ছুরিকাঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করে। এইরূপ গল্পে কৌতূহল উদ্দীপন করার স্থল নাই। কারণ ইহাতে কোন বিষয়ের কিছুমাত্র নূতনত্ব নাই। এই রূপ গল্প বঙ্গভাষায় সহস্র সহস্র প্রকাশিত হইয়াছে।

তাহার পর চরিত্র-বিন্যাস। প্রথম কথা ইহার সকল স্ত্রীলোকগুলিই একরূপ। যিনি কৃষকগৃহে প্রতিপালিত হইয়াছেন, তাঁহার ভাষা, তাঁহার চরিত্র যেরূপ, যিনি রাজপ্রাসাদে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন, তাঁহার ভাষা, তাঁহার চরিত্রও সেইরূপ। কাহারও সহিত কাহারও বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই। পুরুষদের বেলাও ঐ কথা বলা যাইতে পারে। রণজিৎসিংহ, মলহর সিংহ ও ভীষ্মাচার্য্য একই ভাষায়, একই ভাবে কথাবার্ত্তা কহে। এস্থলে প্রসঙ্গতঃ অভিনয়-সম্বন্ধে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। আমরা এক-

বার দুর্গেশ-নন্দিনীর অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয়স্থলে দেখিলাম তিলোত্তমা ও আয়েষা একই প্রকৃতির স্ত্রীলোক। লেখকের অভিপ্রায়ানুসারে তিলোত্তমা ও আয়েষা চরিত্র-বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিলোত্তমা মৃদু, শান্ত ও সুশীল। আয়েষা একটু চঞ্চল, একটু প্রগল্‌ভ ও একটু অধীর। ইংলণ্ডে দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয় হইলে এই দুই চরিত্রের বিভিন্নতা অভিনয়-স্থলেও স্পষ্ট দেখা যাইত। কিন্তু অস্মদ্দেশে মুড়ি মিছরির একদর। তিলোত্তমা ও আয়েষা অভিনয়স্থলে উভয়েই Coquette। এবং রঙ্গভূমির অভিনেত্রীরা Coquetry ভিন্ন অন্য কিছু অভিনয় করিতে জানে না। সে যাহা হউক পাষাণ-প্রতিমাতে চরিত্র-বিন্যাস ঐরূপ। কাহারও চরিত্রে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নাই। অর্থাৎ কাহারও চরিত্রে এমন কোন বিশেষ গুণ নাই, যাহা তুমি অন্যে দেখিতে পাও না। সবই এক ছাঁচে গড়া।

আমরা নিম্নে দুইটি চরিত্রের বিশ্লেষণ (Analysis) করিলাম। নাটককার চরিত্রবিন্যাসে কিরূপ পটু, পাঠকগণ বিবেচনা করুন।

১ম চরিত্র রণধীরসিংহ। ইনি গ্রন্থের নায়ক।

ইনি ডন্ জুয়ান (Don Juan) এর ন্যায় লম্পট। বোবাডিল (Bobadil) বা ফলষ্টাফের (Falstaff) ন্যায় দাম্ভিক (কথায় কথায় বলেন এই দুই বাহু কি শরীর শোভার জন্য?) হ্যামলেটের (Hamlet) ন্যায় আত্মবিস্মৃত (আসিলেন রণজিৎ সিংহের বিপক্ষতাচরণ করিতে, হইয়া গেলেন রণজিতের অতিথি; অতিথি অবস্থাতেও প্রতিজ্ঞা করিলেন রণজিতের বিপক্ষতাচরণ করিব। পরে রমণীগণেরই প্রেমমোহে সকল ভুলিয়া গেলেন। তাহার পর হইলেন রণজিতের সহায়,) যুদ্ধকুশলতায় ইনি জগৎসিংহ ও হেমচন্দ্রের একবিংশতম অনুকরণ। এই কয় চরিত্র মিশ্রিত করিয়া, অর্থাৎ এক পাত্রে হ্যামলেট্, ফলষ্টাফ্, ডন্‌জুয়ান্ এবং জগৎসিংহ এই চারি দ্রব্য পাক করিয়া যদি কোনরূপ খিঁচুড়ী প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা হইলে রণধীরসিংহ তাই।

২য় চরিত্র অনুপকুমারী—

ইনি বিমলার ন্যায়, বা বিমলা অপেক্ষাও কৌশলময়ী। পুরুষসিংহ, রিচার্ডের (Richard the Lion-hearted) ন্যায় সাহসী ও যুদ্ধকুশল। বিট্রিস Beatrice এর ন্যায় বাক্‌পটু। এবং ইনি কৃষক-পালিতা। এই চারি চরিত্র একত্র করিলে যে সামগ্রী হয় অনুপকুমারী তাই। অনুপকুমারী গ্রন্থের নায়িকা।

ফল কথা, আমাদের বিশ্বাস যে চরিত্রবিন্যাস কাহাকে বলে, বা চরিত্র-বিন্যাসে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন লেখক তাহা অবগতও নহেন।

গ্রন্থে ভাবের (Ideas) বিরলতাও শোচনীয়। ইহাতে দুইটি মাত্র ভাব আছে।

১ম। দেশ স্বাধীন কর।

২য়। যতগুলি সম্ভব ততগুলি স্ত্রীলোকের (সবগুলি সুন্দর হওয়া চাই) সহিত প্রণয়-পাশে বদ্ধ হও।

নাটকের ভাষাও দুর্ভাগ্যবশতঃ এইরূপ নাটকেরই উপযোগিনী। নাটক রচনা করিতে হইলে যে শিক্ষা বা যে নৈসর্গিকী ক্ষমতার প্রয়োজন, তাহার বিন্দুমাত্রও ইহাতে দেখিলাম না।

শ্রীনীঃ—

প্রকৃতিবিজ্ঞান।

উক্ত শাস্ত্র দ্বারা আমরা বায়ুর উচ্চতা, পরিসর, গুরুত্ব ও প্রসারণ, এবং স্থানভেদে উহার তাপ ও শৈত্যের সাময়িক ভেদ পরিজ্ঞাত হই। পূর্ব্বে উহা জ্যোতিষের অন্তর্গত ছিল, কিছুকাল হইল, উহা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহার উপাসকগণ অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও ডেল্‌টন, উইলসন্, ডেনায়েল, হাম্বোলট, সেবাইন, ফরবস্, মারে, টিণ্ডেল প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণের যত্নে এক শতাব্দীর মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়া, কবি বা বৈষয়িক, ধনী বা নির্ধন সকলেরই নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে; কেননা প্রকৃতির শোভাই কবি কল্পনার আকর, ও তদ্গত নিয়মরাজিই কবির সামর্থ্য। পক্ষান্তরে শস্য সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতে হইলে, এবং ঝটিকা ও মহাপ্লাবন প্রভৃতি দৈব দুর্ঘটনা সকল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, বায়ুর সাময়িক অবস্থা, শিশির ও বৃষ্টির সাময়িক আধিক্য বা অল্পতা প্রভৃতির বিশেষ জ্ঞান উপলব্ধি করা কি চাসী, কি বণিক্, কি ব্যবসায়ী সকলেরই প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন উহার উপাসক মণ্ডলীর পক্ষে উহার ন্যায় বিমল স্বর্গীয় আনন্দ বিধায়ক, প্রেম ও ভক্তিরসপূর্ণ শিক্ষা আর কি হইতে পারে? স্বর্গই যাঁহাদিগের পাঠ্য পুস্তক, প্রকৃতি স্বয়ংই যাঁহাদিগের উপদেষ্টা, ধীর সমীর বা প্রবল ঝটিকা—মুক্তাবিনিন্দিত নীহারবিন্দু—মেঘরাশির সুকোমল কমনীয় বা ভীম মূরতি ও নানাবিধ নয়নরঞ্জক বর্ণ—বিদ্যুন্মালার ভীষণ আগ্নিক লাবণ্য ও কুহকিনী শক্তি প্রভৃতি যাঁহাদিগের প্রতিদিনের পাঠ্য বিষয়, তাঁহাদিগের আন্তরিক সুখের আর পরিসীমা কি?

এ দেশের দার্শনিক-শিরোমণি সাংখ্য কহিয়াছেন,—

'এবং হি শাস্ত্রবিষয়ো ন জিজ্ঞাস্যেত যদি দুঃখং নাম জগতি ন স্যাৎ।'

বস্তুতঃ দুঃখ আপাতপ্রতিকূল হইয়াও জগতের বিজ্ঞতা ও সমস্ত সুখ সম্পত্তির আদিকারণ। জগতে দুঃখ না থাকিলে দর্শনের আবশ্যকতা এবং সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রের উৎপত্তি ও আলোচনা কখনই হইত না। প্রকৃতি-দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য বিষয় সকল প্রায় সকল জাতিরই প্রবাদবাক্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহার কারণ এই যে, সমাজের বন্য বা কৃষক অবস্থায় মনুষ্যগণকে সর্ব্বদা বাহিরে কার্য্য করিতে হইত। তখন তাঁহাদিগের ঋতু সকলের পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্ত্তনে প্রকৃতির প্রভেদ, ঝড়, বৃষ্টি, জলপ্লাবন প্রভৃতির উৎপত্তিকারণ ও উৎপত্তি সময়ে যে যে লক্ষণ ঘটিত, এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। অনিবার্য্য দুর্ঘটনার পরিহারার্থ, পরিহার্য্য দুর্ঘটনা হইতে আপনাকে রক্ষা করা ও অতীত ঘটনা স্মরণ রাখিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া মনুষ্যেরই ক্ষমতা।

মনুষ্যের আদিম অবস্থাই এই ক্ষমতার পরিচয় দিবার প্রকৃত সময়; তখন প্রকৃতির স্থূল জ্ঞান বা প্রকৃতির সংজ্ঞা জ্ঞান মাত্রই সম্ভাবনা। ক্রমশঃ শব্দ ও ধাতুর রূপ, সন্ধি ও সমাসের বোধ হয়। তৎপরে প্রকৃতির পদমাধুরী, অলঙ্কার-চাতুরী, ভাবের গভীরতা উপলব্ধি হয়। এখন সেই সময়। প্রকৃতির নিয়ম সকলের স্থূল জ্ঞান মাত্র বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য হয় না। প্রতি দিন নূতন নূতন জ্ঞানের উপলব্ধি—নূতন নূতন বুদ্ধিকৌশল—নূতন নূতন আবিষ্কার, এই সময়ের ধর্ম্ম; কেন না জ্ঞানের উন্নতিই জ্ঞানের অভাব প্রতিপাদন করে। প্রকৃতির জ্ঞান-ভাণ্ডার অক্ষয়, মনুষ্যবুদ্ধির প্রসারণী শক্তি এত অধিক যে, ভবিষ্যৎ উন্নতির বেলা লক্ষ্যকরা কাহার সাধ্য?

প্রকৃতি-দর্শনশাস্ত্রের বিষয় সকলের স্থূল জ্ঞান মাত্র বহুকাল পর্য্যন্ত পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে উক্ত শাস্ত্রবিষয়ক বিশেষ উন্নতির কোন উপায় সৃষ্ট হয় নাই। উক্ত সময়ে টোরিসিলি নামে জনৈক পণ্ডিত ব্যারোমিটার (Barometer) বা বায়ুর গুরুত্ব-পরিমাণযন্ত্র প্রথমে আবিষ্কার করেন। কয়েক বৎসর পরে পাস্কেল উহার সমধিক উন্নতি করেন এবং উহার আবশ্যকতা ও উপযোগিতা সমাজে সম্যক্‌রূপে প্রতিপাদন করেন। তদবধি উহার সাহায্যে বিমানস্থ বায়ুর লঘুত্ব বা গুরুত্ব ধর্ম্ম, অথবা প্রসারণী বা সঙ্কোচনী শক্তি ও ঝটিকাদির ভবিষ্যৎ লক্ষণ এক্ষণে পণ্ডিতগণ আপনাপন পাঠগৃহে বসিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন।

ব্যারোমিটারের তুল্য প্রয়োজনীয় তাপমানযন্ত্র (Thermometer) ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে পাডুয়া নিবাসী সেঙ্কটোরিও নামে এক ব্যক্তির দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। তিনি তাপের পরিমাণ স্থির করিবার জন্য প্রথমে এল্‌কহল (Alcohol) ব্যবহার করেন; পরে রুমার নামে একজন ব্যক্তি উক্ত কার্য্য পারদ দ্বারা সংসাধিত করেন। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে ফেরেণহিট্ রুমারের আদর্শমত উক্ত যন্ত্র ৩২ হইতে ২১২ ডিগ্রী বা পরিমাণ-চিহ্ন দ্বারা তাপের সাময়িক সংখ্যা স্থির করেন; তদবধি উহা নানাবিধ বৈষয়িক কার্য্য সকলে ব্যবহৃত হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন স্নিগ্ধ বায়ুর বাষ্প বা জলীয় অংশ নির্দ্দেশ করিবার জন্য ডি সসর নামে এক ব্যক্তি হাইগ্রোমিটার (Hygrometer) সৃষ্টি করেন। পূর্ব্বোক্ত এই তিনটি যন্ত্রের সৃষ্টি ও সমধিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্থানগত বায়ুর সাময়িক লঘুত্ব বা গুরুত্ব, তাপের পরিমাণ বা বাষ্পীয় অংশ জানিবার জন্য পণ্ডিতগণের কৌতূহল উদ্দীপন ও দর্শনের আবশ্যকতা ও আদর বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ডেনায়েল বায়ুর বাষ্পীয় অংশ, সূর্য্য ও পৃথিবীর তাপবিকিরণী শক্তি, ব্যারোমিটার দ্বারা স্থানের উচ্চতা স্থিরীকরণ, বাণিজ্য-বায়ু ও দেশের প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক বায়ুর অবস্থাভেদ প্রভৃতি বিষয়ে আপন মত জনসমাজে প্রচার করেন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের পূজ্যপাদ হামবোল্ট ও তৎপরে ডভ ঋতুগণের পরিবর্ত্তনে পৃথিবীর সর্ব্বস্থলের তাপরাশির কিরূপ ন্যূনাধিক্য হয়,

তাহার নিরূপণ ও মানচিত্র দ্বারা স্থির করিয়া জগতের অনন্ত উপকার সাধন করেন।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক টিন্‌ডেল বায়ুর বাষ্পীয় অংশ সময়ভেদে তাপ ও শৈত্যের যে হ্রাস সম্পাদন করে, তাহা প্রচুর বিজ্ঞেতার সহিত পণ্ডিতমণ্ডলীর আগে প্রদর্শন করেন। তাঁহার মতে বায়ুতে যে বাষ্প অবস্থিতি করে, উহা দিনমানে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণ হইতে পৃথিবীকে রক্ষা ও রাত্রিকালে তাপরাশি বিকিরণ জন্য পৃথিবীর শৈত্যের আধিক্য নিবারণ করে।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ঋতুভেদে পৃথিবীর সকল স্থানের বায়ুর গুরুত্ব ও বায়ু প্রবাহের দিক্‌নির্ণয় চিত্র সকল মুদ্রাঙ্কিত হয়।

১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে বেনজেমিন ফ্রাঙ্কলিন শুভক্ষণে ঘুড়ী উড়াইয়া বিদ্যুৎ ও তাড়িত উভয়ের উপাদান যে এক তাহার সিদ্ধান্ত করেন।

সংক্ষিপ্তসমালোচন।

১। 'পার্থ-পরাজয় নাটক। অর্থাৎ বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জ্জুনের পরাভব। শ্রীমনোমোহন বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।' —এ দেশের নাটককারগণ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। এক শ্রেণির নাম ইংরেজীনবিশ, আর এক শ্রেণির নাম বাঙ্গালানবিশ। বাঙ্গালানবিশদিগের মধ্যে মনোমোহন বাবুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং আমরা এই জন্য বহুদিন হইতেই ইহাঁর গুণপক্ষপাতী। যাঁহারা পৌরাণিক কল্পনার পুষ্পকাননে প্রবেশ করিয়া পুরাতন আর্য্য কবিদিগের নির্ম্মাল্যপুষ্পে নাটক রচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই মনোমোহন বাবুর সমকক্ষ নহেন। তাঁহার লেখা করুণ-রসে পরিপূর্ণ থাকে। তবে সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার পার্থ-পরাজয় রামাভিষেকের মত হয় নাই। ইহার প্রমীলা-প্রসঙ্গটি অপ্রাসঙ্গিক। প্রমীলার পুরোভাগে চিরপ্রণয়িনী সুভদ্রার প্রতি উপেক্ষার ভাব পার্থ নামের অযোগ্য এবং অপ্রেমিকতার পরিচায়ক; আর, ইহার পরিণতি ও নীতি রামাভিষেকের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। গ্রন্থকার রামাভিষেকে বহুবিবাহরূপ সামাজিক পাতকের বিষফল দেখাইয়া, অনুতাপদগ্ধ দশরথের সহিত বিলাপ করিয়াছেন;—পার্থ-পরাজয়ে, —"এক মেঘে চারি দিকে, চারি সৌদামিনী আভা, চারিটি কণক-লতা তমালে যেন জড়িতা" ইত্যাদি গীত গাইয়া তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল ফলাইয়াছেন। কিন্তু নাটকখানি তথাপি অন্যান্য বিষয়ে প্রশংসাযোগ্য এবং বাঙ্গালা নাটকের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। কারণ লেখকের ক্ষমতা আছে।

২। 'বিয়োগী'। (প্রিয়তমার প্রতি) —ইহাতে মহাজনপদাবলীর মিশ্রভাষায় রচিত কএকটি ছোট ছোট কবিতা আছে। সেই মৃতভাষায় এইক্ষণকার বাঙ্গালি কখনই তেমন অধিকার লাভ করিতে পারিবে না। তবে বৃথা এ প্রয়াস কেন?

মহম্মদের উত্তরাধিকারিগণ

(৩৫ পৃষ্ঠার পর।)

সপ্তম অধ্যায়।

বাল্‌বেক (সীরিয় ভাষায়, সূর্য্যদেবের নগরী) সীরিয়া রাজ্যের একটি সর্ব্বপ্রধান নগরী ছিল। ঐ নগরী বেকাপ্রদেশের রাজধানী। গ্রীকজাতির শাসন সময়ে ইহার নাম হিলিওপোলিস্ (সূর্য্যদেবের নগরী) ছিল। এই নগরীতে সূর্য্যদেবের সুরম্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরূপ জনরব যে, মহাজ্ঞানী নরেশশ্রেষ্ঠ সলমন্ আপনার সূর্য্যসেবিকা প্রিয়তমা পত্নীর মনোরঞ্জনার্থ ঐ নগরী এবং মন্দির নির্ম্মাণ করেন। যে সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে মন্দির রচিত হয়, কথিত আছে সলমন্ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার প্রভাবে দৈত্যগণকে বাধ্য করিয়া তাহাদিগদ্বারা সে সমস্ত সংগ্রহ করান। একটি প্রস্তর দৈর্ঘ্যে ৬৯ ফিট্। পরিব্রাজকগণ সেই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে এখনও আশ্চর্য্য হইয়া প্রশংসা করেন; আধুনিক স্থপতিবিদ্যাবিদ্‌গণ কিরূপে ঈদৃশ মন্দির গঠিত হইয়াছিল ভাবিয়া চমকিত রহেন।

চারিশত উষ্ট্রপরিপূর্ণ চিনি, পট্টবস্ত্র প্রভৃতি নগরাভিমুখে নীত হইতেছিল, আবুওবীদা সে সমস্ত আটক করিলেন। সার্থবাহগণ অর্থদান পূর্ব্বক আপন আপন স্বাধীনতা ক্রয় করিয়া নগরে প্রবেশ করিল, এবং মুসলমানগণের আগমনের সংবাদ দিল। নগরীর শাসনকর্ত্তা হার্ব্বিশ ভাবিয়াছিলেন, লুণ্ঠনকারী একদল দস্যু আগত হইয়াছে, সুতরাং মাত্র ছয় সহস্র অশ্ব এবং কতকগুলি বিশৃঙ্খল পদাতিক লইয়া লুপ্ত দ্রব্য পুনরুদ্ধার করণার্থ গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রম শীঘ্রই তিরোহিত হইল। তাঁহার অসংখ্য সৈন্য হত, প্রচুর অর্থ লুণ্ঠিত হইল; তিনি স্বয়ং সাতটি আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন।

আবুওবীদা নগর সমীপে উপস্থিত হইয়া নাগরিকগণের নিকট মুসলমানগণের অপ্রতিহত প্রভাবের বিষয় স্মরণ করাইয়া এক খানি পত্র লিখিলেন। একজন কৃষক পত্রবাহক হইল। সেই ব্যক্তিকে তিনি বিংশ মুদ্রা প্রদান করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই, "মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ কর, নতুবা করদানে সম্মত হও।" নাগরিকগণের অনেকে সম্মত হইত; কিন্তু হার্ব্বিশের শরীরে তখনও মুসলমানের আঘাতের তীব্র জ্বালা বিদ্যমান ছিল; তিনি পত্র ছিড়িয়া ফেলিলেন, এবং প্রত্যুত্তর না দিয়া দূতকে বিদায় করিলেন।

আবুওবীদা তাঁহার সৈন্যগণকে নগরাবরোধে চালিত করিলেন। কিন্তু অবরুদ্ধ-

গণ নগরপ্রাচীর হইতে যন্ত্রের সাহায্যে এরূপ সাহসিকতার সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিল যে, মুসলমানগণের বহুসংখ্যক হত এবং তাহারা দূরে অপসারিত হইল। শীতের দিন ছিল; আবুওবীদা আপন সৈনিকগণের সুখসুবিধার প্রতি সর্ব্বদা অবহিত ছিলেন। তিনি আদেশ করিলেন সকালে আহার করার পূর্ব্বে কেহই যেন সমরে প্রবৃত্ত না হয়। তাহারা সকলে খাদ্যসামগ্রী পাক ও প্রস্তুত করিতেছিল. এমন সময়ে নগর-তোরণ উন্মুক্ত এবং বহুসংখ্যক গ্রীক্ বহির্গত হইল। তাহারা অপ্রস্তুত মুসলমানদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক অনেক সৈন্য শমনসদনে প্রেরণ করিল। অনেক কষ্টে তাহারা তাড়িত হইল সত্য, কিন্তু অনেক বন্দী এবং মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী বিস্তর লইয়া গেল।

আবুওবীদা যন্ত্রের আক্রমণ হইতে শিবির দূরে লইয়া গেলেন, কারণ সেখানে অশ্বারোহীগণ অধিক স্থান সুতরাং আক্রমণের অধিক সুবিধা প্রাপ্ত হইবে। শত্রুগণের মিলিত বল নষ্ট করিয়া নানা স্থানে তাহাদিগকে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য তিনি আপন সৈন্যগণকে দলে দলে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রেরণ করিলেন। সাদ ইবিন্জেইদ্ পাঁচশত অশ্ব ও তিনশত পদাতিসহ পর্ব্বতসমীপস্থ তোরণপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন, দিরার ডামাস্কসের সমীপবর্ত্তী তোরণের দিকে তিনশত অশ্বারোহী এবং দুইশত পদাতিসহ নিয়োজিত রহিলেন।

শাসনকর্ত্তা হার্ব্বিশ মুসলমানগণকে পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, তাহারা গত যুদ্ধের ক্ষতিদৃষ্টে ভীত হইয়াছে। বলিলেন "এই অর্দ্ধ-উলঙ্গ মরুবাসী দস্যুগণ উদ্দেশ্যবিহীন যুদ্ধ করে; আমরা বর্ম্মচর্ম্মে সুরক্ষিত; আমরা আমাদের স্ত্রী, সন্তান, সম্পদ এবং জীবন রক্ষার্থ যুদ্ধ করি।" অনন্তর তিনি আপন সৈন্যদিগকে পুনরায় বাহির হইতে আদেশ দিলেন। তুমুল যুদ্ধ হইল। সোহেইল্ ইবিন্ সাবা নামক একজন মুসলমান সৈনিক বিপক্ষতরবারে দক্ষিণহস্তে আহত হইয়া, রণক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিকটস্থ এক পর্ব্বতে আরোহণ করিল, এবং যুদ্ধের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। সেনাপতি স্বয়ং যে তোরণে অবস্থান করিতেছিলেন, বিপক্ষগণ সেই দিক হইতে বাহির হওয়াতে তিনি নিতান্ত বিপন্ন ও পরাজয়োন্মুখ হইলেন। তখন সোহেইল্, অন্য পার্শ্বে অনর্থক অবস্থিত দিরার এবং সাদেরের সাহায্য সেনাপতির বিশেষ উপকারজনক হইবে বিবেচনায়, কতকগুলি কাঁচা বৃক্ষশাখা আহরণ করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক ধূম উত্থিত করিল। দিরার ও সাদ সসৈন্য-আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয়লক্ষ্মী তখন পুনরায় মুসলমানের সপক্ষ হইলেন। হার্ব্বিসের বিশ্বাস ছিল, জয়লাভের আর বিলম্ব নাই! কিন্তু চারিদিক হইতে যুগপৎ আক্রান্ত এবং নগর ও তাঁহার সৈন্য এতদুভয়ের মধ্যে শত্রুসৈন্য সন্নিবিষ্ট দেখিয়া একবারে হতবুদ্ধি হইলেন। যদি তাঁহার সৈন্যগণের উৎকৃষ্ট শিক্ষা না থাকিত তাহা হইলে আর রক্ষা ছিল না। তাহারা ঢালে ঢালে প্রাচীরের ন্যায় রচনা করিয়া সাবধানে আত্ম-

রক্ষা করিতে করিতে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। মুসলমানগণ চারিদিক অবরোধ করিয়া অবিশ্রান্ত আক্রমণ করিতে লাগিল। আবুওবীদা দিরার এবং সাদেরের আগমন অবগত ছিলেন না, সুতরাং গ্রীকগণের পশ্চাদ্গমন কেবল ভাণমাত্র মনে করিয়া আপন সৈন্যদিগকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন। সাদ্ সে আদেশ শুনিতে পান নাই। তিনি বিপক্ষদিগকে অনুসরণ করিয়া দূরবর্ত্তী পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি কৌমারাশ্রমে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিলেন।

আবুওবীদা যখন জানিতে পাইলেন যে, ধুমদৃষ্টে দিরার ও সাদ্ তাদৃশ প্রয়োজনীয় সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি সোহেইলের প্রত্যুৎপন্নমতির প্রশংসা করিলেন। কিন্তু আপন সৈন্যগণকে এই বলিয়া সতর্ক করিলেন, সেনাপতির আদেশ ব্যতীত ভবিষ্যতে কেহ এরূপ না করে।

এদিকে হার্ব্বিশ অল্পসংখ্যক শত্রু অনুসরণ করিয়াছে দেখিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তেমন ভীষণ যুদ্ধ আর তাহারা করে নাই! গ্রীকগণ বহুসংখ্যক মুসলমান হত্যা করিয়া প্রায় জয়লাভ করিবে এমন সময় পুনরায় একদল মুসলমানসৈন্য আসিল, হার্ব্বিশ পুনরায় মন্দিরমধ্যে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু এমন শোচনীয় ভাবে অবরুদ্ধ রহিলেন যে, কেহ কোন গবাক্ষের সমীপস্থ হইবামাত্র মুসলমান তীরন্দাজের তীর বিদ্ধ হইতে লাগিল। নিশ্বাস প্রশ্বাসও কষ্টকর হইল। আবুওবীদা সেনাপতিকে পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গমবৎ মন্দির মধ্যে অবরুদ্ধ রাখিতে সাদকে নিয়োজিত রাখিয়া স্বয়ং অতি সাবধানে নগর অবরোধ করিয়া রহিলেন। হার্ব্বিশ বুঝিতে পারিলেন খাদ্যাদির অভাবে সেই ভগ্ন প্রায় পুরাতন মন্দিরে অনেক দিন অবস্থান করা যাইবেনা। তাঁহার গৌরব ও তেজস্বিতার হ্রাস হইল। তিনি পট্টবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছিন্ন পশমীবস্ত্র পরিধান করিলেন এবং সাদের সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। মুসলমান সৈনিক উত্তর করিলেন তিনি কেবল সেই আশ্রমবদ্ধদিগের সহিত সন্ধি করিতে পারেন। তাঁহারা ঈশ্বর এবং তাঁহার প্রেরিতকে (মহম্মদকে) স্বীকার করিলে এবং মুক্তিলাভ করিয়া মুসলমানগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না প্রতিশ্রুত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিবেন। তিনি ইহাও প্রস্তাব করিলেন যে হার্ব্বিশ যদি নগরের অবরুদ্ধগণের জন্যও সন্ধি করিতে চান তবে তাঁহাকে প্রধান সেনাপতির নিকট লইয়া যাইবেন, এবং ইহাও বলিলেন সন্ধি না হইলে তাঁহারা পুনরায় আশ্রম মন্দিরে ফিরিয়া আসিবেন, অনন্তর ঈশ্বর এবং তরবারি সকল মীমাংসা করিবে।

হার্ব্বিশ্ তদনুসারে অবরোধকগণের শিবিরে নীত হইলেন, তিনি মুসলমান দিগের সংখ্যা অল্প দেখিয়া দন্তে অধর পীড়ন করিতে লাগিলেন। তিনি সহস্র ঔন্স্ স্বর্ণ, দুই সহস্র ঔন্স্ রৌপ্য, সহস্র রেশমী পরিচ্ছদ প্রদান পূর্ব্বক নগর মুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু আবুওবীদা বলিলেন, এসমস্ত দ্বিগুণ দিতে হইবে এবং তাহাতে সহস্র তরবারি এবং আশ্রমবদ্ধ সৈন্যগণের

সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র যোগ করিতেহইবে; নগরের পক্ষে প্রতি বৎসর করদান করিতে হইবে; নগরে আর খৃষ্টিয়ান উপাসনামন্দির উত্তোলন করিতে পারিবে না; আর কথনও মুসলমান বলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিবেনা।

হার্ব্বিশ্ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নাগরিক গণের অবগতি ও সম্মতির জন্য একাকী নগরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সমস্ত সঙ্গীগণ মুসলমান হস্তে প্রতিভূ স্বরূপ রক্ষিত হইল। নগরবাসীরা প্রথমতঃ অস্বীকার করিল। তাহারা বলিল তাহাদের নগর সীরিয়া রাজ্য মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত ও দৃঢ় গঠিত। কিন্তু হার্ব্বিশ সমস্তের চতুর্থাংশ স্বয়ং দিবেন স্বীকার করাতে তাহারা সম্মত হইল। আহত মনোবৃত্তির প্রশমনজন্য নাগরিকগণের অনুকূলে মুসলমান সেনাপতি স্বীকার করিলেন যে রফী ইবিন্ আবদুল্লা পাঁচ শত সৈন্যসহ তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ বাল্‌বেকে অবস্থান করিবেন; তিনি বাহিরে শিবির সন্নিবেশ করিবেন, কিন্তু নগরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। সমস্ত স্থিরীকৃত হইলে আবুওবীদা অন্যদিকে যাত্রা করিলেন।

রফীর সৈন্যগণ বাল্‌বেক-বাসীদিগের সহিত অল্পদিন মধ্যে প্রণয় স্থাপন করিল। তাহারা চতুর্দ্দিকস্থ স্থান সমুদয় লুণ্ঠন করিয়া লুণ্ঠিতদ্রব্য সকল অল্পমূল্যে নাগরিকগণের নিকট বিক্রয় করিতে লাগিল। এইরূপে স্বদেশীয় গণের সম্পত্তি দ্বারা বাল্‌বেকের লোক সমুদয় অল্পদিন মধ্যে বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিল। শাসনকর্ত্তা হার্ব্বিশ ও সেই লাভের অংশ লইতে লোলুপ হইলেন। তিনি নগরবাসিগণকে স্মরণ করিয়া দিলেন তাহাদের রক্ষার জন্য কত অর্থ আপন ধনাগার হইতে প্রদান এবং কিরূপে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। নাগরিকগণ এই লাভ-জনক বাণিজ্যের দশমাংশ তাঁহাকে প্রদান করিতে অগত্যা সম্মত হইল। যে পর্য্যন্ত তাঁহার আপন ধনাগার হইতে প্রদত্ত সমস্ত আদায় নাহয় সে পর্য্যন্ত এই নিয়ম চলিবে স্থির রহিল। কিন্তু হার্ব্বিশ লাভ দেখিয়া অধিক পাইতে লোলুপ হইয়া বলিলেন তাঁহাকে এক চতুর্থাংশ দিলে অল্পদিনে সমস্ত পরিশোধ হইতে পারিবে। তাহারা তাঁহার অর্থ লিপ্সায় ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হত্যা করিল। অনন্তর বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। রফী আপন শিবির হইতে শুনিতে পাইলেন। নাগরিকগণ কয়েকজন একত্র হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিল, এবং নগরে প্রবেশ করিয়া শাসন ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। প্রধান সেনাপতির অনুমতি ব্যতীত নগরে প্রবেশ করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিয়া অবুওবীদার নিকট পত্র লিখিলেন এবং তাঁহার অনুমতি ক্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। এইরূপে হিজিরা ১৫ সনে খৃষ্টীয় ৬০৬ অব্দের ২০শে জানুয়ারি সুবিখ্যাত বাল্‌বেক নগরী মুশলমানদিগের শাসনাধীন হইল।

এদিকে ইমিসা নগরীর সহিত যে এক বৎসরের জন্য সন্ধি সংস্থাপিত ছিল তাহা অতীত হওয়াতে আবুওবীদা সেখানে উপ-

স্থিত হইয়া অধিবাসিদিগকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া আহ্বান করিলেনঃ—

“পরম কারুণিক পরমেশ্বরের আদেশ ক্রমে আবুওবীদা ইবিন্ অল্‌জিরা মুসলমানগণের অধিনায়ক ওমার আল্‌খাতাবের সৈন্যাধ্যক্ষ হইতে ইমিসার অধিবাসিগণ সমীপে। তোমরা প্রাচীরের উচ্চতা, দুর্গের দৃঢ়তা, শারীরিক সবলতার প্রতি নির্ভর করিয়া ভ্রম নিপতিত হইওনা। আল্লা তাঁহার ভৃত্যগণ দ্বারা দৃঢ়তর রক্ষিত স্থান সমূহ জয় করিয়াছেন। আমাদের শিবির মধ্যে এক পাত্র খাদ্য রাখিয়া দিলে সৈন্যদল তাহা যেরূপ চক্ষে দৃষ্টিপাত করিবে, তোমাদের নগরী তদপেক্ষা কোন অংশেই অধিক গণনীয় নহে। আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি তোমরা আমাদের পবিত্র ধর্ম্ম অবলম্বন কর। ঈশ্বর প্রেরিত মহম্মদ যে সমস্ত ঐশ্বরিক বিধি জ্ঞাত হইয়াছিলেন তাহা গ্রহণ কর। আমরা তোমাদিগকে দীক্ষিত করণার্থ ধার্ম্মিক লোক তোমাদের নিকট প্রেরণ করিব। তোমরা আমাদের সমস্ত সম্পদের অংশ লইতে পারিবে। যদি তাহা অস্বীকার কর, তথাপি বাৎসরিক কর দানে অঙ্গীকার করিলে তোমাদের সমস্ত সম্পত্তি তোমাদের হস্তেই রহিবে। যদি এ উভয় প্রস্তাবেই অসম্মত হও তবে তোমাদের প্রস্তর-প্রাচীরাভ্যন্তরাল হইতে বাহির হও, আল্লা সমস্ত মীমাংসা করিবেন।”

এই পত্র নাগরিকগণ অবজ্ঞা করিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। দুর্গবাসিগণ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া অবরোদ্ধাগণকে এমনই বেগে আক্রমণ করিল যে রজনীর আগমনে যুদ্ধের বিরতি হওয়াতে তাহারা সৌভাগ্য মনে করিল। প্রদোষ সময়ে একজন সুচতুর আরব আবুওবীদার নিকট উপস্থিত হইয়া নগরীর দৃঢ়তা, সৈন্যগণের সাহসিকতা এবং দুর্গ মধ্যে দীর্ঘকালের অবরোধ সহ্য করিবার উপযুক্ত সম্বল থাকা প্রভৃতি বিষয় বিজ্ঞাপন করিল। সে এক কৌশল অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিল। প্রধান সেনাপতি তাহা গ্রহণ করিলেন। নগরে একজন দূত পাঠাইয়া নাগরিকগণকে জানাইলেন যে যদি তাহারা পাঁচদিবসের খাদ্য দানে স্বীকারহয়, তবে তিনি তাঁহার শিবির লইয়া অন্য স্থান আক্রমণে যাত্রা করিতে পারেন। আবুওবীদা বলিলেন তিনি ব্যবধানে গমন করিবেন, মাত্র পাঁচ দিবসের খাদ্যে কুলন হইবে না। তিনি নগরবাসিগণের নিকট পাঁচদিবসের খাদ্যোপযোগী বস্তু লইয়া ক্রমে আরও ক্রয় করা আরম্ভ করিলেন। এইরূপ ক্রমে নাগরিকগণের সমস্ত সম্বল নিঃশেষ হইল। অন্যান্য নগরের গুপ্তচরগণ দেখিতে পাইল যে, ইমিসাবাসিরা তাহাদের তোরণ উন্মুক্ত করিয়া দ্রব্য সামগ্রী মুসলমান শিবিরে আনিতেছে সুতরাং তাহাদের সকলেরই ধারণা হইল যে ইমিসা শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে। এই জনরব দেশ ব্যাপ্ত হইল।

আবুওবীদা আপন প্রতিজ্ঞানুসারে অন্যান্য স্থানের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। প্রথমে আরস্থান নামক দৃঢ় নির্ম্মিত সম্বল পরিপূর্ণ নগরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ঘোষিত এবং অগ্রাহ্য হইল। অনন্তর সেনাপতি প্রার্থনা করিলেন

যে তাঁহার ভারীবস্তুপূর্ণ বিশটি বাক্স নগর মধ্যে রক্ষিত হউক, ঐসমস্ত লইয়া গমন নিতান্ত কঠিন। এত সহজে শত্রুগণ আক্রমণ পরিত্যাগ করিয়া যাইবে দেখিয়া নগরবাসিগণ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল, এবং তালাবদ্ধ বাক্সগুলি দুর্গমধ্যে লইয়া গেল। প্রত্যেক বাক্সে এক একজন অস্ত্রধারী বীর লুকায়িত ছিল। বাক্সের নিম্নভাগ দিয়া বাহির হওয়ার সুযোগও ছিল। ঐসমস্ত বীরগণ মধ্যে খ্যাতনামা দিরার, আবদুলরহমান এবং আবদুল্লা ইবিন্ জাফর ছিল। খালেদ ইহাঁদের সহিত এক যোগে কার্য্য করার জন্য কতকগুলি সৈন্য লইয়া গোপনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মুসলমান সৈন্য প্রস্থান করিল। খৃষ্টিয়ানগণ এইরূপে নিষ্কৃতি লাভ করাতে ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতাসূচক উপাসনার জন্য উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করিল। তাহাদের উল্লাসধ্বনি দিরার এবং আবদুলরহমানের কর্ণগোচর হইল। তখন তাঁহারা সিন্দুক হইতে বাহির হইলেন, শাসনকর্ত্তার স্ত্রীকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তোরণ গুলির চাবি গ্রহণ করিলেন; আবদুল্লা চৌদ্দজন সঙ্গী সহকারে উপাসনা মন্দির সমীপে উপস্থিত হইয়া বাহির হইতে মন্দির দ্বার রোধ করিলেন। দিরার সঙ্গীর চারিজন সহকারে তোরণ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়াতে খালেদ সসৈন্যে নগরে প্রবেশ করিলেন, নগর অধিকৃত হইতে অধিক শোণিত পাত হইল না।

অনন্তর সেইজার নগরী আক্রান্ত হইল, এবং অনুকূল নিয়মে সন্ধি বন্ধন পূর্ব্বক নিষ্কৃতি লাভ করিল। তখন আবুওবীদা পুনরায় ইমিসার সমীপে উপস্থিত হইয়া নগর সমর্পণ করিতে বলিলেন। শাসনকর্ত্তা উচ্চৈঃস্বরে প্রতিবাদ করিয়া মুসলমান সেনাপতিকে তাঁহার সন্ধির বিষয় স্মরণ করাইয়া দিল, তিনি যে ইমিসা হইতে প্রস্থান করিয়া অন্যান্য স্থানের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন প্রতিশ্রুত ছিলেন তাহাও জ্ঞাত করা হইল। আবুওবীদা বলিলেন "আমি প্রস্থান অঙ্গীকার করিয়াছিলাম সত্য কিন্তু আমি ফিরিয়া আসিবনা এরূপ প্রতিজ্ঞা করি নাই। আমি অন্যান্য স্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আরস্থান এবং সেইজার অধিকার করিয়াছি।"

ইমিসাবাসিগণ দেখিতে পাইল তাহারা কিরূপ প্রতারিত হইয়াছে। তাহারা নিঃসম্বল হইয়াছে, এক্ষণে অবরুদ্ধ হইলে কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে সে উপায় নাই। তথাপি বিপক্ষগণকে যুদ্ধে স্পর্দ্ধা করিতে শাসন কর্ত্তা ত্রুটি করিলেন না। সৈন্যগণ উপাসনান্তে সমরে প্রস্তুত হইল। শাসনকর্ত্তা স্বয়ং সেণ্ট জর্জ্জের উপাসনা মন্দিরে রীতিমত শপথ করিলেন। তিনি সাহস বৃদ্ধি জন্য অপকৃষ্ট উপায় অবলম্বনে ইতস্ততঃ করিলেন না। সমস্ত রজনী মদ্যপান করিলেন, একটি মেষ শাবক একাকী খাইয়া ফেলিলেন। প্রভাতে পাঁচসহস্র সুসজ্জিত সাহসী সবল অশ্বসহ বাহির হইলেন। তাহারা আক্রমণকারিদিগকে এত সাহসের সহিত আক্রমণ করিল এবং প্রাচীরস্থ তীরন্দাজগণ এরূপ শায়ক চালাইতে লাগিল যে মুসলমান সৈন্য পশ্চাৎ পাদ হইতে বাধ্য হইল।

অনন্তর খালেদ সমস্ত সৈন্যের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। সৈন্য গণকে পুনরায় একত্র করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে তিনি বর্ণনাতীত রণকৌশল, সাহস এবং অধ্যবসায় প্রদর্শন করিলেন। একজন গ্রীক-অশ্বারোহি-সহ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তাঁহার অসি ভগ্ন হইল, তিনি নিরস্ত্র হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই প্রতিপক্ষের নিকটস্থ হইয়া তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে টানিয়া লইয়া, তাহাকে দুইহস্তে জড়াইয়া ধরিলেন, এবং এত বলে পেষণ করিলেন যে তাহার পঞ্জর ভগ্ন হইল. মৃতাবস্থায় তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। তখন যুদ্ধের তাদৃশ ভীষণাবস্থা এবং আসন্ন বিপদ মুসলমান গণের উন্মত্ত পরাক্রম জাগরিত করিল। উৎসাহ অধ্যবসায় যখন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, তখন ইক্‌রিমা নামক খালেদের একটি খুল্লতাত ভ্রাতা রঙ্গভূমিতে ইতস্ততঃ অশ্বচালনা করিয়া নির্ভীক ঝটিকার ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিল; এবং যাহারা যুদ্ধে মৃত হইবে তাহারা অনন্ত সুখসম্ভোগে স্বর্গে বিচরণ করিবে উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিল। সে বলিল, ‘আমি দেখিতেছি, ঐ কজ্জলনয়না অপ্সরী গণ বিরাজ করিতেছে। পৃথিবীতে ঐরূপ সুন্দরী উপস্থিত হইলে সমস্ত পৃথিবী প্রেমোন্মত্ত হইবে। তাহারা আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। একজন একহস্তে একখান সবুজবর্ণ রুমাল আন্দোলন করিতেছে, অন্য হস্তে রত্ন বিনির্ম্মিত পান পাত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সে আমার দিকে চাহিয়া বলিতেছে প্রিয়তম! শীঘ্র এখানে চলিয়া আইস; আমাকে সঙ্কেত করিতেছে।’ এইরূপে ‘আল্‌জিনা, আলজিনা, স্বর্গ, স্বর্গ’ বলিতে বলিতে খৃষ্টিয়ান গণের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ভয়ানক হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিল। অবশেষে যে স্থানে শাসনকর্ত্তা যুদ্ধ করিতে ছিলেন সেই স্থানে উপস্থিত হইবা মাত্র তাঁহার হস্ত-নিক্ষিপ্ত বল্লমে বিদীর্ণ-হৃদয় ও মৃত হইল। তাহার স্বর্গ চিন্তা ফুরাইল। রজনী সমাগত হইলে উভয় সৈন্য যুদ্ধে বিরত হইল। মুসলমানগণ সেই ভীষণ যুদ্ধের পর বিশ্রাম লাভজন্য আগ্রহের সহিত বস্ত্রগৃহে প্রবেশ করিল। অন্যের ত কথাই নাই, পরদিনের যুদ্ধ সম্বন্ধে কোনরূপ কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক কুট যুদ্ধ করিতে খালেদ ও আবুওবীদাকে পরামর্শ দিলেন। গ্রীকগণ শ্রেণীবদ্ধ হইলে নিতান্ত দুর্ভেদ্য হয় এজন্য তাহাদিগকে শ্রেণীভঙ্গ ও উচ্ছৃঙ্খল করিতে সচেষ্ট রহিলেন।

সুতরাং প্রত্যুষে মুসলমানগণ পলায়ন করিল। প্রথমতঃ শ্রেণী ক্রমে যাইতে লাগিল, ক্রমে শ্রেণী ভঙ্গ হইয়া চলিল। আরবগণ শ্রেণী ভঙ্গ হইলেও নিমেষ মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারে এ তাহাদের অদ্ভুত শিক্ষা। খৃষ্টিয়ানগণ পলায়ন প্রকৃত পলায়ন জ্ঞানে শ্রেণীভঙ্গ হইয়া তাহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল; কেহ সমস্ত সৈন্য ছাড়িয়া অনেক পূর্ব্বে গেল, কেহ কেহ মুসলমান শিবিরলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল।

তখন মুসলমানগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া খৃষ্টিয়ানদিগকে বেষ্টন করিল। আরবীয় ইতিহাস লেখক লিখিয়াছেন ‘উৎক্রোশ পক্ষী সকল মৃত শরীরের উপর যেরূপে অবতরণ করে তাহারা সেই রূপে খৃষ্টিয়ান

সৈন্যোপরি পতিত হইল। খালেদ, দিরার এবং অন্যান্য সৈনিকগণ 'আল্লা আকবর' নাদে মুসলমান দিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। খৃষ্টিয়ানগণের ভীষণ পরাজয় এবং ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড সমাহিত হইল। রণক্ষেত্রে ষোলশত খৃষ্টিয়ান চিরদিনের জন্য নিদ্রিত হইল। তন্মধ্যে শাসনকর্ত্তার শরীর, স্থূলতা, মূল্যবান পরিচ্ছদ এবং মাংসল মুখ দৃষ্টে পরিচিত হইল। সুগন্ধি দ্রব্যে তাঁহার সমস্ত বসন সুবাসিত ছিল।

যুদ্ধান্তে ইমিসা নগরী মুসলমান হস্তে পতিত হইল। কিন্তু তাঁহারা নগরী অধিকার করিতে অথবা রক্ষার্থ নগর মধ্যে সৈন্য রক্ষা করিতে পারিল না। কারণ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত অগণ্য গ্রীকসৈন্য এবং মরুবাসী সামান্য সজ্জিত বহুসংখ্যক সৈন্য তাহাদিগকে একবারে বিনাশ করিতে আসিতেছে এইরূপ সংবাদ পাইল। এই গোলযোগ ও ভয়ের সময়ে নানারূপ এবং পরস্পর বিরুদ্ধ প্রস্তাব হইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল যে স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য; বিপক্ষ সৈন্য অনুসরণ করিয়া সেখানে আহার ও পাইবে না। কিন্তু আবুওবীদা বলিলেন এরূপ কার্য্য ভয়জন্য পলায়ন বলিয়া সকলে ব্যাখ্যা করিবে। অন্যান্যে সুশোভন বাসগৃহ, সুরম্য উদ্যান উর্ব্বরক্ষেত্র, সবুজ মণ্ডিত স্থান নিচয় এই মাত্র জয় করিয়া, দুর্ভিক্ষ এবং মরুভূমিতে প্রত্যাগমন করা অপেক্ষা বিজিত রাজ্যে অবস্থান পূর্ব্বক যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিল। খালেদ্ এই তর্কের মীমাংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'একণে আর অপেক্ষা করা উচিত নয়, সম্রাট তনয় কনষ্ট্যান্টাইন্ অনতি দূরে ছিসারিয়ায় চল্লিশ সহস্র সৈন্যসহ উপস্থিত হইয়াছেন।' সুতরাং তিনি উপদেশ করিলেন যে পালস্তিন এবং আরবের সীমান্তর্ব্বর্ত্তী যার্মূকে অবস্থান করিলে খলিফা সত্বর সাহায্য পাঠাইতে পারেন, এবং সম্রাট্ সৈন্যের আক্রমণে কোন অনিষ্ট হইবে না এরূপ ও প্রত্যাশা করা যায়। খালেদের উপদেশ গৃহীত হইল।

শিক্ষা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভাষাশিক্ষা।

ভাষাশিক্ষা কালে শব্দ সকলের প্রকৃত অর্থ ও উহাদিগের প্রকৃত প্রয়োগের নিয়ম সকল বিশেষ রূপ অবগত হওয়া আবশ্যক। শুদ্ধ শব্দ সকলের প্রতিবাক্য বা চলিত অর্থ অভ্যাস করিলে শিক্ষার কোন ফল দর্শে না; এবং এইরূপ শিক্ষিত হইলে কোন

ব্যক্তি সুলেখক বা সুবক্তা হইতে পারেন না। যে ব্যক্তি আশ্চর্য্য ও অলৌকিক এই দুই শব্দের একরূপ অর্থ বলিয়া জানেন, অথচ উহাদিগের পরস্পর ব্যুৎপত্তির প্রভেদ কিছু মাত্র জ্ঞাত নহেন, তিনি হয় ত এরূপ লিখিতে পারেন 'বাষ্পের অলৌকিক শক্তি'। অলৌকিক শব্দের এরূপ অস্বাভাবিক প্রয়োগ করিতে দেখিলে পণ্ডিতগণের নিকট তিনি কখনই শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত বা তাঁহাদিগের শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন না।

শব্দের অর্থ দুই প্রকার—ধাত্বর্থ ও সহযোগার্থ। শব্দ সকল সচরাচর ধাত্বর্থে বা ব্যুৎপত্তি অর্থে পরিচিত হইয়া থাকে। এতদ্‌ভিন্ন দুই বা তিনটি শব্দের সহযোগে যে অর্থ হয় তাহাকে সমাস বা সহযোগার্থ বলি। প্রথমতঃ ধাত্বর্থের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি শব্দ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

দিহ ধাতু (একত্র করা) + ঘঞ = দেহ। রক্ত মাংস, অস্থি প্রভৃতির সহযোগে দেহ।

রচ ধাতু (সৃষ্টি করা) + যুচ্ = রচনা। ঈশ্বরের সৃষ্টিকে রচনা বলিতে পারি। কোন ব্যক্তির স্বকল্প প্রবন্ধ ও রচনা।

লু ধাতু (কর্ত্তন করা) + হ = লৌহ অর্থাৎ যে ধাতুর দ্বারা আমরা কাটিবার অস্ত্র নির্ম্মাণ করি।

সহযোগার্থ।

গতবিভব—গত হইয়াছে বিভব যাহার অর্থাৎ দরিদ্র।

ধারাধর—জলধারা ধারণ করে যাহা অর্থাৎ মেঘ।

মেঘসুহৃদ—মেঘাগমে যাহারা আনন্দ প্রকাশ করে অর্থাৎ ময়ূর।

শব্দ সকলের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ স্পষ্টরূপ না বুঝিলে উহাদিগের যথার্থ প্রয়োগ কখনই ঘটে না, ইহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দর্শান হইয়াছে। তথাচ এস্থলে আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। রাত্রি শব্দের অনেকগুলি প্রতিবাক্য আছে, তন্মধ্যে বিভাবরী একটি প্রতিবাক্য। কিন্তু বিভাবরী শব্দে কিরূপ রাত্রি বুঝায় তাহা প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক। ব্যুৎপত্তি গত অর্থে আলোকময়ী অথবা চন্দ্রতারকা-শোভিতা রজনীকে বিভাবরী বলা যায়। নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন তামসী নিশিকে বিভাবরী বলা যাইতে পারে না। কবিবর কালিদাস উহার যথার্থ প্রয়োগ করিয়াছেন।

* * * * * *

"বদ্ধ প্রদোষে স্ফুট চন্দ্র তারকা
বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে।"

লেখক ও পাঠক উভয়েই সুপণ্ডিত না হইলে ভাষার উৎকর্ষ সাধন হয় না। আমরা সচরাচর বাঙ্গালা পুস্তকে শব্দ সকলের অন্যায় প্রয়োগ দেখিয়া দুঃখিত হই।

মনের ভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শব্দ সকলের যোজনা আবশ্যক। ইহাতেই লেখকের বিদ্যা, বুদ্ধি, রুচি ও কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিষয় ভেদে ভাষার প্রভেদ হয়, যথা কোন কৌতুকজনক বা ব্যঙ্গ-পরিজ্ঞাপক বিষয়ে আমরা যে ভাষায় সর্ব্বদা কথা কহি সেই ভাষাই লেখা আবশ্যক। ইহাতে গ্রাম্য শব্দের আধিক্য থাকিলেও কোন দোষ হয় না; বরং হাস্য রসের সহায়তা করে। কোন গভীর চিন্তা বা নীতিপূর্ণ বিষয় ঐরূপ ভাষায় লিখিত হইলে, প্রস্তা-

বের বিজ্ঞতা, সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষের লোপ হয়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে দুই প্রকার রচনাই নিয়োজিত হইল।

'বিদ্যাটা কি? পাঁচ জনে পাঁচ কথা লিখে গিয়েছে তাই মনে করে রাখ্‌লিই বিদ্যা—তা আমার কি হয় নি? ধরুক্‌ না আমি আরব্য উপন্যাসের যত গল্প আছে সকল গুলা এক এক করে গল্প করে বলে যাব অথন্‌—এই কথা যদি মাষ্টারের সাক্ষেতে বলি, তাহলে ক্যাঁক্‌ ক্যাঁক্‌ করে কত কথা বল্‌বে, শুন্‌লে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাবে। যাক্‌ যে কটা দিন পাপের ভোগ আছে ভুগুন্‌, আমিও ভুগি।'

'সদ্বংশে জন্মিলে যে সৎ ও বিনীত হয় একথা অগ্রাহ্য। উর্ব্বরা ভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না? চন্দন কাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয় উহার কি দাহ-শক্তি থাকে না? ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল হয় না। দিবাকরের কিরণ কি স্ফটিকমণির ন্যায় মৃৎপিণ্ডে প্রতিফলিত হইতে পারে?'

একস্থলে দুই প্রকার ভাষা পরিহার্য্য; যথা, রাম সৈকতময় শয্যায় উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। বিমল নৈশ গগণে তারকা রাজি ফুট্‌ ফুট্‌ করচে। বিমলা আগুল্‌ফলম্বিত কেশরাশি চিরুণী দিয়ে আঁচ্‌ড়াচ্চেন।

সুন্দর দেহের শোভা বৃদ্ধির জন্য যেরূপ অলঙ্কার ব্যবহার হয়, ভাষার মাধুরী সংবর্দ্ধনার্থ অনুপ্রাস বা উপমা প্রভৃতি যে যে উপায় দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্য সাধন হয়, তাহাকে ভাষার অলঙ্কার কহা যায়; যথা,

(১) 'কে সরে কেশব বিনা সবে শব লো।'

(২) হেন মণিময় আশা সহসা ক্ষার হইল।

দেহের ন্যায় ভাষার প্রকৃতি গত মাধুরী না থাকিলে অলঙ্কার শোভাজনক হয় না, বরং উপহাসের বিষয় হয়। লেখক আপন শরীরের ন্যায় আপন রচনার পক্ষপাতী সর্ব্বদাই হইয়া থাকেন এটি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। দর্পণ বা সমালোচনে উক্ত পক্ষপাতিতার কিছু মাত্র হ্রাস সম্পাদন করে না, বরং আত্মবিশ্বাসসিদ্ধ সৌন্দর্য্যের পোষকতা করত তাঁহাকে উপহাসের স্থল করিয়া তুলে। এইরূপ আত্মাভিমান-রূপ মোহ ও পরিণামে সাধারণের উপহাস স্থল হইতে রক্ষা পাইবার সত্যপ্রিয়তাই একমাত্র উপায়। এই সত্যপ্রিয়তা বাল্যকাল হইতে শিক্ষা না করিলে যে কোন সময়ে সহসা শিক্ষা করা নিতান্ত দুরূহ।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ভাষার প্রকৃতি-গত মাধুরী না থাকিলে অলঙ্কার শোভাজনক হয় না, এক্ষণে কহা যাইতেছে যে পদ সকলের আকৃতি অনুসারে অলঙ্কারের আধিক্য বা অল্পতার আবশ্যক। যে ভাষা অতি সরল ও প্রাঞ্জল তাহার স্থানে স্থানে দুই একটি অনুপ্রাস বা উপমা আবশ্যক, যথা।

'ক্রমে ক্রমে শশধর আকাশ মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সুধা-সলিলের ন্যায় চন্দন রসের ন্যায় জ্যোৎস্না বিস্তার করিলে ভূমণ্ডল কৌমুদীময় হইয়া শ্বেতবর্ণ দ্বীপের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কুমুদিনী বিকসিত হইল মধুকর মধুলোভে তথায় বসিতে লাগিল। নানাবিধ কুসুমরেণু হরণ করিয়া সুগন্ধ গন্ধবহ দক্ষিণদিক্‌ হইতে মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল কোকিলের কলরবে চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইল

পক্ষান্তরে রচনা গম্ভীর, পদ সকলের দীর্ঘ বিন্যাস ও শব্দ সকল কঠিন হইলে পূর্ব্বের ন্যায় অল্প অলঙ্কারে শোভা হয় না, যথা ;—

“ সাধুবিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া সুখাভিলাষ কি ? পরিণাম-বিরস বিষয়-ভোগে যাহারা সুখ প্রাপ্তির আশা করে, ধর্ম্মবুদ্ধিতে বিষ-লতা বনে তাহাদিগের জল-সেক করা হয়, তাহারা কুবলয় মালা বলিয়া অসিলতা গলে দেয়, মহারত্ন বলিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শ করে, মৃণাল বলিয়া মত্ত হস্তীর দন্ত উৎপাটন করিতে যায়, রজ্জু বলিয়া কালসর্প ধরে ! দিবাকরের ন্যায় জ্যোতিঃ ধারণ করিয়াও খদ্যোতের ন্যায় আপনাকে দেখিতেছ কেন ? সাগরের ন্যায় গম্ভীর স্বভাব হইয়াও উন্মার্গপ্রস্থিত উদ্বেল নিস্রব স্রোতের সংযম করিতেছ না কেন ?”

কবিরা উপমাভিন্ন স্বভাবে কল্পনা প্রয়োগ আবশ্যক মত করিয়া থাকেন, তাহাতে রচনার মধুরতা ও ঈপ্সিত রস উদ্ভাবনের বিশেষ আনুকূল্য করে যথা।

“ এ নহে শ্রীবৃন্দাবন,
এ কোন শূন্য কানন,
কোথা ধেনু বৎস, কোথায় সখার সখা রাখালগণ।
যমুনা কর্দ্দম পূর্ণ,
সরোজিনী রস শূন্য,
ভ্রমর ভ্রমরী ভিন্ন, বায়ু গন্ধহীন ॥
সর্ব্বদা সে নিত্যধামে,
বেণু বাজে রাধা নামে,
এ কোথায় আইলাম ভ্রমে, নাহি দেখি কোন চিহ্ন।
সে অতি পবিত্র স্থান,
জীব জন্তু সুখপূর্ণ,
হরিণের সঙ্গে কেন, হরিণী করে রোদন ॥ ”

বৃন্দাবন হয়ত জনশূন্য কানন হয় নাই, ধেনু বৎসগণ পূর্ব্বের ন্যায় মাঠে চরিতেছে, যমুনাও পূর্ব্বের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে, সরোবরে কমলও ফুটিতেছে, জীবজন্তুগণ হয়ত পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক সুখী, কিন্তু রচয়িতা যাহার উদ্দেশে উক্ত আক্ষেপোক্তি রচনা করিয়াছেন, তিনি অবস্থান্তর হওয়াতে পূর্ব্বের সুখ ও স্বভাবের মাধুরী কিছুই উপলব্ধি করিতেছেন না। তিনি যেরূপ দেখিতেছেন কবি সেইরূপেই লিখিয়াছেন।

জীর্ণোদ্ধার।

বায়ুমণ্ডল।

আজ্ হইতে আমরা প্রস্তাবশীর্ষে “ জীর্ণোদ্ধার ” মুকুটার্পণ করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিব। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ঋষিদিগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অনুসন্ধান করাই “ জীর্ণোদ্ধার ” শীর্ষক প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। পুরাতন ঋষিদিগের সলিল-সম্বন্ধীয় জ্ঞান কতদূর বিস্তৃত, তাহা গত তৃতীয় বৎসরের বান্ধবে প্রকাশিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান বৎ-

সরে তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের বায়ুমণ্ডল বিষয়ক জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত উদাহরণ ও সার সঙ্কলন করিয়া দেখাইব।

"তস্মাদ্বা এতস্মাৎ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ।" পুরাতন ঋষিরা সকলেই ঈশ্বর ভক্ত ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা বায়ুকে ঈশ্বর সৃষ্ট বলিয়া প্রথিত করিয়া গিয়াছেন। এতন্মতে বায়ু দ্বিতীয়ভূত। সুতরাং ইহা শব্দ ও স্পর্শ এই উভয় গুণ যুক্ত। শব্দও বায়ুর গুণ, স্পর্শও বায়ুর গুণ, (অগ্নি প্রভৃতির গুণও বটে)।

এই বায়ু সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে বহুপ্রকার অবস্থান্বিত করিয়া শাস্ত্রে বিবেচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে স্থূল বায়ুই আমাদের স্বাচ-প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। "বায়ু স্কন্ধো দশ যোজনানি" বায়ু পৃথিবীর সকল পার্শ্বেই দশ যোজন দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকিয়া স্থির ও চর সকল প্রাণীরই উপকার সাধন করিতেছে। দশ যোজন অর্থাৎ ৪০ ক্রোশ পর্য্যন্ত যে বায়ুর ব্যাপ্তি আছে, ইহা যে ঋষিদিগের কোন্ প্রমাণ-লব্ধ সিদ্ধান্ত তাহা স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইবে।

বায়ু-পদার্থকে আমরা সর্ব্বদাই গমন করিতে দেখি, পরন্তু ইহা জড়স্বভাব প্রযুক্ত স্বয়ং গতিশক্তি সম্পন্ন নহে। অন্যান্য জড় পদার্থ যেমন পরস্পরের সাহায্যে গতিশক্তিসম্পন্ন হয়, বায়ুও সেইরূপ চন্দ্র সূর্য্যাদির আকর্ষণ বা পদার্থান্তরের বিলোড়ন দ্বারা আন্দোলিত হইয়া গমনাগমন-সামর্থ্য লাভ করে। যেরূপ নিয়ম দ্বারা অন্য তরল পদার্থ পরিচালিত হয়, বায়ুও সেইরূপ নিয়মে পরিচালিত হইয়া থাকে। "তরলতা নহি কিং সদাগতৌ ?" বায়ুতে তরল গুণ নাই ? অবশ্যই আছে। অতএব আধুনিক দ্বৈপায়ন পণ্ডিতদিগের ন্যায় বৃদ্ধ ঋষিরাও বায়ুকে তরল পদার্থ বলিয়া নির্ণয় করিতেন। তরল পদার্থের এক প্রধান ধর্ম্ম আছে যে তাহার সর্ব্বত্রই সমোচ্চ থাকে। সর্ব্বত্র সমোচ্চ থাকাই যখন তরল পদার্থের স্বভাব, তখন বায়ুরও সর্ব্বত্র সমোচ্চ থাকা স্বভাব, ইহা স্বীকার করা হইল। বিনা হেতুতে সমোচ্চতার হানি অর্থাৎ এক অংশ উচ্চ ও এক অংশ নিম্ন হয় না। যখন কোন হেতু বশতঃ তাহার সমোচ্চতার হানি হয় তখনই তাহা আন্দোলিত হইয়া পুনশ্চ স্বাভাবিক সমোচ্চতা রক্ষা করিতে উন্মুখ হয়।

দ্রব্য মাত্রের অন্য একটি স্বভাব আছে যে তাহারা উষ্মতা দ্বারা স্ফীত এবং শীতলতা দ্বারা সঙ্কুচিত হয়। মৃদু, কঠিন, স্থূল, সূক্ষ্ম, সমুদায় পদার্থই এই নিয়মের অধীন, সুতরাং লৌহ পদার্থ মহাকঠিন হইলেও তাহার যে খণ্ড শীতকালে অন্যুনাতিরিক্ত অর্থাৎ ঠিক এক হস্ত থাকে—গ্রীষ্মকালে আবার সেই খণ্ডই তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়। এই তর্কসিদ্ধ সিদ্ধান্তের ফল বিশেষরূপ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইবার বিষয় থাকিবেক না।

কঠিন পদার্থাপেক্ষা তরল পদার্থ সকল উত্তাপ দ্বারা অতি শীঘ্র ও অতিশয়িত রূপে স্ফীত হইয়া থাকে। সুতরাং বায়ু পদার্থও উষ্মতা দ্বারা অত্যন্ত স্ফীততা লাভ করে। পৃথিবীর যে ভাগের ঠিক উপরে সূর্য্য মণ্ডল থাকেন, সেই ভাগের বায়ু, রৌদ্রের উত্তাপ দ্বারা স্ফীততা প্রাপ্ত হইয়া 'লঘুত্বানুগমন

স্বভাবঃ' লঘুত্ব-হেতু উর্দ্ধগমন আরম্ভ করে। সুতরাং এই অবস্থায় তাহার বিপরীত ভাগের বায়ু অতিবেগে আগমন পুর্ব্বক বায়ু-সমুদ্রের সর্ব্বত্র সমোচ্চতা রক্ষা করিবার চেষ্টা পায়। সূর্য্যের যখন দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়, তখন সূর্য্য, পৃথিবীর দক্ষিণ ভাগের ঠিক উপরে থাকেন। সুতরাং তৎকালে রৌদ্র'দ্বারা উক্ত ভাগের বায়ুরাশি স্ফীততা প্রাপ্ত হইয়া উদ্গমন আরম্ভ করিলে, উত্তর ভাগের শীতল বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণভাগকে পূরণ করিতে থাকে। এইরূপ, আদিত্যদেব যখন উত্তরায়ণ অর্থাৎ উত্তরভাগের ঠিক উর্দ্ধে বাস করেন, তখনও উক্ত নিয়মে অর্থাৎ উত্তর দিকস্থ বায়ু সূর্য্য কিরণের তেজে উদ্গত হইবার চেষ্টা করিলে দক্ষিণদিগের বায়ু আসিয়া উত্তর ভাগকে পূরণ করিবার চেষ্টা পায়। এইরূপ কারণেই শীতকালে উত্তরীয় বায়ু এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর মধ্যে সুমেরু ও কুমেরু প্রদেশ অত্যন্ত শীতল। তদপেক্ষা নিরক্ষবৃত্তের সমীপ পর্য্যন্ত ক্রমিক সমুদায় দেশই উষ্ণ। সেই জন্যই নিরক্ষ মণ্ডলস্থ বায়ু সূর্য্যরশ্মিদ্বারা স্ফীত ও প্রসারিত হইয়া উর্দ্ধাভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে। সুতরাং সুমেরু ও কুমেরু প্রদেশের শীতল বায়ু তথায় অতিবেগে আগমন পূর্ব্বক শূন্য স্থান পরিপূরিত করিতে থাকে। নিরক্ষবৃত্ত হইতে যে বায়ু আদিত্য তেজে স্ফীত ও প্রসারিত হইয়া উদ্গমন করে—সেই বায়ু কিয়দ্দূর উচ্চে উঠিয়া তত্রস্থ শীতল বায়ুর সংস্পর্শে শীতলতা প্রাপ্ত হয়, এবং যে বায়ু সুমেরু ও কুমেরু হইতে নিরক্ষমণ্ডলাভিমুখে প্রবাহিত হয়, তাহার স্থান পরিপূরণ করিবার জন্যই তাহারা সুমেরু ও কুমেরু অভিমুখে আগমন করে। পৃথিবীতে যেমন সুমেরু ও কুমেরু হইতে নিয়ত কাল উক্ত প্রকারের দুই বায়ু নিরক্ষবৃত্তাভিমুখে আগমন করে, সেইরূপ, গগনতলের উপরিভাগেও নিরক্ষবৃত্ত হইতে সুমেরু ও কুমেরু অভিমুখে দুই বায়ু গমন করিয়া থাকে। এই চতুর্বিধ বায়ুর নাম "সদাতন বায়ু"। পুরাতন ঋষিগণ বায়ুর এবংবিধ স্বভাব বা সতত গতি জ্ঞাত ছিলেন বলিয়াই বায়ুকে "সদাগতি" নামে খ্যাত করিয়া গিয়াছেন।

পৃথিবীতে, যে বায়ু সুমেরু প্রদেশ হইতে নিয়ত নিরক্ষবৃত্তাভিমুখে সমাগত হয় তাহার স্বাভাবিকী গতি দক্ষিণাভিমুখী। আর কুমেরু হইতে যে বায়ু সতত নিরক্ষদেশে প্রবাহিত হয়, তাহার স্বাভাবিকী গতি উত্তরাভিমুখী। এই যুক্তি-লভ্য সিদ্ধান্তটি লোকের সহজে হৃৎপ্রত্যয়গ্রাহ্য হয় না। যেহেতু পৃথিবী হইতে এতদ্রূপ প্রতীতির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীস্থ জীবগণ ঐ দুই বায়ুকে ঈশান ও অগ্নি কোণ হইতেই প্রবাহিত বোধ করিয়া থাকে। প্রাচীন আচার্য্য আর্য্যভট্ট ইহার কারণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "বায়ুস্কন্ধোঽপি জীবৈ-রন্যথা জ্ঞায়তে ভুবোগত্যা।" অর্থাৎ বায়ু যে পরিমিত বেগদ্বারা প্রবাহিত হইতে পারে—পৃথিবীর দৈনিক-গতি তদপেক্ষা প্রভূততর বেগশালিনী। সুতরাং, সুমেরু ও কুমেরু হইতে যে বায়ু নিরক্ষাভিমুখে প্রবাহিত হয় তাহার গতি

কোন ক্রমেই সরলা হইতে পারে না। এবং সেই কারণেই নিরক্ষবৃত্তের নিকটস্থ ব্যক্তি, গণ সুমেরু ও কুমেরু হইতে সমাগত উক্ত দ্বিবিধ বায়ু প্রবাহকে ঈশান ও অগ্নি কোন হইতে আগত বোধ করিয়া থাকেন। এই সনাতন বায়ু পোত পরিচালন বিষয়ে বিশেষ সাহায্য প্রদান করে বলিয়া দ্বৈপায়নজাতীয় পণ্ডিত নাবিকেরা ইহাকে 'বাণিজ্য বায়ু' বলিয়া প্রসিদ্ধ করিয়াছে।

তেজোমণ্ডল সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে পৃথিবীর জলভাগাপেক্ষা স্থলভাগ সমধিক উত্তপ্ত হয়। অতএব, পৃথিবীর যে অংশে স্থলভাগ অধিক—সেই অংশ জলভাগাপেক্ষা অধিকতর উষ্ণ। নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণ অপেক্ষা উত্তরাংশে স্থলভাগ অধিক; সুতরাং নিরক্ষবৃত্তের সন্নিহিততর স্থান গুলি সমধিক উষ্ণ না হইয়া তাহার সপ্তাংশ উত্তরে অবস্থিত স্থান গুলিতে উষ্ণতার আধিক্য অনুভূত হইয়া থাকে। এই স্থানের উভয় পার্শ্বে প্রায় ৫ অংশ স্থানের বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উদ্গত হইয়া থাকে এবং সেই উদ্গমন স্থানের পরিপূরণার্থ পূর্ব্বোক্ত 'বাণিজ্য বায়ু' প্রবাহিত হয়। পরন্তু পৃথিবীর গতির দ্বারা (যেমতে পৃথিবীর গতি নাই —সে মতে এরূপ উপপত্তি করা যায় না) তাহার বক্রতা ঘটে বলিয়া ঐ স্থানে তাহা উত্তমরূপ উপলব্ধ হয় না। নিরক্ষ বৃত্তের উপরে ১০ দশ অংশ হইতে ২৫ অংশ পর্য্যন্ত পৃথিবীর উত্তরভাগের বাণিজ্যবায়ু প্রবাহিত হয় ও দক্ষিণভাগের বাণিজ্য বায়ু নিরক্ষ বৃত্তের উত্তরে দ্বিতীয় অংশ হইতে দক্ষিণে ২৩ অংশ পর্য্যন্ত স্থানে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই দুই বায়ু মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বায়ু ঊর্দ্ধ গমন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা পৃথিবী হইতে উত্তমরূপ অনুভূত হয় না।

যদিও বায়ু একই পদার্থ, তথাচ তাহার লক্ষণ ও অবস্থান ক্রিয়া ভেদে শাস্ত্রকারেরা ইহাকে ৪৯ একোন পঞ্চাশৎ সংখ্যায় পরিগণিত করিয়াছেন। সেই একোন পঞ্চাশৎ বায়ু-প্রভেদের নাম এই—একজ্যোতি (১) দ্বিজ্যোতি (২) ত্রিজ্যোতি (৩) জ্যোতি (৪) একশক্র (৫) দ্বিশক্র (৬) ত্রিশক্র (৭) মহাবল (৮) ইন্দ্র (৯) অদৃশ্য (১০) ততঃপতি (১১) সকৃৎপর (১২) মিত (১৩) সম্মিত (১৪) সুমিত (১৫) ঋতজিৎ (১৬) সত্যজিৎ (১৭) সুসেন (১৮) সেনজিৎ (১৯) অন্তিমিত্র (২০) অনমিত্র (২১) পুরুমিত্র (২২) অপরাজিত (২৩) ঋত (২৪) ঋতবহ (২৫) ধর্ত্তা (২৬) ধরণ (২৭) ধ্রুব (২৮) বিষকরণ (২৯) দেবদেব (৩০) ঈদৃক্ষ (৩১) অদৃক্ষ (৩২) ব্রতিন (৩৩) প্রসদৃক্ষ (৩৪) সভর (৩৫) ধাতা (৩৬) দুর্গ (৩৭) ধিতি (৩৮) ভীম (৩৯) অভিযুক্ত (৪০) অপাৎসহ (৪১) দ্যুতি (৪২) অপু (৪৩) অনার্য্য (৪৪) বাস (৪৫) কাম (৪৬) জয় (৪৭) বিরাট (৪৮) ও মিতাশন (৪৯)।

এই একোনপঞ্চাশৎ প্রকার বায়ুর নাম অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে। মাত্র নামগুলি লিখিত আছে, লক্ষণ কি ক্রিয়া, কিছুই লিখিত হয় নাই। যদিও আমরা অন্য কোন গ্রন্থেও এই সকলের বিস্পষ্ট লক্ষণাদি প্রাপ্ত হই নাই, তথাপি বায়ুর এই সকল নাম যে কেবল অনর্থক মনঃকল্পিত তাহা কোন ক্র-

ষেই স্বীকার করিতে পারি না। এবং পু-রাণে ঐ সকল বিষয় রূপকচ্ছলে বর্ণিত থা-কিলেও উক্ত সমুদায়কে একেবারে অগ্রাহ্যও করিতে পারিব না। আধুনিক পদার্থবিদ্যা-বিশারদ দ্বৈপায়ন পুরুষেরা যে বিশেষ বি-শেষ বায়বীয় বস্তুকে "গ্যাস" বলেন, সেই সকল বস্তুই হয় ত আমাদের প্রা-চীন ঋষিদিগের নিকট ৪৯ একোনপঞ্চা-শৎ বায়ুরূপে পরিচিত ছিল। ঋষিদিগের পরিচিত বিশেষ বিশেষ বায়ুই হয়ত এই-রূপ গ্যাস নামে আবিষ্কৃত হইতেছে। নব্য সম্প্রদায়ের অভিমত গ্যাস্ পদার্থ যদিও ঠিক্ উক্ত সংখ্যায় সংখ্যাত নহে, তথাপি, ঐ গ্যাসই যে উক্ত একোন পঞ্চাশৎ বায়ুর অভিধেয়,ইহাতে আমাদের সন্দেহ জন্মে না। তবে যে, গ্যাসের সহিত বায়ুর সংখ্যার ন্যুনাতিরেকতা দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ হয়ত স্থূল সূক্ষ্মভাব। অর্থাৎ কোন পণ্ডিত হয়ত নিজ সূক্ষ্মদর্শিতা অনুসারে উক্ত পদার্থনিচ-য়কে কিছু অধিক সংখ্যায়, কেহ বা স্থূল দৃষ্টিতে ক্রমে তাহাকে অল্প সংখ্যায় পরিগ-ণিত করিয়া গিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে উপ-স্থিত সমন্বয় বিচার স্থগিত রাখিয়া, এক্ষণে বায়ুর অন্য এক স্বভাবের কথা উত্থাপিত করা যাইতেছে।

বায়ুর অন্য এক আশ্চর্য্য স্বভাব এই যে বায়ুর গতিভেদ হইলেই গুণের ভেদ হইবে। আমরা ত্বক্ দ্বারা যে বায়ু সহসা প্রত্যক্ষ করি,সেই বায়ুই বিশেষ বিশেষ দিক্ হইতে প্রবাহিত হইলে বিশেষ বিশেষ গুণযুক্ত হয়, ইহা পুরাতন ঋষিদিগের নির্ণীত। পূর্ব্ব বায়ু অহিতকর কেন? এবিষয়ে অনেকেরই ভ্রম আছে। তাঁহারা মনে করেন যে, পূর্ব্ব দেশ পচা বা জলময়, তথা হইতে আইসে বলিয়া পূর্ব্ব বায়ুতে শরীর শিথিল করে। বস্তুতঃ ইহা ভ্রম। গতি অনুসারেই বায়ুতে ভিন্নভিন্ন গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন্-দিকের বায়ু কিরূপ গুণবিশিষ্ট তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

দক্ষিণ বায়ু।

"দাক্ষিণ্যমারুতোবলাশ্চাক্ষুষ্যঃশস্যঘাতকঃ।
মধুরশ্চাম্লদাহীচ কষায়ানুরসোলঘুঃ।"
"রক্তপিত্তপ্রশমনো ন চ মারুত কোপনঃ।
গণ্ডুপদাদিকীটানাং জনকঃ প্রাণকারকঃ॥"

অর্থ—দক্ষিণদিক্ হইতে প্রবাত বায়ু লোকের বল-প্রদ, চক্ষুর হিতকর, এবং শস্য বিশেষের নাশক হয়। অপিচ, এই বায়ু মধুর, অম্ল ও বিদাহি রসযুক্ত এবং কষায় অনুরস বিশিষ্ট। (সেই সেই রসের কার্য্য করে বলিয়া রসযুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, নচেৎ বায়ুর কোন আস্বাদ নাই) অন্য বায়ু অপেক্ষা ইহা পরিমাণে লঘু (পূর্ব্বকালে কি-রূপে বায়ুর গুরুত্ব লঘুত্ব তুলিত হইত তাহা প্রস্তাবান্তরে বলা হইবে)। এই বায়ু রক্ত-পিত্ত নিবারণ করে ও শরীরস্থ বায়ুর সমতা করে। এই বায়ু প্রবাত হইলে গণ্ডপদ (কেঁচো) প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কীট সমূ-হের উৎপত্তি হয়। মনুষ্য জীবের আয়ুর পক্ষে ইহা হিতকর হইয়া থাকে।

পশ্চিম বায়ু।

"পশ্চিমোঽগ্নিবপূর্বর্ণবলারোগ্য বিবর্দ্ধনঃ।
কষায়ঃশোষণঃস্বর্য্যোর্বোচনোবিশদোলঘুঃ॥
"অপাং [illegible]বেশদ্যশৈত্যবৈকল্যকারকঃ।
সর্ব্বদ্রবোদ্ভবিব্যক্তপ্রভাবরসবীর্য্যকৃৎ॥

ব্রণসংরোপণস্বাচ্যাদাহশোথতৃষাপহঃ॥”

পশ্চিমদিক হইতে যে বায়ু আগমন করে তাহা জঠরাগ্নি, বপু, বর্ণ, বল, ও আরোগ্য বৃদ্ধি করে এবং কষায় রস বহন, (কষায় সেবার ফল), সলিলাদি শোষণ এবং কণ্ঠ স্বর পরিষ্কার করে। এই বায়ু প্রবাত হইলে লোকের অরুচি নষ্ট হয়। ইহা পরিমাণে লঘু, এবং জলের লঘুত্ব ও বিস্তারতা উৎপাদন করে, ও তাহার শৈত্যের হ্রাসতা করে। অপিচ, সকল দ্রব্যেরই সুস্পষ্ট প্রভাব, রস, ও বীর্য্যবৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই বায়ুর প্রবহনকালে প্রায় শরীরে বলাদি জন্মে, ত্বকের দৃঢ়তা হয়, এবং ইহা দাহ,শোথ, তৃষ্ণা এই সকলকে নষ্ট করে। (এসকল কেন হয়, কিরূপ কার্য্যকারণ ভাব আছে, লিখিলে তাহা "বায়ু বিজ্ঞান" নামে উক্ত হয়)।

উত্তর বায়ু।

"উত্তরোমারুতঃস্নিগ্ধোমৃদুর্ম্মধুর এবচ।
কষায়াম্লরসঃশীতঃ সর্ব্বদোষ প্রকোপনঃ॥'
ক্ষীণক্ষতবিষার্ত্তানাং হিতোদাহ তৃষাপহঃ
শীতাধিকঃ সনীহারঃসবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুমান্॥'

উত্তর দিক্ হইতে প্রবাত বায়ু স্নিগ্ধ অর্থাৎ স্নেহ মিশ্রিত, মৃদু, এবং মধুর রস ও কষায় অম্লরস বাহক। ইহা শীতল ও বাত পিত্যাদিসমুদায় দোষের প্রকোপকর। ক্ষত, বিষার্ত্ত, ও ক্ষীণব্যক্তিদের পক্ষে হিতকারক। তৃষ্ণা ও দাহ বিনাশক। অতিশয় শীতল জনক, এবং নীহার বিদ্যুৎ বজ্র, এই সকল যুক্ত (বায়ু উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত হইলে তাহার সহিত শীত, বিদ্যুৎ ও বজ্রের সহিত কিরূপ যোগাযোগ হয় তাহা এ সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবে পর্য্যাপ্ত হয় না বলিয়া পরিত্যক্ত হইল)।

বিষক্ অর্থাৎ এলো থেলো বায়ু।

'বিষক্বায়ুরনায়ুষ্যঃ প্রাণিনাং নৈকদোষকৃৎ।
সর্ব্বতু নিন্দকোহন্তা কৃত্যোৎপাতপুরঃসরঃ॥'

যুগপৎ নানাদিক হইতে প্রবাত বায়ু প্রাণিনিচয়ের আয়ুষ্কর হয় না, প্রত্যুত অনেক দোষকরই হইয়া থাকে। এই বায়ু সকল ঋতুকেই নিন্দিতাবস্থায় পরিণত করে। প্রাণি মাত্রের মারক স্বরূপ ও অগ্ন্যুৎপাতের কারণ হয়।

যে বায়ু মানব শরীরে সঞ্চরণ করতঃ পোষণাদি কার্য্য সমাধা করিতেছে তাহাও বস্তুতঃ এক হইয়াও লক্ষণ ও ক্রিয়া ভেদে প্রাণ, অপান, ও সমানাদি নাম ধারণ করে। অতএব এক অদ্বিতীয় ব্যাপক পরিপূর্ণ বায়ু পদার্থের মহিমা ইয়ত্তা করা ভার। এই মহৎ বায়ু বিষয়ক বিজ্ঞান, যাহা ঋষি দিগের সম্মত তাহার কিয়দংশ মাত্র প্রকটিত হইল, অপরাংশ প্রস্তাবান্তরে ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা রহিল। ঝড় বৃষ্টির হেতু নির্ণয় ও সেই সেই প্রস্তাবে প্রকটিত হইবে।

কালীবর বেদান্ত বাগীশ।

গ্রীক এবং হিন্দু।

(২৫ পৃষ্ঠার পর।)

উপসংহার।

লোক ক্রমে সর্ব্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া আসিলেও, তথাপি কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিতা মাতা, সন্তানগণ পাঠশালা হইতে গৃহে আসিলে, সন্ধ্যাকালে তাহাদিগকে লইয়া দেবচরিত, লোকচরিত, বংশাবলী জ্ঞান, কি করা কর্ত্তব্য, কি করা অকর্ত্তব্য, যথাবুদ্ধি যথাশক্তি ইহা যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতেন; এবং সর্ব্বদাই দেবতাদির প্রতি ভক্তি, এবং সৎ নীতি, সুযোগ পাইলেই যত্নসহকারে বালকের মনে সমুদিত করিতে চেষ্টা পাইতেন; এবং বালকও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সমাজে প্রবিষ্ট হইলে, কর্ম্মপথে যদিও বলদ বিশেষ, তথাপি যথাকথঞ্চিৎ জীবনের অবলম্বন প্রাপ্ত হইত,এবং যাবেদা মত একরূপ ভাবে চলিতে পারিত; এখনকার ন্যায় সভ্য ভব্য না হইলেও, তথাপি তাহার অভ্যন্তরে এমন একটি সারল্য এবং সহজবুদ্ধি অবস্থান করিত, যাহা সভ্য ভব্যের সমগ্র জীবন অনুসন্ধান করিলেও তাহার লেশ মাত্র পাওয়া যায় না।

এখন তাহাও নাই। পিতা মাতা এখন সৌখীন; সন্তানদিগকে সেরূপ শিক্ষাদান তাঁহাদিগের গৌরবের নিকট হেয়; শিক্ষকের হস্তে সন্তান নিক্ষিপ্ত করিয়া পিতৃমাতৃত্ব দায় হইতে আপনাকে মুক্ত বিবেচনা করিয়া থাকেন। না হইবে কেন? যে দেশে ধর্ম্ম এবং পুণ্য পর্য্যন্ত কিনিতে পারা যায়, সেখানে যে পিতৃমাতৃত্বও কিনিবার অনুষ্ঠান হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? শিক্ষাস্থান আবার বিজাতীয় রাজশাসনে এবং বিজাতীয় প্রথায়, ধর্ম্মশিক্ষা এবং চিন্তায় চিত্তপরিচালনা শিক্ষার পক্ষে সম্ভাবনা শূন্য। নীতিশিক্ষার কখনও কখনও চেষ্টা হয় বটে, কিন্তু মুলশূন্য নীতি। নীতিই হউক বা যে কোন বিষয়ই হউক, যতক্ষণ তাহার উৎপত্তি কোথা হইতে, আবশ্যকতা কি, পরিণাম কোথায়, তাহা জ্ঞাত হইতে না পারিবে, ততক্ষণ কখনও তাহাতে আস্থা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। মদ খাওয়া, মুরগী খাওয়া ইত্যাদির কুসংস্কার অপনোদন করাতে যতটা শ্রম হইয়া থাকে, সুনীতি সংস্কার স্থাপনার্থে যদি তাহার শতাংশ শ্রমও কেহ স্বীকার করিত, তাহা আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কখনই এত পরিমাণে অনুতাপের কারণ থাকিত না। নীতির আবশ্যকতা কি জন্য যদি বা তাহা কখনও শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার জন্য ভাব একমাত্র সমাজহিত বলিয়াই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

নীতির শেষ উদ্দেশ্য যে সমাজহিতে বহুলাংশ পরিণত হয় তাহা জানি, কিন্তু আমি যে সেই সমাজহিতে প্রবৃত্ত হইব তাহা কি জন্য কি বাধ্য-বাধকতায়,—প্রতিদানে? আমি দেখিয়াছি সমাজ অনেক সময় আমার অপকারই করিয়া থাকে, উপকারের ভাগ অতি অল্প। মানব অপ্রত্যক্ষ সংসার-প্রলোভনে অল্পই কার্য্যপ্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

এইরূপে বালক যখন শিক্ষালয় পরিত্যাগ করিয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন তাহার আত্মিকজীবন আকর্ষণে নির্জ্জনমরুকান্তার; আমার সৃষ্টি কি জন্য, কোথা হইতে, আমার কর্ত্তব্য কি, কি করিতে এ সংসারে আসিয়াছি, কি কর্ম্ম করিতে আমি ক্ষমবান, সে বিষয়ে একেবারেই ভ্রূক্ষেপশূন্য; এ পৃথিবী এ সংসার শুদ্ধ যে কেবল আহার বিহার স্থল, না আরও কিছু আছে, সে বিষয়ে অন্ধ। প্রবেশ দ্বারেই তাহারই ন্যায় অনুরূপপ্রকৃতি-বিশিষ্ট লোক-সংগঠিত উন্মত্ত সামাজিকতা, এবং তাহারই উন্মত্ত শাসন। যেখানে অপরাপর শাসনস্থল সকল যখন শূন্য, তখন সেখানে উন্মত্ত হউক বা যাহা হউক যে কোন শাসন নবপ্রবেশীর চক্ষে লক্ষিত হয়, তাহাই সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, এবং তাহাই যথাসম্ভব অনুসৃত হয়। উন্মত্তশাসনের ফলও উন্মত্ত হইবে না ত কি হইবে, এই কারণেই পূর্ব্ববর্ণিত অদ্ভুত লোকচরিত্র এবং সমাজচিত্রের উৎপত্তি। সর্ব্বজনবিবর্জ্জন না করিয়াও এখনও যাহারা হিন্দু নামে পরিচয় দিয়া থাকে, তাহারাও আর হিন্দু নহে; মুখে হিন্দু অন্তরে নরাধম। হিন্দুধর্ম্মের জীবন্ত ভাব যাহা অনেক দিন গত হইয়াছে, এখন কেবল তাহার চিতাভস্ম অবলম্বন হইয়াছে মাত্র; সে চিতাভস্মও ব্যবহৃত কেবল আত্মবিকৃত বদনকে আর একরূপ দেখাইবার জন্য। হিন্দু হিন্দুয়ানী বহির্ভূত হইয়া করিতেছেন সকলই, অথচ সকলই চক্ষু ঠারিয়া ঢাকা দিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছেন। যেদিকে তাকাও, সেই দিকেই কাপট্য এবং মিথ্যাধর্ম্মের প্রভুত্ব। এরূপ কাপট্য এবং মিথ্যাধর্ম্ম হইতে কবে কোথায় সুফল ফলিয়া থাকে? "নাবস্তুনা বস্তুসিদ্ধিঃ",—যেখানে জীবনেরই মূলীভূত পদার্থ মিথ্যা, সেখানে ফলও মিথ্যা না হইয়া কখনও সত্য হইতে পারে না।

এক্ষণে একবার ভারত-ভরসাগণের প্রতি নেত্রপাত করিয়া দেখ। বৃদ্ধ, অর্দ্ধবয়স্ক, এবং যুবা, বর্ত্তমান সমাজে কে কি রকম তাহা উপরে বলিয়া আসিয়াছি। তাহাদের কর্ম্মকারিত্বের বিষয় একবার আলোচনা কর। পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধ বা প্রাচীনের শিক্ষানুযায়ী জীবন মিথ্যার আধার, মিথ্যাই উহার ভিত্তিভূমি। ঐ শিক্ষার স্থূলমর্ম্ম আত্মপ্রকৃতিতে আত্মঘাতী হইয়া, যখন যেদিকে যেরূপ দেখিবে, তাহারই অনুরূপ হইয়া চলিবে। এ বড় দুরন্ত শিক্ষা, এবং ইহাতে আপাততঃ সুখও অনেক দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে যে, সভ্যতার যদি মিথ্যাকে এরূপ লোভনীয় আবরণে আবরিত না করে, সত্য হইতে যদি তাহার বেশী বাঞ্ছনীয় মূর্ত্তি দেখাইতে না পারে, তবে সত্য হইতে লোক ভুলাইয়া আত্মপথে লইবে কি-

রূপে। স্বভাবতঃই সত্য হইতে মিথ্যার পথ প্রবেশ লোভনীয় হইবার কথা। সত্য যাহা তাহা নিত্য, ক্ষয়রহিত, যথানিয়মে, যথাকালে যথাক্রমে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, সময় অনুসারে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করে না। অর্দ্ধবয়স্কেরও জীবন মিথ্যার উপর নির্ম্মিত, কিন্তু মিথ্যার এখানে চূড়ান্ত ভাব, মিথ্যা ক্ষিপ্তবৎ, আত্মশোণিত আপনি পানে রত। সুতরাং ইহার ফলাফলের বিষয় কোন কথা বলিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। তবে কি এ পৃথিবীতে ইহাদের অস্তিত্ব অনর্থক? তাহা নহে; এ পৃথিবীতে বস্তুস্বভাব গুণে বা আত্মগুণে যে কারণে যতই হেয় হউক, একেবারে অনর্থকে কেহ যাইতে পারিবে না। পাঠক, ইহা বোধ করি জ্ঞাত আছ যে ক্ষেত্রের শক্তি একবার লোপ হইলে, তাহার পুনর্ব্বার শক্তি উদ্দীপনে ভাল ফসল উৎপন্ন করাইতে হইলে ভূমিতে সার দিতে হয়। সার স্বভাবতঃ অব্যবহার্য্য ময়লা মাটি পচিয়া হইয়া থাকে; এবং সেই ময়লা মাটি যত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য হয়, সারও তত উত্তম হইয়া থাকে। ভারতীয় জীবনীক্ষেত্রে ইহারাও সেই সার বিশেষ। এবং ভারতের ভাগ্যে যে একদিন মহান্ সৌভাগ্যের উদয় হইবে, তাহাও ইহাদের দেখিয়া একরূপ নিরূপণ করিতে পারি, কারণ এমন অপকৃষ্ট নামের অযোগ্য জীবন ইহাদিগের ন্যায় ভূভারতে নাই!

নব্যের জীবন এই মিথ্যার প্রতি বিরক্তি ও তৎসহ সংগ্রাম ভাব, অথচ এখনও সত্যের আশ্রয়প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। যে সত্য সকল বিধর্ম্মী বস্তুকেও আপন আয়ত্তে আনিয়া অপূর্ব্ব সৃষ্টি রচনা করিয়া থাকে, যাহা তাঁহাদের বন্ধনরজ্জু, তাহার এখনও ইহারা দেখা পায় নাই। বিধর্ম্মী পদার্থ নিকর আয়ত্তক শাসনশূন্য দ্বন্দ্ব-ঘূর্ণিত হইয়া ফিরিতেছে, আকর্ষণে আরও বহুবিধ পদার্থ তাহাতে আসিয়া সংযোজিত হইতেছে, কিন্তু সংযোজনে দ্বন্দ্ব কেবল ব্যাকুল হইতে ব্যাকুলতর করিয়া তুলিতেছে মাত্র। ইহারা পূর্ব্বগত দুই শ্রেণীর ন্যায় নিস্পন্দ নহে, কিন্তু এখনও দৃষ্টি প্রসারিত হয় নাই; কোন উচ্চ আদর্শভিত্তিও সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। এ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান্তরে যাইতে হইবে, ইহা তাহাদের অন্তরাত্মা মধ্যে সুপ্তোত্থিতবৎ ক্ষণে ক্ষণে প্রবুদ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু কোথায় যাইতে হইবে, কিরূপে, তাহার কোন নিদর্শনী আসিয়া উপস্থিত হইতেছে না। সুতরাং ইহারা অগত্যা পূর্ব্বগত দুইশ্রেণির কর্ম্মভূমিই আপন কর্ম্মভূমী রূপে গ্রহণ করিয়া, তাহারই প্রকারান্তর আদর্শে, তাহারই পাঁচ দ্রব্যের পাঁচ মস্‌লা দিয়া, আর এক নূতন দ্রব্য প্রস্তুতের চেষ্টা করিতেছে, মনোমত হইতেছে না,—হইবে কিরূপে? আবার ভাঙ্গিতেছে, আবার গড়িতেছে; এইরূপে কোনদিকে কিছুই সাব্যস্ত হইতেছে না। এইই কারণ হইতে আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি, ইহারা সময়ে সময়ে নানা কার্য্য উপস্থিত করিতেছে, নানা কথা কহিতেছে; আত্ম সফলতা অনুষ্ঠানমাত্রেই গণনা করিয়া চিৎকারে গগণভেদ করিতেছে, আবার পরক্ষণেই সকল নিস্তব্ধ, ছায়াবাজি প্রায় তাহার আরম্ভিত সকল

কার্য্যই ভিত্তিশূন্য হইয়া কোথায় মিশাইয়া গেল, পশ্চাতে চিহ্নস্বরূপ কেবল অস্পৃশ্য ক্লেদরাশিমাত্র নিপতিত রহিয়াছে; আবার ক্ষণ বিলম্বে উঠিতেছে, আবার ক্ষণ বিলম্বে ডুবিতেছে;—সৃষ্টি সংবোধক ইন্দ্রধনু এই মাত্র উঠিতেছে, আবার উঠিতে না উঠিতেই ভগ্নরতি কালমেঘে কোথায় মিশাইয়া যাইতেছে। ইহারাই দৃশ্যমান অভিনয়রূপে দিনত্রয়জীবী সমাজ, বিবিধ সংস্করণ, বিবিধ বক্তৃতা, পরে তুষানল ধূম, শেষে পৃষ্ঠভাসান নিত্য অভিনয় হইয়া যাইতেছে। বড়ই ক্ষোভের বিষয় তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু তথাপি আনন্দের বিষয় এই যে ইহাদের জীবন, পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণির জীবনের ন্যায় নিস্পন্দ, স্বচ্ছ কাঠবৎ, অনস্থা কেন্দ্র শয়নশায়ী নহে। ইহা যদিও প্রলয়বাত্যা-বিতাড়িত নিয়ম শূন্য তরঙ্গ বিশেষ; এবং দেখিতে যদিও বড় ভয়ঙ্কর, রোমহর্ষণকর, এবং ইহাতে ভুক্ত ভোগী যাহারা তাহাদের অবস্থা করুণা-উদ্বোধক; তথাপি তাহা আশাশূন্য নহে! প্রলয় মাত্রেই সৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ।

সমাজ যেরূপ চলিতেছে, এই নিয়মে আরও কিছু দিন গতি করিলেই প্রতুল। এই সময়ে ইহার বেগ যথাপথে ফিরাইতে না পারিলে মহা অমঙ্গলের সম্ভাবনা। সমাজ যখন যথার্থ পথ হইতে গতিচ্যুত হয়, তখন সমাজের মধ্যে যে কোন সাত্ত্বিক ব্যক্তি থাকে, এবং থাকেনও অনেক তাহাতে সন্দেহ নাই, তাঁহাদের কর্ত্তব্য সমাজের জীবনী শক্তির তৎকালীন পরিমাণ বুঝিয়া, তাহার জ্ঞানপথে দর্শন কতদূর, আত্মিক শক্তির অবস্থা কিরূপ, এবং অন্তর্দৃশ্য কিরূপ প্রসারিত, তাহা নিরূপণ করিয়া, সেই অবস্থায় যেরূপ পরিচালন ক্রিয়া শুভপ্রদ হয়, তাহার পরিচালনা করেন। আর কেহ না হউক, আধুনিক ব্রাহ্মেরা বহুপরিমাণে সেই কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এখনও আশা অনুরূপ পারিয়া উঠিতেছেন না। আধুনিক ব্রাহ্মদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম এখনও পূর্ব্বতন চিরসংস্কার ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই; ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি, সে পক্ষে এখনও ইহা নিষ্কাম মোক্ষের দিকে ঢলিয়া রহিয়াছে। এখনও, কেবল স্বভাব ও চরিত্র সংস্কারে পরলোকের পথ পরিষ্কার করাই জীবন এবং ধর্ম্ম উভয়েরই এই একমাত্র উদ্দেশ্য, এই বিশ্বাসের উপর কার্য্য চলিতেছে। পাঠক, আত্মসংস্কারে কিছু বিশেষ বাহাদুরী নাই; প্রত্যুতঃ তুমি যে আত্মসংস্কারের কারণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, ইহাই আশ্চর্য্য। আত্মসংস্কারে তুমি যাহা হইবে, এবং হইয়া ভাবিতেছ যাহাতে চূড়ান্ত ধর্ম্ম উপার্জ্জন হইল এবং মোক্ষ হইবে, তাহাই ত তোমার স্বাভাবিক মূর্ত্তি। তবে যে এতদিন সে মূর্ত্তিতে ছিলে না, তাহা কেবল স্বভাব হইতে এত দিন বিচ্যুত হইয়াছিলে এই মাত্র। এখন যে তুমি আত্মসংস্কারে সেই আত্মস্বভাবে ফিরিয়া আসিতেছ; তাহাত তুমি কেবল আপনারই কার্য্য করিতেছ। কিন্তু যিনি তোমাকে এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, যিনি তোমাকে এই প্রভূত কর্ম্মশক্তি প্রদান করিয়াছেন; যিনি তোমাকে তোমার সেই শক্তিসহ পোষণ করিতেছেন, তাঁহার জন্য

কি কার্য্য করিয়াছ? তিনি যে এতগুলি দিয়াছেন এবং দিতেছেন, অবশ্যই তাহা অভিপ্রায় উদ্দেশ্যশূন্যতায় দেন নাই; সেই উদ্দেশ্য এবং অনুজ্ঞা প্রতিপালন জন্য কি করিয়াছ? তাহা কর, তবেই তোমার ইহ লোক পরলোক উভয়লোকে মঙ্গল হইবে; নতুবা নহে। নিষ্কর্ম্মা ঢিল পাটকিলে যদি তাঁহার অভিপ্রায়পূর্ণ পর্য্যাপ্ত বোধ করিতেন, তাহা হইলে তোমাকে সৃষ্টি করিবার আবশ্যকতা কি ছিল?

মানবীয় স্বেচ্ছা এবং শক্তিসাধ্য কর্ম্মমূল দ্বিবিধ হইতে পারে। এক ঐশ্বরিক নিয়োজন, অপর সামাজিক নিয়োজন *। ঐশ্বরিক নিয়োজন বোধে কর্ম্মারম্ভ সাত্বিক প্রকৃতির কার্য্য। সামাজিক নিয়োজন বোধে কর্ম্মারম্ভ রাজসিক এবং তামসিক প্রকৃতির কার্য্য। এই দ্বিবিধ কার্য্যমূলের পৃথকরূপে বর্ণনা এবং নির্ণয় সেই সমাজেই প্রযুক্ত, যেখানে সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক এই ত্রিবিধ প্রকৃতির লোকই অবস্থান করিয়া থাকে। নতুবা যে সমাজ আমূলতঃ বা বহুপরিমাণে সাত্বিক প্রকৃতি দ্বারা সংগঠিত, তথায় এরূপ বিভাগ নিষ্প্রয়োজন। তথায় ঐশ্বরিক এবং সামাজিক উভয় নিয়োজনই একতায় মিলিত হইয়া থাকে। যে পরিমাণে উহা একতায় মিলিত, সেই পরিমাণে সমাজের সাত্বিকতার পরিচয়; যে পরিমাণে অমিলিত সেই পরিমাণে দুষ্ট এবং অসৎভ্রমকলুষিত। একেবারে সাত্বিক, কখনও এ দুর্ভাগা সংসারে সম্ভব হইবে কি না, তাহা ঈশ্বরই জানেন।

যে ব্যক্তি সাত্বিক প্রকৃতি, সে তোমার আমার অনুজ্ঞাক্রমে, বা তৃপ্ত্যর্থে কার্য্যনিরত, বা কার্য্যসম্পাদন করে না। যে কার্য্য এ সংসারে সৎ, এবং যাহা তাহার শক্তিসাধ্য ও অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত, যাহা ঈশ্বরের তৃপ্তিকর বলিয়া বিশ্বাসিত; এবং যেহেতু সে এই কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মার্থে আগত, এবং কর্ম্ম হইতে ঈশ্বরের নিকট অনুগ্রহের প্রার্থী; এই জন্যই সে সেই কার্য্য প্রাণপণে অনুসরণ করিয়া সম্পাদনার্থ চেষ্টাবান হয়। তজ্জন্য সে মানবীয় সুখ্যাতি অখ্যাতির প্রত্যাশা করে না, যেহেতু সে মানবীয় নিয়োজনে কর্ম্মনিরত হয় নাই। এবং মানবে শত ধিক্কার দিলেও, এবং বস্তুতঃ দিয়াই থাকে, তথাপি সে তাহা পরিত্যাগ করিবার পাত্র নহে। সময় ও সমাজ সপক্ষ বা বিপক্ষ যাহাই হউক, তাহার পক্ষে দুইই সমান, তাহাতে তাহার চেষ্টার রোধকারী কিছুমাত্র নাই। সমগ্র পৃথিবী তাহার মস্তকের উপর চাপিয়া পড়িলেও, সে ক্ষান্ত হইবার পাত্র নহে। যেহেতু সময়, সমাজ, পৃথিবী, তাহার রোষ ও তোষ, সুখ্যাতি বা অখ্যাতি, এ সকলই ক্ষণিক, এই থাকিবে এই থাকিবে না; কিন্তু সে যাহার প্রীত্যর্থে কার্য্য করিতেছে, এবং যাহার অনুগ্রহ বা নিগ্রহ তাহার একমাত্র অবলম্বন, সেই প্রীতি, সেই অনুগ্রহ বা নিগ্রহ তাহার একমাত্র অবলম্বন, সেই প্রী-

* এমন হাওয়ায় দড়ি দেওয়া উদ্ভট তত্ত্বও কোথায় দেখি না। যে যাহা বলুক, সকল কর্ম্মমূল উদর পূরণ; তাহা সংসাধিত হইলেই সকল কার্য্য সংসাধিত। ইতি—বাঞ্ছারাম।

ত্যাদি অনন্তস্থায়ী এবং অনন্তব্যাপী; সুতরাং সে কখনও অনন্তকে রুষ্ট করিয়া অন্তকে তুষ্ট করিতে অগ্রসর হইতে পারে? যে এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চেষ্টাবান, স্বয়ং ঈশ্বর করুণা রসে তাহার সহায়তা করিয়া থাকেন নতুবা সে সমাজ হইতে বহু ক্লেশ, বহু দুঃখ বহু উপহাস, কঠোর মৃত্যু যন্ত্রণাকে পর্য্যন্ত সে কেমন করিয়া তুচ্ছে নিক্ষেপ করিয়া থাকে? যে একবার মাত্র কখনও এরূপ কর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে, সেই বুঝিতে পারিবে যে অন্তঃশক্তি কিরূপ অলোকসামান্য বিকশিত এবং দুর্দ্দমনীয় হইয়া থাকে, এবং বহু ক্লেশ রাশির মধ্যেও কেমন একটি দিব্য শান্তনা পদার্থ পরিদীপ্তিমান হয়, এবং কেমন তাহা অঘোর প্রতিকুল অন্ধকার মধ্যেও স্বচ্ছন্দে পরিচালনা করিয়া লইয়া যায়। এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতা বর্দ্ধক যে সমস্ত মহানুভবের নাম শুনিতে পাইয়া থাক, তাহাদের সকলেরই জীবন একে একে আলোচনা করিয়া দেখিও, দেখিতে পাইবে যে আমূলত ইহারাই জীবন্ত অভিনয় ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং এই কর্ম্মমূলই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। যদি ইচ্ছা হয়, ইহাও দেখিতে পাইবে যে সাময়িক সমাজের নিকট তজ্জন্য তাহাদিগকে সময়ে সময়ে কতই ক্লেশ ও অপমান প্রভৃতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তাহাদের কি হইয়াছিল; প্রতিকুলতা এখন লুপ্ত, কিন্তু তাহাদের কৃতকর্ম্ম যাহা তাহা দিগন্ত পরিব্যাপ্ত, এবং অনন্ত কর্ম্ম প্রবাহে মহাধারারূপে অনন্ত গৃহে গৃহীত। ফলতঃ এখানে মূল যখন “মূলং কৃষ্ণব্রহ্মণব্রাহ্মণাশ্চ” তখন অনুষ্ঠানে বনবাস, বহুক্লেশ, বহুসংগ্রাম থাকিলেও অন্তে সসপ্তদ্বীপা সাগরাম্বরা বসুমতীর আধিপত্য নিঃসন্দেহ প্রাপ্তব্য ফল। তথাপি এপথে অগ্রসর হইতে যাহারা ভয় পায়, তাহাদের ভয় ঠিক যে ব্যক্তি অমর তাহার জুজুবিছা দেখিয়া জীবন ভীতি উপস্থিত হইবার ন্যায়। হিন্দু সন্তান, তুমি বসিয়া রহিয়াছ কি জন্য? তুমিও কেন এই মূল ধরিয়া কার্য্যারম্ভ না কর? যদিও তোমার শক্তি ক্ষুদ্র হয়, বসুমতির আধিপত্যের পরিবর্ত্তে না হয় একখানা গ্রামওত অবশ্য লাভ করিতে পারিবে। যেখানে সকলই ওঠবন্দি হিসাবে ভুক্ত, সেখানে এ ক্ষণস্থায়ী ওঠবন্দি ঠাকুরাণীর পরিবর্ত্তে যদি কিছু স্থায়ী সম্পত্তি করিতে পার, তাহা কি প্রার্থনীয় নহে? মনুপুত্রের তাহাই করা কর্ত্তব্য, নতুবা পিতৃনাম, পিতৃপুরুষের অপমান করা হয়।

দ্বিতীয় কর্ম্মমূল সামাজিক নিয়োজন। ইহার মূলে “মূলংরাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষিঃ” ইহাতে আপাততঃ ইন্দ্রপ্রস্থ পর্য্যন্ত অধিকার ভুক্ত হইয়া সুখ বৃদ্ধি করিল বটে; কিন্তু অন্তে কেবল অধিকারচ্যুতি মাত্র নহে, সবংশসহ সকলই লোপ। আমাদের সমাজ আপাততঃ যেরূপ সংগঠিত, তাহাতে সত্য মিথ্যা উভয়েরই একত্র সমাবেশ, বিশেষতঃ এখানে নির্ব্বোধ মানব স্রোততরঙ্গে পড়িয়া সকল বিষয়েই আশু ফল, আশু প্রতিকারের অনুসন্ধান করিয়া থাকে, যথানিয়ম ও যথাকালের বড় একটা অপেক্ষা রাখে না বা বুঝেনা। এরূপ সমাজের সামাজিকতা যেখানে কর্ম্মমূল বলিয়া গৃহীত

হইয়া থাকে, সেখানে বলা বাহুল্য যে মূল দেশে মিথ্যার প্রাবল্য অনেক, সুতরাং তাহার ফলেরও কখনও স্থিরতা দাড়ায় না। ফল এখানে যুগান্ত স্থায়ী নহে, নিরন্তর এক ভাঙ্গিতেছে, আর গড়িতেছে। মিথ্যা ভ্রমের আধার, ভ্রম দৃষ্টিরোধক, দৃষ্টি যেখানে রোধ মানব সেখানে ভবিষ্যত পথে অন্ধ, অন্ধ ব্যক্তি কেমন করিয়া ভবিষ্যৎবাহি কর্ম্মের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে? এরূপ কর্ম্মের উদ্দেশ্য, আগত সময়কে কোনরূপে তদনুযায়ি কর্ম্মদ্বারা থাবাথুবি দিয়া সন্তুষ্ট রাখা, সুতরাং নিঃসন্দেহই তাহা কেবল আগত সময়ের জন্য। এজন্য অবিরত গতিশীল সময় যেমন ত্বরিত গতিতে কাল পথে অদৃশ্য হইল, তাহার প্রীত্যার্থে কৃতকর্ম্মও আত্মস্থান শূন্য করিয়া সেইরূপ ত্বরিতগতিতে তপনতাপতপ্ত জলবিন্দুর ন্যায় অবিলম্বে অনন্তগৃহে হিসাবশূন্য হইয়া বিলোপ প্রাপ্ত হইল। ইহাকে একরূপ গোঁজা মিলানে ফাকি বুঝান বলে। তুমি যেখানকার সেইখানেই থাকিলে, কেবল ফাকি দিয়া বুঝাইলে যে তুমিও চলিতেছ। তুমি ভাবিলে কাল না দেখিয়া চলিয়া গেল। কাল না দেখিয়া যায় নাই, তোমার ফাকিও তাহার অবিদিত নাই, তবে যে হাতে হাতে তোমার ফাকির প্রতিবাদ করিল না, তাহা কেবল তোমার নষ্টামির শাস্তি দারুণতর করিয়া তুলিবার জন্য। যখন ধরা পড়িবে, তখন দেখিতে পাইবে তোমাকে কি ভীষণ বেগে নাকে দড়ি দিয়া কাল আপন সমস্ত্রে টানিয়া লয়; তখন বুঝিতে পারিবে যে ফাকি দেওয়ার কি দুর্দ্দমনীয় প্রায়শ্চিত্ত। ব্যক্তিগত ফাকির ফল দেখিতে চাও, যদি দৃষ্টিশক্তি থাকে, তবে আত্মমধ্যে বা চতুঃপার্শ্বে অবলোকন কর; যদি জাতীয় ফাকির ফল দেখিতে চাও, একবার ফরাসি রাজবিপ্লবের ভীষণকাণ্ড সমূহ মনে করিও।

যে পাষণ্ডতার স্রোতবেগে দেশ আকুলিত করিতেছে, যাহার প্রভাবে সকলই খণ্ড খণ্ড, কেবল উঠিতেছে পড়িতেছে; গঠনের কোথাও চিহ্ন বা আশামাত্র নাই; কতদিনে যে তাহার বেগ ফিরিবে তাহা কে বলিতে পারে? ভারত সন্তান আর নাস্তিকতার মিছা ঘোরে ঘুরিও না, আমি নিশ্চয় বলিতেছি ইহা ভ্রম। ঈশ্বর এখনও সেই জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে রাজত্ব করিতেছেন, এখনও তিনি বিশ্বসহ তুমি আমি পিপিলিকা পরমাণুটিকে পর্য্যন্ত পরিচালিত করিতেছেন। কুতর্কে ভুলিও না। কখনও কখনও কুতর্কে ভুলিয়া যে প্রকৃতিতে সমস্ত আরোপ করিতেছ, যাহাকে তোমার সর্ব্বেসর্ব্বা শিক্ষয়িত্রী বলিয়া মানিতেছ, তাহারই শিক্ষা অবলম্বন কর, সেই তোমাকে তোমারই শিক্ষা দিতেছে যে, কর্ত্তব্যাতীত, চিত্তব্যাতীত, কর্ম্ম সুসিদ্ধ হইতে পারে না; এবং কর্ম্মই তোমার জীবনের একমাত্র পরিমাণ এবং উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানের কুজ্ঝটিকাতেও অন্ধ হইয়া ভাবিও না যে, তাহার পশ্চাতে চিরক্রুত সূর্য্য এখন অস্তিত্বশূন্য; সেই বিজ্ঞানেই তোমাকে শিক্ষা দিবে যে, সূর্য্য-তেজেই কুজ্ঝটিকার উৎপত্তি, সূর্য্য তেজেই তাহার স্থিতি, এবং সূর্য্য তেজেই উহার ক্ষুদ্র কারিত্ব। তোমার বিজ্ঞানও সেই বিশ্ব-নিয়ন্তৃ-প্রভবশূন্য হইবে অকা-

র্য্যকর। অতএব মিথ্যা সামাজিকতা পরিত্যাগ কর, আত্মপ্রকৃতিতে প্রকৃতিবান হও, আত্মাবলম্বন কর। এক এক জন লইয়া পাঁচজন; তবে কেন তুমি সেই পঞ্চকৃত মুখসে আত্ম গোপন করিয়া আত্ম প্রকাশে লজ্জিত বোধ করিয়া থাক। যে প্রকৃতি পাঁচজনে লইতে বলে তাহা লইও না, যাহা ঈশ্বর দিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিও। পাঁচজন হইতে ঈশ্বর বড়। পাঁচজনের সুখ্যাতি অখ্যাতি-নির্ম্মিত পন্থাকে পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিও না; তোমার স্রষ্টানিয়োজিত কর্ত্তব্যবোধের উপর কর্ম্মমূল স্থাপিত করিও, তাহাই পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিও। এরূপ কর্ম্মমূল অতলস্পর্শ কাল সমুদ্রকে অতিক্রম করিয়া যে ভিত্তির উপর স্বয়ং কাল সমুদ্র স্থাপিত, সেই ভিত্তির উপর আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং এরূপ মূলোৎপন্ন কর্ম্ম এবং তাহার সার্থকতাও অনন্ত স্থায়ী হয়।

যে কোন কার্য্য করিবে চিৎকার করিও না; এত গরমে এত দূর প্রসারণে যে কোন পদার্থ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। নির্ব্বাক হইতে শিখ, শৈত্যে যৌগিকাকর্ষণের বৃদ্ধি হয়, দূরপ্রসারিত বাষ্প ঘনীভূত হইয়া পদার্থ রচনা করিয়া থাকে। নিত্য সংস্করণ, নিত্য সমাজ, নিত্য বক্তৃতায় তুমি ব্যাপৃত, তাহাতে তোমার আদর ভিন্ন অবমাননা করি না; কিন্তু এই বলি যাহা করিতে হয়, বুঝিয়া করিও; তাহার কর্ত্তব্য ভাব এবং আবশ্যকতা অবধারণ করিও। নতুবা অপরে শ্রান্ত হইয়া, পিপাসা তাড়নে জলপান করিয়া সুখ লাভ করিল; আমিও তাহা দেখিয়া ঘটি ঘটি জলপান করিতে বসিলাম, কিন্তু শ্রান্তি যে তাহার জলপানে সুখের একমাত্র নিদানভূত কারণ তাহার প্রতি একবারও লক্ষ্য করিলাম না; সুতরাং আমার লব্ধফল উদর ফাটিয়া যাওয়া! আর এক কথা, যাহা করিবে তাহা ভারতীয় হইয়া কর, সাহেব হইয়া করিও না, প্রকৃতিনিয়োজিত কর্ম্মস্থলীর বাহিরে গিয়া পড়িবে। যে সকল ভারতীয়, ভারতীয় ঘুচিয়া সাহেব হইতে চাহে; তাহাদের পরিধেয় সহস্রমুদ্রাক্রীত এবং আহারীয় লক্ষমুদ্রা ক্রীত হইলেও, তুমি নিশ্চয় জানিবা এই পৃথিবীতে মহত্তের মূল আহার বিহারের অতীতে আর কিছু থাকে, তাহা হইলে তোমার ঐ ছিন্ন বস্ত্র এবং ছিন্ন আহারীয় সত্বেও তুমি তাহাঁদিগের অপেক্ষা অতুলনীয় মহৎ। তাহারা ভীরু, তুমি তাহাদিগের তুলনে বীরপুরুষমহলীয়। তাহারা স্বজাতীয় গন্তব্যপথের দুঃখ ক্লেশে ভীত হইয়া বিধর্ম্মী বিজাতীয় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে; তুমি বীরভাবে সেই দুঃখ ক্লেশে দৃক্‌পাতশূন্য হইয়া গন্তব্যপথে গতিশীল হইয়াছ। তাহারা উপহাসের স্থল, তুমি সকরুণ অশ্রুআকর্ষণের স্থল। যে জাতীয়ত্ব হেতু স্পার্টান জননী অকাতরে সন্তানকে সমক্ষে বলিপ্রদত্ত হইতে দেখিয়াছে; যে জাতীয়ত্ব হেতু অপূর্ব্ব তীর্থস্থলী থার্ম্মপিলি ক্ষেত্রের উৎপত্তি; যাহার প্রভাবে রামায়ণের রাম সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; যাহার প্রভাবে উইলেম টেল এবং ওয়ালেসের অদ্ভুত কীর্ত্তি; এবং যাহার প্রভাবে আধুনিক ভারতীয় ভিন্ন আর যে কোন

জাতি অকাতরে রক্তদান করিয়াছে, সেই জাতীয়ত্ব যে যে জন যৎসামান্য আপাততঃ সুবিধার খাতিরে স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত না হয়, এই জাগতিক কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার মূল্যই বা কি, পদার্থই বা কোথায়? এই নিমিত্তই তাহাদিগকে স্থলান্তরে প্রকৃত গর্ভস্রাব বলিয়া উক্ত করা গিয়াছে।

সেই সকল অঘোর স্বপ্নে উন্মত্ত হইও না। ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আত্মজীবনের উদ্দেশ্যে বিশ্বাস কর, তোমার কর্ম্মক্ষমতায় বিশ্বাস কর, এবং কিজন্য তাহা তোমাকে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে প্রবুদ্ধ হও। ঈশ্বর-প্রীতিকর তোমার কর্ত্তব্য কি তাহার অবধারণ কর। সুকার্য্য মাত্রই ঈশ্বর নিয়োজিত। দেখ তোমার আত্মবুদ্ধিতে এসংসারে কোন্ কোন্ কার্য্য সৎ এবং মঙ্গলদায়ক, এবং কোন্ কোন্ কার্য্য অসৎ এবং অমঙ্গলদায়ক। যাহা সৎ তাহা বাছিয়া লও। তাহার মধ্যে আবার দেখ, কোন্ কোন্ গুলি তোমার সাধ্যায়ত্ত এবং তোমার মতি গতি এবং রুচির পরিপোষক। যে গুলি তোমার সাধ্যায়ত্ত বলিয়া বুঝিবে, এবং যাহাতে তোমার রুচি হইবে, সেই গুলিই তোমার কর্ত্তব্য মধ্যে গণিবে। বহুকার্য্য, একটিমাত্র কার্য্যও, আমূলতঃ হয়ত একই সময়ে, একই উপায়ে, একই প্রকরণে সুসিদ্ধ হইতে পারে না। ভাল, তাহাই হউক। এখন দেখ যেগুলি তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত, তাহার মধ্যে কোনটি বা কোন অংশ, তোমার বর্ত্তমান শক্তি, সময় ও উপায়ে সুসাধ্য হইতে পারে। এবং এরূপে যে অংশ তোমার আপাততঃ সুসাধ্য বলিয়া অবধারিত হইবে, তাহাই প্রাণপণে অনুসরণ করিয়া সম্পাদন করিতে যত্নবান হও। দেখিতে পাইবে, উহা সুসম্পাদিত হইতে না হইতে তোমার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য যাহা যাহা এবং তাহার উপায় আদিও যাহা, আপন হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাণপণে যত্ন করিও, হেলা করিও না, যেহেতু মনে রাখিও তোমার কার্য্যফলের উপরেই তোমার ঈশ্বরের রোষ তোষ বিতরণ নির্ভর করিতেছে। এরূপে কর্ম্মনিরত হও,* সমাজও, আজি হউক কালি হউক, যখন বুঝিতে পারিবে, যখন তোমারই অনুরূপ প্রণালীতে কর্ম্ম করিতে শিখিবে, তখন আর তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। তখন দেখিবে, সমাজকে তুমি তাড়াইয়া দিলেও, সে যাইবে না; তোমার সম্মান

* বক্কেশ্বর মহাশয়! কর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া ত জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছ; কিন্তু কি কর্ম্ম করিব তাহারত কোন কথার উল্লেখ দেখি না। ফলতঃ আমার ক্রমে সন্দেহ হইতেছে যে অভিধানে যদি কর্ম্ম শব্দটি না থাকিত তবে এ লেখকের উপায় নাজানি কি হইত। স্বচ্ছন্দে আহার, বিহার, তদর্থে অর্থ উপার্জ্জন; পরিবার প্রতিপালন, আপনার পাঁচটা লইয়া সুখে কালাতিবাহন ইহা অপেক্ষা আর কি কর্ত্তব্য আছে তাহাত খুজিয়া দেখিতে পাই না। বোধকরি লেখকের উপর কিছু কিছু বাতুলতার ছিট্ আসিয়া চাপিয়াছে। পাঠকবর্গ আপনারা উহার কথা বড় একটা কাণে তুলিবেন না। ইতি।—বাঞ্ছারাম।

করিবে, কেবল সম্মান করিবে না, তোমার পূজা পর্য্যন্তও করিবে। এইখানেই সামাজিক নিয়োজন এবং ঈশ্বর নিয়োজন একতায় আসিয়া মিলিত হয়। এবং এইখানেই একতার তার আসিয়া সমাজের আমূলতঃ পবিচালিত হয়। অতএব এরূপে কার্য্য নিরত হও, তোমার উন্নতি হইবে, তোমার জাতীয় উন্নতি হইবে, এবং জগতের উন্নতি হইবে। তখনই আর পাঁচকাযের মধ্যে ইহাও বুঝিতে পারিবে যে এই গ্রীকদিগের ভগ্নাবশেষ হইতে কোন্ কোন্ বস্তু গ্রহণ করিবে, কোন্ কোন্ বস্তু করিবে না; এবং আত্ম জাতীয় কোন্ অকার্য্যকর বস্তু ফেলিবে,এবং কোন্ বস্তু ফেলিবে না; এবং তখনই কেবল, বিবিধ উপকরণ বিধর্ম্মী হইলেও, কেমন করিয়া তাহার সামঞ্জস্য সাধনে অপূর্ব্ব সৃষ্টিরচনে সমর্থ হইতে পারিবে। কি গ্রহণ করিবে, কি গ্রহণ করিবে না, আমি তাহা নির্ব্বাচন করিলে যদি হইত, আমি তাহা করিতাম। কিন্তু প্রত্যেক প্রকৃতি বিভিন্ন, প্রত্যেক রুচিশক্তি ইত্যাদিও বিভিন্ন, সুতরাং প্রত্যেক নির্ব্বাচনও বিভিন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। বহু প্রত্যেক রাশি সমষ্টি করিয়া এই বিশ্ব, বহু প্রত্যেক রাশির সমষ্টি করিয়াই পূর্ণতা, এখানেও সেই বহু প্রত্যেক রাশির সমষ্টি সংযুক্ত হইয়া পূর্ণতা সাধন করুক। আমার নির্ব্বাচনের এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্তি যে আর বাতুলের স্বপ্ন দেখিও না, ইহাতে কোন কার্য্যই হইবে না; কেবল বাতুলতা বৃদ্ধি হইবে মাত্র। প্রস্তুত হইলে স্বকার্য্য আপনা হইতে হাতে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

অতএব ভারত সন্তান, আর স্রোতে গা ঢালিয়া থাকিও না। এই কর্ম্মক্ষেত্রে বহুকাল নিদ্রিত অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছ; আর কতকাল নিদ্রিত থাকিবে; কত বিশ্রাম করিবে? উঠ উঠ, সুষুপ্তি ত্যাগে জাগরিত হও, চক্ষু উন্মিলিত কর; একবার দেখ দেখি; তাকাইয়া দেখ; মাতৃভূমির কি দুরবস্থাই না করিয়াছ। সেই সোণার মাতৃভূমি ছারখার, তুমি নিজেও ছারখার, চক্ষু থাকিলে দেখিতে পাইতে তোমার সেই জীবনান্তে অবলম্বনস্থল পিতৃভূমিও কিরূপ ছারখার হইয়া আসিয়াছে। এখনও জাগরিত হও, এখনও সময় থাকিতে আপন কার্য্য বুঝিয়া লও। সাত্ত্বিকপ্রকৃতি হও, স্বাত্মাবলম্বন কর, কর্ম্মবান হইতে শিখ; ইহ পরলোক উভয়েতেই তোমার মঙ্গল হইবে। তোমার মঙ্গল হউক।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র।

(৫ম খণ্ড ৫৩০ পৃষ্ঠার পর।)

ন্যায়দর্শন। মহর্ষি গৌতম প্রণীত; ইহাতে মানব মনের আসাধারণ ক্ষমতা এবং পদার্থ ও মানসতত্ত্বের উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে; ইহার মতে ঈশ্বরই সর্ব্বেসর্ব্বা। ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ; কিন্তু কত দিনের তাহা নির্ণয় করিবার সুন্দর উপায় নাই; আমরা সংস্কৃত সাহিত্যাকাশে অনেক গুলি গৌতমের নাম দেখিতে পাই—রামায়ণ—মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি সর্ব্বস্থলেই গৌতম ঋষির নাম শ্রুত হওয়া যায়; ছান্দোগ্য উপনিষদে ও এক গৌতমের উল্লেখ আছে; পাণ্ডবগুরু গৌতমও নিতান্ত অপরিচিত নহেন; আবার দেবরাজ ইন্দ্রের লাম্পট্য জন্য যিনি আপন স্ত্রীকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন আমরা সেই অহল্যাপতি গৌতমেরও নাম শুনিয়া থাকি; বুদ্ধদেবও গৌতম নামে অভিহিত হইতেন; তন্মধ্যে ন্যায়দর্শন প্রণেতা গৌতম কোনটি তাহা নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে—প্রত্যুত হওয়া অসম্ভব। তবে যিনি ন্যায় সূত্র প্রণয়ন করেন তাঁহার অপর নাম অক্ষপাদ। উপরে যে সকল গৌতমের নামোল্লেখ করা গিয়াছে তন্মধ্যে কেহ অক্ষপাদ নামে অভিহিত হইতেন কিনা তাহাও নির্ণয় করা যায় না। যাহাই হউক সে বিষয়ে আর সময় ব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই; মহর্ষি এই ন্যায়শাস্ত্রে পদার্থ ও মানসতত্ত্বের সুন্দর অনুশীলন করিয়াছেন।

ন্যায়দর্শন পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক অধ্যায় দুইটি করিয়া আহ্নিক এবং প্রত্যেক আহ্নিক আবার কতিপয় প্রকরণে বিভক্ত। ইহার মতে ঈশ্বর সিদ্ধ, কিন্তু জীব চৈতন্য স্বরূপ নহেন, কেননা সুষুপ্ত্যাদি অবস্থায় চৈতন্য উপলব্ধি হয় না।

সাংখ্যাদি দর্শন মতে প্রমাণ তিন প্রকার,—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। যাহা চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, রসনা, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হয় তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ; দার্শনিকগণ মনকেও এক ইন্দ্রিয় মধ্যে গণ্য করিয়াছেন;—মনদ্বারা যে প্রত্যক্ষ হয় তাহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলে; মন বহিরিন্দ্রিয় নহে—সুতরাং মনের প্রত্যক্ষীভূত বিষয় বহিরিন্দ্রিয়ের লক্ষ্যাধীন কোন পদার্থ হইতে পারেনা—এই জন্য অন্তর্ব্বিষয় জ্ঞানই মানস প্রত্যক্ষের সর্ব্বস্ব। আবার প্রত্যক্ষ না করিয়াও অনেক বিষয়ের জ্ঞান জন্মে তাহাই অনুমান প্রমাণ; মনে করুন, কোন লোক গৃহ মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন—এমন সময় মেঘ গর্জ্জন হইল; তিনি জানিতে পারিলেন আকাশে

মেঘ দেখা দিয়াছে, এইরূপ জ্ঞানকে অনুমান প্রমাণ বলে। আবার সমুদয় বিষয়ই একজন লোক প্রত্যক্ষ বা অনুমান করিতে পারেন না; তিনি যাহা কখন অনুমান বা প্রত্যক্ষ করেন নাই, হয়ত অন্য কোন তীক্ষ্ণ-ধী-সম্পন্ন ব্যক্তি অনুমান, প্রত্যক্ষ বা বুদ্ধিবলে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—অপরের এবম্বিধ প্রত্যক্ষীভূত প্রমাণ গ্রহণ করাই শব্দ প্রমাণ বলিয়া অভিহিত। সাংখ্যাদি দর্শনকারগণ এই তিন প্রমাণই প্রশস্ত বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু নৈয়ায়িক গণ ইহার উপর আর একটি প্রমাণ স্বীকার করেন; তাহা উপমিতি—কিন্তু ধরিতে গেলে ইহা অনুমানেরই অন্তর্গত; এই জন্য সাংখ্যাদি শাস্ত্রে উপমিতিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। আবার নৈয়ায়িকগণ সর্ব্ব-সময়ে শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে আপ্তবাক্য কি গুরূপদেশ যে সর্ব্বথা অভ্রান্ত তাহা কে বলিতে পারে? সুতরাং মীমাংসক গণের ন্যায় সর্ব্বথা বেদের প্রামাণও গ্রাহ্য করিতে পারেন না; এবং এই জন্যই বেদ সম্বন্ধে গৌতম এই রূপ তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন;—

"তদপ্রামাণ্যম্ অনৃত-ব্যাঘাত-পুনরুক্ত-দোষেভ্যঃ।" অর্থাৎ বেদ অনিত্য ও অপ্রামাণ্য, কেননা ইহাতে অনৃত, ব্যাঘাৎ, ও পুনরুক্তি এই দোষত্রয় পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অন্য স্থলে তিনি এই দোষের নিরাকরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অভ্রান্ত ও নিত্য বলিয়া যে বেদ প্রামাণ্য তাহা নহে,—ইহা অভ্রান্ত পুরুষ-রচিত বলিয়া প্রামাণ্য, এবং সেই অভ্রান্ত পুরুষ ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই হইতে পারেন না; সুতরাং বেদ ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া প্রামাণ্য।

গৌতম পরমাণু হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াছেন সুতরাং এবিষয়ে তিনি ঈশ্বরের সর্ব্বকর্ত্তা শক্তির উল্লেখ করেন নাই; তবে ঈশ্বর যন্ত্রী স্বরূপ হইয়া সমুদয় চালাইতেছেন, এবং পরমাণু ঈশ্বর কর্তৃক পরিচালিত হইয়া জগতের সৃষ্টি সাধন করিয়াছে। এই দর্শন সম্বন্ধে অন্য যাহা যাহা বক্তব্য তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—সে সকল আর এস্থলে পুনরুল্লেখের আবশ্যকতা নাই; এক্ষণে ন্যায়দর্শনের কিরূপ প্রচার তাহাই দেখা যাইতেছে।

ইহা ভারতের সর্ব্বত্র আলোচিত হয় না—কখন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ—বঙ্গদেশই ইহার আলোচনার স্থল। এমন কি কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় প্রভৃতি বহুদূরতর দেশ হইতে বহুতর লোক নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছেন এরূপ শ্রুত হওয়া যায়। ন্যায় দর্শনের আলোচনা সম্বন্ধে ইহা বলিলে বোধহয় অযৌক্তিক হইবে না যে, যেদেশে লোকের মানসিক শক্তি যেরূপ প্রখর সে দেশে সেই রূপ শাস্ত্রেরই সমধিক আলোচনা হইয়া থাকে। ভারতের অন্যান্য দেশবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালীর মানসিক শক্তি সাধারণতঃ প্রখর। এদিকে ন্যায়শাস্ত্রও বিশেষ মানসিক শক্তিসাপেক্ষ; সুতরাং এই দেশেই যে ইহার বহুল অনুশীলনা হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? বঙ্গীয় পণ্ডিতকেশরী রঘু-

নাথ শিরোমণি হইতেই ন্যায়শাস্ত্রের উদ্ধার সাধিত হইয়াছে এবং সেই মহাপুরুষই প্রথমে বঙ্গদেশে ন্যায়বীজ রোপণ করিয়াছেন। এইরূপ কিম্বদন্তী, মিথিলায় একখানি মাত্র ন্যায়দর্শন বিদ্যমান ছিল; কোন ভিন্নদেশীয় লোক তাহার পাঠার্থী হইলে তাঁহাকে সেই গ্রন্থখানি প্রদত্ত হইত না, কেন না পাছে তিনি নকল করিয়া সেই পুস্তকখানি আপনার দেশে লইয়া গিয়া ইহার বহুল প্রচার করেন। পরিশেষে রঘুনাথ শিরোমণি উহার পাঠার্থী হইয়া মিথিলায় গমন করেন। তিনি সেই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তাহা আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন সুতরাং তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হইলে সেই গ্রন্থখানি তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিলেও তাহা তাঁহার স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত হইল না; তিনি স্বদেশে পদার্পণ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে সেই পুস্তকখানি আদ্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন; সুতরাং সেই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে ন্যায়দর্শনের চর্চ্চা আরম্ভ হয়, ক্রমে বঙ্গদেশ ইহার উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। ইদানীং তাহা কতকাংশে নির্ব্বাপিত হইলেও অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এখানে ইহার আলোচনা অধিক হইয়া থাকে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

গৌতম প্রণীত ন্যায়শাস্ত্রে মানসিক শক্তির অত্যাশ্চর্য্য পরিচালনা হইয়া থাকে; এবং অনেকে বলিয়া থাকেন পণ্ডিতাগ্রগণ্য আরিষ্টোটল (Aristotle) ইহারই ছায়া অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র রচনা করেন। মহাত্মা সর্ উইলিয়ম জোন্স বলিয়াছেন "যে স্থান হইতে সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় মহর্ষিগণের দর্শনশাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেই স্থান হইতেই পিথাগোরস এবং প্লেটো আপনাদের মত সংগ্রহ করিয়াছেন।" তিনি আরও বলেন "ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক অত্যাশ্চর্য্য বিষয়ের মধ্যে এক আশ্চর্য্য ন্যায়শাস্ত্রের বিষয় কালিস্থিনিস তাঁহার পিতৃব্যকে বলিয়াছিলেন, যাহা ব্রাহ্মণগণ অনুসন্ধিৎসু গ্রীকগণকে শিক্ষা দেন—এবং মুসলমান গ্রন্থকারগণ তাহাই আরিষ্টোটলের মতের ভিত্তি বলিয়া গণ্য করিয়াছেন"*। ন্যায়দর্শন কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন; তবে হিন্দুসমাজ দৃষ্টে ইহাই বোধ হয়, যখন বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নতির অত্যুচ্চ তোরণে উপনীত হইয়াছিল, সেই সময়েই ইহার উৎপত্তি। পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে শ্রুতিই আর্য্যগণের ধর্ম্মের

* "Nor is it possible to read the *Vedanta* or the many fine compositions in illustration of it, without believing that Pythagoras and Plato derived their sublime theories from the same source with the sages of India. *** Among other curiosities which Callesthenes transmitted to his uncle, was a system of logic, which the *Brahmans* had communicated to the inquisitive Greek, and which the Mahomedan writer supposes to have been the ground-work of the famous Aristotelian method." S. W. Jones' Eleventh Anniversary Discourse.

মূল গ্রন্থ ছিল; ইহা হইতেই তাঁহারা নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনাদি করিতেন; এইরূপে অনেক শতাব্দী অতিবাহিত হইলে পর এখন এক সম্প্রদায় উদ্ভূত হইলেন যাঁহারা বেদ ও বৈদিক কর্ম্মের প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ; ইহাঁদের প্রতাপে সমগ্র ভারত টল টল করিতে লাগিল; আর্য্যধর্ম্ম লোপ পাইতে লাগিল—তখন আর্য্যগণ আপনাদের ধর্ম্মরক্ষা এমন কি ঈশ্বরের সত্ত্বা প্রমাণ করিতেও অসমর্থ হইয়া পড়িলেন; আমাদের বিবেচনায় এই সময়েই মহর্ষি গৌতম ন্যায় সূত্র প্রণয়ন করেন; ন্যায় দর্শনের প্রধান অবলম্বন অনুমান কাণ্ড; গৌতম এই অনুমান কাণ্ড হইতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। যেমন বৃক্ষ হইতে আতা পতন নিউটনের মানসক্ষেত্রে অস্পষ্টভাবে মাধ্যাকর্ষণের বিষয় অঙ্কুরিত করিয়া দেয়; গৌতমও সেইরূপ ঘট ও কুম্ভকার হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন; ঘট কার্য্য, যখন কার্য্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তখন অবশ্যই তাহার কোন না কোন কারণ আছে, এই প্রসিদ্ধ সূত্র অবলম্বন করিয়াই মহর্ষি গোতম এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের একজন কারণ বা জনক আছেন তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। গোতমের সমস্তই অনুমানের উপর নির্ভর। আমাদের মতে বৌদ্ধগণের প্রাদুর্ভাব সময়েই ন্যায় দর্শনের সূত্র পাত হয় এবং তাহাই ক্রমশঃ শাখা প্রশাখায় পরিপুষ্ট হইয়া এতাদৃশ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে।

এক্ষণে ন্যায় দর্শন সম্বন্ধে অন্যান্য যে সকল গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারই বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। "গৌতম সূত্র ভাষ্য" বাৎস্যায়ণ প্রণীত; 'ন্যায় কুসুমাঞ্জলী' 'ন্যায় শাস্ত্রীয় কিরণাবলী,' 'বৌদ্ধাধিকার' ইত্যাদি গ্রন্থ উদয়নাচার্য্য প্রণীত; 'চিন্তামণি' গঙ্গেশ উপাধ্যায় কৃত; মৈথিল পণ্ডিতকেশরী পক্ষধর মিশ্র 'আলোক' নামে ইহার এক খানি টীকা রচনা করেন; গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত 'চিন্তামণি' গ্রন্থই সর্ব্বত্র মূল গ্রন্থের ন্যায় পঠিত হইয়া থাকে। রঘুনাথ শিরোমণি 'দীধিতি' নামে ইহার আর একখানি টীকা রচনা করেন; মথুরানাথ প্রণীত ইহার আর একখানি টীকা গ্রন্থ আছে; জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচার্য্য রঘুনাথের 'দীধিতির' টীকা প্রণয়ন করেন; এই গদাধর ভট্টাচার্য্য 'শক্তিবাদ' প্রভৃতি ন্যায় গ্রন্থের কর্ত্তা; বিশ্বনাথ ন্যায় সূত্রের বৃত্তিকার; বাচস্পতি মিশ্র, বাৎস্যায়ণ প্রণীত 'গোতম সূত্র ভাষ্যের' বার্ত্তিকের টীকা রচনা করেন; এইরূপ ন্যায় দর্শন সম্বন্ধীয় নানা প্রকার গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈশেষিক দর্শন। ইহা মহর্ষি কণাদ প্রণীত; কণাদের অপর নাম উলূক; এই জন্য কেহ কেহ এই দর্শনকে কাণাদ কেহ বা ঔলূক্য দর্শন বলে; ইহাতে অন্যান্য দর্শনের অনভিমত বিশেষ নামে এক স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া ইহার সাধারণ নাম বৈশেষিক দর্শন। মহর্ষি কণাদ ঈশ্বর স্বীকার করিয়াও সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহার প্রাধান্য রক্ষা করেন নাই। গোতম যে পরমাণুবাদ অস্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিয়াছেন ইনি সেই পরমাণুকেই জগতের

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং অদৃষ্টকে সকলের মূল বলিয়াছেন। অদৃষ্টই, তাঁহার মতে সকলের কর্ত্তা; যথা আমরা দেখিতে পাই ঃ—

"অগ্নেরূর্দ্ধজ্বলনং বায়োস্তির্য্যক্‌পতনমণূনাং মনসাংশ্চাদ্যং কর্ম্মাদৃষ্টকারিতং।"

অর্থাৎ অগ্নির ঊর্দ্ধজ্বলন, বায়ুর তির্য্যক পতন এবং পরমাণু ও মনের আদ্যক্রিয়া অদৃষ্টের দ্বারাই সংসাধিত হয়। তাহার মতে অদৃষ্টই প্রধান; তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রাধান্য তিনি একপ্রকার অস্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বরবাদী অনেকেই এই স্থল সম্বন্ধে বলেন যে, অদৃষ্ট সকল কার্য্যের কর্ত্তা হইলেও তাহা ঈশ্বর-প্রতিযোগী নহে, প্রত্যুতঃ ঈশ্বরই চালক স্বরূপ হইয়া অদৃষ্টকে ফিরাইতেছেন ঘুরাইতেছেন। ঈশ্বর যন্ত্রী, অদৃষ্ট তাঁহার যন্ত্র স্বরূপ,—তাহা ঈশ্বর-বিরোধী নহে। যাহাহউক ইহার মতেও অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তির নাম মুক্তি। এই দর্শন দশ অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়া আহ্নিকে এবং প্রত্যেক আহ্নিকে কতিপয় করিয়া প্রকরণ আছে।

অনেকে বিশেষতঃ উদ্দোৎকর মিশ্র ও শঙ্করাচার্য্য কণাদের পরমাণুবাদ বিশিষ্ট দর্শনের দোষ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার দর্শনকে নিরীশ্বর দর্শন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, মহর্ষি কণাদ তাঁহার সমুদয় দর্শনের মধ্যে কোন স্থলেই ঈশ্বরের নামোল্লেখ করেন নাই; কেবল তাঁহার প্রসিদ্ধ টীকাকার শঙ্করমিশ্র তৎকৃত টীকায় যেখানে সুবিধা পাইয়াছেন, সেই স্থলেই ঈশ্বরের নাম সংযুক্ত করিয়া তাঁহার দর্শনকে সেশ্বর দর্শন করিয়া তুলিয়াছেন। বাস্তবিক কণাদ কোনস্থলেই স্পষ্টাক্ষরে কিছুই বলেন নাই; আবার শঙ্কর মিশ্রও যে যে স্থলে ঈশ্বরের নাম যোজনা করিয়া দিয়াছেন, সেই সেই স্থলের অর্থও সর্ব্বথা সুসঙ্গত হয় নাই; প্রত্যুতঃ সেরূপ অর্থ না করিয়া অন্যরূপ অর্থ করিলে সেই সেই স্থলের অর্থ অপেক্ষাকৃত সুগম হইয়া পড়ে। আমরা তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি;—

"বায়ুসন্নিকর্ষে প্রত্যক্ষাভাবাৎ দৃষ্টং লিঙ্গং ন বিদ্যতে। তস্মাদাগমিকং। সংজ্ঞা কর্ম্মত্বমস্মদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গং।"

ইহার টীকাস্থলে শঙ্কর মিশ্র "অস্মদ্বিশিষ্টানাং" অর্থে "ঈশ্বর-মহর্ষীণাং" বলিয়া কৌশল পূর্ব্বক ঈশ্বরের নাম সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু 'অস্মদ্বিশিষ্টানাং' অর্থ 'ঈশ্বর মহর্ষীণাং' সমীচীন বোধ হয় না; বস্তুতঃ বহুবচনান্ত অস্মদ্বিশিষ্টানাং শব্দের কখন একবচনান্ত ঈশ্বর অর্থ হইতে পারে না। কণাদ এই স্থলে অস্যদ্বিশিষ্টানাং শব্দটী প্রয়োগ করিয়া অনেক সংজ্ঞা কর্ত্তারই উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এইরূপে তিনি কোথাও স্পষ্টরূপে ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই, তবে আমরা উদ্দোৎকর মিশ্রের ন্যায় তাঁহার দর্শনকে নিরীশ্বর দর্শন বলিব, না শঙ্কর মিশ্রের ন্যায় সেশ্বর দর্শন বলিব? তাহারই বিচার করা যাইতেছে। কণাদ কোন স্থলেই স্পষ্টরূপে ঈশ্বর স্বীকার না করিয়া গেলেও আমরা তাঁহার প্রণীত দর্শনকে সেশ্বর দর্শন বলিব; তাহার কারণ আছে, পরে উক্ত হইবে; কণাদ ঈশ্বরের নাম

কোথাও উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু তিনি প্রথমেই যে কতিপয় সূত্রে ধর্ম্মের লক্ষণ ইত্যাদি বর্ণন করিয়াছেন অনেকে তাহার মধ্যে "তদ্বচনাদাম্নায় প্রামাণ্যং" এই সূত্রটির, তদ্বচন অর্থে ঈশ্বর বচন বলিয়া ঈশ্বরের আরোপ করেন; এরূপ অর্থ সুসঙ্গত হইলেও আমরা ইহার ভিন্ন প্রকার অর্থ করিতে পারি; আমরা তদ্বচন অর্থে ঈশ্বর বচন না বলিয়া ধর্ম্মবচনও বলিতে পারি এবং তাহাই অধিক সমীচীন বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং যেস্থলে কণাদের ঈশ্বর স্বীকার সকলেই সূচনা করিতেছেন বস্তুতঃ কণাদ সে স্থলেও স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলেন নাই; সেই অস্পষ্টতা লক্ষিত হইতেছে; কেন না ইহার ত অন্যরূপ অর্থ করা যাইতে পারে আমরা এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি, কণাদ কোন স্থলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্ট স্বীকার করেন নাই; তবে যে তাহার প্রণীত দর্শনকে কেন সেশ্বর দর্শন বলিলাম তাহার কারণ আছে।

মহর্ষি কণাদ স্বপ্রণীত দর্শনের প্রথম কতিপয়সূত্রে ধর্ম্মের লক্ষণ ও বেদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, যথাঃ—

অথাতোধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ১।
যতোঽভ্যুদয়ো নিঃশ্রেয়সঃসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ। ২
তদ্বচনাদাম্নায়—প্রামাণ্যং। ৩।
বুদ্ধিপূর্ব্বাবাক্যকৃতির্ব্বেদঃ। ৪।

অর্থাৎ এক্ষণে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিব; যাহা হইতে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহাই ধর্ম্ম; ঈশ্বর বচন অন্যার্থে ধর্ম্মবচন বলিয়া বেদ প্রমাণ; বেদবক্তার যথার্থ জ্ঞান পূর্ব্বক বাক্য রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থলে কণাদ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যদিও উপরিধৃত সূত্রচয়ের মধ্যে তদ্বচনের ধর্ম্মবচন অর্থ করা যাইতে পারে, তত্রাপি তৎপরের সূত্রেই যখন যথার্থ জ্ঞান পূর্ব্বক বাক্য রচনা বলিয়া বেদ প্রমাণ বলিয়াছেন, তখন যেন কিছু না বলিলেও অপরিস্ফুটরূপে ঈশ্বর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন; কেননা মনুষ্য সর্ব্বদাই ভ্রম প্রমাদাদি জড়িত, বেদ বহুশাখা প্রশাখায় বিভক্ত, এবং তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় সকলও অজ্ঞান মনুষ্যের চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলের অগ্রাহ্য—অতএব অজ্ঞান-ভ্রান্ত মানব হইতে কখন বেদ প্রণীত হইতে পারে না। কিন্তু যখন বেদরূপ কার্য্য প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, তখন তাহার কারণ কেহ আছেনই; এদিকে যখন দেখা যাইতেছে একজন মনুষ্য অজ্ঞান—অন্যজন জ্ঞানবান, অপর একজন তাঁহা হইতেও অধিক জ্ঞান সম্পন্ন, তখন যে সকল দোষ বর্জিত অভ্রান্ত পুরুষ কেহই নাই তাহা কিপ্রকারে বলা যাইতে পারে; কিন্তু কেহ কখন কি এইরূপ অভ্রান্ত পুরুষ নয়নগোচর করিয়াছেন? বোধ হয় না; তবে সে অভ্রান্ত পুরুষ কে? তিনি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরভিন্ন আর কেহই নহেন; সুতরাং বৈশেষিক দর্শনের মতে বেদ ঈশ্বর-প্রণীত ও তাহা সেশ্বর দর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে; কণাদ ব্যতীত অন্য যেসকল বৈশেষিক মত দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের মতেও বেদ ঈশ্বর প্রণীত ও প্রামাণ্য। উদয়নাচার্য্যপ্রণীত কুসুমাঞ্জলি, অন্নভট্টকৃত তর্কসংগ্রহ, ভাষা পরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী, প্রভৃতি বৈশেষিক গ্রন্থও এই মতানুযায়ী।

বৈশেষিক দর্শনকে ন্যায়দর্শনের পরিশিষ্ট ভাগ বলা যাইতে পারে; গৌতম ও কণাদ উভয়েই স্বস্ব দর্শনে আত্মার প্রসঙ্গ করিয়াছেন, কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, ইহারা সকল আত্মাকেই নিত্য পদার্থ বলিয়াছেন।

অনেকের মতে এই দর্শন প্রণেতার প্রকৃত নাম কণাদ নহে; তাঁহার অন্য কোন নাম ছিল, তবে তিনি পরমাণু হইতে সমুদয় সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ইত্যাদি প্রমাণ করিয়াছেন বলিয়াই তাহাকে কণাদ নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

এদেশে বৈশেষিক দর্শনের আলোচনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ইহা কেবল ন্যায় শাস্ত্রালোচনায় তৎপর, এবং সেই জন্যই অদ্য আমরা রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ ভট্টাচার্য্য, গদাধর ভট্টাচার্য্য, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শঙ্কর তর্কবাগীশ প্রভৃতি মহাত্মাগণের নামকীর্ত্তন করিয়া আহ্লাদিত হইতেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় ন্যায় দর্শনেরই পরিশিষ্ট ভাগের আলোচনা এদেশে একেবারে নাই; কেবল বঙ্গদেশ কেন? বারাণসী অঞ্চল ব্যতীত ভারতবর্ষের আর কোথাও ইহার আলোচনা নাই, আবার সে স্থলেও যাহারা ইহার গবেষণায় রত তাঁহাদের সংখ্যা অতি সামান্য। সুতরাং বলিতে হইতেছে বৈশেষিক দর্শন ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইয়াছে; এই সময় হইতে ইহার আলোচনার বিশেষ বন্দোবস্ত না করিলে ইহা শীঘ্রই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

মীমাংসা দর্শন। মীমাংসাদর্শন দুই ভাগে বিভক্ত, পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত, তন্মধ্যে পূর্ব্ব মীমাংসা মহর্ষি জৈমিনী প্রণীত ও উত্তর মীমাংসা বেদব্যাস বিরচিত, এই উভয় দর্শনের নাম মীমাংসা দর্শন হইলেও জৈমিনীকৃত পূর্ব্বমীমাংসাই প্রকৃত প্রস্তাবে মীমাংসাশাস্ত্র; কেননা শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ উপস্থিত হইলে ইহারই আশ্রয় গ্রহণকরিয়া তাহার মীমাংসা করিতে। হয় এই দর্শনের নাম পূর্ব্ব মীমাংসা, তাহার কারণ ইহা বেদের পূর্ব্বাংশ অর্থাৎ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগ লইয়াই পরিপুষ্ট। বেদের উত্তরাংশ উপনিষদ লইয়া পরিপুষ্ট বলিয়া ব্যাসকৃত মীমাংসাশাস্ত্রের নাম উত্তর মীমাংসা।

পূর্ব্ব মীমাংসা যাগ, যজ্ঞাদির বিচার লইয়াই পরিপূর্ণ। ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র, স্মৃতি ইত্যাদি শব্দের প্রামাণ্য; দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মভেদ, উপোদ্ঘাত, প্রমাণাপবাদ, প্রয়োগ রূপ অর্থ; তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রুতি, লিঙ্গাদি বাক্যচিন্তা; চতুর্থ অধ্যায়ে জুহু, পর্ণ, রাজসূয়, দ্যূতাদি চিন্তা; পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রুত্যাদি প্রাবল্য দৌর্ব্বল্যচিন্তা; ষষ্ঠ অধ্যায়ে অধিকারী ও তদ্ধর্ম্মীয় প্রতিনিধি ও বহ্নিবিচার; সপ্তম অধ্যায়ে নামলিঙ্গাতিদেশাদি বিচার; অষ্টম অধ্যায়ে প্রবল লিঙ্গাতিদেশাপবাদ বিচার; নবম অধ্যায়ে উহাদি বিচার; দশম অধ্যায়ে নঞর্থাদি বিচার; একাদশ অধ্যায়ে তন্ত্রোপোদ্ঘাত, তন্ত্রপ্রপঞ্চ চিন্তা; এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রসঙ্গতন্ত্র নির্ণয় সমুচ্চয় বিকল্প বিচার। জৈমিনী মন্ত্রকেই দেবতা বলেন; মন্ত্রাতিরিক্ত

দেবতা স্বীকার করেন নাই। বৈদান্তিকেরা বলেন ;—

"অসর্পভূত রজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুনি অবস্ত্বারোপোঽধ্যারোপঃ। বস্তু সচ্চিদানন্দ মদ্বয়ং ব্রহ্ম। অজ্ঞানাদি সকল জড় সমূহোঽবস্তু। * * * এবমাচার্য্যেণ অধ্যারোপাপবাদপুরঃসরং তত্ত্বং পদার্থৌ শোধয়িত্বা বাক্যেন অখণ্ডার্থেইব বোধিতেঽধিকারিণোঽহং নিত্যবুদ্ধমুক্ত সত্যস্বভাব পরমানন্দানন্তাদ্বয়ং ব্রহ্মাস্মীত্য খণ্ডাকারা কারিতা চিত্তবৃত্তিরুদেতি। সাতুচিৎ প্রতিবিম্বসহিতা সতী প্রত্যগভিন্নমজ্ঞাতপরং ব্রহ্মবিষয়ী কৃত্য তদ্গতাজ্ঞানমেব বাধতে, তদা পদদাহে পটকারণ তন্তুদাহবৎ, অখিল কার্য্য কারণেঽজ্ঞানে বাধিতে সতি তৎকার্য্যস্য অখিলস্য বাধিতত্বাৎ তদন্তর্ভূতাখণ্ডাকারকারিতা চিত্তবৃত্তিরপি বাধিতা ভবতি। তত্রবৃত্তৌ প্রতিবিম্বিতং চৈতন্যমপি যথা প্রদীপ প্রভা আদিত্য প্রভাব ভাসনাসমর্থা সতি তয়াভিভূতা ভবতি, তথা স্বয়ং প্রকাশমান প্রত্যগভিন্ন পরং ব্রহ্মাবভাসনানর্হ্যতয়া তেনাভিভূতং সৎ স্বোপাধিভূত খণ্ডবৃত্তের্বাধিতত্বাৎ দর্পণাভাবে মুখ প্রতিবিম্বস্য মুখ মাত্রত্ববৎ প্রত্যগভিন্ন পরব্রহ্ম মাত্রং ভবতি।"

বেদান্তসার।

যেমন অসর্পভূত রজ্জুতে সর্পের আরোপ (জ্ঞান) করা হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ দ্বয় ব্রহ্ম রূপ বস্তুতে অবস্তু অজ্ঞানাদিরূপ জড় বস্তুর আরোপ হয়; ইহাকে অধ্যারোপ বলে; সেই সচ্চিদানন্দ দ্বয় ব্রহ্মই এক নিত্য; জীবাত্মা প্রভৃতি সমুদায় পদার্থই অনিত্য; সেই ব্রহ্ম হইতেই আকাশাদি ক্রমে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, আবার নিধন কালে তাঁহাতেই লয় হইবে। ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ নাই। পরমাত্মা চৈতন্য স্বরূপ ; দর্পণে যেমন মুখের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইরূপ মায়ায় পরমাত্মার প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে ; সেই প্রতিবিম্বিত পরমাত্মার নাম চৈতন্য। সেই পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ জ্ঞানের নাম সংসার, আর অভেদ জ্ঞানের নাম মুক্তি। যখন জীবের "আমিই ব্রহ্ম" এই জ্ঞান জন্মে, তখনই তিনি মুক্ত হন।

শঙ্করাচার্য্য এইরূপে ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—

"যৎসর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিব্রহ্মনিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্তস্বভাবং শারীরাদধিকমন্য তত ঋদ্বয়ং জগতঃ স্রষ্টৃ ব্রূমঃ।........... অপিচ যদা তত্ত্বমসীত্যেবং জাতোয় কৈনাভেদ নির্দ্দেশে নাভেদঃ প্রতিবোধিতো ভবতি, অপগতং ভবতি,তদা জীবস্য সাংসারিকত্বমিত্যাদি।"

সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্ম, যাঁহার স্বভাব সদত শুদ্ধ, যিনি সকল দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন, যাঁহাকে আমরা সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা বলি ; অপিচ যৎকালে তুমিই সর্ব্বময় ইত্যাদি বলিয়া থাকি তৎকালে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এক আমরা জানিতে পারি ; তন্মধ্যে জীবাত্মা সাংসারিক দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। ভগবদ্গীতায় তাহাকে এইরূপ বলা হইয়াছে ;—

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ৩১

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যা দাকাশং নোপলিপ্যতে।

সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩২

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ৩৩

ভগবদ্গীতা, প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যোগ নামক ত্রয়োদশাধ্যায়।

অর্থাৎ ব্রহ্ম অনাদি, নির্গুন, সনাতন; যেমন আকাশ সমুদায় পৃথিবী ব্যাপিয়া রহিয়াছে অথচ কিছুতেই লিপ্ত নহে, তদ্রূপ ব্রহ্ম সকল দেহ মধ্যেই বিরাজ করেন অথচ সকল বিষয়েই নির্লিপ্ত; যেমন এক সূর্য্য সমুদায় আলোক প্রদান করে সেইরূপ পরব্রহ্মও সকলের আলো স্বরূপ; পরমাত্মা সকল জীবেই অধিষ্ঠিত অথচ কাহারও পাপ পুণ্যের ভাগী নহেন। ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ, তিনি জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ।

বেদান্ত সূত্রে ভগবান ব্যাস দেব এই রূপে ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়াছেন 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।' চিত্তশুদ্ধির অনন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়; প্রাণ, মন, জীবাত্মা, শব্দ, মন্ত্র, অন্ন, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বহুতর শব্দ ব্রহ্ম শব্দের প্রতিপাদক হইতে পারে; তন্মধ্যে মনুষ্য কোন্ ব্রহ্মের জিজ্ঞাসু। তাহারই নিরাকরণার্থ তিনি দ্বিতীয় সূত্রে বলিতেছেন "যস্মাদ্যস্য যতঃ" অর্থাৎ যিনি সকলের জন্ম, স্থিতি ভঙ্গের কারণ। কিন্তু এক কথাতেও সকল সন্দেহ দূরীকৃত হয় নাই। কেননা শ্রুতিতে অনেক স্থলে বেদকে নিত্য বলে যথা "বাচা বিরূপ নিত্যয়া" বেদ নিত্য বাক্য; সুতরাং যদি বৈদিকগণ এরূপ মনে করেন যে বেদ অপৌরুষেয়—ব্রহ্ম সকলের কারণ হইলেও বেদের কারণ নহেন; এই সন্দেহ নিরাকৃত করিবার জন্য তিনি বলিলেন "শাস্ত্র যোনিত্বাৎ" শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ নিত্য নহে তাহার ও কারণ ব্রহ্ম। স্বরূপ জ্ঞান লাভার্থ বেদই কারণ বা প্রমাণ স্বরূপ; সৃষ্টির প্রথম সময় হইতেই মনুষ্য গণ যে যে জ্ঞানের অধিকারী হইয়া আসিতেছেন তাহার নিদর্শন বেদেই আছে। এখানে এই সন্দেহ হইতে পারে যে, বেদে যখন নানা দেবতার পূজা ও নানা যজ্ঞের বৃত্তান্ত আছে তখন ইহা কেবল ব্রহ্মোপাসনার প্রমাণ কিরূপে হইতে পারে? এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ তিনি চতুর্থ সূত্রে বলিয়াছেন 'তত্তু সমন্বয়াৎ' বেদে যত প্রকার উপাসনার বিধি থাকুক না কেন তৎসমস্তই ব্রহ্মের উদ্দেশে। বেদের সমুদায় তাৎপর্য্য কেবল ব্রহ্মেতেই বর্ত্তমান; অন্য কোন পদার্থেই সে তাৎপর্য্য প্রয়োগ হইতে পারে না; এখানে আর এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, যদি সাংখ্যগণ এরূপ বলেন যে, সনাতন ব্রহ্ম সকলেরই কারণ এবং বেদে তাঁহারই উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু সে ব্রহ্ম শব্দের প্রতিপাদক অজ্ঞান প্রকৃতি; এ জগৎ কোন জ্ঞানবান কর্ত্তা হইবে। সৃষ্ট হয় নাই; সেই অজ্ঞান প্রকৃতিই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ এবং তাহাতেই বেদের সমুদায় তাৎপর্য্য নিহিত। এই সন্দেহ দূরীকরণার্থ তিনি পঞ্চম হইতে কতিপয় সূত্র রচনা করিলেন; যথা "ঈক্ষতের্নাশব্দং" বেদে অজ্ঞান প্রকৃতির কর্তৃত্ব বলা হয় নাই; যেহেতু "ঈক্ষতি" অর্থাৎ

সৃষ্টির সঙ্কল্প করা চৈতন্য অপেক্ষা করে। ঐ কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে বেদে "আত্মা" শব্দের উল্লেখ আছে; সেই আত্মা শব্দে চৈতন্য স্বরূপ পরব্রহ্ম,—অজ্ঞান প্রকৃতি নহে; সে কর্ত্তৃত্ব গৌণভাবেও অজ্ঞান প্রকৃতিতে অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না। কেননা বেদে চৈতন্যনিষ্ঠেরই মোক্ষফল বর্ণিত হইয়াছে; জড়নিষ্ঠের নহে। প্রকৃতি "যৎ" শব্দের বাচ্য নহে ব্রহ্মই উহার প্রতিপাদক; সেই যৎপদবাচ্য অন্তরাত্মাতেই জীবাত্মার লয় প্রাপ্ত হয়—ইহাই বেদের অভিপ্রায়; জড়ে নহে কেন না তাহা হইলে চেতন স্বরূপ জীবাত্মার জড়ত্ব দোষ ঘটে ইত্যাদি। শ্রুতির মতে ব্রহ্মই আনন্দময়; জীবাত্মার ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, সুতরাং জীবাত্মা এবং পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বিভিন্ন তাহা বেদেই প্রাপ্ত হওরা যায়; আবার ব্রহ্মই আনন্দময়। আনন্দময় বলিলে জীবাত্মা আনন্দময় নহেন—সুতরাং ব্রহ্মই জীবাত্মার আনন্দের আধার তাহাই বলা হইল; ব্রহ্ম আনন্দময়, জীবাত্মা তাহার ভোক্তা। ব্রহ্মই একমাত্র অন্তর্যামী; জীবাত্মা নহে।

বেদে কোন কোন স্থলে আকাশকেই লোকের গতি বলা হইয়াছে, সে স্থলে আকাশ অর্থে ব্রহ্ম, আকাশ নিরাকার, নির্লিপ্ত ও সকল বস্তুর আধার বিধায় ব্রহ্মের সহিত আকাশের চমৎকার রূপক হইয়াছে,—ভগবদ্গীতাতেও আমরা ঠিক এই ভাবের শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। বেদে ঈশ্বর প্রাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সে প্রাণ শব্দে ব্রহ্ম, এইরূপে নানা সন্দেহ বিদূরিত করিয়া মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জীবাত্মাকে দ্বৈত ও উপাসক বলিয়া স্থির করণান্তর কেবল একমাত্র সেই পরব্রহ্মেরই উপাসনা খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন।

বেদান্ত মতে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্পূর্ণ শক্তিদ্বারা জগৎ সৃষ্ট করেন নাই, তাঁহার এক বিন্দু শক্তি এই জগতের কর্ত্তা, সেই শক্তির নাম মায়া।—পরমেশ্বর-স্বত্তাও সর্ব্বব্যাপী; সমুদায় পদার্থই তাঁহার মধ্যগত; এই জন্য এই জগৎ রচনাও তাঁহার মধ্যগত। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকারগণ বলেন পরমাণু ও জীব পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র ছিল; ঈশ্বর তাঁহাদের সংযোজনা করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু বেদান্ত দর্শন তাহা বলেন না; তিনি বলেন, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান; এই জন্য জগৎ সৃষ্টির সমুদায় উপাদানই তিনি স্বয়ং সৃষ্টি করিতে পারেন এবং সেই কর্ত্তৃত্ব ও উপাদান সংযোগ পূর্ব্বক এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন; এই জন্যই ইহাদের মতে তিনিই কর্ত্তা; তিনিই কার্য্য; ঈশ্বর প্রকৃতির সহিত যখন কর্ত্তা হন তখন সেই প্রকৃতি মায়া; আর যখন সেই প্রকৃতির সহিত তিনি কার্য্যরূপ হন তখন তিনি 'অবিদ্যা'। ইহার মধ্যে কর্ত্তারূপ মায়াই শ্রেষ্ঠ, এই জন্য ইহাকে 'বিশুদ্ধ সত্ব প্রধান' অথবা 'নির্ম্মল সত্ব প্রধান' করিয়াছেন; এবং 'অবিদ্যা' তদপেক্ষা নিকৃষ্ট সুতরাং 'তমোমিশ্রিত সত্ব প্রধান' অথবা 'মলিন সত্ব গুণ বিশিষ্ট' পদবাচ্য। আবার এই অবিদ্যার ভাল, মন্দ আছে; সেই উৎকৃষ্ট অবিদ্যা হইতে জীবের উৎপত্তি ও নিকৃষ্ট হইতে পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঈশ্বরের কার্য্যরূপা প্রকৃতি

অবিদ্যা; এবং সেই অবিদ্যা হইতে জীবের উৎপত্তি বলিয়া জীব সেই অবিদ্যাতেই আচ্ছন্ন—সুতরাং সে নিজে ব্রহ্ম স্বরূপোৎপন্ন হইয়াও আপনাকে (ব্রহ্মকে) জানিতে পারে না। ভ্রম ক্রমে অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করে; অবিদ্যার এই আচ্ছাদক শক্তির নাম 'আবরণ শক্তি' এবং ঐ ভ্রমের নাম 'অধ্যাস'। এই জন্যই 'অবিদ্যার' প্রচলিত অর্থ অজ্ঞান।

আমরা ভগবদ্গীতাতেও এই মায়ার প্রভাব দর্শন করিতে পারি; যথা সপ্তম অধ্যায়ে;—

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥
ন মাং দুষ্কৃতি নো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃত জ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥১৫

অর্থাৎ আমার মায়া গুণময়ী; তাহাকে সহজে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই; তবে যে ব্যক্তি আমার ভজনা করে সেই ব্যক্তিই তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ। মূঢ় নরাধম লোক আমার ভজনা করে না; তাহারা মায়া কর্তৃক অপহৃতচেতন হইয়া আসুর ভাব ধারণ করিয়াছে। পঞ্চদশী নামক বৈদান্তিক গ্রন্থেও এই মায়ার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; যথা;—

স্পষ্টং ভাতি জগচ্চেদমশক্যং তন্নিরূপণম্।
মায়াময়ং জগত্তস্মাদীক্ষস্বাপক্ষপাততঃ॥
নিরূপায়িতুমারব্ধে নিখিলৈরপি পণ্ডিতৈঃ।
অজ্ঞানংপুরতস্তেষাংভাতি কক্ষাসু কাসুচিৎ।

এই জগৎ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে; কিন্তু তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব; সেই জন্য পক্ষপাত শূন্য হইয়া এই জগৎ মায়াময় জ্ঞান কর; যৎকালে পণ্ডিত মণ্ডলী ইহার তত্ব নিরূপণে সচেষ্টিত, তখন অজ্ঞানেরা তাহার একাংশবিৎ হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে প্রকাশ পায়।

এইরূপে এই মায়ার বিষয় আমরা প্রায় সমুদায় বৈদান্তিক গ্রন্থেই দেখিতে পাই।

বেদান্ত দর্শন মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত; ইহাতে চারিটি অধ্যায় আছে; প্রত্যেক অধ্যায় আবার চারি চারি পাদে বিভক্ত; সেই সকল পাদ পুনরায় অধিকরণে বিভক্ত, বৈদান্তিক গ্রন্থ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য প্রস্তুত করেন; এই ভাষ্যকে 'শাঙ্কর দর্শন' বলে; 'বেদান্তসার' সদানন্দ যোগীন্দ্র বিরচিত; ইহার দুই খানি টীকা গ্রন্থ আছে যথা 'সুবোধিনী' নৃসিংহ সরস্বতী প্রণীত এবং 'বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী' রামতীর্থ প্রণীত; 'পঞ্চদশী' নামে আর একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ আছে; তাহা শ্রীমদ্ ভারতী তীর্থ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর কৃত; 'বেদান্ত ভাষ্য' রামানুজ প্রণীত; মাধবাচার্য্য 'বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য' প্রস্তুত করেন। বল্লভাচার্য্যও বেদভাষ্যকার বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত মতানুসারে একখানি বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। 'খণ্ডন খণ্ডন খাদ্য' শ্রীহর্ষ প্রণীত।

পূর্ব্ব মীমাংসার অন্তর্গত ও অনেক গুলি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মাধবাচার্য্য প্রণীত 'অধিকরণ মালা।' এই মাধবাচার্য্যই 'সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত কুমারিলভট্ট ও

মণ্ডনমিশ্র এই দর্শনের বার্ত্তিককারক।'শাস্ত্রদীপিকা' পার্থসারথি বিরচিত,'প্রকরণপ্রপঞ্চিকার,' শালীনাথ মিশ্র প্রণীত, ইত্যাদি নানা গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

চার্ব্বাকদর্শন। ইহা মহর্ষি চার্ব্বাক প্রণীত, এই চার্ব্বাক কোন্ সময়ের লোক তাহা নির্ণয় করিবার কোন সদুপায় নাই। আমরা মহাভারতে এক চার্ব্বাককে দেখিতে পাই,—তিনি দুর্য্যোধনের পরম বন্ধু ছিলেন, আবার রামায়ণ—বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও তাঁহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলেই চার্ব্বাক কোন সময়ের লোক তাহা সহজে নির্ণিত হইতে পারে না, তত্রাচ তিনি যে অতি প্রাচীন কালের লোক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই দর্শন মতে সুখই পরম পুরুষার্থ—কিন্তু ইহা দুঃখ পরিবেষ্টিত, সুখ পাইতে হইলে দুঃখ ও ভোগ করিতে হইবে। তাঁহাদের মতে যাঁহারা দুঃখ মিশ্রিত বলিয়া সুখ ভোগ করিতে চাহেন না, তাঁহারা পশুবৎ মূর্খ, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই মানব জীবনে দুঃখ অপেক্ষা সুখের ভাগই অধিক। সুতরাং সে সুখ পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুঃখ ভোগ করা মূর্খতা ব্যতীত আর কি? কিন্তু দেখিতে হইতেছে এই সুখভোগ ইহকালে অধিক, না পরকালে? যদি পরকাল থাকে তাহা হইলে তথায় সুখের আধিক্য হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু চার্ব্বাক মতাবলম্বীরা আদৌ পরকাল স্বীকার করেন না,—তাঁহারা বলেন ইহকালেই সুখ, পরকাল অসম্ভব। ইহাদের মতে ঈশ্বর অসিদ্ধ, সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরকে কেহ কখন দেখেন নাই; তবে যাঁহারা তাঁহার সত্তা প্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অনুমানের উপর। যেমন আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি একটি ঘট রহিয়াছে; ঘটটি কার্য্য, অবশ্যই তাহার কোন কারণ আছে, আমরা সেই কারণ স্থলে কুম্ভকারকে দেখিতে পাই, এইরূপে আমরা যে কোন কার্য্যই নয়ন গোচর করি না, তাহার কোন না কোন কারণ দেখিতে পাই। সেইরূপ এই বিশাল জগৎরূপ কার্য্য যখন অবলোকন করিতেছি তখন ইহার সেইরূপ মহান্ কোন কারণ আছেনই—সেই কারণ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই নহেন। এইরূপ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই ঈশ্বর তত্ত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু চার্ব্বাক মতবাদীরা বলেন আদৌ অনুমান অগ্রাহ্য, তাঁহারা বলেন, অনুমান ব্যাপ্তি-জ্ঞান সাপেক্ষ—কিন্তু এই ব্যাপ্তি জ্ঞান কিরূপে হয়? যদি বল প্রত্যক্ষ দ্বারা, তবে বাহ্য কি অন্তর কোন প্রকার প্রত্যক্ষ দ্বারা? চক্ষু ইত্যাদি দ্বারা যে দর্শন হয় তাহাই প্রত্যক্ষ দর্শন, কিন্তু এরূপ প্রত্যক্ষ এক্ষণে সম্ভব হইলেও ভবিষ্যত কালে অসম্ভব হইতে পারে, যথা,—'নতাবৎ প্রত্যক্ষং তচ্চ বাহ্য মান্তরং বাভিতম্। ন প্রথমঃ তস্য সম্প্রযুক্ত বিষয় জ্ঞান জনকত্বেন ভবতি প্রসরসম্ভবেঽপি ভূতভবিষ্যতোস্তদসম্ভবেন সর্ব্বোপসংহারবত্যা ব্যাপ্তে দুর্জ্ঞানত্বাৎ।

চার্ব্বাক মতাবলম্বীগণ এইরূপে প্রত্যক্ষ ব্যতীত যত প্রকার প্রমাণ আছে তৎসমুদায়ই খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বেদ ভণ্ড, ধূর্ত্ত, নিশাচরপ্রণীত, সুতরাং তাহা অপ্রামাণ্য, তাহাতে কেবল যাহা

কষ্টকর তাহা সম্পাদন করিবারই ব্যবস্থা প্রকটিত আছে; যাহাকে সুখের নিদান বলিয়া আমার দৃঢ় জ্ঞান, বেদে তাহাই দুঃখের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। সাংসারিক-সুখদ-সমুদয় বস্তুই পারলৌকীক দুঃখের মূল বলিয়া বেদের মতে তাহা পরিত্যজ্য, আবার উপস্থিত যাহা অতিশয় ক্লেশকর বলিয়া পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে—বেদ তাহাই সুখের নিদান বলেন। আবার প্রায় প্রতি কথাতেই ব্রাহ্মণকে দান করিবে—তাহাদিগকে ভোজন করাইবে, এইরূপ বিধি থাকায় স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে তাহা কপটব্রাহ্মণ গণের ধূর্ত্ততা সমুদ্ভূত ভিন্ন আর কিছুই নহে। চার্ব্বাক মতাবলম্বীরা বেদকে একেবারেই অগ্রাহ্য করেন, সুতরাং ইহাতে পরকাল ও ঈশ্বরও অস্বীকৃত হইতেছে। এই দর্শনে পরকাল অস্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া ইহার অপর নাম লোকায়ত দর্শন।

ইহারা দেহাতিরিক্ত আত্মার স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন, দেহাতিরিক্ত আত্মা কোথাও প্রত্যক্ষ করা যায় না, যেখানে আত্মা লক্ষিত হয়, সেই স্থলেই তাহা দেহের অন্তর্গত। যেখানে দেহ বিনষ্ট হয়, আত্মাও আর তথায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এইস্থলে চার্ব্বাকবাদীগণকে কেহ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ঈশ্বর যদি অসিদ্ধ হইলেন তবে দেহের অভ্যন্তরে আত্মা সংযুক্ত কে করিল? ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন;——

অত্রচত্বারি ভূতানি ভূমি বার্য্যনলানিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলুভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে॥
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যোমদশক্তিবৎ।

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শন।

যেমন নানারূপ দ্রব্যের সমবায়ে সুরার মাদকতা শক্তি জন্মে সেইরূপ ক্ষিত্যপ্তেজমরুৎ এই চারিভূতের সংযোগে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, সুতরাং মৃত্যুকালে যখন উক্ত চারিভূতের বিশ্লেষণ ঘটিবে তখন চৈতন্যও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। এই স্থলে যদি কেহ বলেন যে যদি চারিভূতের সমবায়েই চৈতন্য উৎপন্ন হইল তবে যখন সেই চারিভূতই বর্ত্তমান তখনও চৈতন্য কেন বিলুপ্ত হয়? তদুত্তরে চার্ব্বকবাদীগণ বলেন, যৌবনকালে যখন চারিভূতেরই ক্ষমতা সমান প্রবল থাকে তখন আত্মাও সতেজ থাকে, ক্রমে বয়োধিক্য বশতঃ যখন ঐ ভূতগণ শ্লথ ও কর্ম্মাক্ষম হইতে থাকে, তখনই ক্রমশঃ আত্মারও তেজ কমিতে থাকে, এবং ঐ ভূতের কার্য্যকরী ক্ষমতা যখন একেবারেই নিরস্ত হইয়া যায়, তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হয়, আবার সময়ে সময়ে শারীরিক পীড়াদি বশতঃ ঐ চারিভূতের কার্য্যকরী ক্ষমতার হ্রাসতা হইলে চৈতন্যেরও তেজ কমিতে থাকে। এইজন্যই দেখাযায় যে ব্যক্তি যৌবন কালে মানসিক শক্তি চালনে অদ্বিতীয় ছিলেন, বার্দ্ধক্যে তিনিই আবার সেই মানসিক শক্তি পরিচালনে অপরের হেয়, উপরি কথিত কারণেই এইরূপ হইবার নিদান, চার্ব্বাকবাদীগণ এইস্থলে সেশ্বর বাদীগণকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি আত্মা ঈশ্বর প্রদত্ত ও তাহা দেহ হইতে ভিন্ন হইল, তবে বার্দ্ধক্য বশতঃ দেহ শ্লথ হইলেও ঈশ্বরের

অংশস্বরূপ আত্মার সতেজ অবস্থায় থাকা কর্ত্তব্য, কেননা তাহা দেহ হইতে ভিন্ন, দেহের সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। তাহা হইলে যে ব্যক্তি যৌবনকালে বুদ্ধি-শক্তি পর্য্যালোচনায় অদ্বিতীয়, তিনিই আবার তৎপর্য্যালোচনে অক্ষম কেন হন। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি শক্তি সমান থাকা উচিত, কেননা শারিরীক বিকারে তাহার কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই। যে-হেতু তাহা দেহ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। চার্ব্বাক মতাবলম্বীগণের এই সকল যুক্তির প্রতিবাদ করিতে এপর্য্যন্ত বিজ্ঞান অশক্ত, এইক্ষণে যতই বিজ্ঞানের চর্চ্চা বৃদ্ধি হইতেছে ততই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির অপহ্নব হইতেছে—ততই চার্ব্বাক শিষ্য দলবদ্ধ হইতেছেন—ততই নাস্তিকতার বৃদ্ধি হইতেছে—তাই আমরা পুনরায় বলি ইহা কথনই সুখের নিদান নহে।

বৌদ্ধদর্শন। এই দর্শনও প্রায় চার্ব্বাক দর্শনেরই অনুযায়ী, উভয় দর্শনে সামান্যই প্রভেদ,চার্ব্বাক পরকাল স্বীকার করেন নাই ইহারা তাহা করেন, নচেৎ তাঁহাদের মত ইহারাও নিরীশ্বরবাদী। আমরা বহু পূর্ব্বকাল হইতেই এই নিরীশ্বরবাদীগণের উল্লেখ দেখিয়া আসিতেছি। সাংখ্যদর্শন প্রণেতা মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ এবং আমাদের বিবেচনায় তিনিই বৌদ্ধদর্শনের সূত্রপাত করিয়া যান, বৌদ্ধেরা বলেন কপিলদেব বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধ। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইলে আমরা সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিলকেই এই কপিলদেব নামের লক্ষ্য বলিয়া বোধ করিতে পারি। কপিল নিরীশ্বরবাদী, বুদ্ধদেবও তাহাই। কপিল সাংসারিক দুঃখচিন্তায় জর্জ্জরিত, বুদ্ধদেবও সাংসারিক দুঃখচিন্তায় কাতর; কপিল বলেন দুঃখের কারণ জন্ম,—জন্মের কারণ কর্ম্ম, কর্ম্মের কারণ প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির কারণ অজ্ঞানতা;—বুদ্ধদেবও তাহাই বলিয়াছেন। সাংখ্যগণ বলেন কারণের রূপান্তর কার্য্য; বৌদ্ধমতে জগৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন কার্য্য সমুত্থিত হইতেছে—সুতরাং কোন পদার্থই ক্ষণাধিক কাল স্থায়ী নহে; আমরা যে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহাদিকে বহুকাল স্থায়ী বলিয়া জ্ঞান করি দার্শনিক অনুসন্ধানে তাহাও পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া প্রমাণীকৃত হয়; এই ক্ষণিকত্ব-বাদই বৌদ্ধদর্শনের অবলম্বন, এবং ইহা বিশেষ সপ্রমাণ করিতেছে যে এই বৌদ্ধদর্শন অনেক দার্শনিক আলোচনার ফল। তাঁহাদের মতে জগতের সমুদায় পদার্থই ক্ষণিক; তবে যে সকল বস্তুকে স্থির বলিয়া বোধ হয় তাহা কেবল প্রবাহের শক্তিতে। বর্ত্তমান দেহে সদতই বিজ্ঞান ধাতুর উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে—যদি মধ্যে কোন ব্যবধান কাল থাকিত তাহা হইলেই তাহা প্রতীতি হইত; তাহা নাই বলিয়াই আত্মা চিরকাল সমান ভোগ করিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাহা দ্বারা ক্ষণিক, বস্তুকে স্থির বলিয়া বোধ হয় তাহার নাম 'অবিদ্যা'। জগতের সকল পদার্থই ক্ষণিক কেবল এই অবিদ্যা প্রভাবেই আমরা তাহাদিগকে আছে বা থাকিবে বলিয়া বোধ করি। সুতরাং ইহাদের মতে আত্মাও নিত্য নহে।

তাঁহাদের মতে এই জগৎ দুঃখ পরিপূর্ণ এবং অবিদ্যাই তাহার কারণ; সুতরাং সেই অবিদ্যাকে নিরোধ করিতে পারিলেই ক্রমশঃ সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উৎপত্তি, নষ্ট হইয়া যায়; উৎপত্তি নষ্ট হইলেই সকল দুঃখের অবসান হইল,—এই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তির নাম নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে সুখ, দুঃখ, আত্মা আর কিছুই থাকে না, সকলই মুক্ত হইয়া যায়; সুতরাং তখন আর পর জন্মেরও ভয় কিছুমাত্র থাকে না, কেন না নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে আত্মাও ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য যতদিন না নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতেছেন ততদিন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতেই হইবে। এই জন্যই নির্ব্বাণ প্রাপ্তিই বৌদ্ধগণের প্রধান লক্ষ্য।

কপিল জগতের মূল তত্ত্ব চতুর্ব্বিংশতি, পতঞ্জলি পঞ্চবিংশতি, গৌতম ষোড়শ, কণাদ সপ্ত স্থির করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধদার্শনিক মতে জগতের মূল তত্ত্ব দুই, চিত্তও ভূত। এই দুই পদার্থ দ্বারাই বাহ্য ও অন্তর সমুদায় কার্য্যই সম্পাদিত হইতেছে। ভূত চারিটি। ইহাঁরা মূল পদার্থকে ধাতু শব্দে আখ্যাত করিয়াছেন; তদনুযায়ী ইহাঁদের মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু এই চারিটি ধাতু; ব্যোম ধাতুর মধ্যেই নহে, আবরণাভাবই আকাশ।

বেদান্ত দর্শন বলেন বৌদ্ধদিগের প্রধান মত বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার, ও মাধ্যমিক। আমরা 'বোধিচিত্ত বিবরণ' নামক বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাই এই নামের চারিজন ব্যক্তি বুদ্ধদেবের নানা শিষ্যের মধ্যে প্রধান ও তাঁহারা পরে আচার্য্য হইয়াছিলেন, যথা 'সৌত্রান্তিকো বৈভাষিকো যোগাচারো মাধ্যমিকশ্চেতি চত্বারঃ শিষ্যাঃ'। ঐ গ্রন্থ আরও বলেন যে ইহাঁরা বুদ্ধদেবের উপদেশ সম্যক রূপে অবধারণ করিতে না পারিয়াই প্রত্যেকে বিভিন্ন মতে উপনীত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। বাস্তবিক ইহারা এক সময়ে ও এক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন মতে প্রস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে ইহাঁদের নামানুসারেই সেই মত বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে বেদান্ত দর্শনের মত পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে, এক্ষণে এই চারিজনের মতের পার্থক্য নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।—বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক মতাবলম্বীরা বাহ্যবস্তু ও বিজ্ঞান উভয়ই স্বীকার করেন, কিন্তু বাহ্যবস্তু ক্ষণিক। যখন তাহা প্রত্যক্ষীভূত হয় তখনই তাহার স্বত্তা থাকে নচেৎ পরক্ষণেই তাহা ধ্বংশ হয়। যোগাচার মতাবলম্বীগণ কেবল বিজ্ঞান স্বীকার করেন, বাহ্যবস্তু স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে এই জগৎ স্বপ্নাদিবৎ; যেমন স্বপ্ন নানা রূপ অপূর্ব্ব ব্যাপার প্রত্যক্ষীভূত করায়, অথচ প্রকৃত পক্ষে তাহারা কিছুই নহে—ভোজবাজী মাত্র—এই অদ্ভুত ক্রিয়া কলাপ বিশিষ্ট জগৎও তাহাই। মাধ্যমিক মতাবলম্বীগণ বাহ্যবস্তু বা বিজ্ঞান কিছুই স্বীকার করেন না—তাঁহাদের মতে সকলই শূন্য। এইজন্য বেদান্ত দর্শন যোগাচার মতাবলম্বীগণকে বিজ্ঞানবাদী ও মাধ্যমিকগণকে শূন্যবাদী

বলিয়াছেন। অদ্যাপি ভোট দেশীয় পণ্ডিত গণ এই চারি মতেরই আলোচনা করিয়া থাকেন।

আমাদের আর্য্য ঋষিগণ বৌদ্ধগণকে নাস্তিক, তাঁহাদের ধর্ম্মকে পাষণ্ড ধর্ম্ম, তদ্ধর্ম্মাবলম্বীগণকে 'যথাহি চৌরঃ সতথাহি বুদ্ধঃ' চৌর, দৈত্য, ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে বৌদ্ধধর্ম্ম যে সামান্য নহে ও এরূপে অভিহিত হইবার উপযুক্ত নহে, তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। তবে যে পূর্ব্বতন ঋষিগণ তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিবেন তাহার বিশেষ কারণ আছে, ইঁহারা বেদ বিদ্বেষী; সনাতন হিন্দুধর্ম্মের নিন্দুক, —তাহার মূলোৎপাটনে যত্নশীল—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাধান্য লোপে সচেষ্টিত ছিলেন; সুতরাং আর্য্য ঋষিগণ তাহাদিগকে সেরূপ বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যখন বৌদ্ধধর্ম্ম অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল, দেশীয় রাজা পর্য্যন্ত যখন তদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তৎপ্রচারে যত্নবান হইলেন, যে সময়ে বৌদ্ধদেবের জয় পতাকা সর্ব্বত্রই উড্ডীন হইতে লাগিল, যখন ব্রাহ্মণগণ আর কিছুতেই তাঁহাদের তেজ সহ্য করিতে সক্ষম হইলেন না, তখন আর বুদ্ধদেবকে চৌর, নাস্তিক, ভণ্ড ইত্যাদি বলিতে সাহস হইল না। তখন ভিন্ন প্রকারে তাহাদের মনোরথ সিদ্ধির জন্য সচেষ্টিত হইলেন—যাহাতে পুনরায় ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের জয় হয় তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণ বুদ্ধদেবকে নারায়ণের অবতার বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন ও তিনি কেবল অবতার বলিয়া গণ্য হইলেন। এইরূপে অবতার মধ্যে গণ্য করিয়াই বিষ্ণুপুরাণকার অমনি বলিলেন;—

অন্যানপ্যন্য পাষণ্ড প্রকারৈর্বহুভির্দ্বিজঃ।
দৈত্যোয়ান্মোহয়ামাস মায়ামোহবিমোহকৃৎ
স্বল্পেনৈব হি কালেন মহামোহেন তেঽসুরাঃ।
মোহিতাস্তত্যজুঃ সর্ব্বাং ত্রয়ীমার্গাশ্রিতাং-
কথাং॥ ইত্যাদি।

যখন দৈত্যগণ অতিশয় প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল, দেবগণ তাহাদের সহিত সংগ্রামে কাতর হইয়া পড়িলেন—যখন তাহাদিগকে দমন করিবার অন্য কোন উপায় রহিল না, তখন দেবগণ মন্ত্রণা করিলেন অসুরগণকে স্বধর্ম্মচ্যুত না করিলে আর তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারা যাইতেছে না। সুতরাং দৈত্যগণকে স্বধর্ম্মচ্যুত করিবার জন্যই নারায়ণ আপনার শরীর হইতে 'মায়ামোহের' সৃষ্টি করিলেন; এই মায়ামোহ অসুরগণের আবাসস্থল নর্ম্মদানদীর তীরে উপনীত হইয়া নাস্তিকতা প্রচার পূর্ব্বক দৈত্যগণকে সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। সুতরাং তাহারা সহজেই দেবগণের বধ্য হইল। ব্রাহ্মণগণ এবম্বিধ নানা প্রকার কৌশলজাল বিস্তার করিয়াই ক্রমশঃ পূর্ব্বধর্ম্ম রক্ষা করণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, নচেৎ বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও আমাদের দেশ হইতে অন্তর্হিত হইত কি না কে বলিতে পারে? তত্রাপি পৃথিবীস্থ তিন ভাগের এক ভাগ লোক এক্ষণেও উক্ত উৎকৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। কোন ধর্ম্মই এতদূর বিস্তৃতি লাভ করে নাই। পণ্ডিত চূড়ামণি অগষ্ট কোম্‌ট (Auguste Comte) ইহার মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন; সেই জন্যই তিনি প্রত্যেককেই

জীবনের মধ্যে এক একবার বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তক পাঠ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের নৈয়ায়িকগণের কি ক্ষমতা—তাঁহারা দুই এক খানি সামান্য ন্যায় গ্রন্থমাত্র পাঠ করিয়াই এই বিশাল ধর্ম্মের অসার্থকতা সম্পাদন করিতে মস্তিষ্ক প্রায় সদতই আন্দোলিত করেন।

জৈনদর্শন। এই দর্শন হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যবর্ত্তী। কারণ ইহাতে কোন কোন স্থলে হিন্দু আর কোন কোন স্থলে বৌদ্ধ দর্শনের সহিত ঐক্যমত দেখাযায়। ইহারা বৌদ্ধদর্শনের ন্যায় পরকাল স্বীকার করে; কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে ইহাদের মত বিভিন্ন; বৌদ্ধগণ ঈশ্বর স্বীকার করেন না। কিন্তু ইহারা তাহা করেন, অথচ হিন্দুগণ যেভাবে ঈশ্বর স্বত্তা সপ্রমাণ করেন ইহারা সেভাবে নহে। ন্যায়শাস্ত্রমতে যেমন কার্য্যই জন্য, ঘট কার্য্য, তাহার কারণ কুম্ভকার, সেইরূপ এই বিশাল জগতের কোন কারণ আছেনই—সেই কারণ ঈশ্বর। কিন্তু জৈনগণ সেরূপে ঈশ্বর স্বত্তা প্রমাণ করেন না। তাঁহারা বলেন, ইহজগতে ভিন্নভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন আত্মা দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও আত্মার জ্ঞান-প্রতিবন্ধক অল্প, কোন কোন আত্মার জ্ঞান-প্রতিবন্ধক তদপেক্ষা অধিক, কাহারও অত্যন্ত অধিক, কাহারও অত্যন্ত অল্প। যখন এরূপ ন্যূনাধিক্য দেখা যাইতেছে, তখন এমন আত্মাও থাকা অসম্ভব নহে, যাহার আত্মার জ্ঞান-প্রতিবন্ধক একেবারেই নাই,—সেই জ্ঞান-প্রতিবন্ধকশূন্য আত্মা সর্ব্বজ্ঞ। সুতরাং সেই আত্মাই ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই নহে। জৈনগণ এইরূপ ঈশ্বর স্বত্তা সপ্রমাণ করেন, চার্ব্বাক মতাবলম্বীগণের ন্যায় ইহারা কেবল প্রত্যক্ষবাদী নহেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই উভয়বিধ প্রমাণই ইহাদের সম্মত। জৈন মতে জগতের মূলতত্ত্ব নয়টি, এই নয়টি পরস্পর নিত্যানিত্যাত্মক। এই নয়টি তত্ত্বের নাম যথাক্রমে জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আশ্রব, সংবর, বন্ধ, নির্জ্জর, ও মুক্তি। চেতন পদার্থ জীব, তদন্যথা অজীব; সৎকর্ম্ম পুণ্য, তদভাব পাপ; কর্ম্মের বন্ধন জনকতা আশ্রব, কর্ম্ম ত্যাগ নির্জ্জর; আর উপরি কথিত অষ্ট প্রকার কর্ম্ম ক্ষয়ই মুক্তি। মূল সম্বন্ধে জৈনগণের দুই মত। এক মতের কথা উপরে কথিত হইল, অন্য মতে জগতের মূল তত্ত্ব সাতটি।

জৈনগণ হিন্দু দর্শনকারগণের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানকেই মুক্তিলাভের উপায় বলেন, কিন্তু হিন্দুগণ তত্ত্বজ্ঞান যেরূপে উপস্থিত হয় বলেন ইহারা তাহা নহে, ইহাদের মতে প্রেম, স্থাবর প্রভৃতি জিনোক্ত পদার্থগণের স্বরূপাবগতিই তত্ত্বজ্ঞান, এই তত্ত্বজ্ঞান গুরূপদেশ, শাস্ত্রচর্চ্চা ও জিনোক্ত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান হইতে সমুদ্ভূত হয়।

হিন্দুগণের তর্কশাস্ত্রের ন্যায় ইহাদেরও তর্করীতি আছে, তাহাকে 'স্যাদ্বাদ' বলে, এবং ইহাদের তর্ককে 'সপ্তভঙ্গীন্যায়' বলে, শারীরভাষ্যে এই 'সপ্তভঙ্গীন্যায়ের' উল্লেখ আছে। শারীর ভাষ্য বলেন জৈনগণ ভিন্ন ভিন্ন কালে এক বস্তুতে, আবার এককালে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে পরস্পর বিরোধী গুণসকল সঙ্ঘটনের সমন্বয় করিবার নিমিত্ত

সপ্ত প্রকার ন্যায় স্বীকার করেন, তাহারই নাম "সপ্তভঙ্গী ন্যায়" অর্থাৎ সপ্ত প্রকার অবয়ব যুক্ত। যথা স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদস্তিচ নাস্তিচ, স্যাদবক্তব্য, স্যাদস্তিচাবক্তব্য, স্যান্নাস্তিচাবক্তব্যশ্চ, এবং স্যাদস্তিচ-নাস্তিচাবক্তব্যশ্চ। অর্থাৎ অস্তি, নাস্তি, অস্তি ও নাস্তি, অবক্তব্য, অস্তিও অবক্তব্য, নাস্তিও অবক্তব্য এবং অস্তি নাস্তিও অবক্তব্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই ধর্ম্ম হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যবর্ত্তী, ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকতা, ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের নীতিমালা উভয়ই আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অবমান হইলে এই ধর্ম্ম সমুত্থিত হয়। বৌদ্ধগণ আত্মার স্থায়িত্ব, ঈশ্বরের স্বত্তা, এবং বাহ্যবস্তুর পার্থক্য স্বীকার করিতেন না, কিন্তু ইহারা তাহা করেন। কিন্তু এই ধর্ম্ম কখনই ভারতবর্ষে অধিক প্রচারিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানেই ইহার উৎপত্তি হইলেও ইহা উহার মত কখনই সর্ব্বদেশে সর্ব্বসময়ে আদৃত হয়নাই, সুতরাং জৈনগণের সংখ্যা চিরকালই অল্প, এই ধর্ম্ম অধিক প্রচারিত নাহইবার কারণ —ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় সুমার্জ্জিত, বা তত দূর প্রগাঢ় চিন্তা-প্রসূত নহে।

জৈনগণ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর, যথা—

'শ্বেতাম্বরাঃ ক্ষমাশীলা নিঃসঙ্গা জৈন সাধবঃ।
লুঞ্চিতাঃ পিচ্ছিকা হস্তাঃ পাণিপাত্রা দিগম্বরাঃ॥'

শ্বেতাম্বরগণ ক্ষমাশীল, সঙ্গরহিত, কেশ সংস্কার বিহীন ও ভিক্ষান্নভোজী। দিগম্বরগণ পিচ্ছিকা ও পয়ঃপাত্রধারী এবং নিরাবরণ। শ্বেতাম্বরগণ স্ত্রী সম্ভোগে বিরত, দিগম্বর রত। এতদুভয়ের মধ্যে প্রধানতঃ এই প্রভেদ।

জৈন ধর্ম্মাবলম্বী গণের মধ্যে আমরা অনেক মহাজনের নাম দেখিতে পাই। বিখ্যাত হেমচন্দ্র, অমরসিংহ প্রভৃতি মহাত্মাগণ জৈন ছিলেন, জিনদেবের উপাসক বলিয়াই ইহাঁরা জৈন বলিয়া অভিহিত।

ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সকল দর্শন শাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছিল তাহা এক প্রকার প্রদর্শিত হইল, এই দর্শনের ক্রমোন্নতির সুন্দর কাল নিরূপিত হইবার কোন সুন্দর উপায় নাই; কোন্ সময়ে কপিল দেব অবতীর্ণ হইয়া চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ঘোষণা করিয়া ঈশ্বর অসিদ্ধ উচ্চারণ করিয়াছিলেন—কোন্ কালে মহর্ষি পতঞ্জলি ঈশ্বর আছেন নির্দ্দেশ করিয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রচার করেন; কোন্ সময়েই বা গৌতম ষোড়শ, কণাদ সপ্তমূলতত্ত্বের ঘোষণা করিয়া জগৎ মাতাইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, কপিলই দর্শনকারগণের মধ্যে প্রধান ও সর্ব্বপ্রাচীন; তাঁহার প্রাচীনত্ব সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন; পতঞ্জলি তাহারই কিঞ্চিৎকাল পরে প্রাদুর্ভূত হন। বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি মহোদয়গণ প্রমাণ করিয়াছেন পতঞ্জলি পাণিনির সমসাময়িক, এবং আমাদের বিবেচনায় সে মত সত্য। গৌতমের ন্যায়সূত্র সকল বুদ্ধদেবের পরে রচিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়—কেন না দেখা যায় ইহার

সমুদায়ই অনুমানের উপর, এবং গৌতম এই অনুমান কাণ্ডকে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়াছেন। বুদ্ধ প্রমাণ করিয়াছেন অনুমান প্রমাণের মধ্যেই গণ্য নহে—কিন্তু তাহারই প্রতিবাদ স্থলে গৌতম দেখাইয়াছেন প্রমাণের মধ্যে অনুমান সামান্য নহে, প্রত্যুত প্রত্যক্ষেরই সমান। বেদান্ত দর্শন ব্যাসদেব বিরচিত, তিনি কোন সময়ের লোক তাহা এক প্রকার স্থিরীকৃতই হইয়া গিয়াছে, এবং জৈমিনি তাঁহার পূর্ব্ব সময়ের লোক সহজেই অনুমিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের অবদান সময়েই জৈন দর্শন সমুত্থিত হয়।

কতদিন হইতে ভারতীয় মহর্ষিগণের মনে দার্শনিক চিন্তার উদয় হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। আমরা বেদের উপনিষদ ভাগেও এই দার্শনিক চিন্তার স্ফুরণ দেখিতে পাই;—যথা ঋক ১ম। ১৬৪—১৬৫ সুক্ত

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষ পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্যন শ্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টংযদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

'দুইটি সুন্দর পক্ষী একই বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া আছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা একত্রে বাস করেন এবং উভয়ে উভয়ের সখা, তন্মধ্যে একটি (জীবাত্মা) সুখে ফলভোগ করেন, অন্যটি (পরমাত্মা) নিরশন থাকিয়া কেবল তাহা দর্শন করেন। জীবাত্মা শরীর মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া দীনভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্ব্বদাই শোক করেন—কিন্তু যখন ঈশ্বর ও তাঁহার মহিমা অবলোকন করেন তখন আর তাঁহার শোক থাকে না।' তাহা হইতেই স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে যে বেদের উপনিষৎভাগ রচিত হইবার বহু পূর্ব্বকাল হইতেই ভারতে দর্শনের চিন্তা উদয় হইয়াছে, আমরা মনুসংহিতাতেও ইহার নিদর্শন প্রাপ্ত হই। যাহা হউক বহু পূর্ব্বকাল হইতেই যে ভারতীয় মহর্ষিগণ দার্শনিক চিন্তায় রত তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতের অর্দ্ধমৃত জীবনে আজি সেই পুরাতন গৌরবের চিহ্ন বিদ্যমান নাই। তথাপি যাহারা সেই গৌরবের আভাস মাত্র প্রাপ্ত হইয়া, পৃথিবীতে জ্ঞান ও সভ্যতার অতুল কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছেন, তাহারা প্রকৃত কৃতজ্ঞের ন্যায় সেই আর্য্যঋষি দিগকে আপনাদের আদিম শিক্ষা গুরু বলিয়া মানিয়া নিয়াছেন। ভারত কাহিনী ভারতবাসীরা আজি বলিতে অক্ষম; কিন্তু যাহারা প্রগাঢ় গবেষণা দ্বারা তাহা বিবৃত করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহাদের কএকটি মত উদ্ধৃত করিলাম।

"The Indians were, accordingly, early celebrated on that account (science),and some of the most eminent of the Greek philosophers travelled into India that, by conversing with the sages of that country, they might acquire some portion of the knowledge for which they were distinguished.

Dr. William Robertson's "Historical Disquisitions concerning Ancient India."

And which (Logic) the Mahomedan writer supposes to have been

the ground-work of the famous Aristotelean method. * * * And which the Greeks themselves condescended to borrow from eastern sages.

Sir William Jones' *Eleventh Anniversary discourse.*

Nor is it possible to read the Vedanta, or the many fine compositions in illustration of its, without believing that Pythagoras and Plato derived their sublime theories from the same source with the the sages of India.

Dugald Stewards' "*Elements of the Philosophy of the Human Mind.*" Vol II Page 225.

I have already had occasion to touch on the Indian metaphysics of *natural bodies* according to the most celebrated of the *Asiatic* schools, from which the Pythagorians are supposed to have borrowed many of their opinions, and as we learn from Cicero, that the old sages of Europe had an idea of *centripetal force* and a principal of *univeral gravitation* (with they never indeed attempted to demonstrate), so I can venture to affirm, without meaning to pluck a leaf from the never-fading laurels of our immortal Newton, that the whole of his theology and part of his philosophy may be found in the *Vedas*: that *most subtil spirit*, which he suspected to pervade natural bodies, and lying concealed in them, to cause attraction and repulsion, the emission, reflection and refraction of light, electricity, calefaction, sensation, and muscular motion, is described by the *Hindus* as a *fifth element* endued wlth those very powers; and the *Vedas* abound with allusions to a force universally attractive, which they chiefly ascribe to the Sun, thence called *Aditya* or the *Attractor.*

Sir William Jones' "*Eleventh Anniversary discourse.*"

It is well argued by Mr. Colebrooke, that the Indian Philosophy resembles that of the earlier, rather, than of the later Greeks; and that if the *Hindus* had been capable of learning the first doctrines from a foreign nation, there was no reason why they should not in like manner have acquired a knowledge of the subsequent improvements, from which he infers that the *Hindus* were, in this instance, the teachers and not the leaners. Elphinstone's *History of India* Vol. I Page 237.

Cousin has some-where said, "The history of Indian Philosophy is the abridged history of the philosophy of the world."

"*Jacobist's Bible in India.*"

Mr. Olcott, the other day, in his lecture on "Post Aryabarta and Modern India" said, It was from this glorious land that the Stoic philosophy and the philosophy of Aristotle were brought to Europe. India's greatness consisted of such as trade, architecture, fine arts, science, philosophy, relegious devotion, in fact every thing that makes a nation great and civilized.

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই; ইহাতেই বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে যে ভারতীয় মহর্ষি-উদ্ভাবিত দর্শনশাস্ত্রই পৃথিবীর সমুদয় দর্শনশাস্ত্রের মূল; এই স্থল হইতে সকলে আপনাপন মত গ্রহণ করিয়া স্বদেশের দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি করিয়াছেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

ধর্ম্ম-যুধিষ্ঠির সংবাদ।

(মহাভারতের কথা।)

যুধিষ্ঠির।—কা বার্ত্তা, অর্থাৎ খবর কি?

ধর্ম্ম।—খবর কোন দিগেরই বড় ভাল নহে। সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা পাপভরে পরিপূর্ণ হইয়া টল টল করিতেছেন, কখন কি হয় বলা যায় না। দুধের শিশু দুর্ব্বিনীত বৃদ্ধের ন্যায় কুপথগামী হইতেছে, বৃদ্ধ আপনার বয়োবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শিশুর ন্যায় মাটি খাইতে শিখিতেছে। অবলা পুরুষের পায়ের বুট, মাথার পাগরী, কটির অসি ও করের যষ্টি কাড়িয়া লইয়া বীরগর্ব্বে আস্ফালন করিতেছে, এবং কিরূপে লজ্জার লূতাতন্তু ছিঁড়িয়া ফেলিয়া এ সংসারের সংগ্রামক্ষেত্রে বিকটবেশে বিচরণ করিতে পারা যায় তাহার উপায় দেখিতেছে;—পুরুষ দিন দিন ক্ষীণ-প্রাণ ও হীন-শক্তি হইয়া চূর্ণকুন্তল চটুলনেত্র ও চঞ্চল অঞ্চলের মোহনমাধুরীতে মোহিনী সাজিতেছে। যাহারা ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত গভীরতত্বের প্রচারদ্বারা জগতের পাপরাশি প্রক্ষালনে বদ্ধসংকল্প, তাহারা নিত্য নূতন নাটকের অভিনয় করিতেছে; আর নাটক করা যাহাদের ব্যবসায়, তাহারা অশ্রুজলে তিলতর্পণ করিয়া আত্মার সদ্গতি সাধনে রত হইতেছে। কেহ পুরুষপরম্পরাগত কণ্ঠ-সূত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে ফেলিয়া দিতেছে, কেহ সেই ছিন্ন-সূত্র কুড়াইয়া আনিয়া জাতি জাতি বলিয়া চীৎকার করিতেছে। যে পদরেণু স্পর্শ করিবারও অযোগ্য, সে মুকুটের মত মাথায় উঠিতেছে,—আর মস্তকের মুকুটমণি পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বিড়ম্বনার বৈচিত্র্য দেখাইতেছে। কুক্কুর দেবতার যজ্ঞভাগ লেহন করিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইতেছে, দেবতা কুক্কুর-ভয়ে ভীত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিয়া পলাইয়া যাইতেছে। তাই বলিয়াছি যে, খবর বড় ভাল নহে। বার্ত্তাশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

যুধিষ্ঠির।—কিমাশ্চর্য্যম্?

ধর্ম্ম।—ইহার পর আর আশ্চর্য্য কি? যাহাদিগের বাক্যের নাম ছলনা, আর দৃষ্টির নাম বিষ, এই পৃথিবীতে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াও যখন আমি জীবিত রহিয়াছি, তখন আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? পবিত্রতার প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি-স্বরূপা সতীসাধ্বী কুললক্ষ্মীরা অন্নবস্ত্রের জন্য লালায়িত অথবা অন্তর্দ্দাহে জর্জ্জরিত, আর কুলটা, ক্লিওপেট্রার ন্যায়, কাব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত; ইহা দেখিয়াও যখন আমি জীবিত রহিয়াছি তখন আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? চোরে আর চোরে বিচার করিয়া সাধুর গলায় দড়ি দেয়,—সাধু আপনার সাধুতাতে লজ্জিত হইয়া মর্ম্মদুঃখে অধোবদন রহে; ইহা দেখিয়াও যখন আমি জীবিত রহিয়াছি, তখন আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যে যে পরিমাণে নীচতা ও অবনতি স্বীকার করিতে পারে, জগতে সেই পরিমাণে তাহার উন্নতি, উচ্চনাম, উচ্চ উপাধি ও উচ্চ গৌরব;—ইহা দেখিয়াও যখন আমি জীবিত রহিয়াছি, ত-

খন আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? সাহেবের কিম্মত তিন, বিবির কিম্মত দুই, আর রঙ্গের গোলাম বিশ, ইহাও যখন আমাকে চক্ষু মেলিয়া দেখিতে হইল; তখন আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

যুধিষ্ঠির।—কঃ পন্থাঃ? এখন পথ?

ধর্ম্ম।—"এই বারই বৎস! বিষম সমস্যা। "উত্তরে বেত, দক্ষিণে ক্ষেত, পূবে আশ, পশ্চিমে বাঁশ, "—অর্থাৎ চারিদিকেই সমান বাধা, সমান বিঘ্ন! "ডেঙ্গায় বাঘের ভয়, জলেতে কুমীর," সুতরাং কোন্ দিকে যাইতে বলিব, বল। আমি এক সময়ে এই বলিয়াছিলাম যে,—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা, অর্থাৎ মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, সেই পথই পথ। কিন্তু এইক্ষণ দেখিতেছি যে, এই মনুষ্য জগতে মনগড়া মহাজনের আর অবধি নাই। যাহার মুখ একটু বেশি চলে, সেই একজন মহাজন। যে কপালে একটুকু ভস্ম মাখিয়া বাঘের ছালে বসিয়া বম্ বম্ করিতে পারে, সেই একজন মহাজন। যে দশ জনের উপর টেক্স বসাইয়া আপনার কার্য্য সাধিয়া উঠিতে পারে, সেই একজন মহাজন। আর যে, যে মাত্রায় আপনার গুণ আপনি গাইতে পারে, সেই সেই মাত্রার এক অভিনব মহাজন। সুতরাং এই অনন্তকোটি মহাজনের অনন্তলীলার অনুসরণ না করিয়া আমারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। যখন মহাজনের ওজন পাওয়া এমনই কঠিন ব্যাপার, এবং আসল ও নকল এবং খাটি ও খাদের পার্থক্য করিয়া লওয়া নিতান্ত দুষ্কর, তখন যেখানে আমার অবস্থান, তাহাই গন্তব্য স্থান এবং আমার পথই পথ।

যুধিষ্ঠির।—কশ্চ মোদতে? কিন্তু সুখী কে?

ধর্ম্ম।—লোকের চক্ষে সুখী সে, যে আমা হইতে দূরে রহিয়াছে। আমার নিকট থাকিয়া আপাতমধুর সুখের আশা বৃথা। এ জগতে যে আমাকে বলিয়া আমার আশ্রয় লয়, তাহার আবার লৌকিক সুখসৌভাগ্য কি? সত্যই যাহার জীবনের ব্রত এবং সারল্যই যাহার একমাত্র গতি, সাধারণ লোকে তাহাকে আদর করিবে কেন? আপনাকে আপনি নিগ্রহ করাই যাহার নিত্যকার্য্য, সে কৃত্রিম উল্লাসে উল্লসিত রহিবে কিসে? যদি মোহের আচ্ছন্নতা অথবা মত্ততার অপ্রাকৃত স্ফূর্ত্তিকে সুখ বলিয়া মনে করিয়া থাক, আমি সে সুখের সামগ্রী যোগাইতে অক্ষম। যদি বঞ্চনা ও সঞ্চয়, এবং আত্মোদর পরিপূরণ ও আত্মবিনোদনকেই সুখের অঙ্গ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাক, তবে আমার নিকট তাহার উপকরণ নাই। অথবা যদি প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা, পরপীড়ন ও পরাভিমর্দ্দনে সুখের স্বাদ পাইয়া থাক, আমার নিকট সে সুখেরও অণুমাত্র প্রত্যাশা নাই। তবে আমার নিকটও এক সুখ আছে। পুরাকালে অনেকে তাহাকেই সুখের সারভূত সুখ বলিয়া জানিয়া গিয়াছে এবং এখনও জগতে কেহ কেহ বিবেকের বিশুদ্ধ আলোকে সেই সুখেরই অমর্ত্ত্য আভা দেখিয়া আনন্দে অধীর হইতেছে। সেই সুখ অন্তরে পবিত্রতার অমল অমৃত এবং অনুষ্ঠানে পরার্থ আত্মদান। এইরূপ অগ্নিদগ্ধ সুখে তৃপ্ত রহিবে কি?

যুধিষ্ঠির।—"ধর্ম্মাৎ পরতরং নহি"

শ্রীজ্ঞানানন্দ সরস্বতী।

রাজপুতানার ইতিহাস।

মিবার বিবরণ।

(পঞ্চমখণ্ড ৫০১ পৃষ্ঠার পর।)

পঞ্চম অধ্যায়।

খ্রীষ্টীয় ১১৫০ সম্বৎসরে সমরসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। যদিও মিবার প্রচলিত যাবতীয় ইতিবৃত্তে ইহার কীর্ত্তিকলাপ উজ্জ্বলবর্ণে বর্ণিত আছে, তথাপি আমরা দিল্লির রাজকবি চাঁদ* কর্তৃক বিবরিত তদীয় বিবরণ অনুসরণ করিয়া পাঠকবর্গকে সমরসিংহের পরিচয় প্রদান করিব। চাঁদকবি রাজস্থানের তৎসাময়িক অবস্থা বর্ণন স্থলে লিখিয়াছেন,—"পত্তনে চালুক্য বংশীয় লৌহকলেবর ভোলা ভীম। আবু পর্ব্বতে রণে ধ্রুবনক্ষত্র সদৃশ অটল জৈত প্রমর। মিবারে সমরসিংহ, ইনি অতি প্রবলদিগের নিকট হইতেও কর গ্রহণ করিতেন এবং দিল্লির শত্রুর পথে লৌহকণ্টকের ন্যায় বিদ্যমান ছিলেন। মধ্যস্থলে, আপনার বলে বলীয়ান মরু প্রদেশের শক্তিস্বরূপ নির্ভীক চিত্ত মণ্ডোর রাজ নাহার রাও। এতৎসমস্তের প্রধান অনঙ্গপাল দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যাহার আহ্বানে মণ্ডোর, না-

* চাঁদকবির গ্রন্থ অশেষ জ্ঞানের ভাণ্ডার। তৎসাময়িক যাবতীয় জ্ঞাতব্য ঘটনা পরম্পরা তাহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই বৃহৎ গ্রন্থ ৬৯ উনসত্তর অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ইহাতে এক লক্ষ শ্লোক আছে। যদিও পৃথ্বীরাজের অতুল কীর্ত্তিকলাপ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য চাঁদ কবি এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তথাপি ইহাতে রাজপুতগণের সাধারণ ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যেক গণনীয় রাজপুত বংশ এই গ্রন্থে তাহার প্রাচীন বিবরণ প্রাপ্ত হইবে। একারণ, রাজপুত বলিয়া যাহার কিছুমাত্র অভিমান আছে, তাঁহারই প্রাচীন লিপি সংগ্রহ ও পুস্তকাগার মধ্যে চাঁদের এই বিখ্যাত গ্রন্থ সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। তিনি অনুসন্ধান করিলেই ঐ গ্রন্থে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয় পাইতে পারেন। পৃথ্বীরা-জের সমর, তাঁহার মিত্র ও করদ রাজদিগের বিবরণ এই গ্রন্থে এমন সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিলে রাজস্থানের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবিধ জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে। রাজপুতদিগের জাতীয় স্বভাব, ধর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্মবুদ্ধি, মানসিক বৃত্তি প্রভৃতির সম্যক জ্ঞান লাভ করিবার একমাত্র উৎকৃষ্ট উপায় চাঁদ কবির গ্রন্থ, এ-কথা কোন অংশে অত্যুক্তি নহে।

গোর, সিন্ধু, জলোরৎ * ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ, পেশোয়ার, লাহোর, কাঙ্গরাও নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশ, কাশী, প্রয়াগ, এবং গড় দেওগিরির অধীশ্বরেরা একত্র সমবেত হইতেন। নীতমারের † অধিরাজেরা সতত তাঁহার ভয়ে ভীত থাকিতেন। ভট্টিরা জাবুলি স্থান হইতে দূরীভূত হইয়া ক্রমান্বয়ে শালবাহন ‡ তান্নোট, দেরবল, § ও লডর্ব ¶ নগরে রাজধানী স্থাপিত করে। যেসময়ের কথা হইতেছে, তখন তাহারা যশলমীর নগর নির্ম্মাণ করিতেছে। ইহাই এখন ভট্টিদিগের রাজধানী। সিন্ধু নদের তীরবর্ত্তী তাক বা তক্ষশিল নগর পর্য্যন্ত তাহাদের যে অধিকার ছিল, তাহা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্যে ভট্টিরা অরোরনগরের নিকটে খলিফার প্রতিনিধি ও শাসন কর্ত্তৃগণের সহিত বহুকাল ধরিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। একাল পর্য্যন্ত ইহাদিগকে কোন রাজকীয় ব্যাপারে লিপ্ত হইতে দেখাযায় নাই। পৃথ্বী রাজের সময় হইতে ইহাদের বল বীর্য্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ভট্টিরাজের ভ্রাতা অচলেশ পৃথ্বীরাজের একজন প্রধান সেনানায়ক ছিলেন। চাঁদ কবির গ্রন্থপাঠে ইহা নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হয় যে দিল্লির অধীশ্বর অনঙ্গপাল হিন্দু রাজকুলের চূড়ামণি ছিলেন; সকল রাজার উপর তাঁহার প্রাধান্য ছিল। অনঙ্গপাল তুয়ার বংশীয় ঊনবিংশ ও শেষ রাজা। প্রায় তাহার চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বীলন দেব নামক জনৈক ঠাকুর-উপাধিধারী ধনবান কর্ত্তৃক এই বংশ বিস্তারিত হয়। বীলনদেব তৎকালীন ভগ্নদশাপন্ন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজমুকুট ধারণ করিয়া অনঙ্গপাল উপনাম গ্রহণ করেন। তদবধি উহা উক্ত বংশের এক প্রকার সাধারণ নাম হইয়া গিয়াছিল। অজমীরের চোহানেরা দিল্লির তুয়ার বংশীয়দিগের অত্যন্ত সম্মান করিতেন, কিন্তু বিশালদেবের সময়ে উহা নামমাত্রে পরিণত হইয়াছিল। কান্যকুব্জেশ্বর অনঙ্গপালের বশ্যতা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইলে চোহান রাজ সোমেশ্বরের সহায়তায় নিজ সম্মান রক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া দিল্লিপতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপে সোমেশ্বরকে কন্যা সম্প্রদান করেন। এই সোমেশ্বরের ঔরসে তুয়ার কন্যার গর্ভে ইতিহাস প্রসিদ্ধ পৃথ্বীরাজের জন্ম হয়। পুত্র সন্তান না থাকায় অনঙ্গপাল নিজ দৌহিত্র পৃথ্বীরাজকে উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া যান। পৃথ্বী অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কান্যকুব্জের জয়চন্দ্র ইহাতে অত্যন্ত কুপিত হইলেন; পৃথ্বীরন্যায় তিনিও অনঙ্গপালের দৌহিত্র ছিলেন। সোমেশ্বরের ন্যায় তাঁহার পিতা বিজয়পালও অনঙ্গের অন্য এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে চোহান ও রাঠোরদিগের পরস্পর এমন বৈরভাব উপস্থিত হইল যে পরিশেষে উভয়ের ধ্বংসে সেই শত্রুতানল নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। চোহান বংশাবতংশ

* সম্ভবতঃ সিন্ধু প্রদেশের কোন স্থান।

† বোধ হয় ভারতবর্ষের কোন শীতপ্রধান প্রদেশ।

‡ পঞ্জাবের অন্তর্গত।

§ ভট্টীদিগের দ্বারা সংস্থাপিত।

¶ মরুপ্রদেশে ভট্টীদিগের দ্বারা অধিকৃত।

পৃথ্বীরাজ দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করিলে জয়চন্দ্র যে কেবল তাঁহার বশ্যতা স্বীকারে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন এমন নহে, আপনি সিংহাসনের যথার্থ উত্তরাধিকারী বলিয়া আপনার স্বত্বাধিকার স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। অহ্নলবর পত্তনের রাজা চোহানদিগের চিরশত্রু, তিনি সময় বুঝিয়া রাঠোরের পৃষ্টপোষক হইলেন। মণ্ডরের পরিহারেরাও রাঠোর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। পরিহার দিগের দ্বারাই বিবাদের প্রথম সূত্র পাত হইল। চোহান যুবককে তাহারা কন্যা দানে অসম্মত হওয়ায় উভয়পক্ষে মনোমালিন্য জন্মিল। কিন্তু ইহাতে চোহানের জয়লাভ হইয়াছিল। কান্যকুব্জ ও পত্তনের অধীশ্বরেরা আপনাদের সেনার মধ্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন; তাহাদিগের দ্বারাই গজনীপতিগণ ভারতীয় ভূপাল বর্গের গৃহছিদ্রের অনুসন্ধান পাইতেন।

চিতোরপতি সমরসিংহ পৃথ্বীরাজের ভগিনীকে বিবাহ করেন। এই সূত্রে তাঁহারা উভয়েই মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মিত্রতা বন্ধনে বদ্ধ ছিলেন। রাজস্থানের মধ্যে যে কয় জাতি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, সততই তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ চলিত। দুই জাতির মধ্যে যে চিরদিনই সেই বিবাদ স্থিরতর রূপে অবস্থান করিত এমন নহে, আবার কোন সূত্র বিশেষে সেই দুই জাতিই পরস্পর এরূপ মিত্রভাবে পরিণত হইত যে, এক জনের জন্য অন্যে জীবনদান করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। অনেক স্থলে বৈবাহিক সূত্রে এই মিত্রতা সংস্থাপিত হইত।

নাগোরপতি অতিশয় ধনসম্পত্তিশালী ছিলেন, তাঁহার সপ্ততি লক্ষ সুবর্ণমুদ্রাছিল; পৃথ্বীরাজ সেই ধনে লোলুপ হইয়া সমরসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জয়চন্দ্র ও পত্তনপতি দেখিলেন পৃথ্বীরাজ এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইলে নিতান্ত অজেয় হইয়া উঠিবেন; অতএব তাঁহারা এই ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা জন্মাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং সহায়তার জন্য সাহাবুদ্দিনকে আমন্ত্রণ করিলেন। ওদিকে সমরসিংহের নিকট চোহানপতি পৃথ্বীরাজ দূত প্রেরণ করিলেন। সীমান্তের অধিনায়ক লাহোরের করদরাজ চাঁদ পুণ্ডির এই দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পুণ্ডির এই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইতিহাসে প্রথিত আছেন। সাহাবুদ্দিন যে সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, পুণ্ডির অদ্ভুত রণদক্ষতার সহিত তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে মুসলমানদিগের করকবলিত হইয়া জীবলীলার অবসান করেন। ইনি বিপুল উপহার সামগ্রী সমভিব্যাহারে চিতোরে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহাঁর মিষ্ট বক্তৃতা, অভ্যর্থনা, উত্তর দান, বিদায় প্রভৃতি ব্যাপার চাঁদ কবি অতি স্ফুট বর্ণে বিবৃত করিয়াছেন। কবিবাক্যে সমরসিংহের যে প্রকার আকার ও ভাবভঙ্গী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে যথার্থই 'মহাদেবের দেওয়ান' বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার গলদেশে পদ্মবীজের মালা, কেশকলাপ উর্দ্ধভাবে নিবদ্ধ, যেন যোগীন্দ্র বলিয়া ভ্রম হয়। সমরসিংহ দিল্লিতে আগমন করিলেন। বিবাহ সূত্রে পত্তনরাজের সহিতও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলিয়া

তাঁহার বিপক্ষে পৃথ্বীরাজকে প্রেরণ করত স্বয়ং গজনী হইতে আক্রান্তকারীদিগের পথরোধ করিতে গেলেন। সমরসিংহ তাহাদের সহিত অনেক যুদ্ধ করেন, ইত্যবকাশে পৃথ্বীরাজ গুজরাটের যুদ্ধ সমাপ্ত করিয়া আসিয়া সমরের সহিত মিলিত হইলেন। সমরসিংহ এইরূপে বিবৃদ্ধ-শক্তিসম্পন্ন হইয়া শত্রুদিগকে একবারে হীনবল করত তাহাদিগের অধিনায়ককে বন্দী করিলেন। নাগোর লুণ্ঠন দ্বারা পৃথ্বীরাজ যে অতুল ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন, সমরসিংহ তাঁহার কণামাত্রও অংশ গ্রহণ করিলেন না, তবে তাঁহার অধীনস্থ অধ্যক্ষদিগকে চোহানরাজ যাহা উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করিতে সমর অনুমতি দান করিয়াছিলেন। ইহার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে কিছুদিন অতিবাহিত হয়। দিল্লীশ্বরের অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য ও লোভ পরবশতার জন্য পত্তন, কান্যকুব্জ, ধার ও অন্যান্য প্রদেশীয় অধিরাজবর্গ নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৈরনির্যাতন মানসে তাঁহারা নিয়তই ছিদ্রান্বেষণ করিতেছিলেন। ভোগবিলাসী দিল্লিপতিও ক্রমে কিছু অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন; মিলিত শত্রুর আক্রমণে ভীত হইয়া তিনি আবার সমরসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। চিতোরপতি সমরসিংহ জন্মের মত চিতোর ত্যাগ করিয়া আসিলেন। চাঁদ কবি তাঁহার এই আগমন বিবরণ সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। সমর আপনার কনিষ্ঠপুত্র কর্ণকে চিতোরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিয়া যান। সমরের ঈদৃশ অসদৃশ ব্যবহারে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যারপর নাই বিরক্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। তথাকার "হব্‌সি পদ্‌সা" নামক জনৈক আবিসিনিয়া দেশীয় অধিনায়ক কর্ত্তৃক অতি সমাদরে গৃহীত হইলেন। সমরের অন্য এক পুত্র এই কারণ অথবা কারণান্তরবশতঃ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া নেপালে গমন করেন। তদীয় বংশীয়েরা অদ্যাপি নেপালে প্রভুত্ব করিতেছে। পৃথ্বীরাজের এই যুদ্ধকে কবিবর চাঁদ "মহাযুদ্ধ" বলিয়া উল্লেখ করিয়া সমরসিংহের বীরত্ব প্রভৃতি অতি বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। দিল্লীতে আনন্দ সঙ্গীত দ্বারা তাহার অভ্যর্থনা হইয়াছিল, তাহার পদার্পণে দিল্লির উদ্ধার হইবে জানিয়া সকলে আনন্দ সলিলে ভাসমান হইয়াছিল। তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা কষিবার জন্য পৃথ্বীরাজ প্রিয় অনুচর বর্গ সমভিব্যাহারে প্রায় সার্দ্ধত্রয় ক্রোশ পথ অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহের প্রিয় আলিঙ্গন ও উভয় পক্ষীয় অনুচরবর্গের পরস্পর শিষ্টালাপ অতি দর্শন-সুখকর হইয়াছিল। সমর সিংহ পৃথ্বীরাজকে তাঁহার রাজপদের অনুপযোগী দোষ সকল উল্লেখ করিয়া উপদেশ সম্বলিত তিরস্কার করিলেন।

কাগার (দৃশদ্বতী) নদীতীরে সেনা সন্নিবেশ করিতে সমরসিংহ পরামর্শ প্রদান করিলেন। সমরসিংহের সাহস, সহিষ্ণুতা রণকৌশল, জ্ঞান, প্রবীণতা, বাক্‌পটুতা, ধার্ম্মিকতা, প্রভৃতি সদ্‌গুণ কবি অতি সুন্দর রূপে বর্ণন করিয়াছেন। চোহানের অনুচরবর্গ তাঁহার আদেশ পালনে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত। রণযাত্রায় শুভা-

শুভ ফল তিনি যেমন বলিতে পারিতেন, আর কেহই সেরূপ পারিত না। সেনা সন্নিবেশ বিষয়ে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। অশ্বচালনা ও অস্ত্রক্রীড়ায় তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী বিরহিত ছিলেন। কবি স্বীকার করিয়াছেন যে খোমানের উপদেশগুলি সমরসিংহ সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়া আমূল তাহার প্রতিপালন করিতেন। ফলতঃ সমাজ ধর্ম্ম ও রাজ্য সম্বন্ধীয় ব্যাপার পরম্পরায় সমরসিংহ আদর্শস্থলীভূত হইয়াছিলেন।

তিন দিবস অবিশ্রান্ত সংগ্রামের পর নিজপুত্র কল্যাণসিংহের সহিত সমরসিংহ সমর শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট রণকুশল ত্রয়োদশ সহস্র সেনানী গতাসু হইল। তাঁহার পতিব্রতা প্রণয়িনী পৃথা পতির নিধন ও ভ্রাতার শত্রুহস্তে পতন সংবাদে অগ্নি প্রবেশদ্বারা জীবন শেষ করিলেন। দিল্লিনগরী দুর্ব্বৃত্ত তাতারদিগের হস্তে পতিত হইল। পৃথ্বীপুত্র রায়ণসিংহ হত হইলেন। তাতারদিগের জয়লাভ হইল। তাহাদের অস্ত্র ক্রমে ভারতের উৎকৃষ্ট ভূখণ্ডে প্রবেশ করিতে লাগিল। যখন সেই দুর্ব্বৃত্তদিগের হস্তে কান্যকুব্জেরও পতন হইল, তখন ভারতে তাহাদের আর প্রতিদ্বন্দী রহিল না। কিছুকাল ধরিয়া লুণ্ঠন ও হত্যাব্যাপার চলিতে লাগিল। দেবমন্দির ও শিল্পসাধিত উৎকৃষ্ট প্রাসাদগুলি অসভ্যদিগের হস্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। রাজপুতেরা যে কোন সুযোগে হউক দৌরাত্ম্যকারীদিগের বধ সাধনে প্রবৃত্ত হইল; উভয়ের রক্তে রাজস্থানের রাজপথ প্লাবিত হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলনা, দলে দলে বিপক্ষ পক্ষ আগমন করিল এবং কতকগুলি হিন্দুজাতি নামমাত্রে পরিণত হইল।

পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র রাজপুত ভিন্ন আর কোন্ জাতি শতশত বর্ষ পর্য্যন্ত বিবিধ দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়াও আপনাদিগের সভ্যতা ও পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরণীয় রীতি নীতি সমান ভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে? যদি রাজপুত চরিত্রে আগ্রহিতা ও অসাবধানতা প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি প্রয়োজন সময়ে ধৈর্য্য ও সাবধানতা অবলম্বন করিয়া প্রতিহিংসার অবসর অন্বেষণ করিতে থাকে। অপর ধর্ম্মের অবমাননা করাই যাহাদিগের উদ্দেশ্য, এরূপ শত্রু কর্ত্তৃক বারম্বার উপক্রত, অপমানিত ও বিজিত হইয়াও পূর্ব্বের ন্যায় স্থির থাকিতে রাজস্থান পৃথিবী মধ্যে একমাত্র দৃষ্টান্ত স্থল। অসভ্যেরা যতদূর দৌরাত্ম্য করিতে পারে, তাহা করিয়াছে, তথাপি রাজস্থান মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। অসভ্যদিগের উপদ্রব গুলি রাজপুতদিগের সাহস সম্বন্ধে শাণশিলা স্বরূপ হইয়াছিল। ব্রিটনেরা রোমকদিগের নিকট পরাভূত হইয়া জন্মের মত সব হারাইল; ড্রুইড, এবং তাহাদিগের কুঞ্জ ও ধর্ম্মবেদী রক্ষা করিবার জন্য বারম্বার চেষ্টা করিয়াও আর কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। স্যাক্সনদিগের নিকট আবার তাহাদের পতনহইল, আবার দিনেমারদিগের নিকট পরাজিত হইল, পরিশেষে তাহারা নর্ম্মাণদিগের পদলেহন করিল। বিজয়ীদিগের ধর্ম্ম ও ব্যবস্থাদি আসিয়া বিজিতদিগের তত্তৎস্থান অধিকার করিল। রাজপু-

তেরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা এবম্বিধ ভূয়োভূয়ঃ বিপৎপাতে ক্ষুণ্ণ অধিকার হইয়াও ধর্ম্ম ও রীতি নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান চিত্রে অনেক রাজপুত জাতির অধিকার পর্য্যন্তের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং জাতীয় বিশ্বাসের অপলাপ নিবন্ধন রাঠোরদিগের গর্ব্ব, চালুক্যদিগের গৌরব, কান্যকুব্জের অভ্যুদয় এবং অহ্লবরপত্তনের প্রভুত্ব বিস্মৃতিসলিলে ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু মিবার—কেবল একমাত্র মিবার, বারম্বার বিবিধ বিপৎপাত সহ্য করিয়াও আপনার ধর্ম্ম, ব্যবস্থা, মান ও গৌরব পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। যে স্বাধীনতা, ধর্ম্ম ও মান রক্ষা করিবার জন্য সমরসিংহ আপনার জীবন বলি প্রদান করিয়াছেন, সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া সেই সকল মহামূল্য সম্পত্তি রক্ষা করিতে তাঁহার পরবর্ত্তী নৃপতিনিচয় আপনাদিগের শোণিতদানে কৃপণতা করেন নাই। ধন্য মিবার! তোমার সমকক্ষ হইবার উপযুক্ত স্থান পৃথিবীতে নিতান্ত দুর্লভ।

অমরসিংহের অনেকগুলি পুত্র; তন্মধ্যে কর্ণ উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। কর্ণের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তদীয় জননী পত্তনরাজকুমারী কর্ম্মদেবী অতি সুন্দররূপে সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থ বীরনারী ছিলেন। অম্বরের নিকটে মুসলমান রাজপ্রতিনিধি কিতবশিরোমণি কুতবউদ্দীন সমরশয্যায় সমাগত হইলে সৈন্য সামন্ত সমাবৃতা শূরপত্নী কর্ম্মদেবী তাঁহার সহিত যুদ্ধ দান করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে কুতব আহত ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। নয়জন অধীনস্থ রাজা ও একাদশ জন রায়ৎ উপাধিধারী অধ্যক্ষ রাজমাতা কর্ম্মদেবীর সেনানায়ক হইয়াছিলেন। কর্ণ ১১৯৩ খৃঃঅব্দে রাজপদ লাভ করেন। কোন কোন রাজকুলপত্রে কর্ণের মাহুপ ও রাহুপ এই দুই পুত্র বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। সূর্য্যমল নামে সমরসিংহের এক সহোদর ছিলেন, সমরের পুত্র কর্ণ ভাগরের চোহান কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, তাঁহারই গর্ভে মাহুপের জন্ম হয়। ভরত নামে সূর্য্যমলের এক পুত্র হয়, চক্রান্তে পতিত হইয়া ভরত চিতোর হইতে ত হইয়া সিন্ধুপ্রদেশে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য জনৈক মুসলমান রাজের নিকট হইতে অরোর নগর অধিকার করত পুগলপতি ভট্টিরাজের কন্যাকে বিবাহ করেন, ঐ কন্যার গর্ভে রাহুপ জন্ম গ্রহণ করেন। মাহুপ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া মাতামহ গৃহে গিয়া বাস করিলেন। কর্ণ ভরতের শোকে ও মাহুপের অযথা ব্যবহারে ভগ্নচিত্ত হইয়া লোকলীলা সম্বরণ করিলেন।

ঝালোরের শনিগররা-পতি কর্ণের দুহিতার পাণি গ্রহণ করেন, রিনঢোল নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। শনিগররা বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা গেহলোট সামন্তদিগের প্রাণবধ করিয়া আপনার পুত্রকে চিতোরের সিংহাসনে বসাইলেন। মাহুপ এতদ্ব্যাপার শ্রবণ করিয়া পিতৃসিংহাসন উদ্ধারের কোন চেষ্টাই করিলেন না; কেবল মাত্র একজন প্রাচীন গ্রহবিপ্রের আগ্রহে উহা চোহানদিগের করকবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

বৃদ্ধ অরোর নগরে গমন করিয়া ভরতের সহিত সাক্ষাৎ করত সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিল। ভরত-পুত্র রাহুপ সেনাবল সমভিব্যাহারে মাহুপ কর্তৃক পরিত্যক্ত সিংহাসন অধিকার করিতে গমন করিলেন। পাল্লী নামক স্থানে এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে শনিগররা গণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। মিবারের সৈন্যগণ আসিয়া রাহুপের পক্ষে যোগ দিল। এবং তাহাদিগের সহায়তায় রাহুপ চিতোরের সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পিতা ও মাতা রঙ্গদেবী চিতোরে আগমন করিলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা অরোরে থাকিলেন।

১২০১ খৃঃ অব্দে রাহুপ চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সামসুদ্দীনের আক্রমণ হইতে চিতোর রক্ষা করিয়া নাগোরের নিকটে এক যুদ্ধে তাহাকে একবারে হতবল করিয়া দেন। ইহাঁর অধিকার কালে দুইটী অতি প্রধান পরিবর্ত্ত সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ গেহলোট হইতে জাতীয় নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া শিশোদী, দ্বিতীয়তঃ বংশীয় নাম রাওল হইতে রাণা হইল। রাহুপ মৃগয়া করিতে গিয়া অতি পরিশ্রমে একটী শশ বধ করিয়া ঐ ব্যাপার স্মরণীয় করিবার জন্য তথায় একটী নগর সংস্থাপন করেন। ইহা হইতেই তাঁহাদের নাম শিশোদী হইল। মণ্ডোরের পরিহার রাজের নাম মোকল এবং উপাধি রাণা; ইনি রাহুপের ঘোরতর শত্রু ছিলেন। রাহুপ মোকলের রাজধানী আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে শিশোদী নগরে ধরিয়া আনিলেন; এবং চিরবিরোধিতার দণ্ডস্বরূপে তাঁহার সমৃদ্ধিসম্পন্ন গডরব প্রদেশ ও তাঁহার রাণা উপাধি হরণ করিলেন। এই উপাধি রাহুপ নিজে ধারণ করিয়া চিরবিরোধ ভঞ্জনের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি অষ্টত্রিংশ বর্ষ রাজ্যভোগ করেন। তিনি যে কেবল পতনোন্মুখ সৌভাগ্য রক্ষা করিবার ক্ষমতা ধরিতেন এমন নহে, তাঁহার সম্যক ধ্বংস হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেন। তাঁহার পরে যে নয়জন ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন, তাহাদের সকলের রাজত্বকাল একত্র করিলেও তাহার দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্ব কালের সমান হইবে না। এই নয়জনের মধ্যে ছয়জন অসভ্যদিগের ভীষণ কবল হইতে পবিত্র গয়াধাম রক্ষা করিতে জীবন দান করেন। এই যুদ্ধ ব্যাপারে পরিলিপ্ত থাকায় তাঁহারা ক্রমে আপনাদের রাজধানী চিতোর নগর হারাইয়াছিলেন, কিন্তু ভন সিংহ তাহার উদ্ধার সাধন করিয়া আপনার নাম স্মরণীয় করিয়াছেন। আমরা এই নয়জনের বিবরণ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধে পরিত্যাগ করিলাম; পাঠকবর্গ মার্জ্জনা করিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

খৃষ্টীয় ১২৭৫ অব্দে লক্ষ্মণসিংহ চিতোর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইহাঁর রাজত্বকাল ভারতীয় ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয় সময় বলিয়া নির্ণীত আছে। শিল্পসাধিত যাহা কিছু উৎকৃষ্ট পদার্থ ছিল, পাঠান সম্রাট দুর্দ্দান্ত আলাউদ্দীনের দ্বারা এই সময়েই সমস্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই দুর্বৃত্ত দুই-

বার চিতোর আক্রমণ করে; প্রথমবারে বহু বীরের জীবন দানে নগর ধ্বংস হইতে রক্ষা পায়, দ্বিতীয়বারে চিতোর এককালে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইতিবৃত্তে এই দ্বিতীয় আক্রমণের বিবরণ সুস্পষ্ট রূপে বিবৃত হইয়াছে।

লক্ষ্মণের অপ্রাপ্ত ব্যবহার সময়ে তদীয় পিতৃব্য ভীমসিংহ রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। সিংহলের চোহানরাজ হাসির শঙ্খের কন্যা পদ্মিনীকে ভীমসিংহ বিবাহ করেন। পদ্মিনী সর্ব্বললামভূতা রমণী; তাঁহার ন্যায় অপরূপ রূপলাবণ্যবতী রমণী কখন কাহারও নেত্রগোচর হয় নাই। পদ্মিনীর রূপলাবণ্য ও গুণগরিমা সম্বন্ধীয় বিবিধ গাথা অদ্যাপিও রাজস্থানে শুনিতে পাওয়া যায়। এই রমণীরত্নের বিবরণ শ্রবণ করিয়া আলাউদ্দীন পদ্মিনীলাভলালসায় চিতোর নগর আক্রমণ করে। দীর্ঘকাল কৃতার্থতা লাভে অসমর্থ হইয়া দুর্ব্বৃত্ত নগর মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিল, পদ্মিনীকে প্রাপ্ত হইলে সে সমস্ত সৈন্য সামন্ত লইয়া চলিয়া যায়। রাজপুতেরা দুর্ব্বৃত্তরাক্ষসের দুর্বিনীত বাক্যে সমধিক কুপিত হইয়া ঘোরতর সাহসিকতার সহিত নগর রক্ষা করিতে লাগিল। আলাউদ্দীন কিছুতেই সিদ্ধ মনোরথ না হইয়া পরিশেষে প্রস্তাব করিল যে সে অপূর্ব্বদর্শনা পদ্মাবতীকে একবার মাত্র দর্শন করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। তাহাতেও রাজপুতেরা সম্মত না হইলে, দুর্ব্বৃত্ত মুকুরে পদ্মবতীর ছায়ামাত্র দর্শন করিয়াই চিত্তের তৃপ্তিসাধন করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। রাজপুতেরা নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়া আলাউদ্দীনের এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল। আলা কতিপয় জন মাত্র রক্ষিসমভিব্যাহারে নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজপুতেরা মনে করিলেই দুষ্ট যবনকে বন্দী করিতে পারিত, কিন্তু তাহারা সেরূপ বিশ্বাসঘাতক নহে। আলাউদ্দীন আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া প্রত্যাগমন সময়ে রাজপুতেরা তাহার প্রত্যুদ্গমন করিল। এরূপ ঘটিবে, দুর্ব্বৃত্ত তাহা মনে মনে স্থির করিয়াই পূর্ব্ব হইতেই নগরের বহির্দ্দেশে কতকগুলি সৈন্যকে গুপ্তভাবে রক্ষা করিয়াছিল। রাণা ভীমসিংহ দুষ্ট যবনের প্রত্যুদ্গমন করিতে নগরের বহির্দ্দেশে আগমন করিবামাত্র ষড়যন্ত্রকারীর চক্রান্তে পতিত হইয়া বন্দী হইলেন। আলা প্রচার করিয়া দিল, পদ্মিনী লাভ ভিন্ন ভীমসিংহের নিষ্কৃতির কোন উপায় নাই।

এই দারুণ সংবাদ শ্রবণে চিতোরবাসীগণ নিতান্ত নৈরাশ্য সাগরে ভাসিতে লাগিল। রাজার নিষ্ক্রয় স্বরূপে পদ্মিনীকে বিসর্জ্জন দেওয়া যাইতে পারে কি না, রাজপুরুষ ও পৌরবর্গের মধ্যে ইহারই আন্দোলন হইতে লাগিল। পদ্মিনী সমস্ত সমাচার অবগত হইলেন। তাঁহার জন্যই যে এই নিদারুণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। অস্পৃশ্য নিষ্ঠুর ম্লেচ্ছর হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে তাঁহার পতি মুক্তিলাভ করেন, সতীকুল শিরোমণি পদ্মিনী নিরাকুলিত চিত্তে এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন। কি করিলে সকল দিক্ রক্ষা হয়, মনে মনে সতী তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে

আত্মসমর্পণে সম্মতি দান করিয়া নিজ পিতৃব্য গোরা ও ভ্রাতুষ্পুত্র বাদল, সিংহল দেশীয় এই বীরদ্বয়ের সহিত সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পতির উদ্ধার সাধন ও আপনার ধর্ম্মরক্ষা এই উভয়বিধ গুরুতর ব্যাপার যাহাতে সুকৌশলে সম্পন্ন হইতে পারে, সতী আপনার নিকট-সম্পর্কীয় বন্ধুগণের সহিত তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। উপায় স্থির হইলে যবন-শিবিরে দূত প্রেরিত হইল। দুরাচার আলার নিকটে নিম্নমত সমাচার বহন করিয়া দূত গমন করিল।—

"পতির উদ্ধারের জন্য পদ্মিনী আত্মসমর্পণে স্বীকৃতা হইলেন, কিন্তু তিনি শিবিরে উপস্থিত হইবা মাত্র যেন যবনেরা শিবিরভঙ্গ করিয়া দিল্লী যাত্রা করে। পদ্মিনী স্বীয় সম্মানের উপযোগী সজ্জায় গমন করিবেন। তাঁহার সহিত অনেক পরিচারিকা ও অন্যান্য স্ত্রীলোক গমন করিবে। তিনি যখন দিল্লির রাজমহিষী হইয়া উক্ত রাজধানীতে গমন করিবেন, তখন যে সকল পরিচারিকা তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিবে, তাহারাই যে শিবিরে তাঁহার সঙ্গে যাইবে, এমন নহে; তাঁহার আত্মীয়া অনেক রাজপুতমহিলা তাঁহার নিকট জন্মের মত শেষ বিদায় লাভ করিতে শিবির পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইবে। মহিলাগণ যে সকল সমাবৃত যানে গমন করিবে, দুরাচার যবনেরা কৌতুকপরবশ হইয়া যেন তাহার দ্বারোদ্ঘাটন না করে। লজ্জাশীলা রমণীবর্গের যেন অবমাননা না হয়।"

ভীমসিংহের উদ্ধারের জন্য পদ্মিনী আত্মসমর্পণ করিবেন এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আলাউদ্দীন আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সতী যেরূপ আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন, শিবিরে সেই আদেশ অচিরাৎ প্রচারিত হইল। রাজকীয় পটমণ্ডপ গুলি উচ্চতম কানাতে আবৃত হইল। ক্রমে অন্যূন ৭০০ সাত শত দোলা শিবির সন্নিধানে সমুস্থিত হইল। প্রত্যেক দোলায় মহিলার পরিবর্ত্তে এক এক জন অস্ত্রধারী সাহসী বীরপুরুষ ছদ্মবেশে বসিয়াছিল। প্রত্যেক দোলায় ছয় জন করিয়া বাহক নিযুক্ত ছিল, বাহকবেশ তাহাদের ছদ্মবেশ মাত্র, তাহারা অস্ত্রধারী সেনাভিন্ন আর কেহই নহে। শিবিরের মধ্যে ঐসকল মহিলা যান-প্রবিষ্ট হইলে পতিপত্নীর প্রণয়-সাক্ষাৎ ও চিরবিদায়ের জন্য দণ্ডৈকমাত্র কাল অবসর প্রদত্ত হইল। কতকগুলি দোলা শিবির মধ্যে রহিল, আর কতকগুলি চিতোরে প্রবেশ করিল। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে কতকগুলি রাজপুত মহিলা পদ্মিনীর নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিবে বলিয়া সঙ্গে আসিয়াছিল, যেন প্রত্যাবৃত্ত দোলায় তাহারাই গমন করিল। ভীমসিংহ ও পদ্মিনী কতিপয় রক্ষি সমভিব্যাহারে সেই সকল দোলায় চড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। দুর্ব্বৃত্ত আলাউদ্দীন ক্রমে অস্থির হইয়া উঠিল। পদ্মিনীকে আয়ত্ত করিবার জন্য দুরাশয় নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। আর সে বিলম্ব করিতে না পারিয়া ভীমসিংহের পটগৃহে উপনীত হইল, দেখিল ভীম ও পদ্মিনী তথায় নাই। কেবল কতকগুলি অস্ত্রধারী রাজপুতবীর দণ্ডায়মান আছে। যে সকল দোলা চি-

তোরাভিমুখে গমন করিয়াছে, তাহাদের আক্রমণের জন্য অশ্বারোহী প্রেরিত হইল। চিতোর নগরীর সিংহদ্বার-সম্মুখে সংগ্রাম বাধিল। রাজপুতবীরমণ্ডলী গোরা ও বাদলকে আপনাদিগের অধ্যক্ষরূপে বরণ করিয়া স্বাভাবিক বীরতার সহিত সমরে অগ্রসর হইল। এই যুদ্ধে চিতোরের প্রধান প্রধান বীরগণ গতাসু হইলেন। ভীমসিংহ বহুতর শত্রুসেনার প্রাণ বিনাশ করিয়া রণ-শয্যায় শয়ন করিলেন। বাদলের বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষ মাত্র; কিন্তু এই বয়সেই রাজপুতেরা অত্যন্ত তেজস্বী হইয়া থাকে। বাদলের রণপাণ্ডিত্য দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিল। অন্তঃপুরে পদ্মিনী ও অন্যান্য রাজপুতমহিলাবর্গ ধর্ম্মনাশ ভয়ে অগ্নিপ্রবেশের উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছেন। বাদল রুধিরসিক্ত কলেবরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে পদ্মিনী ব্যস্ততাসহকারে তাহাকে প্রিয়তমের সমর সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। বাদল কহিলেন, "মাত! আমি সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম, দেখিলাম, তিনি সমরের সম্মান সূচক শয্যার উপর শবের আস্তরণ বিস্তার করিয়া এবং জনৈক মৃত যবন রাজকুমারকে উপাধান স্বরূপে লইয়া শত্রুগণ মধ্যে শয়ন করিলেন।" পদ্মিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহাকে কেমন রণকুশল দেখিলে?" বাদল কহিল "জননি! তাঁহার ক্ষমতার কথা কি কহিব তিনি রণ প্রাঙ্গণে শত্রু রাখিয়া যাননাই।" পদ্মাবতী কহিলেন "প্রভু আমার বিলম্বে বিরক্ত হইবেন।" এই কথা বলিয়াই অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিলেন।

এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটী রাজপুত কবিগণ যেরূপে বর্ণন করিয়াছেন, আমরা তাহার সারভাগ পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিতেছি। পূর্ব্বোক্ত কৌশলবলে রাণা ভীমসিংহ যবন শিবির হইতে মুক্তিলাভ করিলে উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল, যবনেরা প্রবলবেগে চিতোর আক্রমণ করিল। দিন দিন রাজপুত বীরবর্গের সংখ্যা ন্যূন হইতে লাগিল। দিবাভাগের রণশ্রম কথঞ্চিৎ শাম্য করিবার জন্য ভীমসিংহ শয়ন করিয়াছেন, কিন্তু ভাবনায় নিদ্রা আসিতেছে না। কি উপায় মিবার রক্ষা হইবে, কি করিলে রাজপুত কুল-গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিবে, কোন কৌশলবলে বিলুপ্ত প্রায় রাণা বংশ অপ্রতিহত হইয়া রহিবে, তাহার চিন্তাতেই ভীমসিংহের নিদ্রা আসিতেছে না। ঘোর রজনী, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, মহারাণা ভীমসিংহ স্তিমিত প্রায় প্রদীপের দিকে দৃষ্টিরাখিয়া সমস্ত ব্যাপার চিন্তা করিতেছেন। সহসা "মই ভুখা *" এই শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। যেদিক্ হইতে শব্দ হইল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভীম সিংহ দেখিলেন, চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আসিয়া কহিতেছেন, "আমি ক্ষুধিত।" ভীমসিংহ কহিলেন, "মাত! আটসহস্র বীরপুরুষ আপনার নিকট বলি দিয়াছি, তথাপি আপনার তৃপ্তি হয় নাই।' দেবী কহিলেন "আমি ওসকল বলির প্রার্থনা করি না। রাজমুকুটধারী দ্বাদশ বলি প্রাপ্ত না হইলে আমার তৃপ্তিসাধন হইবে না।

* Myn bhooka ho আমি ক্ষুধিত হইয়াছি।

অধিকন্তু রাণাবংশ বিলোপপ্রাপ্ত হইবে।„ এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

প্রাতঃকালে ভীমসিংহ পারিষদবর্গের নিকট এই ব্যাপার বর্ণন করিলে তাঁহারা উহাকে স্বপ্ন বলিয়া উপেক্ষা করিলেন। রাণা কহিলেন, "তোমরা সকলে অদ্য মধ্য রাত্রে আমার শয়ন কক্ষে গমন করিলে হয়ত আবার দেবীর আবির্ভাব দেখিতে পাইবে।" মধ্য রাত্রে রাজপারিষদগণ ভীম সিংহের নয়ন কক্ষে উপস্থিত হইলে, দেবী আবির্ভূতা হইয়া কহিতে লাগিলেন,— "এ প্রকার সহস্র সহস্র বলিতে আমার কি হইবে? প্রতিদিন এক এক রাজকুমারকে সিংহাসনে বসাইয়া ছত্র চামরে সুশোভিত করতঃ তাহাকে রাজা বলিয়া প্রচার কর; তিনদিন কাল তাহার আদেশে সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালিত হউক, চতুর্থ দিবসে সে শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বদেশের জন্য জীবন দান করুক, তবে আমি এখানে থাকিতে পারি।" সকলে শ্রবণ করিয়া স্তব্ধ হইলেন।

স্বদেশ রক্ষার্থে জীবন দান করিতে রাজপুত বীরবর্গ কোন কালেই কাতর নহে। ভীমসিংহের দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে কে অগ্রে যুদ্ধে যাইবে বলিয়া বিবাদ উপস্থিত হইল। উর্শী সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বলিয়া তিনিই সর্ব্বাগ্রে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং চতুর্থ দিবসে সমরে গমন করিয়া স্বদেশের জন্য জীবন দান করিলেন। দ্বিতীয়পুত্র অজয় সিংহ পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, তিনি পিতার অনুরোধ কোন মতে এড়াইতে পারিলেন না। তাঁহার পূর্ব্বে অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ক্রমান্বয়ে রাজবেশ ধারণ করিয়া চতুর্থ দিবসে জীবন বলি প্রদান করিলেন। এই রূপে ভিমসিংহের একাদশ পুত্র গতায়ু হইলে রাণা সমবেত সভ্যমণ্ডলীর নিকট প্রকাশ করিলেন, 'এক্ষণে চিতোরের জন্য আমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।' এদিকে অন্তঃপুর মধ্যে জহর * ব্রতের আয়োজন হইতে লাগিল। মৃত্তিকার নিম্নে প্রকোষ্ঠ বিশেষে চিতা প্রজ্জলিত, তাহার চতুর্দ্দিকে রাজপুত মহিলাবর্গ অগ্নি প্রবেশে উদ্যত হইয়া আছে। চিতোর রক্ষক বীরবর্গের স্ত্রী ও কন্যাগণ পাপাচারী যবন কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেই অগ্নি প্রবেশ দ্বারা আপনাদিগের মান ও ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য ঈদৃশ আয়োজন করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। এক্ষণে পিতাপুত্রে বিবাদ আরম্ভ হইল। ভীমসিংহ ও তদীয় দ্বিতীয় পুত্র অজয়সিংহ পরস্পরে এই বলিয়া বিবাদ আরম্ভ করিলেন যে আমি দেবীর শেষ বলি হইব। অনেক তর্কবিতর্কের পর ভীমসিংহের জেদই বজায় থাকিল। তাঁহার অনুরোধক্রমে অজয়সিংহ কতিপয় রক্ষীমাত্র সমভিব্যাহারে কাইলবর প্রদেশে গমন পূর্ব্বক নি-

---

* আপনাদিগের ধর্ম্ম রক্ষার জন্য রাজপুত মহিলারা অগ্নি প্রবেশ দ্বারা জীবন বিসর্জ্জন করে। ইহারই নাম জহর। এরূপ কিম্বদন্তী, যে স্থলে এই জহর ব্রত সম্পন্ন হইয়াছিল, তথায় কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। তথায় এক বৃহৎ অজগর অধিষ্ঠান করে, তাহার বিষাক্ত নিশ্বাসে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া আগন্তুকের জীবন বিনাশ করে।

রাণপক্ষে অবস্থান করিলেন। রাণা তখন ‘আমি আর নির্ব্বংশ হইলাম না’ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ভীমসিংহ চিতোরের তৎকাল-জীবিত বীরগণের সহিত একত্রিত হইয়া সমরাঙ্গণে উত্তীর্ণ হইলে, এবং সাহসিকতা ও রণপাণ্ডিত্যের অতুলনীয় পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। ওদিকে অন্তঃপুর মধ্যেও জহরব্রতের শেষ হইল। দুর্ব্বৃত্ত আলা স্বদেশ বৎসল বীরপুরুষদিগের শোণিত-সিক্ত চিতোর মধ্যে প্রবেশ করিল। চতুর্দ্দিকে নিজ নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পদ্মিনীলাভ লালসায় অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, চিতোরের সৌন্দর্য্যরাশি ভস্মে পরিণত হইয়াছে।

এইরূপে খৃষ্টীয় ১৩০৩ অব্দে মিবারের রাজধানী চিতোর নগরের পতন হইল। ভারতবর্ষের যবন সম্রাটদিগের মধ্যে আলাউদ্দীন অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ও যুদ্ধ প্রিয় ছিল। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাহার যার পর নাই বিদ্বেষ ছিল। বিজিত প্রদেশে দেবমন্দিরের লেশমাত্র রাখাও তাহার মনোমত অভিপ্রায় ছিল না। আলা স্বয়ং সেকন্দর সানী * উপাধি গ্রহণ করিয়া মুদ্রাতেও উক্ত নাম খোদিত করিয়াছিল। আলাউদ্দীনের নিষ্ঠুর হস্তে ক্রমান্বয়ে অহ্লবর, ধার, অবন্তী দেবগির প্রভৃতি অগ্নিকুলসম্ভূত নৃপতি নিচয়ের অধিকার সমূহ এককালে লয় প্রাপ্ত হয়। ভট্ট, খিচি ও হর বংশীয় ভূপতিবর্গ এই দুর্ব্বৃত্ত দ্বারাই হত বল হইয়াছিল, কিন্তু পরে আবার ইহারা কিয়ৎ পরিমাণে আপনাদের লুপ্ত প্রভাবের উদ্ধার সাধন করিয়াছিল। আলা কিছু দিন চিতোরে অবস্থান পূর্ব্বক বিবিধ প্রকারে আপনার নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া রাজধানী দিল্লি নগরে গমন সময়ে নিজ প্রিয়পাত্র ঝালোর পতি মল্লদেবকে চিতোর রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া যায়। আলা ঝালোর নগর জয় করিলে মল্লদেব তাহার শরণাপন্ন হয়, তদবধি ঝালোরেশ্বর মল্লদেব আলার প্রিয়পাত্র মধ্যে পরিগণিত ছিল। আলার এই আক্রমণে চিতোরের শিল্পসাধিত সমুদায় সৌন্দর্য্যরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভীম ও পদ্মিনীর বাসপ্রাসাদ ভ্রষ্ট বিনষ্ট করে নাই; বোধ হয় তদুপরি নিষ্ঠুরাচরণ করিতে দুর্ব্বৃত্তের মায়া জন্মিয়াছিল।

(ক্রমশঃ।)

* The second Alexander.

রঙ্গমতী। *

(বাঙ্গারামের সমালোচনা।) †

দুরারোহ বৃক্ষ, কণ্টক সমূহ পরিপূর্ণ লতা গুল্ম বা সর্পাদি হিংস্রজীবসঙ্কুলঘোর অরণ্য কান্তার, অথবা খাশবাগান, পুষ্পফুল যেখানেই প্রস্ফুটিত হউক, স্বভাবসম্ভব দেবদত্ত রূপ ও মাধুর্য্য গুণে, চিত্ত প্রকৃত কিংবা বিকৃত যেরূপই থাকুক, দর্শন স্পর্শন বা ঘ্রাণ যে কোন উপায়ের মধ্যদিয়া সেই খানেই তাহা সে চিত্তের কোন না কোন রূপে রমণীয়তা সম্পাদনে সমর্থ; তাহার কারণ প্রকৃত গুণ যাহা যাহা, তাহা সর্ব্বজনীন ও সর্ব্বদেশব্যাপী। এই পৃথিবীতে কাব্যও তদ্রূপ। রূপ পার্থিব, মাধুর্য্য দিব্য। রূপ পার্থিব নয়নকে আকর্ষণ করে; মাধুর্য্য অপার্থিব অন্তরাত্মাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। রূপ কি বুঝিতে পারি, মাধুর্য্য কি বুঝিতে পারি না, কেবল অনুভব করিতে পারি, এবং এই নিমিত্তই তাহার উপর ক্ষমতা শূন্য। কেন মাধুর্য্যে মোহিত হই, বলিতে পার? বৈজ্ঞানিক, তোমার খরিদ বিক্রয় বিজ্ঞান তফাতে রাখ। মাধুর্য্য তুমি বুঝিবে কি, সেই হিব্রু কবি বুঝিয়াছিল, যে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বলিয়াছিল,—'সমগ্র ঐশ্বর্য্য সত্বেও সলোমনের গৌরব-চাকচিক্য সামান্য বনকুসুমের তুলনেও গৌরব রক্ষণে অক্ষম।' উহা গূঢ় গুহ্য, বিধাতৃসত্বা,—বুঝিতে পারি বা না পারি, উহা দৃকপাতশূন্য হইয়া আপন কার্য্য করিয়া চলিয়া যাইতেছে; মানবগণ স্বেচ্ছা শূন্যে, বা যুক্তে, তৎফলভাগী হইতেছে। পশুগণ মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব জ্ঞাত না থাকিলেও, মাধ্যাকর্ষণ যাহা, সে তাহাদের দ্বারা আপন কার্য্য সাধন করাইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাযুক্তে সেই মাধুর্য্য ফলভাগী হয়, ও সেই গূঢ় গুহ্য যোগে দৃষ্টি

* রঙ্গমতী (কাব্য). শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত ও শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। বসুযন্ত্র। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

† 'কালে কালে বাপুও পণ্ডিত হবেন,' আর কালে কালে আমাদের বাঙ্গারামও লেখক হইয়াছেন, আবার সুধু লেখক নহে, সমালোচক!—* কিমাশ্চর্য্য মতঃপরং! কিন্তু বঙ্গসাহিত্য পাঠক, আপনাদের সাবধান করিয়া দেই, বাঙ্গারাম যাহা বলিয়াছে তাহা একটু বাদ-ছাদ দিয়া লইবেন। আমি এ কথা একা বলিতেছি না; তাহার সাক্ষ্য ব+দ সম্পাদক, এ সমালোচনা প্রার্থনা করিয়া লইয়া, শেষে দীর্ঘায়তন এবং অপরাপর খুঁত ধরিয়া অপছন্দ করিলেন কেন? এ সমালোচনার আরও বিশেষ দোষ এই যে, ইহা প্রচলিত প্রথা ভ্রষ্ট! ইতি। জলধর।

চালনা করিতে পারে, তাহারই জীবন সার্থক : সে বিশ্ববিধাতৃকে সাক্ষ্যাৎ দর্শন করিয়া থাকে।

সেই অভাবনীয় অভূতপূর্ব্ব মাধুর্য্য বিস্তার যথায়, তাহা কাব্য। আয়ত্তীকৃত মাধুর্য্যের পরিমাণ অনুরূপ, আমাদিগের আত্মিক পথে অগ্রসরতার পরিমাণ। মাধুর্য্যে পূর্ব্বাভাস বা আদর্শ পদার্থ ; আদর্শ পদার্থ কাব্য। সমাগত কাব্য, অনাগত, আয়ত্তীকৃত, অভূতপূর্ব্ব মাধুর্য্যের অবতারণা করিয়া থাকে। উহা পরিচালক ভবিষ্যবাণীরূপী দেব-অনুজ্ঞার প্রচার। অন্যান্য শাস্ত্র পাচক দ্রব্য, কাব্য পাচিত বস্তু ; অথবা কাব্যের তাহারা রসায়ন-বিয়োজিত পৃথক পৃথক উপকরণ সমূহ। দেখিতে গেলে কাব্যে পৃথক কোন শাস্ত্রই নাই ; অথচ উহাতে সকলই আছে ;—সর্ব্ব সামঞ্জস্যসমাবেশে রূপ ও মাধুর্য্য প্রচার। বলা বাহুল্য যে, বস্তু সমূহের বা বিষয় সমূহের সামঞ্জস্যসমাবেশই পূর্ণতার লক্ষণ। কাব্য সুতরাং পূর্ণ, সমগ্র বা অংশত সর্ব্বত্রেই পূর্ণভাব ; পূর্ণ পূর্ণ সমাবেশে মহাপূর্ণ ইহার সংসার-আয়তন। ইহার অবস্থা সৎ। উহা মনুষ্যের আদিম অবস্থায় অদৃষ্টবলের সহ পরিচিত করিয়া মনুষ্য পদবীতে আনিয়াছে। মধ্যম অবস্থায় জ্ঞানশৈল স্পর্শ ও তদধিরোহণে প্রবৃত্ত করিয়াছে। উন্নত কালে পুষ্টিবর্দ্ধন করিতেছে। একবিশ্বের কর্ত্তা যাঁহারা, তাহাদের যে যতই ধনী বা নির্ধন কর্ত্তা হউন, যদি প্রকৃত কর্ত্তা হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা যে অবশ্য ধন্যবাদের পাত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ সৎ-অসৎময়ী পৃথিবীতে পূর্ণকবি অসম্ভব। আধুনিক জগতের জগত-সাধ্য চূড়ান্ত কবি যিশুখৃষ্ট। তাহার পর 'কবি' শব্দে যাহারা খ্যাত, তাহাদের যাহার যেমন মাল, তাহার তেমনি দাম করিয়া লও। শ্রোতা মহাশয়, তুমি ভাবিওনা যে তুমিও কম ; আতরওয়ালা আতর দিয়া গেল বলিয়া সে চৌদ্দ পুরুষের ঠাকুর হইবে, তাহা নহে ; তোমার যদি সে আতর ব্যবহার করিবার শক্তি ও সুযোগ থাকে, তাহা হইলে মানিও তুমিও কম নহ।

আমরা বাঙ্গালী জাতি, কাব্য ধনেও অধিক ধনী নহি। বাঙ্গালা দেশে কাব্য বলিয়া একজাতির জিনিস অনেক আছে বটে, কিন্তু আমার গুরুজী বলিয়াছেন যে তাহা নচ্ছার বাখরগঞ্জী ফেরিওয়ালার জিনিস, কাব্য নহে। যাহার যেমন অদৃষ্ট, 'লঙ্কায় যান দরিদ্র, নিয়ে আসেন হরিদ্র'! কিন্তু মুনি গোঁসাই মশায়, তাই বলিয়া ভাবিবেন না যে এ কাব্য কর্ত্তাও রঙ্গমতীজাহাজে কেবল হরিদ্রা বোঝাই করিয়া আনিয়াছেন। হরিদ্রা না হউক, আপনার নাকে টিপিয়া দিবার জন্য যদি কিছু প্রকৃত লঙ্কাই আনিতেন, তাহা হইলে আমি কতকটা সন্তুষ্ট হইতাম বটে, সে যাহা হউক এ কবি প্রকৃত সোণাই আনিয়াছেন, এবং পরিমাণে যাহাই হউক, সে ভাল সোণা। কেমন করিয়া বুঝিলে ?—

তাহার কারণ আছে, যুগারম্ভ হইতে যুগান্ত ব্যাপিনী সৃষ্টির কথা ছাড়িয়া দেও, সঙ্কীর্ণ আয়তনের মধ্যেই দৃষ্টি করিয়া দেখ ; —এক বৃক্ষে দুইটি আঁব একরূপ ফলেনা,

এক জঠরেও দুইটি মানুষ একরূপ জন্মায় না; এবিশ্বে প্রতি বস্তু নূতন, প্রতি পদার্থ নূতন নূতন, প্রতিহস্ত নূতন কার্য্য করিতে সৃষ্ট, প্রতি চিত্তও নূতন কার্য্য করিতে সৃষ্ট। ইহার উদ্দেশ্য, প্রতি নূতন পদার্থ যোগে ঐশ্বরিক নূতন সত্যের প্রকটন। যে চিত্ত সেই নূতনত্ব বজায় রাখিয়া নূতন দর্শনের প্রচারণা করিতে পারে, তাহার সেই প্রচারণা সুতরাং নিতান্ত এবং অভূতপূর্ব্ব নূতন সত্য। ফলতঃ অন্যে যে বস্তু যেরূপ দর্শন করিয়া থাকে, তাহা নহে; লেখক স্বয়ং তাহা আত্মপ্রকৃতি যোগে যেরূপ দর্শন করিয়া থাকে, অবিকল তাহাই যদি লিখে; তাহা হইলে, সেই লেখা যতই সামান্য বা মহৎ প্রকৃতির হউক না কেন, তাহাতেই নূতনত্ব ও নবসত্যের প্রচার বলিয়া জানিও। নবীনচন্দ্রের লেখায় সেই নূতনত্বের পূর্ণ প্রচার, অর্থাৎ পূর্ণ শব্দে আমরা যে সঙ্কীর্ণার্থ বুঝিয়া থাকি। এখানে একটু বখামি করিব। বঙ্গ সন্তান প্রায়ই এরূপ নূতনত্ব বড় বুঝেন না; ইহাদের সমাজ নাই, অথচ ইহারা সামাজিকতার খাতিরে বড় ব্যস্ত; পাঁচজনে দেখিলে বা শুনিলে যে কি বলিবে, এই ভয়েই সর্ব্বদা জড় সড়, একেবারে অজ্ঞান; এজন্য ভালয় হউক মন্দয় হউক, পাঁচজনের মন রক্ষা, পাঁচজনের তুষ্টিসাধন জন্য, নিয়ত আত্ম-লোপ এ বঙ্গে দৈনিক ব্যাপার। এ সকল লক্ষ্মীছাড়ার দশা! পাঁচজন, পাঁচজন আছে; কিন্তু মুর্খ, তুমিও কি একজন নও; একজন একজন করিয়া কি পাঁচজন হয় নাই? নিতান্ত দুর্ম্মতি, দুর্ব্বুদ্ধি না হইলে, যে গঠন ঈশ্বরের, পাঁচজন নির্ম্মিত মুখসে তাহা আবরিত না করিয়া বাহির করিতে পার না কি জন্য? স্বাত্ম ভাব এবং সামাজিকতার কি সামঞ্জস্য হইতে পারেনা? কিন্তু এ বঙ্গভূমে তাহা হয় না। এপক্ষে ইহা এতদূর নিম্নে নামিয়াছে যে, এখন সমালোচকেরা পর্য্যন্ত নিজ কার্য্য ভুলিয়া গিয়া, লেখককে এইরূপ কর, এইরূপ কর, বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকে। প্রবন্ধোক্ত নায়ক নায়িকার ঘটকালি পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ফলতঃ যে বস্তু চিত্ত বিশেষের সৌষ্ঠব এবং নিজস্ব সম্পত্তি না হইল, তাহা নূতন নয়, তাহার জন্য লোকের লালসাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?—এই কথা বাঞ্ছারাম শর্ম্মা বড় একটা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

আমার একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, আধুনিক প্রথা অনুসারে রঙ্গমতী কাব্য খানিকে তুলনায় সমালোচনা করি। কিন্তু শেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, বাঞ্ছারামের সে বাঞ্ছা ভুল। ঈশ্বর কাহাকে তুলনায় সৃষ্টি করেন নাই, পৃথিবীও কাহাকে তুলনায় প্রসব করে না। প্রকৃত পদার্থ মাত্রেই সর্ব্বত্রে একত্ব এবং পূর্ণত্ব বিদ্যমান, সকলেই স্ব স্ব প্রধান। আমার বিশ্বাস এই, প্রতি মনুষ্য সেই পরিমাণে আত্ম স্বভাব না ভুলিলে, অপরের সহিত তুলিত হইতে পারে না; এবং দর্শকও আত্ম পদার্থে অন্ধ না হইলে, একজনকে অপরের সহিত তুলনা করিতে অগ্রসর হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে এ সংসারে স্বভাব ভুল এবং তুলনার সংখ্যাই অধিক। নবীন সেন, স্বস্বভাবপূর্ণ কবি,

সুতরাং তাহাকে কাহার সহিত তুলনা করিব? নবীনচন্দ্র, নবীন চন্দ্রেরই সঙ্গে তুলনীয়, তদ্ভিন্ন আর কোন তুলনা হইতে পারে না।

আরও একটি আমার পূর্ব্বাপর হইতে বিশ্বাস আছে যে, যখন যে দেশের কোন প্রকৃত কবির উদয় হয়, তখন তাহার সেই উদিত-ভাব তদ্দেশের কোন আগত প্রায় অভূতপূর্ব্ব উন্নতি, অর্থাৎ প্রস্তুত ভাবে কাল পথে আর একপদ অগ্রসর হইবার পূর্ব্ব সূচনা স্বরূপ। যখন যাহা হইবে বা হইতে বসিয়াছে, তাহা কি প্রকৃতির ও কিরূপ হইবে, এবং তাহার ভাব কিরূপ, তাহা বিধাতা তাঁহার কর্ম্মকারকদিগের জ্ঞাতার্থে, অগ্রে কবিমুখ দ্বারা এই জগতীতলে প্রচার করিয়া থাকেন; এবং তাহা আগত হইয়া চিত্তবিস্তারে, আদর্শদানে, উদ্দিষ্ট কার্য্য সাধন করিতে থাকে। আমি আবার বলিতেছি,—ভাবিওনা যে ছন্দোবন্ধ-বাক্য-লেখক না হইলে কবি, এবং ছন্দোবন্ধ-বাক্য না হইলে কাব্য হয় না। তবে বিশেষ এই ছন্দোবন্ধ বাক্য লেখকেরা উপাধিধারী কবি। যেমন ঔষধব্যবসায়ের গুণে, প্রতি ঔষধ-ব্যবসায়ী ব্যক্তিই কবিরাজ! সে যাহা হউক, কাল উপস্থিত হইলেই, এই প্রচার কার্য্যের সমুপস্থিতি হয়। আমি যে তোমাকে দেখিতেছি ইহা যেমন সত্য, আমার ঐ কথাও তদ্রূপ অব্যর্থ সত্য বলিয়া জানিও। ভাল, তাহাই হউক, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এ দুরন্ত সময়ে, নবীন সেনের রঙ্গমতী, হটাৎ ইংরেজী এক্‌প্রেস্ প্যাসেঞ্জার গাড়ীর ন্যায়, ঝুপ করিয়া ভারত ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল কিজন্য?—যে হাবুডুবু খাইতেছি, অনেক হাবুডুবু খাওয়ায় ফল আছে বলিয়া, তাহাতে কি আরও হাবুডুবু খাওয়াইতে? না দেশের মঙ্গল বলিয়া যে নানাবিধ সংস্করণ ও সভা প্রভৃতি চলিতেছে, তাহার সহায়তা করিতে? অথবা কি এ দুই হইতে আরও কিছু স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যে, যাহা আমরা এখনও জানি না,—এবং চিনির বলদ কবিও এখনও জানেন না? ইহা একবার দেখা কর্ত্তব্য। বিশেষ নবীন সেনকে কোথায় একস্থানে,—এখন স্মরণ হয় না,—নৈমিত্তিক কবিশ্রেণীতে গণনা করা গিয়াছে।

সেই একদিন স্মরণ হয় কি? সেই দিন,—১২০৩ খৃষ্টীয় শকের সেই দিন, যে দিন মুসলমান ভয়ে ভীতা বঙ্গরাজলক্ষ্মী, বঙ্গগৃহশূন্য করিয়া, নবদ্বীপঘাটে গঙ্গা সলিলে শরীর নিমজ্জন করিয়া স্বর্গলাভ করেন? ঐ সময় স্মরণ, এবং ঐ সময়টা ক্ষণেকের জন্য একবার আলোচনা করিয়া দেখুন। ঐ সময়ের পূর্ব্বে এবং ঐ সময় পর্য্যন্ত, রাজা হিন্দু, মন্ত্রী হিন্দু, ধর্ম্মাধিকার হিন্দু, সেনানায়ক হিন্দু, সকলই হিন্দু; ফল কথা হিন্দুসন্তান কি গার্হস্থ্য, কি নৈতিক, কি রাজনৈতিক জীবনে যাহা কিছু বাসনা করিতে পারেন, তাহা সকলই ছিল। এই এই বাহ্যিক দৃশ্য দেখিতে অতি সুন্দর, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু উহার অন্তর্দৃশ্যও কি তদ্রূপ ছিল? রাজাত উপলক্ষ্য মাত্র, সামাজিক অবস্থাই উদ্দেশ্য। স্বদেশস্থ সমাজের উপর মমতা বশতঃ, এবং স্বজাতি প্রকৃতি সম্যকরূপে অবগত থাকা হেতু, তা-

হার উন্নতি সাধনে বেশি সক্ষম হইবেন বলিয়াই, স্বজাতীয় রাজার এত গৌরব; নতুবা কিসের গৌরব? রক্তের টান কিছু আছে বটে, কিন্তু অন্য টানের তুলনায় তাহা অতি সামান্য। এখন দেখ দেশীয় রাজা, দেশীয় দেবতা, কিরূপ উন্নতি সাধনে সক্ষম হইতেন, এবং দেশস্থ সমাজই বা তাঁহাদের হাতে কতদুর গৌরবান্বিত হইয়াছিল। ইহার জন্য বেশি পরিচয় দিতে হইবে না। দাসানুদাস রাজ সেনাপতি বঙ্গে উপস্থিত হইলেন, অমনি সমাজচূড় ব্রাহ্মণেরা বিধি দিলেন যে শাস্ত্রানুসারে বঙ্গ যবনাধিকারে আসিবে, অতএব তজ্জন্য যত্ন বিফল এবং রাজার পলায়নই বিধি। সপ্তদশ সিপাহিসঙ্গে বখ্‌তিয়ার খিলিজী রাজপুরী প্রবেশ করিয়া দ্বারি প্রহরী হত্যা করিতে লাগিল, সকলে শান্তিরসাস্বাদনে পড়িয়া মারি খাইতে লাগিলেন। এ কথা রাজার কাণে গেল,—কিন্তু রাজা ঠাকুরদাদা রাজ্যলালসা অপেক্ষা তীর্থাশ্রমই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। যেমন সপ্তদশ সিপাহির পুরাগমন কাণে উঠিল, অমনি যিনি গর্ভবাস কালীন পর্য্যন্ত রাজা, তিনি সত্য সত্যই মুখের গ্রাস পরিত্যাগ করিয়া, খিড়কি দিয়া পলায়নপর কম্পিতকলেবরে মাঝি মাল্লার পায়ে ধরিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। রাজার বংশে এমন ঢেকি অবতার পাষণ্ড আর কেহ কখনও দেখিয়াছ? রাজা, সামন্তবর্গ, ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ দেশের ঐহিক পারত্রিক উভয় বিষয়ের রক্ষক যাঁহারা, তাঁহাদের দৌড় এতদুর? ইহাপেক্ষা সমাজ আর কতদুর হীন হইতে পারে? ইহাপেক্ষা লোকের অন্তঃসারশূন্যতার নিম্নতম পরিমাণ কোথায় সম্ভব? কোন্ দেশে কোন্ রাজ্য এতটা দুর্দ্দশাসহ অপরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন? হিন্দুরাজত্বের দুর্দ্দশার দিন কেন আসিয়াছিল, তাহার এখানে কারণ অনুসন্ধান সমালোচকের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু আসিয়াছিল; এবং তাহার পূর্ণাবস্থা এই খানে। এরূপ অবস্থায় সমাজের মধ্যে নূতন তেজ প্রবেশের আবশ্যক; সুতরাং নিয়ন্তার নিয়ম অনুসারেই মুসলমানদিগের বঙ্গে আবির্ভাব। ইহা তৎকালে প্রার্থনীয়! এতটা কূট মল ও অন্তঃবিকৃতি যথায়, সে আগে শুধু আগুণে নয়, যাঁতার অগুণে পুড়িয়া মলযুক্ত হউক, পরে মাজিয়া ঘষিয়া ফরসা করা যাইবে, শেষে রসান। তাহার পরেও আবার ওজন আছে, যাচাই আছে, আরও কত কি আছে, সুতরাং কণ্ঠে পরিবার অনেক দেরি।

দুরবস্থা যখন পূর্ণভাবে বেগবতী হইয়া বেগপ্রবাহে উদ্যত, এমন সময়ে আমরা হাত বদল হইয়া, মুসলমানদিগের হস্তে পড়িলাম। বেগ প্রবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু আর পরিসর বৃদ্ধি হইতে পারিল না। কিন্তু সে বেগে গভীরতা এবং তরঙ্গ বৃদ্ধি হইল, কূল ভাঙ্গিতে লাগিল। যেমন যত খানি একদিকে ভাঙ্গিল, তেমনি ততখানি নৈসর্গিক নিয়মবশে অপরদিকে কূল বৃদ্ধি হইতে চলিল। যাইতেছিলাম অকূলমুখে, এখন আসিতে লাগিলাম, বালিবনে হউক, কিন্তু কূলমুখে। কতদূরে আসিয়াছি তাহা কি বলিতে হইবে? বেশী বলিবার সময় নাই। বর্ষশত দুই পূর্ব্বে চিত্তবৃত্তি এবং

চিত্তবিস্তার যেরূপ ছিল, বর্ষশত দুই পরে তাহা কিরূপ, ইহা একবার তুলনা করিয়া দেখ। অথবা আরও সঙ্ক্ষেপতঃ পরিদর্শন কর। পঞ্চাশত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুসন্তান দশভূজা মূর্ত্তি দেখিলেই, তাহার প্রথম চিন্তা, এবং প্রথম প্রার্থনা,—তুমি মূর্ত্তিময়ী প্রতিষ্ঠায় প্রাণশালিনী দেবী, যদি আসিলে, তবে অমনি যাইবে কেন? কিছু চাউল কলা খাও, কিছু পাঁঠার মুণ্ডু খাও, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে,

" ভার্য্যাং মনোরথাং দেহি মনোবৃত্তানু-
সারিণীং।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষো-
জহি॥"

আধ্‌কাঠা আতব চাউলের এমন অদ্ভুত সৃষ্টিসর্ব্বস্ব প্রতিদান প্রার্থনা আর কোথায় সম্ভবিতে পারে, কেবল যেখানে চিত্ত নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং উদরেও ক্ষুধা অনেক! এক্ষণে আধুনিক পঞ্চাশত বৎসর পরের হিন্দুসন্তান কি ভাবেন তাহা দেখ,

" ঊর্দ্ধে উমাপতি বৃষভ বাহন,
নিমজ্জিত দেব তপস্যা সাগরে;
অনাদি, অনন্ত, সৃষ্টির কারণ,
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ভাবিছে অন্তরে।
মরি কি প্রতিমা! অনন্ত শকতি,
অনন্ত বীরতা, অনন্ত বিভব,
বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, প্রেম, যোগ-রতি,
একাধারে, মরি, পরিপূর্ণ সব!

ইনি এখন আর সে দুর্গা নহেন। খড় গোবর নির্ম্মিত " ভার্য্যাং মনোরথাংদেহি " মূর্ত্তী নহেন। ইনি এখন পাশ্চাত্য মসলায় সুসংস্কৃত প্রাচ্য চিত্তবিস্তৃতির বাহ্যরূপ কল্পনা স্থলীয়। এখন দেবীদর্শনে বাঙ্গার ভাবটা দেখা যাউক,—

এস হৈমবতী, এস মা ভারতে,
বঙ্গ কবি, মাতা! করে আবাহন;
এস মা, ভারতে কল্পনার রথে,
দশভূজা রূপে উজলি গগণ।
উঠ, বলহীন ভারত সন্তান!
পূর্ণ জ্ঞানালোকে কর দরশন,
হতেছে ভাবতে দেখ অধিষ্ঠান
মহাশক্তি; উঠ, কর আবাহন।"

অথবা 'আফিং খোর' কমলাকান্তের দুর্গোৎসব পাঠ কর। এখানে একবার আকাঙ্ক্ষাটা দেখিলেত? কি বিপুল বিস্তৃতিই প্রাপ্ত হইয়াছে। দেবী, আগচ্ছ; সেই রূপে বটে, কিন্তু মাটির রূপটি কল্পনায় লীন করিয়া; তুমি অনন্ত মহাশক্তি, আমিও অনন্ত হইতে আগত, আইস তবে আমার এই অনন্ত বাসনা তোমাতে মিলাইয়া তৃপ্তিলাভ করি; ইহাতে আবার দান প্রতিদান কি? —যে যাহারে ভাল বাসে, সে যাইবে তার পাশে। সেই এক দিন, আর এই এক দিন! ভারত সন্তান, কূল পাইবার পূর্ব্বে মনুষ্যত্বে উঠিবার পূর্ব্বে, এখনও তোমাকে অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হইবে, অনেক ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু ভয় পাইও না। দুঃখ আসিতেছে আসুক, তুমিও খুঁটি গাড়িয়া অচল, অটল হইয়া বৈস, সে দুঃখে তোমাকে হেলাইতে পারিবে না। পলাইও না। ভয়ানাং ভয় হইতে যাহার উৎপত্তি, ভয়ে তাহার ভয় কি? তাহার পর পলাইয়া কোথায় যাইবে? বালস্বভাবে কুক্কুরের লেজে কখনও হাঁড়ির কাঁধা বাঁধিয়া

দেখিয়াছ কি? বেচারী তাহা হইতে মুক্ত, হইবার জন্য যতই দৌড়িয়া পলাইতে থাকে উহা উন্মোচিত না হইয়া ততই তাহার বেগ বৃদ্ধি করিয়া দেয়; শেষে আরও দৌড়িলে পৃষ্ঠভাসান। তোমারও দশা তাহাই হইবে, পলাইতে চেষ্টা করিওনা। এখনও আশা আছে, আশ্বস্ত হও। হিব্রুঋষির মুখ বিনির্গত সে বাক্য স্মরণ হয় কি?—'আমি আপন প্রজাবৃন্দের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া আপন অধিকার অপবিত্র করিয়াও তোমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়াছিলাম। তুমি তাহাদের প্রতি করুণা কর নাই; প্রাচীনকেও দুর্ব্বিসহ প্রভুত্বভারে বিনত করিয়াছ। অতএব এখন তোমাকে যাহা কহিতেছি তাহা শোন,—তুমি প্রমোদরত, কর্ত্তব্যে অন্যমনস্ক হইয়া আপনচিত্তে ভাবিতেছ যে আমার আর দ্বিতীয়কে? কিন্তু মানিও আমি বিধবার ন্যায় অঙ্কশূন্য হইয়া বসিয়া থাকিব না, অথবা আমার সন্তানগণেরও ধ্বংস দৃশ্য সহ্য করিব না।' *

অনেক মূর্খ ভাবিতে পারে যে আমি যেন কেবল রাজনৈতিক জীবন লইয়াই ব্যস্ত, তাহারই কথা বলিতেছি, এবং কাব্যের যাবতীয় সম্বন্ধ তাহারই সঙ্গে সংযোজন করিতেছি। আমি রাজনৈতিক জীবনের কথা বলিতেছি না, আমি বলিতেছি মনুষ্যত্ব জীবনের কথা; সমাজগত এবং ব্যক্তিগত, উভয়তই। আমি যে জীবনের কথা বলিতেছি, উহা নৈতিক, রাজনৈতিক, গার্হস্থ্য, বা যে কোন স্বাস্থ্য জীবন, সকলেরই সমাবেশে যাহা নির্ম্মিত এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত। এরূপ জীবনের যে কোন একটি বিষয় টানিলে, একটি বিষয় বলিলে, আর সকল গুলি অবশ্যম্ভাবীরূপে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়ে। যে জীবনে সেরূপ আসিয়া পড়ে না, এবং তাহাতে যদি কোন না কোন বিশেষ বিষয়ের আধিক্য দেখা যায়, তাহা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে, রোগের লক্ষণ বলিয়া জানিও। শরীরস্থ সমস্ত যন্ত্র যখন পরস্পর সংমিলন ও সামঞ্জস্যে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তখনই স্বাস্থ্য; তদ্বিপরীতে অস্বাস্থ্য বলিয়া জানিবে। কি ব্যক্তিগত, কি সমাজ-গত, সেই স্বাস্থ্যবান জীবনই মনুষ্য মাত্রের বাঞ্ছনীয়; অন্ততঃ মনুষ্যচিত্ত, দিগ্দর্শন-সূচিকার ন্যায় সেই দিকেতেই সর্ব্বদা দৃষ্টি-মুখ রহিতে চাহে। তাহার পর ব্যক্তিগত, সমাজগত, জাতিগত জীবন পৃথক বস্তু নহে; বস্তু সর্ব্বত্রেই এক, প্রভেদ কেবল বৈয়াকরণিক একবচন বা বহুবচন প্রয়োগ মাত্র।

মুসলমান রাজত্ব আমাদিগের পক্ষে যথার্থই জাঁতার আগুণ। বলিতে পারা যায় কি যে, মুসলমান রাজত্বশেষে, আমাদিগেরও জাঁতার আগুণে দগ্ধ হওয়া শেষ হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, তবে অবশ্যই এক্ষণে উপযুক্ত মসলাযোগে মার্জ্জিত হইয়া ফরসার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে; এবং বোধ করি বা সেই জন্যই সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসরে যাহা দেখিতে না পাইয়াছিলাম, পঞ্চাশ বৎসরে সেই চাকচিক্য, যতই সামন্যভাবে হউক, দেখিতে পাইতেছি! হইতে পারে; এবং যদি সত্য সত্যই তাহা হয়, তাহা হইলে এখন হইতে

* Isac XLVII. 8—8.

কিছু রসান দ্রব্যের আয়োজন করিতে গেলে তত হাস্যাস্পদের বিষয় হয় কি? বোধ করি নাও হইতে পারে। আয়োজনও অপরাপর বিষয়ের ন্যায় কালসাপেক্ষ; একেবারে হয় না, একে একে হয়। নবীনচন্দ্রের রঙ্গমতী কি তবে, অংশত বা পরিমাণেই হউক, সেই আয়োজন-আদর্শ? বিশ্বনিয়ম-প্রসূত প্রতি সাত্বিক বস্তুই অভিপ্রায়পূর্ণ,—অভিপ্রায়শূন্য হইতে পারে না। এই সাত্বিক কাব্য রঙ্গমতীর উদ্দেশ্য কি তবে ঐ আয়োজন আদর্শ, না আর অন্য কিছু আছে? যদি থাকে থাকুক, আমার এক চক্ষে এই একদেশ মাত্র দর্শন করিলাম। এই এবং ইহার সমধর্ম্মী আর যে কিছু আয়োজন-আদর্শ তাহা সংগ্রহ করিতে, বাপুহে, এখনও অনেক উপন্যাস, অনেক নবন্যাস, জ্ঞান, অজ্ঞান, বিজ্ঞান, কত কি আসিবে যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? গমনপথে আর এক নিদর্শনী দীপ সবে সমুদিত হইল মাত্র। অগ্রগামী যাহারা, আগে আগে চলিয়া যাও; কিন্তু বাপু জানিও, যতক্ষণ সেই শেষের মানুষটি পর্য্যন্ত সেই পর্য্যন্ত আসিয়া না পৌছিবে, ততক্ষণ সেই দীপের উদ্দেশ্য সমাধা হইতেছে না। 'মাতঃ প্রকৃতি, এই সুবিপুল জগত ক্ষেত্রে তোমার জাগতিক কর্ম্ম কুটীরে সেই সুবিশাল কর্ম্মকটাহে, নাজানি কি অদ্ভুত, কি অভাবনীয় ভাবেই, এই অপার ভূতরাশির পরিপাচন, সঙ্কোচন, বা তাহার বিস্তার সাধন করিয়া থাক!' কিন্তু বাপু, সে যাহা হউক, কবি নিজে চিনির বলদ, অথবা 'inspired idiot.' ভডিংটন না টম্‌সনকে বলিয়াছিল 'তুমি তোমার আপনার লেখা আপনি বুঝিতে পার না?'

নানাবর্ণে, নানা মূর্ত্তিতে, এ অনন্ত লোক-সংসারে, ছোট বড় কতই নিদর্শনী দীপ উঠিতেছে ডুবিতেছে, প্রত্যেকেই কত রূপে কত রকমের কার্য্য সমাধা করিতেছে, কে তাহা গণনা বা আয়ত্ব করিতে সমর্থ? তাহা সমগ্র একাধারে ধারণা করিতে আমাদের সামর্থ্য নাই, আমরা সামান্য-প্রাণ মানব, একদেশ দর্শনই আমাদের সাধ্য এবং সম্পত্তি। প্রতিচিত্তে এইরূপ প্রতি একদেশ দর্শনের দ্বারাই, আমরা যাহা কিছু বসুধা পথে অগ্রসর ও তদায়ত্বে সক্ষম হইতে পারি। তাহার পর একটি নূতন চিন্তা, একটি নূতন ভাব, একটি নূতন কথা, সাত্বিক ভাবে বলিতে পারিলে, কতদূর তাহা এই অবনীমূর্ত্তি পরিবর্ত্তনে সক্ষম, তাহাই কি আমরা বলিতে সমর্থ? কে ভাবিয়াছিল যে মথি বা লুক লিখিত বিশ পৃষ্ঠা খৃষ্টচরিত, পৃথিবীর সমগ্র লাইব্রেরী একত্র হইয়া যাহা করিতে না পারে, তাহা করিতে পারিবে; —এই অষ্টাদশ শত বর্ষ ও আরও কত অষ্টাদশ শত বর্ষ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠাংশ মানবগণকে নির্ম্মাণ ও পরিচালন করিয়া আসিবে? এসকল বড় কথা। ক্ষুদ্র নামধারী কবি শ্রেণিতে নামিয়া দেখ; তোমার দান্তে। আধুনিক প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়, তজ্জনিত ঐতিহাসিক বৈচিত্রতা এবং পোপের গর্ব্ব খর্ব্বে ইতালীয় স্বাধীনতা, ইহা কি 'ডিবাইন কমিডীর' দূরস্থ ফল নহে? জ্ঞানি-প্রবর কার্লাইল কহেন, দান্তের কার্য্যকারিত্ব মহত্ত্বাদ হইতে দূরকাল-

ব্যাপী হইবার কথা! অতএব আমাদের সাধ্য কেবল এই পর্য্যন্ত যে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার সাহায্যে বর্ত্তমান বুঝি, আবার এতদুভয়ের সাহায্যে যথা সম্ভব ভবিষ্যত গণনা করি। অতএব আমাদের এই গণনা কতদুর ঠিক বা বেঠিক হয়, তাহা ভবিষ্যতই জানেন। তবে এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় বলিয়া বোধ হয় যে, যদি আমরা ভূতকালে ভাল আলোচনা করিয়া, বর্ত্তমান ঠিক বুঝিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে বোধ করি ভবিষ্যত গণনা নিতান্ত বেঠিক হইয়া দাঁড়ায় না। তাহার পর সকলের উপর, যদি এই সকল কার্য্যেই সাত্বিক বিশ্বাসের আশ্রয় লইতে পারি; নতুবা নহে। আমি বলি, চিত্ত বিস্তৃতি লাভ করুক, হৃদয় ভাবতরঙ্গে প্রশস্ত হউক, প্রকৃতি গভীরতা লাভ করুক, হিন্দুসন্তান বীরেন্দ্র হউক। সমকালিক, ভয় নাই, আপনাকে বলিতেছি না। আপনি গৃহিণীর অঞ্চলে বা টাউনহলে, তাকিয়া ঠেসে বা হুঁকাহস্তে, স্ত্রীস্বাধীনতা, ব্রাহ্মোৎসব, সমাজ সংস্করণ, বেশ সংস্করণ, ভূষণসংস্করণ, জুতা সংস্করণ বা আর যে কিছু সংস্করণ আছে, তাহা করিতে থাকুন; আপনার মঙ্গল হউক। আমি বলিতেছি উত্তর পুরুষের জন্য; যাহারা হয় নাই, হইবে, এখনও ভবিষ্যৎ গর্ভে, অথচ যাহাদের উৎপত্তি কারণ আপনাদিগেতে নিহিত রহিয়াছে, তাহাদের জন্য। বালকে সুমিষ্ট শ্লোক বুঝিতে না পারুক, শুনিবার বাধা কি? এবং কর্ণসুখ হইলে বালকোচিত অস্ফুট আদরেরই বা বাধা কি? কিন্তু তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া অন্তরে অন্তরে নিবিষ্ট করা আর এক সময়ের কার্য্য।

এই কাব্যে প্রায় সমস্তই কবির নূতন সৃষ্টি, তন্মধ্যে বিচিত্র সৃষ্টি বীরেন্দ্র বিনোদ। বীরেন্দ্র বিনোদ! কি অদ্ভুত নাম, কি অদ্ভুত চিত্র, কি অদ্ভুত চরিত্র! কিন্তু একটু আস্তে; একে নিশ্বাসে এত 'অদ্ভুতের' ছড়াছড়ি ভাল নহে; ইহাতে বক্তার বক্তব্যও অদ্ভুত হইয়া উঠে। ভাল বীরেন্দ্রবিনোদে আছে কি, নূতনত্ব কোথায়?—বীরেন্দ্র বীরপ্রকৃতি, বীরেন্দ্র মনুষ্যপ্রকৃতি, বীরেন্দ্র গভীরপ্রকৃতি। বীরপ্রকৃতি, মনুষ্যপ্রকৃতি, গভীর প্রকৃতি ত এ জগতে অনেক হইয়াছে এবং হইতেছে, তবে বীরেন্দ্রের এত আদর কেন? এবং নূতনত্বই বা তাহার কোথায়? সত্য বটে বীরপ্রকৃতি, মনুষ্যপ্রকৃতি অনেক হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু তাহা আমাদের নহে, হিন্দুপ্রকৃতি নহে; বিজাতীয় বর্ণবিশিষ্ট, বিজাতীয় গুণবিশিষ্ট, বিজাতীয় মূল হইতে উদ্ভব, এবং বিজাতীয় কর্ম্ম জন্য বিজাতীয় কর্ম্মক্ষেত্রে সৃষ্ট। বীরেন্দ্রেতে সেইটি প্রভেদ; বীরেন্দ্র বিজাতীয় নহে, বীরেন্দ্র আমাদের। আমাদের যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা নহে, তাহাতে ফল কি? অতএব যাহা হইবে, যাহা হইব, যাহা আমাদের হইবার দিন আসিতেছে। বীরেন্দ্র আমাদের এই জাতীয়, এই কর্ম্মক্ষেত্রে, এই প্রকৃতি, এই মতি, এই গতি, এই দোষ, এই গুণ, এ সকলেরই সমাবেশে নির্ম্মিত; অথচ অনাগত বীর ও মনুষ্য; এই জীবন কার্য্যেরই অনাগত-কর্ত্তব্য-সাধনদক্ষ; এবং এই জন্যই ই-

হার এত আদর, এবং এই জন্যই এত ' অ-ভূত শব্দের প্রয়োগ।

হিন্দুসন্তানের জীবন এখন যেমন ঈশ্বর-বুদ্ধির অভাবে রাজসিক, তামসিক, মুখস্ধারী; এবং যৌগিকাকর্ষণের অভাবে বিস্ফারিত ব্যাঙের ছাতার ন্যায় এ সংস্করণ ও সংস্করণ, এ কাজ সে কাজ, বা না কাজ, অথবা তাস দাবা জৃম্ভনে, অন্তশূন্য, বেগের মুখে, বায়ুর তাড়নে, ক্ষিপ্ত বিক্ষপ্ত, খণ্ড খণ্ড, প্রতিখণ্ডে, জ্যেষ্ঠত্বভাবে, ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে, অথচ কোন দিকেই কূলের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, এবং আভ্যন্তরিক উষ্ণতায় যৌগিকাকর্ষণের প্রতিপক্ষতা করিতেছে; বীরেন্দ্রের জীবনে তাহার অন্যরূপ চিত্র দৃষ্ট হয়। তথায় ঈশ্বর বুদ্ধির প্রগাঢ় সমুদ্ভবে প্রকৃতি সাত্বিক, এবং আভ্যন্তরিক উষ্ণতা হ্রাসে যৌগিকাকর্ষণের উদয়ে, ব্যাঙের ছাতার ন্যায় ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত ইতঃস্ততঃ সঞ্চালিত পূর্ব্বকথিতচিত্ত, সঙ্কোচ ও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিস্তার কমিয়া গভীরতা বাড়িয়াছে। সে কল্পিত সামাজিকতার খাতিরে মুখস ধারণ, বাচালতা, সে কথা-সর্ব্বস্ব-ভাব, সে লেক্‌চার প্রিয়তা, আর নাই। বীরেন্দ্র নির্ব্বাক, অথচ অভ্যন্তর কর্দ্দম-প্রলেপ-লিপ্ত কুম্ভকারের পোয়ান সদৃশ।—কার্য্যকারিত্বের ইহা পূর্ব্বভাব, কার্য্যোপযোগী ভাব। এ যৌগিকার্ষণ গুরুভক্তি, এ শীতলত্ব প্রাপ্তি আত্ম কনিষ্ঠতা বোধ।

বীরেন্দ্র সম্যকরূপেই বর্ত্তমান হিন্দুজীবনের প্রতিপ্রসব (evolution) সম্ভূত। ইহার প্রাচ্য জীবন-স্বর্ণ পাশ্চাত্য মসলায় সুসংস্কৃত। বীরেন্দ্র পূর্ণ হিন্দুসন্তান, পাশ্চাত্য জ্ঞান দর্শনে আরও দীপ্তিমান, ধীর, শান্ত, সুশীল, ভক্তির আধার, স্নেহের আধার, প্রেমের আধার, বিনীত, নৈতিক, অথচ পূর্ণ আত্ম একত্ববান, সত্যাবলম্বনে দীপ্তিমান এবং বিনীত হইয়াও উন্নত-শির, তেজোগর্ব্ব-পরিপূর্ণ বিশাল বীরপুরুষ এবং চিত্ত প্রশস্ততায় মহাসমুদ্রবৎ। দর্শনে চিন্তা চিন্তনীয়কে ভেদ করিয়াও বেগবান, নতুবা তাহার মনে কি এরূপ অচিন্তনীয় ভাবের সমুদ্ভব হয়?

> "এইরূপে হতভাগ্য মানবজীবনে,
> শত শত বাসনার ক্ষুদ্রস্রোত মিলি,
> যেন প্রবাহেতে শেষে হয়ে পরিণত,
> দুঃখের অরণ্যময় করি দুই তীর,
> ছুটে কাল সিন্ধু মুখে!"

একয়টি কথা কেবল নমুনা দেখাইতে উদ্ধৃত করি নাই। ইহার উপর একটু চিন্তা চালনা করিয়া দেখিবে কি? সে যাহা হউক, বীরেন্দ্র হিন্দু সন্তান, ঘরের ভাবনাতে ব্যাকুল, অথচ স্বদেশ ভাবনাতেও ক্ষিপ্ত। প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতেছেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন স্বদেশ হিতার্থে, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিলেন পিতৃ হিতার্থে। কোন পাশ্চাত্য সত্যপ্রিয় বীর এরূপ প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু বীরেন্দ্র হিন্দু সন্তান,—পার্থিব হিত হইতে, জগতীতলে সাক্ষাত দেবতারূপী পিতৃ মাতৃ হিত উচ্চতর; 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।' পাশ্চাত্য খরিদ বিক্রয় বিজ্ঞানে আর্যনীতির কোন ব্যাঘাত করিতে পারে নাই। বীরেন্দ্রের একটি খুঁত আছে, তাহাতেই বীরেন্দ্র আহুতি হইবে,

উহা বীরেন্দ্রের নিপাতার্থে পূর্ণতাপ্রাপ্ত কর্ম্ম-সূত্র স্বরূপ ; তাহা পরে বলিব।

চট্টগ্রাম প্রদেশের পূর্ব্বাংশে রাঙ্গামাটী বা রঙ্গমতী নামক যে পর্ব্বতশ্রেণি আছে, এবং যথায় কলনাদিনী কাঞ্চি প্রসূত হইয়া আসিতেছে, তথায় কানন ও পর্ব্বতশ্রেণি স্বভাবের নিরূপম শোভা বিস্তার করিতেছে; কবি তাঁহার কাব্যনায়কের জন্মস্থান এবং কার্য্যস্থান তথায় নিরূপণ করিয়াছেন। কাব্যনায়ক বীরেন্দ্র শৈশবে মাতৃহীন, কিন্তু তখন বুঝিতে পারেন নাই। অনন্ত হইতে নবাগত পথিক তখনও কালের বড় একটা ধার ধারিতে শিখেন নাই। সে যাহা হউক, এই অনন্ত হইতে স্বচ্ছন্দ আগত পথিকের জীবন প্রবাহ, সংসারদেশে সংজ্ঞার প্রথমোদয়ে, কিরূপ শুভ বা অশুভ গ্রহ দৃষ্টিতে প্রবাহিত হইতে চলিল, তাহা কবি এইরূপে দেখাইয়াছেন ;—

" অষ্টম বৎসর যবে,—এই দীপালোকে
মন্দির বাহিরে যথা নাহি যায় দেখা,
অষ্টম্ বৎসর পূর্ব্বে তেমতি আমার
নাহি চলে, ভগবতি, স্মৃতির নয়ন,
শৈশব প্রথম মম আচ্ছন্ন তমসে,—
অষ্টম বৎসর যবে, সমপাঠীগণ,
পাঠান্তে আনন্দে সবে ' মা মা মা ' বলিয়া
ডাকি উচ্চৈঃস্বরে যবে ছুটিত আলয়ে,
অর্দ্ধ পথে তাহাদের জননী যখন,
আদরে লইয়া কোলে, চুম্বিত বদন
সহস্র চুম্বনে ; মাতৃ স্নেহেতে গলিয়া
অর্দ্ধ শ্বাসে শিশুগণ পাঠ বিবরণ
বলিত যখন ;—মরি কি পবিত্র চিত্র !—
ভাবিতাম আমি,—হায় ! এজীবনে মম
প্রথম ভাবনা ; হৃদয় আকাশে,
স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল, এই প্রথম জলদ
হইল সঞ্চার।"

বীরেন্দ্র কাল-বিক্রমের এই প্রথম সজ্ঞান দর্শন, প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। বীরেন্দ্র তখন বালক, অষ্টম বৎসরের। অন্য বালক হইলে হাতে একটা মুড়ির মোয়া দিলেই ভুলিয়া যাইত। কিন্তু বীরেন্দ্র আর এক বালক। বালক যে প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়াছে তাহা বীরা, সুতরাং বালক বালক হইলেও, প্রকৃতি আপন কার্য্য করিতে ভুলিবে কেন। বীর, বিনা সংগ্রামে কাহারও দাসত্ব স্বীকার করে না; সুতরাং সেই কাল-বিক্রমের সহ সংগ্রামার্থে, গভীরা প্রকৃতির চিন্তা-অস্ত্র-ভাণ্ডারের এই প্রথম দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ঘাত প্রতিঘাতে দুরন্ত সংগ্রাম চলিল। কিন্তু বালকের প্রাণ দুর্জ্জয় কালের সঙ্গে কতক্ষণ বুঝিতে সমর্থ হয়। বালক আঘাত-বিধ্বস্ত, শ্রমবিধ্বস্ত, যায় যায়, কালহস্তে বিলীন হইবার উপক্রম ;—তাহা কবির নিজ বাক্য দ্বারাতেই প্রকাশ হউক,

" এইরূপে ক্রমে ওই নিরদের মত,
জীবন আকাশে হয় দুর্ভাগ্য সঞ্চার !
দুর্ভাগ্যে দুর্ভাগ্যে আসি হয় সংমিলিত
এইরূপে ! এইরূপে করি আচ্ছাদিত
প্রলয় ভাস্করে, জীব-বাসনার স্রোত
করে তমোময়। করে দুঃখের কানন
দ্বিগুণ ভীষণাবহ আচ্ছাদি তিমিরে।
রুদ্ধ হলো চিন্তা স্রোত !"

রুদ্ধ হইবার কথা। কিন্তু এবিশ্বের একজন নিয়ন্তা, একজন বিধাতা আছেন। যে যন্তবিষ্য ভাবে স্রোতে গা না ঢালিয়া কাল-

সহ সংগ্রাম-প্রবৃত্ত হয়, যে বিধাতৃ দত্ত আত্ম প্রকৃতির মহত্ব প্রকটনে যত্নশীল, বিধাতা আপনি তাহার সহায়তা করিয়া থাকেন। বালক যখন এইরূপ কাল-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া ভাসিয়া যাইবার উপক্রম, তখন সহসা সম্মুখে একটি অবলম্বন বস্তুর উদয় হইল, বালকেরও চক্ষু ছিল, উদয় মাত্র চিনিয়া লইল,—বালক যুবা হইল। ঐ অবলম্বন বস্তু কি ?—

" মণিকর্ণিকার ঘাটে,
বসি জাহ্নবীর তীরে, পূত জাহ্নবীর
জলে, হায়! অশ্রুজলে, পূত ততোধিক
মাতৃস্নেহে বিগলিত, করিব তর্পণ।
মায়ের অস্তিমস্থান দেখি, একবার,
দুইবিন্দু অশ্রু তাহে করিব বর্ষণ।"

এ পৃথিবীতে অসৎ ভেদ করিয়াই সতের প্রকাশ। যে যে জাতীয় অসৎ, তাহা ভেদে সেই জাতীয় সতই প্রকটিত হয়, ইহাই নিয়ম। যে মাতৃহীনত্ব জাতীয় অসৎ বিক্রমে মুহ্যমান হইতেছিলাম, তাহাই শেষে সংগ্রাম-পরাভবে কারণ রূপে পরিণত হইয়া, উপরি-উক্ত অবলম্বন সতের উৎপত্তি সাধন করিল। নৈসর্গিক নিয়মও ফলিল, বালকও অবলম্বন প্রাপ্ত হইল। এই অবলম্বন যোগে কবি কিরূপ অবলম্বন যুক্ত হইলেন, তাহাও কবি বীরেন্দ্রের মুখে প্রকাশ করিয়াছেন। এ কবির ঐ বড় দোষ! সমালোচকে যে দুকথা কহিয়া পাণ্ডিত্য ফলাইবে সে পথ বড় রাখেন না। একবার উদ্ধৃত করিতে আরম্ভ করিলে, উদ্ধৃতের পর উদ্ধৃত ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। আগে এমন জানিলে আমি কখনই একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না, কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহার হাত নাই। অতএব এখন কবি কি বলেন বা বলান, শুন্থন।

" হায়! ভগবতি, এই বাসনা আমার
হইল জীবনময়! বহিতে লাগিল,
একাঙ্গ হইয়া মম জীবনের সনে,
ক্রমে বিস্তারিয়া কায়। এই গিরিশৃঙ্গে,
হায়! আসিতাম যত, পুনঃ পুনঃ—মন্ত্রে
আকর্ষিত যেন! তত এই বাসনায়
হ'ত যেন বরিষার সলিল সঞ্চার।
বৎসরে বৎসরে, দেবি, এই স্রোতস্বতী
হইল অপ্রতিহত, হায়রে অচিরে
করিল হৃদয় মম অনন্যবাসনা।"

কাব্য-নায়ক এখন কাল তরঙ্গের অকূলমুখ পরিহার করিয়া, কর্ম্মদেশাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। কর্ত্তব্য পালনার্থে সৃষ্ট যে জীবন, তাহার কর্ত্তব্যের দেখা পাইলেন, জীবনের উদ্দেশ্য দেখিলেন, বুঝিলেন বা অনুভব হইল, এ জীবন সৃষ্টিও অভিপ্রায় শূন্য নহে। সত্য সত্যই তবে এ জীবন ভূতের নিশ্বাস, পাকযন্ত্র, স্বপ্ন দৃশ্য, বা তাসদাবার উদ্দেশ্যভূত নহে। যে জীবনের উদ্দেশ্য আছে, কর্ম্মভূমে যে জীবন কর্ত্তব্য পাইয়াছে, কর্ত্তব্য পালিতেছে, তাহার জীবন সার্থক। তাহার জীবনের বন্ধন আছে, মমতায় সুখ আছে; কাল সমুদ্রের বুকে লাথি মারিয়া স্বেচ্ছা পথে সে যাইতে সক্ষম। আর যে জীবনের উদ্দেশ্য এখনও গুপ্ত, কর্ত্তব্য আসিয়া মিলে নাই, সে জীবন সাহস শূন্য; সহায় শূন্য, অবলম্বন শূন্য, উদ্দেশ্য শূন্য, ভূতের বাসা, ভূতের নিশ্বাস। যে দিকে যাও, সেই দিকেই বিকট কাল

মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, কখন গ্রাস করিবে, যেদিকে তাকাও সেই দিকেই ঘোরতিমিরে সকল বস্তুই নয়নপথ হইতে লুকায়িত; শূন্যোপরি স্থিতি, শূন্যোপরি গতি, জল বুদ্বুদ জলে মিশাইয়া যাইতেছে;—ঈশ্বরের বিড়ম্বনা! মনুষ্যমনে কর্ত্তব্যবোধের উদয়, ঈশ্বরের সত্বা প্রকটন মাত্র। এখন দেখ বীরেন্দ্র কর্ত্তব্য পাইয়া কেমন তাহা পালন করিয়াছে। যে প্রকৃতি অষ্টম বৎসরে কালসহ সম্মুখীন হইয়াছে, সেই প্রকৃতি কর্ত্তব্য পাইয়া কিরূপ পালন করে তাহা দেখা ও কর্ত্তব্য বটে।

বীরেন্দ্র রাজপুত্র, রাজ্যের নির্ব্বিবাদ উত্তরাধিকারী; এবং তাহার জন্মভূমির প্রতি মমতা?—

" আছে কি মানব হেন
এই ভূমণ্ডলে, দেবি, হায় রে যাহার,
তেয়াগিতে জন্মভূমি, না কাঁদে পরাণ?
বনের বিহঙ্গ কিম্বা পশু বনচর,
না চাহে ত্যজিতে যদি দুস্তর কান্তার,
বিশাল কণ্টকাকীর্ণ; তবে কেন, হায়!
তেয়াগিতে জন্মভূমি, তেয়াগিতে হায়!—
শৈশবে মায়ের কোল, প্রীতি পারাবার;
কৈশোরের ক্রীড়াসন; বিদ্যার মন্দির;
সুখের যৌবনে চারু প্রণয় উদ্যান
পরিমলময়, পূর্ণ পারিজাত শোভা;
প্রৌঢ়ের দাম্পত্যপ্রেম; হায় স্থবিরের
জীবন-ঝটিকা-শেষে শান্তির আশ্রম,—
তেয়াগিতে, ভগবতি, হেন জন্মভূমি,
কেন না কাঁদিবে বল মানবের মন?"

তাহার পর প্রণয়িনী কুসুমিকা?
"ভগবতি, রঙ্গমতী নিবিড় কাননে
অঙ্কুরিত ছিল এক তরু সুকোমল।
কোথা হতে, মরি! এক কণকবল্লরী
আসিয়া মিলিল সেই তরু সুকুমারে
আচম্বিতে। দেবি! দিন দিন তরুলতা
বাড়িতে লাগিল; দিন দিন লতা তরু
অনন্ত বেষ্টনে, হায়! বেষ্টিত হইল।
যতই নিদাঘ শিখা হইত প্রখর,
উজ্জ্বল; যতই শীত হইত শীতল;
আলিঙ্গিত পরস্পরে তত গাঢ়তর।
বসন্ত কোকিল কণ্ঠে, মলয় অনিলে
আলাপিত পরস্পরে; দেখিত যুগলে,
হায়রে, যুগল শোভা; ভাসিত আবার
অনিবার বরিষার আনন্দ সলিলে।
কি হেমন্ত, কি বসন্ত, শরত, শিশির,
গ্রীষ্ম, বর্ষা, কিম্বা দিবা, নিশি কালাকাল,
সুখ, দুঃখ, না পারিত হায় ঘুচাইতে
সেই প্রেম-আলিঙ্গন—স্বভাব বেষ্টন—
অবিচ্ছিন্ন, অপার্থিব!"

বীরেন্দ্রের প্রতি কুসুমিকা কিরূপ? বীরেন্দ্রবিরহতপ্তা কুসুমিকার বাক্যে তাহা ব্যক্ত হউক,

" দেবি, ভাবি দিবা নিশি,
বিশুষ্ক হইয়া কেন নিরাশ জীবন
মৃত্যুর শীতল অঙ্কে, হায় এত দিনে
না হয় পতন? কত কত বনফুল
ফুটিল, ঝরিল, দেবি, এই কত দিনে;
কিন্তু আমি অভাগিনী, না ফুটি, না ঝরি,
অনন্ত জীবন জ্বালা সহি কি কারণে?"

বীরেন্দ্রের কর্ত্তব্য-বিপক্ষ-বন্ধন এতগুলি, রাজপুত্রত্ব, রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব, বীরেন্দ্রের চিত্তচিত্রিত জন্মভূমি, প্রণয়িনী এবং প্রেমমুগ্ধা কুসুমিকা। কিন্তু কেহই বীরে-

দ্রকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। বীরেন্দ্র বেগে এ সকল বন্ধনই ছিন্ন করিয়া, বিদেশ, অজ্ঞাত দেশমুখে বাহির হইলেন। কি জন্য?

"ছাড়িলাম—নহে
ধন, রণ, রত্ন, যশ, গৌরব আশায়,
নহে হেন সুখপথে—ছাড়িলাম, হায়
মায়ের চিতায় অশ্রু করিতে বর্ষণ!"

তথাস্তু, বীরেন্দ্রবিনোদ, এ ব্রাহ্মণ আবার বলিতেছে, তথাস্তু। যাহারা সাত্বিক প্রকৃতি, তাহারা সুখ্যাতি অখ্যাতি, সুখ দুঃখে ভুলে না, পরের কথায় মরে বা পরের কথায় বাঁচে না। এই সকলের বহুতরঙ্গ মধ্যে কর্ত্তব্য-অবলম্বনে হিমাদ্রিবৎ অচল দণ্ডায়মান হইয়া তরঙ্গাঘাতকে বিমুখ করিয়া থাকে। যাহা আমার কর্ত্তব্য, তাহা ঈশ্বর-নির্দ্দেশ। যাহা সুখ্যাতি অখ্যাতি এবং তজ্জনিত সুখ দুঃখ, নিন্দা মান, তাহা লোকনির্দ্দেশ। এবং যাহা আমার সুখ দুঃখ, তাহা আমার নির্দ্দেশ। এখন লোকনির্দ্দেশ, আমার নির্দ্দেশ, এই সকল রক্ষা করিতে গিয়া কি ঈশ্বর-নির্দ্দেশ হেলা করিব? লোক এবং আমি বড়, না ঈশ্বর বড়? সাত্বিক প্রকৃতি ইহাই ভাবিয়া থাকে, বীরেন্দ্রও ইহাই ভাবিয়াছিল; এবং ইহা ভাবিয়াছিল বলিয়াই, সকল বন্ধন ছেদ করিয়া কর্ত্তব্য পথ অনুসরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সে কর্ত্তব্য কি?

"মায়ের চিতায় অশ্রু করিতে বর্ষণ!"

বিধাতঃ তুমি কি নির্দ্দয় হইয়াছ? এমন অনন্ত দয়ার ভাণ্ডার নির্দ্দয় হইলে কিরূপে? এমন দিন কি আর আসিবে না, যে দিন ভারত সন্তানও এই কর্ত্তব্যবোধের অনুরোধে, রাজপুত্রত্ব, রাজ্য, জন্মভূমি, প্রণয়িনী, প্রেম-মুগ্ধা পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিবে, কি জন্য?

"মায়ের চিতায় অশ্রু করিতে বর্ষণ"

এমন দিন কি আর আসিবে না?—আসিবে বৈ কি; ভারত সন্তান, বিনত হও; গুরু-উপাসনা করিতে শিক্ষা কর, সে দিন আসিবে বৈ কি! আমার এই দিব্য দৃষ্টি যদি ভ্রান্ত না হয়, তাহা হইলে আমি স্বচ্ছন্দদর্শনে দেখিতেছি যে সময় আসিলে, প্রকৃত সাত্বিক হইলে, ভারত সন্তানকে ভ্রাতৃত্বে বন্ধনে এবং তাহাদিগকে মনুষ্যত্ব পথে চালনে, এই মাতৃচিতাই মূল মন্ত্র স্বরূপ হইবে।

আমরা সর্ব্বদাই শৈশব এবং যৌবনের সন্ধিকালের কথা শুনিতে পাই, কিন্তু কি, তাহা কি কখনও বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকি? হাজারে একজন করে কিনা সন্দেহ। ইহাকে শৈশব যৌবনের সন্ধি না বলিয়া, বালকত্ব ও মনুষ্যত্ব এতদুভয়ের সন্ধিকাল বলিলে ভাল হয়। ইহা দশ বৎসর বয়ক্রম ঘুচিয়া কুড়ি বৎসর হইলেই সুসিদ্ধ হয় না। অনেকে ৫০ বৎসরেও বালক থাকিয়া যায়, কেহবা আবার ১৫ বৎসরেও মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। এই মনুষ্যত্ব প্রাপ্তিই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা পথে গতির আরম্ভ। জীবনবানেরা যে যেরূপেই গ্রহণ করুক, প্রতি জীবনেই এমন একটি সময় আসিয়া উপস্থিত হয় যে সেই সময়ে, সেই বাল্যভাব যাহা আশৈশব এপর্য্যন্ত নাচাইতে নাচাইতে তরঙ্গমুখে শোলা কাঠের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া আ-

গিয়াছে, এখানে তাহার শান্তি; এবং সম্মুখে কর্ম্মক্ষেত্ররূপী অপার মহা সমুদ্রের বিস্তার, এবং মস্তক-ন্যস্ত কর্ম্মভাবের সমুপস্থিতি হয়। যে এই ন্যস্তভার কর্ম্মকে আয়ত্ব করিয়া স্বয়ং তাহার উপর সওয়ার হইতে পারে, সে স্বচ্ছন্দচিত্তে নির্ব্বিবাদে হাঁসিতে হাঁসিতে সেই মহাসমুদ্র অবতরণ করিয়া পিতৃদেশে উপস্থিত হইতে সমর্থ হয়;—সেই ব্যক্তিই সার্থকজন্মা, সেই ধন্য। যে সেই কর্ম্মভার তদ্রূপ আয়ত্ব করিতে না পারিয়া তাহার ভরে বিলীন হয়, তাহাকেও ধন্য বলিতে পারি, যে হেতু সে ব্যক্তি নিতান্ত নিরর্থে জীবন নষ্ট করে নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি পঞ্চাশ বৎসরেও কর্ম্মক্ষেত্র এবং কর্ম্মের দর্শন পায় নাই; সে হেয়, মনুষ্য সমাজে সে অমনুষ্য, তাহার জীবন নিরর্থক এবং ভূতের নিশ্বাস মাত্র। ঐ শুন, গুরুশ্রেষ্ঠ কারলাইল কি বলেন 'যাহার হৃদয়ে সেই ঐশ্বরিক লিপি স্বচ্ছন্দ সৌরকর রূপে সর্ব্বান্ধকার-হন্তা ভাবে আজি পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত হয় নাই; যে এখনও অস্থির ক্ষীণালোকের মধ্যে সন্দেহ দোদুল্যমান হইয়া ইতস্ততঃ করিয়া ফিরিতেছে; অথবা একান্ত পার্থিব ব্যাপাররূপী বাষ্পভার-বিনত ও তমসাচ্ছন্ন হইয়া, যন্ত্রবিষ্য ভাবে দুঃখাভিঘাতে লীন হইয়া যাইতেছে; তাহার তুল্য দুর্ভাগ্যবান আর কে হইতে পারে; মনুষ্য সমূহে সে অসম্পূর্ণ বা অর্দ্ধ মনুষ্য পদে বাচ্য।' মনুষ্যের এই বাল্যভাব বিদূরিত হইলে, ভাবান্তর উপস্থিতিতে মনুষ্যজীবন স্বীয় প্রবাহ প্রবাহিতার্থে যেমন পথ অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহাই আজীবনের জীবন-ক্রিয়ার ভিত্তি হইয়া, অনুরূপ কর্ম্ম করাইয়া, মনুষ্যকে কর্ম্মসীমাভিমুখে লইয়া যাইতে থাকে। বালকত্ব ও মনুষত্বের এই সন্ধিকাল, ইহা সুমহান্ জীবনবিপ্লব বিশেষ। আত্মিক জীবনের পুরাতন কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নূতন কলেবর ধারণ। পুরাতন স্বর্গ পৃথিবীর ধ্বংসে নূতন স্বর্গ পৃথিবীর সঞ্চার। মনুষ্যের ইহা পূর্ণজন্ম বিশেষ, অণ্ড বিদারণে আলোকদর্শী শরীরের প্রকাশ। মনুষ্য জাতিও দ্বিজ।

কিন্তু জীবনের এই বিপ্লবকাল বড় ভয়ঙ্কর। বালকত্ব তিরোহিত হইয়াছে, অথচ তাহার পরিবর্ত্তে যাহা আসিবে তাহা এখনও আইসে নাই। এপর্য্যন্ত যাহা যাহা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার উপর বিতৃষ্ণা জন্মিল, তাহারা হাত হইতে আসিয়া পালাইল; অথচ তাহার পরিবর্ত্তে কাহাকে অবলম্বন করিব, কিসের উপর তৃষ্ণাবান হইব, তাহা পাইতেছি না। চিত্ত ছিন্ন ভিন্ন, ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত, কতবিষয় বিলীন হইয়া যাইতেছে, কতবিষয়ের সমুদ্ভব হইতেছে; সমস্তই প্রলয় বিপ্লবের ঘোর ঘূর্ণায় ঘূর্ণায়মান, ইহা কি যাহা হইবে তাহার পাচন ক্রিয়া? পাচন ক্রিয়া সর্ব্বদাই কষ্টকর। চিত্ত এখন পর্ব্বত মধ্যে আবদ্ধা বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায়, আপন আবদ্ধ বেগ সম্ভূত উত্তাল তরঙ্গে অস্ফুট কুল কুল ধ্বনিতে ঘুরিয়া ফিরিতেছে, বাহির হইবার পথ পাইতেছে না; বেগে যেন পর্ব্বত গহ্বর করিয়া যাইবার ন্যায় হইতেছে, একটি ছিদ্র পাইলেই ফুটিয়া বাহির হয়। বাহির উহা একস্থান দিয়া হইবেই হইবে, কিন্তু কিরূপ

পথে বাহির হয় তাহার প্রতি যেন দৃষ্টি রাখিও, কারণ এই সময়ে যেমন পথে বাহির হইবে, আদ্যন্তের শুভাশুভ তাহারই উপর নির্ভর করিয়া থাকে! এই সময়টি ভোগী এবং তদাকৃষ্ট দর্শক, উভয়েরই পক্ষে অসাধারণ অদ্বিতীয় পরীক্ষাস্থল।

কবিরও বিষম পরীক্ষাস্থল। বীরেন্দ্রের বাল্যাবস্থার পূর্ণাহুতি হইল। বীরেন্দ্র কাশী আসিলেন, মাতৃশ্মশানে অশ্রুবর্ষণ করিলেন; সেই বাল্য ইচ্ছা, যাহা গভীরা প্রকৃতিবশে বালস্বভাব ঘনীভূত হইবায়, তদ্বারা প্রৌঢ়বৎ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কর্ত্তব্যরূপে পরিণত হইয়াছিল; এখানে তাহার সমাধা হইল। যাহার মহত্ত্ব বাড়াইবার নিমিত্ত, সমস্ত বালস্বভাব আত্মলোপ করিয়া তাহাতে আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার এই সুসম্পাদনে তাহারাও সম্পাদিত এবং পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু এখন? দেখ কবির এই পরীক্ষাস্থলে কবি এখন কি করেন, এবং সেই জীবন-বিপ্লব কবির নয়ন পথেই বা কতদূর পতিত হইয়াছিল, তাহা দেখ।

"ভগবতি, একদিন শ্মশানে বসিয়া,
এই চিন্তানল চিত্তে করিল প্রবেশ।
তীর্থে তীর্থে পর্য্যটনে সেই চিন্তানল
বাড়িতে লাগিল; শেষে হইল হৃদয়
মম প্রকাণ্ড শ্মশান? সেই দিন হতে
জীবন আমার, হায়! হইতেছে জ্ঞান
সুদীর্ঘ স্বপন মত। হায়! সে স্বপনে
দিল্লীশ্বর দুর্নিবার সৈন্যের সাগরে
হইলাম ক্ষুদ্র ঊর্দ্মি দাক্ষিণাত্য রণে।
কেন?—নাহি জানি।"

আমার ভয় হইয়াছিল, নাজানি সে পর্ব্বতআবদ্ধ বেগ কবি কিরূপ পথে বাহির করেন। কিন্তু এ কবি দেখিলাম দূরদর্শী। বীরেন্দ্রের আশৈশব প্রকৃতি যে পর্য্যালোচনা করিয়া আসিয়াছে, যে প্রকৃতিতে

"অন্তর জগত—
বাসনার রঙ্গভূমী! প্রকৃতি গাম্ভীর্য্যে
করিয়াছে হৃদয়েতে গাম্ভীর্য্য সঞ্চার।"

এবং যে শৈশবে ভৃত্য শঙ্করকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিয়াছিল,

"ওই দেখ মৃগশিশু মায়ের আদরে,
লভিছে কি সুখ আহা! জননী আমার,
কবে আসিবেন ফিরে, বলনা শঙ্কর?"

সে প্রকৃতি এইরূপ বা তথাবিধ পথে বাহির হইবে না ত কি করিবে? বেগবতী পর্ব্বত কুহর ভেদ করিয়া বাহির হইল বটে, কিন্তু এখন যাইবে কোন্ পথে? ভূমি কর্ষণ সার আদি যোগে প্রস্তুত হইল, ভাল ফসল বুনিতে পার ভাল, নতুবা কণ্টকবৃক্ষে পা বাড়াইবার যো থাকিবে না। এই সন্ধিস্থল হইতেই, মানব সৎ বা অসৎ, ডাকাইত বা পণ্ডিত, পশু বা মানব, যেরূপ পথ পায়, এতদুভয়ের অন্যতর আকার ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু বীরেন্দ্র বাচাল নহে, বাচালতা তথায় ঘনীভূত হইয়া গভীরতার আকার ধারণ করিয়াছে। বীরেন্দ্রের গভীর হৃদয়ে গভীর শক্তির সমাবেশ; এত গভীর ভক্তির ভক্তি, গুরুব্যতীত শান্ত থাকিতে পারে না; এ প্রকৃতিতে চিত্ত জ্ঞাতে হউক, অজ্ঞাতে হউক, গুরু অনুসন্ধান করিয়া থাকে। ফলতঃ এ পৃথিবীতে প্রকৃত মনুষ্যমাত্রেরই গুরু উপদেশ নিতান্ত অপরিহার্য্য ব্যাপার। গুরুর গুরু শিষ্য সমু-

দয়, লোক সকল; শিষ্যের গুরু, গুরু। বীরেন্দ্রের প্রকৃতি শিষ্যসাম্প্রদায়িক; গুরু সাম্প্রদায়িক নহে। গুরু শিষ্য উভয়েরই মধ্যে নির্ব্বাক তেজ যদিও সাধারণ সম্পত্তি বটে, কিন্তু প্রভেদ এই গুরুতে নির্ব্বাক উদ্ধত তেজ, শিষ্যে নির্ব্বাক বিনীত তেজ। গুরুদর্শনপ্রাপ্তির প্রথম দিবস, বীরেন্দ্র কিরূপ শুভদিন বলিয়া গণিয়াছেন, তাহা দেখ,

"আর একদিন, দেবি, জীবনে আমার
অতিক্রমি অমাবশ্যা, মহাকাল ছায়া,
ক্রমে ক্রমে অষ্টমীর চন্দ্রের মতন
হইয়াছে বলাধান;"

অবশ্যই, যথার্থ মানবের নিকট গুরুদর্শন এমনই শুভদিন বটে। বীরেন্দ্র এই দিনে শিবজীর দর্শন পায়েন, এবং পাইয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন। শিবজী কাণে মন্ত্র দিলেন,

"ভারতের স্বাধীনতা—মহারাষ্ট্রজয়!"

বীরেন্দ্রের মনে একবার সন্দেহ হইল, এবং সে সন্দেহ স্বাভাবিক, 'শিবজী না দস্যু?' শিবজী বুঝাইলেন,—

"বীরেন্দ্র, জান কি তুমি সোণার ভারতবর্ষ আছিল কাহার? সেই রাজ্য হায়!
কোন ধর্ম্মনীতি বলে পেয়েছে যবন?
ঘোরি, গিজনী, ছিল কিহে ধর্ম্মের যাজক?
দস্যুত্ব? দস্যুত্ব বলে ভারতে যবন
করিয়াছে আধিপত্য। দস্যুতে সে রাজ্য
আজি করিছে শাসন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে।
কি পাপ, দস্যুত্বে তবে করিতে হরণ?
বীরেন্দ্র, দাসত্ব হতে দস্যুত্ব উত্তম!"

ঠিক! বিজাতীয় রাজভক্তি এলাইয়া পড়িল, বীরেন্দ্র সর্ব্বান্তঃকরণে শিবজীর শিষ্য হইলেন। কিন্তু বাপু, এ বড় সাধারণ মন্ত্র নহে, ইহার দুই মাত্র গতি, কিন্তু দুইই দুরন্ত, তাহা এই,—

"চল যাই সবে
ওই নীলাচলশিলা বাঁধিয়া গলায়,
ঝাঁপ দিয়া সিন্ধুজলে, হায়রে! ডুবাই
এই আর্য্যনাম, এই তীব্র পরিতাপে!
অন্যথা কৃপাণ করে চল যাই রণে,
স্বজাতির, স্বদেশের, স্বধর্ম্মের তরে,
নিবাই কৃপাণতৃষা, যবন শোণিতে।"

এখানে "ষাইট" ষষ্টির দাসের সঙ্গে বড় সম্বন্ধ নাই। উভয় গতিই সমান দুরন্ত হওয়ায়, পরস্পর পরস্পরের পরিমাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইল। বীরেন্দ্র গুরুসদনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর্য্যঅরির বিপক্ষে ভিন্ন অসি চালনা করিবেন না। অতঃপর

"ভারতের স্বাধীনতা,—মহারাষ্ট্র জয়!"

এই মন্ত্র সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে অসি দিল্লীশ্বরের আজ্ঞায় হয় ত শত শত আর্য্যশোণিত পান করিত; গুরু-উপাসনা ফলে তাহা এক্ষণে আর্য্য-অরি-শোণিতপানে রত হইল।

বীরেন্দ্রের জীবন এই পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যালোচনা করায়, বোধ করি প্রবন্ধ দীর্ঘ এবং কিছু কিছু বিরক্তিকরও হইয়া থাকিবে। হয় হউক, তজ্জন্য ভ্রূক্ষেপ করি না, ঐ পর্য্যন্ত ঐরূপ দীর্ঘ পর্য্যালোচনা করা আমার অভিপ্রায় ছিল, সেই জন্য করিয়াছি। বীরেন্দ্রকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ পর্য্যন্ত দেখা আমার অভিপ্রায়, এবং মনুষ্যজীবনে বোধ করি উহা অপেক্ষা মহৎ দৃশ্য আর কিছুই নাই।

অতঃপর বীরেন্দ্র গুরুমন্ত্র সাধিয়া, গুরুমন্ত্র লইয়া দেশে আসিল। আসিতে পথে নৌকা ডুবিল; আজীবনের একমাত্র সঙ্গী ভৃত্য বৃদ্ধ শঙ্কর জলে ভাসিয়া গেল; কুসুমিকার দেখা পাইলেন বটে, কিন্তু কুসুমিকাকে পাইবার আশা নাই, কারণ কুলোকে রটনা করিয়াছে যে, তিনি জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন; পিতৃরাজ্য এখনও উদ্ধার হয় নাই, সুখের দৃশ্য কিছুই নাই,—কি দুরন্ত পরীক্ষা, জবের পরীক্ষার ন্যায় কঠোর! তথাপি কি তেজ বিনীত হইয়া বীরেন্দ্র নাড়ীশূন্য হইয়াছিলেন? দেখা যাউক। নবাবের পক্ষ হইতে বীরেন্দ্র যখন নবাবশত্রুনাশের নিমিত্ত ৫০০ শত ফৌজ এবং ১০ কামান চাহিলেন, নবাব জিজ্ঞাসিলেন তোমাকে বিশ্বাস কি? বীরেন্দ্র কহিল,

বিশ্বাস—যুবক কহিল হাসিয়া
বীরের বচন, নৃপতিবর;
নিজে বীর তুমি, তোমাকে কি তাহা
এ বৃদ্ধ বয়সে শিখিতে হবে?
বঙ্গেশ্বর তুমি না পার চিনিতে
বীর, প্রবঞ্চক? হাসিবে সবে!
বিশ্বাস—একক, অসহায়, আমি
ঝাঁপ দিনু দশ কামান মুখে,
বিশ্বাস, নির্ভয়ে লইনু পাতিয়া
পঞ্চশত খড়্গ একই বুকে।
হয় হত পঞ্চশত অশ্বারোহি,
যায় শত্রুহস্তে কামান দশ,
বঙ্গসৈন্য-সিন্ধু হবে বিন্দুহীন,
ঘোষিবে ভারতে তোমার যশ।

এরূপ উত্তর না হইলে যে গুরুমন্ত্র বিফল হয়। যে প্রকৃতি সাত্ত্বিক এবং গভীর, সে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কখনই আত্মস্বভাব বিস্মৃত হয় না।

যে অদৃষ্টচক্র এতদিন অপার দেশ ব্যাপ্ত হইয়া বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছিল; কালসহ ক্রমে তাহা ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল; আয়োজন পূর্ণ হইয়া আসিল। এতদিন যে সকল আয়োজনের সঙ্গে বীরেন্দ্রের জীবনের কোন সম্বন্ধই দেখিতে পাওয়া যাইত না, তাহারা এখন পুষ্টি প্রাপ্তে দর্শন পথে আগত হইয়া আপন সম্বন্ধ বজ্রনিনাদে ঘোষণ করিতে অগ্রসর হইল। বলা বাহুল্য যে আয়োজন মাত্রেরই আদি মূল অনন্ত-নিহিত, তথা হইতে অদৃষ্ট মুখে, কার্য্যকারণ যোগে, ধীরে ধীরে, অদৃশ্য ভাবে, তিল তিল করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া, কাল বুঝিয়া, রাক্ষস বা দেবমূর্ত্তিতে নয়ন পথে সমুপস্থিত হয়। বীরেন্দ্রের দুর্দ্দমনীয় চিত্তবেগ, কুসুমিকা লাভার্থে চিত্তের ক্ষিপ্রতীব্রতা, মর্কট রায়ের চাতুরী, পিতৃহিতের পূর্ণভাব, তসস্বিনীর অপরিণামদর্শিতা, রাজ্যচ্যুতির মোহ পরিণাম, মগপর্টুগিজসহ মুসলমানের বিবাদ বিসম্বাদ, বীরেন্দ্রের গুণগৌরব, গুরু আজ্ঞায় অবহেলা; এই সকল আয়োজন পরস্পর পরস্পরের বিপরীত দিক হইতে বেগবান হইয়া বীরেন্দ্রের জীবনক্ষেত্রস্থ কেন্দ্রস্থলে ছুটিয়া আসিতেছে। দুই বিপরীত বেগসংঘাতেই রক্ষা নাই, তাহাতে এতগুলি বিপরীত বেগ আসিয়া একত্র হইতেছে। এই পরস্পর সঙ্ঘাতে যে দুরন্ত ঘূর্ণাতরঙ্গ উঠিবে, তাহাতে বীরেন্দ্রের রক্ষা নাই। ইহাতেও বীরেন্দ্র রক্ষা পাইয়া স্বচ্ছন্দে কূলে উঠিতে পারিত,

যদি ইহার মধ্যে একটি ভাসক পাইত। সে ভাসক, বিজ্ঞতা—দূরদর্শিতা। বীরেন্দ্রের চিত্তবেগ সে বিষয়ে তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাই বীরেন্দ্রের নিপাত-পথ-নেতা কর্ম্মসূত্রের প্রধান সূত্র। বহুদিনের বাঁধা ঘোড়া একবার মাত্র স্বাধীনতা পাইলে, যেমন তাহার দৌড় দিগ্বিদিগ্-শূন্য ও তাহার নিবৃত্তি নাই; এ চিত্তবেগও তদ্রূপ। সার্দ্ধসপ্তশত বর্ষ নিষ্পীড়িত চিত্ত সহসা মুক্তপদ পাইয়া এরূপ দৌড়াইবে না ত করিবে কি? কিন্তু ইহারও এক দিন নিবৃত্তি আছে, ইহারও একদিন সাম্য আছে; কিন্তু বীরেন্দ্রের ভাগ্যে সে পর্য্যন্ত ঘটে নাই। বীরেন্দ্র বেগ-পতিত হইয়া নিপাত হইবে।

বীরেন্দ্র দেশে আসিয়া মর্কটরায়ের চাতুরীতে পড়িয়া পিতৃহিতজ্ঞানে মুসলমানের পক্ষ হইয়া অস্ত্রধারণ করিলেন। মিথ্যাতে সত্যের ভাণ হইয়া মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তিই মনুষ্যের নিপাতলক্ষণ। নতুবা সত্যদৃষ্টিরূপি সত্যকারণ অবলম্বন করিয়া থাকিলে সত্য কারণে নিপাতরূপি মিথ্যা ফল কিরূপে সম্ভব হয়? নিপাত মিথ্যা, সুতরাং মিথ্যাই মিথ্যার কারণ হইতে পারে। বীরেন্দ্র কর্ম্মসূত্রে, অদৃষ্টচক্রের অদ্ভুত গতিতে, মর্কটরায়ের চাতুরীতে পড়িয়া, পিতৃহিতের মিথ্যা দৃষ্টিতে আকৃষ্ট, এবং তৎসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই মিথ্যাদৃষ্টিবশে মুসলমানের পক্ষ হইয়া অস্ত্রধারণ করিতে, গুরুসমক্ষে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, প্রাচ্যপ্রকৃতির বশবর্ত্তিতায় এখানে তাহা ভঙ্গ হইল। মগপর্টুগীজের সহ যে যুদ্ধ করেন, সেই যুদ্ধ বর্ণনাটি অতি অদ্ভুত। ভিখারী ব্রাহ্মণ পরিচয় দিতেছে, কিন্তু কবির যুদ্ধ বর্ণনা যে অপূর্ব্ব তাহাতে সে ঠিক পরিচয় দিতেছে,

'কর্ণে চক্ষে যাহা দেখেছি, শুনেছি,
শ্রবণে নয়নে, লাগিয়া আছে;
ষাটিবর্ষ মম, স্মরিলে তথাপি,
শিরায় শিরায় শোণিত নাচে।
উত্তরে মোগল হাজারে হাজার,
চন্দ্রার্দ্ধ কেতন শূন্যেতে হেলে।
দক্ষিণে কেতন হাজারে হাজার
বৌদ্ধ ফিরিঙ্গির মিসিয়া খেলে।

'মধ্যে ফেণিনদী রজতের ফণি
সভয়ে সভয়ে বহিয়া যায়,
উভয় পক্ষের শিবিরের ছবি,
নিরপেক্ষ ভাবে মাখিয়া গায়।
পশ্চিম জলধি গর্ভেতে তপন,
বসি রক্ত জবা কুসুমাসনে,
নিরখিছে দুই সংহারক ছবি,
নিরপেক্ষ ভাবে অচল মনে।

'উভয়ের পার্শ্বে বঙ্গ-সিন্ধুনীরে,
ভাসে উভয়ের সমর-তরী;
পল্লব বিহীন দুইটি কানন,
সিন্ধুগর্ভে যেন ভাসিছে, মরি!

* * * *

এই গেল সজ্জা। ইহার পর যুদ্ধবর্ণন। তাহা উদ্ধৃত করিব না, আমার স্থান নাই। তাহার পর ঐ বনবর্ণনা এমন স্বাভাবিক, এমন অদ্ভুত এমন অপূর্ব্ব চমৎকার যে উদ্ধৃত করিতে হইলে, হয় সমগ্র অংশ উদ্ধৃত

কর, নতুবা কিছুই করিও না। অংশত তুলিলে, অপরাংশের অপমান করা হয়। বীরেন্দ্র এই যুদ্ধে একটি আঘাত প্রাপ্ত হয়েন।

ইহার পর বীরেন্দ্রের জীবন যখন অদৃষ্ট চক্রের ঘোর ঘূর্ণায় আসিয়া পড়িয়াছে, যে বিজ্ঞতা ও বহুদর্শীত্বে চিত্তকে সকল অবস্থাতেই উন্নত এবং অবিচলিত রাখে, এখানে তাহার অভাব; সুতরাং এখন ভারবিনত মনে পূর্ব্বস্মৃতিই একমাত্র বিনাপ্য। এই পূর্ব্বস্মৃতি অত্যন্ত হৃদয়দ্রবী, বলা বাহুল্য যে ইহা কবির হৃদয়-শোণিতে লিখিত;—

'মাতৃহীন শৈশবান্তে, দিলাম কৈশোরে
বিদেশ সমুদ্রে ঝাঁপ,' ইত্যাদি।

এই গুলি বীরেন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত। ইহার সঙ্গে কবির নিজ উক্তি

'দেও দাসে কূল, মাতা, দেও পদ-ছায়া,'
শারদ অষ্টমী আজি,'

ইত্যাদী স্থলের ভাব সমূহের সহ একবার মিলাইয়া দেখিও।

মাতুলে বলপূর্ব্বক প্রেমমুগ্ধা কুসুমিকার অন্যত্র বিবাহ দিতেছে। বিবাহদিন আসিল। বরসভায় বর আগত। এই বেলা, প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া, কোন রূপে কুসুমিকা উদ্ধার করিতে পারিলেই রক্ষা, নতুবা কুসুম জন্মের মত হাতছাড়া হইয়া যায়। বীরেন্দ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। দৌড়, দৌড়! কিন্তু একি? কুসুমিকা পাইলাম বটে, কিন্তু কুসুমিকা যে মূর্চ্ছাপন্ন! কুসুমিকা কি তবে মৃতা? বীরেন্দ্রের প্রাণ উড়িল, নাড়ি ছাড়িল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল; বীরেন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। যুদ্ধকালীন প্রাপ্ত—আঘাতের ক্ষত স্থান দিয়া রক্ত ছুটিল। বিষম দেহ-বিপ্লবে, রক্ত নিঃসরণে, শরীরস্থ যন্ত্র বিলোড়নে বীরেন্দ্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। যে দেবতা যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা বলাইয়া, পুনরায় নিয়মের অখণ্ডনীয়ত্ব রক্ষাহেতু তাঁহাকে নরক দর্শন করাইয়াছিলেন; সেই দেবতাই বীরেন্দ্রকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে পিতৃভক্তির ধার শোধাইয়া, এখানে, এইরূপে, সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য অখণ্ডনীয় নিয়মের পরিণাম সাধন করিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বীরেন্দ্রে বিজ্ঞতা ছিল। যে যে গুণ থাকিলে, পিতৃভক্তি, গুরুভক্তি; আত্মহিত, লোকহিত; স্বয়ং এবং সমাজ; অন্তঃ এবং বাহ্য; ইহাদের সামঞ্জস্য হইতে পারে, এবং সদসদের মর্ম্মভেদ করিতে পারা যায়, বীরেন্দ্রে তাহা সমস্তই ছিল। কিন্তু চিত্তের সম্বন্ধে যেমন মনীষা; তেমনি ইহাদের যাহাকে যাহার উপযোগিতা অনুসারে যথাস্থানে নিয়োজক ও শাসনকর্ত্তা যে বিজ্ঞতা, তাহা ছিল না। সুতরাং তাহারা যদৃস্থা দ্বন্দ্ব-ঘূর্ণিত হইয়া অবশেষে এই পরিণাম প্রাপ্ত হইল। বোধ করি কবির ইহা ইচ্ছা, নতুবা বীরেন্দ্রকে জীবিত রাখিলে, লোকমুখাপেক্ষী, কঙ্কালদৃশ্য, প্রেত-নিবাসিত এই বঙ্গে বীরেন্দ্রের স্থান হইত কোথায়? বীরেন্দ্রের মৃত্যুতে বীরেন্দ্রকে বরং সুখী বলিতে হইবে। এবং কবিও চতুর, স্বকার্য্যসাধক, অথচ প্রাকৃতিক অখণ্ডনীয় নিয়মে সুদূর দূরদর্শন-সম্পন্ন। কবি বীরেন্দ্রের অন্তিম কালে তাহাকে বারেক মাত্র তাহার চিরস্বপ্ন মাতৃদর্শন করাইয়াছিলেন, কিন্তু বীরেন্দ্র তখন মৃত্যুর নির্ধূম-

অঙ্কে শয়নশায়ী। বীরেন্দ্রের কি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল? সংসারেই সকল আকাঙ্ক্ষা যাহারা পূরণ করিতে চাহে তাহারা কি ভ্রান্ত! কিন্তু বিধাতঃ, যদি এই আকাঙ্ক্ষা, এই জীবন, ইহার পরিণাম না থাকে, ইহার পরিণাম না করিয়া থাক. তাহা হইলে নাজানি মনুষ্যের পশুত্ব ঘুচাইয়া তুমি কি বিড়ম্বনাই সাধিয়াছ! তাহা হইলে উহারা আবার ফিরিয়া যাউক, আবার সেই অরণ্য-বাসী হউক; মনুষ্যত্ব, সভ্যতা,উহাদের পক্ষে কেবল বিড়ম্বনা মাত্র—ইহা দুঃখ কুট হইতে কুটতর, কুটতর হইতে কুটতমে পরিণতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তত্ত্ব অভাবে মূল, অভাব দুঃখের মূল; অতএব প্রতি নূতন তত্ত্বের উদয় আর একটি নব দুঃখের সোপান-সৃষ্টি ভিন্ন তাহাকে আর কি বলিব?

সেক্‌সপিয়রের জুলিয়েটের ন্যায় কুসুমিকাও মূর্চ্ছা অন্তে বীরেন্দ্রকে মৃত দেখিয়া দুঃখাতিশয্যে আপনিও হৃদয় ফাটিয়া মৃত হইল। এই কুসুমিকাকে কবি বড় একটা দেখিতে দেন নাই। এ কাব্যে কুসুমিকার সমাবেশ,'বিরাট দৃশ্য বিশাল অদ্রি-স্তর-প্রবিষ্ট সুবর্ণশিরা সদৃশ। একবার মাত্র কবি কুসুমিকার হৃদয়কে পূর্ণ দর্শন করিতে দিয়াছিলেন, তাহাতেই কেবল জানা গিয়াছিল, কুসুমিকার হৃদয় অতলস্পর্শ গভীর এবং তাহাতে যে স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার আদিও নাই অন্তও নাই। বীরেন্দ্র-বিরহ-বিধুরা কুসুমিকা সেই একবার হৃদয়ের দ্বার এরূপে খুলিয়াছিল।—

১

জীবন না যায়রে!

যায় দিন যায়, দিনমণি যায়,
নিবিয়া নিবিয়া রে!
সাগর নীলিমে, বাড়ব অনল,
মিশিয়া মিশিয়া রে!
যায় দিন যায়, দেখিতে দেখিতে
ছায়াতে মিশায় রে!
সকলিত যায়, কেবল দুঃখের
জীবন না যায়রে?

২

যায় নদী যায়, ফিরিয়া না চায়,
বহিয়া বহিয়া রে!
বনের বসন্ত, সেও চলে যায়,
নিদাঘে জ্বলিয়ারে।
কুসুম শুকায় সৌরভ লুকায়,
সকলি ফুরায় রে!
স্বজনি, কেবল এই দুখিনীর
জীবন না যায় রে!

৩

সকলি ফুরায়;— শৈশবের খেলা,
গলায় গলায় রে!
কৈশোর কাহিনী, নয়নে নয়নে,
অমিয় ধারায় রে!
যৌবনের আশা, হৃদয়ে হৃদয়ে,
সকলি ফুরায় রে!
সকলিত যায়, সখি, কি কেবল
জীবন না যায় রে?

৪

সখি, স্রোত ধারা, নিলে অন্য পথে
নদীও শুকায় রে!
নিলে বৃন্তান্তরে, পড়ে বনফুল,
ঝরিয়া ধরায় রে!.
জীবন কুসুম, যেই আশাবৃন্তে

আদরে ফুটায় রে!
ছিঁড়িলে তা হতে, তবু কি স্বজনি
জীবন না যায় রে?

৫

নানা, সখি, নানা, অবশ্য যাইবে,
যেতেছে নিবিয়া রে!
প্রাণ দিবা হায়! নিরাশা ছায়াতে
যেতেছে মিশিয়া রে!
যেতেছে, যাইবে, নাহি যায় কেন,
যাতনা ঘুরায় রে!
হায়, সখি, কেন ওই দিবা সনে
জীবন না যায় রে?

৬

একদিন আর, আশায় আশায়,
আশায় থাকিব রে,
এক দিন আর, জীবনের আশা
হৃদয়ে বহিব রে,
কালি রবি সনে, যদি আশালোক,
বিধাতা নিবায় রে,
আশা সহ সখি, দেখিব কেমনে,
জীবন না যায় রে!

ইহার পর আর বাক্যব্যয় করিতে যাওয়া অধিকন্তু মাত্র। ভৃত্য শঙ্কর!—অতি অপূর্ব্ব ভৃত্য। বীরেন্দ্রের ন্যায় যখন মুনিব জুটিবে, ভৃত্যও তখন ঐরূপ হইবে। বীরেন্দ্রের উপযুক্ত ভৃত্য: ইহার পর আর কাহারও বিষয় কিছু বলিব না, যেহেতু অনাবশ্যক। বীরেন্দ্রই কবির অদ্ভুত, অপূর্ব্ব ও অনাগত সৃষ্টি, এবং অতুলনীয়।

রঙ্গমতী অতুলনীয়, যথার্থ সাত্বিক কাব্য। ইহার প্রায় সমস্ত অংশই কবির হৃদয় শোণিতে লিখিত। ইহা সমস্তই কবির দৃষ্টি সম্ভূত, তর্কদর্শনসম্ভূত নহে। কোন বিষয়ই এইরূপ করিলে এইরূপ হইতে পারে; এরূপ মীমাংসা নিরূপিত নহে। প্রকৃত কবিকে কোন বিষয়ই মীমাংসার উপলব্ধি করিতে হয় না, দৃষ্টিদ্বারা উপলব্ধি হয়। তাহার নিকট কোন বস্তুই লুপ্ত, গুপ্ত, ছিন্ন, ভিন্ন, অসংলগ্ন, বা সংযোজন-যোগ্য নহে। কার্য্যকারণব্যাপ্তা প্রকৃতির দূরতম গুহা পর্য্যন্ত তাহার দৃষ্টি প্রসারিত। এ কবির দৃষ্টি অল্প বা অধিক যতদূরই প্রসারিত থাকুক, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে এই কাব্যের প্রায় আদ্য-অন্ত সেই একমাত্র দৃষ্টি হইতেই সম্ভূত।

রঙ্গমতী কাব্য এবং রঙ্গমতীর কবি সংসারে কিরূপ স্থান প্রাপ্ত হইবে, কোন্ পর্য্যায়ে থাকিবে এবং লোক সংসারে, সাহিত্য সংসারেই বা কিরূপ প্রভুত্ব করিবে, তাহা আমি কিছুই বলিলাম না, কারণ আমার কথা হয়ত নাও থাকিতে পারে, যেহেতু এপক্ষে একমাত্র মীমাংসক কাল, এবং এ মীমাংসক এমনই দুরন্ত ও দুর্ব্বিনীত যে কাহারও কথা শুনে না, কাহারও খাতির করে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যাহারা কেবল অভিমানে কাঁদে ও রাগে ফুলে, কিন্তু যে জন্য কান্না অভিমান ও রাগ, তাহার উপায় বলিতে জানে না, তাহাদের হইতে সেই ই শ্রেষ্ঠ যে জানে; নবীন সেনের কাব্য সে শ্রেষ্ঠ শ্রেণির নহে। রঙ্গমতী আমি সমগ্র দর্শনে আলোচনা করিলাম, অংশ অংশ লইয়া আলোচনা করিলাম না; কোন অট্টালিকা দেখিতে গেলে, তাহার সমগ্রদর্শনই অধিক চক্ষুতৃপ্তিকর;

পর্ব্ব পর্ব্ব, শেষে ইট কাঠ, মাল মসলা খুলিয়া পর্য্যন্ত পরীক্ষা করা, তেমন চক্ষুতৃপ্তিকর নহে; বিশেষ তাহা মজুরের কার্য্য; তাহার পর, মজুরের কথায় বড় আসে যায় না।

তাহার পর এ পর্য্যন্ত কেবল গুণ ভাগেরই বিষয় আলোচনা করিলাম, দোষভাগের বিষয় কিছু বলিলাম না। আবশ্যকও নাই। কবি মানুষ। মানুষ ক্ষীণতা এবং হীনতা শূন্য নহে। সুতরাং রঙ্গমতীতেও যে অনেক দোষ আছে তাহা বলিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। এসংসারে একেবারে ভাল, একেবারে মন্দ, বস্তু নাই। আলোকেও অন্ধকার আছে, সুখেতেও দুঃখ আছে, অসতেও সৎ আছে। অতএব যেখানে ভালর ভাগ অধিক আমরা তাহাকেই ভাল বলি, যেখানে মন্দের ভাগ অধিক, সেখানেই মন্দ বলি। এই ভাল অর্থেই রঙ্গমতীকে ভাল কাব্য বলি। তাহার পর ইহার কোথায় হাঁসিতে হয়, কোথায় কাঁদিতে হয়, কোথায় ফুলিতে হয়, কোথায় চুপ্সাইতে হয়; এবং কোথায় কবির রসভঙ্গ, ছন্দভঙ্গ, যতিভঙ্গ, বা বর্ণাশুদ্ধি হইয়াছে, এসকল সম্বাদপত্র সম্পাদক সমালোচকবর্গের জন্য রাখিয়া দিলাম; যেহেতু ইহা তাঁহাদের এক চেটিয়া জিনিস, সুতরাং তাহাতে হাত দিতে গেলে অনধিকার প্রবেশ জনিত দোষে পড়িতে হয়। এরূপ সমালোচকেরা বলিবেন "কবি এই সর্গে এই রসের অবতারণা করিলেন" অথবা "এখানে করুণা রসের তরঙ্গ ঢালিয়া, আবার দেখ হঠাৎ কেমন বীররসের উপরে তুলিলেন" অথবা "এখানে কবি এই রস ভঙ্গ করিয়াছেন" "এখানে তিনি সুনীতি বা সুরুচির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন" ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি রঙ্গ-অবতারণাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবেত রস-অবতারণা নিত্যই হইয়া আসিতেছে, তাহাতে নূতন কি? যাহা নূতন নহে, তাহাতে বাহাদুরী কোথায়? অতএব, 'রস-অবতারণা' নহে, 'নূতন কি?' তাহার অনুসন্ধান কর। রস-অবতারণা আনুষঙ্গিক পদার্থ মাত্র; স্বয়ং পদার্থ নহে।*

---

* কবির সুরুচি সম্বন্ধে লোকে যাহা বলিয়া থাকে, তাহা নিতান্ত অর্থশূন্য নহে। ফলতঃ "প্রেম-উন্মাদিনী", "সখের গোলাপ" প্রভৃতি, কবির রচনা যে পড়িবে সে যে তাঁহার সুরুচির বড় পক্ষপাতি হইবে তাহা বোধ হয় না। প্রকৃত মহত্ত্ব ঈশ্বর পরায়ণ-সুনীতি অবলম্বন ভিন্ন অসম্ভব। পাশবনীতি সর্ব্বত্রেই ঘৃণার বস্তু। তবে কথা এই, এই সুখদুঃখময় সংসারে সত্যনীতিশীলও রোজ মিলে না; এবং একটা নীতির ব্যতিক্রমেও মানুষ একেবারে অধঃপাতে যায় না। তাহার পর 'একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে'। বহু গুণশালী নবীনচন্দ্রের ইহাই যে কিছু দোষ মার্জ্জনাস্থল। ফুলবাবু বাইরণ কবির উন্নত শক্তিকে যেরূপ বিকৃত করিয়াছে, কবির ঐ ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার পাঠকবর্গের উপরেও সেই আশঙ্কার সম্ভবহেতু, তাহাদের এরূপ দূষণীয় বলিলাম। সামান্যশক্তি লেখক দুহাজার পুঁথি তদ্রূপ লিখিলে কোন দোষের হয় না, কিন্তু অসামান্যশক্তি লে-

আর একটি এ কাব্যে তৃপ্তিজনক বিষয় আছে, এবং পাঠকেরাও তাহাতে অনেক তৃপ্তিলাভ করিবেন; তাহা এই,—উপাখ্যান ভাগ পৌরাণিক নহে। পৌরাণিক উপাখ্যানের উপর তাঁহাদের এত চটা হওয়ায় তত দোষও দেওয়া যাইতে পারে না। এপর্য্যন্ত যে কেহ কাব্য লিখিতে যাইত, পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বন ভিন্ন তাহাদের উপায়ন্তর ছিল না। সুতরাং ফলে এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, যে কোন পদ্যরচক, সেই মহাকবি, এবং তাহার লেখনী প্রসূত যে কোন পদ্য, তাহাই মহাকাব্য। যে মহাকাব্যের অভাবে, প্রভূত রাজ্যগৌরব সত্বেও রুষীয় জাতীকে কার্লাইল নির্ব্বাক, বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; বঙ্গভূমে সেই, 'মহাকাব্য' ও 'মহাকবি' নামের ছড়াছড়ি। আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে এখানকার মাটির গুণ আছে! এই শ্রেণির লেখক এবং পাঠকদিগের বিশ্বাস এই যে, যে কোন বড় এবং গণনীয় কাব্য, তাহা পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন ভিন্ন হইতে পারে না; এবং স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন একত্র, ত্রিভুবনে খবর চালাচালি, এবং দেব লোক, গন্ধর্ব্ব লোক, রাক্ষস লোক, ইত্যাদি লোক সমাবেশ করিতে পারিলেই, কাব্য ঘোরাল, বিশাল, এবং তাহার চিত্ত-বিস্ময়ক গুঢ় মাধুরী সম্পাদিত হয়। এসকল কবিরা কাব্য অর্থে কি ভাবিত বলিতে পারি না, কিন্তু তাহারা আত্ম লোকও কেন তাহার মধ্যে সমাবেশ না করিত, তাহা হইলে তাহাদের কাব্যের মাধুরী ত আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবার সম্ভব ছিল, যেহেতু তাহারাও মানুষী লোকের বহির্ভূত? কবি যে, তাহাকে কাব্যের জন্য দায়গ্রস্তবৎ ত্রিভুবন টানাটানি করিতে হয় না; কবি যে,সে নিজেই কাব্য। তবে যে প্রাচীন কবিগণ ত্রিভুবন লইয়া টানাটানি করিতেন, তাহার কারণ আছে; তাঁহারা সেই ত্রিভুবন সহ আত্ম জীবনে প্রত্যক্ষবৎ সম্বন্ধ দেখিতে পাইতেন, সেই জন্য; কিন্তু তুমি? সে যাহা হউক নবীনচন্দ্র যে প্রথমে সেই চর্ব্বিত চর্ব্বণ পরিহার করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি না; তবে তিনি পরিহার করিয়াছেন, এই পর্য্যন্ত বলিতেছি।

কিন্তু রঙ্গমতীর উপাখ্যান ভাগ আধুনিক, এই পর্য্যন্ত। যদি তাহাতে উপন্যাসাদির ন্যায় চিত্ত আকর্ষক ঘটনাবলীর অনুসন্ধান করিতে যাও, তাহা হইলে নিরাশ হইবে। উপাখ্যান ভাগও কাব্য-নায়ক বীরেন্দ্রের জীবনের ন্যায়, অযত্ন গ্রথিত, গ্রন্থিশিথিল। আত্মগুণে নহে, কেবল একমাত্র কবির কবিত্ব গুণে তাহা আদ্যন্ত সজীব। উপাখ্যান ভাগও কাব্য-নায়কের জীবন সহ সমধর্ম্মী; উভয়েই বনবিহঙ্গের ন্যায়, স্বভাব সুখে, স্বচ্ছন্দ চিত্তে, লোকালয় বন পর্ব্বতে, যদৃচ্ছা পরিভ্রমণে ক্রীড়াশীল। অথচ উভয়েই গম্ভীর, বায়ুগ্রস্ত গম্ভীর-প্রকৃতি সদৃশ; উভয়ই অগ্নি-শিখা সদৃশ তেজোময়, জন্মান্তরীণ-স্মৃতি-উৎপাদক; উভয়ই বন্ধন শূন্য;—কল্পনা দেবী যেন ইচ্ছা করিয়াই ক্ষণেকের জন্য অযত্ন শিথিলতায় আপনার ক্রীড়া ভাণ্ডার

খকের তদ্রূপ এক পংক্তিও দুষণীয়, যে হেতু সে শক্তির আকর্ষণী শক্তি অনিবার্য্য।

বিকীর্ণ করিতে বসিয়াছেন। ইহা আদ্যন্ত গম্ভীরতা পূর্ণ; ভাব গম্ভীর, কথা গম্ভীর, রচনা গম্ভীর; এতদুর, যে কবি যেখানে হাস্যরসের উৎপাদন করিতে গিয়াছেন, সে হাস্যরসেও গম্ভীরপ্রকৃতি মানুষের কাষ্ঠ-হাসির ন্যায় নীরস হইয়া গিয়াছে। তাহার সাক্ষ্য চন্দ্রশেখরে ঢেঁকী পঞ্চানন সহ বীরেন্দ্রের বাক্যালাপ। তবে বঙ্গভূমে ইহা হাস্যরস উৎপাদন করিলেও করিতে পারে, কারণ যেখানে

"পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার।
রাবণ উদ্ধবে কহে শুন সমাচার ॥"

ইত্যাদি শুনিয়া লোকে হাসির হিল্লোলে ঢলিয়া পড়ে, সেখানে ঢেকী পঞ্চাননের কথায় না হাসিবে কেন? ফলতঃ এই স্থান দৃষ্টির অনুসরণে লিখিত নহে; মীমাংসার অনুসরণে। প্রকৃত কবিও মীমাংসার অনুসরণ করিলে কিরূপ নিস্ফলতা আসিয়া জুটে, কবির এই স্থান এবং রঙ্গমতীর আরম্ভেই কয় পৃষ্ঠা তাহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ। হ্যাদে দেখ কি বলিতে বলিতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি।

রঙ্গমতীকে সাত্বিক কাব্য বলিয়াছি। ফলতঃ বাঙ্গলাভাষায় চণ্ডীদাসের পদাবলি ভিন্ন আর কোথাও এরূপ সাত্বিকগুণশীল কবিতানিচয় পড়িয়াছি কিনা স্মরণ হয় না। ইহার অনেক স্থানে কবির জীবন-ছায়া পড়িয়াছে; এবং বহুস্থান কবির হৃদয়শোণিতে লিখিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের কর্ম্মস্থান সঙ্কীর্ণ, রঙ্গমতীর কর্ম্মস্থান সমুদ্রবৎ বিস্তার-যুক্ত। যাহাহউক রঙ্গমতী সম্বন্ধে আর অধিক বাক্যব্যয় করিব না। এখনও অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু সময়-অভাব। কেবল আর একটি মাত্র স্থান উদ্ধৃত করিয়া এ কাব্য আলোচনা শেষ করিব। বিরহ বিধুরা জনৈক জুমিয়া রমণী, আপন প্রেমিক-বিরহে পরিতপ্তা হইয়া, সেই প্রেমিক-উদ্দেশে হৃদয় খুলিয়া আপন দুঃখে সঙ্গীত গান করিতেছে।

"ভুলিলে কেমনে
এত আশা, ভাল বাসা, ভুলিলে কেমনে?
এই কালিন্দীর তীরে,
এই কালিন্দীর নীরে,
এই তরুতলে, এই নিবিড় কাননে,
বসি এই শিলাতলে,
এই নির্ঝরিণী কলে,
বলেছিলে কত কথা,—ভুলিলে কেমনে?

২

যথা এই গিরিবর,
ঢালিতেছে নিরন্তর,
সরসী হৃদয়ে বারি; ভুলিলে কেমনে,
তেমতি হৃদয়ে মম,
ওই বারিধারা সম,
ঢালিলে যে প্রেমধারা প্রেম-প্রস্রবণে?

৩

সেই প্রেম প্রবাহিনী,
আজি কূল বিপ্লাবিনী,
প্লাবিয়া হৃদয় সর বহিছে নয়নে;
ওই স্রোতস্বতী মত,
বহিতেছে অবিরত,
অশ্রুধারা অবিরল প্রণয়-প্লাবনে।

৪

যে দেশে রয়েছ তুমি,
নাহি কি আকাশ ভূমি,

সে দেশ, সলিল নাহি, নাহি রবি শশী ?
আকাশে নীলিমা নাই,
ভূমে বৃক্ষ লতা নাই,
সলিলে তরল শোভা, নিশি কণ্ঠে শশী ?

৫

দিনে দিবাকর নাই ?
প্রদোষ প্রভাত নাই ?
নরের হৃদয় নাই, হৃদয়েতে স্মৃতি ?
থাকিলে এ দুঃখিনীরে,
ভাসায়ে বিস্মৃতি নীরে,
কেমনে রয়েছ ছাড়ি আশ্রিতা ব্রততী ?

৬

যখন যে দিকে যাই,
কেবল দেখিতে পাই,
অঙ্কিত তোমার মুখ,—শূন্য, ধরাতল !
ঝর ঝর নির্ঝরে,
নিত্য প্রেম গীত ঝরে,
অনন্ত প্রেমের কাব্য গগণ ভূতল।
কিম্বা বল প্রাণনাথ,
তথায় কি পারিজাত,
ফুটে ধরাতলে, সে কি নন্দন কানন ?
পেয়ে পারিজাত ফুল,
দুঃখিনীর আশা মূল,
ছিড়িলে কি, ভুলিলে কি দরিদ্র কুসুম ?

৮

সব আর কত কাল,
এ স্মৃতি-শর জাল,
রবি, শশী, তারা, এই সরসী কানন ?
বাণমুখে অবিরল,
জ্বলিছে নিরাশানল,
কানন-কুসুম কলি ঝরিবে এখন।

৯

এই কালিন্দীর তীরে,
এই কালিন্দীর নীরে,
এই তরুতলে, এই নিবিড় কাননে,
বসি এই শিলাতলে,
এই নির্ঝরিণী কলে,
বনের কুসুম কলি শুকাইবে বনে।

১০

ভুলিলে কেমনে
এত আশা, ভালবাসা, ভুলিলে কেমনে ?”
এই মহা-প্রবন্ধ ভূমিবলয়ে জীবন্ত রহুক।

শ্রীবাঞ্ছারাম।

বাঙ্গলা সাহিত্যের উৎকর্ষ বিষয়ক প্রস্তাব।

১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে বালেশ্বর নগরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কলেক্টর জন্ বীম্স্ সাহেব বাঙ্গলাভাষার সংস্করণ ও উৎকর্ষ-সাধনার্থ এক প্রস্তাব রচনা করিয়া সাধারণ কৃত-বিদ্য বঙ্গবাসিগণের নিকট স্বীয় মতের বিজ্ঞতা, প্রস্তাবের সংলগ্নতা ও উদ্দেশ্য-বিষয়ের শুভ ভবিতব্যতা সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। তৎসাময়িক বিজ্ঞমণ্ডলী উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে কতদূর যত্ন ও কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমি সবিশেষ অবগত নহি; যেহেতু তখন অতি অল্পকাল হইল, পঠদ্দশা হইতে নিস্তার পাইয়াছি। বস্তুতঃ

উহা যে এপর্য্যন্ত ফলবান্ হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য।

উক্ত প্রস্তাবের প্রারম্ভে বীম্স্ সাহেব বলিয়াছেন * যে, এক্ষণে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গলাই কি শিক্ষা, কি সামাজিক উৎকর্ষ উভয় বিষয়েই অগ্রসরতা লাভ করিয়াছে, এবং ইহার সাহিত্য শাস্ত্র পূর্ব্বাবস্থা অতিক্রম করিয়া, ইউরোপীয় অনুকরণ প্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু অন্যান্য প্রদেশ এখনও সেই ভাবে আছে; অতএব বঙ্গভাষার শৃঙ্খলা স্থাপন ও কিয়ৎপরিমাণে একরূপতা সম্পাদন, অধিক কি, ইহাকে সাহিত্যোপযোগী করা নিতান্ত আবশ্যক।

সময়াতিরিক্ত কোন প্রস্তাব নিতান্ত হিতগর্ভ হইলেও যে সাধারণ-প্রিয় হইতে পারে না, এবং তাহা হইতে সর্ব্বদা যে সুফল আশা করা যায় না, তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত প্রায় প্রত্যেক দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসে এবং প্রত্যেক সভ্য জাতির সামাজিক উন্নতির ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার উক্ত প্রস্তাব পণ্ডিত মণ্ডলীর অনুসরণীয় হয় নাই, এক্ষণে যে হইবে তাহা বলা দুরূহ, তবে আশার বিষয় এই যে পূর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালা বাঙ্গালীর অধিক আদরণীয়া হইয়াছে।

এতাবৎকাল বাঙ্গালা সাহিত্যের যতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহা কেবল ব্যক্তিগত যশোলিপ্সা বা উপচিকীর্ষার ফল মাত্র। সমাজের বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ বিদ্যানুশীলন হইতেছে, তাহাতে সহস্র সহস্রের মধ্যে পঞ্চাশৎ ব্যক্তিও সাধারণ ইংরেজী সাহিত্যালোচনার রুচি-বিরোধী হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলনে বা উহার উৎকর্ষসাধনে যত্নবান হইবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি? কিন্তু তাঁহাদিগের যত্ন-লব্ধ সম্পত্তি কি সামাজিক সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে? ত্রিংশৎ বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্র কুৎসিৎ ও অস্বাস্থ্য-কর পতিত ভূমি ছিল, কেহই উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না; ক্রমশঃ কয়েকটী জ্ঞানবান সুদূর-দর্শী কৃষক-রত্নের সাহায্যে ও পরিশ্রমে হৃদয়-তোষিণী শস্য-সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া বিরুদ্ধমতাবলম্বি-দিগের প্রতি উপহাস করিতেছে। পতিতভূমি হল-সংমিলনে সহসা যে প্রচুর পরিমাণে ফলবতী হইবে তাহা প্রকৃতি সিদ্ধ; এবং উহাতে যে প্রথমে প্রচুর পরিমাণে কণ্টকী বৃক্ষও উৎপন্ন হইবে তাহাও অনিবার্য্য। সংপ্রতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংবর্দ্ধন, এবং অপ্রয়োজনীয় ও অমঙ্গলকর বিষয়ের নিষ্কাশন করা কর্ত্তব্য-বোধে এই প্রস্তাব সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিতগণের অনুমোদনার্থ লিখিত হইল।

সুবিজ্ঞ বঙ্গ-দেশহিতৈষী বীম্স্ সাহেবের প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য বর্ণ সকলের যদৃচ্ছা

* Bengal has so complety taken the lead in education and culture among the provinces of India that its literature has passed out of the stage in which that of the other provinces still remains, and is now closely approximating to an Europian standard. * * * * * The time has, therefore, arrived for consolidating the language, and giving it a certain uniformity, in short, for creating a literary language.

প্রয়োগ রহিত ও সংস্কৃত বা গ্রাম্য-শব্দ প্রচলনের সীমা নির্দ্দেশ করা *। ভাষার কিয়ৎপরিমাণে একরূপতা সম্পাদন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; কিন্তু শব্দ প্রচলনের সীমা-নির্দ্দেশ করিবার জন্য অভিধান প্রস্তুত করা প্রথমেই বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে না। প্রাচীন পণ্ডিতেরা রসভেদে বর্ণ, সমাস, সন্ধি প্রভৃতির প্রয়োগের নিষেধ ও আদেশ করিয়াছেন, এবং তাহাতে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সময়ের সস্কৃত লেখকদিগের ভাষার একরূপতা সংরক্ষিত হইয়াছে। এবং ঐ একরূপতাই উক্ত ভাষার উৎকর্ষ ও বিশেষ সম্মানের অন্যতম কারণ। তাঁহারা যে সকল সুনিয়ম-সংস্থাপন এবং তৎপরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ সেই সকলের অনুসরণ করিয়া একরূপতা সংরক্ষণ করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায়ও সেই সকল নিয়মের উপযোগিতা সংলক্ষিত হয়। বীম্‌স্‌ সাহেব 'অউক্‌সড্‌ ও ফোস্‌ফেট' এই দুইটী বর্ণাশুদ্ধি দোষ কোন লোকের অনুবাদে দেখিয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ঐ দোষ অবশ্যই পরিহার্য্য বটে, কিন্তু আমরা উহাতে তত দুঃখিত হই না, যত বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন গ্রন্থকারের ইংরাজীর অনুকরণে বাঙ্গালা ভাষার রচনা এবং সংস্কৃত ও গ্রাম্য শব্দ সকলের যদৃচ্ছা প্রয়োগ দেখিয়া দুঃখিত হই। সকল ভাষারই স্ব স্ব গঠনপ্রণালী আছে। একের গঠনপ্রণালী অপরে সন্নিবেশ করিলে দেশীয় মূর্ত্তি সংরক্ষিত হয় না। যাহাতে পূর্ব্বোক্ত যদৃচ্ছাচারিতা দোষ দ্বয়ের শীঘ্রই নিষ্কাশন হয়, তাহার চেষ্টা করা উপস্থিত সময়ে অতীব কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালীর ইংরাজী ভাষা-শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ইংরাজদিগের ন্যায় ইংরাজী লিখিতে সক্ষম হওয়া নহে, (ফলতঃ এরূপ সক্ষম হইলে দেশের গৌরব ভিন্ন অগৌরবের বিষয় কিছুই নাই), উহাদিগের পুস্তক-গত সত্য সকলের সঙ্কলন, ও আপন ভাষার উন্নতি সাধন বিশেষ প্রয়োজনীয়। যদি আমাদিগের কৃতবিদ্য লেখক গণ উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ সতর্ক না হইয়া ভাষার একরূপতা ধ্বংস ও প্রচলিত গঠন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে এই পরামর্শ দিতে বাধ্য হই যে তাঁহারা ইংরাজীতে রচনা করিতে সাধ্যমত

---

* That the language of Bengal requires consolidating and defining will not be questioned. On the one hand limits must be set to the practice of introducing Sanscrit words wholesale, and on the other it is necessary to restrict the use of local, vulgar, and provincial terms. *****

I, therefore, strongly urge on the Bengalis the foundation of an Academy, which should undertake the task of consolidating the national speech. If the Academy succeeded in its labours, as there is no doubt it would, an immense benefit would be conferred on the language. It would be provided with a standard, and thenceforth any word not to be found in the dictionary of the Academy of Bengal, would be inadmissible in polite society, and excluded from the pages of all good writers.

সক্ষম হউন; কেন না পারদর্শিতা লাভ যে কোন ভাষায় হউক না কেন তাহাই প্রার্থনীয়।

পূর্ব্বে বাঙ্গলা পুস্তকের ভাষাগত দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি বিশেষ দোষ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় ইতিহাস, বা স্থানীয় ভূগোল অথবা সামাজিকতার অনভিজ্ঞতাই উক্ত দোষ সমূহের কারণ। সামান্য ভাষাজ্ঞান মাত্র অবলম্বন করিয়া যশোলোভে বিমুগ্ধ হইয়া সহসা লেখনী ধারণ করিলেই লোকে সুবিজ্ঞ লেখক হইতে পারেন না। বাঙ্গালা সামাজিকতা পঞ্জাবে নিয়োগ, হুগলী নগরীতে উজ্জয়িনী ভ্রম, বিন্ধ্যাচলের প্রাকৃতিক মূর্ত্তি হিমালয়ে অর্পণ, ইংরেজ-স্বাধীনতা পরাধীন বাঙ্গালী সংসারে সংঘটন প্রভৃতি দোষ সকল প্রায় নিত্য-নয়ন-শূল হইয়াছে। যাহাতে উক্ত দোষ সমূহ শীঘ্র অপসারিত হয়, তাহাও করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালাভাষার উৎকর্ষ বিদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবার নহে। ব্যক্তিগত যত্নেও সংসাধিত হওয়া দুরূহ। দেশীয় অধিকাংশ সমালোচক পক্ষপাত-শূন্য নহেন, এরূপ অবস্থায় একটি সামাজিক সভা ভিন্ন উক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। সভা সংস্থাপন * ও সভ্যগণের সংখ্যা নিরূপণ সম্বন্ধে সাহেব যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমারও মত সেইরূপ। কএক বৎসর হইল ঢাকা প্রদেশে বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ এবং লেখকগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ এইরূপ একটি সভার ভিত্তি স্থাপন হইয়াছে। যদি কলিকাতায় উক্ত সভার অনুরূপ একটি বৃহৎ সভা সংস্থাপিত হয়, এবং দুই সভা একরূপ নিয়মাবলীর অধীন থাকিয়া একই উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত কৃতসংকল্প হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই শুভফল হইতে পারে।

যৎকালে বীমস্ সাহেব আপন প্রস্তাব প্রকাশ করেন, তখন দেশীয় মহিলাগণ বিশেষ সুশিক্ষিতা হয়েন নাই। এক্ষণে অনেক মহিলা পুরুষাপেক্ষা রচনায় নিপুণতা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদিগকে সভ্য-শ্রেণী ভুক্ত করা এবং আবশ্যক মত তাঁহাদিগের লিখিত মত গ্রহণ করা উপস্থিত সময়ে বিশেষ সুখের ও উপকারের বিষয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

† The chief seat of the Academy would necessarily be the capital of the province, and at least forty of the academicians should be residents thereof, the remaining sixty being chosen from men of learning from all parts of Bengal.

The resident members should meet once a week or oftener. If necessary a room might be hired for meetings, but it would be perhaps pleasanter to adopt the practice of old Florentines, who used to meet in the gardens of some Suburban Villa belonging to one or other of the members. * * * * Music and singing would appropriately conclude the evening, and if songs were selected from the writings of Bengal's best authors of past time, or composed for the occasion by her living poets, this branch of literature also would benefit.

সভার প্রথম উদ্যোগ—প্রাচীন সময়াবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সকল উত্তমোত্তম বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে উহাদিগের তালিকা করিয়া সংগ্রহ করা*। তৎপরে যে সকল নূতন নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে, প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ্য সভায় উহাদিগের দোষ গুণ সভ্যগণ কর্ত্তৃক সমালোচিত হইবে ; এবং এই অবসরে সাহেব মহোদয়ের প্রস্তাবিত অভিধান প্রস্তুতির ভিত্তি সংস্থাপিত হইতে পারে। সভাপতি ও সভ্যগণের মতে যে যে দোষ ও গুণ বিবেচিত হইবে, সম্পাদক তৎক্ষণাৎ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া, কোন প্রসিদ্ধ সুলেখকের মাসিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিবেন। এতদ্ভিন্ন বিশেষ গুণ সম্পন্ন কোন রচয়িতা স্বীয় রচনা সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলে, তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে প্রথমতঃ সাহায্য করা হইবে, এবং সভার সঙ্গতি অনুসারে সুলেখকদিগকে যথাবিহিত সম্মানিত করা হইবে।

এইরূপ একটি সভা সংস্থাপন করিতে হইলে উহার মাসিক ব্যয় প্রায় ১৫০ সার্দ্ধ-শত টাকা হইবার সম্ভাবনা। মাসিক সার্দ্ধ শত টাকার হিসাবে ২। ৩ বৎসরের ব্যয় এককালে সংগ্রহ না করিয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করা অনুচিত।

পরিশেষে যে বিদ্যোৎসাহী মহাশয়ের নামে (শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশনাথ রায়) বঙ্গহিতৈষী বীম্‌স্ সাহেবের প্রস্তাবের শেষে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাকে ও সাহেবকে উক্ত সভা সংস্থাপন-সম্বন্ধে পুনর্ব্বার যত্নবান্ হইতে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।

*কলিকাতায় শ্যামবাজার জ্ঞানদীপিকা সভার পুস্তকালয় নামে যে পুস্তকালয় আছে তাহা এক্ষণে আমার তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে, উহা প্রস্তাবিত সভার বিশেষ সাহায্য করিতে পারে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "রামায়ণ। মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত মূল সংস্কৃত হইতে শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদিত।" স্বকার্য্যদক্ষ সহিষ্ণু স্থপতি যেমন ধীরে ধীরে ইষ্টকের সহিত ইষ্টক গাঁথিয়া অপূর্ব্ব প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে, কবিবর রাজকৃষ্ণরায়ও সেইরূপ ধীরে ধীরে, সর্গের সহিত সর্গ এবং কাণ্ডের সহিত কাণ্ড গাঁথিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের শোভা ও সম্পদ বিলাসের জন্য তেমনই এক মনোহর কীর্ত্তিস্তম্ভ গঠন করিতেছেন। তাঁহার নাটক নবন্যাস বাঙ্গালার অনন্তকোটি নাটক নবন্যাসের ন্যায় কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই রামায়ণরূপ কল্পবৃক্ষ অক্ষয়কীর্ত্তি বাল্মীকির বরে কালের তরঙ্গ-প্রহারেও অক্ষত ও অক্ষয় রহিবে। বস্তুতঃ আমরা এ উদ্যমের সমুচিত প্রশংসা করিতে অক্ষম। আমরা ইহা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছি এবং বোধ হয় সুরুচিসম্পন্ন ব্য-

ক্তিমাত্রেরই এইরূপ সংস্কার যে, বাল্মীকির রামায়ণ পৃথিবীর সাহিত্য ভাণ্ডারে এক অতুল ও অদ্বিতীয় পদার্থ। ব্যাসের ভারত এবং শেক্ষপীরের নাটকাবলী কবিজনোচিত মনস্বিতার বিচিত্রক্ষেত্র। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণ অমৃত-প্রস্রবণ। ব্যাস ও শেক্ষপীর মানব-প্রকৃতির অনন্ত বৈচিত্রের সহিত মনুষ্যে যাহা ভাল কি মন্দ আছে তাহারও অনন্ত বৈচিত্র দেখাইয়াছেন, কিন্তু বাল্মীকি আপনার হৃদয়কন্দরের অমৃতপ্রবাহ ঢালিয়া দিয়া মনুষ্যকে পবিত্র ও কৃতার্থ করিয়াছেন। সেই বাল্মীকির রামায়ণ অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদিত হইয়া, বাঙ্গালা কাব্যরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত গ্রথিত হইতেছে, বাল্মীকি পূতসলিলা সংস্কৃত ভাষায় যাহা বিলাইয়া গিয়াছেন, আজি অনতিবিকসিতা বাঙ্গালাভাষা তাহাই অর্দ্ধস্ফুট মধুর স্বরে বঙ্গভূমিতে বিলাইতে যাইতেছে, ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। সংস্কৃত কবিতার গদ্যানুবাদ প্রশংসার কার্য্য হইলেও নিতান্ত দুষ্কর নহে, কিন্তু অক্ষরবদ্ধ পদ্যানুবাদ প্রকৃত প্রস্তাবেই কঠিন কার্য্য। রাজকৃষ্ণ বাবু মূল হইতে পরিভ্রষ্ট না হইয়াও কিরূপ মনোহর কবিতায় রামায়ণের অনুবাদ করিতেছেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি মিলাইয়া পড়িলেই প্রকাশ পাইবে।

মূল।

"বানরান্ বানরশ্রেষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ।
যথা রাঘবনির্ম্মুক্তঃ শরঃ শ্বসন-বিক্রমঃ।
গচ্ছেত্তদ্বদগমিষ্যামি লঙ্কাং রাবণপালিতাম্।
নহি দ্রক্ষ্যামি যদি তাং লঙ্কায়াং জনকাত্মজাম্॥
অনেনৈব হি বেগেন গমিষ্যামি সুরালয়ম্।
যদি বা ত্রিদিবে সীতাং ন দ্রক্ষ্যামি কৃতশ্রমঃ॥
বদ্ধ্বা রাক্ষসরাজানমানয়িষ্যামি রাবণম্।
সর্ব্বথা কৃতকার্য্যোঽহমেষ্যামি সহ সীতয়া॥
আনয়িষ্যামি বা লঙ্কাং সমুৎপাট্য সরাবণাম্।
এবমুক্ত্বা তু হনুমান্ বানরো বানরোত্তমঃ॥
উৎপপাতাথ বেগেন বেগবানবিচারয়ন্।
সুপর্ণমিব চাত্মানং মেনে স কপিকুঞ্জরঃ॥
সমুৎপততি বেগাত্তু বেগাত্তে নগরোহিণঃ।
সংহৃত্য বিটপান্ সর্ব্বান্ সমুৎপেতুঃ সমন্ততঃ॥
স মত্তকোয়ষ্টিভকান্ পাদপান্ পুষ্পশালিনঃ।
উদ্বহন্নূরুবেগেন জগাম বিমলেঽম্বরে॥
উরুবেগোত্থিতা বৃক্ষা মুহূর্ত্তং কপিমন্বয়ুঃ।
প্রস্থিতং দীর্ঘমধ্বানং স্ববন্ধুমিব বান্ধবাঃ॥
তমূরুবেগোন্মথিতাঃ সালাশ্চান্যে নগোত্তমাঃ।
অনুজগ্মুর্হনুমন্তং সৈন্যা ইব মহীপতিম্॥
সুপুষ্পিতাগ্রৈর্ব্বহুভিঃ পাদপৈরন্বিতঃ কপিঃ।
হনুমান্ পর্ব্বতাকারো বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ॥
সারবন্তোঽথ যে বৃক্ষা ন্যমজ্জন্ লবণাম্ভসি।
ভয়াদিব মহেন্দ্রস্য পর্ব্বতা বরুণালয়ে॥
স নানাকুসুমৈঃ কীর্ণঃ কপিঃ সাঙ্কুর-কোরকৈঃ।
শুশুভে মেঘসঙ্কাশঃ খদ্যোতৈরিব পর্ব্বতঃ॥

অনুবাদ।

"কপিগণে ডাকি,　কহিলা তখন ;—
'কর সবে অবধান।—
আজি শ্রীরামের　শরদণ্ড সম—
বায়ুবেগে যা'ব আমি
রাবণ-রক্ষিত　লঙ্কাপুরী মাঝে
হইয়া আকাশগামী।
যদ্যপি তথায়　নাদেখি সীতায়—
এ বেগেই তাহা হ'লে—
দেবলোক মাঝে　উপস্থিত হ'ব
অবিচল গতিবলে।

সেখানেও যদি না দেখি সীতায়,
তবে লঙ্কা উপাড়িয়া
রাবণে বাঁধিয়া আনিব এখানে—
শুন সবে মনদিয়া।”

এই কথা বলি, বীর হনুমান
গরুড়ের মত বেগ প্রদর্শন
করি’ বলে লম্ফ করিলা প্রদান,
মুখে ‘ জয় রাম ’ শব্দ ঘন ঘন।

গিরি বিরাজিত পাদপ সকল—
শাখা প্রশাখাদি করি’ সঙ্কুচিত,
চতুর্দ্দিক হ’তে ফেলি’ ফল ফুল,
হনুমান বেগে হইল উত্থিত।

গাছে ফল ফুল ; ডাকে পক্ষীগণ,
গমনের বেগে বীর হনুমান
সে সকল বৃক্ষ সঙ্গেতে লইয়া
মহাব্যোম পথে করিলা প্রয়াণ।

তখন স্বজনগণ যেইরূপ
বহুদূরগামী বন্ধুর সহিত
যায় কিছু দূর ; সৈন্যেরা যেমন
ভূপ সনে ধায় হ’য়ে পুলকিত,

সেইরূপ সাল তাল আদি তরু
মুহূর্ত্তেক তরে হনুর পিছনে
গমন করিল ; চলে হনুমান
আকাশ ভেদিয়া পবন গমনে।

সে সময়ে সেই পর্ব্বত প্রমাণ
হনুমান্ বীর কুসুমে সাজিয়া

খদ্যোত আবৃত মহাশৈল যেন
আকাশ মণ্ডলে শোভিত হইল।

পরে বৃক্ষগণ স্খলিত বেগেতে—
কুসুমের হার করি’ পরিহার
পক্ষচ্ছেদ ভয়ে পর্ব্বতের মত
মগন হইল সাগর মাঝার।

লঘুত্ব বশতঃ ফুলরাশি ক্রমে
সমুদ্র-সলিলে পতিত হইল ;
লঘুত্ব বশত না হ’য়ে মগন
জলের উপরে ভাসিতে লাগিল।

বিচিত্র কুসুমে সাগর তখন
পরিব্যাপ্ত হ’য়ে বিজলি মণ্ডিত
মেঘ আর চারু নক্ষত্রখচিত।
আকাশের মত হইল শোভিত।”

এই অনুবাদে কোথাও দুই একটি শব্দ পরিত্যক্ত কোথাও বা দুই একটি শব্দ নূতন প্রবিষ্ট হইয়াছে। কোন কোন স্থলে সামান্যতঃ পংক্তিব্যত্যয় কিংবা এক আধটু পদব্যত্যয়ও ঘটিয়াছে। কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে যে, কাব্যের এইরূপ অর্থ সংগত, উৎকৃষ্ট, ও অনর্গল কাব্যানুবাদ বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম। রাজকৃষ্ণ বাবু কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড পর্য্যন্ত পরিসমাপন করিয়া সুন্দরাকাণ্ড আরম্ভ করিয়াছেন। যদি তাঁহার উৎসাহ অটুট রহে, তাহা হইলে বোধ হয়, তিনি অতি শীঘ্রই ব্রত-সমাপনে কৃতকার্য্য হইবেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণহউক। তিনি এই অনুবাদে ভাষার উপর যেরূপ

প্রগাঢ় আধিপত্য দেখাইয়াছেন, তাঁহার টীকানিচয়েও তেমনই কি ততোধিক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ অন্তঃপুরের অবলা এবং শাস্ত্রার্থদর্শী পণ্ডিত উভয়ের সংশিক্ষার উপযোগী। আমরা এই হেতু ভরসা করি যে, বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পোষণ করিবেন, এবং যাঁহারা বাঙ্গালাভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া ভালবাসিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা এই রামায়ণের এক এক খণ্ড গ্রহণ করিয়া স্বজাতিবাৎসল্য ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিবেন। এই গ্রন্থ কোন দিন বাঙ্গালা সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল রত্নাভরণ বলিয়া আদৃত হইবে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাস রাজকৃষ্ণ বাবুকে কৃতজ্ঞতার সহিত অভিবাদন করিবে।

২। "ভট্টিকাব্যম্। With copious explanatory and grammatical Notes and Bengali & English Translations. Edited by Nabin Chandra Vidyaratna, Professor of Sanskrita Metropolitan Institution, Calcutta. Second Edition." আমরা ভট্টিকাব্যকে ভট্টিব্যাকরণ বলিয়া থাকি। ইহার দ্বিতীয় সর্গের শরদ্বর্ণনা বিনা আর সমস্ত অংশই ব্যাকরণের উৎকট উদাহরণমালায় অলঙ্কৃত। যখন ভট্টিকাব্য কালেজের ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তক বলিয়া অবধারিত হয়, তখন আমরা একটুকু সন্দিহান হইয়াছিলাম। কালেজের ছাত্রেরা সংস্কৃত ব্যাকরণে ভালরূপ অধীতি নহে। আমরা তাই মনে করিয়াছিলাম যে, ভট্টি লইয়া তাহারা এক বিষম বিভ্রাটে পড়িবে। কিন্তু পণ্ডিতবর নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন সে আশঙ্কা উন্মূলন করিয়াছেন। তাঁহার ইংরেজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ এবং টীকা টিপ্পনী এমনই বিশদ হইয়াছে যে, যে উপক্রমণিকা মাত্র পড়িয়াছে সেই তাঁহার প্রসাদাৎ ভট্টির পদপদার্থে অনায়াসে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে। ফলতঃ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে এবং তিনি বিদ্যার্থী ছাত্রবৃন্দের ধন্যবাদার্হ।

৩। "উদ্ভট চন্দ্রিকা। শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্যেন সংকলিতা। তৎকৃত চন্দ্রিকা সদ্বিবৃতিনামটীকাসহিতা ভাষাতরিণশ্চ।" যাঁহারা সংস্কৃত কবিতার অনুরাগী, এই উদ্ভটচন্দ্রিকা তাঁহাদিগের অবসরসঙ্গিনী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইহাতে যে সকল কবিতা সংকলিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই নিতান্ত প্রীতিপ্রদ ও মনোহর এবং অনুবাদ সর্ব্বথা প্রশংসা যোগ্য।

৪। "চারুবার্ত্তা। সংবাদপত্র। সহর সেরপুর চারুযন্ত্রে শ্রীরমানাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।" আমরা এই পত্রিকা খানির ক্রমিক কএক সংখ্যা পড়িয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম। ইহা অচিরেই বাঙ্গালার একখানি উৎকৃষ্ট পত্রমধ্যে গণ্য হইবে, এবং সংবাদপত্রের যদি কিছু শক্তি ও সামর্থ্য থাকে, ইহা সেই শক্তি ও সেই সামর্থ্য উপার্জ্জন করিয়া সাধারণী শক্তির পুষ্টিসাধন করিবে। চারুবার্ত্তা দীর্ঘজীবিনী হউক।

৫। "সঙ্গীতলহরী, শ্রীযুক্ত কুমার মহেন্দ্রলাল খাঁন বিরচিত।"

৬। "মানমিলন। গীতি নাট্য। ঐ

৭। "গোবিন্দ গীতিকা। তত্ত্বসঙ্গীত। নারাজোল ও মেদিনীপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁন প্রণীত।"

ইহাতে বোধ হইতেছে, এই গ্রন্থত্রয়ের প্রথম দুখানি রাজা মহেন্দ্রলালের প্রথম বয়সের রচনা, এবং শেষোক্ত তত্ত্বসংগীত বয়ঃপরিণতির ফল। সঙ্গীতলহরী এক বিচিত্র খিচুড়ী। ইহাতে মাতঙ্গী বগলা ও শীতলা মঙ্গলচণ্ডী অবধি করিয়া ব্রহ্মসংগীত পর্য্যন্ত সকল প্রকার সামগ্রীই সমানরূপে বিন্যস্ত রহিয়াছে, এবং মানের কথা, বিরহের কথা, শঠ ও লম্পটের কথা এবং আশায় আশায় প্রাণত্যাগের কথা,'এসবও আছে। মানমিলন রীতিমত মানভঞ্জনের যাত্রা। গোবিন্দগীতিকা অপেক্ষাকৃত আদরের বস্তু। তবে বড় মানুষের রচনা, বাঙ্গালির পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। আমরা এদেশে বায়রণ, চেষ্টারফিল্ড্ ও ডিয়ুক অব্ আর্গিল কোথায় পাইব ? বঙ্গদেশের বড়মানুষেরা যদি এইরূপে একটু একটু করিয়া ভারতীর রত্নোজ্জ্বল প্রতিভার দিগে অগ্রসর হন,—আর পাঁচ সখের মধ্যে সখ করিয়াও একবার হাতে কালি কলম লন, আমরা তাহা হইলেই তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে প্রস্তুত আছি।

৮। "প্রত্যাদেশ। শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত প্রণীত।" ইংরেজীতে যাহাকে Inspiration ও Revelation বলে, আমরা তাহাকে অনুপ্রাণনা ও দিব্যজ্ঞান বলি। এই 'প্রত্যাদেশ' সেই বিষয়েই একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। লেখক চিন্তাক্ষম লোক। কিন্তু তিনি যে লিখিয়াছেন,—'মনুষ্য ইচ্ছা এবং যত্ন করিলে যীশু, পল,লুথার, চৈতন্য, শাক্য মুনি হইতে পারেন,' একথা প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও সর্ব্ব প্রকার যত্নবিরুদ্ধ। লেখক যদি Francis Galton কৃত Hereditary Genius নামক গ্রন্থ খানি একবার পাঠ করেন, আমরা নিতান্ত বাধিত হইব। সকলেই যদি সংকল্পের বলে সকলের কার্য্য করিতে পারে, তাহা হইলে বাঙ্গালি কেন বোনাপার্টির মত বীর হয় না এবং ঢেঁকিরাম পণ্ডিত কেন কালিদাসের বীণা কাড়িয়া লয় না ? ফলকথা, প্রতিভার বিকাশ এবং প্রতিভা-জন্য ক্ষমতার বিকাশ এই জগতের অন্যান্য বিচিত্র ঘটনার ন্যায় অনন্তশৃঙ্খলসূত্রিত নিয়মের ফল। অনুপ্রাণনা ও দিব্য জ্ঞানও সেই নিয়মেরই অধীন।

৯। "কুসুমকলিকা। শ্রীযদুনাথ সেন গুপ্ত প্রণীত।" ইহাতে এইক্ষণকার দস্তুর মত কতকগুলি খণ্ডকবিতা আছে। একটি কবিতা এইরূপ,—

"অন্যকৃতা যেই পীড়া সহনীয়া নয়।
প্রিয়জন কৃতা হ'লে সহিতেই হয়॥
অতএব সহ সব প্রফুল্ল অন্তরে।
প্রেমের পরীক্ষা তাঁর পীড়নের ভরে॥"

১০। "কল্পনা। সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।" ইহা বিষয়াংশে মূল্যবান, কিন্তু ইহার মুদ্রামূল্য একটাকা মাত্র। মধ্যে মধ্যে দুই একটি প্রবন্ধ সুপাঠ্য ও সুরুচির পরিচায়ক।

১১। রুদ্রচণ্ড। নাটিকা। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত"।—বাবু রবীন্দ্রনাথ এদেশের

একজন উদীয়মান কবি। বোধ হয়, তাঁহার জ্যোতির নূতন আভা অচিরেই সমস্ত বঙ্গে ছাঁইয়া পড়িবে। তাঁহার সমগ্র কবিতাতেই একটুকু অপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ নূতনত্ব আছে। রুদ্রচণ্ডের রচনাতেও সেই নূতনত্ব স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে। কবিতা গুলি যেন আধ আধ ভাঙ্গা গলায় নিরবচ্ছিন্ন মধু ঢালিতেছে। কিন্তু নাটকাংশে ইহা অসম্পূর্ণ। আমরা নিম্নে এই কাব্যের কতিপয় পংক্তি তুলিয়া দিলাম। আমাদিগের বোধ হয় বাঙ্গালায় কেহই এমন জ্যোৎস্নাশীল, সরল, কোমল ও মধুর কবিতা রচনা করিতে পারে না।

অমিয়া—

তাই যদি হ'ত পিতা, বড় ভাল হ'ত।
কে জানে মনের মধ্যে কি হ'য়েছে মোর,
বরষার মেঘ যদি হইতাম আমি
বর্ষিয়া সহস্রধারে অশ্রুজল রাশি,
বজ্রনাদে করিতাম আকুল বিলাপ!
আগে ত লাগিত ভাল জোছনার আলো,
ফুটন্ত ফুলের গুচ্ছ বকুল তলাটি,
ভ্রূকুটীর ভয়ে তব ডরিয়া ডরিয়া
তাহাদেরো পরে মোর জ'ন্মেছে বিরাগ;
শুধু একজন আছে যার মুখ চেয়ে
বড়ই হরষে পিতা সব যাই ভুলে;
দূর হ'তে দেখি তারে আকুল হৃদয়
দেহ ছাড়ি তাড়াতাড়ি বাহিরিতে চায়।
সে আইলে তারকাছে যেতে দিও মোরে।
সে যে পিতা অমিয়ার আপনার ভাই।

রুদ্রচণ্ড।—

বটে বটে, সে তোমার আপনার ভাই।
শত তীক্ষ্ণ বজ্র তার পড়ুক মস্তকে,
চিরজীবী হক্ সে অগ্নি-কুণ্ড মাঝে।
মুখ ঢাকিস্‌নে তুই, শোন্ তোরে বলি,
পুনরায় যদি তোর আপনার ভাই—
চাঁদ কবি এ কাননে করে পদার্পণ
এই যে ছুরিকা আছে কলঙ্ক ইহার
তাহার উত্তপ্ত রক্তে করিব ক্ষালন!

অমিয়া।—

ওকথা বোল' না পিতা—

রুদ্রচণ্ড।— চুপ্, শোন্ বলি;
জীবন্তে ছুরিকা দিয়া বিঁধিয়া বিঁধিয়া
শত খণ্ড করি তার ফেলিব শরীর,
পাণ্ডুবর্ণ আঁখি-মুদা ছিন্ন মুণ্ড তার
ওই বৃক্ষ শাখা পরে দিব টাঙ্গাইয়া;
ভিজিবে বর্ষার জলে পুড়িবে তপনে
যত দিনে বাহিরিয়া না পড়ে কঙ্কাল!
শুনিয়া কাঁপিতেছিস, দেখিবি যখন
মস্তকের কেশ তোর উঠিবে শিহরি!
আপনার ভাই তোর! কে সে চাঁদ কবি।
হতভাগ্য পৃথ্বিরাজ, তারি সভাসদ!
সে পৃথ্বিরাজের হীন জীবন মরণ
এই ছুরিকার পরে র'য়েছে ঝুলান'!

* * * * *

অমিয়া।—

বড় সাধ যায় এই নক্ষত্র মালিনী
স্তব্ধ যামিনীর সাথে মিশে যাই যদি।
মৃদুল সমীর এই, চাঁদের জোছনা,
নিশার ঘুমন্ত শান্তি, এর সাথে যদি
অমিয়ার এ জীবন যায় মিলাইয়া!
আঁধার ভ্রূকুটী ময় এই এ কানন,
সঙ্কীর্ণ-হৃদয় অতি ক্ষুদ্র এ কুটীর,
ভ্রূকুটির সম্মুখেতে দিনরাত্রি বাস,
শাসন-শকুনি এক দিনরাত্রি যেন

মাথার উপরে আছে পাখা বিছাইয়া,
এমন ক'দিন আর কাটিবে জীবন!
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া!
পাখী যদি হইতাম, দুদণ্ডের তরে
সুনীল আকাশে গিয়া উষার আলোকে
একবার প্রাণ ভোরে দিতেম সাঁতার!
আহা, কোথা চাঁদ কবি, ভাইগো আমার।
এ রুদ্ধ অরণ্য মাঝে তোমারে হেরিলে
দু'দণ্ড যে আপনারে ভুলে থাকি আমি!

১২। "বঙ্গীয় গার্হস্থ চিকিৎসা। নানাবিধ ইংরেজী গ্রন্থহইতে শ্রীবিহারীলাল ঘোষ, জি, এম্, সি, বি, কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।' এখানি গৃহস্থ ও চিকিৎসক উভয়েরই ব্যবহারোপযোগী। আমরা চিকিৎসা গ্রন্থের দোষ গুণ বিচার করি না। কিন্তু ইহার স্বাস্থ্যরক্ষা নামক পরিচ্ছেদ এবং উপক্রমণিকা ভাগ পড়িয়া বোধ হইল যে, গ্রন্থকার একজন বিচক্ষণব্যক্তি এবং যাহারা চিকিৎসা শাস্ত্রের কিছুমাত্র পড়ে নাই, তিনি তাহাদিগকেও নিত্য জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে সরল ভাষায় শিক্ষাদিতে সমর্থ। এই গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক বিশুদ্ধির অনুরোধে স্থানে স্থানে অতি সুকঠিন সংজ্ঞাশব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকিলেও তৎসমুদয় ব্যাখ্যার গুণে বিশদ হইয়াছে। আর, আগাগোড়া সর্ব্বত্রই অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে। বাঙ্গালা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রেরা এই বইখানি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমরা সুখী হইব।

১৩। 'দোলযাত্রা উপলক্ষে বাইজিস্তোত্র। পণ্ডিত চূড়ামণি শ্রীযুক্ত ভক্তদাস বেদান্ত বাগীশ কর্ত্তৃক বিরচিত।'—গ্রন্থকার অন্যকে বিদ্রূপ করিবার অভিলাষে আপনি ভক্তদাস সাজিয়া বাইজির স্তোত্র পাঠ করিতেছেন এবং বাইজিকে চন্দ্র, সূর্য্য, কাশী, কাঞ্চী ও পতিত-পাবনী বলিয়া অভিবাদন করিয়াছেন। একস্থানে বলিয়াছেন,—'তুমি গয়া, রাত্রি দিন কত পিতৃ-পুরুষের পিণ্ড তোমাতে পড়িতেছে।' এই পিতৃপুরুষ কাহার? বাক্যে সম্বন্ধ-পদ নাই। এইরূপ উৎকট স্থলে সম্বন্ধ-পদের অনুল্লেখ সদ্বিবেচনার কর্ম্ম নহে।

১৪। "মেলা। কবিতাময় খণ্ডকাব্য। (সন ১২৮৬ সালের ১৩ই মাঘ তারিখে রাণাঘাটে কৃষি ও শিল্প বিষয়ে যে প্রদর্শন বা মেলা হইয়াছিল তদুপলক্ষে) শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত ও প্রকাশিত।'—ইহার কবিতাগুলি মাঝে মাঝে বড় দুরুচ্চার শব্দে রচিত। যথা,—

"অমৃত-আধার-অক্ষ-অঙ্ক-বীণাপাণি"
"সাহসী বীরের মনে প্রেৎনীর শঙ্কা"

যাহা খণ্ড কাব্য, তাহা অবশ্যই কবিতাময়, গ্রন্থকার তথাপি খণ্ড কাব্যকে কি উদ্দেশ্যে কবিতাময় বলিয়া বিশেষণ দ্বারা পুনরায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমরা মেলার মূল অপেক্ষা টীকা পাঠে অধিকতর সুখী হইয়াছি।

রামবসুর বিরহ।

রাম বসুর বিরহসংগীত বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র খ্যাত। জানা শুনা লোকের মধ্যে বিরহ-সংগীতের কথা উঠিলেই রাম বসুর নাম হয়। রাম বসুর নাম এ প্রকার প্রসিদ্ধ হ-ইবার উপযুক্তও বটে। রাম্সুনৃসিংহ, হরু ঠাকুর, নিত্যানন্দ বৈরাগী, কৃষ্ণচন্দ্র চর্ম্ম-কার (কেষ্টা মুচি), লালু নন্দলাল, নীলমণি পুটুনি, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, সাতু রায় প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবিওয়ালাদিগের যত সংগীত আমরা অবগত আছি, তন্মধ্যে রাম বসুর গানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া আমা-দের বোধ হয়। ইহাঁর গানের ভাব যেমন স্বাভাবিক,সময়োপযোগী এবং সুন্দর, শব্দ-বিন্যাসও তেমনি প্রাঞ্জল, সুকৌশলসম্পন্ন, সুতরাং পরিপাটী ও মনোহর। কিন্তু দুঃ-খের বিষয়—লজ্জার বিষয়ও বটে—দুঃখের বিষয় এই যে, রাম বসুর নাম যত লোকে জানে, তাঁহার পনর আনা লোকই বোধ হয়, রাম বসুর একটি গানও কখন কর্ণে শুনে নাই বা চক্ষে দেখে নাই। দুই চারি জন বোধ হয় দুই একটা গানের দুই চারি ছত্র অবগত আছেন। এই সকল লোকের মুখে রাম বসুর যে প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীনদিগের প্রশংসার প্রতি-ধ্বনি মাত্র।

রাম বসু যে কেবল বিরহসংগীতই র-চনা করিয়াছিলেন, এরূপ নহে। তাঁহার রচিত আগমনী এবং সখিসংবাদও অনেক আছে। কিন্তু বিরহের জন্যই ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধ। বাস্তবিকও ইহাঁর বিরহসংগীতগুলি যেমন মনোহর, অন্যবিধ গান তেমন নহে। এই স্থলে ইহাও বলিতে হয় যে, বিরহসং-গীতেরও সকলগুলি সমান নহে। দুই এ-কটা এমনও আছে যে, তাহা রাম বসুর র-চিত বলিতে দুঃখ বোধ হয়, লজ্জা করে। কিন্তু ইহাও বিবেচ্য যে, আকাশের সকল নক্ষত্রই কিছু শুকতারা নহে, কাননের স-কল কুসুমই কিছু কানন আলো করে না, সরভাণ্টিসের সকল গ্রন্থই কিছু ‘ ডন্ কুই-ক্সোট্ ’ নহে, শেক্ষপীয়রেরও সকল নাটক কিছু হ্যাম্লেট্, ওথেলো নহে। সাধারণ কথায় বলে, হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান হয় না।

রাম বসুর গানের ভাব ও শব্দবিন্যাস-কৌশল, উভয়েরই আমরা প্রশংসা করি-য়াছি। মোটামুটি এরূপ প্রশংসা করা যায়। কিন্তু আঁটাআঁটি করিয়া ধরিয়া সূক্ষ্ম সমা-লোচনা করিতে গেলে বলিতে হয় যে, ই-হাঁর ভাবপারিপাট্য অপেক্ষা রচনাচাতুর্য্য অধিকতর জাজ্বল্যমান—ভাবুকতা অপেক্ষা মুন্সিগিরি অধিক—কথার বাঁধনি, কথার গাঁথনি যেমন, ভাবের মনোহারিতা, ভা-বের চমৎকারিতা তদ্রূপ নহে। সুতরাং ইহাঁর বিরহিণীদিগের বিরহসংগীত শুনিয়া

'বাহবা' দিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু 'আহা' কথাটা মুখে আসে না, মনেও আসে না।

রাম বসুর বিরহসংগীতে যেরূপ বিরহের বর্ণনা, তাহাকে আমরা বিরহ না বলিলেও না বলিতে পারি। এ বিরহ, না প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের বিরহ, না অধুনাতন নাটকোপন্যাসলেখকদিগের বিরহ। ইহাতে ব্যাকুলতা নাই, আত্মবিস্মৃতি নাই, স্মৃতি-দংশন নাই, মর্ম্মদাহ নাই, তন্ময়ত্ব নাই। ইহাতে হাহাকার নাই, চক্ষের জল নাই, ভূপতন নাই, মূর্চ্ছা নাই, মৃত্যু নাই। আছে কেবল প্রগল্‌ভার বাক্‌চাতুরী। তীব্র ব্যঙ্গ এবং অগ্নিময় শ্লেষ ইহার প্রাণ। ইহার নায়িকারা—নায়কের উক্তি বিরহ বড় বিরল—বিরহপীড়িতা হইয়া উষ্ণনিশ্বাসে এবং উষ্ণতর অশ্রুপাতে প্রেমতর্পণ করেন না; নায়কের দেখা পাইলে বাক্যবিষে তাঁহাকে দগ্ধ করেন। যখন বিরস, মলিন মুখে আপনার হৃদ্গত দুঃখের কথা ব্যক্ত করেন, তখনও যেন নয়নপ্রান্তে শ্লেষপরায়ণার ঈষৎ তীব্র হাসি, আকাশপ্রান্তে ক্ষীণ বিদ্যুতের ন্যায়, খেলিতে থাকে—বিদ্যুতের ন্যায়, সে ক্ষীণ হাসিরও দাহিকা শক্তি আছে। যখন বহুদিনের অদর্শনের পর দৈবযোগে বাঞ্ছিতের দেখা পাইয়া প্রেমতৃষ্ণা নিবারণের জন্য মিনতি করিয়া বলেন—

"দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ, হলো
এ পথে আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা, তোল
ও বিধু বদন॥"

তখনও সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ—

"পিরীত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি, এমনতো প্রেমভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি।„

আমরা বলি, ইহার অপেক্ষা দু ঘা মারা বরং ভাল।

এই সকল বিরহসংগীতে যে প্রকার প্রেম পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা প্রেমের আদর্শ নহে, কেন না তাহা পবিত্র নহে। ইহার অধিকাংশ নায়িকাই পরকীয়া নায়িকা, সুতরাং ইহাদিগের প্রেম আত্মবিসর্জ্জনে পরাঙ্মুখ, আত্মোৎসর্গে কুণ্ঠিত, ভোগবিলাসকলুষিত, আত্মসুখান্বেষণে অপবিত্র। যে দুই একটি গানের নায়িকা পরকীয়া নহেন, তাঁহাদেরও তাই। ইহাঁদের যত জ্বালা, কেবল যৌবনজনিত, বসন্তজনিত, স্মরশরজনিত। ইহাঁদের দুঃখ—

"যৌবন রসের, ভার অতি ভার,
নারী নারি আর বহিতে।"

ইহাঁদের দুঃখ—

"যৌবন জনমের মত যায়,
সে তো আসাপথ নাহি চায়।"

ইহাঁদের অনুযোগ—

"একে আমার এ যৌবন কাল, তাহে
কাল বসন্ত এলো।
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেল॥"

তাই বলিতেছিলাম যে ইহা প্রেমের উচ্চ আদর্শ নহে। যে প্রেম আত্মনিগ্রহরত, আত্মবিস্মৃত, ইহা সে প্রেম নহে। যে প্রেমে মনুষ্য আত্মসুখদুঃখ ভুলিয়া যায়, জগৎসংসার ভুলিয়া যায়, আপনাকে আপনি ভুলিয়া যায়, ইহা সে প্রেম নহে। যে প্রেম প্রলোভনে পরীক্ষিত, দুঃখে দৃঢ়ীকৃত, অদর্শনে অবিচলিত, অনাদরে অক্ষুণ্ণ এবং কালস্রোতে অপরিশ্রান্ত, ইহা সে প্রেম নহে।

যে প্রেম আত্মায় আত্মায় হৃদয়ে হৃদয়ে, যে প্রেমের সৌরভ বৈকুণ্ঠধাম পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, যে প্রেমে মানুষকে দেবতা করে, ইহা সে প্রেম নহে। যে প্রেমে "গুরুজনা গঞ্জনা" দেয়, প্রতিবাসী প্রতিবাদী হয়, লোকে ছি ছি করে, ইহা সেই প্রেম। যাহাতে কলঙ্ক আছে, লুকাচুরি আছে, অনুতাপ আছে, অধর্ম্ম আছে, ইহা সেই প্রেম। ইন্দ্রিয়লালসাতেই যাহার উৎপত্তি এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতেই যাহার পরিসমাপ্তি, ইহা সেই প্রেম—কেবল রক্তমাংসের প্রেম।

কাজেই প্রেম অতি সামান্য। ইহার দায়ে নায়িকা কখন আত্মবিস্মৃত হয়েন না। যখন বড় দুঃখে কাতর, তখনও আপন ক্ষতিলাভ গণনায় রত, ক্ষতিলাভ গণনায় অভ্রান্ত। যখন প্রণয়পাত্র প্রবাসে যাইতেছেন, তখনও লোকের কথার ভয়ে তাঁহাকে মর্ম্মকথা বলা হইতেছে না—

"যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে।"

ভোগলালসাকলুষিত বলিয়া এ প্রণয় বড় স্বার্থপর। আপন সুখসম্ভোগের জন্য প্রণয়পাত্রের প্রাণে কষ্ট দিতেও কুণ্ঠিত নহে। তাঁহার মনোবেদনাতেই যদি বাসনাসিদ্ধির উপায় হয়, তবে তাহাতেও রাজি। নায়িকা বিরহসন্তপ্তা হইয়া বিচ্ছেদকে উদ্দেশ করিয়া গাইতেছে—

"যাও প্রাণনাথের কাছে বিচ্ছেদ একবার।
যাতে বদ্ধ আছে বঁধুর প্রাণ,
হান গে তায় বিচ্ছেদ বাণ;
যদি জ্বালায় জ্বলে আমায় ব'লে মনে পড়ে
তার।"

আবার,—

"বিচ্ছেদ ব্যথার ব্যথা কিছু তায় দিও বিশেষে।
নারীর প্রাণে কত ব্যথা জানে যেন সে।"

ইহা প্রকৃত ভালবাসার ভাষা নহে। যথার্থ প্রেমানুরাগ যাহার মনে আছে, সে প্রাণান্তেও এমন কামনা করিতে পারে না। প্রকৃত প্রেম, প্রণয়পাত্রের অতি সামান্য ক্লেশ নিবারণের জন্যও আপনার বুক চিরিয়া বুকের রক্ত দিতে অগ্রসর হইবে, বাঞ্ছিতকে সুখী করিবার জন্য আপন হাতে আপনার হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া দিতে প্রস্তুত থাকিবে; তাহা কখন আপনার কষ্ট নিবারণের জন্য প্রীতিপাত্রের মনে 'বিশেষ ব্যথা' দিতে চাহিবে না। এই বিরহিণী প্রকৃত প্রেমশালিনী হইলে গাইতেন—

আমার মনোবেদনা কভু শুনা'ওনা তায়।
শুনিলে আমার দুঃখ, সে পাছে বেদনা পায়।
না বাসে না বাসে ভাল, ভাল থাকে সেই ভাল
শুনিয়া তার মঙ্গল তবু ত প্রাণ জুড়ায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এপ্রকার, উচ্চ প্রেমের ভাব রাম বসুর বিরহ সংগীতে নাই। যাহা বলিয়াছি তাই—আধ্যাত্মিকতার অভাবই এই সকল প্রেম-সংগীতের প্রধান দোষ। ইন্দ্রিয় লালসার আধিক্যই ইহাদের প্রধান কলঙ্ক।

কিন্তু একটি কথা আছে। প্রত্যেক মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও রুচি অনেকটা সমসাময়িক সামাজিক অবস্থানুসারে গঠিত হয়। কার্লাইল এক স্থলে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্যকলাপের জন্য সেই ব্যক্তি যতটা দায়ী, সমাজ তদপেক্ষা অধিকতর দায়ী। ইহা সত্য। এ জগতে কেহ একা নহে,

কেহই অন্যনিরপেক্ষ নহে—পরস্পরনির্ভর, পরস্পরাবলম্বন মনুষ্যের জীবন। এ পৃথিবীতে আসিতে হয় পরের উপর নির্ভর করিয়া, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হয় পরের হাত ধরিয়া, থাকিতে হয় পরকে অবলম্বন করিয়া। আমাদের দৈনন্দিন অভাবের নিরাকৃতি পরের সাহায্যে; আমাদের উচ্চতম প্রবৃত্তি সকলের তৃপ্তি পরের সাহচর্য্যে। পর হইতে জন্ম, পর হইতে অন্ন, পর হইতে শিক্ষাপর হইতে খ্যাতি—পরের হাতে মান, পরের হাতে মর্য্যাদা। পরকে সঙ্গী না করিলে সুখভোগে সুখ হয় না; পরে ভাগ না লইলে দুঃখভার লঘু হয় না—পরের মুখের হাসিতে অন্তরাত্মা আনন্দে উৎফুল্ল, পরের চোখের জলে হৃদয় বিষাদে অবসন্ন। পরের সঙ্গে যখন এতটা ঘনিষ্ঠতা, পরের উপর যখন এতটা নির্ভর, তখন পরের প্রভাব কেমন করিয়া এড়াইতে পারা যায়? তাহা হইবার নহে—এ মরভুবনে, এ জীবনধারণে তাহা অনতিক্রম্য। জন্মাবধি যে ছায়াতলে বিশ্রাম করিয়া শক্তিসংগ্রহ করিয়াছি, যে বাতাতপে জীবনী লাভ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার প্রভাব অস্থিমজ্জাশোণিতের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে—জীবনের অংশীভূত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য বলিতেছিলাম যে, মনুষ্যের রুচি, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি অনেকটা তৎকালবর্ত্তমান সামাজিক সংস্থানের প্রতিকৃতি মাত্র। কালের অনভিভবনীয় মাহাত্ম্য প্রতিভার দুর্দম স্বানুবর্ত্তিতাকে পর্য্যন্ত আপন বর্ণে রঞ্জিত করিয়া লয়—মনুষ্য কালের ক্রীড়নক, কালের ছায়া। এক্ষণে, আমরা যদি এই তত্ত্বের আলোকে সমালোচ্য সংগীতনিচয়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে রচয়িতাকে বোধ হয় আরোপিত কলঙ্কভার হইতে অনেকটা মুক্তি দেওয়া যায়।

কারণ সকল নির্দ্দেশ করিবার এ স্থান নহে, কিন্তু আমাদের জাতীয় প্রকৃতিতে ভোগ বিলাসের ভাব যে অত্যন্ত প্রবল, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবে না। বকল্ সাহেবের গ্রন্থের সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের জন্য কারণ নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজনও বোধ হয় নাই। বিলাসের ভাব এতই প্রবল, যে উহা সর্ব্বত্রই প্রবেশ করিয়াছিল, সকল বিষয়কেই স্পর্শ করিয়াছিল। পূজ্যপাদ বৃদ্ধ ঋষি ভক্তিরসে ভোর হইয়া গঙ্গার স্তব করিলেন, তাহাতেও একটু চন্দনের ছিটা না দিয়া থাকিতে পারিলেন না—তাহার মধ্যেও 'বসুধা শৃঙ্গার হারাবলী।' তার পর, এই বহুবিবাহ-প্রচলিত দেশে, যৌনসাহচর্য্য বিষয়ে দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠার ভাব কাজেই অত্যন্ত দুর্ব্বল। আজ কাল যে আমরা প্রেমের পবিত্রতা ও একনিষ্ঠতার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছি, সে প্লেটো এবং কোম্তের প্রসাদাৎ—তাহাতে আমাদের জাতীয় গৌরব কিছু নাই। ইহার উপর বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরকীয়া নায়িকাকে প্রাধান্য দিয়া সোণায় সোহাগা সংযোগ করিল। একে মনসা, তায় ধুনার গন্ধ—বাঙ্গালি আপন আপন অভিধানে লিখিল, যে আপন স্ত্রীকে ভাল বাসিবে সে স্ত্রৈণ, যে পরের স্ত্রীকে ভাল বাসিবে সেই প্রেমিক। ইহার উপর মুসলমান আপন দৃষ্টান্ত চক্ষের উপর ধরিয়া ষোল কলা সম্পূর্ণ করিলেন। সেই সময়ে

এই সকল সংগীত রচিত হইল। রাম বসু যে সময়ের লোক, তখন বঙ্গদেশে মুসলমানের একাধিপত্য। এবং বাঙ্গালি অন্ধ অনুবর্ত্তিতায় তুলনারহিত। বাল্যকালে কাহিনীতে শুনিয়াছিলাম—রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘সিদ্ধির ঝুলি তুমি কার?’ ঝুলি বলিল ‘যখন যার কাছে থাকি, তখন তার।’ বাঙ্গালির প্রকৃতি এই ঝুলির মত—যখন যার কাছে থাকে, তখন তার। বহুরূপীর ন্যায়, যখন যে সাহচর্য্যে থাকে, তখন সেই বর্ণ ধারণ করে। এই কারণে, সে সময়ের বঙ্গসমাজের রুচি মুসলমানের আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। এখনকার বাঙ্গালি যেমন ইংরেজের কাছে কোট্ পেণ্টুলন পরিতে, চপ্ কট্‌লেট খাইতে শিখিয়াছে; তখন তেমনি মুসলমানের কাছে ইজার চাপ্‌কান পরিতে, কোর্মা কাবাব্ খাইতে শিখিয়াছিল। আজ যেমন ইংরেজের দেখা দেখি এই সাত শত বৎসরের দাসজাতি রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইতেছে, তখন তেমনি মুসলমানের দেখা দেখি ‘দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা’ বলিয়া বিধর্ম্মী অত্যাচারীর পদতলে তটস্থ হইয়া মস্তক নত করিয়াছে। আবার বাঙ্গালি, যখন যাহা করে, তাহাতেই কিছু বাড়াবাড়ি করে। আজ ইংরেজের মন্ত্রশিষ্য হইয়া যে বাঙ্গালি স্ত্রীকে দেবতা বলিয়া জানিয়াছে এবং দাম্পত্য প্রণয়ের পবিত্রতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে শিখিয়াছে, তখন সেই বাঙ্গালিই মুসলমানের চেলা হইয়া শিখিয়াছিল যে, স্ত্রীলোক বিলাসের উপকরণ বা সন্তান প্রসবের যন্ত্র মাত্র—শিখিয়াছিল যে, বাবু হইতে হইলেই দুই একটা বেশ্যা রাখিতে হয়। এইরূপ সামাজিক অবস্থায় রাম বসুর আবির্ভাব। সুতরাং তাঁহার প্রেম-সংগীতের যাহা কিছু কলঙ্ক আছে, তাহার নিন্দার ভাগী একা তিনি নহেন—সে সময়ের সমাজকেও খানিকটা দিতে হইবে। এইরূপ সময়ে, এইরূপ সমাজে বর্ত্তমান থাকিয়াও রাম বসু যে সকল প্রেমসংগীত রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যেও যে আমরা দুই এক স্থলে উচ্চ প্রেমের আত্মবিসর্জ্জন ও আত্মবিস্মৃতির ভাব দেখিতে পাই, তজ্জন্য আমরা সহস্র মুখে তাঁহার প্রশংসা করি। ধর্ম্মনীতি ছাড়িয়া দিয়া, কেবল সাহিত্য বলিয়া বিচার করিলে, এই সকল সংগীতকে অতি সুন্দর বলিতে হয়। এমন সুন্দর রচনা কৌশল, এমন পরিপাটী কথা ও ভাবের গাঁথনি, প্রতারিত অনুরাগের সাভিমান অনুযোগ প্রকাশের এমন সুন্দর ভঙ্গী বাঙ্গালা সংগীতে বিরল। রাম বসুর নায়িকাদিগের আর যত দোষ থাক্, তাঁহারা সুরসিকা বটেন।

এক্ষণে আমরা রাম বসুর দুই চারিটা গান পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করিব।

মহড়া।

যৌবন জনমের মত যায়।
সে তো আসা পথ নাহি চায়॥
কি দিয়া গো প্রাণ সখি, রাখিব উহায়॥
জীবন যৌবন গেলে আর;
ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার;
বাঁচিতো বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায়॥

চিতেন।

গেল গেল এ বসন্ত কাল, আসিবে তৎকাল;

কালে হলো কাল এ যৌবন কাল,
কাল পূর্ণ হলে রবে না,
প্রবোধে প্রবোধ মানে না।
আমি যেন রহিলাম তার আসার আশায়॥

অন্তরা।

হায় ষোল কলা পূর্ণ হলো যৌবনে আমার,
দিনে দিনে ক্ষয় হয়ে বিফলেতে যায়।

অন্তরা।

কৃষ্ণ পক্ষ প্রতিপদে হয় শশিকলা ক্ষয়।
শুক্ল পক্ষ হয়, পুনঃ পূর্ণোদয়।
যুবতীর যৌবন হলে ক্ষয়,
কোটি কল্পে পুনঃ নাহি হয়;
যে যাবে সে যাবে হবে অগস্ত্য গমন প্রায়।

মহড়া।

প্রাণ বলো না প্রাণ।
ছি ছি হাস্‌বে লোকে; আমার পাকে,
হবে শেষে অপমান।
যারে প্রাণ সঁপেছ, সেই প্রাণ,
আমায় করে অন্তরের অন্তর, যারে অন্তরে দিয়েছ স্থান।

চিতেন।

নূতন যারা, তোমার তারা নয়নের তারা।
যে জন স্থূলে ভুল, দুটি আঁখির শূল,
কেন তায় আদর করা?
ত্যজ্য ধনের বাড়ায়ে সম্মান, কর পূজ্যধনের অপমান।

অন্তরা।

কথায় তব নব ভাব, যারে প্রাণ বল, তার সুখ;
আমায় কেন, বলে প্রাণ, বাড়াও দ্বিগুণ দুঃখ?

চিতেন।

ভেবেছিলাম প্রাণের প্রাণ, গিয়াছে সে দিন।
এখন হলেম প্রাণ, তোমার কথার প্রাণ,
কিন্তু কর্ম্মে ফল হীন।
চোখের দেখা, মুখের আলাপন,
হলো সেই লক্ষ লাভ জ্ঞান।

মহড়া।

মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি,
বলা হলো না।
শরমে মরম কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে।
সখি ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে
নারী জনম যেন করে না।

চিতেন।

একে আমার এ যৌবন কাল, তাহে কাল বসন্ত এলো।
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেল।
যখন হাসি হাসি সে আসি বলে,
সে হাসি দেখে ভাসি নয়নের জলে;
তারে পারি কি ছেড়েদিতে, মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ধরো না।

অন্তরা।

তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে, কাঁদিলাম স্বজনি;
অনা(য়া)সে প্রবাসে গেল সে গুণমণি।
একি সখি হলো বিপরীত, রেখে
লজ্জার সম্মান,
মদন দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ;
যদি সে হলো নিদয়, লইল বিদায়,
তবে যেন সখি প্রাণও রহে না।

মহড়া।

দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ, বদন ঢেকে যেও না।

তোমায় ভাল বাসি তাই, চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছু থাক থাক বোলে ধরে রাখব না।
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল।
সদা রাগে কর ভর, আমিত ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।

চিতেন।

দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ হলে এ পথে আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা, তোল ও বিধুবদন।
পিরীত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি,
এমন ত প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি।
আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হোল বিমুখ,
আমি সাগর সেঁচে কিছু মাণিক পাব না।

(অসম্পূর্ণ)

মহড়া।

বল কার অনুরোধে ছিলে প্রাণ।
ছিলে আমার বশ, কি যৌবনের বশ,
কি প্রেমের বশে, প্রেম রসে তুষতে প্রাণ,—
রাখিতে হে অধিনীর সম্মান।
অভিমানী হতেম হে তোমায়,
প্রাণনাথ কার সোহাগে, অনুরাগে,
ধরতে আমার পায়।
তুমি আমি যে সেই আছি,
তবে কিসে গেল সে সম্মান।

চিতেন।

আবাহন করে প্রেম দিলে বিসর্জ্জন।
সে যেমন হোক্, হয়েছে,
আমার কপালে ছিল হে যেমন।
রঙ্গ রসে ছিলাম এত দিন,
প্রাণ নাথ, প্রেমের পথে, দুজনাতে কে কার অধীন।
শেষে যদি কর্‌বে এমন, কেন আগে বাড়াইলে মান।

অন্তরা।

ওরে প্রাণ, কথা কবার নয়, কইতে ফাটে হিয়া।
পূজ্য ছিলাম, ত্যজ্য হলাম, যৌবন গিয়া।

চিতেন।

দৈব দেখা প্রাণনাথ হতো হে পথে;
আপনা আপনি ভুলিতে, হাতে আকাশের চন্দ্র পেতে।
এখন ত সেই পথের দেখা হয়;
প্রাণনাথ লজ্জাতে মুখ ঢাক যেন ঠেকেছ কি দায়।
প্রেম গেছে, যৌবন গেছে, শেষে তুমি করিলে প্রস্থান।

আরও দুই চারিটা গান উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্থানাভাব।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

তর্কদর্শন

১। তর্কদর্শনে ফল কি?

যাহার প্রতি কোন কথা প্রয়োগ করিবামাত্র, যে দেখিলে তখনই তাহার ভালমন্দ বিচারে তোমাকে সাধুবাদ বা তদন্যতর প্রদানে উদ্যত হইল; নিশ্চয় জানিও, তাহার কাছে তোমার কথিত কথার উদ্দেশ্য পূরণ সেই পর্য্যন্তই শেষ। আর যে দেখিবে, স্থিরভাবে শুনিয়া ভালমন্দ বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া চুপ করিয়া রহিল, সেই খানেই জানিবে শুভলক্ষণ; ইচ্ছা করিলে স্বচ্ছন্দে সার্থকতার প্রত্যাশায় প্রত্যাশাবান্ হইতে পার। এ বঙ্গক্ষেত্রে আমার সে প্রত্যাশার স্থান অতি অল্প। অন্য শ্রোতায় দণ্ডবৎ। আইস বাঞ্ছারাম, তোমায় আমায়, আমাদিগের নিত্য প্রথা অনুসারে, আপনা আপনির মধ্যে কিঞ্চিৎ সদালাপ করা যাউক। অদ্যকার সদালাপ তোমার অষ্টপ্রহরি তর্ক-বিঘূর্ণন লইয়া।

বাঞ্ছারাম, তুমি শিষ্ট সভ্য এবং বিদ্বান্; তুমি দেশমান্য, ঘাসছোলা হইতে ঠাকুরপূজা পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই তোমার ছাপি নাই। বয়সের ভাল অর্দ্ধেক পার হইয়াছে, অকর্ম্মা অর্দ্ধেক বাঁকি। কিন্তু বলিতে পার, এই দীর্ঘকাল ধরিয়া তোমার তরবতর জীবন কার্য্যে কতটুকুতে তর্কদর্শনের প্রয়োজন, বা কতটুকু তর্ক-উপপাদ্য হইয়া সম্পন্ন হইয়াছে? ষড়দর্শনে তুমি সরস্বতী, তোমার কণ্ঠে কোম্‌তে, জিহ্বাগ্রে হামিল্টন, ললাটে বেন্থাম, এবং মিল তোমার শিরোভূষণ। বলিতে পার, ইহাদের কোন্ টুকু কবে তোমার কাজে লাগিয়াছে? তুমি যদি আইনজ্ঞ হও, তাহা হইলে তোমার উপর আমার কথা নাই, যেহেতু সে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন ব্যাপার মধ্যে আমাদিগের ন্যায় সামান্য প্রাণীর প্রবেশাধিকার নিষেধ। যদি লোকের সর্ব্বনাশে আত্ম পক্ষ পোষণের জন্য কখন যত্নবান্ হইয়া থাক; তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, তোমার জীবনে অনেক তর্কের প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফল? তোমার ফল এখনও ফলে নাই, সুতরাং আত্মদৃষ্টে বুঝিতে পারিবে না; অন্য কোন তথাপ্রকৃতি ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ।

তথাপি এই দর্শন, এই তর্কশক্তিতে কিছু মোহিনী শক্তি আছে তাহাতে সন্দেহ নাই; নতুবা নব্যজগত কি কারণে আপনাপনি গলা বাড়াইয়া এই দেবমন্দিরে বলি হইবার জন্য আগ্রহ পূর্ব্বক আসিয়া থাকে? পতঙ্গের নিকট আলোকের যে মোহিনী শক্তি, নব্যজগতের নিকট তর্কদর্শনেরও তাহাই। পতঙ্গও মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আলোকে পুড়িয়া মরে, অপরিণামদর্শী নব্যজগৎও তর্কদর্শনের নিকট আত্ম

বলিদান দিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের নিকট যে কোন কথা, বা যে কোন পদার্থের উপস্থিতি হইবে, অমনি উদ্যত "আইস তর্ক করিয়া দেখি।" ইহাদিগের মতে তর্কদর্শনই সমুদয়ের মূল; ইহারই উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ, এবং অতীত কালের স্থিতি; ইহারই উপরে বিশ্বসংসারের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অবস্থিতি; ইহারই সাহায্যে নবজ্ঞানের উদ্ভব; ইহারই সাহায্যে নববস্তুর আবিষ্ক্রিয়া; অধিক কথা কি, ইহারই কল্যাণে ঈশ্বরের পর্য্যন্ত অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সাব্যস্ত। ইহাঁদিগের সমগ্র জ্ঞানজীবনই একমাত্র উপনয় প্রণালীর উপরে উপস্থাপিত; এবং যে কিছু জ্ঞান তর্কদর্শন-পরিমাণে অসিদ্ধ বা দুষ্ট, তাহা নিঃসন্দেহচিত্তে পরিত্যাজিত। তর্কদর্শনের এই সর্ব্বশক্তিমত্তা হেতুই, ইহাদিগের সঙ্গে আমার এই কন্দল।

তর্কদর্শনের এই অযথা অনুসরণে কি অনিষ্টই না উৎপন্ন করিয়াছে, এবং করিতেছে। একদা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রসঙ্গে, একজন আধুনিক বিদ্বান্‌কে বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কুসংস্কার বহুকাল হইল চুকিয়া গিয়াছে। কেন চুকিয়া গেল? ভূমিকম্প হইল না, পর্ব্বত উড়িল না, সমুদ্র শুকাইল না, শব্দটি পর্য্যন্ত হইল না, অথচ এমন দুরন্ত, আদি পিতামাতা হইতে পিতৃ পৈতৃকাদি করিয়া কালপরম্পরা আগত চিরনিহিত কুসংস্কার, ভালয় ভালয়, সহজে সহজে, ভাঙ্গিয়া গেল? কি আশ্চর্য্য! আমরাত আমাদিগের 'নবমীতে লাউ খাইতে নাই,' এই সামান্য কুসংস্কারটা, এতকাল ধরিয়া, এতযত্নে, উহাপেক্ষা লক্ষগুণ অদ্ভুতপাত সহিয়াও, কোন মতে তাড়াইতে পারিলাম না! তখন এ দুরন্ত কুসংস্কার এত শীঘ্র ভাঙ্গিবার কারণ? উত্তরে শুনিলাম,—বিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্র পাঠারম্ভের দিন হইতে সে সব তর্ক মীমাংসিত, এবং সে কুসংস্কার দূরীভূত হইয়াছে! আগে জানিতাম ঈশ্বর মহান্, অন্ততঃ ঈশ্বর না হউন, প্রকৃতি মহতী; কিন্তু এখন জানিলাম যে বালকদিগের পাঠ্যদর্শন-লেখকগণ মহত্তর। বরং কদলিদগ্ধ প্রক্রিয়ায় কিছু গোলযোগ আছে, তথাপি বিশ্বরচন প্রক্রিয়ায় কিছুমাত্র নাই; হয় না হয়, আমাদিগের তর্ক-চস্‌মায় একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ।—ইহার পরত ঈশ্বর-নিরূপণ অতি সহজ ব্যাপার!

আশ্চর্য্য! বাঞ্ছারাম, ঐ যে জগতের যাবতীয় দর্শনশাস্ত্রের দার্শনিকগণ, স্ব স্ব দর্শনহস্তে, আমারই দর্শন সত্য বলিয়া পরস্পর ঘোরতর কন্দল আরম্ভ করিয়াছে, এবং পরস্পর পরস্পরকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে; ঐ যে বৈদান্তিক তাহা দেখিয়া রাগে ফুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—"কিছু নয়, কিছু নয়, তোমাদিগের ওসব ছায়াবাজি, সব মায়া, কেবল অবিদ্যা;" ওদিকে আবার তাহা শুনিয়া অমনি যে ঐ বিজ্ঞানভিক্ষু তাহার টিকি টানিয়া সরোষে বলিতেছে—"চুপ বিট্‌লে, বলিস্ কি? 'নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনা বন্ধা যোগাৎ।'" বলিতে পার, ইহাদিগের মধ্যে কাহার কথা সত্য? ইহাদিগের আত্মতত্ত্ব,

আত্মজ্ঞান বা দর্শন, অথবা ইহাদের অবলম্বিত তর্কদর্শন, যাহাতেই হউক, অবশ্যই কোথাও দৃষ্টিরোধ এবং তথায় সত্যের অভাব আছে, নতুবা পরস্পরে এত গোলমাল, এত বিরোধের সম্ভাবনা কোথায়? যাহা সত্যে উদ্ভাবিত, সত্যে গঠিত, সত্যে পোষিত, এবং সত্যে গৃহীত, তাহা প্রত্যেকে বিভিন্নরূপ হইলেও পরস্পর সামঞ্জস্যসাধক ও বিরোধ-শূন্য, এবং তাহার সমষ্টি বিশ্বাবলম্বন মহাসত্যের পরিপোষক। কিন্তু এখানেত তাহার ছায়ামাত্রও দেখিতে পাই না। কি আক্ষেপ, এতকাল ধরিয়া, এত দার্শনিকের মুণ্ড একত্র হইয়াও দার্শনিকদলের মধ্যে এ গোলমাল, এ বিরোধ একটুও সাম্য করিতে পারিল না। এত কাল ধরিয়া এত দর্শনের সৃষ্টি হইল, এবং প্রতিবারেই প্রতি দর্শনের সমকালিকেরা ভাবিল যে, এইবারেই জ্ঞান আবিষ্কারের চূড়ান্ত হইল; কিন্তু তথাপি দেখা যাইতেছে যে, যেমন তাহারা একে একে উদ্ভব হইয়াছে, তেমনই ক্ষণেক গণ্ডগোল বাধাইয়া আবার তাহারা কাল পরিবর্ত্তনে একে একে বিচ্যুত, বিদূরিত, বা পশ্চাতে পড়িয়া বিস্মৃতি মগ্ন হইয়াছে। কেন? ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? না দেখিয়া থাক ত দেখিও।

মানব, এই সৃষ্টিমধ্যে তুমি যখন সহায়শূন্য, সঙ্গিশূন্য, আহারসাপেক্ষ, পরশক্তিসাপেক্ষ হইয়া প্রেরিত হইয়াছ; তখন মনে করিও না যে তুমি এই সৃষ্টি লইয়া ডিক্রি ডিস্‌মিস্, ক্রীড়াকন্দুকে পরিণত করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছ। তাহা হইলে এমন দুর্দ্দশায় আসিবে কেন? আসিবার সময় তোমার সঙ্গে নাগরা নিশান আসা সোটা ছুটিত। তুমি একজন ক্ষুদ্রপ্রাণ কর্ম্মকারক মাত্র; কর্ম্ম করিতে আসিয়াছ, কর্ম্ম করাইতে আইস নাই। এই সৃষ্টি তোমার ক্রীড়নক, বা ডিক্রি ডিস্‌মিসের পদার্থ নহে, ইহা তোমার কর্ম্মক্ষেত্র। ইহাতে নিত্য অসংখ্য অভিনব ব্যাপার, যাহা প্রতিক্ষণে প্রত্যক্ষ করিতেছ; যাহা তোমার অনাকর্ষক দর্শনে অলক্ষিতভাবে চলিয়া যাইতেছে; তাহাদের কাহাকেই অগ্রাহ্য এবং সামান্য বলিয়া ভাবিও না, উহারা কেহই তোমার তুচ্ছ বা খেলার দ্রব্য নহে। প্রত্যেককে স্থির চক্ষে নিরীক্ষণ কর, নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে চেষ্টাকর;—কি কর্ম্ম করিতে তুমি এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছ তাহাই তথায় লিখিত আছে, চক্ষু খুলিয়া পড়িয়া লও। সভক্তি চিত্তে পড়িতে চেষ্টা করিও, সহজে পারিবে। খেলাইতে চেষ্টা করিও না, কোথায় পালাইবে; কেবল তাহার সারশূন্য ছায়াভিন্ন আর তাহাকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইবে না।

আধুনিক দর্শন ও দার্শনিক শিষ্যের উদ্দেশ্য, আত্ম কর্ত্তব্য বুঝিয়া লওন, বস্তুলাভে তদুদ্বোধন বা তন্নিরাকৃতিসাধন, বা পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানকে জ্ঞান-শৈলের উচ্চ শৃঙ্গারোহণহেতু সোপানশ্রেণি নিবন্ধন নহে। অনন্ত এবং অদৃষ্ট পদার্থের আয়ত্তীকরণ, এবং অজ্ঞাত জ্ঞানের অনুধাবন, ইহাই প্রধানতঃ প্রায় যাবতীয় দর্শন, অন্ততঃ দার্শনিক শিষ্যদের উদ্দেশ্য। এই জন্য ফলও এমন সুন্দর! পাঁচ টাকা করিয়া বনাতের

গজ হইলে, চারিগজ বনাতের মূল্য যদি কষিয়া বিশটাকা বাহির হইতে পারে; তবে ঈশ্বর থাকিলে, সৃষ্টি মূল থাকিলে, আত্মা থাকিলে, বা যে কোন অদৃষ্ট বা অনন্ত পদার্থ থাকিলে,কেন না তাহা বাহির হইবে? বিষয় গুরুতর হইলে হইতে পারে, কিন্তু প্রক্রিয়া যখন এক, এবং ত্রৈরাশিকের সাধন প্রণালীও যখন অভ্রান্ত, তখন সেই সঙ্কেতে এ বিষয়ও সাধিত না হইবে কেন? বাঞ্ছারাম, আমি তাহা জানি, কেবল ত্রৈরাশিক কেন, তুমি অন্বিত পঞ্চক পর্য্যন্ত কষিতে জান; কিন্তু ইহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ যে,এখানে উপপাদ্য সংখ্যা গণনায় অনন্ত! কই, তোমারও ত গতিশক্তি আছে, ঊর্দ্ধে যাইতে পার,অধোভাগে যাইতে পার, যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে যাইতে পার; ভাল, এখন একবার সেই গতি ধরিয়া চন্দ্রমণ্ডলে চল দেখি, তাহাও ত গতির কাজ! পারিবে না—কেন?—বাহ্যে গতি-সাদৃশ্য থাকিলেও, অভ্যন্তরে বহুবিধ অদৃষ্ট বাধায় প্রতিবন্ধিত। মূর্খ? এই অদৃষ্টবাধা তবে আর সর্ব্বত্র দেখিতে না পাও কেন? এবং আয়ত্ত করিতে, বিশ্বগ্রাসী দর্শন এবং তর্কবুদ্ধির আবশ্যক; আমাদিগের তাহা নাই। আমরা এক এক বিষয় এক এক বারে দেখিতে চাহিলে বোধ করি দেখিতে পাই, এবং তাহা বুঝিতেও সক্ষম হইতে পারি; কিন্তু একেবারে সমগ্রদর্শন, অথবা কাহাকেই একেবারে সগুণ আয়ত্তীকৃতি, আমাদিগের ভাগ্যে লেখা নাই।

তাহার পর তোমার বিজ্ঞান, যাহাকে আনুষ্ঠানিক সর্ব্বসাধক বলিয়া নিত্য নিরন্তর ভক্তিভরে পুজোপহার প্রদান করিয়া থাক, তাহাও তোমাকে এ অনন্ত জ্ঞানক্ষেত্রে অতি অল্পদূর মাত্রই লইয়া গিয়া থাকে। তোমার বিজ্ঞান কি?—আরও কিছু বেশি পরিমাণ অক্ষর পরিচয় মাত্র; অথবা তোমার খরজনিনাদী বৈজ্ঞানিক ভাষায়, পদার্থ পরম্পরায় মিশ্রণ-অমিশ্রণ গুণ পরিবোধন, কে বিধর্ম্মী কে সধর্ম্মী তত্ত্বদ্বোধন, এবং নামকরণ, ইত্যাদিতে প্রায় তোমার বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি। এবং ইহারই আবার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে আনতি, ঐ বিজ্ঞানের দৌড় এবং উন্নতি। আমি দেখিতেছি এই বিটপ-শিশু ত্বক্ এবং কাষ্ঠে নির্ম্মিত, এবং উহার শরীরাভ্যন্তরস্থ বৃক্ষরসে উহার পুষ্টি। তুমি দেখাইলে, কেবল তাহা নহে, এই এই বস্তু সংঘটনে ত্বক্, ইহাতে ইহাতে কাষ্ঠ নির্ম্মিত; এবং বৃক্ষরসে এই এই বস্তুর অস্তিত্ব হেতু উহা তাহার পরিপোষক; অথবা উহা হইতে আরও কিছুদূর সূক্ষ্মতরে চলিলে; কিন্তু অনন্ত পদার্থরূপের মধ্যে তাহা তোমাকে কতদূরই লইয়া যাইবে ভাবিয়াছ?

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ভল্লুক একদিন না খাইতে পাইলে মরিয়া যায়, আর উত্তর কেন্দ্রস্থ ভল্লুক বৎসরের তিনভাগ স্বচ্ছন্দে অনাহারে যাপন করিয়া থাকে; বলিতে পার কি জন্য? তুমি বলিবে এই এই জন্য; আবার জিজ্ঞাসা করি তোমার 'এই এই জন্যের' কারণভূত 'জন্য' পদার্থ কি, অথবা 'জন্য' পদার্থ কাহাকে বলে? ইহাই যখন আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তখন বিশ্বকার্য্য, বা কার্য্যমূল, কেমন করিয়া বু-

ঝিয়া আয়ত্ত করিব ?—যখন এই এক পৃথিবীর স্থান ভেদে এত প্রকরণ এবং নিয়মভেদ, তখন ঐ সীমাশূন্য গগণ-সাগরে যে অসংখ্য গোলকরাশি নিরন্তর ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহাতে আবার কত কি নূতন নিয়ম, কত কি অপরিচিত পদার্থ অবস্থান করিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে; আমাদিগের কল্পনারও তাহা অগোচর! অথবা আমরা যাহাকে নিয়ম বলিয়া থাকি, আমরা যাহাকে যাহা নাম দিয়াছি, তাহাই বা কি, তাহা কি আমরা জানি? আমরা যাহাকে যে নাম দিয়া ভাবিলাম তাহার উপর প্রভুত্ব করিতেছি, তাহাত কেবল কতকগুলি সংজ্ঞা মাত্র, পার্থক্য বিরোধক, এবং তাহা আবার আমাদিগেরই কর্ত্তৃক প্রদত্ত। তোমার সেই সংজ্ঞা গুলি থাকুক বা যাউক (তাহা একদিন যাইবেও) তাহাতে বিশ্বকার্য্য বড় একটা অপেক্ষা রাখে না; কিন্তু যদি কোন ঘটনা ক্রমে সেই সংজ্ঞারাশি সহসা একদিন উড়িয়া অদৃশ্য হয়, তাহা হইলে তোমার পক্ষে কি দুরন্ত বিপদ, তোমার দৃষ্টিতে সৃষ্টি মহাপ্রলয়ের আকার ধারণ করিয়া থাকে! অতএব উর্দ্ধ, অধঃ, পার্শ্ব, যে দিকেই দেখিতে যাও সেই দিকেই অপরিজ্ঞেয় সংসার, সেই দিকেই তুমি সামান্য প্রাণ এবং সামান্য শক্তি; যে দিকেই তুমি ভ্রাতৃসংমিলন এবং সৌজন্য ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রভুত্ব করিতে অগ্রসর, সেই দিকেই তোমার প্রভুত্বের উদ্দেশ্য পদার্থ আয়ত্তাতীত বিরাট দেহে, তোমাকে ছায়া-ক্রীড়নক দানে ভুলাইয়া, উপহাস করিতে থাকে।

ফলতঃ বিষয় যত উত্তর উত্তর উচ্চ হয়, ততই তাহা আমাদিগের আয়ত্ত, আমাদিগের কর্ত্তৃত্বের অতীত হইয়া থাকে। একজন একখানি ভাল রিপোর্ট লিখিল, তখনই তাহার ভালমন্দ বুঝিতে পারিলাম, এবং পুরস্কার স্বরূপ রিপোর্ট লেখকের আশার অতীত পদোন্নতিও করিয়া দিলাম। কিন্তু সেক্স্পিয়র যাহা লিখিল, তাহার ভালমন্দ বুঝিয়া পুরস্কার দেওয়া আমার সামর্থ্য হইল না। সে গরিব সন্তান এখনও সেই সং সাজিয়া, নাট্যালয়ে টিকিট বেচিয়া, উদর পোষণ করিতেছে। লোকে বলিতেছে লোকটা নকুলে বটে, নাটকের ছলে গল্পগুলি সাজায় মন্দ নয়! বাঞ্ছারাম, যে কোন সময়ের লোক-গৃহীত সমসাময়িক বড়লোকের ঘটা এবং উন্মাদনের ছটার প্রতি কি কখনও নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছ? সংবাদপত্র লেখক বড় লোক, ঘাট মাঠের বর্ণনা বা উপন্যাস লিখিয়া বড় লোক, বক্তৃতা করিয়া বড় লোক, সভা করিয়া বড় লোক, দারোগাগিরি করিয়া বড় লোক, টাকা দেখাইয়া বড় লোক, তাহার পর তোমার বঙ্গভূমির অভিনেতৃ (Leading men) বড় লোক, যে দিকে যাইবে সেই দিকেই বড় লোকের ছড়াছড়ি! ইহাঁরা 'দেশের মঙ্গল' সাধন করিয়া থাকেন, খবরদিয়া—বানরকীর্ত্তি দেখাইয়া—কথা শুনাইয়া—পোষাক দেখাইয়া—কুলি ধরিয়া—চাঁদা দিয়া—তাহার পর সাষ্টাঙ্গে সেলাম ঠুকিয়া! কিন্তু প্রকৃত বড় লোক, প্রকৃত মহৎ যে, যাহার কার্য্য যুগান্তস্থায়ী, সেও সেই তাহার সমসাময়িকের মধ্যে

প্রাদুর্ভূত হইয়া কার্য্য করিয়া যাইতেছে; কিন্তু সে সর্ব্বত্রই নিন্দা, ঘৃণা, বা উপহাসের পাত্র হইয়া থাকে। স্থিরবুদ্ধি সাময়িক বড় লোক সমক্ষে তাহাদের কথা বাতুলের প্রলাপ মধ্যে গণ্য; এবং আবশ্যক অনুসারে কখনও উপহসিত, কখনও উৎপীড়িত। নির্জ্জন কান্তারে মৎস্যজীবী লইয়া বিস্তর শিক্ষা প্রচার; এবং বিজন অরণ্যমধ্যে অশ্বত্থমূলে বুদ্ধের জ্ঞানঘোষণা, ধীর, নিস্তব্ধ, নির্জ্জনে নিষ্পাদিত; কিন্তু তথাপি যুগান্ত অতিক্রম করিয়া জীবন্ত মূর্ত্তিতে চলিয়া আসিতেছে। আর তোমার বড় লোকের বড় ঘোষণা গুরুধ্বনি কামান মুখে দিগন্ত ঘোষিত হইয়াও, মুহূর্ত্ত পরিবর্ত্তনে জলবুদ্বুদবৎ জলে মিশাইয়া যাইতেছে। আমাদিগের মহত্ত্ব অনুভব-শক্তি কি প্রচুর!

কপিল, গৌতম, এবং কোম্‌তে প্রভৃতি মণিহারির দোকান সদৃশ অসংখ্য দার্শনিকগণ, এতকাল ধরিয়া অনেক তর্কশাস্ত্র লিখিয়া, এবং অনেক তর্কশাস্ত্রের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। কেহ ঈশ্বরকে নির্ণয় করিয়াছেন, কেহবা অনির্ণয় করিয়াছেন; কেহবা বিশ্বমূল, লোক যাত্রা, লোকনীতি, সমাজনীতি, ইত্যাদি করতলস্থ করিয়া তুলিয়াছেন; কেহবা তাহাতে অপরিহার্য্য বিঘ্নবাধায় প্রতিবদ্ধ হইয়া, সকলই মায়া বা দৃশ্য মাত্র বলিয়া, হাসিয়া উড়াইয়া, আপন জ্যেষ্ঠত্ব স্থির রাখিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। মূল হইতে তর্ক তারে তারে বাঁধিয়া শেষে মীমাংসায় আসিয়া শেষ হইয়াছে; কোথাও ছিদ্র মাত্র পাইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ চূড়ান্ত, বুদ্ধিবিরোধ নিরশক জ্ঞান এবং জ্ঞানপন্থা আর কি হইতে পারে! কিন্তু তথাপি বলিতে পার, তাহাদিগের অনুগামী শিষ্য সংখ্যা কয়টি? কয়টি লোক জীবন মন বিক্রয় করিয়া তাহাদিগের অনুগামী হইয়াছে, এবং কয়টিলোক তাহাদের সত্যতা সাক্ষ্যে জীবন দানে, এবং জাগতিক লাঞ্ছন সহনে উদ্যত? কিন্তু এদিকে একজন অতার্কিক নব্যবয়স্ক যুবার প্রতি তাকাইয়া দেখ,—চৈতন্য দেব। বোধ করি এমন অতার্কিক মন আর হইতে নাই: তর্কের সকল সংস্রবশূন্য, কেবল একমাত্র সমগ্র সভক্তি চিত্ত এবং তদুদ্ভূত অনুরাগ মাত্র সার। এক হরিধ্বনি, হরিনাম মুখ, দিয়া বাহির হইল, আর দেশ শুদ্ধ পাগল হইয়া পিছু পিছু হরিনামের মোহে ছুটিল;—জাতিত্ব, জ্ঞাতিত্ব, পুত্রত্ব, সকল বিসর্জ্জন করিল, কেবল একমাত্র হরিনামের মোহে। কি আশ্চর্য্য! বাঞ্ছারাম, কোথায় গোপিনীমোহন ব্যভিচার-পরায়ণ, গোচারণ-বৃত্তি হরি, আর কোথায় তোমার তর্কসার, নিরাকার, উচ্চ নামধারি ঈশ্বর; তবু লোকে ঈশ্বর ছাড়িয়া সেই হরিতে মাতিয়া গেল।

বলিতে পার কেন? বলিতে পার বা না পার, এবং বুঝিতেও পার বা না পার, এই হরিনাম যতই হীন হউক, তথাপি তাহা জীবন্ত। আর তোমার তর্কসার ঈশ্বর যতই উচ্চ হউন, এখানে কেবল নাম মাত্র, জীবন্ত নহে, বর্ণমালার বর্ণযোজনা, শুষ্ক নীরস ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক

জন ভিক্ষুক আসিয়া তোমার নিকট আপন দুঃখ কত বাক্যকৌশলে বর্ণনা করিল, তুমি ভাবিলে বক্কেশ্বর বেটাকে তাড়াইতে পারিলে রক্ষা পাই; কিন্তু অমনি আর একজন ভিক্ষুক আসিয়া কেবল আপন অবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া এক ফোটা চখের জল ফেলিল, আর অমনি তুমি দ্রব হইলে, তাহার দুঃখে তোমার দুঃখ উপস্থিত হইল, তাহার দুঃখ মোচন করিতে তোমার চেষ্টার উদ্রেক হইল। কেন? প্রথমটি এত যুক্তিযুক্ত বাক্যকৌশল বিস্তার করিল, তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিলে না; আর এই দ্বিতীয়টির চখের জল মাত্র একফোটা দেখিয়া দ্রব হইয়া গেলে? আশ্চর্য্য! "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে", নতুবা কি গতজীবন শুষ্কদেহ মৈসরীয় 'সমীর'সঙ্গে তোমার সংমিলন হইতে পারে, না তাহা কখনও সম্ভবে? তুমি জীবন্ত, বিশেষ অনন্ত-উৎস-প্রসূত জীবনীতে তুমি জীবন্ত; সুতরাং কৃত্রিমজীবন, বা জীবনের সারশূন্য শুষ্ক ছায়ামাত্র, ঊর্দ্ধসংখ্যা পরিচর্য্যার্থে নিয়োজন ভিন্ন, তাহার সঙ্গে তোমার প্রগাঢ় আত্মীয়তা এবং সংমিলন কখনই সম্ভব হইতে পারে না। জীবন্ত জীবন্তে মিলিত হয়। যে কোন জীবন্ত মূর্ত্তি তোমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলে দেখিতে পাইবে যে, তোমার কিছু অনিচ্ছা থাকিলেও, তাহার উপর তোমার আত্মীয়তা ও সহানুভূতি কত দূর। ফলতঃ উহা যতই হীন হউক, তথাপি উহা তোমার স্বজাতীয়, —উহা জীবন্ত; সুতরাং কেমন করিয়া তাহার সংস্রব ছিন্ন করিবে? অনন্তসূত্রে যে সম্বন্ধ বর্দ্ধিত, তাহা তোমার আমার ছিন্ন করিবার শক্তি নাই। জীবন্ত এবং জীবন হীনে কখনও সংমিলন হয় না; এবং এই জন্যই লোকে তর্ক-উপপাদ্য জ্ঞানের সহ সহানুভূতিতে, সর্ব্বস্ব বা যে কোন বিষয় ত্যাগে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে।

তর্কদর্শনগ্রথিত যে জ্ঞান তাহা একমাত্র বিচারণা শক্তিকে আশ্রয়, এবং কেবল তাহাকেই যথাশক্তি কথঞ্চিৎ উদ্ভাবিত করিয়া থাকে। মানবীয় অপরাপর বৃত্তি ও শক্তিসমূহের উত্তেজন পক্ষে একেবারে সম্বন্ধশূন্য এবং আস্থাশূন্য; যেন ঐ ঐ বৃত্তি বা শক্তির মানবীয় মনঃক্ষেত্রে অস্তিত্বই নাই, এবম্প্রকার আচরণ করিয়া থাকে। সুতরাং জীবন্তভাব সংঘটন বা সমুৎপাদনের জন্য যতগুলি উপকরণের আবশ্যক, তাহা সমস্তই পরিত্যক্ত হইয়া একমাত্র বিচারণা শক্তিই সর্ব্বেসর্ব্বারূপে গৃহীত হয়। যদি বিবেচনা করা যায় যে, একা বিচারণা শক্তিই অপরাপর বৃত্তি এবং শক্তিসমূহের রাজস্বরূপ, তাহা হইলেই বা ফলের অঙ্কে অধিক কি দাঁড়াইল? প্রজাসাপেক্ষতাশূন্য রাজার আশ্রয় যেমন মঙ্গল বা অমঙ্গলকর; একামাত্র বিচারণা শক্তির আশ্রয়ও তদ্রূপ। এই নিমিত্তই তথাবিধ তর্কগ্রথিত জ্ঞানের সারশূন্যতা, এবং তাহার নীরস অজীবন্তভাব এত অধিক; এবং এই জন্যই তাহার হৃদয়গ্রাহিতাশক্তি এরূপ শূন্যস্থলীয়। তোমার দার্শনিক মহাশয় প্রেমপদার্থের অবতারণা করিলেন; আমি দেখিলাম সংজ্ঞারূপক কয়েকটি শব্দ মাত্র পর পর কৌশল সহকারে

বিন্যস্ত হইয়া বর্ণযোজনায় শোভা পাইতেছে, বা তথাবিধ। এবং বুঝিলাম যে উহার শব্দ সমূহের বিন্যাসকৌশল ভেদ করিতে পারিলেই, বিষয়টি আমার আয়ত্তমধ্যে; এবং অত্যল্প মাত্র বুদ্ধি চালনায় দেখিলাম যে আয়ত্তকৃতিও সহজসাধ্য। অতএব আমি কেন না উহার উপর প্রভুত্ব করিতে বাঞ্ছা করিব? আমি উহার সত্বা অসত্বা, দোষ অদোষ, শক্তি সামর্থ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি বিচারে নিঃসন্দেহ প্রবৃত্ত হইলাম; কতক দোষ বলিলাম, কতক গুণ বলিলাম, যাহা বলিবার নহে তাহাও বলিলাম,—আমি বড় অপক্ষপাতী। কিন্তু ফলে করিলাম কি—বিন্যস্ত শব্দের মধ্যে কোন্‌টি রাখিতে হইবে, কোন্‌টি রাখিতে হইবে না, কোন্ শব্দটি কোথায় বসিলে ভাল হয়, কোথায় বসিলে ভাল হয় না; ইত্যাদি শব্দসংগ্রাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু একবার প্রেম পদার্থের জীবন্ত ভাব সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেখ দেখি তোমার অপক্ষপাতিত্ব কোথায় ঘুরিয়া যায়; তোমার তর্ককল্পিত দোস গুণের আরোপ কোথায় ভাসিয়া যায়, তাহার স্থানে আবার কত নূতন প্রকৃতির গুণাগুণ বিচার সাক্ষেপ ভাবের অতীতে সমুদ্ভূত হয়, এবং নিরন্তর হইতে থাকে। অথবা সর্ব্ববৃত্তির সামঞ্জস্য-আশ্রয়সমুদ্ভূত যে কোন কবিবর্ণনার মধুর রস পান করিয়া দেখ। দেখিবে কয়েকটি পংক্তিমাত্র পাঠে কি অপার ভাবরাশি এবং বোধানুভব সমুদ্ভূত হইবে; সমস্তবৃত্তি নিচয়কে সমপ্রস্ফুটিত করিয়া চিত্তক্ষেত্র কিরূপ প্রসারিত করিয়া আনিবে; বর্ণিত বিষয় জীবন্ত মূর্ত্তিতে কিরূপ হৃদয় স্থান অধিকার করিয়া লয়; মানস নেত্র অনন্ত গতি পথে কিরূপ বিস্ফারিত হয়,—আয়তনে যাহার এই বিস্তারময়ী পৃথিবীও সঙ্কুলানস্থলী হইয়া উঠিতে পারে না। বলিতে পার তোমার তর্কদর্শনে সেরূপ করিতে সমর্থ কি না? তোমার পৃথিবী পূর্ণ তর্কগ্রথিত জ্ঞানফল লইয়া আইস, এবং দেখ যে উহার শতাংশের একাংশ মাত্রও হৃদয় গ্রহণ করিতে পারে কি না। দুর্দ্দান্ত দার্শনিক মিল, সামান্য কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ হইতে শেষে রস সিঞ্চনে দর্শন পিশিত স্বীয় শুষ্কজীবনকে সরস করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

বাঞ্ছারাম, একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, কথায় শুনিয়া কাজ আর চোখে দেখিয়া কাজ, দূরে বসিয়া কাজ আর চখোচখিতে কাজ, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ কত দূরান্ত! তুমি মনে করিয়া দেখ দেখি, অসাক্ষাতে লোকের কত সর্ব্বনাশ, কত কুৎসা করিয়া থাক; কিন্তু আবার সেই সকল কুৎসা এবং সর্ব্বনাশের পাত্রলোক সাক্ষ্যাৎকারে আসিলে, তখন তজ্জন্য কেমন জড়সড়, লজ্জিত, মিষ্টমুখ, যেন সেই ব্যক্তিই নহ, এরূপ ভাব ধরিয়া থাক! যে কোন লোক বা পদার্থের বিষয়, কাণে শুনিয়া একরূপ ধারণা, আর চোখে দেখিয়া আর এক ধারণা, ইহা নিত্যব্যাপার। কাণের শুনন হইতে চোখের দেখা সর্ব্বদাই কত নূতন, কত রূপান্তর ভাব; এবং শুনা হইতে দেখায়, দর্শকের মনে কতই অভিনব এবং পূর্ণভাবের উদ্দীপন করিয়া থাকে। ইহার কারণ কাণে শুনার অবলম্ব বস্তু ছায়া,

এবং চোখে দেখার অবলম্ব বস্তু জীবন্ত ভাব। তুমি ইতিহাস পড়িয়াই, জ্ঞাত আছ যে সুলতান মামুদ ব্যভিচারী সৈনিককে তরবারি ঘাতে দ্বিখণ্ড করিবার সময় দীপ নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন। বলিতে পার, এ দীপ নির্ব্বাণের উদ্দেশ্য কি? মামুদের মনে তখন স্পষ্টতঃ উদয় হউক বা না হউক, ইহার উদ্দেশ্য হত্যাসক্ষম হইবার জন্য, উদ্দেশ্য বস্তুর জীবন্তভাবকে পরিত্যাগ করিয়া সাধ্যায়ত্তে তাহার ছায়াকে অবলম্বন মাত্র,—তর্কদর্শন ক্ষেত্রে প্রবেশ,—হৃদয়ের উপর পরদা ক্ষেপ! ছায়ার অবলম্বন মানবকে কি দুরন্ত ভ্রম পথেই লইয়া যায়, এবং তাহাকে দিয়া কি অপকর্ম্মই না করাইয়া থাকে। দেখিও তুমিও যেন ছায়ার অবলম্বনে সেইরূপ বাহ্যিক অপক্ষপাতিত্বে আসিয়া আত্ম বলি দিয়া ফেলিও না। তুমি বলিবে, মামুদের যেন ছায়াই অবলম্বন হইল, কিন্তু সেই ছায়া ধরিয়া ফলে কি সে নিতান্ত মন্দ কার্য্য করিয়াছিল? নির্ব্বোধ! প্রকৃতি যাহার বিরোধি তাহা কি কখনও ভাল হইতে পারে,—সন্তান বধ্য হইলেও পিতৃহস্তে নহে, এ জগতে লোকহিত এবং অপত্যস্নেহ এতদুভয়ের কি সামঞ্জস্য হইতে পারে না? মামুদের সন্দেহ হইয়াছিল, ঐ সৈনিক তাহার পুত্র; পুত্রমুখ দেখিয়া পাছে ক্রূরকর্ম্মে হস্তোত্তোলিত না হইয়া উঠে, এইজন্য দীপ নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে যাহা হউক, মামুদের তাহাতে বিচার অপক্ষপাতিত্বের বড় প্রশংসা হইয়াছিল। বাঞ্ছারাম, তোমারই কোন্ সেরূপ প্রশংসা নাই;—সকলেই বলিয়া থাকে তোমার তর্ক বুদ্ধি বড় চিকণ, এবং তোমার হেকমতেরও অন্ত নাই; কিন্তু আবার সেই সকলেই বলিয়া থাকে যে তুমি বড় নাস্তিক, বড় পাষণ্ড, বড় ভণ্ড, তোমার অসাধ্য কাজ নাই।

উপার্জ্জন ক্রিয়ার অনুসরণ এবং তাহাতে কৃতকার্য্যতা, মনুষ্য জীবনের স্ফূর্ত্তিমান্ শ্রেষ্ঠ ক্ষমবান্ অংশকেই অবলম্বন করিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। তখন বাক্যাড়ম্বর বা কুতর্কের সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক থাকে না, প্রাণপণে নির্ব্বাক্ কার্য্যানুসরণই একমাত্র সে সময়ের রীতি। বাক্যাড়ম্বর, তর্কবিতর্ক, দোষগুণবিচার, এ সকল উপার্জ্জন শ্রান্ত, এবং উপার্জ্জন ক্ষান্ত, জ্যেষ্ঠতাতত্ত্বের সম্পত্তি, এবং এতদিন অনুষ্ঠিত উপার্জ্জন ক্রিয়ার সমাপ্তিকালের উপস্থিতি চিহ্ন স্বরূপ। জ্ঞান সংসারেও অবিকল তাহাই; প্রতি তর্কদর্শন তৎশ্রেণীয় জ্ঞান উপার্জ্জনের অন্তিম কালের পরিচায়ক স্বরূপ। যে প্রবল স্রোতধারা এতদিন দুর্দ্দমনীয় গমনে পাহাড় পর্ব্বত অবহেলে লঙ্ঘন করিয়া বেগবতী হইয়া ছুটিতেছিল; এক্ষণে তাহা সাহারা-মরুস্থল-সংলগ্নে বিলুপ্ত হইতে বসিল। ফলতঃ যে তর্কদর্শন যে সময়ের এবং যে শ্রেণীর, সেই সাময়িক সেই শ্রেণীয় জ্ঞান উপার্জ্জন চেষ্টার উত্তর গতির উহা সমাপ্তি নিশান স্বরূপ। অতএব লোকে যে তর্কদর্শনকে জ্ঞানের প্রবর্ত্তক স্বরূপ ভাবিয়া, তাহার অযথা অনুসরণে উন্মাদবৎ হইয়া থাকে; এবং অদৃষ্ট জ্ঞানের বৃথা আশায় বসিয়া সময় ক্ষেপণে আত্মধ্বংস করে; এখন দেখ সেই তর্কদর্শন সেই জ্ঞানের প্রবর্ত্তক নহে। বস্তুতঃ তাহার বিপরীত, নিবর্ত্ত-

কেরই কার্য্য করিয়া থাকে; অথবা নিবর্ত্তন হইতেই উহার উৎপত্তি। কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রাচীনেরা, এবং কখন কখন আধুনিকেরাও যথার্থ উপার্জ্জন ক্রিয়ার অনুসরণ সময়েও, তর্কদর্শনের আলোচনা করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহার মধ্যে সৌভাগ্য এই যে, সেই তর্কদর্শন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কদাচিৎ পরিণত হইয়া থাকে। উহা ফলে উপার্জ্জন ক্রিয়াশ্রমের ক্ষণিক চপলতার কার্য্য, সুতরাং প্রায়ই আসবাবের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন প্রাচীন হিন্দুর দর্শনশাস্ত্র, এবং আধুনিক ইংরেজের মিল সাহেবের বার্ত্তাশাস্ত্র। যতক্ষণ উহা আসবারের ন্যায় ব্যবহৃত, ততক্ষণ উহা তত ক্ষতিকর নহে। কিন্তু যখনই উহা বেদবিধি রূপে গৃহীত, তখনই অধঃপতনের সূচনা হইয়া থাকে। যদি ইতিহাস মনঃসংযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাক, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, প্রায়ই জাতীয় অধঃপতনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যে কোন দেশে তর্কদর্শনের ঘটাঘটি আরম্ভ, এবং ব্যাপ্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য চিত্ত বিশ্বশক্তি প্রতিরূপ, অতএব এমন প্রত্যাশা করিও না যে, তাহাকে নাকে দড়ি দিয়া যদৃচ্ছা লওনে সমর্থ হইবে। ভাল পথ দেখাইতে পার দেখাও, দেখাইয়া পথে উঠাইয়া স্বেচ্ছা গমন করিতে দেও, দেখিতে পাইবে তাহার কি সুন্দর, কি মহান্, কি চিত্তমুগ্ধকর গতি!

আমি এতক্ষণ ধরিয়া যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা শুনিয়া তুমি নিঃসন্দেহই মনে ভাবিতেছ যে, আমার ন্যায় তর্কদর্শনের দ্বিতীয় শত্রু এবং নিন্দুক আর নাই, বস্তুতঃ তাহা নহে। সকল বস্তুরই ব্যবহার আছে, তর্কদর্শনেরও ব্যবহার আছে। তুমি তাহাকে অপরাপর মনীষাশক্তি এবং চিত্তবৃত্তি হইতে সামঞ্জস্য চ্যুত করিয়া, সর্ব্বেসর্ব্বা রূপে ব্যবহার করিতে চাহ; আমি বলি তাহা নহে, উহা সামঞ্জস্য সংমিলনে ব্যবহৃত হউক। পর প্রস্তাবে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কীটভুক্ উদ্ভিদ।

শরীর ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে আহার অভাবে কেহ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে না। আমাদের কি অন্য কোন চেতন দেহ মাত্রেরই আহারের বিলক্ষণ আবশ্যকতা আছে। দেহ ক্ষণে ক্ষণে লয় প্রাপ্ত হইতেছে। অশ্বারোহণ, ধাবন প্রভৃতি আয়াসসাধ্য কার্য্য হইতে নিশ্বাস গ্রহণ, ওষ্ঠাধর বিকাশন বা পক্ষ্ম সঞ্চালন প্রভৃতি সামান্য বিষয় পর্য্যন্ত সকল কার্য্যেই এই শরীরের ক্ষয়সাধ্য সংসাধিত হইতেছে। এই ক্ষয়ব্যাপার নিবারণ করিয়া কি প্রকারে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়? নিবারণ করি-

বার উপায় নাই। তবে ক্ষতি পূরণ করিয়া চলিতে পারিলে কোন ব্যাঘাত নাই। এই ক্ষতি পূরণের প্রশস্ত উপায় আহার। সুতরাং আহার জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আহার না করিলে শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ হইতে থাকে; শরীরে বল না থাকাতে মনেরও স্ফূর্ত্তি হ্রাস হইয়া যায়; সুতরাং শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে জীবের যে সমস্ত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হয়, তাহার বিঘ্ন ঘটিতে থাকে। সংক্ষেপে আহার অভাবে চলিবার উপায় নাই। তবে কেহ কেহ অনাহারে বা বায়ুভক্ষণ করিয়া পুরাকালের ঋষিগণের সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যার কথা এস্থলে উল্লেখ করিতে পারেন। তদুত্তরে আমরা এই বলি যে, তাঁহারা দেবতা ছিলেন। আমরা মনুষ্য হইয়া কি প্রকারে তাহাদের চরিত্র সমালোচনা করিতে প্রয়াসী হইতে পারি? আর দেবচরিত্র বুঝাও ভার।

আহার কার্য্যের ফলাফল যে কেবল জীবগণকেই সংস্পর্শে, এমত নহে। উদ্ভিদ্‌গণও এই সর্ব্বব্যাপী প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন।

কথাটা আপাততঃ অলৌকিক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের চক্ষে অযৌক্তিক নয়। সচরাচর আমরা যে ভাবে "পান ভোজন" পদ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা বিজ্ঞানানুমোদিত সংজ্ঞা নহে। ভক্ষ্যদ্রব্য তরল হইলেই আমরা 'পান' করিয়া থাকি। জল পান করি, দুগ্ধ পান করি, তরল না হইলেই ভোজন বা আহার করি; কিন্তু কি কঠিন দ্রব্য কি তরল দ্রব্য উভয়ই উহাদের পুষ্টিকর অংশ রক্তে পরিণত হইবার পূর্ব্বে, তরলীভূত হইবে। খাদ্যদ্রব্য মুখবিবর হইতে কণ্ঠনালী দ্বারা পাকস্থলীতে নীত হয়। যাইবার সময়েই জীবের শরীরে যে নানা জাতীয় রস সঞ্চিত থাকে, তদ্দ্বারা রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংসাধিত হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে ভুক্ত দ্রব্য তরল অবস্থায় পরিণত হয়। কোন কোন কঠিন দ্রব্য লালার সাহায্যে প্রথমে শর্করায় পরিণত হয়। পরে পাকস্থলী হইতে শোষিত হইবার পূর্ব্বেই তরল হয়। সাবানের কারখানায় যাঁহারা তৈল ও বসা কঠিন হইতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা শর্করায় পরিণত হওয়াটি অক্লেশে বুঝিতে পারিবেন।

উপরে যাহা নির্দ্দেশ করা গেল, তাহা কেবল জন্তুদের বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহা নহে। জন্তুদের মধ্যে যেমন ভুক্ত দ্রব্য তরলীভূত হয়, উদ্ভিদের পক্ষেও সেইরূপ। ফলতঃ উভয়ের অতিঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যে রস দ্বারা পরিপাক কার্য্য সংসাধিত হয়, তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। অতি প্রথম অবস্থায় যদি জন্তুদেহপিণ্ড ছেদ করা যায়, তবে তাহা একটি বৃক্ষপত্র ব্যবচ্ছেদের ন্যায় দেখাইবে। ইহার উপরে ও নিম্নে এক এক খণ্ড সূক্ষ্মচর্ম্ম বা ত্বক্ থাকে এবং মধ্য স্থলে সূত্রাকার চর্ম্মমণ্ডল। ক্রমে ক্রমে একপ্রান্ত হইতে ইহা লম্বালম্বি আপনা আপনি গুটাইয়া আইসে। এই সময়ে ইহাকে ব্যবচ্ছেদ করিলে অশ্বের খুরের ন্যায় দেখাইবে।

ক্রমে প্রান্তদ্বয় পুষ্পগর্ভস্থ কিঞ্জল্কের ন্যায় যুক্ত হইয়া গেলে মধ্যস্থলে একটি স্বতঃই গহ্বরের সৃষ্টি হয়। ইহাই জন্তুদিগের কণ্ঠ-

নালী। উপরে যে ত্বকের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে লাল ভেরাণ্ডার (Jatropa Glandulifera) বৃক্ষে যেমন একরূপ আটাময় প্রত্যঙ্গ দৃষ্টহয়, সেইরূপ আছে। তাহা ঘর্ম্ম নির্গমের পথ। কিন্তু নিম্নে আবার পূর্ব্বোক্ত পদার্থ গুলিই প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অপর এক বিশেষ রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। তন্মধ্য দিয়া একটি রসের অবতারণ হইয়া থাকে। এই রস এবং ঘর্ম্ম এক নহে, বিশেষরূপে স্বতন্ত্রীভূত। এই রস সাহায্যেই জন্তুদের পরিপাক কার্য্য সংসাধিত হয়।

উদ্ভিদ্ পক্ষে দেখুন। সকল বৃক্ষপত্র হইতেই ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া থাকে, তাহা জলীয় বাষ্পরূপে পরিণত হয়। কিন্তু কোন কোন স্থলে বাষ্পরূপে পরিণত না হইয়া জলবিন্দুরূপেই বৃক্ষপত্রোপরি অবস্থিত থাকে। জন্তুদিগের ঘর্ম্ম বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইলেই যে, পরিপাক কার্য্যক্ষম রস উৎপন্ন করে, তাহা জানা আছে। এইজন্য উদ্ভিদ্‌বিদ্ পণ্ডিতেরা কহেন, জন্তুদিগের ঘর্ম্ম যদি বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পরিপাক কার্য্যক্ষম রস উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইল, তবে উদ্ভিদের ঘর্ম্ম বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া উদ্ভিদের পরিপাকোপযোগী রস উৎপন্ন করিতে কেন না সক্ষম হইবে? শারীরিক যন্ত্রনিয়ম পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও ইহার বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা যায় না। অথচ যদি এইটি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবেই কতকগুলি উদ্ভিদের একটি অতি আশ্চর্য্য ক্ষমতার কতকটা তথ্য নিরূপণ করিতে পারা যায়। এস্থলে আর একটি কথাও বলা যাইতে পারে। জন্তু ও উদ্ভিদের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া এ পর্য্যন্ত কোন বিজ্ঞানবেত্তা পার্থক্য নিরূপণ করিতে সক্ষম হন নাই! তাহা যে দিন হইবে সে দিন বিজ্ঞানের অপরমূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাইব। বটবৃক্ষে বা নারিকেল বৃক্ষে এবং মনুষ্যে বা মার্জ্জারে পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু ঐ দুইজাতীয় (এখানে আমরা চলিত ভাষার দুইজাতি বলিলাম —বিজ্ঞানের কথা নহে) নিম্ন শ্রেণীর পরস্পরে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। প্রবাল, কীট কি উদ্ভিদ, তাহা সে দিন মাত্র নিরূপিত হইয়াছে। এইজন্য অনেক বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদ কি জন্তু বলিয়া যাহাদিগকে নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, তাহাদিগকে 'জুফাইট' বলিয়া একটি স্বতন্ত্রশ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ফলতঃ যদি উদ্ভিদ্ বা জন্তুর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা আমাদের অদ্যকার কার্য্য হইত, তাহা হইলে নানাপ্রমাণ দেখাইতে সক্ষম হইতাম, ভবিষ্যতে উক্ত বিষয়টি পুনর্গ্রহণের পূর্ণ ইচ্ছা রহিল। এখন এই বলিতেছি যে, যখন জন্তুও উদ্ভিদের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়না, তখন একের রূপান্তরিত ঘর্ম্ম যদি পরিপাককার্য্য করিতে সক্ষম হয়, তবে অপরের ঘর্ম্ম (যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মত ভেদ নাই) রূপান্তরিত হইয়া সেইরূপ পরিপাক কার্য্য (যাহার অস্তিত্ব পশ্চাল্লিখিত বিষয় পাঠে উপলব্ধি হইবে) করিতে সক্ষম হইবে না, বলা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা বুঝিতে পারি না। আর ইহা স্বীকার না করিলে কীটভোজী উদ্ভিদ্‌গণের কার্য্য কোন ক্রমে বুঝাযায় না বলিয়া আধুনিক উদ্ভিদ্‌বেত্তারা ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং নানা প্রকারে

প্রতিপন্ন করিতেছেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহাদের মতই আজকাল গ্রাহ্য।

উদ্ভিদ্‌গণ জন্তুগণের ন্যায় আহার করিয়া থাকে। মুখই আমাদের উদরে আহার লইয়া যাইবার প্রধান বর্ত্ম। উদ্ভিদের সর্ব্ব প্রধান বর্ত্ম শিকড় বা মূল। তরলীভূত ভক্ষ্য পদার্থ মূলমুখে প্রবিষ্ট হইয়া উদ্ভিদ অঙ্গে সঞ্চারিত হয় এবং পুষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই প্রবন্ধে সেই বিষয়টির বিশেষ বিবরণ প্রকটিত না করিয়া কোন উদ্ভিদের কীটভোজনরূপ একটি অত্যাশ্চর্য্য রহস্য বিজ্ঞাপিত হইবে।

ড্রসেরা (Drosera Burmauni) আখ্যানে অভিহিত একজাতীয় উদ্ভিদ্ আছে। তাহার পত্রগুলি বড় ঘনসন্নিবিষ্ট এবং প্রায় স্তবকে পরিণত হইতে দেখা যায়। পত্র অঙ্গ কেশে সমাচ্ছন্ন। বিপর্য্যস্ত কলসীর ন্যায় কেশগুলির অবয়ব এবং অতিশয় চঞ্চল। মনুষ্যের এক ইঞ্চি পরিমিত এক টুকরা কেশ লইয়া তাহা সাতসহস্র অংশে বিভক্ত করিয়া যদি তাহারই এক অংশ ঐ পত্রের কেশে নিক্ষেপ করাযায়,তাহা হইলেও উহাকে বিচলিত হইতে দেখাযায়। ১ইঞ্চির ৭০০০হাজার ভাগের একভাগ প্রায় $\frac{1}{৪০০০০০}$গ্রেণ। মনুষ্যের সমস্ত ইন্দ্রিয় অপেক্ষা রসনার ক্ষমতা অধিক। তথাপি প্রবল মিষ্টরসগ্রাহী ব্রাহ্মণের জিহ্বা এক ইঞ্চ মিষ্টান্নের ৫০ভাগের একভাগ কিছুতেই অনুভব করিতে পারিবেনা। কিন্তু এই সমস্ত কেশের অনুভব শক্তি (মনস্তত্ত্ববিদ্ ক্ষমা করিবেন) কি ভয়ঙ্কর প্রবল দেখুন। বালুকণা কি-ক্লেশাংশ,ঐ কেশের উপর নিক্ষেপ করিবা মাত্র কেশগুলি সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু যখন জানিতে পারে যে উহাদের আহারীয় দ্রব্য নয়, তখন সজোরে প্রসারিত হইয়া আপনাদের পূর্ব্বাবস্থা পরিগ্রহ করে এবং ঐ উদ্যমে বালুকণা স্থানচ্যুত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। স্বভাবজাত ড্রসেরা পরীক্ষা করিয়া জানাগিয়াছে যে, ঐ সমস্ত কেশ প্রায়ই কীটপূর্ণ। কেশ সুদৃঢ়ভাবে কীট চাঁপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। ঐ কেশ গুলিতে আটাময় এক প্রকার রস থাকে। কীট রসলোলুপ হইয়া যেমন অবতরণ করে, অমনি আটায় লাগিয়া যায় এবং অপর কেশ সমস্ত আসিয়া চাঁপিয়া ধরে। উর্ণনাভের পাশের ন্যায় কীটের ইহা হইতে আর কোন ক্রমে নিস্তার নাই। পলাইতে যত চেষ্টা করিবে, ততই জড়াইয়া পড়িবে। ক্রমে বিষে জর্জ্জরিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অবিলম্বে কীটদেহ গলিয়া যায়।

বিজ্ঞানামোদী মনীষিগণ একটু একটু করিয়া ঐ বৃক্ষরস সংগ্রহ করিয়া দেখিয়াছেন যে, জীব শরীরের অংশ উহাতে সংযোজিত হইবা মাত্র গলিয়া যায়। তবেই দেখা যাইতেছে যে, কীটদেহ দ্রবীভূত করিবার জন্য ঐ রসের সৃষ্টি ও কেশমধ্যে উহার সংস্থান। স্বভাবজ ড্রসেরায় মূল হয় না। যদি ড্রসেরা এরূপে রক্ষা করাযায় যে, তাহার কাছে একটিমাত্রও কীট যাইতে পারিবে না, তবে অচিরাৎ উহা মরিয়া যায়। এই সমস্ত প্রবল কারণের সত্তার উপর ভরদিয়া বৈজ্ঞানিক নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ড্রসেরা মাংসভোজী উদ্ভিদ্। বেহার অঞ্চলে ড্রসেরা দেখিতে পাওয়া যায়।

ড্রসেরা ছাড়িয়া দিয়া অপর একটি উদ্ভিদের কথা বলা যাইতেছে। ইহার নাম Utricularia stellaries। ইহা প্রায়ই মৃত্তিকার মধ্যে বা জলের ভিতরে থাকে। পুষ্পগুলি মৃত্তিকা বা জলের উপর থাকে। উদ্ভিদের পত্রগুলি বিশেষ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া সূত্রাকারে পরিণত হয়। উদ্ভিদের সকল সন্ধিস্থান হইতে দুই দিকে দুইটি করিয়া সূত্রাকার পত্র প্রসারিত থাকে, গাছের প্রত্যঙ্গ বিস্তৃতি প্রায় এই রূপই। এই সন্ধিস্থলে একটি গোলাকার থলি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন যে, ঐ থলি বায়ুপূর্ণ এবং উহার সাহায্যে উদ্ভিদ্ জলে ভাসিয়া থাকে। ইউট্রিকিউলেরিয়া শব্দের ব্যুৎপত্তিই এই। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে,ঐ থলিতে বায়ুর পরিবর্ত্তে এক প্রকার তরল পদার্থ থাকে। পূর্ব্বে উহাতে বায়ু গমনাগমনের পথ থাকার বিষয় কেহই জানিতেন না। আর কেবলমাত্র জলে এই উদ্ভিদ্ জন্মে, তাহাও নহে, কর্দ্দমেও জন্মিয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে ঐ থলি গুলি কি,তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য নানারূপ পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফল এই হইয়াছে যে, ঐ থলিগুলি কীট ধরিবার ফাঁদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; আর থলির অভ্যন্তরে যে রস সঞ্চিত থাকে, তদ্দ্বারা কীটদেহ ড্রসেরার ন্যায় দ্রবীভূত হয়। এই উদ্ভিদেরও মূল নাই এবং যদি উত্তমরূপ জলের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া যায়, তথাপি কীট গমনাগমন বন্ধ করিয়া দিলে উদ্ভিদ্ শীঘ্রই মরিয়া যায়।

এই উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে আর একটি রহস্য পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। কতকগুলি মাংসাশী জন্তু আপনাদের ভক্ষ্যজীবের উপর একরূপ ক্ষমতা পরিচালন করে। এক প্রকার সর্প আছে, তাহাদের শরীর নানাবর্ণে রঞ্জিত এবং ঐ সর্পের ভক্ষ্য এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহাদেরও পক্ষ ঠিক্ ঐ সমস্ত বর্ণে চিত্রিত। পক্ষী ঐ জাতীয় সর্প দেখিলেই পূর্ব্বোক্ত পরিচিত বর্ণে আকৃষ্ট হয় এবং উড়িয়া সর্পের উপর পড়িতে থাকে। কোন ক্রমে সরিয়া যাইবে না, অবশেষে অনলে পতঙ্গের ন্যায় একবার সর্প কর্ত্তৃক ধৃত হইলেই ভবলীলা শেষ হইয়া যায়। ইউট্রিকিউলেরিয়ার থলিগুলির গঠন ,যে জাতীয় কীট উক্ত উদ্ভিদ্ ভোজন করে, ঠিক সেই জাতীয় কীটের ন্যায়। কীট স্বজাতি মনে করিয়া থলির নিকটে গমনাগমন করে এবং রস কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে। একবার প্রবেশ করিলে আর নিস্তার নাই—সব ফুরাইয়া গেল। এই উদ্ভিদ্ পুষ্পের সময় হইলেই জলের উপর ভাসিয়া উঠে।

আমেরিকায় এক জাতীয় উদ্ভিদ্ দেখা যায়, তাহার বৈজ্ঞানিক নাম Dionœa Mucipula। চলিত ভাষায় ইহা Venus's Fly-trap অথবা মক্ষিকা ধরিবার ফাঁদ বলিয়া অভিহিত হয়। ড্রসেরার ন্যায় ইহারও পত্রগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট এবং স্তবকীকৃত। যেমন লেম্বুপাতার মধ্যস্থলে একটি গ্রন্থি দেখিতে পাওয়া যায়, এই উদ্ভিদের পত্রেও সেইরূপ একটি করিয়া গ্রন্থি আছে। পত্রের শেষাংশটি অথবা

অগ্রভাগটি একটু রঙ্গিল আর পত্র পার্শ্ব কাটা কাটা। তাহাকে দন্ত কহে। ইহার দন্তগুলি সুতীক্ষ্ণ। পত্রান্তের উপরিভাগে ৬।৮ তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টক দৃষ্ট হয়। ড্রসেরার ন্যায়ও ইহাদের অনুভব শক্তি বড়ই প্রখর। আর গ্রন্থি হইতে আরম্ভ করিয়া পত্রের যে শেষ রঙ্গিল অংশ আছে, তাহাও ঐরূপ অনুভব শক্তি দেখাইয়া থাকে। মক্ষিকা রঙ্গিল পত্রান্ত দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তদুপরি উপবেশন করে। উপবেশন করিবামাত্র পত্রের মেরুদণ্ড ঠিক্ রাখিয়া পত্রপার্শ্বদ্বয় মক্ষিকাকে মধ্যে ফেলিয়া সংযুক্ত হয় এবং মক্ষিকাকে চাপিয়া ধরে। সেই সমস্ত কণ্টকগুলি মক্ষিকাদেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলে এবং অবিলম্বে উহার দেহ গলিয়া উদ্ভিদ্ অঙ্গে সঞ্চারণোপযোগী রসে পরিবর্ত্তিত হয়। এই রস আকর্ষণ করিয়াই উদ্ভিদ বাঁচিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা উদ্ভিদের কীট ভোজনের আর কি প্রবলতর প্রমাণ প্রদর্শিত হইতে পারে?

এল্‌ট্রোভেণ্ডা Altrovanda বলিয়া উদ্ভিদের যেএকটি শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতেও কীটভোজনের প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের বাঙ্গালাদেশে ও আমেরিকায় আলাকা ঝাঁজি বলিয়া একটি উদ্ভিদ্ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে Fly trap মক্ষিকার ফাঁদের বড় সৌসাদৃশ্য আছে। আমরা একবার চক্রদহের নিকট একটি পুষ্করিণীতে এবং কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুরের একটি পুষ্করিণীতে অসংখ্য ঝাঁজি দেখিয়াছিলাম। ঝাঁজির নাম অনেকেই শ্রুত আছেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবেন, ঝাঁজির গাত্রে যত কীট থাকে, এমত আর প্রায় দেখা যায় না এবং এই সমস্ত কীট ঝাঁজির খাদ্য বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু যথার্থ বর্ত্ম আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই।

অদ্য আর একটি মাংসভোজী উদ্ভিদের কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যে উদ্ভিদের বিবরণ বিবৃত হইবে, তাহার বাহ্যিক গঠন আর ঐ গঠনের আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও তাহার কীট ভোজন কার্য্যের বিষয়ে আজিকালি আর বৈজ্ঞানিকের দ্বিধা নাই

নেপেন্থিস বা পিচার উদ্ভিদ্ (Nepenthes or Pitcher Plant) অর্থাৎ বিপর্য্যস্ত কলস নামক এক প্রকার উদ্ভিদ আছে, কেহ কেহ তাহাকে প্রণালী পদবী প্রাপ্ত পত্রবৃন্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অপর কেহ কেহ ইহাকে পত্রের 'জমি' বলিয়া থাকেন। অতি অল্প দিন হইল, ইহা সম্বন্ধে ডার্বিন সাহেব আর একটি মত প্রকটিত করিয়াছেন। উহার সরল অংশটি উদ্ভিদাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, ঐ সন্ধিস্থল হইতে একটু পত্রের ন্যায় বাহির হইয়াছে। ক্রমে পত্র সূত্রাকারে কখন সরল, কখনও বক্রভাবে ক্রমে উর্দ্ধমুখে উঠিয়াছে। একটি পাত্রাকারে উহা শেষ হইয়াছে। উক্ত আধারের আবার একটি আবরণ (ঢাকনী) দেখা গিয়া থাকে। কখনো লেবুরবৃক্ষে যেমন একটি অত্যন্তক্ষুদ্রপত্র দেখাযায়, অনেকেই উহা সেইরূপ পত্রেরই রূপান্তর মাত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। ঐ আবরণ যেন কব্জা দিয়া লাগান আছে। আবশ্যক হ-

ইলে আপনি উঠে ও আপনি পড়িয়া আধারটি রুদ্ধ করিয়া রাখে। ইহা ঠিক্ কবাটের কার্য্য করে। যখন প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তিতে বিরাজ করেন, যখন নাতিশীত, নাতি উষ্ণ, তখন আবরণ অল্পে অল্পে খুলিয়া যায়। প্রখর গ্রীষ্মের সময় আবরণ পড়িয়া থাকে। আবার প্রবল বর্ষার সময় কি বৃষ্টির সময়ও আধার আবরণ কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া থাকে। এই আধারটি সকল সময়েই ঠিক্ খাড়া হইয়া থাকে। আধার মধ্যে এক প্রকার তরল জলীয় পদার্থ থাকে। পূর্ব্বে লোকে মনে করিত, যে ঐ তরল পদার্থ জল ভিন্ন আর কিছুই নয়। হয়ত বৃষ্টির জল উহাতে সংরক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা মনে করিবার একটি তাৎপর্য্য ছিল। প্রায়ই দেখা যাইত,বানরগণ ঐ জল পান করিয়া থাকে। সুতরাং লোকের উহা নিশ্চয়ই জল বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐ জল জল নহে—এক প্রকার সঞ্চিত রস এবং কীটদেহ দ্রবীভূত করিতে সক্ষম। কীটগণ পিপাসা শান্তির নিমিত্ত ঐ জলপান করিতে আধার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, আর বাহির হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে উহার মধ্যে একরূপ সুঁচ আছে। তাহাদের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগগুলি ভিতর দিকে। সুতরাং কীট প্রবেশ করিবার সময় বুঝিতে পারে না। বাহির হইতে চেষ্টা করিলে উক্ত তীক্ষ্ণ অগ্রভাগগুলি তাহার গাত্রে বিদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। যতই চেষ্টা করে, ততই শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায় এবং ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া প্রাগুক্ত রসে পড়িয়া যায়। এ ব্যূহ হইতে কোন ক্রমে নিস্তার নাই। একবার রসে পড়িবামাত্র জীবশরীর ধ্বংস হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপে এই জাতীয় উদ্ভিদেরা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

কীটভোজী পূর্ব্বোক্ত উদ্ভিদ্‌গণের সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে ঐ তরল পদার্থটির স্বরূপই প্রথমে জানা আবশ্যক। তাহার স্বরূপ আমরা অবগত হইয়াছি, এবং উহাদের জীবশরীরধ্বংসকারী ক্ষমতার বিষয়ও পরিজ্ঞাত আছি। বহু আয়াসে অনেক দিনে অনেকের যত্নে এই অত্যাশ্চর্য্য কৌতুকাবহ রহস্য উদ্‌ভাবিত হইয়াছে। যদি সত্যের অপলাপ কাহারও অভিপ্রেত না হয়, তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ রস দ্বারা উদ্ভিদের পরিপাক কার্য্য সংসাধিত হয়। খাদ্য কি ? কীট, পতঙ্গ। শিকড় নাই যে অপর কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিবে, সুতরাং স্বীকার করিয়া লইতে হইতেছে যে, এমন কতকগুলি উদ্ভিদ্ আছে, যাহারা কীট প্রতঙ্গ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে, এবং জন্তুদের ন্যায় তাহাদের পরিপাক কার্য্য সংসাধিত হয়। এইক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, জন্তুদের ন্যায় পরিপাক কার্য্যোপযোগী রস কোথা হইতে আসিল ? এইটির মীমাংসা করিতে পারিলেই কীটভোজী উদ্ভিদ্‌গণের সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্নের উত্তর বাকী থাকে না। এখন আবার পূর্ব্বের কথা উঠিতেছে। জন্তুদের ঘর্ম্ম বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পাককার্য্য সম্পন্ন করে। আপাত দৃষ্টিতে ঘর্ম্ম ও পাকরস দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ। ফলতঃ তাহাই। কিন্তু একটি সামগ্রীই কোন

বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া বলে অপর মূর্ত্তি ও অপর গুণ ধারণ করে। এদিকে উদ্ভিদের ঘর্ম্ম আছে, পাক কার্য্য আছে। সুতরাং বিজ্ঞানবেত্তারা স্থির করিয়াছেন যে, জন্তুদের ন্যায় উদ্ভিদেরও এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। তবে সকল উদ্ভিদের না হইতে পারে। তাঁহারা এইরূপ কীটভুক্ উদ্ভিদের অস্তিত্ব ও তাহার কার্য্য প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং তাহা এক্ষণে বিজ্ঞানের গ্রাহ্য। এই প্রবন্ধে তাঁহাদের মতেরই সারবত্তা প্রকটিত হইল। জগন্নাথের মহীয়সী শক্তি প্রভাবে অহরহ কি সমস্ত আশ্চর্য্যাত্মক অবোধ্য কার্য্যই না সম্ভব পর হইতেছে। শ্রী—

প্রতাপসিংহ।

(ষষ্ঠ খণ্ডের ৪০ পৃষ্ঠার পর।)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আর এক ভাব।

শৈলম্বররাজ অন্তঃপুরের একতম প্রকোষ্ঠে কুমারী ঊর্ম্মিলা উপবিষ্টা রহিয়াছেন। প্রকোষ্ঠের বাতায়ন দ্বারাদি উন্মুক্ত। উত্তর বাতায়ন সমীপে কুমারীর পালঙ্ক তদুপরি কুমারী আসীনা। সেই বাতায়ন পার্শ্বে অন্তঃপুরের বৃক্ষবাটিকা। কুমারীর দৃষ্টি সেই বৃক্ষবাটিকায় শূন্য ভাবে নিপতিত। তাঁহার চিত্তের ভাব তখন অন্য কোন পদার্থে লীন নহে। কুমার অমরসিংহ আসিয়াছেন, একথা তাঁহার অবিদিত নাই। সেই কুমার অমরসিংহই এক্ষণে তাঁহার চিন্তার বিষয়। তিনি ভাবিতেছেন, কুমার ও আমার মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। তবে এদুরাশা কেন হইল? আবার ভাবিতেছেন, আমার আশা দুরাশা না হইতেও পারে।

কুমারী ঊর্ম্মিলা যখন এবংবিধ ভাবনায় ভাসিতেছেন, সেই সময় সেই প্রকোষ্ঠে, তাঁহার মাতুলানী শৈলম্বর রাজ মহিষী দেবী পুষ্পবতী প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র ঊর্ম্মিলা স্বীয় অংশনিপতিত বিশৃঙ্খল চিকুরদাম হস্ত দ্বারা পশ্চাদ্দিকে সরাইয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার বদনে লজ্জার চিহ্ন প্রকটিত হইল। এ লজ্জা স্বভাবসিদ্ধ। মনুষ্য যখন এমন কোন কার্য্য করে যাহা সে সকলকে জানাইতে ইচ্ছা করে না, অথবা জানিলে লজ্জিত হইতে পারে, তখন সে প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে করে আমার গুপ্ত কথা হয়ত প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ভয়ে সে লোকের সহিত পূর্ব্ববৎ সাহসিকতা সহকারে কথা কহিতে পারে না; কাহারও বদন প্রতি পূর্ব্ববৎ স্থির ও উৎফুল্ল ভাবে চাহিতে পারে না। এই জন্যই ঊর্ম্মিলা মাতৃবৎ মাননীয়া মাতুলানী সমক্ষে লজ্জানুভব করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন হয়ত তিনি কুমার অমরসিংহের

প্রতি কুমারীর মনের ভাব জানিতে পারিয়াছেন। ফলতঃ এ বৃত্তান্ত দেবী পুষ্পবতীর অবিদিত নাই। মালতী কুমারীর কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণে, এবং তাঁহার মনের উদাসীনতা দর্শনে ভয় প্রযুক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত রাজ্ঞী পুষ্পবতীকে নিবেদন করিয়াছিল, রাজ্ঞী এই সংবাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি চিন্তাকুলা হইয়াছিলেন। তিনি তৎকালে শৈলম্বররাজকে এ সংবাদ বিদিত করা বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। ভাবিলেন অগ্রে কৌশলে এ সম্বন্ধে কুমারের অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যদি তাহা শুভ হয় তাহা হইলে তখন এ রহস্য রাজার গোচর করিব। যদি বাসনার বিপরীত হয় তাহা হইলেই ঊর্ম্মিলার আশা মুকুলেই বিনষ্ট করিতে হইবে। এই ভাবিয়া শৈলম্বররাজ-প্রিয়া অমরসিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কুমারী ঊর্ম্মিলা অভ্যন্তরস্থ এ সকল কথা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

মহিষী জিজ্ঞাসিলেন,—

'ঊর্ম্মিলে! একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছ? তুমি সমস্ত দিন ভাবই কি?'

ঊর্ম্মিলা নম্রমুখী হইয়া বলিলেন,—

'ভাবিব কি? একদণ্ড একাকী থাকিলে তুমি ভাব ঊর্ম্মিলা কি ভাবিতেছে। আমার অত ভাবনা নাই।'

মহিষী বলিলেন,—

'আমি তাহা ভাবি সত্য; কিন্তু আমার ভাবিবার অনেক কারণ আছে। তুমি উত্তরোত্তর কৃশ হইয়া যাইতেছ। তোমার রং ক্রমেই মলিন হইতেছে। এ সকল দেখিয়া আমার কাজেই মনে হয় তুমি কি ভাবিয়া থাক।'

ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—

'তোমার ঐ এক কথা। তুমি আমাকে কেবলই কৃশ হইতে দেখ। দিন রাত্রি না হাঁসিলে, আর দরবারের থামের মত মোটা না হইলে তোমার মনে আহ্লাদ হয় না।'

কথা সমাপ্তির পর ঊর্ম্মিলা একটু হাসিয়া মস্তক বিনত করিলেন। এক গুচ্ছ কেশ স্থানভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার কপোলদেশে আসিয়া পড়িল। রাজ্ঞী পুষ্পবতী সস্নেহে কেশগুচ্ছ অপসারিত করিয়া দিয়া কহিলেন,—

'বৎসে! শুনিয়াছ মহারাণা প্রতাপসিংহের পুত্র কুমার অমরসিংহ আমাদের বাটীতে আসিয়াছেন।'

কুমারী বিনত মস্তকে কহিলেন,—

'হাঁ—শুনিয়াছি।'

রাজ্ঞী পুনরপি কহিলেন,—

'তুমি কি তাঁহাকে জান না?'

'হাঁ জানি।'

ঈষদ্ধাস্যের সহিত মহিষী আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

'তুমি কি তাঁহাকে কখন দেখ নাই?'

'দেখিয়াছি।'

'কোথায় দেখিয়াছ?'

এই প্রশ্নের উত্তর হইবার পূর্ব্বেই এক জন দাসী আসিয়া নিবেদিল,—

'কুমার অমরসিংহ আসিতেছেন।'

দাসী প্রস্থান করিল। তৎক্ষণাৎ বীরবর অমরসিংহ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। রাজ্ঞী গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন,—

'বৎস! উপবেশন কর।'

এক পালঙ্ক ব্যতীত সে গৃহে উপবেশনোপযোগী অন্য সামগ্রী ছিল না। কুমার কোথায় বসিবেন দেখিতে না পাইয়া সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পুষ্পবতী কহিলেন,—

'দোষ কি? ঐ পালঙ্কে উপবেশন কর। তুমি তো আমাদের পর নহ।'

কুমার অমরসিংহ পালঙ্কের একদিকে উপবেশন করিলেন। কুমারী ঊর্ম্মিলা ব্রীড়াবনতবদনে স্বীয় চম্পকদাম সদৃশ পদাঙ্গুলির মুক্তাসদৃশ নখর কণ্ডূয়ন করিতে লাগিলেন।

অন্যান্য বহুবিধ কথাবার্ত্তার পর রাজ্ঞী জিজ্ঞাসিলেন,—

'অমর! ঊর্ম্মিলাকে কি আর কখন দেখ নাই? ঊর্ম্মিলা যে আমার ভাগিনেয়ী।'

অমর কহিলেন,—

'দাস যে অদ্য আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে, সে কেবল কুমারী ঊর্ম্মিলার কৃপায়। কুমারী আমাকে বার বার মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এ জীবনে ঐ দেবীর নাম কখনই ভুলিব না।'

রাজ্ঞী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—

'সে কি কথা?'

কুমারী ঊর্ম্মিলা ধীরে ধীরে বলিলেন,—

'কি শুনিবে? কুমার হয় তো তিলকে তাল করিয়া গল্প করিবেন। তাহা শুনিয়া কি হইবে?'

অমরসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—

'আমি সত্য কথা বর্ণনা করিব। তবে এ কথা বলিয়া রাখিতেছি যে, আমি যাহা বলিব তাহা সত্য হইলেও উপন্যাসের ন্যায় অলীক ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে। কুমারী তোমাকেও বলিয়া রাখিতেছি যে, যদি আমি কোন স্থানে সত্য কথা না বলি, তাহা হইলে দয়া করিয়া তখনই তাহা ধরিয়া দিও।'

এই সময় একজন দাসী আসিয়া নিবেদিল,—

'ভগবতী অরুণমালিনী আসিয়াছেন।'

রাজ্ঞী ব্যস্ততাসহ উঠিয়া কহিলেন,—

'বৎস! ক্ষণেক অপেক্ষা কর। আমি এখনই আসিতেছি।'

রাজ্ঞী প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।'

অদ্য খোশরোজ্ বা নরোজা পর্ব্বাহ। সম্রাট্‌ভবন অদ্য আনন্দ, উৎসাহ ও কোলাহলে পূর্ণ। পাঠকগণকে এই উৎসবের কিঞ্চিৎ বিবরণ বিদিত করা বিধেয়।

নরোজা নববর্ষের প্রথম দিন; অর্থাৎ সেই দিন সূর্য্য মেষরাশিতে প্রবেশ করেন। এই দিন এদেশস্থ তাবতেরই মহানন্দের দিন। কিন্তু সম্রাট্ আকবর সে মূল নরোজা পরিবর্ত্তিত করিয়া খোশরোজ্ নামে এক অভিনব পর্ব্বের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত ও স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনের কৌশল মাত্র। এই উপলক্ষে অন্তঃপুরে ললনাকুল আনন্দউচ্ছ্বাসে ভাসিতেন। আকবরের কুটিলচক্রে বদ্ধ রাজপুতকুলসীমন্তিনীগণ ও যবন ওমরাহগণের মহিলাগণ

সেই আমোদে মিশ্রিতা হইতেন। তথায় রীতিমত বিপণিমালা সজ্জিত হইত। সম্ভ্রান্ত পুরস্ত্রীগণ ও বণিকসীমন্তিনীগণ নানাবিধ দ্রব্যজাত বিক্রয় করিতেন। আর, পাঠকগণ!—বলিতে লজ্জা করে—যিনি সম্রাট্‌কুলভূষণ বলিয়া জগন্মান্য, যাঁহার ন্যায়পরতা ও সাধুতার প্রশংসা সর্ব্ববাদিসম্মত, যাঁহার নাম অদ্যাপি ‘দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা’ বলিয়া সমাদৃত, সেই নরশ্রেষ্ঠ আকবর এক পার্শ্বে অন্তরালে থাকিয়া উপস্থিত অপ্সরাসদৃশী রূপসী যুবতীগণের সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতেন!!!

চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ শ্বেত-প্রস্তর বিনির্ম্মিত অট্টালিকাশ্রেণী। মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরাচ্ছাদিত সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। ঊর্দ্ধদেশ অতি চমৎকার শিল্প-কৌশলসম্পন্ন মনোহর চন্দ্রাতপসমাচ্ছন্ন। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকস্থ অট্টালিকাশ্রেণী পুষ্পমালায় সুশোভিত। তাহাতে অত্যুৎকৃষ্ট চিত্রসকল বিলম্বিত ও বিবিধ বর্ণের অত্যুজ্জ্বল প্রস্তর সন্নিবিষ্ট। বিশ্রামার্থ রঙ্গভূমির স্থানে স্থানে সুচারু শয্যাচ্ছাদিত পালঙ্ক সকল সংস্থাপিত। প্রাঙ্গণসীমায় স্থানে স্থানে সুন্দরী যুবতীগণ বসিয়া পণ্য বিক্রয় করিতেছেন। গোলাপের তোড়া, ফুলের মালা, ফুলের খট্টা, বাটী, টুপি, আসন, সূচীজাত-শিল্প প্রভৃতি দ্রব্য সকল বিক্রীত হইতেছে। বিক্রয়িত্রীগণ ব্যতীত সকলেই ক্রয়কারিণী। সময়ে সময়ে ক্রেত্রীদলের কেহ বা বিক্রেত্রীর স্থান গ্রহণ করিতেছেন; বিক্রেত্রী অপরা যোষিদ্‌গণের সহিত আমোদে পরিলিপ্তা হইতেছেন। অর্দ্ধমুদ্রা মূল্যের দ্রব্য পঞ্চ মুদ্রায় বিক্রীত হইতেছে! সমবেত সুন্দরীসমূহের সুখ শান্তি সংবিধানার্থ পালঙ্ক ব্যতীত স্থানে স্থানে শ্বেতপ্রস্তরাধারে আতর ও গোলাপপূর্ণ হৈমপাত্র সকল স্থাপিত। পুষ্পের তো কথাই নাই! ভূতলে, ঊর্দ্ধে, পার্শ্বে, যুবতীগণের অঞ্চলে, সর্ব্বত্র অপরিমিত গন্ধবিস্তারী পুষ্পরাশি পরিপ্লুত!

এইরূপ স্থানে বিবিধ মহার্ঘ্য বস্ত্রালঙ্কারবিশোভিত, পরমা সুন্দরী নবীনা হিন্দু ও মুসলমান সীমন্তিনীগণ যথেপ্সিত আমোদে নিমগ্না। সুন্দরী নারীগণের শোভাবর্দ্ধনকারী অলঙ্কার সমস্তের মধুর শিঞ্জিনী, রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত সপ্ত-স্বর-নিনাদিনী মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি, অযথা আনন্দের চিহ্নস্বরূপ হাস্যের উচ্ছ্বাস, নৃত্য-জনিত পাদবিক্ষেপধ্বনি, আর সুন্দরীগণকর্ত্তৃক বাদিত বীণা, সপ্তস্বরা প্রভৃতি যন্ত্রের ধ্বনি সমবেত হইয়া সম্রাট্‌প্রাসাদ অতি প্রীতিকর কোলাহলে পরিপূর্ণ করিয়াছে! রমণীগণ কেহ নাচিতেছে, কেহ গায়িতেছে, কেহ বাদ্য করিতেছে, কেহ বা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সহচরীর গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে।

এক দিকে কএকজন রাজপুত মহিলা সমবেত হইয়া একজনকে রাধা ও অপরকে কানাইয়া সাজাইয়া মহা আমোদ করিতেছেন। মানভঞ্জন প্রসঙ্গের অভিনয় দ্বারা নকল শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে স্বীয় স্বামীর কষ্টের পরিমাণ অনুমান করিতেছেন। নকল কৃষ্ণকে অপর সকলে মান ভাঙ্গিবার কৌশল শিখাইয়া দিতেছেন। অতি কষ্টে কৃত্রিম মান ভাঙ্গিল। তথায় তুমুল হাস্যের লহর উঠিল। তখন রাধাকৃষ্ণ যুগল হইয়া দাঁড়াইলেন; সহচরীগণ তাঁহাদের বেষ্টন

করিয়া করতালি দিতে দিতে গাইতে লাগিল ;—

" চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডক-
মণ্ডলবলয়িতকেশং।
" প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিত-
মেদুরমুদিরসুবেশং॥
" গোপকদম্বনিতম্ববতীমুখ-
চুম্বনলম্ভিতলোভং।
" বন্ধুজীবমধুরাধরপল্লব-
মুল্লসিতস্মিতশোভং॥
" বিপুলপুলকভুজপল্লব-
বলয়িতবল্লবযুবতীসহস্রং।
" করচরণোরসি মণিগণভূষণ-
কিরণবিভিন্নতমিস্রং॥
" মণিময়মকরমনোহরকুন্তল-
মণ্ডিতগণ্ডমুদারং।
" পীতবসনমনুগতমুনিমনুজ-
সুরাসুরবরপরিবারং॥"

আর একস্থানে কএকজন কজ্জল-নয়না যবনপ্রণয়িনী একত্রিত হইয়া নৃত্যের পারদর্শিতা দেখাইতেছেন। একজন যন্ত্র বাদন করিতেছেন, দুইজন গায়িতেছেন ও দুই দুই জন অগ্রসর হইয়া বহুবিধ নৃত্যের পরীক্ষা দিতেছেন। নর্ত্তকীদ্বয়ের গাত্রে দ্রষ্টৃবর্গ তালে তালে পুষ্প প্রক্ষেপ করিতেছেন।

রঙ্গভূমির দক্ষিণ পার্শ্বে এক নীলাম্বরাবৃতা, লাবণ্যময়ী, যুবতী দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে, দুলিতে দুলিতে সহচরীর সহিত মধুর ভাবে কথা কহিতেছেন। কি চক্ষু, কি দৃষ্টি, কি বর্ণ, কি গঠন, কি কমনীয়তা শরীরের সর্ব্বত্রই পরিণত, সর্ব্বত্রই সুকুমার! সুন্দরী রাজ-রাজ-মোহিনীরূপে বক্রভাবে দাঁড়াইয়া পার্শ্বস্থ নবীনা কামিনীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন। এই রমণী-কুল-কমলিনী রাজকবি পৃথ্বিরাজপত্নী যোধবাই।

পাঠক! আর দেখিয়াছেন, পশ্চিম দিকস্থ কিংখাপ যবনিকার অন্তরালে বাদশাহ আকবর দাঁড়াইয়া কেমন অনিমিষ লোচনে মনোমোহিনী পৃথ্বিরাজপ্রণয়িনীর প্রতি চাহিয়াছেন। এই উন্নত বয়সেও বাদশাহের লোচনযুগল হইতে বিংশবর্ষীয় যুবকাপেক্ষা ইন্দ্রিয়তৃষ্ণা-সূচক দৃষ্টি নিঃসৃত হইতেছে। সমবেত সুন্দরী মণ্ডলী নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে গাত্র বস্ত্রাদি উন্মুক্ত করিয়া মনের সুখে আমোদ করিতেছে। কে জানে বর্ষীয়ান্ ন্যায়পর বাদশাহ রমণীজন-ভূষণ লজ্জাধনাপহরণ করিতেছেন।

রঙ্গভূমির অপরদিকে যে এক নবীনা প্রবাল-খচিত স্বর্ণাভরণ মধ্যে পদ্মরাগ মণির ন্যায়, কুমুদিনীপূর্ণ নীলাকাশে চন্দ্রমার ন্যায়, পুষ্পপাত্রস্থ বহুবিধ পুষ্পের মধ্যে কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন,—পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই সুন্দরী মেহের উন্নিসা। মেহের উন্নিসা আড়ম্বর-রহিত পরিচ্ছন্ন সজ্জায় সজ্জিতা। ষোড়শী মেহের উন্নিসা অপরা সমবয়স্কা এক সুন্দরী ললনার সহিত রঙ্গভঙ্গ করিতেছেন। সেই ললনা সাহারজাদি বন্নু। মেহের উন্নিসা যাহার সহিত এক দিন আলাপ করিতেন, সেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার অতুলনীয় রূপরাশি, অসীম গুণমালা ও অপার মহিমার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া, তাঁহার নিকট চিত্ত বিক্রয় করিত।

এই কারণেই সাহারজাদি বন্নুর সহিত মেহের উন্নিসার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। মেহের উন্নিসা যখন বন্নুর সহিত নানাবিধ কৌতুকে পরিলিপ্তা রহিয়াছেন, সেই সময়ে ধীরে ধীরে আমিনী তথায় আগমন করিল। মেহের উন্নিসা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

'আমিনা! কি সংবাদ?'

আমিনী তাহার উত্তর দিতে লাগিল। ইত্যবসরে বন্নু সন্নিহিত গোলাপপূর্ণ হেমকলস লইয়া নিঃশব্দে মেহের উন্নিসার নিকটস্থ হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে তাহার অধিকাংশ মেহের উন্নিসার গাত্রে ঢালিয়া দিলেন। মেহের উন্নিসার বস্ত্র গোলাপার্দ্র হইয়া গেল। বন্নু খল্ খল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। মেহের উন্নিসা বন্নুর গলদেশ স্বীয় নবনীত বিনিন্দিত কোমল বাহুদ্বারা বেষ্টিত করিয়া কহিলেন,—

'এই ভাব কি চিরদিনই থাকিবে?'

বন্নু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

'প্রার্থনা করি মৃত্যু পর্য্যন্ত যেন এমনই ভাবই থাকে; আর প্রার্থনা তোমার সহিত এরূপ ব্যবহারের পথ যেন নষ্ট না হয়।'

মেহের উন্নিসা হাসিয়া কহিলেন,—

'তা কেমন করে হবে? যে দিন তোমার ও সরল হৃদয় পরের হবে, সেই পরের প্রেম ভিন্ন যখন আর কিছু ভাল লাগিবে না, তখন সাহার জাদি! তখন কি আর আমাদের নাম মনে থাকিবে?'

বন্নু অত্যন্ত হাসিতে হাসিতে দুই পদ সরিয়া গিয়া বলিলেন,—

'ছিঃ মেহু! তুমি আপনার কথায় আপনি ধরা পড়িলে! তবে তো দাদার সহিত তোমার বিবাহ হলে তুমি আমাকে একেবারে ভু'লে যাবে?'

মেহের উন্নিসা সবিস্ময়ে কহিলেন,—

'তোমার দাদার সহিত আমার বিবাহ হবে কে বলিল?'

'তুমি তো কিছু বল না; লোকে বলে তাই শুনিতে পাই।'

তখন মেহের উন্নিসা বলিলেন,—

'বন্নু! তোমাতে আমাতে কোনই প্রভেদ নাই; এই জন্যই তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি, তুমিই বল দেখি ভাই, সাহারজাদা সেলিমের সহিত বিবাহ হইলে আমি কি সুখী হইব?'

বন্নু অনেকক্ষণ চিন্তার পর কহিলেন;—

'না।'

'তবে কেন ভাই এ বিশ্বাস মনে স্থান দিয়াছ? তোমার কর্ত্তব্য যাহাতে এ প্রসঙ্গ আর না উঠে এবং যাহাতে ইহা কার্য্যে পরিণত না হয় তাহার চেষ্টা করা।'

বন্নু কহিলেন,—'ভগ্নি! ভয় নাই। আমি শুনিয়াছি তোমার পিতা বাদশাহের নিকট তোমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং বিবাহের অন্যত্র সম্বন্ধ হইয়াছে তাহাও জানাইয়াছেন। পিতা বলিয়াছেন বাগ্দত্তা কন্যার অন্যত্র বিবাহ হইতে পারে না। অতএব পিতার অনিচ্ছায় কিরূপে সাহার জাদার সহিত তোমার বিবাহ ঘটিতে পারে?'

মেহের উন্নিসা বন্নুর বদন চুম্বন করিয়া কহিলেন,—

'ভগ্নি! অদ্য তুমি আমায় যে সুসমাচার দিলে, তাহার প্রতিদান আমি আর

কি দিব। প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমায় সুখী করুন।'

ক্ষণকাল পরে মেহের উন্নিসা বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমিনীর সঙ্গে প্রস্থান করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের রহস্য কথা।

কএকটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া গেলে অপর এক প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া যায়। সেই প্রাঙ্গণে উপস্থিত যোষিদ্বর্গের শিবিকা সকল সংস্থাপিত আছে। মেহের উন্নিসা সেই সমস্ত প্রকোষ্ঠের দুইটি অতিক্রম করিয়া তৃতীয়টিতে পদার্পণ করিয়াছেন এমন সময় পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে শব্দ হইল,—

'মেহের উন্নিসা!'

মেহের উন্নিসা সভয়ে ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন সাহার জাদা সেলিম! মেহের উন্নিসার ভয় হইল। ভাবিলেন সাহার জাদা এ নির্জ্জনে কেন? আবার ভাবিলেন 'আমি তো একাকিনী নহি।' ফলতঃ সেলিমের মনে কোনই দুরভিসন্ধি ছিল না। বাদশাহ আকবর এ সম্বন্ধে তাঁহাকে কঠিন আজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মেহের উন্নিসার বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছে। কথা স্থির হওয়া ও কার্য্যতঃ বিবাহ হওয়া একই কথা। সুতরাং মেহের উন্নিসাকে পরস্ত্রীবৎ ব্যবহার করিতে হইবে। তদন্যথায় তিনি নিরতিশয় কুপিত হইবেন। সেলিম বুঝিয়াছেন যে, মেহের উন্নিসারূপ রত্ন লাভ করা এক্ষণে দুরাশা। তবে তাঁহার এক আশা আছে। মেহের উন্নিসার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে বাসনা সফল হইতেও পারে। তিনি স্থির করিয়া আছেন যে, মেহের উন্নিসার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া বা লোভ দেখাইয়া দেখিব যদি মত পরিবর্ত্তন করিতে পারি। কিন্তু মেহের উন্নিসা, অবিধেয় বিবেচনায় ইদানীং সম্রাট্ ভবনে সতত আগমন করেন না। সেলিম জানিতেন অদ্য মেহের উন্নিসা আসিবেনই আসিবেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, একটু সুরা সংযোগে মস্তিষ্ককে উদ্দীপ্ত রাখিলে হৃদয়ের নিভৃত ভাব সকলও বিশদরূপে ব্যক্ত করিতে পারিব সুতরাং অধিকতর ফল লাভে সমর্থ হইব। সুরার প্রতি এইরূপ অত্যধিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অনেকেই আত্ম সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনে এবং পরিণামে পরিতাপানলে দগ্ধ হয়। অবিশ্বাসিনী সুরা এক্ষণে তাঁহার যে অবস্থা করিয়া তুলিয়াছে তাহাতে মুখের কথায় পরের চিত্তাপহরণ করা বা পরের সংস্কার বিদূরিত করা সম্ভব নয়। তাঁহার আয়ত লোচন দ্বয় আরক্ত হইয়াছে ও ঢল্ ঢল্ করিতেছে; তাঁহার বদনের অনিন্দ্য গৌরবর্ণ রক্তিম হইয়াছে; তাঁহার হস্ত পদ অস্থির; তিনি এক স্থানে দাঁড়াইতে অক্ষম; তাঁহার জিহ্বা বিশুদ্ধ বাক্য কথনের ক্ষমতা বিরহিত। মেহের উন্নিসা সেলিমকে দেখিবা মাত্র সসম্মানে নিবেদিলেন,—

'জাঁহাপনা! অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি আপনাকে দেখিতে পাই নাই।'

সেলিম বলিলেন,—

'বেশ তো, বেশ তো। মেহের উন্নিসা তুমি ভাল আছ ?'

মেহের উন্নিসা বলিলেন,—

'সাহার জাদার অনুগ্রহে সমস্তই মঙ্গল।'

ক্ষণেক পরে আবার বলিলেন,—

'জাঁহাপনা! আমি এক্ষণে বিদায় হই।'

সেলিম কহিলেন,—

'ছিঃ! যাবেই তো—দুটো কথাই শুনে যাও। মনের কথা বলি শুন। তোমাকে বড় ভাল বাসি, তুমি তো বাস না; তাতেই শুন্‌তেছ না। শুন আগে, তার পর ব'লো,শের খাঁ ভাল কি সেলিম ভাল। তুমি আমাকে বিয়ে কর্‌বে না কেন ?''

সেলিম প্রকৃতিস্থ থাকিতে মেহের উন্নিসাকে বলিবেন বলিয়া যাহা স্থির করিয়াছিলেন,এক্ষণে তাহা মনে নাই। সেই সকলের অপরিস্ফুট ছায়া এক একবার তাঁহার মনে পড়িতেছে। যাহা মনে পড়িতেছে, তাহারও গ্রন্থি নাই, শৃঙ্খল নাই। সুতরাং তিনি যে উদ্দেশ্যে এই প্রলাপজাল বিস্তার করিতেছেন এতদ্দ্বারা ইষ্ট না হইয়া তৎসম্বন্ধে অনিষ্টই ঘটিতেছে। মেহের উন্নিসা সেলিমের কথা শুনিয়া লজ্জায় মস্তক নত করিয়া রহিলেন। সেলিম কহিলেন,—

'এই কি তোমার উচিত ? তুমি জান না। তোমাকে কি বলিব ? আমার মনে পড়ে না। আমি যাহা বলিতাম তাহা বলিতে পারিতেছি না। তাই বলিয়া যাইও না,—আমি তোমারই।'

মেহের উন্নিসা বুঝিলেন যে, সুরাতেজে সেলিম এক্ষণে অপ্রকৃতিস্থ আছেন। মনে মনে কহিলেন,—

'ধিক্! এই গঠন, এই যৌবন, এই অতুল সম্পত্তি,স্বভাবের দোষে তোমার সকলই বৃথা, সকলই অনর্থক।'

প্রকাশ্যে বলিলেন,—

'জাঁহাপনা! যাহা বলিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অদ্য আপনার শরীর ভাল নাই। সময়ান্তরে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।'

সেলিম কহিলেন,—

'সত্য।'

'হাঁ।'

সেলিম কহিলেন,—

'তবে এস। মনে থাকে যেন।'

মেহের উন্নিসা বিদায় হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, সেলিম কি যথার্থই আমাকে ভাল বাসেন ?—না; এ সকল মোহের উত্তেজনা। আবার ভাবিলেন, না, ইহা হৃদয়স্থিত প্রণয়-উদ্দীপনা। আবার ভাবিলেন, মোহই হউক বা প্রণয়ই হউক, সেলিমের স্বভাব অতি মন্দ তাঁহার চরিত্র অতি ঘৃণিত। তিনি প্রণয়ের উপযুক্ত নহেন। পরক্ষণেই ভাবিলেন, 'স্বভাব, চরিত্র কি পরিবর্ত্তিত হয় না? অবশ্য হয়। তবে স্বভাব মন্দ বলিয়া মনুষ্যকে ঘৃণা করা অবৈধ।' আবার ভাবিলেন, 'আমি কেন এত চিন্তা করিতেছি, উপস্থিত আয়ত্তাগত সুখ ছাড়িয়া অনুপস্থিত সুখের আশায় মত্ত হওয়া মূঢ়ের কার্য্য, মেহের উন্নিসা একটি অনতি-দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফুট স্বরে কহিলেন,—

'অনেক দূর।'

আমিনী জিজ্ঞাসিল,—

'কি বকিতেছ?'

মেহের উন্নিসা বিষণ্ণ স্বরে উত্তর দিলেন,—

'বড় গ্রীষ্ম—নয়?'

বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভণ্ডতপস্বী।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া রমণী মণ্ডলে খোস্‌রোজ আমোদ স্থগিত হইল। সীমন্তিনীগণ একে একে বিদায় হইতে লাগিলেন। সম্রাট্‌প্রাসাদ আলোকমালায় পূর্ণ হইল। পুরাভ্যন্তরে ও বহির্দ্দেশে অগণ্য আলোক প্রজ্বলিত হইল।

কামিনীকুলশিরোমণি পৃথ্বিরাজপ্রণয়িনী যোধবাই প্রধানা বেগমের নিকট হইতে বিদায় হইয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় একজন প্রৌঢ় বয়স্কা সম্রাট্‌পুরপরিচারিকা আসিয়া কহিল,—

'আপনার শিবিকা পূর্ব্ব দিকের প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করিতেছে।'

দাসী চলিয়া গেল। পৃথ্বিরাজমহিষী পূর্ব্ব দিকের এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে তিন চারি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিলেন কিন্তু বাহিরে যাইবার কোনই সুযোগ দেখিলেন না। ভাবিলেন আর দুই একটা প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিলেই হয়তো প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া যাইবে। এই ভাবিয়া যোধবাই অপর প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিলেন। অন্য প্রকোষ্ঠের ন্যায় তথায় অধিক আলোক জ্বলিতেছে না; একটিমাত্র ক্ষীণালোক লম্বিত রহিয়াছে। প্রকোষ্ঠের অন্য দ্বারাদি রুদ্ধ। যোধবাই ভাবিলেন এইটিই শেষ প্রকোষ্ঠ এই জন্য দ্বারাদি রুদ্ধ রহিয়াছে। এই ভাবিয়া পূর্ব্ব দিকের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। যেমন যোধবাই প্রবেশ করিলেন অমনই তাঁহার পশ্চাদ্দিকের উন্মুক্ত দ্বার অপরদিক হইতে রুদ্ধ হইয়া গেল। এতক্ষণে সুন্দরী শঙ্কিতা হইলেন। ভাবিলেন, কোথায় আসিলাম, কে দ্বার রোধ করিল? অধিকাংশ রমণী পশ্চিমদিকে গেল; পরিচারিকা আমাকেই পূর্ব্ব দিকে আসিতে বলিল কেন? পশ্চাৎ হইতে দ্বার রুদ্ধ হইল, সুতরাং নিশ্চয়ই আমার পশ্চাতে লোক আছে। তবে কি আমার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত হইয়াছে? তিনি সভয়ে কটিদেশে হস্তার্পণ করিলেন, দেখিলেন, তথায় চন্দ্রহাস আছে। ভাবিলেন 'তবে কিসের ভয়? সঙ্গে অস্ত্র থাকিলে রাজপুত মহিলা শমনকেও ডরে না।' তিনি অধোবদনে নিষ্কৃতির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, এমন সময় অলক্ষিত ভাবে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার হস্ত-ধারণ করিয়া কহিল,—

'সুন্দরি! কি ভাবিতেছ?'

যোধবাই সভয়ে এই পরস্ত্রী-স্পর্শকারী মূঢ়ের বদন প্রতি চাহিলেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন, সে ব্যক্তি বাদশাহ আকবর! এই বর্ষীয়ান্‌ ভুবন-বিখ্যাত, যশস্বী, ন্যায়বান্‌ নৃপতির এতাদৃশ অবৈধ ব্যবহার দর্শনে বুদ্ধিমতী যোধবাইয়ের অন্তরে যাদৃশ বিস্ময়ের উদয় হইল, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় বা তদ্বৎ প্রাকৃতিক নিয়মের বিপর্য্যয় দেখিলেও তাঁ-

হার চিত্তে তদধিক বিস্ময় জন্মিত না। যোধবাই কিয়ৎকাল সংজ্ঞাশূন্য ভাবে স্থির হইয়া রহিলেন। বাদশাহ আকবরের বুদ্ধি জগদ্বিখ্যাত। তিনি সুন্দরীকে তদবস্থাপন্না দেখিয়া তাঁহার তৎকালীন মনের ভাব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কহিলেন,—

'সুন্দরি! তুমি বিস্মিত হইতেছ? বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই। প্রেমের এই ধর্ম্ম। আমি তোমার জন্য কত কষ্টই না স্বীকার করিয়াছি। কত কৌশল করিয়া তোমাকে এই পথে আনাইয়াছি। অদ্য ভবনের এই ভাগ—

বাদশাহের কথা শেষ হইতে না হইতে যোধবাই সজোরে বাদশাহের মুষ্টিমধ্যস্থ স্বীয় হস্ত আকর্ষণ করিয়া লইলেন। হস্তস্থালন কালে তিনি এতাদৃশ বল প্রয়োগ করিলেন যে, বীরবর আকবর তাহার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পতনোন্মুখ হইলেন। যোধবাইয়ের বদনে ঘৃণা, ক্রোধ ও লজ্জার চিহ্ন প্রকটিত হইল। তিনি ওড়নার দ্বারা স্বীয় বদনাবৃত করিলেন। নির্ল্লজ্জ আকবর আবার কহিলেন,—

'ললনে! আমার প্রতি বিমুখ হইও না। আমাকে দাস বিবেচনা করিয়া আমার প্রতি করুণনেত্রে অবলোকন কর।'

'লেখনি! তুমি চূর্ণ হইয়া যাও, মস্যাধারে মসী শুষ্ক হইয়া যাউক, কাগজ! ভস্মীভূত হও। তোমাদের আর প্রয়োজন নাই। তোমরা অতল জলে নিমজ্জিত হও। যাঁহাকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিতাম, যাঁহার চরিত্র তুষার অপেক্ষাও নির্ম্মল বলিয়া জানিতাম, পরম পুণ্যাত্মা জ্ঞানে যাঁহার নাম ভক্তির সহিত স্মরণ করিতাম, তাঁহার এই চরিত্র! তবে আর কাহাকে বিশ্বাস করিব? আর কাহাকে সৎ বলিয়া উল্লেখ করিব? বুঝিলাম মানবজাতি উচ্চ চরিত্রের আদর্শ নহে; এতদুদ্দেশে তাহাদের সৃষ্টি হয় নাই। এ সকল স্মরণে লেখনী সহ হস্ত বিকম্পিত হয়। ইচ্ছা হয় আর লিখিয়া কাজ নাই; যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা বিধ্বংসিত হইয়া তাহার ভূতকলেবর ভূতের সহিত বিমিশ্রিত করুক।

যোধবাই কথা না কহিয়া পশ্চাদ্দিকে দুইপদ সরিয়া গেলেন। ইন্দ্রিয়-চপল আকবর সুন্দরীর সন্নিহিত হইয়া আবার কহিলেন,—

'সুন্দরি! তুমি আমার প্রাণেশ্বরী। আমাকে উপেক্ষা করিও না। আমি তোমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসি।'

বাদশাহ পুনরায় যোধবাইয়ের হস্ত ধারণ করিলেন। যোধবাইয়ের পবিত্র দেহ ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার পবিত্র আত্মার পবিত্র ভাব নয়নে পরিস্ফুট হইল। তাঁহার পরমসুন্দর বদন আরক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। স্বাভাবিক অনুপম সৌন্দর্য্য আরও সংবর্দ্ধিত হইল। এই সময় আকবর একবার যোধবাইয়ের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া তাঁহার বদন শোভা দেখিতে পাইলে হয়ত চিরকালের নিমিত্ত চৈতন্য হারাইতেন। আবার যোধবাই সজোরে বাদশাহের মুষ্টি হইতে স্বীয় হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন, এবং ক্রোধোত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—

'নরাধম! স্বীয় পদ-মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়াছ? যাও; এখনও বলিতেছি সহজে প্রস্থান কর। নচেৎ বিপদ ঘটিবে।'

আকবর হাসিয়া বলিলেন,—

'কেন আমার প্রতি নির্দ্দয় হইতেছ? বিবেচনা করিয়া দেখ আমি কিসে প্রণয়ের অযোগ্য?'

যোধবাই ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিলেন,—

'বাদশাহ! ছিঃ ছিঃ! আপনার ন্যায় মহোচ্চ ব্যক্তির মুখে এরূপ কথা শুনিয়া আমারই ঘোর লজ্জা হইতেছে; আপনার আরও অধিক লজ্জা হওয়া উচিত। বুদ্ধির দোষে দৈবাৎ আপনার এরূপ জঘন্য মনোবৃত্তি জন্মিয়া থাকিবে। যাহা হইয়াছে তাহার আর হাত নাই। আপনি এখনও প্রস্থান করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার গ্লানিসূচক কোন কথা কেহ জানিবে না।'

বাদশাহ ভাবিলেন, যোধবাইয়ের চিত্ত কিয়ৎ পরিমাণে নরম হইয়াছে। হাসিয়া কহিলেন,—

'প্রাণেশ্বরি!—'

যোধবাই বাধাদিয়া কহিলেন, 'আবার ঐ কথা? নিশ্চয়ই বুঝিতেছি তোমার বিপদ নিকটস্থ।'

আবার বাদশাহ হাসিয়া কহিলেন,—

'ঘোরক্ষুধা—উপাদেয় আহার্য্য সম্মুখে—অথচ ভোজনে বঞ্চিত। এতদপেক্ষা অধিক বিপদ আর কি হইতে পারে?'

যোধবাই অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া রোষকষাইত লোচনে কহিলেন,—

'পামর এখনও বোধের উদয় হইল না। এখনও পদমর্য্যাদা স্মরণ করিয়া সাবধান হও।'

বাদশাহ একথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তিনি অল্পে অল্পে সুন্দরীর সমীপস্থ হইয়া তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলেন এবং কহিলেন,—

'সুন্দরি! কেন আমাকে এত ভৎর্সনা করিতেছ? কেন আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতেছ না? তোমাকে আমি অন্তরের সহিত ভালবাসি, আমি তোমার দাসানুদাস। আমাদের এ গুপ্ত প্রণয় কেহ জানিতে পারিবে না। কাহার সাধ্য এ কথার উল্লেখ করে।'

যোধবাই মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। আকবর আবার কহিলেন,—

'সুন্দরি! ধন বল, রত্ন বল, সম্পত্তি বল আমার কিছুরই অভাব নাই। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই, তুমি আমার প্রতি কৃপা কর।'

ক্রোধবিকম্পিত স্বরে যোধবাই কহিলেন,—

'নরপ্রেত তুমি আমাকে লোভ দেখাইতেছ? ভাবিয়াছ আমি সম্পত্তি লোভে তোমার ঘৃণিত প্রস্তাবে কর্ণপাত করিব! ধিক্ তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে। সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্যের সহিত সতীত্বের বিনিময় হইতে পারে না। তুমি এ মহৎ তত্ত্ব কিরূপে বুঝিবে! তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, আমার পথ ছাড়িয়া দেও, আমি চলিয়া যাই।

বাদশাহ বুঝিলেন সহজে কার্য্যসিদ্ধ হইবে না। ভয় প্রদর্শন আবশ্যক। এই ভাবিয়া কহিলেন,—

'এতক্ষণ দয়া করিয়া তোমার নিকট সম্মতি প্রার্থনা করিলাম, বুঝিলাম তোমার সহিত সদ্ব্যবহার অরণ্যে রোদন। জান আমি কে? আমি মনে করিলে কি না করিতে পারি?'

যোধবাই তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—

'আমি জানি তুমি মানবাকারে একটি পশু। তুমি মনে করিলে অনেকের অনেক অনিষ্ট করিতে পার সত্য, কিন্তু ইহা তুমি জানিও যে,তোমার ন্যায় শত বাদশাহ একত্রিত হইলেও যোধবাইয়ের সতীত্বের বিনাশ করিতে পারে না, তোমাকে আবার বলিতেছি, আমাকে পথ ছাড়িয়া দেও; আমি প্রস্থান করি।'

আকবর সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি সুন্দরীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত বাহুপ্রসারণ করিয়া কহিলেন,—

'চতুরে! আর নিস্তার নাই; কোথায় প্রস্থান করিবে? এখানে কে সাহায্য করিবে? তোমার গর্ব্ব ভাঙ্গিতে পারি কি না দেখ।'

যোধবাই ঈষৎ সরিয়া আকবরের অপবিত্র আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন, এবং ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া মনে মনে কহিলেন,—

'মাতঃ ভবানি! দাসীকে আত্মরক্ষণে সমর্থ কর।'

তাহার পর নিমেষ মধ্যে পরিচ্ছদাভ্যন্তর হইতে চন্দ্রহাস বাহির করিলেন। প্রজ্বলিত আলোকরশ্মি উজ্জ্বল আলোকে প্রতিভাত হইয়া ঝল্লসিতে লাগিল। দর্শন মাত্র আকবর স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। যোধবাই দক্ষিণ হস্তে চন্দ্রহাস উন্নত করিয়া কহিলেন,—

'দুরাচার! আর এক পদ অগ্রসর হইলেই অদ্যকার দিন তোমার জীবনের শেষ দিন হইবে। যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করিতেছি; বিনা বাক্য ব্যয়ে এস্থান হইতে দূর হইয়া যাও।'

আকবর জ্ঞানহীনের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। বুঝিলেন এ ব্যাপারে যখন অস্ত্রের আবির্ভাব হইল, তখন ইহার পরিণাম শুভ হইতে পারে না। অতএব ইহার এই স্থানেই উপসংহার হওয়া বিধেয়। আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা আবশ্যক ভাবিয়া ধীরে ধীরে বাদশাহ কহিলেন,—

'সুন্দরি।'—

বাক্য বাদশাহের বদন বিনির্গত হইবামাত্র যোধবাই অগ্রসর হইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—

'তোমার অথবা আমার অথবা উভয়ের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে। আইস,মূঢ়,অস্ত্রাগ্রে তোমার আশার শেষ দেখাইয়া দি।'

আকবর উত্তোলিত অস্ত্রের আঘাত হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থ পিছাইয়া গেলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, বাসনা সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বিরল। এখনও ক্ষান্ত না হইলে, যে পক্ষেই হউক,একটা বিপদ ঘটিতে পারে। বুদ্ধিমান্ আকবর এই সিদ্ধান্ত করিয়া ক্ষান্ত হওয়াই স্থির করিলেন। যাইবার সময় একটা কথা বলিয়া যাইব ভাবিয়া একবার

মুখ তুলিলেন। কিন্তু যোধবাইয়ের নয়নের প্রদীপ্ত ও উচাটন ভাব লক্ষ্য করিয়া কিছুই বলিতে সাহস করিলেন না। অবশেষে ধীরে ধীরে পশ্চাদ্দিকে যোধবাইয়ের প্রতি সোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে দ্বার উন্মোচন করিয়া ভগ্ন মনোরথ আকবর অপমানিত চোরের ন্যায় পলায়ন করিলেন।

দিনাজপুরের প্রস্তর-স্তম্ভ-লিপি।

দিনাজপুরের অন্তর্গত গঙ্গারামপুর থানার অধীন একটি সামান্য অরণ্য সাধারণতঃ "বাণরাজার বাটী" আখ্যাদ্বারা পরিচিত। এই স্থানে অট্টালিকাদির রাশীকৃত ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্য হইতে একটি প্রস্তরস্তম্ভ দিনাজপুর রাজবাটীতে নীত হইয়াছে। সেই স্তম্ভে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ রহিয়াছে,—

দুর্ব্বারারি বরূথিনী প্রমথনে দানেচ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণ গুণ গ্রাম গ্রহো-গীয়তে।
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দু মৌলেরয়ম্
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ॥

বিজ্ঞবর ওয়েষ্ট্‌মেকট সাহেব এই প্রস্তর-স্তম্ভ লিপির বিবরণ দুইখানি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। * উক্ত সাহেবের অনুরোধ ক্রমে শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তর শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"By him, whose ability in subduing the forces of his irresistible enemies, and liberality in appreciating the merits of his suitors, are sung by the Vidyadharas in celestial spheres, by that sovereign of Gour; by him, who is descended from the Kambojan line, this temple the beauty of the Earth, was erected for the *Selenecephalous*, in the year 888."

মিত্র মহোদয় অসন্দিগ্ধ চিত্তে এইরূপ অর্থ করেন নাই। কারণ, মন্তব্য স্থলে তিনি লিখিয়াছেন;—'The figures I derive from the words *kunjaraghata*, *kunjara* being equal to 8, the eight elephants of the quarters, and *ghata* threefold or plural. The two dots at the end might be allowed to remain to make it correspond with the

* Indian Antiquary. 1872. April, page 127. and Calcutta Review. Vol LIX. page 90.

masculine *prasada*, though the word *bhusana* does not take the masculine affix. This appears to me to be the true meaning. But if the words *varshe* be a mislection of *varshmana*, it would mean *a temple which has many elephants carved* upon it."

এই শ্লোকে স্থানে স্থানে পাঠের পরিবর্ত্তন করিলে ভাবার্থ সম্বন্ধিনী চমৎকারিতার বৃদ্ধি সম্পাদন করা যাইতে পারে। 'প্রমথনে দানেচ' এই স্থলে 'প্রমথনাদানেচ' এই পাঠ কল্পনা করিলে, প্রথম দুই-চরণের এই রূপ অর্থ করা যাইতে পারে—'দুর্ব্বার শত্রু সৈন্যের বিনাশে ও সম্যক রূপ ছেদন বা উন্মূলনে যাঁহার অস্ত্রশক্তি বিদ্যাধরগণ সানন্দে স্বর্গলোকে গান করিয়া থাকে' অথবা 'দুর্ব্বার শত্রুসৈন্য বিনাশ স্বীকারে যাঁহার ইত্যাদি।' ওয়েষ্টমেকট সাহেবের উদ্ধৃত পাঠ সঙ্গত ও প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিলে—'দুর্ব্বারারি সৈন্য প্রমথনে ও ছেদনে (শত্রুসৈন্যের ছেদন বা উন্মূলনে) যাঁহার অস্ত্র শক্তি-ইত্যাদি—' অর্থই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শ্রদ্ধেয় মিত্র মহোদয় যে কি ভাবিয়া কি অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। 'মার্গণ গুণ গ্রাম গ্রহঃ' ইহার সহিত 'দুর্ব্বারারিবরূথিনী প্রমথনে' ও 'দানে' এই উভয়ের তুল্যান্বয়তার বিরুদ্ধ কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত। কিন্তু মিত্র মহোদয় দেখিলেন দানশীলতার সহিত অস্ত্র শিক্ষার কোনও সম্বন্ধ নাই; সুতরাং 'মার্গণ গুণ গ্রাম গ্রহঃ' ইহার সহিত কেবল 'দুর্ব্বারারি—প্রমথনে' ইহার অন্বয় কল্পনা করিয়া, 'দানে' এই পদটিকে পৃথক্ করিয়াছেন, এবং liberality in appreciating the merits of his suitors' (অনুগ্রহ প্রার্থিদিগের দোষ গুণ বিচারে উদারতা) ইংরেজীতে তাহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবংবিধ ব্যাখ্যান বুধমণ্ডলীর শিরোভূষণ মিত্র মহোদয়ের ন্যায় ব্যক্তির লেখনী নিঃসৃত হইলেও তাহা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা দুঃসাধ্য।

চতুর্থ চরণে 'কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ' আর একটি বিবাদস্থল। শ্রদ্ধেয় মিত্র মহোদয় 'কুঞ্জর' শব্দের অর্থ ৮ ও 'ঘটা' (বা সমূহ) শব্দের অর্থ ৩ কল্পনা করিয়া 'কুঞ্জর ঘটাবর্ষেণ' পদের অর্থ—'৮৮৮ শকে' করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রকার অর্থ নির্দ্ধারণ অবশ্যই কষ্ট কল্পনা বলিয়া স্বীকার্য্য। কুঞ্জর শব্দের অর্থ ৮; ঘটা শব্দের অর্থ যদি ৩ হয়, তবে 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' এই নিয়মানুসারে 'কুঞ্জরঘটা' বলিতে '৩৮' বুঝিতে হইবে। ৩টি আট ধরিয়া অর্থ করিতে হইলে ৮৮৮ অপেক্ষা বরং ২৪ই অধিক সঙ্গত। এই সকল আপত্তির খণ্ডন হইলেও মিত্র মহোদয়ের কৃত ব্যাখ্যানে আর একটি মহান্ দোষ ঘটে। 'কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ' তৃতীয়ান্ত পদ সুতরাং '৮৮৮ সনে', '২৪ সনে' বা '৩৮ সনে' এইরূপ অর্থ নির্দ্ধারণ কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে? 'কুঞ্জরঘটাবর্ষৈঃ' পদ থাকিত তবে—অন্যান্য আপত্তি ভঞ্জন হইলে—মন্দির নির্ম্মাণে ৮৮৮, ২৪ বা ৩৮ বৎসর লাগিয়াছিল—করা যাইতে পারিত। আমাদের মতে এখানে 'বর্ষ' শব্দ বৎস-

রার্থবাচী নহে। 'কুঞ্জর ঘটাবর্ষেণ' ই-
হার অর্থ 'হস্তি সমূহের বর্ষ বা আধিক্য'
এবং 'কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ' ইহার অর্থ
'কুঞ্জর সমূহ উৎকীর্ণ থাকাতে পৃথিবীর
শোভা স্বরূপ'। 'বর্ম্মেণ' এইরূপ পাঠ
থাকিলে 'কুঞ্জর ঘটাবর্ম্মেণ ভূভূষণঃ', ই-
হার 'কুঞ্জর সমূহের প্রমাণ দ্বারা (অর্থাৎ
বৃহদাকার হস্তি সমূহ উৎকীর্ণ থাকাতে)
পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ' এইরূপ অর্থ নির্দ্ধা-
রণ করিতাম। শ্লোকটি যে ভাবে উদ্ধৃত
হইয়াছে তাহাতে আমরা তাহার নিম্ন লি-
খিত রূপ অর্থ করিব।

By that king of Gour, descended from the Kamboja family,—the excellence of whose weapens in the act of destroying the forces of his irresistible enemies and in the act of cutting (them) down is sung by Vidyadharas in celestial spheres—was erected this temple of the Moon-headed-deity; the beauty of the Earth by the shower (large number) of a multitude of Elephants (carved upon it.)

দুর্ব্বার অরি সৈন্যের প্রমথনে ও ছেদনে
যাহার অস্ত্র শক্তি বিদ্যাধরদিগকর্ত্তৃক স্বর্গ
লোকে গীত হইয়া থাকে, কাম্বোজান্বয়জ
সেই গৌড় পতি কর্ত্তৃক কুঞ্জরঘটাবর্ষ দ্বারা
(বহু সংখ্যক হস্তী উৎকীর্ণ থাকা বশতঃ)
পৃথিবীর শোভা স্বরূপ এই চন্দ্রাপীড়-প্রা-
সাদ নির্ম্মিত হইয়াছে।

'মুনীনাঞ্চ মতি ভ্রমঃ' পূজ্য পাদ মিত্র
মহোদয়ের নিকট বিনীতভাবে বিদায় গ্রহণ
পূর্ব্বক এইক্ষণ আমরা বিজ্ঞবর লালমোহন
বাবুর সহিত একটু নির্দ্দোষ আমোদ
করিব।

লালমোহন বাবুও এই কবিতাটি প্রকাশ
করিয়াছেন। কিন্তু ইহার অর্থ সম্বন্ধে তিনি
যাহা লিখিয়াছেন তৎপাঠে বোধ হয় যে,
লালমোহন বাবু দিনাজপুর রাজ বাটীতে
শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, লোকে এই শ্লোক
পাঠে (এই) 'শিবমন্দির ৮৮৮ অব্দে নি-
র্ম্মিত হইয়াছিল' এইরূপ অর্থ করিয়া
থাকেন। লালমোহন বাবু একজন বিজ্ঞ
ব্যক্তি, তিনি শ্লোকের অর্থ সম্বন্ধে মুহূর্ত্ত-
কাল চিন্তা না করিয়াই লিখিলেন—'যে
শ্লোকটি লিখিত আছে, তাহার অর্থ সংগ্রহ
করিলে তাহাকে ৮৮৮ সংবতে * ঐ মন্দির
প্রতিষ্ঠা (দিনাজপুর রাজ বাটীতে অনুসন্ধান
কর) করিতে অধিকারী বলাযাইতে পারে।'

* মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি, কাত্যায়নকে
লক্ষ্য করিয়া দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে 'ত
দ্ধিত-প্রিয়' বলিয়া উপহাস করিয়াছেন।
শকাব্দপ্রিয় বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে একমাত্র
লালমোহন বাবুকে অদ্য আমরা 'সংবৎ
প্রিয়' আখ্যাদান না করিয়া বিরত হইতে
পারিলাম না। ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতের
'৯৯৯ শকাব্দ' (নবনবত্যধিক-নবশতী শ-
কাব্দে) এর পরিবর্ত্তে তিনি '৯৯৯ সংবৎ'
লিখিয়াছেন। এই শ্লোকেও যদি তর্ক
স্থলে '৮৮৮ অব্দ' স্বীকার করা যায়, তবে
সেই অব্দ সংবৎ কি শকাব্দ তাহার কোন
নিশ্চয় নাই; লালমোহন বাবু মুক্ত কণ্ঠে
ইহাকে সংবৎ ঘোষণা করিয়াছেন।

লালমোহন বাবু এবংবিধ অশুদ্ধ অর্থের উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গ ইতিহাসের একটি দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া বসিয়াছেন।

লালমোহন বাবুর মতে পাল গৌড়েশ্বর দিগের তিরোধানান্তে ও আদিশূরের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কাম্বোজ বংশজ রাজগণ বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন। এ শিবমন্দির তাঁহাদেরই নির্ম্মিত। বিজ্ঞবর ওয়েষ্ট্‌ মেকট সাহেব উৎকীর্ণ অক্ষর দর্শনে এই মন্দির কোনও একজন পাল গৌড়েশ্বরের নির্ম্মিত বিবেচনা করেন। বোধ হয় এই বাক্য শ্রবণ করিলে লালমোহন বাবুর হৃৎকম্প হইবে। যদিচ আমরা ওয়েষ্ট্‌ মেকট সাহেবের নির্দ্দেশ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছি না, তথাপি বৌদ্ধ পাল গৌড়েশ্বর গণ কর্ত্তৃক শিবমন্দির নির্ম্মিত হওয়া অসম্ভব বোধ করি না। ভ্রমসঙ্কুল কুলজি গ্রন্থের সাহায্যে লালমোহন বাবু পাল রাজ গণের চরিত্র যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে তাহাদের চরিত্র তদ্রূপ ছিল না। এ সম্বন্ধে আমরা যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি স্বতন্ত্র গ্রন্থে প্রকাশিত হইবে।

লালমোহন বাবু বলেন—'অনেকেই জানেন যে পাল বংশীয়েরা গৌড় রাজ্যে আদিশূরের অনেক পূর্ব্বে রাজত্ব করেন।' এবম্প্রকার উক্তি আমাদিগের সমক্ষে নিতান্ত অভিনব ও অকর্ম্মণ্য বোধ হইতেছে। শ্রদ্ধাস্পদ মিত্র মহোদয়ের মতেও আদিশূর (নামান্তর বীরসেন) †, পাল বংশীয় ষষ্ঠ নরপতি রাজ পালের কিঞ্চিৎ কনিষ্ঠ। প্রবন্ধান্তরে আমরা আদিশূরকে সপ্তম কিংবা অষ্টম শতাব্দীর লোক অবধারণ করিয়াছি। আবুল ফাজেল প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারগণও আদিশূরকে পাল রাজগণ হইতে প্রাচীন লিখিয়াছেন।

লালমোহন বাবু বলেন—'আদিশূরের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম একবারে নির্ধূম হয়।' বৌদ্ধ গয়ার উৎকীর্ণ ফলক পাঠে সেনবংশীয় শেষ নরপতি অশোক চন্দ্র (লাক্ষ্মণেয়) দেবের শাসন কালেও (৫৭ লক্ষ্মণাব্দে) বাঙ্গলায় বৌদ্ধের অস্তিত্ব অনুমিত হইয়াছে।

শ্রীঃ—

† আমরা 'বীরসেন' আদিশূরের নামান্তর স্বীকার করিতে পারি না। কারণ, আদিশূর গৌড়ের রাজা, বীরসেন দাক্ষিণাত্যের কোন প্রদেশাধিপতি। বীরসেনের উত্তরপুরুষ বীজয়সেনই প্রথম বাঙ্গালার রাজদণ্ড ধারণ করেন। রাজসাহির প্রস্তর ফলক ও চোলরাজকুলতুঙ্গার তাম্রশাসন আমাদের বাক্য পোষণ করিতেছে।

মহম্মদের উত্তরাধিকারিগণ।

(৫৬ পৃষ্ঠার পর।)

অষ্টম অধ্যায়।

মহম্মদশিষ্যগণের এত দ্রুত বিজয় লাভ দৃষ্টে সম্রাট্ হিরাক্লিয়স্ তাঁহার সীরিয়া রাজ্য শত্রুহস্তে পতিত হইবে আশঙ্কায় ভীত হইলেন। ইয়ুরোপ এবং আসিয়া উভয় মহাদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ এবং আক্রান্ত রাজ্যের নানাস্থানে জল ও স্থল পথে প্রেরিত হইতে লাগিল। মূল সৈন্য অশীতি সহস্রলোক মুসলমানসৈন্যের বিরুদ্ধে মানুয়েল্ (আরবীয় ঐতিহাসিক তাঁহাকে মাহান্ বলেন) নামক প্রসিদ্ধ সেনাপতির অধীনে প্রেরিত হইল। পথে গাসান জাতির রাজা জাবালা ইবিন্ আল্ আয়েন্ হাম্ নামক খৃষ্টীয়ানের সহিত মিলিত হইল। জাবালা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু নিম্নলিখিত অবস্থায় ঘটনা ক্রমে সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। সে খলিফা ওমারের সহিত মক্কা গমন করে। সেখানে কাবা প্রস্তর সপ্তবার প্রদক্ষিণ করার সময় একজন আরব তাহার পবিত্র শরীরাবরণপ্রান্ত পদমর্দ্দিত করাতে বস্ত্র তাহার শরীর হইতে পড়িয়া গেল। সে তখন নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল " 'তুই নিপাত যা' তুই আমার পৃষ্ঠদেশ ঈশ্বরের পবিত্র গৃহে অনাবৃত করিলি!" সে ব্যক্তি, হঠাৎ এই কার্য্য হইয়াছে, ইচ্ছা করিয়া করে নাই, বলিয়া প্রতিবাদ করিতে লাগিল। কিন্তু জাবালা তাহার মুখমণ্ডল ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাহার চারিটি দন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সে ব্যক্তি ওমারের নিকট অভিযোগ করাতে জাবালা যে অবমানিত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিল, 'যদি কাবার প্রতি সম্মানের অনুরোধ এবং এই পবিত্র নগরে শোণিতপাত নিষিদ্ধ না থাকিত, আমি এ ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিতাম।' ওমার বলিলেন, "তুমি তোমার অপরাধ স্বীকার করিয়াছ; যদি তোমার বিপক্ষ ক্ষমা না করে, তবে প্রতিহিংসার আইনের অধীন হইতে হইবে,—'চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, দন্তের বিনিময়ে দন্ত' হারাইতে হইবে।" জাবালা বলিল, 'আমি রাজা, বিপক্ষ একজন কৃষক'। ওমার বলিলেন 'তোমরা উভয়েই মুসলমান, আল্লা ব্যক্তিগত মর্য্যাদা গ্রাহ্য করেন না, তাঁহার চক্ষে তোমরা উভয়ে সমান।' জাবালা ওমারের অনমনীয় ন্যায়-দণ্ড এই পর্য্যন্ত নোয়াইতে পারিল যে, দণ্ডাজ্ঞা পরদিন প্রতিপালিত হইবে। রজনীতে সে পলায়ন করিয়া কনষ্ট্যান্টিনোপলে গমন করিল। সে খানে মহম্মদীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ

পূর্ব্বক খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিল এবং সম্রাট্ হিরাক্লিয়সের চাকরী লইল। এক্ষণে সে ষষ্ঠি সহস্র আরব ম্যানুয়েলের সাহায্যে আনয়ন করিল। এইরূপ সৈন্যের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে মুসলমানেরা জয়লাভ করিয়াও ইমিসা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহারা নাতিশীতোষ্ণ, নিকুঞ্জবিরাজিত যার্ম্মূক নামক অপ্রসিদ্ধ স্থানে উক্ত নামধারী ক্ষুদ্র তটিনীর তটে শিবির সন্নিবেশ করিল। পরিশেষে ঐ স্থানেই সীরিয়ার অদৃষ্টশাসন ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল।

ম্যানুয়েল ধীরে ধীরে সাবধানে তাঁহার সুসজ্জিত সৈন্যগণ সহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রগামী আরব সৈন্য সহকারে সমস্ত স্থান লুণ্ঠন করিতে অগ্রসর হইবার জন্য জাবালাকে পাঠাইলেন। তিনি জানিতেন মরুবাসী মুসলমান সৈন্য সেই উপায়ে সহজে পরাভূত হইবে, 'হীরক ব্যতীত হীরক কাটাযায় না' একথা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। এইরূপে মিলিত সৈন্য যে স্থান দিয়া যাইতে লাগিল সে সমস্ত স্থান লুণ্ঠন, অত্যাচার প্রভৃতিতে মরু তুল্য হইয়া উঠিল। যে সমস্ত খৃষ্টীয়ান মুসলমান সৈন্যগণের সহিত সন্ধিবন্ধন বা তাহাদের নিকট নগর সমর্পণ করিয়াছিল, তাহাদের অপমান, অনিষ্ট ও দুর্দ্দশার পরিসীমা রহিল না। ম্যানুয়েল সৈন্য সহ দূরে থাকিতেই সম্রাটের উপদেশানুযায়ী আবুওবীদার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলে আবুওবীদা তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু তিনি জাবালার নিকট বারবার দূত প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহার স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ, এবং স্বদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি জন্য ভৎর্সনা করিলেন; এবং যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু জাবালা বলিল সে তাহার ধর্ম্ম ও বিশ্বাস সমস্ত সম্রাটের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়াছে, তাঁহারই পক্ষে যুদ্ধ করিবে।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া খালেদ প্রস্তাব করিলেন যে, ধর্ম্মত্যাগীকে তিনি হস্তগত করিবেন। তিনি বলিলেন, "মূল সৈন্য ছাড়িয়া জাবালা অনেক পূর্ব্বে আসিয়াছে। আমাকে আমার মনোমত কএকজন সৈন্য সঙ্গে লইয়া যাইতে দেও, ম্যানুয়েল আসিবার পূর্ব্বেই আমি তাহাকে আক্রমণ করিব।"

এই প্রস্তাব নিতান্ত দুঃসাহসিকতা এবং বৃথা আড়ম্বরজনক বলিয়া অনেকে অবজ্ঞা করিল। খালেদ উৎসাহের সহিত বলিলেন, 'কখনই নহে। এই নাস্তিকের সৈন্য সয়তানের সৈন্য বই কিছুই নহে। আল্লার সৈন্যগণকে তিনি স্বর্গীয় দূতগণ প্রেরণ পূর্ব্বক সহায়তা করিবেন, তাহারা কিছু করিতে পারিবে না।'

এরূপ পবিত্র যুক্তির বিরুদ্ধে কে কি বলিবে? খালেদ সৈন্যনির্ব্বাচনে অনুমতি পাইয়া পরীক্ষিতপরাক্রম সেনাগণকে বাছিয়া লইলেন। তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে জাবালার সৈন্য আক্রমণ করিলেন। সে প্রস্তুত ছিল না, সুতরাং তাহার সৈন্যগণ শ্রেণীভঙ্গ হইল; অনেকে শমন-সদনে গমন করিল, অবশিষ্ট সৈন্য পলাইয়া মূল

সৈন্য দলে মিলিত হইল। খালেদ এই জয়লাভে সুখী হইলেন না। কারণ ইয়েদ, রফী, দিরার প্রভৃতি শক্রহস্তে পতিত এবং বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক পলায়ন সময়ে বন্দীস্বরূপ নীত হইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে আবদুল্লা ইবিন্ কর্ট নামক এক ব্যক্তিকে আবুওবীদা মদীনায় খলিফার নিকট পাঠাইয়া মুসলমান সৈন্যের বিপন্ন অবস্থা এবং শীঘ্র সাহায্য প্রেরিত না হইলে সর্ব্বনাশ হইবে জ্ঞাপন করিলেন। খলিফা মহম্মদের বেদীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া সনাতন ধর্ম্ম, ঈশ্বর এবং তাঁহার প্রেরিতের অনুরোধে যুদ্ধ করার গৌরব বর্ণন পূর্ব্বক বক্তৃতা করিলেন। অনন্তর তিনি আবদুল্লার নিকট আবুওবীদার নামে একখানি পত্র দিলেন। তাহাতে কোরাণ হইতে উপদেশ উদ্ধৃত হইল; তিনি সেনাপতির মঙ্গলার্থ উপাসনা করিবেন এবং শীঘ্র সাহায্য পাঠাইবেন লিখিত হইল। অনন্তর, দূত আবদুল্লাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অতিক্রুত সীরিয়ায় পাঠাইয়া দিলেন।

আবদুল্লা অনেক দূরে আসিয়াছেন এমন সময় তাঁহার স্মরণ হইল তিনি মহম্মদের সমাধিস্থান দর্শন করেন নাই। তিনি ফিরিয়া গেলেন, আয়েষার গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মহম্মদের সমাধি মন্দির ছিল। তিনি দেখিতে পাইলেন রূপবতী বিধবা ললনা আয়েষা সমাধিস্থল পার্শ্বে বসিয়া আছেন, আলী এবং আব্বাস্ কোরাণ পড়িতেছিলেন, তাহাই শুনিতেছিলেন; হাসন, হোসেন নামক আলীর পুত্র, মহম্মদের দৌহিত্র দ্বয় হাঁটুর উপর বসিয়াছিলেন।

মহম্মদের সমাধিস্থলে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনান্তে সদ্বিবেচক আবদুল্লা প্রকাশ করিলেন যে, এই বিলম্বে যুদ্ধের পূর্ব্বে সৈন্য সহ মিলিত হইতে পারিবেন না ভয়ে তিনি শঙ্কিত হইয়াছেন। তখন সকলেই স্বর্গে হস্ত উত্তোলন করিলেন, তাঁহার শীঘ্র গমন জন্য আলী উপাসনা করিলেন। তিনি এমনই দ্রুত বেগে প্রস্থান করিলেন যে সৈন্যগণ ইহা দুর্ব্বোধ্য দৈবানুগ্রহ বিবেচনায় ওমারের আশীর্ব্বাদ এবং আলীর উপাসনা-ফল লব্ধ মনে করিতে লাগিল।

শীঘ্রই অঙ্গীকৃত সাহায্য প্রেরিত হইল। ওমার সৈয়দ্ ইবিন্ আমীর নামক একব্যক্তির নিকট রক্তবর্ণ রেশমের পতাকা এবং আটহাজার সৈন্য প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহাদের প্রস্থান সময় এই উপদেশ দিলেন আপনাকে এবং অধীনস্থ সৈন্যগণকে শাসনে রাখিতে হইবে, ইন্দ্রিয় যেন তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে না পারে।

সৈয়দ, মুসলমানের স্বভাবসিদ্ধ সারল্যের সহিত বলিলেন 'আপনি মনুষ্যকে ভয় না করিয়া ঈশ্বরকে ভয় করিবেন; আপনার স্বগণের ন্যায় সমস্ত মুসলমানকে ভালবাসিবেন। যাহারা দূরে রহিয়াছে এবং যাহারা নিকটে রহিয়াছে সকলকে সমভাবে প্রতিপালন করিবেন।' অবশেষে যাহা ন্যায়সঙ্গত তাহা ব্যতীত আর কিছুই না করিতে এবং যাহা অসঙ্গত তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নিষেধ না করিতে উপদেশ দিলেন। খলিফা হস্তস্থিত যষ্টির উপর মস্তক রাখিয়া অবহিতচিত্তে শুনিতে ছিলেন, সৈয়দের

বন্দা শেষ হইলে মস্তক উত্তোলন করিলেন। তাঁহার চক্ষুদিয়া দরদর ধারে অশ্রুপাত হইতেছিল। তিনি বলিলেন, 'হায়! ঈশ্বর সহায় না হইলে এ সমস্ত কে করিতে পারে?'

সৈয়দ্ ইবিন আমীর মরুভূমির মধ্য দিয়া সোজা পথে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু কেবল বেগে গমন মাত্র মনে রাখিয়াছিলেন, বিশেষ প্রণিধান না করাতে পথ হারাইলেন। একদা রজনী যোগে কথক গুলি কূপসমীপে শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক পন্থানিরূপণের চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন যে, আমনের শাসনকর্ত্তা পাঁচ সহস্র সৈন্য সহ অনতিদূরে উপস্থিত আছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক পদাতিকগণকে খণ্ড খণ্ড করিলেন। শাসনকর্ত্তা অশ্বারোহিগণ সহ পলায়ন করিতেছিলেন, পথি মধ্যে খাদ্যাদির অন্বেষণে বিনির্গত একদল মুসলমান সৈন্য সহ সাক্ষাৎ হওয়াতে তুমুল সংগ্রাম হইল। তাহাদের দলপতি জব্বের শাসনকর্ত্তার হৃদয় বল্লমবিদ্ধ করিল। একজন খৃষ্টীয়ান সৈন্যও জীবিত রহিল না। মুসলমানগণ মৃত খৃষ্টীয়ানগণের মস্তক বল্লমবিদ্ধ করিয়া শিবিরে প্রত্যাগত হইলে আবুওবীদা এবং তাঁহার সৈন্যগণ বিলক্ষণ উৎসাহিত হইলেন।

সম্রাট্ সৈন্য নিকটস্থ হইল, ম্যানুয়েল পুনরায় সন্ধির চেষ্টা পাইলেন। খালেদ সন্ধির প্রস্তাব লইয়া যাইতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু আবু সোফিয়ান, দিরার, রফী এবং অন্য দুইজন সেনানী তাঁহার এই প্রিয় সহচরগণ বিধর্ম্মী জাবালার সহিত যুদ্ধে যে বন্দী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করাই খালেদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

খালেদ খৃষ্টীয়ান সৈন্যের প্রথম স্থানে উপস্থিত হইলে তাহারা তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গীয় একশত সৈন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেনাপতির সমক্ষে একাকী যাইতে বলিল। তিনি অস্বীকার করিলেন। তিনি এবং তাঁহার সৈন্যগণ অশ্বপৃষ্ঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসি শত্রুহস্তে প্রদান করিবেন। খালেদ এ প্রস্তাবেও অসম্মত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ তর্কবিতর্কের পর ইচ্ছামত সেনাপতির সন্নিধানে যাইতে অনুমতি পাইলেন।

ম্যানুয়েল গৌরবের সহিত সিংহাসন সদৃশ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, সুসজ্জিত সেনানীগণ চারিপার্শ্বে বসিয়াছিল। খালেদ সামান্যভাবে সজ্জিত রণ-কুশল শত অনুচরের সহিত প্রবেশ করিলেন। তাঁহার এবং তাঁহার পদস্থ সঙ্গীয়গণের উপবেশন জন্য বেত্রাসন প্রদত্ত হইল। কিন্তু তাঁহারা তাহা রাখিয়া দিয়া মৃত্তিকায় আরব-প্রণালীতে বীরাসনে উপবেশন করিলেন। ম্যানুয়েল কারণ জিজ্ঞাসা করিলে খালেদ কোরাণের বিংশতি অধ্যায় হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উত্তর দিলেন, "তোমরা মৃত্তিকা দ্বারা সৃজিত, মৃত্তিকা হইতে আগত, মৃত্তিকাতেই বিলীন হইবে।' তিনি বলিলেন 'ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি মনুষ্যের উপদেশ জন্য যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আপনার পট্টবস্ত্রাদি হইতে অধিক মূল্যবান্।'

ম্যানুয়েল প্রথমতঃ বলিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমানগণ তাহাদের প্রতিবেশিগণের রাজ্যে অকারণে প্রবেশ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের ধর্ম্মোপাসনার ব্যাঘাত করিতেছে, তাহাদের স্ত্রী এবং সম্পত্তি অপহরণ করিতেছে, তাহাদিগকে দাসরূপে বন্দী লইতেছে; এইরূপ নানা বাক্যপ্রয়োগ পূর্ব্বক প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। খালেদ প্রত্যুত্তরে বলিলেন 'ঈশ্বর একজন মাত্র, তাহার আর স্বগণ বা সহযোগী নাই, মহম্মদ তাহার প্রেরিত, অবাধ্যতাবশতঃ তাহারা এই কথা অস্বীকার করাতেই সকল অনর্থ ঘটিতেছে। বাদানুবাদ প্রবল হইয়া উঠিল। খালেদ্ ক্রুদ্ধ হইয়া ম্যানুয়েল্‌কে বলিলেন, আপনি দেখিতে পাইবেন একদা আপনি গলফাঁসযুক্ত হইয়া ওমারের সমক্ষে নীত হইবেন; সেখানে নাস্তিকগণের শাসন এবং সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণের উপদেশ প্রদান জন্য আপনার শিরশ্ছেদ হইবে।'

ম্যানুয়েল্ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'যদি আপনি দৌত্যের আবরণে রক্ষিত না হইতেন, তবে আজ রক্ষা ছিল না। আপনার এই অবিমৃষ্যকারিতার প্রতিফল স্বরূপ আপনার বন্ধু পাঁচজন কয়েদীর এই মুহূর্ত্তে শিরশ্ছেদ করিব।' খালেদ্ বলিলেন, আপনি আপনার কথা কার্য্যে পরিণত করিতে সাহস থাকিলে এক্ষণ করুন, আপত্তি নাই। কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষী, নিশ্চয় জানিবেন কাবার দোহাই দিয়া বলিতেছি, যদি আপনি ইহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করেন, এখনই আপনাকে এই স্থানেই দ্বিখণ্ড করিব, আমার অনুচরগণ আপনার এক একজন সৈন্য এক একজনে হত্যা করিবে। বলিবা মাত্র তিনি উঠিয়া অসি নিষ্কোষিত করিলেন, তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল।

সম্রাটের সেনাপতি খালেদের সাহস দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন তিনি মৃদুভাবে বলিলেন, তিনি ভয় প্রদর্শন করিলেন মাত্র, তাঁহার হৃদয়ে দয়া আছে; খালেদ্ দূতের কার্য্য নির্ব্বাহে আসিয়াছেন, তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান করিবেন, ওরূপ কখনও হইতে দিবেন না।

পরিশেষে খালেদের নিকট ম্যানুয়েল্ বন্দী পাঁচ জনকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় দিলেন। খালেদ যে একটি বস্ত্রগৃহ খৃষ্টীয়ান শিবিরে আনয়ন পূর্ব্বক বিস্তার করিয়াছিলেন, ম্যানুয়েল্ তৎসম্বন্ধে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে খালেদ্ তাহা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। এইরূপে সন্ধির প্রস্তাব শেষ হইল। উভয় পক্ষ পরস্পরের জন্য বীরবৎ শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরের নিকট বিদায় লইলেন।

সীরিয়ার অদৃষ্ট মীমাংসার শেষ যুদ্ধ সন্নিকট হইয়া আসিল। একটি বৃহৎ যুদ্ধে সমস্ত নিষ্পত্তি হয়, সম্রাটের এই অভিপ্রায় ছিল। আবুওবীদা এই যুদ্ধের ফলের গুরুত্ব এবং সম্মুখ যুদ্ধে আপনার তদুপযুক্ত শক্তির অভাব বুঝিতে পারিয়া উদারতার সহিত কার্য্য করিলেন;—সমস্ত কর্তৃত্ব খালেদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি স্বয়ং

ললনাগণ সহ পশ্চাদ্ভাগে রহিলেন; অভিপ্রায় এই যে, কেহ পলায়নে প্রবৃত্ত হইলে তিনি তাহাকে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইবেন। সেখানে তিনি আবুবেকার প্রদত্ত পীতবর্ণ পতাকা উত্তোলন করিলেন, ঐ পতাকা মহম্মদ খাইবার যুদ্ধে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

যুদ্ধের প্রাক্কালে খালেদ্ সৈন্যগণ মধ্যে বিচরণ করিয়া সংক্ষেপ কিন্তু ওজস্বিনী বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন "সম্মুখে স্বর্গ, তোমাদের পশ্চাতে প্রেত ও নরক। সাহসের সহিত যুদ্ধ কর, স্বর্গ লাভ হইবে, পলায়ন কর নরকে ও প্রেতহস্তে পতিত হইবে।"

সৈন্যগণ একত্র হইল। কিন্তু খৃষ্টীয়ানগণের সংখ্যা অনেক অধিক, গ্রীক এবং রোম সৈন্যগণের শিক্ষাও অনেক শ্রেষ্ঠ; মুসলমান সৈন্যের দক্ষিণ পক্ষ ভঙ্গ হইল। যাহারা ফিরিয়া পলায়নে প্রয়াস পাইল পশ্চাদিকে ললনাগণ তাহাদিগকে যারপর নাই ভৎসনা করিয়া আক্রমণ করিতে লাগিল। সুতরাং এরূপ অসমযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে সকলেই সম্মুখযুদ্ধে বিপক্ষের সম্মুখীন হওয়া শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিল। শত্রুর আক্রমণ হইতে পলায়ন করিতে প্রয়াস পাইয়া আবুসোফিয়ানও তাঁবুর দণ্ডের আঘাত পাইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

গ্রীকসৈন্যশ্রেণীর দুর্ব্বার আক্রমণে মুসলমানগণ তিনবার পশ্চাৎপাদ হইয়াছিল, কিন্তু ললনাগণের আক্রমণে তিনবারই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইল। রজনী আগত হইলে সে ভীষণ যুদ্ধ ক্ষান্ত হইল। তখন আবুওবীদা আহত গণের শরীরে স্বহস্তে ঔষধ বিলেপন আরম্ভ করিলেন, ললনাগণও কোমল স্নেহের হস্তে ক্ষতস্থান সকল বাঁধিয়া দিতে লাগিলেন!

পরদিন পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মুসলমানগণ পুনরায় নিতান্ত বিপন্ন হইল। খৃষ্টীয়ান তীরন্দাজগণ ভয়ানক হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিল। তাহাদের এরূপ আশ্চর্য্য শিক্ষা ছিল যে, যাহারা সে দিন তীরবিদ্ধ হয়, তাহাদের মধ্যে সাতশত লোকের দুইটি বা একটি চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং এই যুদ্ধ 'অন্ধীকরণ যুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ হয়। যাহারা ঐরূপ অন্ধ হইয়াছিল, উত্তরকালে সেই অন্ধতা গৌরবের চিহ্ন বলিয়া অহঙ্কার করিত; তাহারা সেই ভীমযুদ্ধের দিবস যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সনাতনধর্ম্ম রক্ষায় যুদ্ধ করিয়াছিল, এই তাদৃশ সুখানুভবের কারণ ছিল। এই দিবস অনেক দ্বন্দ্বযুদ্ধও হইয়াছিল। তন্মধ্যে সার্জ্জাবিল একজন বলিষ্ঠ খৃষ্টীয়ানের সহিত যে যুদ্ধ করেন তাহা উল্লেখযোগ্য। সার্জ্জাবিল দীর্ঘকাল উপবাস, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতিতে এমনই শুষ্কশরীর এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই হত হইতেন। কিন্তু দিরার পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া বর্শাফলকে বিদ্ধ করিয়া খৃষ্টীয়ান যোদ্ধাকে হত করাতে সার্জ্জাবিল রক্ষা পাইলেন। উভয়েই মৃতের শরীরস্থ দ্রব্যাদি ও বসনভূষণ আপনার প্রাপ্য বলিয়া দাওয়া করিলেন। কিন্তু বিচারে হত্যাকারীই সে সমস্ত

পাইবেন সাব্যস্ত হয়। এই কালান্তক সময়ে মুসলমানগণ অনেকবার পরাজয়োন্মুখ হইয়াও সীমন্তিনীগণের পরাক্রমে পুনরায় সমবেত হইতে বাধ্য হইয়াছে। দিরারের ভগ্নী কৌলা পুরুষগণের সহিত মিলিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি আহত হইয়া পতিত হইতে ছিলেন এমন সময়ে বরাঙ্গিণী ওফীরা তাঁহার প্রতিপক্ষকে হত্যা করাতে প্রিয় সখীর জীবন রক্ষা হইল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শত্রুমিত্র পরিচয় করা যাইতে পারে যুদ্ধ চলিল। রজনী আগত দেখিয়া মুসলমানগণ উল্লসিত হইল; তাহারা মহম্মদের এবং তাঁহার অঙ্গীকারের প্রতি নির্ভর করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। যুদ্ধ নিতান্ত ভীষণ, শত্রু সংখ্যাও অনেক অধিক। রজনীতে সৎপ্রকৃতি আবুওবীদা দুইবারের উপাসনা একত্র করিয়া সৈন্যগণের নির্ব্বিঘ্ন বিশ্রামের জন্য ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিলেন।

এই ভীষণ যুদ্ধের ফল অনেক দিন পর্য্যন্ত সীরিয়ার অদৃষ্টের সহিত অনিশ্চয় অবস্থায় দুলিতেছিল। অবশেষে উন্মত্ত মুসলমান সৈন্যের দুর্ব্বার পরাক্রম প্রবল হইয়া উঠিল। খৃষ্টীয়ান সৈন্য সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। অনেকে পশ্চাৎ হইতে অনুসরিত এবং হত হইল। অনেকে গিরিবর্ত্মে, অনেকে তাহাদের নিজের একজন লোককর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া বেগবতী গম্ভীর নদী মধ্যে নিমজ্জিত হইল, ঐ ব্যক্তি কোন অপকার গ্রস্ত হইয়াছিল সেই ক্রোধে ঐরূপ করিল। সম্রাটের সেনাপতি ম্যানুয়েল নোমান্ ইবিন্ আল্কামা নামক একজন মুসলমানের হস্তে নিহত হইলেন।

আবুওবীদা রণক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন আহত মুসলমানগণ যত্নে রক্ষিত হইয়াছে, এবং মৃতগণ যথাবিধি সমাহিত হইয়াছে কি না। মস্তকশূন্য কতকগুলি দেহ দৃষ্টে তাহারা মুসলমান কি না সন্দেহ হইল; পরিশেষে উপাসনা করিয়া তাহাদিগকেও মুসলমানের ন্যায় প্রোথিত করিলেন।

আবুওবীদা লুপ্ত বিভাগ সময়ে খলিফা এবং সাধারণ ধনাগারের জন্য এক পঞ্চমাংশ রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট সমস্ত প্রত্যেক পদাতিক একাংশ এবং অশ্বারোহী তিনাংশ এইরূপে বিভাগ করিলেন। অশ্বারোহিগণের নিজের দুই অংশ, অশ্বের একাংশ। কিন্তু প্রকৃত আরবজাত ঘোটকের অংশ দ্বিগুণ হইল। ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু আরবীয় অশ্বের মূল্য অধিক বলিয়া খলিফা সেই বন্দোবস্ত স্থির রাখিলেন।

এইরূপে খৃষ্টীয় ৬৩৬ সনের নবেম্বর মাসে হিজিরাশকের পঞ্চদশ বর্ষে যার্ম্মুক নগরীর সমীপস্থ যার্ম্মুক নদীতীরে যে ভীম যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা শেষ হইল।

গণিত শিক্ষা।

কি কাব্য, কি গণিত, কি ভূগোল, কি ইতিহাস, প্রত্যেক শাস্ত্রই সত্যমন্দিরে উঠিবার এক একটী পথ স্বরূপ। এই পথ সকল প্রথমতঃ অপ্রশস্ত অন্ধকারময় ও দুরারোহ। দর্শনার্থী যাত্রী যতই অগ্রসর হয়েন, উহারা ততই প্রশস্ত ততই উজ্জ্বল, ততই সুখকর অনুভূত হয়। যিনি যতদূর অগ্রসর হইতে পারেন, তিনি ততদূর পশুলোক পরিত্যাগ করিয়া দিব্যলোকের নিকটবর্ত্তী হয়েন। বালকেরা প্রথমে সংকলন, ব্যবকলন, গুণন, ভাগহার প্রভৃতি শিক্ষা করিতে যখন অতীব কষ্ট অনুভব করে, তখন শিক্ষকগণের তাহাদিগকে জ্ঞাত করা আবশ্যক যে ভবিষ্যতে ঐ ক্লেশকর পাঠ সকল হইতে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণের দৈনিক বা বাৎসরিক গতি নির্দ্দেশ, গ্রহণ-গণনা, ঋতুগণের পর্য্যায় ভ্রমণ নির্ণয়, নদীর জোয়ারের ও ভাটার কারণ ও সময় নিরূপণ প্রভৃতি মহৎ মহৎ বিষয় সমস্ত উপলব্ধি করিবার জন্য ভিত্তি সংস্থাপিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন গৃহনির্ম্মাণ, নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী সকলের প্রস্তুত করণ, পুস্তকাদি মুদ্রণ, বাণিজ্যের জন্য জল যান গঠন প্রভৃতি মনুষ্যের যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তৎসমুদয়ের সৃষ্টি যে, গণিত শিক্ষার ফল তাহাও দর্শান সম্যক্‌রূপে কর্ত্তব্য। গণিত-আলোচনা আপাত-ক্লেশকর হইলেও উহাতে বুদ্ধির স্থিরতা, প্রসারণ ও তীক্ষ্ণতা সম্পাদন করিয়া মনুষ্যকে সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম করে। পূর্ব্বোক্ত কারণেই সকল ব্যক্তিরই সাধ্যমত গণিত শিক্ষা করা আবশ্যক। যাঁহাদিগের গণিত আলোচনায় স্বভাবসিদ্ধ আসক্তি আছে, তাঁহারা উক্ত বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে সম্যক্‌রূপ যত্নবান হইবেন; কেন না, তাঁহারাই সমাজের বিশেষ উপকার করিতে সক্ষম।

অন্যান্য শাস্ত্রে ব্যক্তিগত ক্ষমতার তারতম্যে রুচি ও মতভেদে অনেক অসারতা থাকিতে পারে, কিন্তু গণিতে তাহার কিছুই লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই; যেহেতু ইহার নিয়মাবলীর আবশ্যকতা এই যে, ঈশ্বর সৃষ্ট গূঢ় নিয়মাবলী যতদূর মনুষ্যকর্ত্তৃক অনুসংহিত ও উপলব্ধ হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রকাশ করা; সুতরাং উহাদিগের আলোচনা, আর সত্য বা ঈশ্বরের উপাসনা ভিন্ন কার্য্য নহে। গণিত শিক্ষা করিতে হইলে উহার নিয়মাবলী প্রথমে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা ও সর্ব্বদা স্মরণে উপস্থিত রাখা কর্ত্তব্য। প্রশ্ন সকলের উত্তর যথার্থ হইল কি না কেবল ইহা দেখা শিক্ষকের কার্য্য

নহে। উদাহরণ সকল যে যে নিয়মের অধীন, ঐ সকল নিয়মের পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ ছাত্রগণকে বিশেষরূপে জ্ঞাত করা আবশ্যক।

পদার্থবিজ্ঞানের ন্যায় গণিতবিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য সতত সত্য অনুসন্ধান ও সত্যের আবিষ্কার। শাস্ত্রভেদে সত্যের রূপভেদ হয় মাত্র। পদার্থবিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ পদার্থের কারণ নির্দ্দিষ্ট হয়, গণিত বিজ্ঞানে পদার্থের সংখ্যা ও ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হয়। পদার্থ না থাকিলে উহার সংখ্যাও ধর্ম্ম-নির্দ্দেশ কিরূপে সম্ভব? এই জন্যই পদার্থবিজ্ঞানের সহিত গণিত বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ ও নিত্য সম্বন্ধ। যাঁহারা গণিতের প্রতি উপহাস করিয়া পদার্থশাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা গুণ-গ্রহণে অক্ষম ব্যক্তির ন্যায় কোন " মহৎ ব্যক্তির বন্ধু " বলিয়া পরিচয় দিয়া কেবল আত্মাভিমানে পরিতৃপ্ত হন মাত্র।

" রাশি " এই শব্দ গণিতবেদের প্রণব স্বরূপ। এই প্রণবটী কি, তাহা প্রথমে বিশেষ রূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যাহা হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যায়, যাহার সংখ্যা বা পরিমাণ নিরূপণ করা যায় তাহাই রাশি "; সুতরাং রাশি শব্দে পদার্থের সংখ্যা, রেখা, স্থান, সময়, গতি ও গুরুত্ব সমস্তই বুঝায়। গণিত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সর্ব্বপ্রকার রাশির সংখ্যা বা পরিমাণ নিরূপণ করা। যে অংশে কেবল সংখ্যা নির্ণয় হয়, তাহাকে পাটীগণিত, ও যে অংশে রেখাদ্বারা পরিমাণ সিদ্ধ হয়, তাহাকে জ্যামিতি বলাযায়। এই দুই অংশ বীজগণিত ও মিশ্রগণিতের ভিত্তি স্বরূপ।

গণিত শাস্ত্রমতে দুই প্রকার পদ্ধতিতে সত্যের নির্ব্বাচন হয়। উহাদিগকে ইংরাজি শব্দে Analitical and Synthitical Method কহে। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে প্রস্তাবিত বিষয় অগ্রে সত্য বলিয়া স্বীকার করত, ক্রমশঃ বিচারদ্বারা অন্য কোন পরীক্ষা-সিদ্ধ সত্যের সাহায্যে উহার সত্য সিদ্ধান্ত করা। এইরূপ পদ্ধতি বীজগণিতে ব্যবহার হইয়া থাকে। অপর পদ্ধতি মতে প্রথমতঃ কয়েকটি সহজ ও সরল নিয়মাবলী লইয়া ক্রমে বিচার দ্বারা সত্যের সিদ্ধান্ত হয়। এই দুই প্রকার বিচার পদ্ধতি পরস্পর বিপরীত রূপ হইলেও প্রথমোক্ত পদ্ধতি মতে সত্যের নির্ব্বাচন হইলে, শেষোক্ত পদ্ধতি মতে উহার প্রমাণ সিদ্ধান্তীকৃত হয়।

হিন্দুভূগোল।—পৌরাণিক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(চতুর্থ খণ্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠার পর)

আমরা প্রথম প্রস্তাবে সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রের পৌরাণিক বিবরণ প্রকটন করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান প্রস্তাবে জম্বুদ্বীপস্থ নববর্ষের বিবরণও সেই পুরাণ অবলম্বন করিয়াই লিখিত হইতেছে। সমগ্র পৃথিবীর বর্ণনাতে পাঠকেরা যেরূপ অনেক প্রলাপ বাক্য দর্শন করিয়াছেন; নববর্ষের বর্ণনায় তদ্রূপ অসংলগ্ন ও অসম্বদ্ধ বহু প্রলাপ দেখিতে পাইবেন। প্রাচীন আর্য্যেরা প্রত্যেক বিষয়ে যেরূপ নানা অলীক ও অসম্ভব কথার অবতারণা করিয়াছেন, ভূগোলেও তাহা করিতে ক্রুটিকরেন নাই। কিন্তু এই সকল ভৌগোলিক বিবরণ যে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা-প্রসূত কেহ যেন সেরূপ মনে করেন না। ইহাতে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিরন্যায়, ও মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায়, সত্য প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত রহিয়াছে। তবে অলীক কল্পনার ভাগ এত অধিক যে সহসা আমাদের নয়ন পথে সত্যের জ্যোতিঃ পরিলক্ষিত হয় না। যাহা হউক, বাগাড়ম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি।

বিষ্ণুপুরাণ মতে জম্বুদ্বীপ নয়খণ্ডে বিভক্ত, ঐ খণ্ডগুলি বর্ষনামে খ্যাত। জম্বুদ্বীপের সর্ব্বদক্ষিণ ভাগে ভারতবর্ষ, উহার উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত। তদুত্তরে ক্রমে কিম্পুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ, ও ইলাবৃতবর্ষ। ইলাবৃতের মধ্যভাগে সুমেরু পর্ব্বত। ইলাবৃতের পূর্ব্বভাগে ভদ্রাশ্ববর্ষ, ও পশ্চিমভাগে কেতুমালবর্ষ। শেষোক্ত বর্ষত্রয় প্রায় সমসূত্রে স্থাপিত; ইহাদের উত্তরে রম্যক বর্ষ, তদুত্তরে হিরণ্ময়বর্ষ, এবং তদুত্তরে কুরুবর্ষ। প্রত্যেক বর্ষের আয়তন নয়সহস্র যোজন। সুতরাং নববর্ষের পরিমাণ একাশীতি সহস্র যোজন।

শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে প্রাগুক্ত নববর্ষ অষ্টগিরি শ্রেণী দ্বারা বিভক্ত। বিষ্ণু পুরাণে এই অষ্ট পর্ব্বতের নাম আছে; যথা—হিমবান, হেমকূট, নিষধ, নীল, শ্বেত, শৃঙ্গবান, গন্ধমাদন, ও মাল্যবান। এই স্থলে একটি প্রগাঢ় সন্দেহের উদয় হয়। পূর্ব্বে যে নববর্ষের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার অবস্থিতি বিবেচনা করিলে, তিব্বত, তাতার, চীন প্রভৃতি এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশ বলিয়া বোধ হয়। পরে যে অধিবাসী দিগের বর্ণনা প্রদত্ত হইবে, তদ্দ্বারাও এবম্বিধ অনুমানই সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু বর্ষ পর্ব্বত গুলি সীমা পর্ব্বত বলিয়া বর্ণিত হইলেও, উহার দুই একটি ভিন্ন সমস্তই ভারতবর্ষের পর্ব্বত রূপে দৃষ্ট হইতেছে। নীলগিরি, শৃঙ্গবান, গন্ধমাদন প্রভৃতি যে ভারতবর্ষের পর্ব্বত তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে একনামে ভিন্ন পর্ব্বত থাকিতে পারে, অর্থাৎ বর্ষপর্ব্বত নীলগিরি প্রভৃতি এবং দাক্ষিণাত্য স্থিত নীলগিরি প্রভৃতি, স্বতন্ত্র পর্ব্বত একথা স্বীকার করিলে সন্দেহ নি-

টিয়া যায়। ফলতঃ পাঠক, যতক্ষণ পৌরাণিক ভূগোল পাঠ করিবেন, ততক্ষণ গোঁড়া হিন্দুর ন্যায় নির্ব্বাক্ ও নিঃসন্দেহ হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। পুরাণ পাঠ বা শ্রবণে অশেষ জন্মার্জ্জিত কলুষনাশ হইবে।

বিষ্ণু ও বরাহ পুরাণে এই বর্ষপর্ব্বত গুলির অবস্থিতি, দৈর্ঘ্য, বিস্তার প্রভৃতির এইরূপ উল্লেখ আছে। যথা, ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় অশীতি সহস্র যোজনদীর্ঘ হিমবান পর্ব্বত। কিম্পুরুষবর্ষের উত্তর সীমায় নবতি সহস্র যোজনদীর্ঘ হেমকূট পর্ব্বত। হরিবর্ষের উত্তর সীমাস্থিত নিষধশৈল লক্ষ যোজন, অর্থাৎ জম্বুদ্বীপ ব্যাপী। কেতুমাল, ইলাবৃতও ভদ্রাশ্ব এই বর্ষত্রয়ের উত্তর সীমাস্থিতনীলগিরিও লক্ষ যোজনদীর্ঘ। রম্যকবর্ষের উত্তর প্রান্তে নবতি সহস্র যোজনদীর্ঘ শ্বেতগিরি; এবং হিরণ্ময়বর্ষের উত্তর সীমায় শৃঙ্গবান অশীতি সহস্র যোজনদীর্ঘ। এই ছয়টি পর্ব্বত শ্রেণীর প্রত্যেকেই দ্বিসহস্র যোজন উচ্চ, ও দ্বিসহস্র যোজন বিস্তৃত। উহারা প্রত্যেকেই দৈর্ঘ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগর স্পর্শী; তবে জম্বুদ্বীপের গোলতা প্রযুক্ত কোনটি বা কিঞ্চিদধিক, কোনটি বা কিঞ্চিন্ন্যূন দীর্ঘ। কেতুমালবর্ষের পূর্ব্ব সীমা ও ইলাবৃত বর্ষের পশ্চিম সীমায় গন্ধমাদন পর্ব্বত; এবং ইলাবৃতের পূর্ব্ব সীমা ও ভদ্রাশ্ববর্ষের পশ্চিম সীমায় মাল্যবান নামে পর্ব্বত। ইহারা প্রত্যেকেই উচ্চতায় চত্বারিংশৎ সহস্র যোজন এবং দৈর্ঘ্যে উত্তরে নীল পর্ব্বত ও দক্ষিণে নিষধ পর্ব্বত স্পর্শী। পুরাণে ইহাদের বিস্তারের উল্লেখ না থাকিলেও, নির্ণয় করিবার সহজ উপায় আছে। জম্বুদ্বীপ লক্ষ যোজন বিস্তৃত; নববর্ষের বিস্তার একাশীতি সহস্র যোজন; প্রথমোক্ত ছয়টী বর্ষপর্ব্বতের বিস্তার দ্বাদশ সহস্র যোজন; সুতরাং গন্ধমাদন ও মাল্যবানের বিস্তার সপ্ত সহস্র যোজন হইল।

লিঙ্গ ও স্কন্দ পুরাণে প্রাগুক্ত পর্ব্বতগুলির শোভা ও বৈভব, এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।—

'হিমবৎ প্রমুখাশ্চ ষ্টৌ মর্য্যাদা পর্ব্বতা ইমে
নানা ধাতু পিনদ্ধাশ্চ নানারত্নাকরাশ্চবৈ।
নানা পুষ্প ফলোপেতা নানাবৃক্ষগণাবৃতাঃ,
ভূস্বর্গা দেবভোগ্যাশ্চ দুষ্প্রাপ্যা মানবৈর্ভুবি।
হেমকূটেতু গন্ধর্ব্বাবিজ্ঞেয়া শ্চাপ্সরো গণাঃ,
সর্ব্বে নাগাস্তু নিষধে শেষ বাসুকি তক্ষকাঃ।
নীলেস্থু বৈদূর্য্যময়ে সিদ্ধব্রহ্মর্ষয়োমলাঃ,
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ শ্বেত পর্ব্বত উচ্যতে।
শৃঙ্গবৎ পর্ব্বতে চৈব পিতৃণাং নিলয়াঃ শুভাঃ,
হিমবান্ দক্ষমুখ্যানাং ভূতানামীশ্বরস্তচ।
সর্ব্বাদ্রিষু মহাদেবো হরিণা ব্রহ্মণা সুরৈঃ।'
ইতিলৈঙ্গে।

'সন্তি বিদ্যাধরাণাঞ্চ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে,
উদ্যানানি বিচিত্রাণি ভবনানি বহূনিচ।
তেষু বিদ্যাধরবরাবিদ্যাধর্য্যশ্চ কৌতুকাৎ,
বিহরন্তি সুখং যত্র বায়ুর্বহতি গন্ধবান্।
সুগন্ধিপুষ্পসম্ভূতান্ গন্ধানাদায় সর্ব্বতঃ,
দেবাদৈত্যাদানবাশ্চ কদাচিদ্যান্তি তত্রবৈ।'
ইতিস্কান্দে।

উক্ত উদ্ধৃত বচনগুলি এরূপ প্রাঞ্জল সংস্কৃতে লিখিত যে, উহার বাঙ্গলা অনুবাদ অনাবশ্যক।

হতভাগ্য ভারতবর্ষে 'নহি সুখং দুঃখৈর্বিনালভ্যতে।' দুঃখবিনা সুখলাভ করা যায় না—শয়ন, ভোজন, পান, পরিধান, প্রভৃতি প্রত্যেক প্রয়োজনে যেরূপ সামগ্রী

লাগিবে, পরিশ্রম না করিলে কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সাধে কি বলি ভারতবর্ষ 'হতভাগ্য'? পাঠক, 'হা করিয়া থাকিলে আপনি আসিয়া রসগোল্লা মুখে পড়িবে' এমন সুখের দেশে যদি যাইতে চাও, তবে আইস আমরা অপর কোন বর্ষে যাই। দেখ দেখি আর্য্যঋষি নয়নমুদ্রিত করিয়া কল্পনা-শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক উহাদের কেমন সুন্দর প্রকৃতি বর্ণন করিয়াছেন :—

'যানি কিম্পুরুষাদীনি বর্ষাণ্যষ্টৌ মহামুনে,
তেষাং স্বাভাবিকী সিদ্ধিঃ সুখপ্রায়াহ্যযত্নতঃ।
বিপর্য্যয়োন তত্রাস্তি জরামৃত্যুভয়ং নচ,
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ নতেষাস্তাং নোত্তমাধম মধ্যমাঃ।
নতেষ্বস্তি যুগাবস্থা ক্ষেত্রেষষ্টস্থ সর্ব্বদা,
নতেষু বর্ষতে দেবো ভৌমান্যম্ভাংসি তত্রবৈ।' ইতি বৈষ্ণবে।

অর্থাৎ কিম্পুরুষাদি অষ্টবর্ষে স্বাভাবিকী শক্তি গুণে অনায়াসে সুখোৎপত্তি হয়; উহাতে সাধারণ বিধিব কোন ব্যতিক্রম নাই, অর্থাৎ অকালে জরামৃত্যু প্রভৃতিব ভয় নাই। সেখানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য প্রভৃতির বিচার নাই, উত্তম, মধ্যম, অধম প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ নাই সকলেই সমান। এদেশে যেমন যুগভেদে ব্যবস্থাভেদ, সেখানে তাহা নাই। কিন্তু ভূমিতে জল আছে অর্থাৎ নদ নদীতে পান ও স্নানের নিমিত্ত জল পাওয়া যায়। পাঠক, আর কি চাও? ইহাতেও যদি অধিক লোভ না হইয়া থাকে তবে মার্কণ্ডেয় পুরাণের—

"নতেষু পুণ্য পাপানামপূর্ব্বাণামুপার্জ্জনং,
নচৈতেষু মনুষ্যাণাং বৈষম্যত্বং কদাচন।"

ইত্যাদি প্রলোভময়ী বাণী পাঠ কর। অতঃপর পুরাণাদিতে নববর্ষের অধিবাসীগণের বর্ণ, ধর্ম্ম, পরমায়ু সংখ্যা, ভক্ষ্যদ্রব্যের ব্যবহারের যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। ভারতবর্ষ। বিষ্ণুপুরাণে আছে, "যাহার উত্তরে হিমাদ্রি ও দক্ষিণে সমুদ্র, এবং যেখানে ভরতের সন্ততিগণ বাস করিয়াছেন, তাহার নাম ভারতবর্ষ। ইহার বিস্তার নব সহস্র যোজন। যাঁহারা স্বর্গ ও অপবর্গ লাভেচ্ছু, ইহা তাঁহাদিগের কর্ম্মভূমি। ইহাতে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র এই সপ্তকুলপর্ব্বত আছে।" পদ্ম পুরাণে হিমাদ্রিকে বহু রত্নখনি ও হরের আবাসস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

২। কিম্পুরুষবর্ষ। "ইহা পুণ্যবান প্রাণিগণের বসতি স্থান। অত্রত্য নরগণ সুবর্ণবর্ণ বিশিষ্ট এবং নারীগণ অপ্সরা তুল্যা সুন্দরী। ইহারা সকলেই শুদ্ধসত্ব, হেমাভ এবং প্লক্ষবৃক্ষের ফলভোজী। অত্রত্য মানবেরা জানকীনাথ শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। ইহাদের পরমায়ু সংখ্যা দশ সহস্র বৎসর।" ইতিলৈঙ্গে।

৩। হরিবর্ষ। "হরিবর্ষ দেবভোগ্য ও মনোরম স্থান। এই বর্ষোদ্ভব নরগণ মহারজতসংকাশ। দেবলোকচ্যুত ব্যক্তি গণ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সকলেই দেবাকার। অত্রত্য অধিবাসীগণ বিশ্বেশহরের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; এবং সুন্দর ইক্ষুরস পান করেন। অত্রত্য নরগণ ব্যাধিক্লিষ্ট বা জরাজীর্ণ নহে। মানবগণ এখানে দশসহস্র বৎসর জীবিত থাকেন" ইতিলৈঙ্গে।

৪। ইলাবৃতবর্ষ। "ইলাবৃতবর্ষে মানবগণ পদ্মপ্রভ, পদ্মাক্ষ, পদ্মলোচন এবং পদ্মগন্ধ। সুগন্ধ জম্বুফলরসাহারী ও নিশ্চলরহিত। দেবলোকচ্যুত ব্যক্তিরা এখানে জন্মগ্রহণ করাতে জরা ও মৃত্যুরহিত। যাঁহারা ধার্ম্মিক অর্থাৎ নরোত্তম তাঁহারা ত্রয়োদশ ও অপরেরা দ্বাদশ সহস্র বৎসরজীবী।" ইতিলৈঙ্গে।

৫। ভদ্রাশ্ববর্ষ। "ভদ্রাশ্বে নরগণ শুক্লবর্ণ, নারীগণ চন্দ্রাংশু সন্নিভ। সকলে কালাম্র ফলরসভোজী বলিয়া নিরাতঙ্ক ও রতিপ্রিয়। শৈবগণ একাদশ ও অপরেরা দশসহস্রবর্ষজীবী।" লিঙ্গপুরাণে এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। মহাভারতে প্রাগুক্ত কালাম্র ফল সম্বন্ধে লিখিত আছে "ভদ্রশালবননামা মহারণ্যে কালাম্র নামে এক মহাদ্রুম আছে। ঐ বৃক্ষের ফলরস পান করিলে নরগণ নিত্য সুস্থির যৌবন হয়।"

৬। কেতুমালবর্ষ। "কেতুমালবর্ষবাসী পুরুষগণ কৃষ্ণবর্ণ, স্ত্রীগণ উৎপলপত্রাভা, এবং সকলেই প্রিয়দর্শনা। শৈবধর্ম্মাবলম্বী নরগণ একাদশ সহস্র বৎসর পরমায়ু বিশিষ্ট। ইহারা সকলেই পবন ভোজন করে।" ইতিলৈঙ্গে।

৭। রম্যকবর্ষ। রম্যকবর্ষের মানবগণ অত্যন্ত রতিপ্রিয়, অথচ বিমল চরিত্র। জরা রোগ বিবর্জ্জিত; দেবরূপী ও ধর্ম্মপরায়ণ। এখানে ন্যগ্রোধ নামে এক সুমহান পাদপ আছে, অধিবাসীগণ তৎফলরস পান করে, এবং দশসহস্র বৎসর জীবিত থাকে।" বরাহপুরাণে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। লিঙ্গপুরাণে আছে—"রম্যকবর্ষের জীবেরা ন্যগ্রোধ বৃক্ষের ফল ভোজন করে। সকলেই শুদ্ধসত্ব ও শিবধ্যান-পরায়ণ। ইহাদের পরমায়ুসংখ্যা দশসহস্র পঞ্চদশ শতবর্ষ।" পরন্তু ভারতে আছে "অত্রত্য পুরুষেরা শুভ্রবর্ণ, তেজস্বী এবং মহাবল। স্ত্রীগণ কুসুমগন্ধা, সুন্দরী, প্রিয়দর্শনা, চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রবর্ণা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা, চন্দ্রশীতল গাত্রা এবং নৃত্যগীত বিশারদা।"

৮ম। হিরণ্ময়বর্ষ। বরাহপুরাণমতে "হিরণ্ময়ী নামা এক নদী আছে। উক্ত স্থানে বলবান কামরূপী যক্ষগণ বাস করে। লিঙ্গপুরাণ কহেন "অত্রত্য জনগণ স্বর্ণকান্তি, ঈশ্বরার্পিতচেতা, লকুচাশন জীবিত (মাদার ফলভোজী), এবং একাদশ সহস্র পঞ্চদশশত বর্ষ পরমায়ু বিশিষ্ট। ইহাদের ভোজনপাত্র গুলি কাঞ্চননির্ম্মিত।"

৯। কুরুবর্ষ। লিঙ্গপুরাণে বর্ণিত আছে "কুরুবর্ষের লোকেরা স্বর্গচ্যুত দেবোপম। সেখানে একটি পুত্র ও একটি কন্যা যমজরূপে জন্মে; ইহারা অনাময়, অশোক ও নিত্যসুখসেবী। ইহারা কেহ কেহ যোগী, কেহ কেহ ভোগী। ইহারা ত্রয়োদশ সহস্র পঞ্চশতবর্ষজীবী। ইহারা পরস্ত্রী নিষেবণে অনুরক্ত নহে, সুতরাং মহাবীর্য্যবান। দম্পতী জীবনে সর্ব্বদা একত্রবাস করে, তৎপর একত্রে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসী হয়। ইহারা হৃষ্টচিত্ত, সুপ্রবুদ্ধ, সদামৃতভোগী, সদাচন্দ্রকান্তি ও সদাযৌবনশালী।" মহাভারতের বর্ণনাও প্রায় এইরূপ, যথা "তত্রত্য মধুফলবিশিষ্ট বৃক্ষসমূহ নিত্য ফলপুষ্প প্রসব করে। সেখানে 'ক্ষীরিন্' নামে এক মহাবৃক্ষ আছে, তাহাতে . ষড়্রসামৃতোপম

কীর-সর্ব্বদা ক্ষরিত হয়। সেই জলে মন্দাতরণও প্রসব করে। এই স্থানের ভূমি মণিময় ও বালুকা সূক্ষ্ম স্বর্ণচূর্ণ। সর্ব্বস্থানই সুখপ্রদ ও জলাশয় পঙ্করহিত। তত্রত্য মানবেরা দেবলোকচ্যুত। সকলেই শ্বেতবর্ণ ও প্রিয়দর্শন। সন্তানাদি মিথুনরূপে প্রসূত হইয়া একত্রে পরিবর্দ্ধিত হয়; ইহারা তুল্যরূপ, তুল্যগুণ এবং তুল্যবেশ। ইহারা দশ সহস্র দশশতবর্ষ জীবিত থাকে, ইহাদের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নাই। ঐ দেশে শকুন্ত জাতীয় তীক্ষ্ণচঞ্চু মহাবল ভারুণ্ড নামে এক প্রকার পক্ষী আছে, তাহারাই চঞ্চুদ্বারা টানিয়া শব দূরে নিক্ষেপ করে।"

ভারতবর্ষের আকার ও বিভাগাদি সম্বন্ধে বায়ু, মার্কণ্ডেয়, মৎস্য প্রভৃতি পুরাণে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মহাভারত ও রামায়ণ অবলম্বন পূর্ব্বক যে ভূগোল লিখিত হইবে তৎসঙ্গে প্রকাশ করা যাইবে। অতঃপরের হিন্দু-ভৌগোলিক বিবরণ প্রায় সম্যক্‌রূপে ভারতবর্ষেই নিবদ্ধ থাকিবে।

শ্রীজ—

ক্ষমানন্দদাস।

পাঠক! পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথি ইত্যাদি অনুসন্ধান করিতে গিয়া কতিপয় মহাজনকে ক্রমে আপনার সমক্ষে ধরিয়াছি,—অদ্য আর একজনকে লইয়া আবার উপস্থিত; ইহার নাম ক্ষমানন্দদাস। আমরা পূর্ব্বতন যত কবি নয়নগোচর করিয়াছি তাঁহারা প্রায় সকলেই শাস্ত্রীয় কোন না কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন; মুকুন্দরাম চণ্ডী, কৃত্তিবাস ও রঘুনন্দন রামায়ণ, কাশীরাম মহাভারত—এইরূপ প্রায় সকলেই কোন না কোন সংস্কৃত-গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু ক্ষমানন্দ তাহা করেন নাই; তাঁহার কৃত গ্রন্থ কোন গ্রন্থের অনুবাদ বা আদর্শে লিখিত নহে; তাহা সম্পূর্ণ নূতন—দেশীয় কিংবদন্তীই তাঁহার অবলম্বন—মনসাদেবীর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তিই তাঁহার পথপ্রদর্শক—বেহুলা লখিন্দরই তাঁহার সর্ব্বস্ব। তৎপ্রণীত গ্রন্থের নাম "বেহুলার ভাসান"। উহা আমাদের দেশে পূর্ব্বে দশহরা পূজার দিনে সর্ব্বত্র সমাদরে পঠিত হইত। গ্রামের মধ্যস্থিত কোন চণ্ডীমণ্ডপ উহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইত; গ্রামস্থ যত লোক, আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সকলেই তথায় উপস্থিত—সকলেই একাগ্রমনে উহা শ্রবণ করিতেন—সকলেই মুগ্ধ হইতেন—সকলেরই অন্তঃকরণে আহ্লাদের তরঙ্গ সমুত্থিত হইত। কিন্তু এক্ষণে দেশের আর সে অবস্থা নাই—ইংরাজী সভ্যতা দেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছে—এ সকলে আর আমাদের আমোদ হয় না। যাহা পূর্ব্বে প্রকৃতির অকপট পুত্রকন্যাগণের আহ্লাদের উৎস স্বরূপ ছিল, সভ্যতাভিমানী মহোদয়গণের নিকট তাহা অশ্রাব্য উপাখ্যান মাত্র—যাহা সকলের মনোমোহন করিত, তাহা তাঁহাদের বিরক্তির নিদান; সুতরাং চিরদিনের নিমিত্ত ইহা আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল; এমন

কি দুই একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট হইতে ইহার বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারা যায় না। পঞ্চাশৎবৎসর পূর্ব্বে ইহা আদরের সহিত পঠিত হইত কিন্তু এক্ষণে ইহার নাম পর্য্যন্তও অজ্ঞাত, গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য—ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় পুরাতন মহাজনগণের নাম চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইবে—না ক্রমশঃই তাঁহারা অধঃপাতে যাইতেছেন—তাঁহাদের নাম বিলুপ্ত হইতেছে; ইহা অতিশয় লজ্জার কথা। আমরা কোন কোন গৃহে স্তূপাকার হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার অধিবাসী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার অভ্যন্তরে কি মহামূল্য রত্নরাজী আছে তিনি তাহা বলিতেও পারেন না—তিনি কখন ভ্রমক্রমেও কীটদষ্টমলাবিদ্ধ বসন গুলি উন্মোচন করিয়া তাহা দেখেন নাই; এইরূপ কতস্থানে যে কত অমূল্য রত্নরাশি অযত্নাবস্থায় পতিত আছে তাহা কে বলিতে পারে? এই জন্যই আমাদের পূর্ব্বতন মহাজনগণ ক্রমে ক্রমে জগতীতল হইতে বিলুপ্ত হইতেছেন—এই জন্যই বঙ্গীয় অসংখ্য কবিমণ্ডলীর মধ্যে আমরা দুইচারি জনের নাম মাত্র অবগত আছি। বঙ্গদেশের প্রতিপল্লী প্রতিগৃহ অন্বেষণ করিলে আমরা কবির সমাজ দেখিতে পাই ও জানিতে পারি বঙ্গীয় সাহিত্য কবিত্ব বিষয়ে নিতান্ত দীনা ছিলেন না। পাঠক! আমরা অদ্য ক্ষমানন্দকে আপনার সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি; কবিত্ব গুণগ্রামে ইনি কবিকঙ্কণের সমকক্ষ ছিলেন না তত্রাপি ইঁহাকে অনাদর করা যাইতে পারে না—ইনিও আমাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজার পাত্র। কবিকঙ্কণের রচনা যেরূপ স্বাভাবিক—সেরূপ স্বভাবকবি অতি বিরল; সুতরাং ক্ষমানন্দ সে বিষয়ে ধনী নহেন।

প্রাচীন লেখকগণ প্রায় সকলেই ছন্দঃপতন দোষে দুষ্ট; ক্ষমানন্দে সে দোষ আরও অধিক; কিন্তু যখন দেখি তিনি কবিকঙ্কণেরও অনেক পূর্ব্বে গ্রন্থ রচনা করেন তখন তাঁহার এই দোষ পরিহার্য্য; ইহা বাদ দিলেও তাঁহাকে আমরা উৎকৃষ্ট কবি বলিতে পারি না, তবে গ্রন্থের স্থানে স্থানে মনোহারিত্বেরও অভাব নাই—আমরা 'মনসার ভাসান' হইতে এইস্থলে একটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম। চাঁদ সদাগরের তরী ডুবাইবার নিমিত্ত মনসাদেবীর আজ্ঞায় নদীতে ঝটিকা উত্থিত হইয়াছে; কবি সেই স্থলের বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন,—

দেবীর আজ্ঞায়, হনুমান ধায়,
সঙ্গে লয়ে মেঘগণ।
পুষ্কর দুষ্কর, আইল সত্বর,
করিল বড় বর্ষণ॥
আসি কালীদয়ে, করিল উদয়ে,
ডুবাইতে সাধুর তরী।
বীর হনুমান, অতিবেগে যান,
করিবারে ঝড়বারি॥
অবনি আকাশে, প্রবল বাতাসে,
হৈল মহা অন্ধকার।
পড়িয়া গরর, নায়ক নফর,
নাহিক দেখে নিস্তার॥
গজ শুণ্ডাকার, পড়ে জলধার,
ঘন ঘোর তর্জ্জে গর্জ্জে।
মনে পাইয়া ডর, বণিক সদাগর,
বাহিরে আসিয়া বাজে। ইত্যাদি।

আর উদ্ধৃত করিবারই আবশ্যকতা নাই। কবিকঙ্কণ ও এইরূপ একটি নদীতে ঝড়ের বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠক এই স্থানে একবার "ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর" পাঠ করিয়া দেখুন; দেখিলেই এতদুভয়ের পার্থক্য সহজেই প্রতীয়মান হইবে।

আমরা উপরে যে অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা ক্ষমানন্দের স্বরচিত নহে; কেতকানন্দ দাসের রচিত। ক্ষমানন্দ ও কেতকানন্দ উভয়ে মিলিয়া এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন; সেই জন্য "মনসার ভাসানে" কোন কোন স্থলে ক্ষমানন্দের আর কোথাও বা কেতকানন্দের ভণিতাযুক্ত রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষমানন্দ ও কেতকানন্দ দুই সহোদর ছিলেন; তন্মধ্যে ক্ষমানন্দই জ্যেষ্ঠ। এক্ষণে আমরা ক্ষমানন্দের একটি রচনা উদ্ধৃত করিতেছি; বেহুলা বিশ্বকর্ম্মাকে একখানি ব্যজনী নির্ম্মাণ করিতে দেন— কবি তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—

বেহুলা আদেশে, কামিলা হরষে,
লক্ষের ব্যজন গড়ে।
অতি সুগঠন, কৈল বিচক্ষণ,
হেরি শশী ভূমে পড়ে॥
রজত মুকুতা, প্রবালাদি গাঁথা,
পরশ পাথর তার।
মকরন্দ লোভে, অলিকুল সবে,
সদাই গুঞ্জরি গায়॥
কামিলা আপনি, গড়িছে ব্যজনী,
শুধু সুবর্ণের ডাটী।
ব্যজনী দেখিয়া, স্থির নহে হিয়া,
পবন মানিল ঘাটি॥
ব্যজনী বাতাসে, চন্দ্রিমা প্রকাশে,
তাজিল শীতল রশ্মি।
সোনার ছাউনি, সহজে আটনি,
বিশ্বকর্ম্মা গড়ে বসি॥
তাহে স্বর্ণ বিন্দু, রচে বিন্দু বিন্দু,
কণক কুসুম ফুল।
ভানু হেন দেখি, করে ঝিকিমিকি,
কিবা দিব সমতুল॥
কণক গুণেতে, তার চারি ভিতে,
বিনোদ বন্ধনে বান্ধে।
ভানু পৃথিবীতে, ব্যজন দেখিতে,
যেমন ভূমেতে কান্দে॥
দিয়া অপরূপ, সোণার বিম্বুক,
সাজে ব্যজনীর বুকে।
তাহে ঝল মল, রতন কমল,
ভালশোভা চারিদিকে॥ ইত্যাদি।

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই; যাহা হইয়াছে তাহাতেই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবে যে, ক্ষমানন্দ নিতান্ত অবহেলিত হইবার লোক ছিলেন না; অথচ কবিকঙ্কণের ন্যায় উচ্চ আসনও পাইতে পারেননা। তাঁহার কবিত্ব শক্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না এবং সর্ব্বোচ্চ আসন না পাইলেও কবিসমাজে স্থান পাইবার উপযুক্ত; বিশেষতঃ তিনি যখন গ্রন্থ রচনা করেন তখন মুসলমানগণের রাজত্বকাল; কবিকঙ্কণ তখন অত্যাচারী মুসলমানগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া স্বর্গপ্রতিম জন্মভূমি ও পরিজন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি মান্য পাইবার উপযুক্ত।

ক্ষমানন্দ তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের কোন স্থলেই আপনার বিশেষ পরিচয় দেন নাই

কিম্বা সময় জ্ঞাপক কোন কথাই বলেন নাই; সেই জন্য আমাদিগকে তাঁহার যথার্থ সময় নিরূপণ করিতে নানা গোলযোগে প-তিত হইতে হইয়াছে। আমরা যে হস্তলি-খিত পুঁথিখানি সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহা ১১০৫ সালের লিখিত; তাহা হইলেই উহার বয়স প্রায় ১৮৩ বৎসর। এই গ্রন্থখানি আমরা বর্দ্ধমান জেলার পশ্চিম প্রান্তের কোন গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম—কিন্তু ক্ষমানন্দ ঐ জেলার পূর্ব্ব প্রান্তে জন্ম গ্রহণ করেন। এক্ষণে দেখিতে হইতেছে একটি সমগ্র দেশে এক জনের প্রতিপত্তি হইতে কত দিন আবশ্যক—বিশেষ মুসলমা-নগণের সেইরূপ কঠোর শাসন সময়ে। যখন এই গ্রন্থখানি নকল করা হয় তখন যে ক্ষমানন্দ কেবল [illegible] মাত্র বিখ্যাত হইয়া ছেন তাহা নহে, তখন তাঁহার পুস্তক সকল স্থানেই বিশেষরূপে আদৃত ও পঠিত হইত এবং বৎসরান্তে মনসা পূজার দিবস মহা-রঙ্গে গীত হইত। যখন তাঁহার রচনা সর্ব্বত্র সমাদরে পঠিত হইত তখনই আমাদের সং-গৃহীত সেই পুঁথিখানি লিখিত; তাহাতে ইহাই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, অন্ততঃ সেই সময়েরও ১০০ বৎসর পূর্ব্বে মূল গ্রন্থখানি রচিত হয়। তাহা হইলে আমরা ২৮৩ বৎসর পূর্ব্বে উপনীত হই-তেছি; কবিকঙ্কণ ১৫২৫ শকাব্দায় বা ২৭৬ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার চণ্ডী রচনা সমাপ্ত ক-রেন; তাহা হইলে আমাদের অনুমান মত ক্ষমানন্দ কবিকঙ্কণেরও কিছু পূর্ব্বে গ্রন্থ র-চনা করেন ইহাই হইতেছে। শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও তাঁহার "বা-ঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতায়" এই কথাই বলিয়াছেন; তিনি বলেন 'ইনি (ক্ষমানন্দ) কবিকঙ্কণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বি-দ্যমান ছিলেন।" এই মত আমাদের স-হিত ঐকমত্য হইতেছে।

ক্ষমানন্দ বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্ব সীমাবর্ত্তী বালিভাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; কেত-কানন্দ নামে তাঁহার এক সহোদর ছিলেন, তিনিই ইহার সহিত একযোগে পুস্তক প্রণ-য়ন করেন; তাহা আমরা পূর্ব্বেই ব্যক্ত ক-রিয়াছি। কেতকানন্দ কবিত্ব শক্তি বিষয়ে নিতান্ত হীন ছিলেন না—তিনিও স্থানে স্থানে ইহার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। কে তকানন্দের ভণিতাযুক্ত রচনা গ্রন্থে নিতান্ত অল্প নহে—তথাপি তাঁহার নামে গ্রন্থ প্র চারিত হয় নাই; পুস্তকখানি পাঠ না ক-রিলে তাঁহার বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারা যায় না।

ক্ষমানন্দ কায়স্থ কুলসম্ভূত। গ্রন্থের এক স্থলে কেতকানন্দ কায়স্থকুলের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছেন যথা—

"কেতকার বাণী, রক্ষ ঠাকুরাণী,
কায়স্থ যতেক আছে।"

অভিরাম দাস নামে ক্ষমানন্দের একটি পুত্র ছিল, যথা কবি সরস্বতী বন্দনা সমাপ্তি কালে প্রার্থনা করিয়াছেন

'অভিরামে কর দয়া, ক্ষমানন্দ দুঃখ পায় ভজে।'

কিন্তু তাঁহার পিতার নাম তিনি কোন স্থ-লেই উল্লেখ করেন নাই। ক্ষমানন্দ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই।

[illegible] ঘোষ।

তর্কদর্শন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

তর্কদর্শনে ফল আছে।

আমরা মানবীয় জীবন-স্রোত পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইয়া থাকি যে,সাধারণ মানবীয় জীবন স্রোতও স্রোতস্বতী নদীর ন্যায় কাল-আবর্ত্ত আনীত উৎস হইতে সামান্য ধারায় সমুদ্ভূত হইয়া, যতই গন্তব্য পথ অতিক্রম করিয়া আসিতেছে, ততই পর্ব্বে পর্ব্বে ক্রমান্বয়ে, নিত্য নব প্রকৃতি-কৌশল দর্শন এবং তদুদ্বোধনরূপী শাখানদী, উপনদী, প্রভৃতিসহ সঙ্গম সংমিলনে, পর পর পুষ্ট, বিস্তার-প্রাপ্ত, এবং বিকশিত হইয়া, গন্তব্য পথে গতিশীল হইয়া ছুটিতেছে। ক্রমে পশুত্ব হইতে অরণ্যচরভাব, অরণ্যচর হইতে অসভ্য, অসভ্য হইতে অর্দ্ধসভ্য, অর্দ্ধসভ্য হইতে সভ্য, সভ্যহইতে সভ্যতর, সভ্যতম, তাহা হইতে আবারও কোথায় যাইবে তাহা কে বলিতে পারে? এই ক্রমান্বয় গতি, এবং গতি সহ উন্নতি, ইহা প্রকৃতির নিয়ম এবং বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই এতন্নিয়মে পরিচালিত হইতেছে। আত্মিক ভাবে মানবীয় জীবনস্রোতের এই বিস্তার প্রাপ্তি বা উন্নতির একমাত্র পরিচায়ক তাহার জ্ঞান সংসারের প্রশস্ততার পরিমাণ। দেশ কাল পাত্র অনুসারে এই জীবন গতি এবং তাহার জ্ঞান সংসারের বিস্তৃতি শ্রেণি এবং পর্ব্বাদি বিভাগ শূন্য নহে। উহাও আহ্নিক এবং বার্ষিক গতিযোগে গতিশীল হইয়া,দণ্ড, প্রহর, দিবা, বৎসরাদির ন্যায়, শ্রেণি পর্ব্ব পরিচ্ছেদাদি বিভাগে বিভাজিত হইয়া থাকে। মানব-জীবন গতিযোগে যখন যে পর্ব্বে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই পর্ব্বেরই সীমান্ত দ্বয়ের মধ্যে তাহার ক্রিয়া বিস্তার হইয়া থাকে, এবং যে কিছু বিস্তার প্রাপ্ত তাহা তন্মধ্যেই আবদ্ধ হয়। তদূর্দ্ধ দৃষ্টি-রোধ; এবং এই কারণেই প্রতি সাময়িক ব্যক্তি স্বসাময়িক বিস্তার প্রাপ্তিকেই চূড়ান্ত ভাবিয়া থাকে এবং তাহাতেই আকৃষ্ট হয়।

মানবীর জ্ঞানসংসার এবং অজ্ঞানসংসার, যাবতীয় ক্রিয়াভিত্তি, এবং যাবতীয় ক্রিয়া নিষ্পত্তি; ইহাদের ভাব, স্বভাব এবং বিস্তৃতি,তাৎকালিকী মানবের চিত্তস্থ ধারণা শক্তির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে; তৎসীমান্ত বহির্ভূতে যাইতে পারে না। এই নিমিত্ত মানব জীবন তাহার জ্ঞান সংসারের যখন যে পর্ব্বে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার কি আধ্যাত্মিক কি আধিভৌতিক, উভয়বিধ জীবন ক্রিয়াই

সেই পর্ব্বসীমান্তদ্বয়ের মধ্যে আবদ্ধ; এবং সেই পর্ব্বরূপানুসারে রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার ন্যায় অন্যায়, উচ্চ নীচ, যাবতীয় ক্রিয়া এবং মনীষা শক্তি, যতই ইতস্ততঃ ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত, রূপ বিরূপ প্রাপ্ত হউক, তাহা সমস্তই সেই পর্ব্বসংজাত, এবং তৎস্বভাবে স্বভাবিত, যেহেতু উহাই নৈসর্গিক নিয়ম। মানবীয় দেশাচার, লোকাচার, লোকনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মবুদ্ধি, বিবিধ শাস্ত্র, যে যতই বিভিন্ন প্রকারের হউক এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করুক, বা আড়ম্বর প্রাপ্ত হউক না কেন, তাহা সর্ব্বদাই সমপর্ব্বস্থ হেতু এক স্বভাবের এবং সকলেরই দূরদর্শিতা পর্ব্বসীমান্ত মধ্যে আবদ্ধ। কুনীতি, কদাচার, অপকার্য্যাদি সম্বন্ধেও সেই একই উক্তি, অথবা তাহা বলাই বাহুল্য; যেহেতু কুনীতি, কদাচার, অপকার্য্যাদি সুনীতি সদাচার সুকার্য্যাদিরই দিগন্তর মাত্র। এই হেতুই আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি প্রাচীনদিগের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম চর্চ্চা, চিত্তক্রিয়া, শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি সেই এক পর্ব্বের; মধ্য যুগের লোকের আর এক পর্ব্বের, আধুনিকের অপর এক স্বতন্ত্র পর্ব্বের; অথবা সুক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিভাগ করিলে আরও কত শ্রেণি, কত পর্ব্ব, প্রভৃতি লক্ষিত হইতে পারে।

যেহেতু প্রাকৃতিক প্রতিনূতনত্ব হেতু, প্রতি পর্ব্বই পূর্ব্বান্তর হইতে পৃথক্ স্বভাবের; এজন্য মধ্য যুগের যাহা অনুসৃত, তাহা প্রাচীনদিগের হইতে পৃথক্ স্বভাবের; আবার আধুনিকের যাহা অনুসৃত, তাহা মধ্য যুগ হইতে পৃথক্ স্বভাবের হইয়া থাকে। এ কারণে পর্ব্ব হইতে পর্ব্বান্তরে আগতিতে পূর্ব্ব পর্ব্বস্থ বিষয় সমুদয় পরপর্ব্বের ভিত্তি স্বরূপ উপস্থাপিত হইয়া ব্যবহার হইতে পরিত্যক্ত হয়। এই পরিত্যক্ত হওনই, পর্ব্ব হইতে পর্ব্বান্তরের স্বভাব পৃথকত্বের পরিচায়ক স্বরূপ। নতুবা দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ, প্লেটো প্রণীত তত্ত্ববিদ্যা এবং দর্শনাদি কি কারণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। যদি কেবল ভ্রম আবিষ্কারে হয়, তাহা হইলে, একেবারে পরিত্যাগের আবশ্যক কি? প্লেটোর ন্যায় মনীষাশক্তি সত্যই আমূলতঃ বস্তুশূন্য সারশূন্য ভ্রমরাশি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে। একথা কখনও হইতে পারে না। সুতরাং যখন আমূলতঃ পদার্থশূন্য এবং ভ্রমপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না, এখন আমূলতঃ পরিত্যাগ না করিয়া কেবল ভ্রমকয়টি সংশোধন করিয়া লইলেই ত চলিতে পারিত, সমগ্র পরিত্যাগের আবশ্যক? কিন্তু তথাপি সমগ্রই পরিত্যক্ত হইয়াছে; তাহার কারণ,উহাতে ভ্রম আবিষ্করণ নহে, —তাহার কারণ, প্লেটোর ধারণাশক্তি এবং চিত্তক্রিয়া প্রণালী, তাহা এখনকার সঙ্গে মিশ খায় না, এবং সহানুভূতি শূন্য।

কিন্তু এখন এক কথা উঠিতেছে এই যে, যখন নিত্য বস্ত্বন্তর পরিবর্ত্তনই দেখিতেছি নিয়ম, তখন নিত্য অবলম্বনীয় বস্তু কি হইতে পারে, কোথায় পাইব, এবং কাহার অবলম্বনে নিত্য প্রতিরূপ দৃঢ়তা লাভে কর্ম্ম প্রবর্ত্ত হইব? দেখ, প্রতিদিবা বৎসরাংশ হইলেও উহা স্বয়ং এক একটি পূর্ণ পদার্থ। বৎসর প্রতিরূপ উ-

হাতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিয়া থাকে; সেইরূপ মানবজীবন প্রবাহেরও প্রতিপন্ন আমূল প্রবাহের অংশ হইলেও, উহা স্বয়ং একটি পূর্ণ পদার্থ, এবং সমগ্র প্রবাহ উহাতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। এই বিশ্ব সংসারই, কেবল অনন্ত পূর্ণ সমষ্টি সংমিলনে মহাপূর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অথবা আমেরিক ইমার্সনের কথা স্মরণ করিও; তিনি বলিয়াছেন বিশ্ব ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম, বৃহৎ হইতে বৃহত্তম, ক্রমোত্তর চক্র সন্নিবেশ ও চক্র অভিনয় স্বরূপ। বস্তুতই তাহা উত্তর-উত্তর চক্র হইতে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব চক্র বিস্তার ন্যূনতা হইলেও, অবয়বে এবং চক্র ধর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন। বিস্তৃতি পরিত্যাগ করিলে মহাচক্র এবং ক্ষুদ্রচক্র উভয়েই কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এই আণবীয় জীবনপর্ব্ব এবং তদাশ্রিত বিষয়াদি সম্বন্ধেও অবিকল তাহাই। তুমিও ইচ্ছা করিলে, এবং অনুষ্ঠানশ্রমে যদি কাতর না হও, সেই সীমান্তদ্বয়ের মধ্যেই, তোমার ধারণাশক্তির পরিমাণ অনুসারে, তোমার অবলম্বনীয় নিত্য বস্তুর দর্শন পাইতে পারিবে। যদিও কাল আবর্ত্তনে উত্তরদর্শীর নিকট উহা ভিন্নরূপ বলিয়া দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, তথাপি তোমার অবলম্বন এবং তাহা হইতে কার্য্য মূলের উৎপত্তির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটাইবে না। যে হেতু ঐ রূপান্তর বস্তুর নহে, বস্তুর বিস্তৃতি গুণের। দুর্গম গিরির আভ্যন্তরীণ শৈল দণ্ড যাহা, তাহা নিয়তই একই ভাবে একই রূপে অবস্থান করিতেছে; প্রভেদ কেবল কথনও সমুদ্র, কথনও বালি, কথনও মৃত্তিকা, কথন উদ্ভিদ্ জীব জন্তু আদি পর পর তাহাকে আসিয়া আশ্রয় করিতেছে ও যাইতেছে মাত্র।

নিত্য বস্তু এরূপে রূপান্তর প্রাপ্ত হইতে চলিলে, অনিত্যের ক্ষণস্থায়িত্ব হইতে তাহার পৃথকত্বের পরিচায়ক এই যে, নিত্য বস্তু যাহা তাহার কি পূর্ব্বরূপ কি উত্তররূপ, কি যে কোন সত্য এবং নিত্য পদার্থ, কেহ কাহারও বিরুদ্ধাচরণ করে না, প্রত্যুত তাহা পরস্পরকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থনই করিয়া থাকে। অনিত্য এবং ভ্রমপূর্ণ বস্তুর ধর্ম্ম তাহা নহে, উহা আত্মাতীত আর যে কোন বস্তুর সঙ্গে নিত্য বিরোধি। তোমার অযথা অনুসৃত তর্কদর্শনও পরস্পরের মধ্যে সেই জন্যই এরূপ বিরুদ্ধমূর্ত্তি দেখাইয়া থাকে, এবং অপর যে কোন চিত্তশক্তি উপার্জ্জিত জ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। এই অযথা অনুসৃত তর্কদর্শন একে পরিবর্ত্তনীয়, তাহাতে এরূপ পরস্পর বিরোধি, এই জন্যই তোমাকে তাহার উপর তোমার জ্ঞান সংসার নির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করিয়া থাকি। তবে উহার সদ্ব্যবহার কোথায়?

মানবীয় যে কিছু আধিভৌতিক স্বচ্ছন্দতা, তাহা সর্ব্বদাই মানবীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান হইতে উদ্ভব হইয়া থাকে; অথবা অন্য কথায় আধিভৌতিক বস্তু মাত্রই আধ্যাত্মিকের কেবল বাহ্য প্রচার মাত্র। ফলতঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সংসারই মানব জীবন প্রবাহের একমাত্র সার পদার্থ; এবং সেই জ্ঞান সংসারের বিস্তৃতিই মানবীয় উন্নতি; এবং সেই জ্ঞান সংসার বিস্তৃতিকে মূল করিয়া, সেই মূল হইতে সাত্বিক কর্ম্ম-

রাশির সমুৎপাদনই মনুষ্য জীবনের এক-মাত্র উদ্দেশ্য। এই জ্ঞান সংসার, যাহার একমাত্র বিস্তৃতির উপরেই সমগ্র ভাবী উন্নতি এবং জীবনের উদ্দেশ্য সফলতা প-র্য্যন্ত নির্ভর করিয়া থাকে, তাহা আপনি পায় হাঁটিয়া বিস্তার প্রাপ্ত হয় না। মান-বীয় যাবতীয় সৎশক্তি, বৃত্তি, বুদ্ধি, শস্ত্র শা-স্ত্রাদি সমগ্রই তদর্থে নিয়োজিত; এবং তাহাদেরই কার্য্য পরিমাণ অনুসারে ঐ বি-স্তার প্রাপ্তির ন্যূনাতিরেক সম্ভাবনা হইয়া থাকে। বলা বাহাল্য যে মানবীয় সেই সৎশক্তি প্রভৃতি, তাহাদের মধ্যে যে, যে পরিমাণে সেই বিস্তৃতিকল্পে সহায়তা ক-রিয়া থাকে, সে সেই পরিমাণে মঙ্গল দায়ক এবং শুভ; যে যে পরিমাণে নিষ্কার্য্য বা বিপরীত কার্য্যের তাহার অন্যতর সাধন করিয়া থাকে, সে সেই পরিমাণে অমঙ্গল দা-য়ক এবং অশুভ। ইহাতেই যে কোন বি-ষয়ের ব্যবহার অসদ্ব্যবহারের পরিমাণ হইয়া থাকে। তোমার তর্কদর্শনেরও ব্য-বহার অসদ্ব্যবহারের পরিমাণ ইহাতে হয়।

আমাদিগের দ্বারা যাহা কিছু নিষ্পন্ন হ-ইয়াছে, হইতেছে, এবং হইবে, তাহাদের সকলেরই প্রাথমিক বীজ সেই প্রকৃতি-রূপি বিশ্বচিত্রফলকে চিরচিত্রিত এবং নিহিত আছে। তাহাদেরই সুষুপ্তি ভঙ্গ, পরিচয় গ্রহণ, দৃশ্য মধ্যে আনয়ন এবং অঙ্কুরিত করণ, ইহাই জ্ঞান সংসারের বি-স্তৃতি সাধন ক্রিয়া। উহা মনুষ্য মনের ক্রিয়া-শক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই ক্রিয়া শক্তি দ্বারা কিরূপে সম্পাদিত হয়, তাহা দেখা যাউক। এই ক্রিয়া-শক্তি চতুর্ব্বিধ। চিত্ত, বুদ্ধি, যুক্তি, এবং শ্রদ্ধা।

১। চিত্ত।—যদবলম্বনে, স্থূল হউক সূক্ষ্ম হউক, বস্তুর অস্তিত্ব এবং বস্তুরূপ দৃষ্ট অর্থাৎ অনুভূত হইয়া থাকে।

২। বুদ্ধি।—যদবলম্বনে সেই দৃষ্ট বা অনুভূত বস্তুর বস্তুত্ব জ্ঞান হয়।

৩। যুক্তি।—যদবলম্বনে সেই জ্ঞাত বস্তু, বস্তুতঃ সেই বস্তু কি না, তাহা নি-রূপিত হয়।

৪। শ্রদ্ধা।—যদবলম্বনে সেই নিরূ-পিত বস্তুকে, সেই বস্তু বলিয়া স্বীকৃত এবং গৃহীত হয়।

উক্ত চতুর্ব্বিধ ক্রিয়া-শক্তির ক্রিয়া প্র-ণালী যদিও মনুষ্যমনে প্রতি মুহূর্ত্তেই কর্ম্ম-রাশির সমুৎপাদন করিয়া যাইতেছে; যদিও তাহা উদাহরণ চিত্রে চিত্রিত করিয়া দে-খাইবার কিছুমাত্র আবশ্যক রাখে না; তথাপি সহজ বুদ্ধির সহজবোধের নিমিত্ত একটি মাত্র উদাহরণ দিয়া দেখাইব। স-ম্মুখে একটি বৃক্ষ রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষটি মানসক্ষেত্রে আনয়ন এবং স্থাপন করিতে হইলে, উক্ত চতুর্ব্বিধ ক্রিয়া শক্তি এরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। চিত্তযোগে বৃক্ষটির স্থিতি ও রূপ সন্দর্শন, বুদ্ধিযোগে তাহা অপরাপর পদার্থ হইতে পৃথক্ এবং বৃক্ষ বলিয়া উদ্বোধন; যুক্তিযোগে উহার অ-বস্থা এবং স্বভাব সমন্বয়ে, উহার বৃক্ষত্ব নিরূপণ, এবং শেষে শ্রদ্ধাযোগে উহা নিঃ-সন্দেহ বৃক্ষ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। স্থূল সূক্ষ্ম, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক, যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধেই, এই শক্তি চতুষ্টয়ের

ক্রিয়া প্রণালী অবিকল এইরূপ। এবং এই ক্রিয়া প্রণালীর যথার্থ পরিচালনেই নবজ্ঞান আবিষ্কার এবং জ্ঞান সংসারের বিস্তৃতি সাধন হইয়া থাকে।

মনুষ্য মনের ক্রিয়াশক্তি উক্ত চতুর্ব্বিধ ভিন্ন, আর অপর কোন প্রকার ক্রিয়াশক্তি নাই। ইহা ভিন্ন অপরাপর আর যে সকল সামান্য শক্তি আপাততঃ মনের পৃথক্ শক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে; তাহা বস্তুতঃ পৃথক্ শক্তি নহে; এই চারিটির মধ্যেই কোনটি না কোনটির শাখা প্রশাখা মাত্র। এই চতুর্ব্বিধ ক্রিয়াশক্তির যাহা বাহ্য প্রচার ও প্রতিরূপ, এবং যাহা সঞ্চালনভাব, তাহা আমরা সাধারণতঃ এরূপে অভিহিত করিয়া থাকি। চিত্তের —চিন্তা এবং কল্পনা, বুদ্ধির—বোধানুভব, যুক্তির তর্ক এবং তত্ত্ব; শ্রদ্ধার—বিশ্বাস এবং ভক্তি। এখন দেখ, যে যুক্তিকে সর্ব্বেসর্ব্বা ভাবিয়া উন্মাদ হইতে, তাহা মনুষ্য মনের ক্রিয়া শক্তির তৃতীয়পর্য্যায়ে অবস্থান করিয়া থাকে। আর চিত্ত, যাহাকে কেবল কল্পনা প্রসূত বলিয়া উপহাস করিতে, তাহার স্থান প্রথম পর্য্যায়ে। ফলতঃ চিত্তই সকল জ্ঞানের প্রসূতী স্বরূপ, অপর শক্তিত্রয় ধাত্রী স্থলীয়।

শারীরিক সমস্ত যন্ত্র গুলিন যখন প্রকৃতিস্থ থাকিয়া সর্ব্ব সংমিলনে সামঞ্জস্যে আপনাপন যথানির্দ্দিষ্ট কার্য্য গুলিন করিয়া থাকে, তখনই তাহাকে স্বাস্থ্যবান্ শরীর কহা যায়। এই সামঞ্জস্য সংমিলন হইতে কোন যন্ত্র পৃথক্ হইয়া ক্রিয়াধিক্য বা ন্যূন ক্রিয়াবান্ হইলেই, তাহা রোগের মূল রূপে পরিণত হয়। যেমন মানবের ভৌতিক শরীর সম্বন্ধে; আত্মিক শরীর সম্বন্ধেও অবিকল তদ্রূপ। এই চতুর্ব্বিধ ক্রিয়াশক্তি যখন সামঞ্জস্যে পরস্পর সুখ সংমিলনে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে; তখনই অনুষ্ঠিত কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে সুসম্পাদিত হইবার তাহার সার্থকতা উপস্থিত হয়; এবং তখনই কর্ম্মদায়ক এবং কর্ম্মকারক উভয়েরই অভীষ্ট পূরণ হইয়া থাকে। তখনই মন শান্তির আলয়, এবং তখনই মন প্রকৃত পক্ষে কৃতি এবং স্বাস্থ্যবান্। তদ্ভিন্ন ইহার একান্যতর যে কোন শক্তি প্রবল বা ক্ষীণ হইলেই, তাহা অস্বাস্থ্যের চিহ্ন। অস্বাস্থ্য মন অশান্তির আলয়। সন্দেহ, বৃথান্বেষণ, কুচিন্তা, কুসংস্কার, ইত্যাদি ইহার রোগ। এই সকল রোগের উপস্থিতি হইলেই, মানবনিষ্পাদিত কার্য্য অকার্য্য মধ্যে পরিগণিত, এবং তাহা কুফলপ্রদ হইয়া থাকে।

এই সকল রোগ, ইহাদের মূল স্বরূপ মনের বিকৃত ক্রিয়া শক্তির প্রকৃতিভেদে পৃথক্ পৃথক্। চিত্তের আধিক্য জনিত যে রোগ, তাহার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত অর্থশূন্য খেয়াল, এবং অনাবশ্যকে কার্য্যারম্ভ; জাতিগত দৃষ্টান্ত ভারতে অষ্টাদশ পুরাণের উদ্ভব, এবং পৌরাণিকি ধর্ম্ম গ্রহণ। বুদ্ধির আধিক্যজনিত রোগে ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত অহঙ্কার এবং আত্মসর্ব্বস্ব ভাব; জাতিগত দৃষ্টান্ত চীনদিগের বিদেশ-বিমুখতা। যুক্তির আধিক্য জনিত রোগের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত সন্দেহ, অবিশ্বাস, এবং নাস্তিকতা ও সারশূন্য অকর্ম্মা জ্যেষ্ঠতাতত্ব;

জাতিগত দৃষ্টান্ত ফরাশি রাজ্যের মুহুর্মুহু রাজবিপ্লব। শ্রদ্ধার আধিক্যজনিত ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত জ্ঞানশূন্য স্বেচ্ছাপ্রিয়তা এবং গোঁড়ামি; জাতিগত দৃষ্টান্ত রোমাণ কাথলিক খৃষ্টানদিগের অগ্নিপরীক্ষা, বল পরীক্ষা ইত্যাদি। আমি এখানে বোধ সুগমের নিমিত্ত কেবল এক একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম। মানবজীবন প্রবাহের স্রোতধারাও যখন অসংখ্য, তখন দৃষ্টান্তও অসংখ্য। আর কিছু দৃষ্টান্তের আবশ্যক হইলে, যাহার যেমন চিত্ত শক্তি তাহা হইতে খুজিয়া লইবে। তবে বাঙ্গারাম, তুমি তোমার তোমাতে কিছু দৃষ্টান্ত না দেখাইলে সহজে বুঝিবে না? কিন্তু বাপু তোমাতে দৃষ্টান্তের অভাব কি?—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দৃষ্টান্ত আসিয়া তোমাতে সমাবেশ হইয়াছে! ঐ যে তুমি নূতন লক্ষ্মীর আশে ঘরের লক্ষ্মী সর্ব্বদাই পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিতেছ, উহাই তোমার চিত্তাধিক্যের দোষ; তোমার এ পর্ব্বের তোমার গুরুগ্রন্থ বঙ্গীয় অপাঠ্য কাব্য নাটক উপন্যাসাদি। তুমি যে নিজে জ্যেষ্ঠ, আর সমস্ত কনিষ্ঠ; তুমি খৃষ্টানের কাছে খৃষ্টান, হিন্দুর কাছে হিন্দু, মুসলমানের কাছে মুসলমান; এবং তোমার বহুতর সভা ও বক্তৃতাদি, ইহাই তোমার বুদ্ধির দোষ; এপর্ব্বে তোমার অবলম্বনীয় গুরুগ্রন্থ আদালতের নজির এবং লর্ডমেও ও কেশব সেনের বক্তৃতা। তুমি যে কিছুই নহ, কেবল উদর চিনিয়া লোকের সর্ব্বনাশে আক্কেলমন্দ; নাস্তিকতা ও পাষণ্ড ভাব; তোমার দেড়গজি বচন, এবং এক নিশ্বাসে বিবিধ সমাজ সংস্করণ, ইহাই তোমার যুক্তির দোষ; এ পর্ব্বে তোমার গুরুগ্রন্থ মিলসাহেবের হিতবাদ দর্শন এবং সাময়িক মাসিক পত্রিকাদির বিজ্ঞান রহস্য। আর হাঁচি টিকটিকীতে যে তোমার যাত্রা বারণ, ইহাই তোমার শ্রদ্ধার দোষ; তোমার অবলম্বনীয় গুরুগ্রন্থ শ্রীরামপুরের ফুল পঞ্জিকা। বোধকরি এতদবস্থার অতিরিক্ত যাইতে বিধাতা তোমার শাস্ত্রে লিখেন নাই। ঐ যে নির্ব্বোধ চাষাটিকে দেখিতেছ, মনের সুখে খাটিতেছে, খাইতেছে, হাঁসিতেছে, এবং ঘুমাইতেছে, তুমি মনে মনে ভাবিতেছ যে বুদ্ধি বিদ্যা মনীষা শক্তির দৌড়ে তোমা অপেক্ষা সে সহস্রগুণে নিকৃষ্ট। বস্তুতঃ তাহাই। তোমার সহ গণনা এবং সমকক্ষতার সে সর্ব্বাংশে অযোগ্যই বটে; এই হীনাবস্থা, তাহার পর তোমার নিজেরও দৌরাত্ম্য তাহার উপর অনেক আছে; কিন্তু বলিতে পার তথাপি কেন সে তোমা অপেক্ষা সহস্রগুণে শান্তি সুখ ভোগ করিয়া থাকে,—উহাকেও ত মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া উদরান্ন সংগ্রহ করিতে হয়? কই, উহার ন্যায় নির্ভাবনায় আহার বিহার ত তোমার ভাগ্যে একদিনও দেখি নাই! বাপু বাঙ্গারাম, কেবল আক্কেলমন্দিতে কিছু হয় না। তুমি মানসরুগ্ন, সে নীরোগ। তাহার মানসিক শক্তি এবং বৃত্তি সমূহ যতই অল্প সতেজ এবং হীনপ্রকৃতির হউক না কেন, যাহা কিছু আছে তাহা প্রকৃতিস্থ, তাহা সামঞ্জস্যময়ী। তোমার তাহা নহে। যাহার মানসিক বৃত্তি সমূহ যেমন সতেজ, তাহাকে ঘাত প্রতিঘাতও সেইরূপ সহ্য করিতে হয়। উচ্চে উচ্চে উচ্চ পরীক্ষার প্রয়োজন, যেহেতু ত-

থায় বিধাতৃকর্তৃক ন্যস্তভার পরিমাণ অনুরূপ উচ্চ কার্য্যের। তোমার ঘাতপ্রতিঘাতে তুমি অস্থিরপদ, কিন্তু ঐ চাষাটি উহার ঘাত প্রতিঘাতে সুস্থিরপদ। এজন্য মানসিক শক্তিতে সে তোমা অপেক্ষা হীন হইলেও,তোমা অপেক্ষা সাধু; এবং এই জন্যই তাহার মন তোমা অপেক্ষা অধিক শান্তির আলয় বলিয়া জানিও। বড়ত্বে তুমি যাহাজ, সে ক্ষুদ্র নৌকা হইলে হইতে পারে; তুমি তরঙ্গ-সঙ্কুল-সমুদ্রগামী, সে সামান্য স্রোতধারা-মাত্র-বাহী। কিন্তু এক্ষণে প্রভেদ এই, তুমি বিপাকসংঘর্ষে ভগ্নদেহ চড়ায় নিপতিত; সে এখনও বসনার্দ্ধে পাইল তুলিয়া সুখস্পর্শ দক্ষিণানীলে নিজ-স্রোত বাহিয়া অঙ্গ ভাসাইয়া চলিয়াছে!

এই চতুর্ব্বিধ শক্তির একতর প্রবল হইলেই, অপরাপর শক্তি সমূহ ক্রিয়া ন্যূনতায় ক্ষীণতেজ হইয়া আইসে; এবং যেটি প্রবল হইয়া থাকে, তাহারই বশবর্ত্তী এবং আজ্ঞাবহ হয়। এইরূপ সংঘটন হইলেই অসতের সঞ্চার হইয়া থাকে। সৎ হউক অসৎ হউক, যে কেহ, একবার উদয় হইবার সুযোগ পাইলে, স্বস্থানে স্থির হইয়া থাকিবার পাত্র নহে; নৈসর্গিক নিয়ম অনুসারে তাহারও বৃদ্ধি আদি উত্তর অবস্থা আছে। বিকার হইতেই বিকারের উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি। এ নিমিত্ত যে শক্তির বিকার হইতে যে অসতের উৎপত্তি, তাহার, পরিবর্দ্ধনেও সেই শক্তিরই অযথা সঞ্চালনের আবশ্যক হয়। ইহা হইতেই মনুষ্য ক্রমে কূট হইতে কূটতর এবং কূটতম অসতে নিপতিত হয়। শক্তি সমস্ত প্রকৃতিস্থ এবং সামঞ্জস্য সংমিলিত থাকিলে, সেরূপ হয় না। বিনাদৃশ্যমান শ্রমেই তদ্দ্বারা সুকার্য্য স্বতঃ নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। এই কারণেই পূর্ব্বতন বিজ্ঞগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, সুকার্য্য নিরূপণ করিতে হইলে প্রকৃত পক্ষে কিছু মাত্রই ভাবনার আবশ্যক রাখে না; যত ভাবনার আবশ্যক অসৎকার্য্যের উৎপাদনে। উহার অর্থ সম্প্রসারিত করিয়া বুঝিলে, বস্তুতই তাহা। ফলতঃ এই বৃত্তি চতুষ্টয়ের সামঞ্জস্যসমাবেশই শুভ; এবং তদন্যতর অশুভ বলিয়া জানিও।

বস্তুতঃ যদি আমরা এই শক্তিচতুষ্টয়কে এক হইতে অপরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আলোড়ন না করি, তাহা হইলে তাহারা কতই সহজে উদ্দিষ্ট কার্য্য যথাসম্ভব ভাবে কেমন সম্পন্ন করিয়া থাকে। বাঞ্ছারাম, তুমি কখনও কোন বিপদে পড়িয়া কি ভাবিয়াছ; যদি পড়িয়া না থাক, যখন পড়িবে, দেখিতে পাইবে, এবং আমিও অনেক বার দেখিয়াছি;—সমস্ত দিন রাত্র ভাবিয়া ভাবিয়া বিপদের কোনই উপায় করিতে পারি নাই। যখন নিদ্রিত হইলাম, তখনও কিছুই ঠিক্ হয় নাই; কিন্তু পরদিন নিদ্রাভঙ্গে দেখি, সমস্তই পরিষ্কার; ইতিকর্ত্তব্যতা আপনা হইতে নিরূপিত হইয়া রহিয়াছে। নিউটনের অদ্ভুত আবিস্ক্রিয়া সম্বন্ধে, তিনি এক সময়ে সন্ধান-জিজ্ঞাসু হইয়া এরূপ মর্ম্ম ব্যক্ত করিয়াছিলেন, "আমি যখন চিন্তা করিতে বসি, তখন এক সাধারণ জ্ঞানোদ্দেশ্য ভিন্ন, অপর কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের স্থিরতা থাকে না। ক্রমে প্রগাঢ় চিন্তার ঘোর অন্ধকারে পতিত হইয়া

পথভ্রষ্ট হই। ক্ষণেক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া, তাহাতেই অনুসন্ধান করিতে করিতে আলোকের উদয়দিক্ পরিষ্কার হইয়া আইসে। ক্রমে উষা, ক্রমে প্রাতঃকাল, ক্রমে সূর্য্যোদয়, শেষে মধ্যাহ্ণ আসিয়া উপস্থিত হয়। তখনই এই মধ্যাহ্ণ সূর্য্যালোকে আমার লোভনীয় বস্তু যাহা যাহা, তাহা স্বচ্ছন্দে দেখিয়া ও চিনিয়া লই।" যদি তাহাই না হইবে, তাহা হইলে কি কখন মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইত!

এই শক্তিচতুষ্টয় স্বভাবতই মনুষ্যমনে তিষ্ঠিতেছে। তবে যে তাহাদের দৃশ্যাদৃশ্য সদ্ব্যবহার অসদ্ব্যবহার প্রভেদ, তাহা কেবল উৎকর্ষ, অপকর্ষ বা অসতোৎকর্ষ সাধনের ফল। তুমি যে তর্কদর্শন বিশেষকে জগৎসার বলিয়া ভাবিতেছ, তুমি জানিও তোমার মনে নিরন্তর তাহা অপেক্ষা অনন্তগুণ অধিকতর তর্কদর্শন অবস্থান করিতেছে। তোমাতে তাহা সুপ্ত, সেই জন্য বুঝিতে পারিতেছ না। কিন্তু যাহাতে তাহা কিয়ৎপরিমাণে সুপ্তোত্থিত, তথায় দেখ; ঐ দেখ ঐ ব্যক্তি তোমার সেই জগৎসারদর্শন, বিনা তর্কে, ভাল নহে বলিয়া মুখ উল্টাইয়া ফেলিয়া দিতেছে। কেন ফেলিতেছে?—উহার মনে বলিল উহা ভাল নহে। মন কেন বলিল?—মনই জানে! ইহা নিশ্চয় জানিও, যে কোন বস্তু মন যথার্থভাবে আয়ত্ত করিয়া (স্কুল পণ্ডিতী আয়ত্ত নহে) তাহার উপরে দৃঢ়ভাবে মতামত প্রকাশ করিতে পারে; নিঃসন্দেহই সেই বস্তু হইতে মতামত প্রকাশক মানসশক্তি অনন্ত গুণে শক্তিসম্পন্ন।

বাঞ্ছারাম, তুমি সাধারণ মনুষ্যমনকে যত হেয় ভাবিয়া থাক, বস্তুতঃ উহা তত হেয় নহে। মনের ভাবও অনন্ত, শক্তিও অনন্ত। অসীমশক্তি সসীমপৃথিবীতে আসিয়া সীমা নিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, একই দর্শনে তাহার বিস্তার অনুভব করিতে পার নাই, কর্ম্মস্থল অসীম, কর্ম্ম পদার্থও অসীম; কিন্তু কর্ম্মমজুর একেবারে সকল একত্রে যুটে নাই, সুতরাং কেমন করিয়া তুমি তাহার একেবারে বহু বিস্তৃত শক্তি সঞ্চালন দেখিতে পাইবে। এই জন্যই একেবারে না হইয়া, যুগে যুগে নূতন জ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়া, যুগে যুগে জ্ঞানের নূতন উন্নতি দেখিতে পাইয়া থাক। আমি এখানে এখন, এখানকার অনুষ্ঠানীয় কর্ম্মরত হইয়া তাহার অনুধাবন করিতেছি; এই সময়ে তুমি যদি ওখানে কি কর্ম্ম করিব তাহার কর্ম্ম পদার্থ অথবা কর্ম্ম পদার্থ ভ্রমে বা নষ্টামিত অকর্ম্ম পদার্থ রাখ, ভাবিওনা যে তাহা আমি একেবারেই দেখিতে পাইব না, বা যাহা ভাল তাহা হেলা করিয়া নষ্ট করিব। যদি তাহা না হইবে, তবে এতকাল ধরিয়া দুর্জ্জনশিক্ষা ভেদ করিয়া আসিলাম কিরূপে; কিরূপেই বা সুজনবাক্য রক্ষা করিয়া আসিতে সমর্থ হইলাম? যদি তাহা না হইত, তবে তোমার কালিদাস, হোমার, শঙ্করাচার্য্য, সক্রেতিস, এ সকলকে কালের তরঙ্গ ভেদ করিয়া রক্ষা করিয়া আনিয়াছে কে? যদিও ক্ষণিক তোমার অকর্ম্ম পদার্থের মোহে ভৌতিক সক্রেতিসকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছি বটে; তথাপি, আমার অন্তর্নিহিত সাত্ত্বিক শক্তি সমষ্টি সুপ্ত হইলেও এত প্রবল

যে, সে মোহ ভেদ করিয়াও আত্মিক সক্রেতিসকে অবহেলে বাঁচাইয়া আনিয়াছি। তথাপি অকর্ম্ম পদার্থের মোহ সর্ব্বদা পরিহার্য্য। ঐ মোহ নিত্য নহে, ক্ষণিক বটে; কিন্তু সেই ক্ষণিক স্থিতিতেই কর্ম্ম পণ্ড করাইয়া থাকে। কর্ম্ম পণ্ড হইলেই সকল পণ্ড হইল, যেহেতু কর্ম্মই আমাদের জীবন ক্রিয়ার পরিমাণ; এবং এই পণ্ড হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই, আমাদিগকে যে কিছু মানবীয় উচ্চ মনীষা শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে।

আমাদিগের মন কখনও সুস্থির থাকিবার নহে; উহা অনবরতই কার্য্যরত। সুতরাং কার্য্যসাধক কথিত চতুর্ব্বিধ ক্রিয়া শক্তিও, স্ব স্ব সামঞ্জস্য কার্য্যপটুতার পরিমাণ অনুরূপ নিরন্তর পরিচালিত হইতেছে। বিভিন্ন মনের শ্রেণী অনুসারে ইহাদিগেরও পরিচালন ক্রিয়ার ক্ষীণেতর আছে। এবং সেই ক্ষীণেতরের পরিমাণ অনুসারে, বিভিন্ন মন কর্তৃক সম্পাদিত কার্য্যও ক্ষীণেতর হইয়া থাকে। শক্তি সমুদয় যখন সুসম্মিলিত, তাহাদের ক্ষীণেতর পরিচালনে ক্ষীণেতর কার্য্য সম্পন্ন হইলেও, ক্ষীণ এবং সবল উভয় কার্য্যই সৎ। তবে যে ক্ষীণেতর ভাব তাহা কেবল কার্য্য পর্য্যায় মাত্র। সুসম্মিলিত শক্তি সমূহের সরল পরিচালনার দৃষ্টান্ত স্থল নিউটনের চিত্ত; এবং দুর্ব্বল পরিচালনের ফল, সেই যে চাষা যে তোমা অপেক্ষা বেশি মানসিক শান্তিভোগ করিতেছে। তোমার তর্কদর্শন, তোমার তর্কদর্শন কেন, উক্ত শক্তি চতুষ্টয়ের যে কাহারও অধিকার উদ্ভবতত্ত্ব, তাহার সদ্ব্যবহার এবং সার্থকতা, কেবল এইরূপ সামঞ্জস্য সংমিলনে ক্রিয়া উৎপাদনেই সিদ্ধি। ইহাই মুখ্য সদ্ব্যবহার সামঞ্জস্য পরিত্যাগে একাইক সদ্ব্যবহারও আছে; তাহা গৌণ, নিম্নে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

সংসারে নিয়তই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বস্তুকে ভিত্তি স্বরূপ করিয়া উত্তর বস্তু সমাগতহইয়া থাকে; এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বস্তুও পূর্ব্বগত তাবৎ যুগের আয়োজন ফল আপনাতে সমাবেশ করিয়া তৎপ্রতিনিধি রূপে উত্তর বস্তুতে প্রবিষ্ট হইয়া, আত্ম ব্যবহার সেই উত্তর বস্তুর ব্যবহারে মিলাইয়া, স্বয়ং অব্যবহারে পতিত বা অদৃশ্য হইয়া যায়। এই পূর্ব্ব বস্তুর অতিক্রমে উত্তর বস্তুর উদয়, যেখানে যেখানে মানবীয় শক্তিসাপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেখানে সেখানে অবশ্যই উত্তর বস্তুর পরিচালনে দক্ষতা লাভের নিমিত্ত পূর্ব্ববস্তুদ্বারা পরিচয় হইতে উত্তর বস্তুর প্রকৃতি অবগতির নিমিত্ত, পূর্ব্ব বস্তুর স্মৃতি উদ্দীপক স্বরূপ তদবয়ব জ্ঞাপক সঙ্ক্ষেপতঃ রেখাচিত্র, অথবা সঙ্কেত লিপির আবশ্যক।—এই সঙ্কেত লিপির ব্যবহার অবিকল আধুনিক বক্তৃতাকারকের বক্তৃতা কালীন স্মৃতি উদ্দীপক সঙ্কেত লিপির ন্যায়।

এই কারণ হইতে, মানবীয় জ্ঞানসংসার যখন একপর্ব্ব হইতে পর্ব্বান্তরে গমন করে, তখন পূর্ব্ব পর্ব্বের সমাপ্তি সীমান্তে, এবং উত্তর পর্ব্বের আরম্ভ সীমান্তে এই দুই সীমান্তদ্বয়ে,দ্বিবিধ বিভিন্ন মানবীয় শক্তির দুই মহান্ ক্রীড়া অভিনয় হইয়া থাকে। একটি তমোগুণাশ্রয়ী। ইহার কার্য্য পূর্ব্বপদার্থের ধ্বংসকার্য্য শেষ করিয়া, তাহার বিগত জী-

বন-ক্রীড়ার সঙ্কেত লিপি গ্রহণ। দ্বিতীয়টি রজোগুণাশ্রয়ী, ইহার কার্য্য যাবতীয় বিপথগামী পদার্থকে স্বপথে আনিয়া আবার নব সৃষ্টিরচনে উত্তরবস্তুর আগমন সূচন। তমোগুণের কার্য্য সামঞ্জস্য বিচ্যুতি, রজোগুণের কার্য্য সামঞ্জস্যের পুনর্ব্বার রচন। এতদুভয় গুণাশ্রয়ে যাহারা কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে উচ্চতর প্রভেদ এই, রজোগুণাশ্রয়ে যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার কার্য্য পুরোহিতের; এ জগতের পুরোহিতচূড়া, যিশুখৃষ্ট, শাক্যসিংহ, মহম্মদ প্রভৃতি; দশকর্ম্মান্বিত পুরোহিতগণও নিতান্ত হেয় নহে। আর তমোগুণাশ্রয়ে যাহারা কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাদের কার্য্য মুর্দ্দাফরাসের; কিন্তু লোকে মুর্দ্দাফরাসকেই চিনে অধিক। এ শ্রেণির নাম সংখ্যা অনেক, অসংখ্য।

যখন পূর্ব্ব পর্ব্বের ধ্বংস হয়,তখন সঙ্কেতলিপি গ্রহণের সহায়তা করিতেই হউক, বা ধ্বংস কার্য্যের কার্য্যসম্পন্ন করিবার জন্যই হউক,—যেহেতু সামঞ্জস চ্যুতি ভিন্ন ধ্বংস বা বিকৃতির সম্ভাবনা হইতে পারে না,—অথবা যে কোন কারণেই হউক, মানবীয় শক্তি চতুষ্টয়, যাহা এতদিন সামঞ্জস্য সংমিলনে কার্য্য করিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে তাহাদের সেই সামঞ্জস্যসংমিলন ভ্রংশ হইতে আরম্ভ হয়। বস্তু সমূহ এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-ছন্নতায়, একরূপ নিয়মশূন্য হইয়া অনিয়ম তরঙ্গবিঘূর্ণিত হইতে থাকে। এই অনিয়ম তরঙ্গ ঘূর্ণন মধ্যে, মানবীয় অনিয়ম বাঞ্ছা পরিপূরণের এই একমাত্র সময়; অপরিণামদর্শী মানব সন্তানও এ সুযোগ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। ইহা হইতেই পাপের সঞ্চার হয়। সংমিলন ভ্রংশে শক্তি চতুষ্টয় আপন আপন গতির স্বাধীন পরিচালন দ্বারা বিকৃত হইয়া আইসে; এবং সেই বিকৃতির বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইতেই এই জ্ঞানবিপ্লব কালীন লোক ভণ্ডাচার, গোঁড়ামী, আত্মদর্শন-সর্ব্বস্ব-ভাব, কদাচার, কুতর্ক, নাস্তিকতা প্রভৃতির উপস্থিত হয়।

এই কুফল গুলিই আমাদের আত্মবুদ্ধি, আমাদের কৃত পাপ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, নতুবা শক্তি বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই যে একেবারে সকল অনিষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়, এমন নহে। তাহারও একটি সীমা আছে সে, যে সীমা পর্য্যন্ত সামঞ্জস্য ত্যাগে বিষয় বিশেষ আধিক্য প্রাপ্ত হইলেও দৃশ্যমান কোন কুফলের উৎপত্তি হয় না; এবং সেই সীমা পর্য্যন্তাগমন করিলে প্রকৃতিও প্রতিকূলা হয়েন না। প্রত্যুত বোধহয় প্রকৃতিরও তাহাই ইচ্ছা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বস্তু আত্মগঠন পদার্থে ছিন্ন ভিন্ন হইলে, সেই ছিন্ন ভিন্ন মধ্যে স্ব-স্ব অধিকার ভূত বিষয় সমূহের সঙ্কেত লিপি গ্রহণের জন্য, স্বস্ব অধিকার স্থলে কথিত শক্তিচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রত্যেকের কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীন পরিচালনার আবশ্যক হইয়া থাকে। এতদর্থে যুক্তিশক্তির যে পরিচালনা তাহারই ফলে তর্কদর্শন। এ তর্কদর্শনের কার্য্য গতজ্ঞানের স্মৃতি-উদ্দীপনে আগত-জ্ঞান-চেষ্টার সহায়তা মাত্র। ইহার পর যুক্তি শক্তির আরও স্বাধীন পরিচালনা করিলেই আধুনিক নব্য জগতের তর্কদর্শনের উৎপত্তি হয়।

জ্ঞানিমাত্রের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য সেই শেষোক্ত তর্কদর্শনহইতে সর্ব্বদা আত্মরক্ষা করিয়া আইসা।

জ্ঞান-শরীরে তর্কদর্শন অস্থিস্থলীয়। তৎসহ চিত্ত,বুদ্ধি, এবং শ্রদ্ধা এতৎ শক্তিত্রয়-জাত বিষয় সংমিলিত হইলেই, অপূর্ব্ব রূপের সঞ্চার—অপূর্ব্ব কাব্যের সঞ্চার হইয়া থাকে; অস্থিকঙ্কাল ঘুচিয়া তৎস্থানে অপূর্ব্ব মোহন রূপ-মাধুরীর সমুদ্ভব হয়। কি মনোহর! তুমি কেবল অস্থিকঙ্কাল দেখিয়া কি কখন এই মনোহর রূপের সম্ভবতা উপলব্ধি করিতে পারিতে?—কখনই নহে; উহার দ্বারা ঊর্দ্ধ সংখ্যা শরীর ভাবের অস্তিত্ব মাত্র অনুমান করিতে সক্ষম হইতে পারিতে। কিন্তু সে অনুমান, আর এ দৃশ্যে কতই অন্তর!

ভাষা পর্ব্বে ব্যাকরণ শাস্ত্র যদ্রূপ, জ্ঞান পর্ব্বে তর্কদর্শন শাস্ত্রও অবিকল তাহাই। অগ্রে ভাষা পরে ব্যাকরণ; অগ্রে জ্ঞান পরে তর্কদর্শন। ব্যাকরণে ভাষা বোধ বা ভাষার সৃষ্টি হয় না, কেবল গঠন মাত্র জ্ঞাপিত হয়; জ্ঞান-পর্ব্বেও তর্কদর্শন সেইরূপ। ব্যাকরণ ভাষার জীবিতকালে অসম্পূর্ণ, কেবল ভাষা মৃত হইলেই পূর্ণ হয়; জ্ঞানপর্ব্বেও তর্কদর্শন তদ্রূপ। চলিত ভাষার ব্যাকরণ ভাষারই মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে, স্বতন্ত্র ভাবে কেবল পণ্ডিত মহাশয় ভিন্ন আর কাহারও ব্যবহারে আইসে না; জ্ঞান-পর্ব্ব সম্বন্ধেও তর্কদর্শনের প্রতি অবিকল সেইরূপ কথা বর্ত্তে। উভয়েরই কার্য্য পূর্ব্বার্জ্জিত বিষয়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আয়ত্তসাধ্যে আনিয়া, উত্তর বিষয় লাভের সোপান স্বরূপে পরিণত করিয়া থাকে। কেবল ব্যাকরণ ধরিয়া কথা কহিলে,—অলঙ্কার ধরিয়া কাব্য লিখিলে, যেরূপ অশ্রাব্য কথা বা অশ্রাব্য কাব্যের জন্ম হয়; তেমনি তর্কদর্শন ধরিয়া জ্ঞান চর্চ্চা করিলে, জ্ঞানও সেইরূপ কুৎসিত কণ্টকময় হইয়া উঠে। ফলতঃ তর্কদর্শন, ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার, এ তিনই বস্তু এক, তিনেরই ব্যবহার এক, কেবল স্থান এবং উপকরণ মাত্র ভেদে রূপ ভেদ হইয়া থাকে। বাঞ্ছারাম, ইহারা কেহই স্বাধীন নহে, সকলেই অনুগামী অনুচর; তোমার দোষ এই যে তুমি অনুচরকেও কখন কখন, অথবা তাহা কেন, সর্ব্বদাই আপনার উপর প্রভুত্ব করিতে দিয়া থাক। আমাদিগের টোলের পণ্ডিত মহাশয়েরা ব্যাকরণকে পৃথক্ এবং স্বাধীন শাস্ত্র রূপে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন; ইহার ফল স্বরূপ তাঁহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিবার কি আবশ্যক হইবে?

কেবল যুক্তি শক্তির অযথা পরিচালন অর্থাৎ আধুনিক তর্কদর্শনের অযথা অনুশীলন মাত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া এতগুলি কথা বলিয়া আসিলাম; তাহার কারণ এই, তর্ক দর্শনই ইদানীং অধিক অনুশীলিত, এবং কুফলের অধিকাংশই ইহাদ্বারা প্রসবিত। নতুবা যাহা যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা কথিত শক্তি চতুষ্টয়ের যে কোনটিরই তদ্রূপ অসদ্ব্যবহারের প্রতি সমান বর্ত্তে। যদি প্রকৃত জ্ঞানের অনুশীলন এবং উপার্জ্জন করিতে বাঞ্ছা থাকে, তবে শক্তি চতুষ্টয়ের সামঞ্জস্য পরিচালন করিতে শিক্ষা কর। সামঞ্জস্য গুণেই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বক্রিয়ার রচন এবং প্রকটন। তোমার মঙ্গল হউক। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজপুতানার ইতিহাস।

(১০৮ পৃষ্ঠার পর।)

কাইলবর নগরী আরাবলী পর্ব্বতের উপত্যকায় সংস্থাপিত। বিশ্বস্ত রক্ষিবর্গের আশ্রয়ে অজয়সিংহ তথায় বাস করিতেছিলেন। ভীমসিংহ তাঁহাকে এই শেষ আদেশ করিয়াছিলেন যে অজয়সিংহের পর যেন উর্শ্বির পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। উর্শ্বির পুত্র বিখ্যাত হামীর। হামীরের জন্ম ও বাল্য জীবন সম্বন্ধে চমৎকার সম্বলিত বিবরণ সমূহ রাজপুত ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই মহাবীর হামীর চিতোরের পুনঃ উদ্ধার সাধন দ্বারা আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া যান। রাজপুত জাতির বিলুপ্ত সম্মানের পুনঃ সংস্কারের জন্যই যেন তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জননী এরূপ বিক্রমশালিনী ছিলেন, যে কবিগণ উজ্জ্বল বর্ণে তাঁহার বিবরণ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। একদা হামীরের পিতা উর্শ্বি কতিপয় সমবয়স্ক অধ্যক্ষনিচয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া ওন্ধার বনপ্রদেশে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা একটি বন্য-বরাহের পশ্চাদ্গামী হইয়া দেখিলেন, বরাহ জবনাল * ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল; ঐ ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক জন্তু সমূহকে দূর করিবার জন্য এক বালিকা উপস্থিত রহিয়াছে। শস্যক্ষেত্রে সচরাচর একটি উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হয়, তাহার উপর দাঁড়াইলে ক্ষেত্রের সকল অংশেই দৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারা যায়। বালিকা তদুপরি দণ্ডায়মানা হইয়া ক্ষেত্রের সংরক্ষণ কার্য্য সমাধা করিতেছে। বালিকা, জবনাল ক্ষেত্রে বরাহ প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া সম্মুখস্থিত অষ্টহস্ত পরিমিত এক জবনাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক বরাহ পৃষ্ঠে এরূপ সবলে আঘাত করিল যে তাহা সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের ন্যায় তদ্গাত্রে পতিত হইয়া বরাহকে শূন্য জীবিত করিয়া ফেলিল। তখন বালিকা সেই মৃত শূকরের পশ্চাতের পদমাত্র আকর্ষণ করিয়া সেই মৃগয়াভিলাষী রাজপুরুষ দিগের সম্মুখে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া গেল। রাজপুতেরা স্বভাবতঃ বলবিক্রমশালী; বালিকার এতাদৃশ ব্যাপার দর্শনে তাঁহারা সকলেই চমৎকৃত হইলেন। নদীতে স্নান করিয়া তথায় আহারের উদ্যোগ হইতে লাগিল। সহসা একটি বেগবান মৃন্ময় গোলা পতিত হইয়া উর্শ্বির ঘোটকের একখানি পদ ভগ্ন হইয়া গেল। যে দিক হইতে গোলা আসিল, তাঁহারা সকলে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বোক্ত বালিকা জবনাল ক্ষেত্রের মঞ্চোপরি দণ্ডায়মানা হইয়া অনিষ্টকারী

* জবনাল,—ভুট্টা, মক্কা, maize.

জীব জন্তুর দৌরাত্ম্য হইতে শস্য রক্ষা করিতেছে। তাহার হস্তে একটি ফিঙ্গা * রহিয়াছে, তাহার দ্বারাই সে মৃণ্ময় গোলা পরিত্যাগ করিয়া জন্তুগণকে দূর করিয়া দিতেছে। তাহার পরিত্যক্ত গোলা দ্বারা রাজকীয় অশ্ব ভগ্নপদ হইয়াছে দেখিয়া বালিকা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার দোষ স্বীকার ও তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গেল। তদ্দিবসীয় মৃগয়াবিলাস সমাপ্ত করিয়া রাজ সম্প্রদায় নগরাভিমুখে গমন করিতে করিতে দেখিলেন সেই বালিকা মস্তকে দুগ্ধভাণ্ড ও কক্ষদ্বয়ে দুইটি মহিষশাবক লইয়া অম্লান বদনে ও অক্লিষ্ট ভাবে গমন করিতেছে। রাজসহচরগণের মধ্যে একজন কহিলেন 'উহার মস্তকের দুগ্ধ ফেলিয়া দেওয়া যাউক।' অপর একজন কৌতুক করিয়া বালিকার গায় পড়িয়া গেল। বালিকা তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া একটি মহিষ শাবককে সবেগে জনৈক রাজসহচরের অশ্বগাত্রে ফেলিয়া দিল, তাহাতে অশ্ব নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া এরূপ লম্ফ ঝম্প প্রদান করিল যে আরোহী তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। উর্শি এই বলবিক্রমশালিনী কুমারীর পরিচয় জানিতে ব্যগ্র হইয়া অবগত হইলেন, বালিকা জনৈক দরিদ্র চন্দন † রাজপুতের দুহিতা। পর দিবস উর্শি সেই স্থানে উপনীত হইয়া বালিকার পিতাকে ডাকাইয়া উক্ত বলবিক্রমশালিনী কুমারীর পাণিগ্রহণের প্রার্থনা করিলেন। বালিকার পিতা তাহাতে স্বীকৃত হইল না। এই অস্বীকারে উর্শি ও তদনুচরবর্গ যার পর নাই চমৎকৃত হইলেন। বালিকার জননী এই সমাচার অবগত হইয়া এই অস্বীকরের জন্য পতিকে তিরস্কার করিলে তাহার মন ফিরিয়া গেল। উর্শিকে কন্যাদানে স্বীকৃত হইল। উভয়ের বিবাহ হইল। সেই চন্দন রাজপুত্রীর গর্ভে বলবিক্রমশালী রণকুশল হামীর জন্মগ্রহণ করেন। চিতোরের এই সকল গোলযোগের সময়ে হামীর মাতুলালয়ে কৃষকশিশুর ন্যায় বাস করিতেছিলেন।

এক্ষণে দিল্লীশ্বরের সৈন্য দ্বারা চিতোর রক্ষিত হইতেছে। মিবারের নানা স্থানে মুসলমান সেনা সমবেত রহিয়াছে। অজয়সিংহ মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আবার সময়ে সময়ে নূতন শত্রু দমন করিতে ব্যস্ত হইতেছেন। কতকগুলি পার্ব্বত্য অধিনায়ক তাঁহার নূতন শত্রু হইয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে মুঞ্জ বলাইচা সর্ব্বপ্রধান। এক দিন তাহার সহিত অজয়সিংহের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সে রাণার মস্তকে এক বল্লমের আঘাত করে। রাণা অজয়সিংহের দুই পুত্র, আজিমসিংহ ও সুজনসিংহ, তাহাদের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ ও চতুর্দ্দশ বর্ষ। এই বয়সেই রাজপুতযুবকেরা ভাবী প্রভাবের পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু অজয়ের পুত্রদ্বয় সেরূপ বলবীর্য্যের পরিচয় দিতে পারে নাই। তাহাদের নিকট অজয় অতি অল্প সাহায্য পাইয়াছিলেন। অজয় নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র হা-

* ফিঙ্গা, ফ্িঙ্গে,—দড়ির ক্ষুদ্র শিকা বিশেষ; ইহাতে ইষ্টক কি প্রস্তর রাখিয়া বহু দূরে নিক্ষেপ করিতে পারা যায়; sling.

† চোহান বংশের শাখাবিশেষ।

মীরকে আহ্বান করত পার্ব্বত্য দস্যু মুঞ্জাকে দমন করিতে আদেশ করিলেন। হামীর প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিলেন, যদি কৃতকার্য্য হইতে পারেন তবেই প্রত্যাগমন করিবেন, নচেৎ আর কলঙ্কিত মুখ দেখাইতে আসিবেন না। কতিপয় দিবস মধ্যে দৃষ্ট হইল মুঞ্জার রুধিরসিক্ত মস্তক লইয়া হামীর কাইলবর নগরে প্রবেশ করিতেছেন। পিতৃব্যের চরণতলে মুঞ্জার মস্তক রক্ষা করত অভিবাদন পূর্ব্বক হামীর বিনীত বচনে কহিলেন, "দেব! দাস আপনার শত্রুমুণ্ড ঐ চরণতলে ডালি প্রদান করিল।" অজয় সিংহ সাদরে ভ্রাতুষ্পুত্রকে আলিঙ্গন ও শিরশ্চুম্বন করিয়া মুঞ্জমুণ্ডের রক্ত দ্বারা স্বয়ং হামীরের ললাটে রাজটীকা অর্পণ করিলেন। এই ব্যাপারে অজয়সিংহের পুত্রদ্বয় সিংহাসন প্রাপ্তি সম্বন্ধে এককালে হতাশ হইল। আজিমসিংহ অল্পদিন মধ্যেই দারুণ রোগে কাল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল; সুজনসিংহ পাছে কোন বিদ্রোহাচরণ করে বলিয়া দূরদেশে প্রেরিত হইল। সুজনসিংহ দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া তথায় যে বংশ বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহারা ভাবী কালে ভারতবর্ষে এরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাদের দ্বারা এক সময়ে দিল্লীর সিংহাসনও বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সুজনসিংহই বিখ্যাতনামা শিবজীর পূর্ব্ব পুরুষ।*

হামীর খৃষ্টীয় ১৩০১ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া চতুঃষষ্টি বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রাজত্ব সময়ে রাজপুতগণের লুপ্ত গৌরবের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি যে দিন সিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই দিনই প্রাচীন নিয়মানুসারে শত্রু বিমর্দ্দন কার্য্য দ্বারা ভাবী বলবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করেন। সেই দিন তিনি পূর্ব্বোক্ত বলাইচা অভিধেয় পার্ব্বত্য অধিনায়কদিগের পোশালী নামক দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য দুর্গ অধিকার করেন। রাজপুতদিগের সিংহাসনারোহণ সময়ে শত্রু মর্দ্দন সম্বন্ধীয় কার্য্যবিশেষের দ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিচয় প্রদান করিতে হয়। আমরা পাঠকগণের গোচরার্থে উক্ত প্রচলিত প্রথার বিবরণ করিতেছি। সিংহাসনে আরোহণ করিবার দিবস প্রাতঃকালে ভাবী নৃপতি রণবেশে ভূষিত ও অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া কোন শত্রুর অধিকার মধ্যে প্রবেশ করত কোন দুর্গ জয় অথবা কোন নগর লুণ্ঠন করিয়া তাহার চিহ্ন বা প্রমাণ সমভিব্যাহারে রাজধানী প্রবেশ করিবেন। যদি চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী রাজবর্গের সহিত সৌহৃদ্য বন্ধন থাকে, তথাপি এবম্বিধ কোন তামসিক ব্যাপার সমাধা করিতে হইবে। অদ্যাপিও এই নিয়ম তথায় কিয়দংশে প্রচলিত আছে।

দিল্লীশ্বরের সৈন্যে সমাবৃত হইয়া মল্লদেব চিতোরে অধিষ্ঠান করিতেছেন; মি-

---

* অজয়সিংহ, সুজনসিংহ, দলিপজী, সেউজী, ভোরাজী, দেওরাজ, উগ্রসেন, মাহুলজী, খৈলুজী, জঙ্কোজী, সত্তুজী, শম্ভুজী, শিবজী। একবিধ কারণে চিতোরের রাণা বংশ হইতে দুইটি অতি মাননীয় বিখ্যাত শাখা বাহির হইয়াছে। নেপালের গুরখা, ও দক্ষিণা পথের মারহাট্টা।

বারের স্থানে স্থানে যবন সেনা অবস্থিত রহিয়াছে ; হামীরের রণদক্ষতায় যবন সেনা সমূহ ক্রমে ক্রমে মালভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ক্রমে ক্রমে কতিপয় দুর্গ ভিন্ন মিবারের সমস্ত সমতল ভূমিই প্রায় হামীরের হস্তগত হইল। হামীর স্বীয় অধিকার মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন, যাহারা রণ কৌশলে অনভিজ্ঞ ও শত্রু ভয়ে ভীত, তাহারা সপরিবারে উপত্যকা ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করুক, আর যাহাদিগের কিছু মাত্র সাহসিকতা আছে, তাহারা আমার সমভিব্যাহারে দেশ বৈরির বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়া স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করুক। হামীর স্বাধিকার মধ্যে সেনাদিগের এরূপ গুপ্ত নিবাস সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, যে শত্রুপক্ষীয়েরা কোন ক্রমেই নিরাপদে গমন করিতে পারিত না। এবম্প্রকারে তিনি ক্রমে ক্রমে মিবারে শত্রুসংখ্যা হ্রাস করিতে লাগিলেন।

হামীর আপাততঃ কাইলবর নগরেই রাজপাট সংস্থাপন করিলেন। তথায় তিনি 'হামীর তলাও' নামে এক সরোবর খনন ও তাহার তীর-ভূমিতে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দির সংস্থাপন করেন। অদ্যাপি তাহারা তাঁহার কীর্ত্তিকুশলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। কাইলবর নগর অতি নিরাপদ স্থানে সংস্থাপিত ; সহসা শত্রু আসিয়া তাহা আক্রমণ করিতে পারে না। তাহার চতুর্দ্দিকে ফল মূলাদি পরিব্যাপ্ত বিবিধ কাননভূমি ও সুস্বাদু নির্ম্মল জল-প্রণালী বিরাজিত। ঐ প্রদেশ প্রায় পঞ্চবিংশ ক্রোশ বিস্তারিত ও সমভূমি হইতে দ্বাদশ শত ও সাগরের জল-সীমা হইতে তিন সহস্র পদ উন্নত। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে মাড়োয়ার, গুর্জ্জর ও ভীলদিগের সর্ব্বদা গতিবিধি ছিল। ভীল দিগের নিকট রাণারা সময়ে সময়ে অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। অগুণা ও পানোরার ভীল অধ্যক্ষেরা সময়ে সময়ে রাণাদিগকে পঞ্চ সহস্র ধনুর্দ্ধারী সৈন্য দিয়া সাহায্য করিয়াছে। সমর সময়ে বিবিধ খাদ্য দ্রব্য যোজনা দ্বারা মিবার সৈন্যের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। বৈদেশিক শত্রুর সহিত যখন দীর্ঘকালব্যাপি সমরে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে, তখন মিবার রাজপরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য ভীলেরা অতি বিশ্বস্তরূপে সম্পাদন করিয়াছে।

হামীর এইরূপে মিবার হইতে শত্রু দূর করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে চিতোরের মল্লদেব তাঁহাকে জামাতা করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। পারিষদেরা যার পর নাই প্রতিবাদ করিলেও হামীর মল্লদেবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অনুচরেরা এবংবিধ প্রস্তাবে মল্লদেবের কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে, অথবা তিনি এই কৌশলে হামীরকে হস্তগত করিবার মানস করিয়াছেন, এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু হামীরের মন অন্য পথ অবলম্বন করিল। তিনি ভাবিলেন এই উপায়েই চিতোরের উদ্ধার সাধন করিবেন। তিনি শান্তভাবে কহিলেন, "আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা যে পাষাণময় পথে পদচারণ করিয়াছেন, অন্ততঃ এই উপলক্ষে আমার পদও সেই পথে ভ্রমণ করিবে। বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য রাজপুতকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থা-

কিতে হয়। এক দিন তিনি হয় ত রুধিরাক্ত কলেবরে বাসভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছেন, 'আবার হয় ত অন্য এক দিন তিনি মস্তকে রাজমুকুট ধারণ করিয়া পুরপ্রবেশ করিতেছেন।' এইরূপ স্থির হইল যে, হামীরের সঙ্গে পাঁচশত মাত্র অশ্বারোহী গমন করিবে। হামীর চিতোরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, মল্লদেব চোহানের পঞ্চপুত্র তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু পুরদ্বারে কোন বৈবাহিক চিহ্ন * দেখিতে পাইলেন না। তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা যে উত্তর প্রদান করে, তাহাতে তিনি কোন মতেই সন্তুষ্ট হইলেন না। এই তাঁহার চিতোরে প্রথম পদার্পণ। তিনি তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের প্রাচীনপ্রাসাদে রাও মল্লদেব, তদীয় পুত্র বনবীর এবং অন্যান্য অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক সমাদরে গৃহীত হইলেন। তাঁহারা সকলে হামীরের সমক্ষে যুগ্মকরে দণ্ডায়মান রহিলেন। কন্যা আনীত হইলে পিতা সম্প্রদান করিলেন, কিন্তু বৈবাহিক ক্রিয়া কিছুই হইল না। কেবল মাত্র বরবধূর বসনাগ্র বন্ধন ও উভয়ের হস্ত একত্রীকরণ হইল। হামীর বধূসহ আপনাদের জন্য নির্দ্ধারিত প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। বিবাহিতা রমণীর কথা বার্ত্তায় ও সত্যপ্রতিজ্ঞতায় তিনি এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যে যখন তিনি শ্রবণ করিলেন যে, তিনি একটি বিধবা রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি ক্রোধান্ধ হইলেন না। রমণী কহিল যে, সে বিধবা, জনৈক ভট্টী অধ্যক্ষের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল, বিবাহের অল্পকাল পরেই তাহার মৃত্যু হয়। তখন সে এমন বালিকা যে স্বামীর আকৃতি পর্য্যন্তও তাহার স্মরণ নাই। কিরূপে এই অপমানের প্রতিশোধ হইতে পারে এবং কি উপায়েই বা চিতোরের উদ্ধার সাধিত হয়, রমণী এতদ্বিষয়ে বিবিধ পরামর্শ দেওয়ায় হামীর সে সময়ে মল্লদেবকৃত অপমান ভুলিয়া গেলেন। এরূপ একটি প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে যে, বিবাহের পর জামাতা কোন একটি বিষয় মাত্র যৌতুক স্বরূপে স্বয়ং কন্যা কর্ত্তার নিকট প্রার্থনা করিবেন। তদনুসারে হামীর-পত্নী পতিকে কহিয়া দিলেন, যৌতুক প্রার্থনা সময়ে তিনি যেন জাল নামক মেহতা জাতীয় রাজকর্ম্মচারীকে

* তিন খণ্ড সমান দীর্ঘ কাষ্ঠ খণ্ডে একটি সমবাহু ত্রিভুজ প্রস্তুত করিয়া বিবাহ পাত্রীর পুরদ্বারের উপরিভাগে সংস্থাপিত হয়। তাহার শীর্ষ কোণোপরি একটি ময়ূরের প্রতিকৃতি থাকে। এইরূপ বৈবাহিক চিহ্নের নাম তোরণ। যখন জসলমীর, বিকানীর ও কৃষ্ণগরের রাজকুমারদিগের সহিত রাণার দুইকন্যা ও এক পৌত্রীর বিবাহ হয়, তখন উদয় পুরের দুর্গদ্বারে তোরণত্রয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। পাত্রীর সহচরীবর্গ কর্ত্তৃক তোরণ রক্ষিত হইয়া থাকে। বিবাহার্থী অশ্বারোহণে আগমন পূর্ব্বক বল্লম হস্তে তোরণ ভঙ্গ করিবার উদ্যোগ করিলে তোরণ রক্ষিকা রমণীবর্গ বরের প্রতি নানাবিধ পদার্থ, বিশেষতঃ পলাশ পুষ্পচূর্ণ নিক্ষেপ ও সময়োচিত গান করিতে থাকে। অবশেষে তোরণ ভঙ্গ হইলে তাহারা সকলে চলিয়া যায়।

চাহিয়া লয়েন। হামীর তাহাই করিলেন। পঞ্চদশ দিবস পরে জালকে সঙ্গে লইয়া হামীর সস্ত্রীক কাইলবর নগরে আগমন করিলেন। মল্লদেবের দুহিতার গর্ভে কৈয়ৎসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। দৌহিত্রের জন্মোপলক্ষে মল্লদেব হামীরকে পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহ দান করিলেন। যখন কৈয়ৎসিংহের বয়ঃক্রম একবৎসর মাত্র তখন কোন কারণে তদীয় জননী পিতাকে এই বলিয়া পত্র লিখিলেন যে, তিনি চিতোরে যাইতে ইচ্ছা করেন। চিতোর হইতে লোকজন আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। তিনি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গেলেন; জাল মেহতাও তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। হামীর-পত্নী চিতোরে গমন করিয়া দেখিলেন তাঁহার পিতা মাদারী প্রদেশস্থ অসভ্যদিগের বিপক্ষে প্রধান অমাত্যগণ সহ গমন করিয়াছেন। এই উপযুক্ত অবসরে কৈয়ৎজননী মেহতার সহিত পরামর্শ করিয়া সৈন্য দিগকে হস্তগত করিলেন। হামীর নিকটস্থ বাগোর নগরে সমাচার পাইবার প্রতীক্ষায় ছিলেন। সমস্ত প্রস্তুত বলিয়া তাঁহার নিকট সমাচার প্রেরিত হইল। তিনি কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে নিষ্কোষিত অসি হস্তে চিতোরে প্রবেশ করিলেন। যাহারা প্রতিপক্ষতাবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। তিনি এককালে পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মল্লদেব প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আর পুর প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেন না। এই সময়ে আলাউদ্দীনের উত্তরাধিকারী মহম্মদ দিল্লির সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁহাকে এই সমাচার প্রদান করিতে স্বয়ং মল্লদেব দিল্লি নগরে গমন করিলেন। চিতোরের তোরণ দ্বারে হিন্দুপতাকা উড্ডীন হইতে লাগিল। যে সকল লোক মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্যে পলায়ন করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতেছিল, তাহারা আবার চিতোরে প্রবেশ করিতে লাগিল। হামীরের জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দিল্লি-পতি মহম্মদ মল্লদেব মুখে এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া লুপ্তাধিকার উদ্ধারের জন্য সৈন্য সামন্তে সমাবৃত হইয়া চিতোরাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। এদিকে হামীর রাজপুত সেনা সমভিব্যাহারে মহম্মদের আগমন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সিঙ্গোলী নামক স্থানে মহম্মদ শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। হামীর উপস্থিত হইয়া সহসা মুসলমানদিগের উপর আক্রমণ করিলেন। তুমুল সংগ্রাম বাধিল, মুসলমানেরা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। মহম্মদ বন্দী হইলেন; দ্বন্দ্বযুদ্ধে হামীরের হস্তে বনবীরের ভ্রাতা হরিসিংহ নিহত হইল। দিল্লীশ্বর মহম্মদ তিনমাস কাল চিতোর নগরে বন্দী হইয়া ছিলেন; পরিশেষে হামীরকে অজমীর, রিন্থম্বোর, নাগোর ও সোপুর এই চারিটি প্রদেশ আর পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা ও এক শত হস্তী প্রদান করিয়া নিষ্ক্রয় লাভ করেন। * মহম্মদ আর কখন চিতোর

* ফেরেস্তা এই ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও বর্ণন করেন নাই। যে যে যুদ্ধে মুসলমানেরা ঘোরতর দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইয়াছে,

আক্রমণ না করেন, মনে করিলে হামীর এরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইতে পারিতেন; কিন্তু তাহা নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া হামীর উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিরূপে অধিকার রক্ষা ও শত্রু দমন করিতে হয় তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন।

মল্লদেবের পুত্র বনবীর হামীরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। হামীর স্বীয়পত্নীর আত্মীয়বর্গের যথাযোগ্য মর্য্যাদানুসারে সুখ স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার উপযোগী বৃত্তি দান মানসে বনবীরকে নিমচ, জীরন, রতনপুর ও কৈরার প্রদেশ প্রদান করিলেন। বনবীর ভীনসোর জয় করিয়া মিবারের অধিকার বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। রাজস্থানের অধ্যক্ষগণ এক্ষণে হামীরের আদেশ পালনে আপনাদিগকে সুখী মনে করিতে লাগিলেন। প্রাচীন হিন্দুরাজবংশ মাত্রই প্রায় মুসলমানদিগের বিক্রমে ও দৌরাত্ম্যে হীনবল হইয়াছিল, কেবল মিবার আপনার মস্তক উন্নত রাখিতে ক্ষমবান্ হইয়াছিল। মাড়োয়ার, জয়পুর, বুঁদী, গোয়ালিয়র, চন্দেরী, রায়জীন, শিকৃরি, কাল্পী, আবু প্রভৃতির রাজগণ* হামীরের নিকট কর প্রদান ও নতশিরে তাঁহার আদেশ পালন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর মিবারবাসিগণ সুদীর্ঘকাল শান্তিলাভ করিয়াছিল। এই অবসরে যবন হস্তে বিলয়প্রাপ্ত দেবালয়াদির পুনঃসংস্কার ও নূতন দেবালয়ের নির্ম্মাণাদি কার্য্য অনেক হইয়াছিল। হামীর অতি শিল্পপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার অনেক কীর্ত্তিকলাপ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। হামীর অতি নীতিকুশল ও প্রজারঞ্জন রাজা ছিলেন। তিনি যার পর নাই খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি চতুঃষষ্টি বৎসর সিংহাসনে সমাসীন থাকিয়া জ্ঞান, বুদ্ধি ও বল বীর্য্যের ভূয়োভূয়ঃ পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক যাত্রা করেন।

* মুসলমান ইতিহাস বেত্তারা সে সকল যুদ্ধের আদৌ উল্লেখ করেন নাই।

(ক্রমশঃ।)

তত্ত্বনির্ণয়।*

বঙ্গ-সমালোচককে গ্রন্থ লিখিয়া সন্তুষ্ট করা বড় কঠিন ব্যাপার। যদি নভেল লিখিতে চাও, তাহা হইলে স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারে বা জর্জ্জ ইলিয়টের মত লিখিও, নতুবা তোমার পুস্তক অপাঠ্য বলিয়া ঘৃণিত হইবে। যদি কবিতা লিখিতে চাও, তাহা হইলে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন প্রভৃতির মত লিখিও। যদি নাটক লিখিতে চাও তাহা হইলে সেক্ষপীয়রের মত লিখিও। নতুবা সমালোচকের হস্তে তোমার পরিত্রাণ নাই। যদি দর্শন লিখিতে চাও, তাহা হইলে মিল, কোম্‌তের মত লিখিও, নতুবা

* শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

বৃষ্টিধারার ন্যায়, সমালোচকের তর্জ্জন গর্জ্জন তোমার পৃষ্ঠে পতিত হইবে।

অনেকে হয়ত এই জন্য বঙ্গ-সমালোচকের নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, যে দেশে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা সেই দেশের তুলাদণ্ডে পরিমিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালার পুস্তক, বাঙ্গালার সভ্যতা, বাঙ্গালির ক্ষমতা প্রভৃতি ধরিয়া বিচার কর। বাঙ্গালা ইংলণ্ডের সমকক্ষ হইবে ইহা আশা করা অন্যায়। অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু আমরা বঙ্গ-সমালোচকের এই অতিমার্জ্জিত রুচির দোষ দিই না। যে সর্ব্বদা ভাল জিনিসের আস্বাদন করে, নিকৃষ্ট জিনিস দেখিলে স্বভাবতঃই তাহার ন্যক্কার উপস্থিত হয়। আর এক কথা, যদি নিজে উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিতে না পার, তাহা হইলে অন্য দেশ হইতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যের আমদানী কর না কেন? সকল সভ্য দেশেই আমদানী রপ্তানী বহুলরূপে চলিতেছে। ইংলণ্ডের পুস্তক, জর্ম্মণি, ফ্রান্সে অনুবাদিত হইতেছে। জর্ম্মণি, ফ্রান্সের পুস্তক ইংলণ্ডে অনুবাদিত হইতেছে। আমাদের দেশে অনুবাদকের সংখ্যা এত কম কেন? আমাদের দেশে সকলেই মৌলিকতার প্রয়াসী কেন? জগদীশ্বর যাঁহাদিগকে মৌলিক করিয়াছেন, তাঁহারা মৌলিক থাকুন। কিন্তু জগদীশ্বর যাঁহাকে কাক করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তিনি ময়ূর হইবার প্রয়াস পান কেন?

মৌলিক হইবার প্রয়াস, আমাদের দেশে কত প্রবল, তাহা তত্ত্বনির্ণয় পাঠে একরূপ অবগত হওয়া যায়। যে সকল বিষয় নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করে, তৎসম্বন্ধে মৌলিক হওয়া সম্ভব। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অস্মদ্দেশীয় লোকের মৌলিক হওয়া একরূপ অসম্ভব। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য, পর্য্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষাবেক্ষণ (Experiment) প্রভৃতির আবশ্যক। ডারউইন একত্রিশ বৎসর ধরিয়া ঘটনা সংগ্রহ করেন। সামান্য পারাবতপালক হইতে জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলের নিকট হইতে অভিজ্ঞতা শিক্ষা করেন। এবং ইংলণ্ডে বসিয়া, এক দিকে ভারতবর্ষ অন্য দিকে আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি কত দেশের পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ প্রভৃতির সংবাদ সংগ্রহ করেন। এত কাণ্ড করিয়া তবে ডারউইন বৈজ্ঞানিক জগতে মৌলিক বলিয়া পরিচিত হইলেন। যদি ডারউইনের বিপক্ষে মৌলিক বলিয়া পরিচিত হইতে হয়, তাহা হইলে ঐরূপ নানা দেশ হইতে ঘটনা সংগ্রহ করিতে হইবে, ডারউইনের মত পায়রার পাল পুষিতে হইবে, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য এক প্রান্ত পর্য্যন্ত পণ্ডিতদের সহিত সংস্রব রাখিতে হইবে। কিন্তু মৌলিক হইবার জন্য, আমাদের দেশে এ সকলের কিছুই করিতে হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তত্ত্বনির্ণয়ের গ্রন্থকারের কথা ধরুন।

দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, ডারউইন খানি মোটামুটি পড়িয়া বা পাতা উল্‌টাইয়া সরাসরি বিচার করিলেন ডারউইন ভ্রান্ত। কেন ভ্রান্ত? কেন আবার কি? আমার স্বাধীন চিন্তা আমাকে এইরূপ বলিতেছে। আপনি কিছু পর্য্যবেক্ষণ

করিয়াছেন কি? হাঁ আমি তত্ত্ব-বোধিনী পড়িয়াছি। আমাদের দেশে এইরূপ তত্ত্ব-বোধিনী পড়িয়া অনেকে মৌলিক হইয়া বসেন। সুতরাং সমালোচকের সহিত সম্ভাব অনেকেরই ঘটিয়া উঠে না। বিজ্ঞান-সম্বন্ধে আমরা সকলেই (দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শুদ্ধ) ছাত্র। ছাত্র হইয়া শিক্ষকতার ভাণ কেন?

দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্ত্রীলোকদের জন্য এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। বস্তুতঃ যদি দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মৌলিক হইবার প্রয়াস না পাইতেন, যদি তিনি স্বাধীন চিন্তার এত পক্ষপাতী না হইতেন, তাহা হইলে স্ত্রীলোকে কেন, অনেক পুরুষেও তাঁহার পুস্তক পাঠে সবিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিত, এবং আমরাও আজি আহ্লাদ সহকারে তাঁহাকে অগণ্য সাধুবাদ প্রদান করিতে পারিতাম। দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বোদ্ধা ও বিচক্ষণ। তাঁহার লিখনপ্রণালীও অতীব প্রশংসার্হ। দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রেও তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। যদি এই সকল গুণ লইয়া তিনি ডারউইনের মতটি বা ডারউইনের বিপক্ষ মতটি সকলকে বুঝাইয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পুস্তক মহামূল্য বলিয়া আদৃত হইতে পারিত। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি তাঁহার পাঠকগণের মনে স্বাধীন-চিন্তার উদ্দীপনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই উদ্দেশ্যে নানাবিধ তত্ত্ব লইয়া তর্ক করিয়াছেন, এবং তত্তৎসম্বন্ধে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিপ্রায় জানিলে কিরূপে স্বাধীন-চিন্তার উদ্রেক হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যদি অন্য অন্য পুস্তক মানুষে 'তোতা পাখীর ন্যায় কণ্ঠস্থ' করিয়া রাখে, তাহা হইলে দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্ব নির্ণয়ও যে ঐ রূপে কণ্ঠস্থীকৃত হইবে না তাহা কে বলিল? ফলতঃ স্বাধীন-চিন্তা আপনা হইতে আইসে। আমরা অন্যকে শিক্ষা দিতে পারি। কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ ইহা অন্যকে বুঝাইয়া দিতে পারি। কিন্তু আমরা ইচ্ছা করিয়া অন্যের মনে স্বাধীন-চিন্তার উদ্রেক করিয়া দিতে পারি না। নানাবিষয় শিক্ষা করিতে করিতে স্বভাবতঃই আমাদের মনে স্বাধীন-চিন্তার উদয় হয়। বিনা শিক্ষায় যে স্বাধীন-চিন্তা উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত বাতুলতার বড় প্রভেদ নাই। ফলতঃ শিক্ষাই মূল, স্বাধীন-চিন্তা শিক্ষার ফল। এখন আমাদের দেশে অন্ততঃ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষার সময়। এখন ভক্তিভাবে গুরুর পাদতলে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে স্বাধীন-চিন্তার চেষ্টা করিব। ডারউইনের মতটি যে ভাল করিয়া বুঝে নাই, সে যদি স্বাধীন-চিন্তার বলে স্থির করে যে, ডারউইন ভ্রান্ত তাহা হইলে তাহাকে বাতুল ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। অতএব আমাদের উচিত যে অগ্রে ডারউইনের মতটি কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝি এবং সকলকে বুঝাইয়া দিই। ডারউইনের বিপক্ষবাদীরা কি বলেন, তাহাও সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। এবং যদি এই সমস্ত গুরুতর কার্য্য

সম্পন্ন করিয়া আমরা আমাদের নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করি, তাহাতেও দোষ নাই। কিন্তু যদি ডারউইনের মতটি না বুঝিয়া বা না বুঝাইয়া, তৎসম্বন্ধে দু একটি বাজার গল্প লইয়া তাহার তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া দিই, তবে আমরা স্বাধীন-চিন্তা ও শিক্ষা উভয়েরই প্রতিরোধী। দীননাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যে কতক পরিমাণে এই দোষে দোষী নহেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। এ কথার প্রমাণ নিম্নে দ্রষ্টব্য।

কিন্তু বোধ হয় দীননাথ বাবু শুদ্ধ মৌলিক বলিয়া পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রণয়ন করেন নাই, বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য পৃথিবীর ভাই ভগ্নীদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করা। এই জন্য যে সকল মত ঈশ্বর-বিরোধী বলিয়া তিনি মনে করেন, তাঁহার তত্ত্ব নির্ণয়ে সেই মতগুলি খণ্ডিত হইয়াছে। ডারউইন, হক্সলি, মিল, কোম্‌ত প্রভৃতি পণ্ডিতের মত খণ্ডিত হইয়া শেষ সিদ্ধান্ত এই হইল যে, ঈশ্বর আছেন এবং তিনি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' ইত্যাদি। যাঁহাদের মনে এইরূপ কোন উদ্দেশ্য থাকে, সে উদ্দেশ্য সৎই হউক, বা অসৎই হউক, তাঁহাদের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় হইবার সম্ভাবনা নাই। রঙ্গিল চস্‌মা চক্ষে দিলে প্রকৃতির প্রকৃত শোভা আমাদের নিকট প্রতিভাসিত হইতে পারে না। এবং কোন একটা উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া পুস্তক লিখিলে, তাহাতে স্বাধীন-চিন্তার স্রোত বদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে বিচারকের আসনে বসিতে হইবে। সত্য যে পথে লইয়া যায়, সেই পথে চলিতে হইবে। উকীলের মত নিজের পক্ষটি সমর্থন করিলে চলিবে না।

কিন্তু এ সমস্ত ভিন্ন দীন বাবু আর একটি অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। তিনি একখানি ৮৭ পাতার পুস্তকের মধ্যে ত্রয়োদশটি অতীব গুরুতর বিষয় সমাবেশিত করিয়াছেন; বিষয় গুলির নাম এইরূপ। পরমাণু ও জীব প্রকরণ (Materialism) জীবোদ্ভিদ্‌ পরিবর্ত্তন প্রকরণ (Origin of species & evolution)। ...... স্বাধীনতা প্রকরণ (Free will)। আত্মার অমরত্ব প্রকরণ ইত্যাদি। ইহাদের প্রত্যেকটির উপর এক একখানি পুস্তক লেখা যাইতে পারে। দীন বাবু ৮৭ পাতার মধ্যে ইহাদের বিচার সমাধা করিয়াছেন। দীন বাবু যেরূপ সুযোগ্য, যেরূপ বিচক্ষণ, তাহাতে তিনি ইহাদের অনেক গুলিরই আশানুরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু এতগুলি গুরুতর বিষয় এত সংক্ষিপ্ত রূপে সংবদ্ধ করিয়া তিনি সুবিবেচনার কার্য্য করেন নাই।

অতএব সাধারণতঃ বলিতে গেলে দীন বাবুর পুস্তক সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারা যায়। দীন বাবু তাঁহার পুস্তকে অনেক গুণবত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি সুলেখক, বহুদর্শী, বোদ্ধা ও বিচক্ষণ। কিন্তু তাঁহার পুস্তকখানি আশানুরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। আমরা সংক্ষেপে দীন বাবু ও তাঁহার পুস্তকের পরিচয় প্রদান করিলাম। এক্ষণে আমরা তাঁহার পুস্তকোল্লিখিত দুই চারিটি বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১ম, পরমাণুবাদ বা জড়বাদ।

দীন বাবু বলেন পরমাণু জগতের স্রষ্টা হইতে পারে না। কারণ পরমাণু যদি সে কালে জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা হইলে এখন করে না কেন?

এতৎ সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, এখন করে না, তাহা কে বলিল? পরমাণুগণ পূর্ব্বেও যাহা করিতেছিল, এখনও তাহাই করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংস্থাপিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সমুৎপন্ন করিতেছে। আচার্য্য টিণ্ডেল বলেন—'মনে করুন, মনুষ্য-শরীরের পরমাণু গুলি, একেবারে প্রকৃতির নিকট হইতে লওয়া গেল। মনুষ্য শরীরে ঐ পরমাণু গুলি যে রূপে সংস্থিত, সেই রূপে তাহাদিগকে সংস্থাপিতও করা গেল। এক্ষণে এই পরমাণু সমষ্টি বুদ্ধি বৃত্তি সম্বলিত মনুষ্য আকারে পরিণত হইবে কি না? মনুষ্য আকারে পরিণত হইবে না এরূপ বিশ্বাস করিবার কোন উপযুক্ত কারণ দেখা যায় না।* কিন্তু শুদ্ধ তাহাই নয়। দীনবাবু হয়ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, মনুষ্য পরমাণু সমষ্টি দ্বারা জীবন্ত জীবের সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। "At the present moment, there are, no doubt, persons experimenting on the posibility of producing what we call life out of inorganic materials"। † সুতরাং দীন বাবুর প্রথম কারণটি তাঁহার সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে পারিল না।

দীন বাবু আরও বলেন যে পরমাণু অজ্ঞান। অজ্ঞান হইতে জ্ঞানী জীবজন্তুর সম্ভব কিরূপে হইতে পারে। কিন্তু এইরূপে বলা যাইতে পারে যে, শীতল বস্তু হইতে উষ্ণ বস্তুর সমুদ্ভব অসম্ভব। অথচ সকলেই জানেন যে, বরফে বরফে ঘর্ষণ করিলে, তাহা হইতে উত্তাপ উদ্ভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ পরমাণুগণের সংযোগ বিয়োগে কি সম্ভব কি অসম্ভব ইহা কেহই বলিতে পারে না। আচার্য্য টিণ্ডেল * জড় পদার্থের উপর কতকগুলি প্রত্যক্ষাবেক্ষণ দেখাইয়া বলিতেছেন 'উপযুক্ত পরিমাণে জড় পদার্থের শক্তির সমাবেশ করিতে পারিলে, তন্মধ্য হইতে উদ্ভিদ্ পদার্থের সৌন্দর্য্য দেখান যায়।' ফলতঃ জড় পদার্থের শক্তির বিষয় আমরা কিছুই জানি না। সুতরাং এক্ষণে যাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তাহা বাস্তবিক অসম্ভব না হইতে পারে।

পরমাণুবাদ সম্বন্ধে দীন বাবু আরও একটি আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন। জীবজন্তুতে নানাপ্রকার জ্ঞানের চিহ্ন, কৌশলের (design) চিহ্ন, দেখা যায়। পরমাণুদের ভবিষ্যৎ জ্ঞান নাই। সুতরাং তাহারা কিরূপে ভবিষ্যৎ জ্ঞানের ফলভূত কৌশলের চিহ্ন প্রকটিত করিবে। এই আপত্তি, অনেক দিন পূর্ব্বে Paley উত্থাপিত করিয়াছিলেন। নানা পণ্ডিতে নানা রূপে এই আপত্তির উত্তর দান করিয়াছেন। এতৎ

* Tyndall's Fragments of Science. Vol II. P 51.

† Ibid. P 72.

* Tyndall's Fragments of Science. P. 67.

সম্বন্ধে (Hebert Spencer) যাহা বলেন, তাহা আমরা পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছি। আমরা স্পেনসারের কথার মর্ম্মটি উদ্ধৃত করিতেছি মাত্র। অনুবাদের প্রয়াস পাইতেছি না।

"পেয়ারার আবরণটি শক্ত। কিন্তু উহার মধ্যের শাঁসটি কোমল। পক্ষিগণ পেয়ারার আবরণ ভেদ করিতে পারে না, কিন্তু উহারা অক্লেশে উহার শাঁস খাইয়া ফেলে। সুতরাং পেয়ারার আবরণটি পেয়ারার পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, যে এই কঠিন আবরণটি পেয়ারা কোথা হইতে পাইল? যদি বলি, পক্ষীদের অত্যাচার নিবারণার্থে কোন দেব বা দেবাধিদেব পেয়ারার শক্ত আবরণ করিয়াছেন, তাহা হইলে আমি অন্যায়রূপে তর্ক করিতেছি। কিন্তু যদি বলি যে, পূর্ব্বে সকল পেয়ারারই কোমল আবরণ ছিল; কেবল দু একটি পেয়ারা হঠাৎ কঠিন আবরণ যুক্ত হইত।* যে গুলির কোমল আবরণ ছিল; দুর্দ্দান্ত পক্ষীরা তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিয়াছে, কেবল কঠিন আবরণযুক্ত পেয়ারার বংশই এক্ষণে জীবিত রহিয়াছে, তাহা হইলে আমি অন্যায় রূপে তর্ক করিতেছি না। জীবজন্তুর ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। এই সকল ইন্দ্রিয় ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও সংশোধিত হইয়া বর্ত্তমান কৌশল-নির্ম্মিত বস্তুর ন্যায় প্রতীত হইতেছে, ক্রমশঃ পরিপোষণ, ক্রমশঃ সংশোধন প্রকৃতির নিয়ম।"* যদি বলেন, এনিয়ম কোথা হইতে আসিল, বিজ্ঞান সে বিষয়ে কোন উত্তর দিতে পারে না। বিজ্ঞান নিয়মানুসন্ধান করে মাত্র।

আমরা দীন বাবুর কয়টি আপত্তির খণ্ডন করিলাম। কিন্তু, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর যে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এই মতের সম্বন্ধে কি কোন গোল নাই? তিনি সে গোল উত্তোলন করেন নাই কেন? কেন না, দীন বাবু উকীল, নিজের পক্ষের বক্তৃতার শেষ হইলেই উকীলের বক্তৃতার শেষ হয়।

পরমাণুবাদ সম্বন্ধে আচার্য্য টিণ্ডেলের নিম্ন লিখিত কয়টি মত আমরা পাঠকদিগকে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

'যদি পরমাণুবাদ ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহা হইলে জড় জগতের তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অবধারণ করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে।'

কারণ ঈশ্বরের মাহাত্ম্যে হইতেছে, তাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রযুক্ত হইতে পারে না।

"জড় পদার্থের আমি এইরূপ লক্ষণ করি। সেই অজ্ঞেয় বস্তু, যাহা দ্বারা চক্ষুতে শত শত শিরা ও কর্ণেতে শত শত বাদন যন্ত্রোপযোগি বস্তু সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহারই নাম জড়। জড় পদার্থ কি শক্তিতে ইহা করিতেছে তাহা আমরা জানি না।"

*এইরূপ আকস্মিক জন্তুপরিবর্ত্তন (Variability) সংসারের নিয়ম। দুইমস্তকবিশিষ্ট মনুষ্য, বা পাঁচপদযুক্ত গো অশ্ব তাহার প্রমাণ।

* Spencer's Article, on Mind, P 82-83, January 1881, named "Replies te criticisms on the Data of Ethics."

উপসংহারে আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে জড় পদার্থের নিয়ম কে সৃষ্টি করিল, বা জড় পদার্থ কোথা হইতে আসিল ইহা আমরা অবগত নহি। অবগত হইবার উপায়ও, বোধ হয়, নাই। আমরা শুদ্ধ এই পর্য্যন্ত জানিয়াছি যে, এই জড় জগৎ কাহারও ইচ্ছাবশে চলিতেছে না। অত্রস্থ সকল ঘটনাই নিয়মাধীন। এ কথা বলিলে, ঈশ্বর আছেন কি নাই, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলা হইল না। সুতরাং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের অবতারণা করিলে ধান ভান্‌তে শিবের গীত গাওয়া হয়। সে যাহা হউক, আমরা এক্ষণে দ্বিতীয় তত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

২য়। জীবোদ্ভিদ পরিবর্ত্তন প্রকরণ এই সম্বন্ধে দুইটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে।

(১) নির্জ্জীব পদার্থ হইতে জীবন্ত পদার্থ সমুৎপন্ন হইতে পারে কি না ?

(২) উদ্ভিদ্ বা জীব প্রথমে একই জাতি হইতে উৎপন্ন হয়। ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে সেই এক জাতি হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের ও ভিন্ন ভিন্ন জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। ডারউইন্ প্রভৃতির এই 'ক্রমিকোন্নতির' মতটি সত্য কি না ?

দীনবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এই দুইটি মতই ভ্রমাত্মক। প্রথমটি লইয়া তিনি বেশী পীড়াপীড়ি করেন নাই। চিঙ্গ্‌ড়ী মাছের শুক্‌না ডিম্ বাতাসে উড়িয়া আসিয়া পড়ে এবং তাহাতেই চিঙ্গ্‌ড়ী মাছের উৎপত্তি হয়, জল পচিয়া চিঙ্গ্‌ড়ী মাছ হয় না, এই এক দৃষ্টান্ত দিয়া দীনবাবু প্রমাণ করিলেন যে, প্রথম মতটি ভ্রমাত্মক। বৈজ্ঞানিকেরা এই বিষয় লইয়া শত শত প্রত্যক্ষাবেক্ষণ করিতেছেন। পচা মাংস বায়ু শূন্য স্থানে রাখিয়া পরীক্ষা করা হইতেছে। মদিরার বুদ্বুদোত্থান লইয়া পরীক্ষা করা হইতেছে। শত শত পণ্ডিতে শত শত প্রণালীতে পরীক্ষা করিতেছেন। বিজ্ঞান যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে কেবল ইহাই জানা গিয়াছে যে, নির্জ্জীব পদার্থ হইতে জীবন্ত পদার্থের উৎপত্তি দেখা যায় নাই। কিন্তু এতদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবার সময় আইসে নাই। ইহা অনুমানের দ্বারা নির্ণীত হইবে না। ইহাতে শুদ্ধ ন্যায় শাস্ত্রের বিচার খাটাইলে চলিবে না। পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। প্রত্যক্ষাবেক্ষণ করিতে হইবে। যাঁহারা পর্য্যবেক্ষণশীল, প্রত্যক্ষাবেক্ষণশীল, তাঁহাদের সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। আনুমানিকের তর্ক, বা ন্যায়শাস্ত্র ব্যবসায়ীর বিচার ইহাতে কোন রূপ ফল প্রদান করিতে পারিবে না। তবে এক্ষণে কেবল এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে, জড় পরমাণুতেই প্রথম হইতে জীবনী শক্তি নিহিত আছে। এবং সুবিধামত স্থানে পড়িলে ঐ জীবনী শক্তি বিকাশিত হয়। পণ্ডিতবর ইউবার ওয়েগ্ বলেন যে আমাদের খাদ্য দ্রব্যে (যথা চুণ বা ময়দায়) ঐ জীবনী শক্তি নিহিত আছে। কারণ তাহা যদি না থাকিত, তাহা হইলে খাদ্য দ্রব্যের দ্বারা আমাদের জীবনের পরিপোষণ সম্ভবিত না। যেমন বৃক্ষবীজকে যথা স্থানে রোপিত না করিলে তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গতি হয় না, সেইরূপ জড় পদা-

র্থকে সুবিধামত স্থানে না রাখিলে তাহা হইতে জীবনী শক্তির বিকাশ হয় না। জড় পদার্থের জীবনী শক্তি আছে ইহা শুনিয়া পাঠক হয়ত বিস্মিত হইবেন। কিন্তু বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। ডেকার্টের সময়ে লোকে বিশ্বাস করিত যে, জড় পদার্থের নিজের গতিশক্তি নাই। অন্য কোন জীব (মনুষ্য বা ঈশ্বর) উহাতে গতিশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেন। যখন প্রথমে জড়ের গতিশক্তিবিশিষ্টত্ব অনুমান করা হয়, তখনও লোকে বিস্মিত হইয়াছিল। জড়ের আবার গতিশক্তি কি? যাহা হউক, জড়ের গতিশক্তি আছে বলিলে এখন আর কেহ বিস্মিত হন না। সেইরূপ, হয়ত, এমন এক সময় আসিবে, যখন জড়ের জীবনী শক্তির কথা বলিলে লোকে আর বিস্মিত হইবে না। জড় বলিলেই অভ্যাসদোষে আমাদের জীবনীশক্তিশূন্য এবং অন্য অন্য অনেক শক্তিশূন্য কি একটা দ্রব্যের কথা মনে হয়। কিন্তু যখন জড়ের গুণ সমূহ এক একটি করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা প্রকাশ করিবেন, তখন আর আমাদের ঐ অভ্যাস দোষ থাকিবে না। যখন আমরা জড়ের মাহাত্ম্য বুঝিব তখন আর জড় বলিলে আমাদের মনে ঘৃণা বা উপেক্ষা উদিত হইবে না। বৈজ্ঞনিকেরা জড়ের গুণ ও জড়ের নিয়ম আবিষ্কার করিয়া আমাদের ঘৃণা ও উপেক্ষাকে দূরীকৃত করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যখনই বৈজ্ঞানিকেরা অশেষ পরিশ্রম ও অশেষ চিন্তা স্বীকার করিয়া জড় জগতের কোন একটি নিয়ম বা গুণ আবিষ্কৃত করেন তখনই ধর্ম্ম জগতে এক মহাবিপ্লব উপস্থিত হয়, এবং ধার্ম্মিকেরা বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চ চীৎকারে জগৎকে মাতাইয়া তুলেন।

যখন পৃথিবীর গতি প্রথম আবিষ্কৃত হইল, তখন এইরূপ চীৎকার পড়িয়া গেল। ধার্ম্মিক লোকেরা শিহরিয়া উঠিলেন এবং "কর্ণে পিধায়" নাস্তিকদের ঈশ্বরাবমাননায় আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা পূরা ধার্ম্মিক, তাঁহারা পাষণ্ড নাস্তিক গ্যালিলিওকে কারাবাসে সমর্পিত করিলেন। পৃথিবীর গতির সঙ্গে ঈশ্বরাবমাননা বা নাস্তিকতার কোন সংস্রব আছে কি না, তাহা বিচার করা হইল না। ঈশ্বরের সংসার গতিশীল, এমন কথা যে বলে সে অধার্ম্মিক, পাষণ্ড, নাস্তিক, ষণ্ড বিশেষ। ঈশ্বরের সংসার ধীর, স্থির। আহা কেমন ধীর! কেমন স্থির! ইহাকে যে অধীর, অস্থির বলে সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরাবমাননা করে সে নিশ্চয়ই পাষণ্ড ষণ্ড। ঠিক এই প্রণালীতে তর্ক করিয়া এখনকার ধার্ম্মিকেরা চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। পরমাণু কি? উন্নতি কি? জড় পরমাণুর আবার জীবনী শক্তি কি? এ সমস্ত নাস্তিকের জল্পনা ঈশ্বর সমস্ত বিষয়ের বিধাতা। দীন বাবুও ধার্ম্মিকদের পথ অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই পথ প্রশস্ত বলিয়া আমাদের বোধ হয় না।

সে যাহা হউক এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্নটির বিচার করা যাউক। সে প্রশ্নটি এই।

ডারউইনের ক্রমিকোন্নতি মতটি সত্য কি না? একই জাতীয় বস্তুর ক্রমশঃ পরি-

পোষণে প্রথমে নানাজাতীয় উদ্ভিদ্‌গণের ও পরে উদ্ভিদ্ হইতে নানা প্রকার জীবজন্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। এ কথার প্রমাণ কি? প্রমাণ অনেক আছে। ডারউইন একত্রিশ বৎসরের পরিশ্রমে নানা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। হক্সলী, লায়েল, স্পেন্সার নানা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু সে সব প্রমাণ দীন বাবুর গণনায় আইসে না। তিনি প্রমাণ সংগ্রহ না করিয়া আপত্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। দেখা যাউক, তাঁহার আপত্তি গুলি কি?

১ম আপত্তি—

আমরা যে সকল পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই, তাহাদিগকে জাতীয় পরিবর্ত্তন না বলিয়া স্থানীয় পরিবর্ত্তন না বলি কেন? যে কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই তাহা স্থানীয়। জাতীয় পরিবর্ত্তন অসম্ভব।

মেটে ফিরিঙ্গী বিলাতে গেলে সাদা হয়, বাঙ্গালি আসামে গেলে গোদা হয়, এ সব স্থানীয় পরিবর্ত্তন সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল পরিবর্ত্তনই কি ঐরূপ? ইহাতে অনুমান করিলে চলিবে না, ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। শুনুন, ডারউইন এতৎসম্বন্ধে কি বলেন?

"আমি অনেক প্রসিদ্ধ পায়রা-পালকের সহিত মিশিয়াছি। এবং দুই পায়রা-সভার সভ্য হইবার সম্বন্ধে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পায়রার মধ্যে যে প্রভেদ দেখিতে পাই, তাহা বিস্ময়কর। ইংরাজী বাহক-পায়রা ও ছোটমুখো লোটন পায়রা ইহাদের মধ্যে প্রভেদ দেখ। ইহাদের ঠোঁটে কত প্রভেদ, ইহাদের মস্তিষ্কের গঠনে কত প্রভেদ। ইত্যাদি।"

একই দেশে একই সময়ে এই সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এতদ্ভিন্ন বর্ণসম্বন্ধে কত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এই সমস্ত পরিবর্ত্তনকে স্থানীয় পরিবর্ত্তন কিরূপে বলা যাইতে পারে?

২য় আপত্তি—

আমরা স্বীকার করি এই আপত্তিটি গুরুতর আপত্তি। আপত্তিটি এই যে সকল জন্তু এক জাতীয়, তাহাদের মধ্যে পরস্পর সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত হয় না। ডারউইন এক পাল পায়রা পোষিয়া দেখিয়াছেন যে, দুই প্রকার পায়রার সহস্র আকার-গত বৈষম্য থাকিলেও তাহাদের সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত হয় না। যদি পৃথিবীস্থ সকল জন্তু কোন এক প্রাথমিক জাতি হইতে সমুদ্ভূত হইত, তাহা হইলে পৃথিবীস্থ আধুনিক সমস্ত জাতীয় জীবগণের মধ্যেও সন্তানোপত্তির ব্যাঘাত হইত না। কিন্তু এই ক্ষণে ভিন্ন জীবের মধ্যে সন্তানোপত্তির ব্যাঘাত দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহাদিগকে এক জাতীয় বলা যইতে পারে না। হক্সলিও এই আপত্তি গুরুতর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু হক্সলি আরো বলেন, যে সন্তানোৎপত্তির নিয়ম আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি নাই। ডারউইন বলেন যে জন্তু স্বাধীন অবস্থায় থাকিলে যে ভাবে সন্তানোৎপত্তি করে, পোষিত হইলে আর সেরূপ পারে না। ঘুঘু ও পায়রা বা অশ্ব ও গর্দ্দভ ইহারা সকলেই পোষিত জন্তু। পোষিত

জন্তুর সন্তানোৎপত্তির ক্রম দেখিয়া আরণ্য জন্তুর সন্তানোৎপাদক ক্ষমতা বিবেচিত হইতে পারে না। যদিও আপত্তিটি এইরূপে খণ্ডিত হইয়াছে, তথাপি তর্কের অনুরোধে স্বীকার করিলাম যে, এই আপত্তিটি আজিও অখণ্ডিত রহিয়াছে। এজন্য তুমি ডারউইনের মতটিকে অসম্পূর্ণ বলিয়া আখ্যা দিতে পার, কিন্তু উহা যে ভ্রমাত্মক তাহা কিরূপে স্থিরীকৃত হইল। মনুষ্যের কোন্ বিজ্ঞানটি অবিসংবাদিতরূপে উপপন্ন হইয়াছে? সকলেই স্বীকার করেন যে ঈথরাখ্য বাষ্পের আন্দোলনে আলোক পরিচালিত হয়। কিন্তু ঈথরাখ্য বাষ্প কি কেহ প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণ করিয়াছেন? আমরা স্বীকার করি যে পরমাণুতে আকর্ষণী শক্তি নিহিত আছে। কিন্তু কেহ কি পরমাণুর সত্তা অবিসংবাদিত রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন? যদি ঐ সকল গোল বা আপত্তি সত্বেও আলোক-বিজ্ঞান, পরমাণু-বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা হইলে এই একটি আপত্তি আছে বলিয়া ডারউইনের মতটি ভ্রমাত্মক বলিয়া অভিহিত হইবে * কেন?

এস্থলে দীন বাবুকে আমরা আর একটি দোষ না দিয়া থাকিতে পারি না। ডারউইনের মতে নিন্দার বিষয় আছে, প্রতিবাদের বিষয় আছে, এবং দীন বাবু সেই দোষগুলি লোক (স্ত্রীলোক) সমক্ষে বাহির করিলেন। কিন্তু ডারউইনের মতে যে কত অজ্ঞেয় বিষয়ের মীমাংসা হইল, অন্য বিজ্ঞান-শিক্ষার কত সুবিধা হইল, ভূতত্ত্বের (Geology) ঘটনা কেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল, প্রাকৃতিক ভূগোল কেমন নিয়মায়ত্ত হইল, দীনবাবু তাহার উল্লেখও করিলেন না। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের বক্তব্যটি পাঠকদিগকে বুঝাইয়া দিব। ভূতত্ত্ববিদেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে অতি নিম্নে, ভূগর্ভে, প্রাণীর কোন চিহ্নই প্রায় দেখা যায় না। কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিলে অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জন্তুর অস্থি দেখিতে পাওয়া যায়। আরও ঊর্দ্ধে উৎকৃষ্টতর ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জন্তুর অস্থি পাওয়া যায়। আরও ঊর্দ্ধে, অনেক ঊর্দ্ধে মনুষ্যের অস্থি পাওয়া যায়। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর অতি আদিম অবস্থায় শুদ্ধ উদ্ভিদ্ জন্মিত; কিছুকাল (৪। ৫ সহস্র বা লক্ষ বৎসর) পরে সামান্য ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জন্তুর সমুদ্ভব হয়; আরও কিছুকাল পরে উৎকৃষ্টতর ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জাতির সমুদ্ভব হয়। আরও অনেককাল পরে মনুষ্যের সমুদ্ভব হয়। এই সকল ঘটনা ভূতত্ত্ববিদেরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পরমেশ্বর সকল জন্তুর সৃষ্টি করিতেছেন বলিলে, ইহাও বলিতে হয়, যে একযুগে পরমেশ্বর শুদ্ধ উদ্ভিদ্ সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছিলেন, পরযুগে উদ্ভিদ হইতে একটু উন্নীত জীব সৃষ্টি করিয়া বসিয়া রহিলেন। তৎপরযুগে তদপেক্ষা আর একটু উন্নীত জীবের সৃষ্টি করিলেন। এই মতটি সম্ভব কি ডারউইনের ক্রমিকোন্নতির মতটি সম্ভব তাহা পাঠক বিচার করুন। এইরূপ অন্য অনেক শাস্ত্রও ডারউইনের মতের সহায়তা করে।

* Huxley's "Man's place in nature" P 109–110.

হক্সলি সেই গুলির নাম করিয়াছেন, যথা ১ম Comparative Anatomy ; ২য় Science treating of the facts of Development ; ৩য় Science of Geographical aistrilution; ৪র্থ Palæontology ইত্যাদি। এসমস্ত গুণের কথা ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ দোষের কথা ধরিয়া এবং কেবল সেই দোষগুলি অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন স্ত্রীলোকদের নিকট উল্লিখিত করিয়া দীনবাবু অন্যায় করিয়াছেন। তত্ত্ব নির্ণয়কারের পক্ষে এইরূপ পক্ষপাতিতা অমার্জ্জনীয়। দ্বিতীয় আপত্তির এইরূপ সমালোচনা করিয়া আমরা তৃতীয় আপত্তির কথা বলিতে চলিলাম। ৩য় আপত্তি ;—

"মনুষ্যে ও বানরে আকারগত বিশেষ সাদৃশ্য নাই। জ্ঞান সম্বন্ধে সাদৃশ্যত নাই।"

যদি এই আপত্তি সত্য হইত, তাহা হইলে ডারউইনের ভ্রম সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করা যাইতে পারিত না। কিন্তু নানাবিধ ঘটনা সংগ্রহ করিয়া পণ্ডিতবর হক্সলি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

১ম। মনুষ্যাকার বানর, যথা গিবন, ওরাঙ্, সিম্পাঞ্জী ও গেরিলা, ঋজু ভাবে, বা অর্দ্ধ ঋজু ভাবে গতায়াত করিতে পারে। গতায়াতের সময় ইহাদের বাহুর সাহায্যের অপেক্ষা করিতে হয় না।

২য়। আক্রান্ত হইলে মনুষ্য যেরূপ অনুনয় বিনয় করে, ইহারাও সেইরূপ করিতে পারে।

৩য়। মনুষ্যের ন্যায় ভূতলস্থ বায়ু ইহাদের দ্বারা সেবিত হয়। দিনমানে মনুষ্যভয়ে ইহারা বৃক্ষের উপর কাল কাটায়। রাত্রিতে ইহারা নিম্নে আসিয়া শয়ন করে।

৪র্থ। মনুষ্যের ন্যায় ইহারা শয্যা প্রস্তত করে। ছোট ছোট জঙ্গলের উপর কঞ্চি ও পাতা বিছাইয়া ও হস্তকে উপাধান স্বরূপ ব্যবহার করিয়া নিদ্রা যায়।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

৫ম। মনুষ্যও বানরের মস্তিষ্ক ও অন্য অন্য ইন্দ্রিয়ের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। ফলতঃ উচ্চশ্রেণীস্থ বানরে ও নিম্নশ্রেণীস্থ বানরে এতৎসম্বন্ধে অর্থাৎ মস্তিষ্ক সম্বন্ধে যে প্রভেদ, তাহা অপেক্ষা মনুষ্যে ও উচ্চশ্রেণীস্থ বানরে অধিক প্রভেদ নাই। *

এই সকল সিদ্ধান্তের প্রমাণের জন্য হক্স্লি পর্য্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, এবং বানর ও মনুষ্যের, মস্তিষ্কচিত্র পার্শ্বাপার্শি অঙ্কিত করাইয়াছেন। তত্ত্ববোধিনীর মুখের কথায় আমরা হক্সলিকে অমান্য করিতে পারি না।

ডারউইনের মতের সম্বন্ধে দীনবাবুর আরও একটি আপত্তি আছে। কিন্তু তাহার বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই বলিয়া আমরা তাহা লইয়া পাঠককে জ্বালাতন করিব না।

যখন আমরা এই সমালোচন আরম্ভ করি, তখন মনে করিয়াছিলাম, দীনবাবুর পুস্তক হইতে আরও কতকগুলি তত্ত্ব লইয়া তাহাদেরও বিস্তৃত সমালোচন করিব। কিন্তু আমাদের সমালোচনা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন দীনবাবুর সকল

* That the structrual differences which separate man from the gerilla and the chimpanzee are not so great as those which separate the gerilla from the other apes.

মত গুলির সমালোচন করিতে হইলে দীনবাবুর মত আর একখানি পুস্তক লিখিতে হয়। অতএব আমরা দীনবাবুর পুস্তকোল্লিখিত আরও দুইটি মত লইয়া তাহাদের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিব এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে এই সুদীর্ঘ সমালোচনার উপসংহার করিব।

কোম্‌ত বলেন আমরা ঘটনার নিয়মানুসন্ধান করিব, কারণানুসন্ধান করিব না। দীনবাবু এই মতে অনেক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন কারণানুসন্ধান করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। এবং শুদ্ধ নিয়মানুসন্ধান করিয়া আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, মনুষ্য কারণানুসন্ধান করে কি জন্য? শুদ্ধ জ্ঞানের আশায় করে না। এই কারণানুসন্ধান করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য আছে। কারণটি জানিলে ঘটনাটি আমার আয়ত্ত হয়। এই জন্য মনুষ্যের কারণানুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি হয়। শুদ্ধ জ্ঞানের আশায় যে কারণানুসন্ধান তাহা দুই চারি জন ন্যায়শাস্ত্র ব্যবসায়ীর থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণের তাহা থাকা সম্ভব নহে। অসভ্য অবস্থার লোকের কথা ধরুন। একজন অসভ্য দেখিল, হঠাৎ আকাশে মেঘ গড়গড় শব্দ করিল, হঠাৎ মেঘ হইতে অগ্নিবৎ কি এক দীপ্তি তাহার নয়ন ঝলসিত করিল। সে স্তম্ভিত হইল, ভাবিল এ কি? এ সব কোথা হইতে আসিল? তাহার মনে এসকল প্রশ্ন উদিত হইল কেন? শুদ্ধ জ্ঞানলাভ তাহার উদ্দেশ্য নহে। অসভ্য অবস্থায় লোকে প্রাণধারণ করিবার প্রয়াসী থাকে, জ্ঞানলাভের প্রয়াস সভ্যাবস্থার ফল। তবে, অসভ্য বিদ্যুৎ বজ্রাঘাত দেখিয়া তাহার কারণানুসন্ধান করিল কেন? করিল তাহার সাংসারিক মঙ্গলের জন্য। সে ভাবিল যদি ইহার কারণ জানিতে পারি তাহা হইলে ইহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিব কারণানুসন্ধানের পর সে যে কার্য্য করে, তাহাতেও তাহার ঐ উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া ঐ অসভ্য স্থির করিল যে মেঘের মধ্যে একজন দেবতা আছেন। ঐ দেবতা ঐ বিদ্যুৎ বজ্রাঘাতের সৃষ্টি করিতেছেন। কিন্তু সে এই জ্ঞানলাভ করিয়াই সন্তুষ্ট রহিল কি? না—সে ঐ দেবতার উদ্দেশে স্তব স্তুতি আরম্ভ করিল, বলিল হে প্রভো আমার প্রতি বিদ্যুৎ বজ্রাঘাত নিক্ষেপ করিওনা, আমি তোমার দাস। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, কারণানুসন্ধানের উদ্দেশ্য সাংসারিক মঙ্গল। যদি নিয়মানুসন্ধানে মনুষ্যের সাংসারিক মঙ্গল সম্পূর্ণ সংসাধিত হয়, তাহা হইলে, সে আর কারণানুসন্ধান করিবে না। কিন্তু আজিও সকল বিষয়ের নিয়মানুসন্ধান হয় নাই। যাহাদের নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে আর কারণানুসন্ধান হয় না। জ্বর হইলে শিরঃপীড়া হয়। শিরঃ-পীড়ার এই নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং লোকে এই নিয়মানুসারে কার্য্যও করিতেছে। কিন্তু শিরঃপীড়ার আদিম কারণ কি, সেই আদিম কারণের আদিম কারণ কি ইহা লইয়া লোকে (দুই চারিজন ধার্ম্মিক ভিন্ন) আপনাদিগকে বিব্রত করিতেছে না। যত বিজ্ঞানের উন্নতি ততই লোকে কেবল নিয়মানুসন্ধান

করিবে কারণানুসন্ধান ক্রমশঃ মনুষ্যের মন হইতে বিদূরিত হইবে।

দীন বাবু বলেন যে, বালকে সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করে, কেন এটা হইল, কেন ওটি হইল, এবং ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, কারণ জিজ্ঞাসা করা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। বালক অনর্থক দৌড়িয়া বেড়ায়, অনর্থক কোলাহল করে, কিন্তু তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে অনর্থক দৌড়িয়া বেড়ান, অনর্থক কোলাহল করা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। ফলতঃ বালকের স্বভাবতঃ কথা কহিতে ইচ্ছা হয়। যেমন তাহার দৌড়িয়া বেড়াইতে ইচ্ছা হয়, তেমনি তাহার কথা কহিবারও ইচ্ছা হয়। বালককে অনেকক্ষণ একস্থলে বসাইয়া রাখা যেমন কঠিন, বালককে চুপ করিয়া রাখাও তেমনি কঠিন। কথা কহিবার ইচ্ছা হইলে বালক কি কথা কহিবে? সে ঐ এক 'কেন' কথা জানে। আর ঐ এক কেন কথা বলিলে সে অনেক কথা শুনিতে পায়, তাহার কথা কহিবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়। এজন্যই সে কেন কেন করে। মূল কারণ অর্থাৎ ঈশ্বরের কথা শুনিতে পাইলেই যে, সে নিরস্ত হয় এমত নহে। দীন বাবু যেখানে মাতা ও বালকের কথা থামাইয়াছেন, আমরা সেখান হইতে আরও অনেক 'কেন' আনিতে পারি যথা।

মাতা—ঈশ্বরই জানেন... P 58 (পৃঃ)

দীন বাবু বালককে এখানে থামাইয়াছেন, বালক যেন এই উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু সে সন্তুষ্ট নাও হইতে পারে। সে জিজ্ঞাসা করিতে পারে,

বালক—কেন ঈশ্বর জানেন?

মাতা—আর কাহারও জানিবার ক্ষমতা নাই।

বালক—কেন নাই?

মাতা—ঈশ্বর ক্ষমতা দেন নাই।

বালক—কেন দেন নাই?

মাতা—যাঃ, আমি জানিনে।

বালক—কেন জানিস্‌নে?

মাতা—যাঃ বাপু, ত্যক্ত করিস্‌নে, ওদের বাড়ী খেলানা বিক্রি কর্‌তে এসেছে খেলানা কিন্‌গে যা।

অনেক মাতা ও বালকের কথা এইরূপ শেষ হয়। অনর্থক কেন কেন করা বালকের বালক-স্বভাব। কিন্তু মনুষ্যের স্বভাব তাহা নয়। ইহারা যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করে, তাহাতে একটা না একটা লাভের উদ্দেশ্য থাকে। ঐ লাভ সাধারণতঃ সাংসারিক মঙ্গল লাভ, শুদ্ধ আদিম কারণের জ্ঞানলাভ সাধারণের উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

দীনবাবুর আর একটি মতের সমালোচনা করিয়া আমরা এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

কোমৎ "স্ত্রী, কন্যা, ও মাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জেনে পূজার ব্যবস্থা দেছেন।" কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে দীনবাবুর আপত্তি আছে। সে আপত্তিটি এই—যদি স্ত্রী, কন্যা বা মাতা দুশ্চরিত্রা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে কিরূপে পূজা করা যাইতে পারে। এই স্থলে দীন বাবু বলিয়াছেন যে এখানেই কোমতের বিদ্যা বুদ্ধি সব বেরিয়ে পড়েছে।

যিনি কোমতের মতের প্রতিবাদ ক-

রিতে বসিয়া এইরূপ অহমিকার সহিত নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাঁহার অন্ততঃ জানা উচিত কোমতের মতটি কি। মিল কোমতের প্রতিবাদী। কিন্তু শুনুন মিল কোমতের মতের কিরূপ ব্যখ্যা করেন।

'কোমতের মতে গার্হস্থ্য পূজার পূজ্য দেবতা মাতা, স্ত্রী ও কন্যা। ইহাদের মধ্যে মাতা অতীত-স্থানীয় এবং আমাদের হৃদয়ে ইনি ভক্তির উদ্বোধন করেন। স্ত্রী বর্ত্তমান স্থানীয় এবং ইনি আমাদের হৃদয়ে প্রেমের বা প্রণয়ের উদ্বোধন করেন। এবং কন্যা ভবিষ্যৎ স্থলীয় এবং তিনি আমাদের হৃদয়ে দয়ার ভাব উদ্বোধিত করেন। ইহাঁরা মৃতই হউন বা জীবিতই হউন, আমরা ইহাদিগকে আমাদের নেতৃ দেবতা বলিয়া স্বীকার করিব। যাঁহার স্ত্রী বা কন্যা হয় নাই, কিংবা যেখানে মাতা, স্ত্রী, বা কন্যা, দুশ্চরিত্রা, সেখানে তাঁহাদের স্থলে অন্য সদ্গুণবিশিষ্টা স্ত্রীলোক অভিষিক্ত হইতে পারে।* (অর্থাৎ দুষ্টা মাতার পরিবর্ত্তে খুড়ী জেঠাই প্রভৃতি, স্ত্রীর পরিবর্ত্তে ভগ্নী, ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি, এবং কন্যার পরিবর্ত্তে ভ্রাতৃকন্যা বা ঐ পর্য্যায়ের অন্য কোন কন্যা পূজিত হইতে পারেন।) এমন কি সদ্গুণবিশিষ্টা ইতিহাসোল্লিখিতা স্ত্রীগণও (যথা; অরুন্ধতী, সীতা, দময়ন্তী) ঐ ভাবে পূজিত হইতে পারেন। পূজ্যা জীবিতই হউন বা মৃতই হউন পূজা শুদ্ধ তাঁহার 'ভাবনার' (Idea) প্রতি অর্পিত হইবে।'*

বোধ হয় ইহাতেই দীনবাবুর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। যদি কোমত ঐ সামান্য গোলটুকু মিটাইতে না পারিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই জগদ্বিখ্যাত হইতে পারিতেন না, কখনই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতেন না।

আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্তে দীনবাবুর পুস্তকের সমালোচনার শেষ করিলাম। ফলতঃ দীনবাবু যেসমস্ত গুণবত্তা প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দারা তাহা হইতে অনেক উত্তম উত্তম পুস্তকের আশা করা যায়। এজন্য তাঁহার একদেশদর্শিতা দেখিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। আশা করি ভবিষ্যতে তিনি আমাদের এই সামান্য সমালোচন অনুসারে নিজের দোষটুকু সারিয়া লইবেন এবং তত্ত্বগুলিকে দুই পক্ষ হইতে বিচার করিয়া বঙ্গভাষাকে, ও বাঙ্গালি জাতিকে চির-ঋণে আবদ্ধ করিবেন। দীন বাবু শ্রদ্ধার পাত্র। আমরা সমালোচনায় যাহা বলিয়াছি, তাহা শুদ্ধ সত্যের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে। ফলতঃ সমালোচনার সময়—

"We were more in sorrow than in anger.

শ্রীনী—

* ইহাতেই দীনবাবুর আপত্তি খণ্ডিত হইল।

* Mill on Comte P 157.

কাব্যশিক্ষা।

সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রানুসারে রস নয় প্রকার; যথা—প্রণয়, করুণ, হাস্য, বীভৎস, ভয়ানক, রৌদ্র, বীর, অদ্ভুত, ও শান্ত। এই নয় প্রকার রসের মধ্যে এক বা ততোধিক রস-প্রধান রচনার নাম কাব্য। কাব্য, রস-সংযুক্ত রচনা হইলেও উহা কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক হওয়া আবশ্যক। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে কবিত্ব-শক্তি কি, ও উহার কার্য্য কিরূপ? প্রত্যেক মনুষ্য আপনাপন ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তেই জগতীয় পদার্থ সমূহে পরিচিত হইতেছেন বটে, কিন্তু পদার্থগত সৌন্দর্য্য ও মধুরতা, কদর্য্যতা ও ভীষণতা সমানরূপ উপলব্ধি করিতে সকলে সক্ষম নহেন। বাহ্য জগতের ন্যায় মনুষ্য-মন ও মনুষ্য-হৃদয় এক একটি ক্ষুদ্র জগৎ স্বরূপ। যৌবনাগমনে মনের শক্তি ও হৃদয়ের ইচ্ছা সকল ক্রমশঃ যেরূপ পরিস্ফুট হইতে থাকে, মনুষ্যের অবস্থানুসারে উহাদিগের সহিত বাহ্য পদার্থ সকলের আন্তরিক-সুখ-দুঃখ-উদ্ভাবন সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইতে থাকে। এই সময়ে যাঁহাদিগের কল্পনাশক্তি সত্যের বশবর্ত্তী হইয়া সতত পরিচিত পদার্থরাশি হইতে বিভিন্ন উপকরণ লইয়া মানসে নূতন নূতন প্রীতিকর সংযোগ করিতে পারে, তাঁহারাই কবি এবং তাঁহাদিগের রচনাই কাব্য; যথা,—

"অয়ি সুধাময়ি উষে! কে তোমারে নিরমিল।
বালার্ক সিন্দুর বিন্দু কে তোমার ভালে দিল"॥

সুন্দরী রমণীর সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু যেরূপ শোভাপায়, উষাগমে রক্তিমবর্ণ বালরবি পূর্ব্বগগণে সেইরূপ শোভা পায়। কোথায় সিন্দূর বিন্দু শোভিত সুন্দরী রমণীর সীমন্ত, কোথায় বা বালরবির রক্তিম মূর্ত্তি? ইহারা বিভিন্ন উপকরণ হইয়াও একের শোভার সহিত অপরের শোভার সাদৃশ্য উপলব্ধি—উহাদিগের এক স্থলে বিন্যাস ও অতি প্রীতিকর প্রেমরসাশ্রিত সহযোগ কবিরই কার্য্য। কবিত্ব কল্পনার ফল। কল্পনাদ্বারা অপ্রাকৃতিক সহযোগ করা যাইতে পারে তাহাতে দোষ হয় না, কিন্তু উহার উদ্দেশ্য সর্ব্বদা সত্য ও ধর্ম্ম হওয়া উচিত; যথা, কোন মহৎ তেজস্বী অথচ দয়াবান ব্যক্তির রূপ বর্ণনা কালে যদি আমি কহি

রবি শশী একাধারে হয়েছে মিলন।

তাহা হইলে এস্থলে অপ্রাকৃতিক সংযোগ করা হইল; কেননা রবি ও শশী কখন সমভাবে একত্রে গগণে উদয় হয় না; কিন্তু এস্থলে এ উপমাটির তাৎপর্য্য এই যে বর্ণনীয় ব্যক্তির মূর্ত্তি দিবাকরের ন্যায় তেজবিশিষ্ট হইলেও তিনি ব্যবহারে চন্দ্রের

ন্যায় সকলকে স্নিগ্ধ ও সুখী করেন। এইরূপ রচনা যদিও এক পক্ষে অপ্রাকৃতিক তথাচ উহার উদ্দেশ্য, বর্ণনীয় বিষয় সত্যরূপে পরিচয় দেওয়া। যদি উহা ঐরূপ না হইয়া অস্বাভাবিক স্তুতিবাদ মাত্র হয়, তাহা হইলে উহা কল্পনা শক্তির অনভিপ্রেত দুষ্ট কার্য্য বলিয়া সকলের অশ্রদ্ধেয় ও পরিহার্য্য।

কাব্য রস-প্রধান রচনা বলিয়া সর্ব্বদাই প্রীতিকর। সত্য সতত সকলের রুচিকর নহে, ও তদ্গত গূঢ় নীতি সকল সর্ব্বদাই নীরস। কবির উদ্দেশ্য অরুচিকর ও নীরস বিষয় সকল সরস ও প্রীতিকর করিয়া সাধারণের শিক্ষা সম্পাদন করা।

এস এস নিদ্রা দেবি,
জগত তোমারে সেবি
সংসার যাতনা নিত্য করে পরিহার।
নিত্য নব বল ধরে,
নিত্য নব রূপ পরে,
তোমারি মহিমা নিত্য করয়ে প্রচার।
যদিও কৃতান্ত-জায়া,
সব জীবে কর দয়া,
ইহ পর দুই লোক কর ব্যবধান।
সম্মুখে সুখযামিনী,
পশ্চাতে কাল রজনী,
মোহ রূপে দুই দিক কর আবরণ।

এস্থলে নিদ্রার কার্য্য, নিদ্রার ফল, নিদ্রারূপ মোহের সহিত অবিলোপনীয় মোহের (মৃত্যুর) সাদৃশ্য, মনুষ্য-জীবনের অনিত্যতা, মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা অথচ ভবিষ্যৎ অনিশ্চিততা এই সকল বিষয় উক্ত গীতি কবিতার উদ্দেশ্য। পূর্ব্বোক্ত বর্ণিত বিষয় সকল যদি প্রবন্ধাকারে রচিত হইত, তাহা হইলে উহা ঐরূপ প্রীতিজনক ও আশু ফলপ্রদ হইত না।

বিজ্ঞানাদি অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় সত্যানুসন্ধান ও সত্য নির্ব্বাচনই কাব্য শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। পদার্থ বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেরূপ পার্থিব বা প্রকৃতি বিষয়ক সত্য সকলের পরিচয় দেয়, কাব্য শাস্ত্র মনুষ্যের অবস্থাভেদে তাঁহার মন, ইচ্ছা, সদসৎ বিবেচনা, ও সুখদুঃখবোধ প্রভৃতির কার্য্যগত সত্য সমূহের প্রকাশ করে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে মনুষ্য-হৃদয় এক একটি জগৎ স্বরূপ, ইহা নিতান্ত অত্যুক্তি নহে; কেননা স্মৃতি, চিন্তা, বিবেক ও কল্পনা; স্বার্থপরতা, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, লোভ, ক্রোধ ও অহঙ্কার; স্নেহ, প্রণয়, ভক্তি, দয়া, ও ক্ষমা; আশা, উৎসাহ, ভয় ও নৈরাশ্য; আত্মগ্লানি ও আত্ম-প্রসাদ, মনুষ্যের প্রকৃতি ও অবস্থা ভেদে নিত্য যে কতশতরূপে প্রকাশ পাইতেছে ও ভবিষ্যতে পাইবে, তাহার সংখ্যা করা যায় না; সুতরাং কবির রচনাভাণ্ডার অক্ষয়। দেখ, অহঙ্কার (আত্মগরিমাপ্রকাশক ইচ্ছা) বিষয়ভেদে কতরূপ ধারণ করে। কাহারও বা পরিচ্ছদে, কাহারও বা অত্যুচ্চ অট্টালিকায়, কাহারও বা দাস দাসীতে, কাহারও বা যানাদিতে, কাহারও বা পুস্তকাদিতে, কাহারও বা শিল্পনৈপুণ্যে, কাহারও বা ধর্ম্মানুষ্ঠানে, কাহারও বা শারীরিক সৌন্দর্য্যে, কাহারও বা মানসিক গুণে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকারে প্রকাশ পায় উহা আবার অবস্থা ভেদে কতরূপে প্রকাশিত হয়। যথা, মূর্খে একরূপ, পণ্ডিতে

অন্যরূপ; দরিদ্রে এক প্রকার, ধনবানে অন্য প্রকার; স্বাধীন অবস্থায় একমত, পরাধীনে অন্যমত; যৌবনে একভাব, বার্দ্ধক্যে অন্যভাব। এতদ্ভিন্ন অহঙ্কারের পরিণামের প্রতি দৃষ্টি করিলে আমরা কোন স্থলে ক্ষুব্ধ, কোন কোন স্থলে ক্রুদ্ধ, কোন স্থলে লজ্জিত, কোন স্থলে ভীত হই। কোন স্থলে মৃদু হাস্য, কোন স্থলে উচ্চ হাস্য প্রকাশ করি।

এতদ্ভিন্ন যেসকল বিষয়ে সহসা মনুষ্যের সুখ সম্পাদন বা দুঃখ উদ্ভাবন হয়, উহাও কাব্য শাস্ত্রের বিশেষ লক্ষ্য। এই সুখ দুঃখ সম্বন্ধীয় ভাবকে উচ্ছ্বাস বলাযায়। দূরস্থ প্রিয়জন-সম্মিলনে, দুঃখের সময় কোন শুভ সংবাদ শ্রবণে, শুভ-প্রতীক্ষ হৃদয়ে নৈরাশ্য সমাগমে, আন্তরিক অবস্থার প্রতিকূল কোন বাহ্য বিষয় দর্শনাদিতে মনে সহসা যেরূপ সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি হয়, ঐরূপ বিষয় সকলের বর্ণনাও কবি-কল্পনার শ্রেষ্ঠ বিষয়; যথা, পুণ্ডরীকের সহসা মৃত্যুতে মহাশ্বেতার খেদোক্তি।

জনমের মত সখি জনমের সাধ ফুরাইল।
মণিময় আশা মম সহসা ক্ষার হইল।
বিষয় বাসনা সখি,
কি আছে আর বল দেখি,
কি সাধে এ অভাগিনী গৃহেতে যাইবে বল?
এই মণিময় হার,
দিলাম করেতে ধর,
পরিও, কররে সুখী যে বিধি মোরে দহিল।

পুণ্ডরীকের মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রকৃতির অবস্থা মহাশ্বেতার আন্তরিক অবস্থার প্রতিকূল হওয়াতে তরলিকার প্রকৃতির প্রতি উক্তি;—

বলগো প্রকৃতি সতি! একি তব আচরণ
বধিতে কি রাজবালা এমোহন আয়োজন?
কোকিল মদকল, ধীর মলয়ানিল,
সংফুল্ল ফুলদল, নিরমল গগণ।
বিমান তারকাহারে, মরি কিবা শোভা ধরে
শশীর রজত করে মধুময় এ ভুবন।
কালনিশি মধুময়, একি মা সঙ্গত হয়,
ছাড় মা মোহন রূপ কর অশ্রু বরিষণ।
সুকুমারী দ্রাক্ষালতা, রাজবালা মহাশ্বেতা,
দহিবে শুখাবে গো মা, লুটিবে আজ ধরণী।

কাব্য সর্ব্বদাই ছন্দে লিখিত হয়; কিন্তু কাব্য-গুণ বিশিষ্ট রচনা গদ্যে লিখিত হইলেও উহাকে কাব্য কহা যায়; এই জন্যই উৎকৃষ্ট উপন্যাস সকল কাব্য শ্রেণীভুক্ত। পরন্তু কাব্য পাঠ করিতে হইলে বালকদিগের সর্ব্বদা সতর্ক হওয়া আবশ্যক। যে সকল কাব্য-গ্রন্থের উদ্দেশ্য পাপের পোষকতা করা, উহাদিগকে তাহারা পরিহার করিবে; যেহেতু পাপের মোহিনী মূর্ত্তি কল্পনার সহযোগে শতগুণ মোহিনী হইয়া অশাসিত হৃদয়কে সহসা প্রবলবেগে আকৃষ্ট করে। যৌবনাগমে বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে যখন বুদ্ধির পরিপক্কতা হয় না, যখন বহুদর্শিতা অধর্ম্মের কুহকিনী শক্তি ও উহার বিরুদ্ধ পরিণাম কিছুই পরিজ্ঞাত করে না, তখন আশুপ্রীতিকর অথচ পরিণামবিরুদ্ধ বিষয় সকল সতত আলোচনে উহারা অসৎসংসর্গ অপেক্ষাও আজীবন দুঃখের ভিত্তি সংস্থাপন করে।

গণিত শিক্ষা ।

কি কাব্য, কি গণিত, কি ভূগোল, কি ইতিহাস, প্রত্যেক শাস্ত্রই সত্য মন্দিরে উঠিবার এক একটি পথ স্বরূপ। এই পথ সকল প্রথমতঃ অপ্রশস্ত অন্ধকারময় ও দুরারোহ। দর্শনার্থী যাত্রা যতই অগ্রসর হয়েন, উহারা ততই প্রশস্ত ততই উজ্জ্বল, ততই সুখকর অনুভূত হয়। যিনি যত দূর অগ্রসর হইতে পারেন, তিনি ততদূর পশু-লোক পরিত্যাগ করিয়া দিব্য লোকের নিকটবর্ত্তী হয়েন। বালকেরা প্রথমে সংকলন, ব্যবকলন, গুণন, ভাগহার প্রভৃতি শিক্ষা করিতে যখন অতীব কষ্ট অনুভব করে, তখন শিক্ষকগণের তাহাদিগকে জ্ঞাত করা আবশ্যক, যে ভবিষ্যতে ঐ ক্লেশকর পাঠ সকল হইতে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ গণের দৈনিক বা বাৎসরিক গতি নির্দ্দেশ, গ্রহণ গণনা, ঋতুগণের পর্য্যায় ভ্রমণ নির্ণয়, নদীর জোয়ারের ও ভাটার কারণ ও সময় নিরূপণ প্রভৃতি মহৎ মহৎ-বিষয় সমস্ত উপলব্ধি করিবার জন্য ভিত্তি সংস্থাপিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন গৃহ নির্ম্মাণ, নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রী সকলের প্রস্তুত করণ, পুস্তকাদি মুদ্রণ, বাণিজ্যের জন্য জল-যান গঠন প্রভৃতি মনুষ্যের যাহা কিছু প্রয়োজনীয়,তৎসমুদয়ের সৃষ্টি যে গণিত শিক্ষার ফল তাহাও দর্শান সম্যক্ রূপে কর্ত্তব্য। গণিত আলোচনা আপাতক্লেশকর হইলেও উহাতে বুদ্ধির স্থিরতা, প্রসারণ ও তীক্ষ্ণতা সম্পাদন করিয়া মনুষ্যকে সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম করে। পূর্ব্বোক্ত কারণেই প্রত্যেক ব্যক্তির সাধ্যমত গণিত শিক্ষা করা আবশ্যক। যাঁহাদিগের গণিত আলোচনায় স্বভাবসিদ্ধ আসক্তি আছে, তাঁহারা উক্ত বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে সম্যক্ রূপ যত্নবান্ হইবেন, কেননা, তাঁহারাই সমাজের বিশেষ উপকার করিতে সক্ষম।

অন্যান্য শাস্ত্রে ব্যক্তিগত ক্ষমতার তারতম্যে রুচি ও মতভেদে অনেক অসারতা থাকিতে পারে, কিন্তু গণিতে তাহার কিছুই লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই ; যেহেতু ইহার নিয়মাবলির আবশ্যকতা এই যে, ঈশ্বরসৃষ্ট গূঢ় নিয়মাবলি যতদূর মনুষ্য কর্ত্তৃক অনুসংহিত ও উপলব্ধ হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রকাশ করা ; সুতরাং উহাদিগের আলোচনা, আর সত্য বা ঈশ্বরের উপাসনা ভিন্নকার্য্য নহে। গণিত শিক্ষা করিতে হইলে উহার নিয়মাবলী প্রথমে উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করা ও সর্ব্বদা স্মরণে উপস্থিত রাখা কর্ত্তব্য। প্রশ্ন সকলের উত্তর যথার্থ হইল কি না,কেবল ইহা দেখা শিক্ষকের কার্য্য নহে। উদাহরণ সকল যে যে নিয়মের অধীন, ঐ সকল নিয়মের পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ ছাত্রগণকে বিশেষ রূপে জ্ঞাত করা আবশ্যক।

পদার্থবিজ্ঞানের ন্যায় গণিতবিজ্ঞা-

নের মুখ্য উদ্দেশ্য সতত সত্য অনুসন্ধান ও সত্যের আবিষ্কার। শাস্ত্রভেদে সত্যের রূপ-ভেদ হয় মাত্র। পদার্থবিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ পদার্থের কারণ নির্দ্দিষ্ট হয়, গণিতবিজ্ঞানে পদার্থের সংখ্যা ও ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হয়। পদার্থ না থাকিলে উহার সংখ্যাও ধর্ম্ম নির্দ্দেশ কি রূপে সম্ভব? এই জন্যই পদার্থবিজ্ঞানের সহিত গণিতবিজ্ঞানের সাক্ষাৎ ও নিত্য সম্বন্ধ। যাঁহারা গণিতের প্রতি উপহাস করিয়া পদার্থশাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা গুণ গ্রহণে অক্ষম ব্যক্তির ন্যায় কোন "মহৎ ব্যক্তির বন্ধু" বলিয়া পরিচয় দিয়া কেবল আত্মাভিমানে পরিতৃপ্ত হন মাত্র।

"রাশি" এই শব্দ, গণিতবেদের প্রণব স্বরূপ। এই প্রণবটি কি তাহা প্রথমে বি-শেষ রূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যায়, যাহার সংখ্যা বা প-রিমাণ নিরূপণ করা যায় তাহাই "রাশি"; সুতরাং রাশি শব্দে, পদার্থের সংখ্যা, রেখা, স্থান, সময়, গতি, ও গুরুত্ব সমস্তই বুঝায়। গণিত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সর্ব্বপ্রকার রাশির সংখ্যা বা পরিমাণ নিরূপণ করা। যে অংশে কেবল সংখ্যা নির্ণয় হয়, তাহাকে পাটীগ-ণিত, ও যে অংশে রেখা দ্বারা পরিমাণ সিদ্ধ হয়, তাহাকে জ্যামিতি বলা যায়। এই দুই অংশ বীজগণিত ও মিশ্রগণিতের ভিত্তি স্বরূপ।

গণিত শাস্ত্র মতে দুই প্রকার পদ্ধতিতে স-ত্যের নির্ব্বাচন হয়। উহাদিগকে ইংরাজি শব্দে Analytical and Synthetical Meth-od কহে। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে প্রস্তাবিত বিষয় অগ্রে সত্য বলিয়া স্বীকার করত, ক্রমশঃ বিচার দ্বারা অন্য কোন পরীক্ষাসিদ্ধ সত্যের সাহায্যে উহার সত্য সিদ্ধান্ত করা। এইরূপ পদ্ধতি বীজগণিতে ব্যবহার হইয়া থাকে অপর পদ্ধতিমতে প্রথমতঃ কএকটি সহজ ও সরল নিয়মাবলী লইয়া ক্রমে বিচার দ্বারা সত্যের সিদ্ধান্ত হয়। এই দুই প্রকার বিচার পদ্ধতি পরস্পর বিপরীত রূপ হইলেও প্র-থমোক্ত পদ্ধতি মতে সত্যের নির্ব্বাচন হ-ইলে, শেষোক্ত পদ্ধতি মতে উহার প্রমাণ সিদ্ধান্তীকৃত হয়।

ভূগোলশাস্ত্র শিক্ষা

পৃথিবীর আকার, উহার ব্যাস ও পরিধি, গতি, জল ও স্থল বিভাগ, তাপ ও শৈত্য-ভেদে উহার নৈসর্গিক বিভাগ, উহার অন্ত-র্গতস্থান সমূহের বিভিন্ন প্রাকৃতিক মূর্ত্তি, জল ও বায়ুর অবস্থা, খনিজ ও উদ্ভিদ্ ও পশ্বাদির বিবরণ, স্থলভেদে মনুষ্যজাতি-ভেদ ও জাতিভেদে আচার ও সমাজ প্রণা-লীর প্রভেদ,—প্রভৃতির বিবরণ ভূগোলশাস্ত্র পাঠে উপলব্ধি হয়।

প্রাকৃতিক বিষয়ক জ্ঞানোপার্জ্জন মনুষ্য জীবনের সতত উদ্দেশ্য হইলেও অল্পবয়স্ক বালকদিগের পক্ষে উহা প্রথমেই উপযোগী নহে; যে হেতু পদার্থগত প্রাকৃতিক গূঢ় নিয়মাবলীর ধারণা, বোধ, চিন্তা ও অনু-

সন্ধানে যেরূপ বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য, ধীরতা ও পরিপক্কতার আবশ্যক, তাহা বাল্যকালে আশা করা যায় না। অল্পবয়সে যখন বুদ্ধির অল্পতা, কিন্তু কৌতূহল ও স্মৃতি শক্তির বিশেষ আধিক্য থাকে, তখন ভূগোলশাস্ত্র পাঠে পার্থিব বিষয়ক জ্ঞান যতদূর উপলব্ধি হইতে পারে, তাহাই শিক্ষা দেওয়া উচিত। উক্ত জ্ঞান ও পদার্থগত বিবরণ সমস্ত স্মরণ থাকিলে পশ্চাতে প্রাকৃতিক বিষয়ের জ্ঞান উপার্জ্জনে বিশেষ সহায়তা করে।

অপিচ, ভূগোলশাস্ত্র পাঠে যে অনির্ব্বচনীয় সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ কৌতূহল পরিতৃপ্তির কারণ। কোন দেশে কিরূপ মনুষ্যের বসতি, উহাদিগের আচার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ কিরূপ, উহাতে কি কি শস্য উৎপন্ন হয়, এবং কি কি ধাতু পাওয়া যায়, এইরূপ বিষয় সকল জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? উক্ত ইচ্ছার পরিতৃপ্তি পাঠ ও ভ্রমণ দ্বারা সম্পাদিত হয়। ভ্রমণ সকলের অবস্থাসঙ্গত নহে, ও বাল্যকাল-সাধ্য নহে বলিয়া প্রথমতঃ শিক্ষার আবশ্যক। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষা-পদ্ধতি অভাবে ভূগোলশাস্ত্র যথাবিহিত শিক্ষা ও আনন্দ বিধান না করিয়া, কেবল দুর্ভার ক্লেশকর পাঠ হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি Icelandsparনামে, দেখিতে সুন্দর স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল এক প্রস্তর খণ্ড আপন অল্পবয়স্ক পুত্রের নিকট রাখেন, তাহা হইলে প্রথমতঃ উহা কি, ও তৎপরে উহার বিবরণ সমস্ত জ্ঞাত হইতে কৌতূহল প্রকাশ অবশ্যই করিবে। এই সময়ে যদি তাহার পিতা, উহার নাম Icelandspar এই বিজাতীয় শব্দ মাত্র স্মরণ রাখিতে আদেশ করেন, তাহা হইলে ঐ বালক হয়ত পাঁচবার বলিয়া দিলেও উক্ত নাম অভ্যাস করিতে সক্ষম না হইতে পারে। সেইরূপ শিক্ষাভারার্থিগণ যদি অভ্যাসের উপর নির্ভর না করিয়া যত্নের সহিত প্রত্যেক দেশের মানচিত্র লইয়া জ্ঞাতব্য বিষয় সকল সরল ও বিশদ রূপে গল্পচ্ছলে একবার বলিয়া দেন, তাহা হইলে বালকেরা কখনই তাহা ভুলে না।

আধুনিক ভূগোলশাস্ত্র অনেকগুলি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান শাস্ত্রের অন্তর্গত বিষয় সকল লইয়া সৃষ্ট হইয়াছে। গণিত ও জ্যোতিষের সাহায্যে পৃথিবীর আকার, উহার আহ্নিক ও বাৎসরিক গতি, সৌরজগতে উহার সম্বন্ধ প্রভৃতির বিষয় সকল স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভূবিদ্যা সহায়ে ভূগর্ভস্থ খনিজ প্রস্তর ও ধাতু সকলের বিষয় নির্ণীত হইয়াছে। উদ্ভিদ্ ও পশ্বাদি বিজ্ঞান সহায়ে পৃথিবীর সর্ব্বস্থলের উদ্ভিদ্ ও পশু, পক্ষী, মৎস্য, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মনুষ্যজাতিভেদে জাতিগত ইতিহাস, সামাজিক আচার ব্যবহার, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি, বৈজ্ঞানিকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং আধুনিক ভূগোলশাস্ত্র পাঠে পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞান ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত সকল স্বতন্ত্র পাঠ না করিয়া এককালে উহাদিগের বিষয়গত সমাচার সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়।

সামাজিক নীতিশিক্ষা।

পূর্ব্বে 'ইতিহাসশিক্ষা' প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মনুষ্য স্বভাবসিদ্ধ ইচ্ছানুসারে স্বজাতির সহিত সর্ব্বদা একত্রে থাকিতে ভালবাসে। এই ইচ্ছাই প্রথম সামাজিকতার মূলকারণ। সমাজ সংবদ্ধ হইলে পরস্পর একমত হইয়া আপনাপন ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা সীমাবদ্ধ করা আবশ্যক; কেন না স্বার্থপরতা নিয়মিত রূপে সংযত না হইলে সামাজিকতা রক্ষা হয় না। যদি এক ব্যক্তি স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া অপর ব্যক্তির পরিশ্রমলব্ধ সম্পত্তি বল পূর্ব্বক আত্মসাৎ করে, তাহা হইলে সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। যাহাতে ঐরূপ না হয়, এই জন্য সমাজস্থ ব্যক্তি সকলই একমত হইয়া কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিতে প্রথমতঃ স্বীকৃত হন। কিন্তু কেবল নিয়মাবলী প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হইলেও সমাজ রক্ষা হয় না। এই জন্যই, নিয়মভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডবিধির সৃষ্টি। নিয়মভঙ্গের নাম অপরাধ; অপরাধের লঘুত্ব ও গুরুত্ব অনুসারে দণ্ডের লঘুত্ব ও গুরুত্ব স্থিরীকৃত হয়। অত্যাচারী ব্যক্তি যাঁহার উপর অত্যাচার করে তাঁহারই নিকট কেবল যে অপরাধী এমন নহে। সে ব্যক্তি সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘনার্থ সমাজের নিকটও অপরাধী। এই কারণেই চোর বা ডাকাইতকে যাঁহার বাটীতে চুরী বা ডাকাইতি হইয়াছে, তিনি ইচ্ছা করিলেই ছাড়িয়া দিতে পারেন না। যদি গুপ্তভাবে ছাড়িয়া দেন, তাহা প্রকাশ হইলে তিনিও দণ্ডনীয় হন। পক্ষান্তরে পিতা আপন পুত্রের জন্ম দিয়াছেন এবং উহাকে লালন পালন করিতেছেন বটে, কিন্তু তিনি ইচ্ছামত আপন পুত্রের প্রাণনাশ করিতে পারেন না;—করিলে নরহত্যার যে শাস্তি তাহাই তাঁহাকে পাইতে হইবে; কেন না তাঁহার পুত্র যে তাঁহারই সম্পত্তি এমন নহে, উহা সমাজের অন্তর্ভূত লোক বলিয়া সমাজের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য। মনুষ্যের জ্ঞানোদয় হওয়া অবধি তিনি যদি দেশীয় সমাজভুক্ত থাকেন, তাহা হইলে দেশীয় সামাজিক প্রচলিত নিয়মাবলী প্রতিপালনে তিনি যে স্বীকৃত হইয়াছেন, এই রূপ অনুমান করিয়া লইতে হইবে। তাহা না করিলে কাহাকেও দণ্ডনীয় করা যাইতে পারে না। যদি কোন প্রচলিত নিয়ম অসম্পূর্ণ বা অসঙ্গত তাঁহার বোধ হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উহার প্রতিবাদ করিবার তাঁহার অধিকার ও ক্ষমতা আছে। কিন্তু যতক্ষণ উহার সংস্করণ বা দূরীকরণ না হয়, ততক্ষণ তাঁহাকে প্রচলিত নিয়মের বশবর্ত্তী থাকিতে হইবে।

সামাজিক নীতি ও ধর্ম্মনীতি পরস্পর

বিরোধী নহে। ফলতঃ মূল সামাজিক নীতি ও মূল ধর্ম্মনীতি পরস্পর সাহায্য সাপেক্ষ; যেহেতু ধর্ম্মের আশ্রয় সমাজ ও সমাজের আশ্রয় ধর্ম্ম। দয়া স্নেহ পরহিতেচ্ছা প্রভৃতির কার্য্য সমাজেই সাধিত হয়। পক্ষান্তরে ধর্ম্মভয় না থাকিলে যে সকল অপরাধ সামাজিক নিয়মে দণ্ডনীয় নহে, উহাদিগেব নিবারণ করিবার আর অন্য উপায় নাই। বস্তুতঃ সমাজ রক্ষাই ধর্ম্ম শব্দের অর্থ। সামাজিকতা মনুষ্যের স্বার্থপরতাকে সীমাবদ্ধ করে; কিন্তু ধর্ম্ম উক্ত উদ্দেশ্য সাধন করিয়াও পরোপকারে মনুষ্যকে আপন স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে আদেশ, এবং স্বার্থ বিসর্জ্জনে তাঁহার গৌরব ও সুখ বৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করে। কেন্দ্রাভিকর্ষণী ও কেন্দ্রবিকর্ষণী শক্তি যেরূপ পৃথিবীকে আপন কক্ষে রাখিয়া সূর্য্যমণ্ডলে পরিক্রমণ করাইয়া ঋতু সকলের উৎপত্তি এবং উহার মঙ্গল সাধন করে, সামাজিকতা ও ধর্ম্ম মনুষ্যজাতিকে সেইরূপ সমাজবদ্ধ করিয়া দয়া, স্নেহ, ক্ষমা প্রভৃতির উৎসাহ সংবর্দ্ধন করতঃ মনুষ্যজাতির সুখ সচ্ছন্দতা ও ক্রমাধিক্ উন্নতি সাধন করে।

সমাজের প্রথম অবস্থায় সামাজিক নীতি যে কয়েকটি থাকে, সময়ে সমাজবর্দ্ধন ও উন্নত হইলে, উহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন হয়। আদি সমাজে সত্যের পালন, গুপ্ত বা প্রকাশ্য অপহরণ ও অন্যরূপ অহিতাচরণ নিবারণ জন্য কএকটি স্থূল নীতি প্রথমে সংস্থাপিত হয়। ক্রমশঃ মনুষ্যসংখ্যাও মনুষ্যবুদ্ধির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অহিতচারণ শত শত রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। উহাদিগের নিবারণের জন্য নূতন নূতন বিধি ও বিধি উল্লঙ্ঘনে দণ্ডের আয়োজন হয়। যথা প্রথমে চৌর্য্য নিবারণের জন্য কোন রূপ বিধির সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমে যখন মনুষ্য দেখিল জুয়াচুরী বা বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কোন দণ্ডের আয়োজন নাই, তখন জুয়াচুরী ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা নিজ স্বার্থ সম্পাদন করিত। ক্রমে উহাদিগের নিবারণ করিবার জন্য নূতন বিধি ও নূতন দণ্ডের সৃষ্টি হইল। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে উহারা স্থূল অপহরণ নিষেধক বিধির শাখা প্রশাখা মাত্র। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি সামাজিক সাধুতার নিয়ম আছে। উহাদিগের মূল উদ্দেশ্য সমাজে পরস্পর ভ্রাতৃবৎ সদ্ভাব রক্ষা ও অকারণ কাহারও মনঃপীড়া নিবারণ করা। মান্য ব্যক্তির সম্মান করিবে, ধৃষ্টতা বা ঔদ্ধত্যভাব সতত পরিহার করিবে, সর্ব্বদা বিনয়ী ও নম্র হইবে, যে প্রকার উপহাস বা কার্য্যে কোন ব্যক্তি মর্ম্মবেদনা পায় তাহা করিবে না, ইত্যাদি সামাজিক সাধুতার নিয়মাবলী। যদিও পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ নাই, ও উহাদিগের উল্লঙ্ঘনে কোন রূপ শাস্তির আয়োজন নাই বটে, তথাচ তদ্‌বিপরীতাচরণে মনুষ্যকে নীচ ও বর্ব্বর বলিয়া পরিচিত করে।

সংপ্রতি স্থূল সামাজিক নীতি সকল শিক্ষা দিবার সময় শিক্ষাভারার্থিগণ প্রত্যেক নীতির উদ্দেশ্য, উহা কোন ধর্ম্মনীতির প্রতিরূপ, উহার বিপরীতাচরণে সমাজের কিরূপ অমঙ্গল, ও বিপরীতাচারীর নিজের পক্ষেই বা কিরূপ অমঙ্গল হইতে

পারে, এই সকল বিষয় বালকগণকে বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। আদেশ মাত্রে—যথা, "চুরী করিও না" "পরের গ্লানি করিও না"—বালকদিগের শিক্ষা হয় না; এবং 'চুরী করা মহাপাপ' বা 'পরের গ্লানি করা বড় দোষ,' এইরূপ যুক্তিতেও বিশেষ ফল দর্শে না; যেহেতু অলক্ষ্য অতীন্দ্রিয় পাপের ভীতি বা সামাজিক দণ্ডের কাঠিন্য বা গুরুত্ব অতি অল্প রকমে স্পষ্ট অনুভূত হয় না। অল্প বয়সে যখন ইন্দ্রিয় সকল পরিস্ফুট হয় না, যখন স্বার্থপরতা প্রবল থাকে না, তখনই নীতি শিক্ষা দিবার ও চরিত্র গঠন করিবার উপযুক্ত সময়। কিন্তু উক্ত উদ্দেশ্য আদেশ মাত্রে বা ভীতি প্রদর্শনে সাধিত হয় না। বালকেরা বিজ্ঞতা ভাল বাসে। কোন কার্য্য করিতে আদেশ বা নিষেধ করিবার সময় তাহাদিগকে তদনুকূলে বা প্রতিকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ উহাতে প্রবৃত্ত বা উহা হইতে ক্ষান্ত হয়।

অপিচ, বালকদিগকে সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাত করাণ আবশ্যক যে, মনুষ্য সর্ব্বকালেই শিক্ষা করিতে সক্ষম, কিন্তু চরিত্র গঠনের এক মাত্র সময় বাল্যকাল। যৌবনের প্রারম্ভে তাহারা চরিত্র গত যেরূপ শিক্ষা পাইবে, আজীবন উহাই তাহাদিগের নিয়তির কার্য্য করিবে। ফেনিলন, প্রফেসর উইল্‌সন, চামার্স প্রভৃতিবা যদি বাল্যকালে সামাজিক ও ধর্ম্মনীতি সকল উত্তমরূপে শিক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে পরিণামে তাঁহাদিগের স্বভাবের পবিত্রতা এবং রচনার উৎকর্ষ, ও নির্ম্মলতার জন্য কখনই সুপ্রসিদ্ধ হইতে পারিতেন না। এই মহৎ ব্যক্তি সকলের চরিত্রগত বিবরণ ও কতিপয় ইন্দ্রিয়সেবক, স্বার্থপর সমাজবিদ্রোহী ব্যক্তির জীবনী লইয়া একত্র শিক্ষা দিলে, বালকদিগের পক্ষে উহার ফল আশু ও চিরস্থায়ী হইবে; কেননা এক পক্ষে অধার্ম্মিক ও অসাধু ব্যক্তিদিগের সতত দুর্ভার জীবন, শত সহস্র প্রকার ভয় কষ্ট ও যাতনা এবং পক্ষান্তরে নির্ম্মল পবিত্র জীবনের সুখ সচ্ছন্দতা, সাহস ও গৌরব পরস্পর তুলনায় একের কদর্য্যতা ও অপরের সৌন্দর্য্য, সুকুমার মতি বালকদিগের বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। ধর্ম্মনীতি প্রতিপালনে আস্থা, ও তদ্বিরুদ্ধাচরণের ভয় হৃদয়ক্ষেত্রে প্রথম বয়সে অঙ্কুরিত হইলে উহাদিগের সুফল আজীবন প্রসব করিবার বিশেষ সম্ভাবনা।

রাজা কংশনারায়ণ ওরফে রাজা গণেশ।

বাঙ্গলার ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গলা বিজয় সম্পাদন করেন। ১২০৩ হইতে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাটের নিযুক্ত শাসন কর্ত্তৃগণ বাঙ্গলা শাসন করেন। তৎপর দুইশত বৎসর অর্থাৎ ১৩৩৮ হইতে ১৫৩৮ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশ স্বাধীন রাজাদিগের দ্বারা শাসিত হয়। এই স্বাধীন রাজাদের সংখ্যা সাকল্যে ২৪ জন, তন্মধ্যে ২২ জন মুসলমান, একজন মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দু, একজন বিশুদ্ধ হিন্দু। এই হিন্দু নৃপতির নামই রাজা কংশনারায়ণ। দুঃখের বিষয় এই যে ইতিহাসে ইহাঁর পর্য্যাপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় না। যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাও অলীক বিষয়ে মিশ্রিত, এবং বিসংবাদিতায় পরিপূর্ণ।

ষ্টুয়ার্ট, মার্শমেন, লেথব্রিজ প্রভৃতি সকলের ইতিহাসেই এই মাত্র জানা যায় যে, ইনি একজন প্রবল পরাক্রান্ত যবন-বিদ্বেষী রাজাছিলেন; এবং ইহাঁর পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক জেলাল-উদ্দীন নাম গ্রহণ করেন। "তবকতে আকবরি" ও "রিয়াজ উস্সলেতিন" নামক দুই খানি প্রসিদ্ধ পারস্য ইতিহাসে রাজা কংশ সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা বিমিশ্র যে কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই সারাংশ প্রকটন করিতে মনস্থ করিয়াছি। "তবকতে আক্‌বরি" প্রণেতা নিজাম উদ্দীন আহাম্মদ সম্রাট আকবরের বক্সি ছিলেন। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়। ইহাতে ১৩৩৮ হইতে ১৫৩৮ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার স্বাধীন রাজাদিগের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। জর্জ্জ আদনে নামা মালদহের জনৈক ইংরাজের আদেশক্রমে জীতপুর নিবাসী গোলাম হোসেন (অথবা সলিম) কর্ত্তৃক ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে "রিয়াজ উস্সলেতিন" অর্থাৎ "রাজোদ্যান" গ্রন্থ প্রণীত হয়।

বাঙ্গলার সপ্তম স্বাধীন রাজা সৈফুদ্দীন হামজা সাহ ১৩৮৯ খৃঃ অঃ পরলোক গমন করিলে, তদীয় পুত্র সামসুদ্দীন সাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি তিন বৎসর এবং কতিপয় মাস রাজত্ব করিয়া ৮০৭ হিজরি শকে বা ১৪০২ খৃঃ অঃ দেহ ত্যাগ করেন। ইহাঁর রাজত্ব সময়ে দেশ শান্তিপূর্ণ ছিল। সামসুদ্দীন যখন রাজা হন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অধিক ছিল না; এবং তাঁহার বুদ্ধিরও তত প্রাখর্য্য ছিল না। সুতরাং তদীয় প্রধান কর্ম্মচারী রাজা কংশনারায়ণ তদীয় জীবদ্দশাতেই অতি প্রবল হইয়া উঠেন; এবং শাসন ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। 'রিয়াজ'*

* উচ্চারণ সৌকর্য্যার্থ আমরা "রিয়া-

বলেন, "কিছুকাল সুখভোগের পর, পীড়াগ্রস্ত হইয়া, বা প্রবল পরাক্রান্ত রাজা কংশের বিশ্বাসঘাতকর্তা নিবন্ধন ৭৮৮ হিঃ শাঃ (১) (১৩৮৩ খৃঃ অঃ) সামসুদ্দীন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে সামসুদ্দীন সৈফুদ্দীনের পালক পুত্র, এবং ইহাঁর নাম সাহবুদ্দীন। সে যাহা হউক, ইনি ৩ বৎসর, ৪ মাস, ৬ দিন রাজত্ব করেন। প্রামাণিক বৃত্তান্তদ্বারা জানা যাইতেছে যে, ভাতরিয়ার জমিদার রাজা কংশ বিদ্রোহী হইয়া ইহাঁর প্রাণ নাশ এবং সিংহাসন অধিকার করেন।"

আইন আকবরি বা অপর কোন প্রাচীন গ্রন্থে ভাতরিয়ার নাম দৃষ্ট হয় না। ১৭৭৮ খৃঃ অঃ রেনেল সাহেব যে মানচিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে ঐ স্থলের নাম প্রথম দেখা যায়। উক্ত মানচিত্র অনুসারে ভাতরিয়া মালদহ জিলার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহার পশ্চিম সীমায় মহানন্দা ও তাহার তোয়দা পুনর্ভবা নদীদ্বয়; দক্ষিণ সীমায় পদ্মা; পূর্ব্ব সীমায় করতোয়া নদী; এবং উত্তর সীমায় দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট। সুতরাং

জউস্সেতিন" ও "তবক্কতে আকবরি" স্থলে, শুদ্ধ "রিয়াজ" ও "তবক্কত" ব্যবহার করিব।

(১) ফেরেস্তার অনুসরণ করিয়া গোলাম হোসেন ও ষ্টুয়ার্ট সাহেব সময় সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। 'তবক্কতের' সময়ের সহিত 'মুদ্রা' ও অপরাপর বিষয়ের ঐক্য থাকাতে উহাই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

আত্রেয়ী নদীর অববাহিকা ভাতরিয়ার অন্তর্গত।

রাজা কংশ বল পূর্ব্বক সিংহাসন গ্রহণ করেন, ও সাতবৎসর রাজত্ব করেন "তবক্কতে" এই মাত্র বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ষ্টুয়ার্ট সাহেব ফেরেস্তার মতানুসারে লিখিয়াছেন, "তিনি মুসলমান না হইলেও, মুসলমানদিগের সহিত প্রণয় ছিল; এবং তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদা মিশিতেন। এমন কি তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক মুসলমান তাঁহাকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত বলিয়া সমাহিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি সাত বৎসর প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হয়েন; তদীয় পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

শ্রীমান ওয়েষ্ট মেকট সাহেব ১৮৭২ অব্দের 'কলিকাতা রিভিউতে' একটি প্রবন্ধ লিখেন, তাহাতে কথিত আছে, রাজা কংশ রাজা গণেশের নামান্তর মাত্র। ইনি দিনাজপুর প্রদেশের রাজা ছিলেন। ঠিক রাজা কংশের সমকালে দিনাজপুর প্রদেশে সাহাবুদ্দীন আবুলমজফর বাজিত সাহ নামে একজন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রাজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাপি উক্ত জিলায় বাজিতপুর নামে একটি পরগণা বিদ্যমান আছে, আইন আকবরিতেও উহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত বাজিত সাহের নামাঙ্কিত ৮১২ ও ৮১৬ হিজরি শাকের দুইটি রৌপ্য মুদ্রাও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কংশ ও বাজিত সাহ উভয়েই সামসুদ্দীনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী; উভয়েই দিনাজপুরের অধিপতি; এবং উভয়েই সম সাময়িক।

পরন্তু রাজা কংশ রাজবংশ সম্ভূত নন বলিয়া তাঁহার নামের পূর্ব্বে যেমন 'নৃপাত্মজ' উপাধি নাই; বাজিত সাহের নামের পূর্ব্বেও তদ্রূপ উক্ত উপাধিটি নাই। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন, রাজা কংশই মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক বাজিতসাহ নাম ধারণ করেন। প্রাগুক্ত কারণ গুলি সংশয়-দ্যোতক বটে, কিন্তু রাজা কংশ ও বাজিত সাহ যে এক ও অভিন্ন একথা বিশ্বাস না করিবার প্রবল কারণ আছে। প্রথমতঃ নদু-জেলালউদ্দীনের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার পিতার কোন উল্লেখ নাই; যদি রাজা কংশ মুসলমান হইতেন, তাহা হইলে জেলাল উদ্দীনের নামের অগ্রে 'নৃপাত্মজ' উপাধিটি অবশ্যই থাকিত। তাঁহার পিতা রাজা হইলেও বিধর্ম্মী ছিলেন; সুতরাং কাফেরের নামে আপনার পরিচয় দিতে লজ্জা বা অধর্ম্ম বোধ করিয়াই উক্ত উপাধিটি গ্রহণ না করিয়া থাকিবেন। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত মুসলমান ইতিহাসেই রাজা কংশকে বিধর্ম্মী, কাফের ও মুসলমানের ঘোর বিদ্বেষী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে; এমন শত্রু মুসলমান হইলে অন্ততঃ স্বীয় ধর্ম্মের গৌরব প্রকাশ জন্যও কোন না কোন ঐতিহাসিক ইহার উল্লেখ করিতেন। তৃতীয়তঃ 'রিয়াজ' অতি স্পষ্টাক্ষরে বারংবার বলিয়াছেন যে, রাজা কংশ কিছুতেই কাফেরের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। প্রবন্ধের চরমভাগে আমরা 'রিয়াজ' হইতে যেসকল বিবরণ উদ্ধৃত করিব, তাহাতে পাঠক দেখিতে পাইবেন, উক্ত গ্রন্থকারের উক্তি গুলি কেমন বিদ্বেষপূর্ণ। তিনি রাজা কংশের ধর্ম্মকে 'অশ্লীকধর্ম্ম' বলিয়াছেন; তাঁহাকে নরকে পর্য্যন্ত প্রেরণ করিয়াছেন। কংশ যদি মুসলমান হইতেন, তবে 'রিয়াজের' এরূপ কটু কাটব্য প্রয়োগের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। শ্রীযুক্ত বুকমান সাহেব এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন যে, রাজা কংশই প্রকৃত রাজা; বাজিতসা কেবল নাম মাত্র রাজা ছিলেন। * নানা কারণে এরূপ মীমাংসায় আমরা সায় দিতে পারি না। আমাদের মতে রাজা কংশ মুসলমানদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য প্রকাশ্যে বাজিতসাহ নাম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন; অন্তরে প্রকৃত হিন্দুই ছিলেন। এই অনুমান যথার্থ হইলে, ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাস হইতে যেসকল কথা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সহিত কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য হয়। যাহা হউক, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের প্রতি এপ্রশ্ন মীমাংসার ভারার্পণ করিয়া আমরা 'রিয়াজ' হইতে কংশ নারায়ণের বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ গল্প অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"সুলতান সামসুদ্দীনের মৃত্যু হইলে রাজা কংশ নামে জনৈক হিন্দু জমিদার সমগ্র বাঙ্গলাদেশ অধিকার করে, এবং গর্ব্বিতভাবে সিংহাসনে আরোহণ করে। অত্যাচারও শোণিত বর্ষণ আরম্ভ হইল; সে সমস্ত মুসলমানের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অনেক বিদ্বানের প্রাণ সংহার করিল। একদা সেখ মাইনদ্দীন আব্বাসের

* এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণেল ৪২ বলুম। ২৬৩ পৃষ্ঠা।

পুত্র সেখ বদরল ইস্লাম ঐ পাষণ্ডের নিকট যাইয়া তাহাকে অভিবাদন না করাতে, সে অভিবাদন না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তখন সেখ কহিলেন ‘ বিদ্বানেরা কাফের, বিশেষতঃ তোমার মত মুসলমান-শোণিতবর্ষী কাফের অত্যাচারীকে অভিবাদন করিতে পারে না ’। অপবিত্র কাফের এই কথায় নিরুত্তর হইল ; সেখের বাক্যে তাহার মর্ম্মদাহ হইতে লাগিল ; এবং সেখকে বিনাশ করিতে মনে মনে সঙ্কল্প করিল। কিছু দিন পর রাজা একটি অপ্রশস্ত ও নিম্ন দ্বারবিশিষ্ট প্রকোষ্ঠে উপবেশন পূর্ব্বক, সেখকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে কহিল। সেখ রাজার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, অগ্রে পা বাড়াইয়া দিয়া অনবনত মস্তকে গৃহ প্রবিষ্ট হইলেন। ইহাতে রাজা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সেখকে তদীয় আত্মীয় বৃন্দের পথের পথিক করিতে আদেশ করিল। তৎক্ষণাৎ সেখের শিরচ্ছেদন হইল। এবং অপরাপর অনেক মৌলবিদিগকে একখানি নৌকায় আরোহণ করাইয়া সেই দিনই জলে নিমজ্জিত করা হইল।

‘ কাফেরের সিংহাসনাধিকার ও মুসলমানদিগের বিনাশে ব্যথিত হৃদয় হইয়া পীর নূর-কুতব-অল আলম জোনপুরের অধিপতি এব্রাহিম সার্কির * নিকট এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন যে, তিনি ইসলাম ধর্ম্ম ও মুসলমানবিদ্বেষী কাফেরের বিরুদ্ধে সত্বর যুদ্ধ যাত্রা করেন। এই সময় বিহারের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত জোনপুর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এব্রাহিম ভক্তি সহকারে উক্ত পত্রিকা গ্রহণ পূর্ব্বক কাজি সাহবুদ্দীনের সহিত ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ঐ কাজি সকলমৌলবি অপেক্ষা বিদ্বান ছিলেন ; সুতরাং রাজসভায় রজতাসনে উপবেশন করিতেন। কাজি কহিলেন কাফেরের সহিত সংগ্রামে ঐহিক পারত্রিক উভয়তঃ মঙ্গল। বিশেষতঃ এই উপলক্ষে বিখ্যাত পীর আলমের সন্দর্শন লাভও অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। অতঃপর এব্রাহিম অসংখ্য সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে কাফেরের প্রতিকূলে যাত্রা করিয়া ফিরোজপুর সরাইতে আসিয়া স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া রাজাকংশ পীর আলমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। এবং বিনয় অনুনয় করিয়া কহিল আপনি জোনপুরেশ্বরকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুমতি করুন। পীর কহিলেন কাফেরের অনুরোধে মুসলমান সুলতানকে আমি নিবৃত্ত করিতে পারিব না। বিশেষতঃ আমিই জোনপুরপতিকে রণে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছি। কাফের তখন পীরের চরণে শির লোটাইয়া কহিল, আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি প্রতিপালন করিব, আমাকে রক্ষা করুন। পীর কহিলেন ইছলাম ধর্ম্ম পরিগ্রহ ভিন্ন তোমার উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। রাজা তাহাতেই সম্মত হইল। রাণীর প্ররোচনায় কাফের পুনর্ব্বার নরকের পথে প্রত্যাগমন করিল, ‘ দীনে ’ আসিলনা। কিন্তু স্বীয় দ্বাদশবৎসর বয়স্ক পুত্র যদুকে পীরের সমীপে উপস্থিত করিয়া কহিল ‘ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি ; আমার আর

* এব্রাহিম সার্কি ৮০৪ হইতে ৮৪০ হিঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

সংসারবাসে থাকিবার বাসনা নাই। এই পুত্রকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, ইহার হস্তে বাঙ্গলার শাসনভার অর্পণ করুন।' পীর আলম তখন তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে ছিলেন। খানিক চর্ব্বিত তাম্বূল লইয়া যদুর আস্যে প্রদান করিলেন। তৎপর তাহাকে 'কলমা' পড়াইয়া মুসলমান করিলেন; এবং তাঁহার নাম জেলাল উদ্দীন রাখিলেন। রাজার ইচ্ছানুসারে পীর আলম নগরময় ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, নূতন রাজার নামে 'জুম্বার নমাজ' পড়িতে হইবে। এই রূপে মহম্মদের সনাতনধর্ম্ম নূতন বিক্রমে প্রচলিত হইল। তখন পীর আলম এব্রাহিমকে সমরে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। কাজি সাহবুদ্দীনের প্রতি রাজা কোপ-নয়নে চাহিলে, কাজি কহিতে লাগিলেন, 'আপনার আমন্ত্রণে নৃপতি এখানে আসিয়াছেন; এখন আপনিই কাফেরের প্রতি সানুকূল হইয়া রণে নিবৃত্ত হইতে কহিতেছেন। একথা লোকে শুনিলে কি বলিবে?' পীর কহিলেন 'যখন আমি সাহকে আহ্বান করি, তখন একজন কাফের এদেশ শাসন করিত। কিন্তু নূতন রাজা তাঁহার আগমনে মুসলমান হইয়াছেন। মুসলমান কাফেরের বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করিবে, কিন্তু যে 'দীনে' আসে তাহার বিরুদ্ধে নহে।' ইহাতে কাজি নিরুত্তর হইলেন বটে, কিন্তু রাজাকে তখন ও কোপান্বিত দেখিয়া পীর কাজির সহিত দার্শনিক তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক তর্কবিতর্কের পর পীর কহিলেন 'দরিদ্রের প্রতি তাচ্ছিল্য ও তাহাকে পরীক্ষা করিয়া কোন ও ব্যক্তি সৌভাগ্য শালী হইতে পারে না। অতএব দেখিতেছি তোমাদের অন্তিমকাল সন্নিকট।' এবং রাজার প্রতি রোষকষায়িত নয়নে চাহিলেন। তখন এব্রাহিম মনে মনে ক্ষুন্ন হইয়া অগত্যা জোনপুর পুন র্যাত্রা করিলেন। কথিত আছে যে পীরের অভিসম্পাতে অনতিবিলম্বে কাজি ও এব্রাহিমের মৃত্যু হয়।

'এব্রাহিমের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ মাত্র রাজা কংশ জেলাল উদ্দীনের হস্ত হইতে সিংহাসন কাড়িয়া লইল। এবং পুনরায় স্বীয় অনৃত ধর্ম্মানুসারে দেশ শাসন করিতে লাগিল। একটি হিরণ্ময় গবী প্রস্তুত করিয়া জেলাল উদ্দীনকে, তাহার মুখ দ্বারা প্রবেশ করাইয়া পায়ু দ্বারা বহির্গত করাইল; এবং প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ গোদেহ ভগ্ন করিয়া স্বর্ণগুলি ব্রাহ্মণসাৎ করিল। সে আশা করিয়াছিল, এতদ্দ্বারা স্বীয় তনয়কে পুনর্ব্বার হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিতে পারিবে। কিন্তু জেলালউদ্দীন পীর আলমের দ্বারা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সুতরাং কাফেরের উপদেশে তিনি গৃহীত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন না।

'রাজা কংশ এখন মুসলমানদিগকে অধিকতর পেষণ করিতে লাগিল। তাহার অত্যাচারের মাত্রা পূর্ণ হইলে, পীর আলমের পুত্র সেখ আনোয়ার পিতাকে কহিলেন 'বড় দুঃখের বিষয় যে, ভবাদৃশ ব্যক্তি রক্ষক থাকিতে কাফেরের হস্তে মুসলমানের এত লাঞ্ছনা হইতেছে।' পীর নমাজ পড়িতে ছিলেন; হঠাৎ এইরূপে বাধা পাইয়া অসন্তোষের সহিত পুত্রকে

কহিলেন ‘তোমার রক্ত মোক্ষণ ব্যতীত মুসমলমানের শান্তি হইবে না।’ আনোয়ার জানিতেন তদীয় পিতৃবাক্য অবশ্যম্ভাবী—কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। অতএব ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। রাজা কংশের অত্যাচার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল, সে আনোয়ার ও তদীয় ভ্রাতৃসুত জাহিদকে বন্দী করিল। কিন্তু তাঁহাদের প্রাণনাশে সহসা সাহসী না হইয়া, তাঁহাদিগকে স্বর্ণগ্রামে প্রেরণ করিল। এবং পীর আলমের গুপ্তধনের সন্ধান কহিয়া দিবার জন্য তাঁহাদের প্রতি ভয়ানক যন্ত্রণা দিতে লাগিল। বাস্তবিক পীরের কোন গুপ্ত সম্পত্তি ছিল না, সুতরাং তাঁহারা কেমন করিয়া সন্ধান কহিয়া দিবেন? তখন নরাধম কাফের তাঁহাদের প্রাণ দণ্ড করিল। * * * * প্রবাদ আছে, যে দিন সেখ আনোয়ার ‘স্বর্গে’ গেলেন, সেই দিনই রাজা কংশও রাজ প্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ‘নরকে’ গমন করিল। কাহারও মতে জেলালউদ্দীন কারাগারে থাকিয়াও কর্ম্মচারীদিগকে হস্তগত করেন, এবং তাহাদের দ্বারা কংশ বিনষ্ট হয়। এই পাষণ্ডের অত্যাচার-পূর্ণ শাসন সাত বৎসর স্থায়ী ছিল।

রাজা কংশের পর তদীয় পুত্র যদু জেলালউদ্দীন (জেলালউদ্দীনমজফর মহম্মদসাহ) তৎপর তৎপুত্র মোজাহিদ সাহ (সামসুদ্দীন আবুল মোজাহিদ আহম্মদ সাহ), রাজত্ব করেন। ইহার পর এই বংশের লোপ হয়, ও ইলিয়স সাহের বংশধরেরা পুনর্ব্বার সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

বুকমান সাহেবের প্রবন্ধ হইতে রাজা কংশের বংশের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

রাজার নাম	রাজত্ব কাল হিঃ অঃ	মুদ্রাদ্বারা নির্ণীতকাল হিঃ অঃ
১। রাজা কংশ (বাজ্জিতসা)	৮১০-৮১৭	(১)৮১২ (২)৮১৬
২। জেলালউদ্দীন	৮১৭-৮৩৪	(১)৮১৮(২)৮২১ (৩)৮২৩(৪)৮৩১
৩। মোজাহিদ	৮৩৪-৮৫০	৮৩৬

রাজা কংশনারায়ণ ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেন। ১৪৪৫ অব্দে তদীয় পৌত্র মোজাহিদ সার মৃত্যু হয়। সুতরাং এই বংশের রাজত্বকাল সর্ব্বশুদ্ধ ৪০ বৎসর। ‘রিয়াজ’ বিদ্বেষবশতঃ রাজা কংশের যতই কেন কলঙ্ক রটনা না করুন; তিনি যে অপক্ষপাতে রাজ্য শাসন করিয়া হিন্দু মুসলমান উভয়েরই প্রিয় হইয়াছিলেন „ ফেরেস্তা প্রভৃতির গ্রন্থে তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

প্রতাপসিংহ।

(৪র্থ সংখ্যা, ১৮০ পৃষ্ঠার পর।)

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সমরসঙ্গিনী।

দিবসত্রয় মধ্যে শৈলম্বররাজ তিনসহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। সেই সকল সৈন্য সঙ্গে লইয়া সম্প্রতি অমরসিংহ কমলমর যাইবেন স্থির হইল; পরে আরও যত সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারে তত্তাবৎ সঙ্গে লইয়া স্বয়ং শৈলম্বররাজ মহারাণার পতাকানিয়ে উপস্থিত হইবেন কথা হইল।

সন্ধ্যা সময়ে কুমার অমরসিংহ শৈলম্বর রাজ-প্রাসাদের একতম প্রকোষ্ঠে বসিয়া অদৃষ্টের পরিণাম বিষয়ক দুর্জ্ঞেয় চিন্তায় নিবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে কুমারী উর্ম্মিলা সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পদাশ্রিত নূপুর-শিঞ্জনে অমরসিংহের চিন্তাস্রোত ভাঙ্গিয়া গেল। উর্ম্মিলা জিজ্ঞাসিলেন,—

"যুবরাজ! তুমি—অঁ্যা—আপনি কি কল্যই কমলমর যাইবেন?"

যুবরাজ কহিলেন,—

"কুমারি! তুমি আমাকে আত্মীয়বৎ সম্ভাষণ করিতে করিতে নিরস্ত হইলে কেন? তুমি আমার সহিত সমান ভাবে কথা না কহিলে আমি তোমার প্রশ্নের কোনই উত্তর দিব না।"

লজ্জাসহকৃত হাস্যসহকারে উর্ম্মিলা কহিলেন,—

"আপনার সহিত আত্মীয়তায় লাভ কি? আপনি যেরূপ কার্য্যসাগরে মগ্ন, তাহাতে যেই নয়নান্তরালে যাইবেন, সেই হয়তো সমস্তই ভুলিবেন।"

অমরসিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"যাহার অসি শত বীরবধে পরাঙ্মুখ নহে, যাহার সাহসের তুলনা নাই, তাহার এ আশঙ্কা শোভা পায় না। কুমারি! তোমার কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইতেছে।"

কুমারী বলিলেন,—

"অসির ক্ষমতা দেহের উপর; হৃদয়ের উপর তাহার কখনই অধিকার নাই। যাহার হৃদয় মাতিয়া উঠে, তাহাকে কাহার সাধ্য নিরস্ত করে? যুবরাজ! কে জানে আপনার হৃদয় আমার অসমক্ষে গিয়া কি ভাব ধারণ করিবে?"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"আমার তো হৃদয় নাই।"

কুমারী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"তবে এ সমরায়োজন কেন? যে বীরের হৃদয় নাই, সে কখন দেশের উপকার করিতে পারে না। যুবরাজ! তবে আর কমলমর গিয়া কি হইবে? আপনি নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করুন। হৃদয়হীন

ব্যক্তির দ্বারা দেশের কোনই উপকার সম্ভাবিত নহে।”

“তোমারকথা যথার্থ; কিন্তু আমার যে হৃদয় ছিল না, অথবা এখনও নাই, এমন নহে। তবে আমার সে হৃদয়ের উপর আমার আর এখন কোনই আধিপত্য নাই।”

“একি কথা, রাজ পুত্র?”

“কথা মিথ্যা নহে। যে সুন্দরীর মধুমাখা কথা শুনিতে শুনিতে এখনও আমি জগৎসংসার সকলই ভুলিতেছি, আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয় সম্পূর্ণরূপে সেই ভুবনমোহিনীর বাসনা ও আজ্ঞার অধীন হইয়াছে; সুতরাং এ হৃদয় এখন আর আমার নহে।”

উর্ম্মিলা মস্তক অবনত করিলেন।

অমরসিংহ ধীরে ধীরে নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

“উর্ম্মিলে! কল্যই কমলমর যাইব স্থির করিয়াছি, তুমি কি বল?”

কুমারী নীরবে রহিলেন, যুবরাজ পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—

“যাওয়ায় কি তোমার আপত্তি আছে?”

উর্ম্মিলা দীর্ঘ নিশ্বাস সহ বলিলেন,—

“না; আজি কালি আমাদের যেরূপ সময় তাহাতে এক মুহূর্ত্তও অন্য মন হওয়া বিধেয় নহে। আমাদের রাজ্য নাই, ধন নাই, মান নাই; আমাদের গৃহ নাই, ভক্ষ্য নাই, আশ্রয় নাই—আমাদের দ্বারে প্রবল শত্রু উপস্থিত, এ সময় আমাদের হাসি ভাল দেখা যায় না। কে জানে যুবরাজ! কখন যবন উদয়পুর আক্রমণ করিবে। এদারুণ সময়ে আমাদের অন্য চিন্তার অবসর থাকা অনুচিত।”

কুমার অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—

‘কর্ত্তব্য সাধনে ভ্রমেও কাতর হইব না ইহা স্থির। কিন্তু কতদিনে যে এযুদ্ধবিগ্রহের শান্তি হইবে তাহার স্থির কি? আমাদের অদৃষ্টে কি আছে তাহাই বা কে জানে? যাহাই হউক উর্ম্মিলে! আমার হৃদয় অধুনা দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়াছে। তোমার সাহস, স্বদেশানুরাগ ও তেজ আমার স্বাভাবিক উৎসাহ শতগুণে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছে। যখন রণসাগরে নিমগ্ন থাকিব এবং যখন আমার খরধার অসির আঘাতে রাশি রাশি যবনমুণ্ড বৃন্তচ্যুত ফলের ন্যায় ভূপতিত হইবে ও তাহাদের কণ্ঠ নিঃসৃত রুধিরধারা উৎসের ন্যায় আমার পদনিম্নে পড়িয়া আমাকে অতুলানন্দে ভাসাইবে তখন তোমার এই জগন্মোহিনী মূর্ত্তি ইষ্টদেবীর ন্যায় আমার হৃদয়বেদীতে আবির্ভূতা হইয়া আমাকে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করিবে। যখন দুরন্ত যবনের অপবিত্র খড়্গ আমার অজ্ঞাতসারে মস্তকোর্দ্ধে উত্থিত হইয়া আমাকে জীবন বিহীন করিতে চেষ্টা করিবে, তখন, উর্ম্মিলে, তোমার এই স্বর্গীয় মূর্ত্তি আমাকে ইষ্টকবচের ন্যায় সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবে।’

উর্ম্মিলা বাধা দিয়া বলিলেন,—

‘আর, যুবরাজ! যখন যবন-যুদ্ধে আপনি ঘোর ক্লান্ত হইয়া সহায়তার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, তখন কি এদাসী আপনার শ্রীচরণে বাস্তবিকই উপস্থিত থাকিবে না। তখন কি এহতভাগিনী আপনার হস্তভ্রষ্ট অসি, স্থানভ্রষ্ট তূণ, বিচ্ছিন্ন কবচ যথাস্থানে পরিস্থাপিত করিবে না। এ

অভাগিনী কি তৎকালে সমীপে থাকিয়া আপনার অমোঘ-পরাক্রম-নিহত যবনের সংখ্যা একটিও বাড়াইবে না?'

সবিস্ময়ে অমর কহিলেন,—

'ঘোর যবনযুদ্ধে, তুমি আমার সহায়তা করিবে? ধন্য তোমার সাহস!'

ঊর্ম্মিলা অশ্রুজ্জললোচনে কহিলেন,—

'কি যুবরাজ! আমি যবনসংগ্রামে যাইব না? গৃহে বসিয়া সুখ-পর্য্যঙ্কে শয়ান থাকিয়া আপনার বিপদ সমস্ত কল্পনার চক্ষে দেখিব, তথাপি স্বয়ং তাহার প্রতিবিধানার্থ দেহের একবিন্দুও রক্তপাত করিব না, এ কি কথা কুমার?'

অমরসিংহ বলিলেন,—

'ঊর্ম্মিলে! আমি অনুরোধ করিতেছি এ ভয়ানক বাসনা পরিত্যাগ কর।'

ঊর্ম্মিলা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একজন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল শৈলম্বররাজ কুমারকে স্মরণ করিতেছেন। কুমারকে অগত্যা প্রস্থান করিতে হইল। তাঁহাকে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ কুমারী অতৃপ্তনয়নে সেই স্কন্দারি সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলেন। তিনি অদৃশ্য হইলে কহিলেন,—

'এ অনন্ত সুখের তুলনা নাই। এ সুখের গতি কি অব্যাহত থাকা সম্ভব? জগতে কে কবে অবিশ্রান্ত সুখ সম্ভোগ করিয়াছে? যে রাজবারার কল্যাণ কামনায় আমি এই অসীম সুখরাশি বিসর্জ্জন দিতেছি, কে জানে সে রাজবারার কি হইবে? কে যেন আমায় বলিতেছে রাজবারার মুক্তি দূর—দূর—অসম্ভব। কি, এ পুণ্যভূমির মুক্তি অসম্ভব? কে জানে ভবানীর হৃদয়ে কি আছে? আশা কে কবে ত্যাগ করিতে পারিয়াছে? আমরাই বা কেন আশা শূন্য হইব? কেন ভগ্নোৎসাহ হইব?'

জাতীয় প্রেমোন্মাদিনী বালিকা সেই স্থানে বসিয়া এইরূপ ভাবনায় নিবিষ্টা রহিলেন।

দ্বিতীয়খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হল্‌দিঘাট।

তামসী ভবিষ্যতের অন্তরতম প্রদেশে জাগতিক নিয়তির কি ব্যবস্থা পরিস্থাপিত আছে তাহা কে জানে? মানব, তুমি যে আশায় যে চিন্তায় সংসার সাগরে সাঁতার দিতেছ, কে জানে তাহার পরিণাম কি হইবে? যে আকাঙ্ক্ষায় মানব তুমি জলধির অতল জলে ডুবিতেছ কে জানে সে কার্য্যের কি পুরস্কার হইবে? বীরবর মহারাণা প্রতাপসিংহ ও তদীয় আত্মীয় ও অনুচরগণ যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইল না। জগদ্বিখ্যাত হল্‌দিঘাট-সমরে মহারাণার পরাজয় হইল।

সংবৎ ১৬৩২ অব্দের ৭ই শ্রাবণ! ভয়ানক দিন! ইতিহাসের সেই চিরস্মরণীয় শোণিতাক্ত দিন! সে দিন হল্‌দিঘাটে যে ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে?

উত্তরে কমলমর, দক্ষিণে পক্ষনাথ এই চত্বারিংশৎ ক্রোশ পরিমিত ভূখণ্ডের নাম হল্‌দিঘাট। স্থানটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরণ্য ও নির্ঝরিণী সমূহে পরিপূর্ণ। রাজধানীতে প্রবেশ করিতে হইলে গিরি-সঙ্কট অতিক্রম না করিলে উপায়ান্তর নাই।

এইরূপ স্থানে অদ্য দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুত সৈন্য সশস্ত্রে ও প্রফুল্লবদনে শত্রুর সমাগম প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভীল যোদ্ধৃগণ তীর, ধনুক অথবা প্রস্তরখণ্ডহস্তে পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান। অনেকে স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড এরূপে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে যে, সামান্য বল প্রয়োগ করিলেই তাহা ভূপতিত হইয়া বহুসংখ্যক বিপক্ষকে এককালে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিবে। সৈন্য সমূহের বদনে তেজ, উৎসাহ ও আনন্দের চিহ্ন বিদ্যমান। সকলেই শত্রু নিপাত করিতে দৃঢ়সংকল্প। উন্মুক্ত অসি, শাণিত শেল প্রভৃতি অস্ত্রসমস্তের উজ্জ্বলতায়,বীর-নয়ন-নিঃসৃত তেজে, পরিচ্ছদের চাকচিক্যে,অদ্য রণভূমি প্রদীপ্ত। পুরোভাগে স্বয়ং মহারাণা প্রতাপসিংহ বিশাল বক্ষ পাতিয়া যেন যবনের গতিরোধ করিবেন বলিয়া দণ্ডায়মান। তাঁহার মস্তকে শ্বেতছত্র। চৈথক নামক প্রভু পরায়ণ, অমিততেজ অশ্ব বীরবর প্রতাপসিংহকে বহন করিয়া রহিয়াছে। দারুণ উৎসাহে অশ্ব স্থির থাকিতে পারিতেছে না। তেজ-ভরে পৃথিবী বিদীর্ণ করিব ভাবিয়া নিয়ত পদনিম্নস্থ পর্ব্বত-শিলায় পদাঘাত করিতেছে; আঘাত হেতু পদনিম্ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহিরিতেছে। মহারাণার দক্ষিণ পার্শ্বে কুমার অমরসিংহ ও কুমার রতনসিংহ অশ্ব পৃষ্ঠে উপবিষ্ট। অমরসিংহের বদনের ভাব ঘোর চিন্তায় আচ্ছন্ন, রতনসিংহের মূর্ত্তি উন্মাদের ন্যায়। লোচন যুগল রক্তবর্ণ, বদন শ্রীহীন। অদ্য সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া এ হৃদয়হীন জগৎ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন ইহাই তাঁহার স্থির-সংকল্প।

রাজপুতকুলপালগণ অদ্য আপনাদের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারার্থে প্রাণপণ যুদ্ধ করিলেন। সে ঘোর যুদ্ধে রাজপুত বীরগণ যে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। রণকল্যাণী ভবানীদেবীর পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া যে রণসাগরে অদ্য রাজবারার ভূষণবৃন্দ সাঁতার দিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিস্ময়ে আপ্লুত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী যবনসৈন্যমণ্ডলী সংখ্যায় বিপুল, মুসলমান সৈন্যবৃন্দ হইতে নির্ণীত দক্ষগণ অদ্য এই যুদ্ধে উপস্থিত। স্বয়ং সাহারজাদা সেলিম তাহাদের অধিনায়ক। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন রণচতুর মহারাজ মানসিংহ ও সুপটু মহাবেত খাঁ তাঁহার দক্ষিণ ও বাম হস্ত। এরূপ প্রবলবল বিরোধী শত্রুমণ্ডলীর সহিত সমরে জয়াশা অসম্ভব। তথাপি পাঠক! একবার কল্পনা নেত্রে সেই শোণিতস্রোতঃপ্রবাহিত ভারতের পবিত্র ক্ষেত্র হল্‌দিঘাট সন্দর্শন কর; একবার দুইশত অতীত বর্ষ অতিক্রম করিয়া কল্পনাকে সেই চির-স্মরণীয় ঘটনার ধ্যান করিতে বল, একবার সেই হৃদয়মন বিহ্বলকারী, জীবনান্তক রণভূমির চিত্র মানস-মন্দিরে স্থাপনা কর; একবার সেই তেজ, উৎসাহ, আনন্দ ও আশা-পূর্ণ, যন্ত্রণা-চিহ্ন-বিবর্জ্জিত রাজপুত শবের বদন স্মরণ কর, আর পাঠক! যদি পার, তবে সেই সকল ভাবিতে ভাবিতে দুই বিন্দু অশ্রুপাত কর, তাহাতেও পুণ্য আছে, তাহাতেও শান্তি আছে।

প্রতাপের অদ্য কি উৎসাহ, কি উদ্যম, কি আনন্দ, কি অনুরাগ! পদতলে যবন-মুণ্ড বিলুণ্ঠিত হইতেছে, দেহ ও পরিচ্ছদ যবন-শোণিতে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। হস্ত-স্থিত অস্ত্র নিয়ত সম্মুখস্থ যবনশত্রুর বিনাশ সাধন করিতেছে, এতদপেক্ষা রাজপুত-কুল-ভরসার আর কি আনন্দ হইতে পারে? কিন্তু কোথায় মানসিংহ? সে ভ্রষ্ট, কুলাঙ্গার কোথায়? তাহাকে সমর-ক্ষেত্রে কর্ম্মোচিত পুরস্কার দিবার কথা ছিল, সে পাষণ্ড কোথায়? প্রতাপসিংহ একবার অস্ত্র সংযম করিয়া মানসিংহ কোথায় দেখিবার নিমিত্ত সমর-ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, অনেক দূর। রাশি রাশি শত্রু-সৈন্য ভেদ করিতে না পারিলে তথায় উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। এদিকে দেখিলেন, নিজ সৈন্য সংখ্যা নিতান্ত হ্রাস হইয়া উঠিয়াছে—জয়ের আশা নাই। তবে কেন শত্রু-নিপাত করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইব না? মানসিংহকে স্বহস্তে সমুচিত প্রতিফল দিব ভাবিয়া বীরবর প্রতাপসিংহ সজোরে ও সোৎসাহে বিপক্ষ পক্ষ ভেদ করিয়া মানসিংহের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না, হস্তি-সমারূঢ় সেলিম বাহাদুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিলেন, সেলিমকে দেখিয়া প্রতাপসিংহ স্বীয় উদ্দেশ্য ভুলিয়া গেলেন। প্রতাপের অমোঘ আক্রমণ কাহার সাধ্য সহ্য করে? একে একে সেলিমের শরীর-রক্ষাবর্গ ধরাশায়ী হইল, তখন সুশিক্ষিত চৈথক সম্মুখস্থ পদদ্বয় সেলিমের হস্তিশিরে উঠাইয়া দিল এবং প্রতাপসিংহ বর্শা ফলকে বাদশাহ-তনয়ের মুণ্ড বিদ্ধ করিবেন ভাবিয়া যেমন তাহা উত্তোলন করিলেন অমনি ভীত, কাতর, চালকহীন হস্তী পলায়ন করিয়া ভাবী ভারতেশ্বরের জীবন রক্ষা করিল। নচেৎ সেই দিন, সেই সমর ক্ষেত্রেই তাঁহার জীব-লীলার অবসান হইত; আকবরের উত্তরাধিকারীর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইত; ইতিহাসের পৃষ্ঠা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নাম বহন করিত না এবং নূরজাহানের ভাগ্যলতিকা মোগল মুকুটে জড়িত হইত না। সেলিম ভীত হস্তীর অনুগ্রহে নিষ্কৃতি পাইলেন বটে কিন্তু সেই স্থান মানব শোণিত স্রোতে ভাসিয়া গেল। ক্ষত-দেহ প্রতাপের সহায়তা করিবার নিমিত্ত রাজপুত সৈন্যগণ সেই দিকে ব্যস্ততা সহ উপস্থিত আর সেলিমের জীবন রক্ষার্থ মুসলমানেরা সেই স্থলে অগ্রসর, সুতরাং তথায় নরহত্যার সীমা রহিল না। সেলিমের হস্তী পলায়ন করিলে পর যবন মাত্রেরই প্রতাপকে নিপাত করাই প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া জাতি-মান রক্ষা প্রতাপের জীবন রক্ষা করাই তখন হিন্দুরা প্রধান ব্রত করিয়া তুলিল সুতরাং যখন যে যে দিকে প্রতাপ সিংহ যাইতে লাগিলেন, তখন সেই সেই দিকে মানব জীবন ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় বিনষ্ট হইতে লাগিল।

রক্তাক্তকলেবর রতনসিংহ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। শরীর ক্ষত বিক্ষত, শোণিতাপচয় হেতু হস্ত পদ বলহীন ও বিকম্পিত, লোচন যুগল মুদিত-প্রায়। হস্ত তখনও অসি চালনা করি-

তেছে বটে, কিন্তু সে চালনা অনর্থক। সেই সময়ে কয়েক জন যবনযোদ্ধা আসিয়া তাঁহাকে ভীম রবে আক্রমণ করিল। অমর সিংহ দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়া বেগে সেইদিকে ধাবিত হইলেন, এবং অসাধারণ কৌশল সহকারে আক্রমণকারী যবনগণকে পরাভূত করিলেন। তখন ক্ষীণ ও বিকম্পিতস্বরে রতন বলিলেন,—

"ভাই! আমার শেষ প্রার্থনায় কর্ণপাত কর। অদ্যকার দিন আমার জীবনের শেষদিন হইতে দেও। আমার জীবন আর বাঁচাইও না।"

অমরসিংহ জানিতেন, রতনসিংহের হৃদয় কেন সম্প্রতি এরূপ উদাসীন ভাব ধারণ করিয়াছে। তিনি সোৎসুকে বলিলেন,—

"ভাই একি ভ্রান্তি? হৃদয়ের হতাশ প্রেমের যাতনা তুমি কি মিবারের শান্তিসুখ নষ্ট করিয়া প্রশমিত করিবে?"

রতনসিংহ প্রথমতঃ আকাশের দিকে পরে মহারাণার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—

"মিবারের স্বাধীনতা ও উন্নতি মহারাণার দ্বারাই সাধ্য। আমরা কাল সাগরে জল বুদ্বুদ মাত্র।"

এই সময়ে মহারাণা শত্রুবেষ্টিত হওয়ায় সেই দিকে তুমুল গোল উঠিল। অমরসিংহ ব্যস্ততা সহ সেই দিকে ধাবিত হইলেন, রতনসিংহও সেই দিকে যাইবার নিমিত্ত প্রযত্ন করিলেন, কিন্তু দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই তাঁহার কাতর দেহ কম্পিত হইয়া ভূপতিত হইয়া গেল। অমরসিংহ তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সেই উৎকণ্ঠা অধিকক্ষণ থাকিতে পাইল না। তখনই কিশোর বয়স্ক রাজপুত যোদ্ধা সযত্নে দুইজন ভীলদ্বারা রতনসিংহের বিচেতন দেহ উঠাইল এবং সাবধানতা সহ প্রস্থান করিল। অমর সিংহ যেন সেই কিশোর যোদ্ধাকে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক তিনি অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হৃদয়ে পিতার সাহায্যার্থে গমন করিলেন। ঘোর সমর-সমুদ্রে অমর সিংহ ঝাঁপদিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিক পরিমাণ যুদ্ধ করিতে হইল না। চারিপাঁচজন যবন যোদ্ধা তাঁহাকে বেষ্টন করিল ও অনবরত আঘাত করিতে লাগিল। অমর দেখিলেন সমস্ত রাজপুতেরা মহারাণার রক্ষা কার্য্যে ব্যস্ত এবং সমস্ত যবন তাঁহারই বিনাশ সাধনে চেষ্টিত। তাঁহার সাহায্যার্থ কেহই নাই। কেবল দেখিলেন, সেই কিশোর যোদ্ধা ঘর্ম্মাক্ত ও শোণিতাক্ত কলেবরে তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান ও কেবল মাত্র সেই ব্যক্তি যথাসাধ্য যত্নে শত্রু নিধনে নিযুক্ত। অমরসিংহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন,—শত্রু কয়জন নিহত হইল বটে, কিন্তু অমর সিংহও আর আপনার দেহ স্থির রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত ও চেতনা বিলুপ্ত হইতে লাগিল। তখন সেই কিশোর যোদ্ধা তাঁহার অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে পতনশীল চেতনাহীন দেহ বাহু পাতিয়া ধরিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় ভীলের সাহায্যে তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া গেল।

উন্মত্ত প্রতাপসিংহ অদ্য বাহ্যজ্ঞান বিরহিত। বার বার তিনি সজোরে বিপক্ষ সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অসাধারণ বীরত্ব সহকারে শত্রুক্ষয় করিতে লাগিলেন এবং আত্ম জীবনকে যৎপরো নাস্তি বিপদে মগ্ন করিতে লাগিলেন এবং বার বার রাজপুত বীরেরা প্রাণপণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনিল। প্রতাপের দেহ শোণিতাক্ত এবং আঘাত হেতু ক্ষত বিক্ষত। মুসলমানেরা বুঝিতেছে প্রতাপকে বিনাশ কবিতে পারিলেই সমরে জয়ী হওয়া যায়। রাজপুতেরা বুঝিতেছে মহারাণাকে রক্ষা করিতে পারিলেই সকল রক্ষা এবং তাহা হইলে কোন পরাজয়ই পরাজয় নহে। কিন্তু রাজপুত বীরেরা দেখিলেন, যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে মহারাণাকে রক্ষা করা অসম্ভব। মহারাণা স্বয়ং আত্মজীবনের প্রতি লক্ষ্য বা মমতা শূন্য অথচ তাঁহার পক্ষীয় সৈন্য বল এতই হীন যে তাহাদের চেষ্টায় তাঁহাকে রক্ষা করা সম্পূর্ণরূপে অসাধ্য। তখন স্বদেশ বৎসল, বীরভক্ত ঝালারাজ মানাহসিংহ বিপক্ষের জয়ধ্বনি, সৈন্যগণের কোলাহল, মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, অশ্বের হ্রেষারব, গজের গর্জ্জন ভেদ করিয়া প্রতাপসিংহের কর্ণে কর্ণে কহিলেন,—

"বীরবর! জগৎপূজ্য মহারাণা বংশের কেতন! আপনি এক্ষণে আমাদের একমাত্র ভরসা। আপনি বাঁচিলে মিবারের ভবিষ্যতের আশা আছে। এই যুদ্ধে যদি আপনার জীবন অবসান হয়, তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আশা ফুরাইবে। এক্ষণে তাহাই কি আপনার বাসনা?"

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রতাপসিংহ কহিলেন,—

"অদ্য কি জয়ের আশা নাই?"

গলদশ্রু লোচনে ঝালাপতি কহিলেন,—

"আশা বহুক্ষণ ত্যাগ করিয়াছি। কেবল আপনার আশায় এখনও সমরক্ষেত্রে আছি। আপনাকে বাঁচাইতে পারিলে শত্রু জয়ের অপেক্ষা অধিক লাভ মনে করি।"

"অমর, রতন, কোথায়?"

"সমরে পতিত হইয়াছেন, কিন্তু জীবন যায় নাই বোধ হয়। তাঁহাদের দেহ স্থানান্তরিত হইয়াছে।"

নিতান্ত হতাশ স্বরে প্রতাপসিংহ কহিলেন,—

"যদি অমরের বিনিময়েও যুদ্ধে জয় হইত, সেও ভাল ছিল। কিন্তু মিবারের—। এখন আমাকে কি করিতে বলেন।"

তখন প্রভুপরায়ণ ঝালারাজ হস্তদ্বারা মহারাণার পাদস্পর্শ করিয়া অশ্রুসমাকুললোচনে বলিলেন,—

"মহারাণা, এ দীনের এই শেষ প্রার্থনা অবহেলা করিবেন না। আমার প্রার্থনা ন্যায় কি অন্যায়, সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহার বিচার করিবেন না। আমি ভবদীয় চরণে অদ্য যে শেষ প্রার্থনা করিতেছি তাহা গ্রাহ্য করিতেই হইবে।"

মহারাণা বলিলেন,—

"স্বীকার করিলাম।"

মানাহসিংহ বলিলেন,—

"আমার প্রথম প্রার্থনা মহারাণাকে সমরক্ষেত্র ত্যাগ করিতে হইবে। আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা সম্প্রতি আমি যাহা করিব, মহারাণা তাহাতে আপত্তি করিবেন না।"

মহারাণা মানাহসিংহকৃত প্রথম প্রার্থনা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন;

বলিলেন,—

"তোমার দ্বিতীয় প্রস্তাব অবশ্যই গ্রাহ্য; কিন্তু তুমি কি আমাকে জীবিতাবস্থায় সমরক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বলিতেছ ?"

"নচেৎ কি ? মহারাণার জীবনই আমরা মিবারের স্বাধীনতা বলিয়া জানি। আপনি কি বিশ্বাস করেন, আমরা মিবারের স্বাধীনতা ধ্বংস করিতে অভিলাষী ?"

মহারাণা অধোবদনে রহিলেন। ইত্যবসরে মানাহসিংহ মহারাণার ছত্রধারীকে তাহার মস্তকে রাজচ্ছত্র ধরিতে আদেশ করিলেন, এবং নিজ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে দ্বিগুণ উৎসাহে চণ্ডিকার নাম উচ্চারণ করিয়া সমর সাগরে ঝাঁপ দিলেন। রাজচ্ছত্র দৃষ্টে মানাহসিংহকে রাজা মনে করিয়া মুসলমানেরা তাঁহাকে উন্মত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় আক্রমণ করিল।

মহারাণা প্রতাপসিংহ তখন একবার সুবিস্তৃত সমরক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার চক্ষু দিয়া কয় বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইয়া শোণিত রাশির সহিত মিশিয়া গেল। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মহারাণা কহিলেন,—'ভগবন্! এই কি তোমার বাসনা ? তবে আর কেন ? আর এ বিড়ম্বনা দেখিয়া কি কায ? যদি পরাজিত হইলাম তবে এ জীবনে কি কায ? কিন্তু জীবন বিসর্জ্জন দিলেই কি লাভ ? যদি আমার প্রাণের পরিবর্ত্তে মিবারের স্বাধীনতা রক্ষিত হয়, তবে কথায় কি কায ? যাহার ইচ্ছা সেই আমায় বধ করুক বা স্বয়ংই বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করি। মিবারের কি আশা ভরসার এই শেষ ? না, কখন না। প্রতাপ জীবিত থাকিতে মিবার অধীন ? না, না, না। তবে মরণে কি ফল ? না, মরিব না। মিবারকে এ দশায় রাখিয়া কদাচ মরিব না। এই লৌহ হস্তে করিয়া বলিতেছি, মাতঃ জন্মভূমি! তোমাকে এ দশায় রাখিয়া মরিব না। তোমার দুর্দ্দশা ঘুচাইবার পূর্ব্বে যদি আমার কাল পূর্ণ হয়, তবে যেন আমার আত্মা চিরকাল নরকমধ্যে প্রোথিত থাকে। হে দেবি! আমার সহায় হও। ভগবন্! আমার আশা পূর্ণ কর।" অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রতাপসিংহ চৈথককে বিপরীতদিকে গমন করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

প্রভুর জীবন রক্ষার্থ ঝালারাজের মন্ত্রণা সিদ্ধ হইল। রাজ ভ্রমে অসংখ্য মুসলমান সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সেই ঘোর সংগ্রামে প্রভুরাজের প্রাণ রক্ষার্থ মানাহসিংহ সদলবলে ইচ্ছায় প্রাণ ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে ঝালারাজ অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—

"ভগবন্ ভবানীপতি! প্রতাপসিংহকে রক্ষা কর। মিবারের লুপ্ত গৌরব তিনিই রক্ষা করিবেন।'

স্বদেশ বৎসল প্রভুপরায়ণ ঝালারাজের জীবন বিগত হইল। জগতে তাঁহার কীর্ত্তি

অতুলনীয়। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস অন্বেষণ করিয়া এরূপ মহোচ্চ মনের অতি অল্পই নিদর্শন পাওয়া যায়। ধন্য রাজবারা! ধন্য তোমার বীর সন্তান!

প্রতাপসিংহ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট হিন্দু সৈন্যেরাও সমর ত্যাগ করিল। দ্বাবিংশতি সহস্র সৈন্যের মধ্যে অষ্ট সহস্রের জীবন রক্ষিত হইল।

এইরূপে হল্‌দিঘাট সমরের অবসান হইল। কুরুক্ষেত্র সমরের পরে ভারতে হল্‌দিঘাটের ন্যায় মহারণ আর ঘটিয়াছিল কিনা সন্দেহ। কালচক্রনেমির আবর্ত্তনে বীরবর প্রতাপসিংহ অদ্যকার সমরে উর্দ্ধ হইতে অধঃস্থাপিত হইলেন। যে আশায় উন্মত্ত হইয়া এবং যে সাহসে বুক বাঁধিয়া ভারতীয় বীরেরা অদ্য সমরক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিলেন তাহার কিছুই সফল হইল না। কালসূর্য্যের অস্তগমন সহ অদ্য কাল যবন অমিতপ্রতাপ প্রতাপসিংহকে পরাজিত করিল। এসংসারে বিধাতার বাসনার কে অন্যথাচরণ করিতে পারে বা পারিয়াছে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চৈথক।

মহাবলশালী চৈথক প্রতাপসিংহকে লইয়া বায়ুবেগে প্রস্থান করিল। কেবল এক জন মাত্র অশ্বারোহী প্রতাপের পশ্চাদনুসরণ করিল। প্রতাপের সেদিকে লক্ষ্য নাই। তাঁহার হৃদয়ে তৎকালে যেরূপ চিন্তা ও যন্ত্রণাস্রোত প্রবাহিত, তাহাতে তথায় বাহ্য জগতের অপর কোন বিষয়েরই স্থান হওয়া অসম্ভব। বহুদূর আগমন করায় পর অনুসরণকারী চীৎকার করিল,—

"ওহে নীল ঘোড়ার সোওয়ার!" *

প্রতাপসিংহ অশ্ব থামাইয়া মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন অনুসরণকারী তাঁহারই ভ্রাতা সুক্তসিংহ। সুক্ত বহুদিন হইতে জাতীয় পক্ষ ত্যাগ করিয়া বাদশাহের আনুগত্য ও তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন; সুতরাং অধুনা তিনি মিবারের প্রধান শত্রু। কিন্তু বহুকাল পরে অদ্য তাঁহার দর্শন লাভ করায় প্রতাপের মনে স্নেহের সঞ্চার হইল। সুক্তসিংহ সমীপে সমাগত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। মহারাণাও অশ্বত্যাগ করিলেন। হিংসা, দ্বেষ, শত্রুতা বিরোধ তখন দূরে পলায়ন করিল। উভয় ভ্রাতা বহুকালের পর অদ্য আলিঙ্গন বদ্ধ হইলেন। উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন। প্রতাপসিংহ প্রথমে জিজ্ঞাসিলেন,—

'ভ্রাতঃ! শরীর ও মন ভাল আছে তো?'

সুক্ত ভাবিলেন প্রতাপসিংহ তাঁহাকে উপহাস করিয়া একথা জিজ্ঞাসিলেন। স্বজাতির মমতা ত্যাগ করিয়া যবনের সহিত মৈত্রী করায় শরীর ও মন ভাল না থাকিবারই কথা তাহা সুক্ত বুঝিতেন। তিনি ভাবিলেন প্রতাপ তাহাই লক্ষ্য করিয়া এই বাক্যদ্বারা পরিহাস করিলেন। তৎক্ষণাৎ মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। কহিলেন,—

"শত্রুর ভয়ে জীবন লইয়া মনুষ্য যখন পলায়ন করে তখন তাহার শরীর ও মন ভাল থাকে তো?"

এ তিরস্কার প্রতাপসিংহের পক্ষে অসহ্য।

* 'হো নীল ঘোড়েকা আসবার!'

তিনি একবার কটী সংলগ্ন অসিতে হস্তার্পণ করিলেন। আবার তখনই চিত্তবেগ সংবরণ করিয়া বলিলেন,—

'যাও সুক্ত—তুমি শত্রু ভাবে আমার সহিত সাক্ষাৎ কর নাই; আমিও তোমার সহিত বিরোধ করিতে ইচ্ছা করি না। জানিলাম, তোমার সহিত সৌহার্দ্য বিধাতার বাসনা নহে। প্রার্থনা করি তোমার সহিত ইহজীবনে আর সাক্ষাৎ না হয়।'

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া প্রতাপসিংহ অশ্ব উদ্দেশে গমন করিলেন। সুক্তসিংহও বিনাবাক্যব্যয়ে স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া সেলিম বাহাদুরের উদ্দেশে গমন করিলেন। বহুকালের পর প্রতাপসিংহের সহিত সাক্ষাতে সুক্তসিংহের হৃদয় ঘৃণা ও লজ্জায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সেই রাত্রে তিনি চিরকালের নিমিত্ত মুসলমান পক্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সমস্ত দিন দারুণ রৌদ্রের উত্তাপে, যৎপরোনাস্তি পরিশ্রমে, অস্ত্রাঘাত জন্য শোণিতক্ষয়ে চৈথক নিতান্ত কাতর হইয়াছিল। ঘর্ম্মে তাহার সমস্ত শরীর আপ্লাবিত, মুখেও পদসন্ধিস্থলে তুষারধবল ফেণরাশি সমুত্থত; বল্গার ঘর্ষণে মুখ হইতে, এবং অস্ত্রাঘাত হেতু দেহের অসংখ্য স্থান হইতে রুধিরধারা প্রবাহিত হইয়া চৈথকের শারীরিক শক্তির ধ্বংস হইয়াছিল। ক্রমে তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইতে লাগিল; দেহ কম্পিত হইতে লাগিল; পদচতুষ্টয় দেহের ভার বহনে অক্ষম হইয়া পড়িল। যন্ত্রণাপীড়িত চৈথক কাঁপিতে২ সেই প্রস্তরের উপর পড়িয়া গেল। প্রতাপসিংহ চৈথকের অনুসন্ধানে সেই স্থানে উপস্থিত হইলে চৈথক একটি অপরিস্ফুট যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনি করিল। প্রতাপ চৈথকের এই শোচনীয় দশা দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। চৈথক তখন সতৃষ্ণ ও কাতর নয়নে প্রতাপসিংহের প্রতি চাহিল। প্রতাপের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। চৈথক তাঁহার বিপদ বা সম্পদ, শান্তি বা বিগ্রহ সকল অবস্থাতেই প্রধান সহায়, ভরসা ও আনন্দ। কতবার এই চৈথক তাঁহাকে অপরিহার্য্য বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে! কতবার এই চৈথক তাঁহার জয়ের সহায়তা করিয়াছে! কতবার এই চৈথক অনাহারে, অবিশ্রামে নিরন্তর তাঁহাকে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে, বন হইতে বনান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে লইয়া গিয়াছে! কতবার এই চৈথক আত্মজীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া প্রতাপকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লম্ফ প্রদান করিয়াছে! যে চৈথক সঙ্গে থাকিলে প্রতাপসিংহ কোন স্থানেই আপনাকে সহায়শূন্য মনে করেন না; যে চৈথক প্রভুর নিমিত্ত গহন বন বা উত্তুঙ্গ শৈল, অগ্নিবৎ মরুভূমি বা বিশালকায়া নদী সর্ব্বত্রই অকুণ্ঠিত ভাবে বিচরণ করিত; যে চৈথক হস্তী বা ব্যাঘ্র, ভল্লুক বা মহিষ, ভীমকায় অজগর বা অস্ত্রধারী শত্রুসেনা—কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ করিত না, সেই চৈথকের আজি এই দুর্দশা! প্রতাপসিংহ চৈথকের মস্তক স্বীয় উরুদেশে স্থাপন করিলেন। চৈথক অতিক্লেশে একবার মস্তক উত্তোলন করিয়া কাতরতাব্যঞ্জক শব্দ করিল। তাহার নেত্র নির্গত কয়েক বিন্দু জল প্রতাপের অঙ্গে প-

ড়িল। প্রতাপসিংহ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

'আজি রাজ্যশূন্য, ধনজন শূন্য হইয়াও আমার এত ক্লেশ হয় নাই। চৈথক! আজি তুমি আমার বক্ষে শেল আঘাত করিয়া চলিলে।'

কথা যেন অশ্ব বুঝিতে পারিল। বাক্য কথনের ক্ষমতা থাকিলে সে যেন আজি কত কথাই প্রভুকে জানাইত। প্রতাপসিংহ চৈথকের মুখে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্ব প্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত একবার মুখ ফিরাইবার প্রযত্ন করিল। প্রতাপসিংহ তাহা বুঝিতে পারিয়া ঘুরিয়া বসিলেন। পুনরায় অশ্ব শব্দ করিল। আবার তাহার দেহ তর্ তর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মস্তক প্রতাপসিংহের উরুদেশ হইতে পড়িয়া গেল। আবার একবার শব্দ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। চির জীবন প্রভুর হিত চিন্তা করিয়া অদ্য চৈথক প্রভুর পার্শ্বে শয়ন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।* প্রতাপসিংহের প্রাণাধিক প্রিয়তর অশ্ব প্রাণশূন্য হইল। জগতে চৈথক তাঁহার প্রধান আদরের সামগ্রী। সেই চৈথকের বিহনে মহারাণার যারপর নাই ক্লেশ হইল। তিনি চৈথকের মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া উন্মত্তের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

* যে স্থলে চৈথক গতাসু হয় স্মরণার্থ তথায় এক চৌতারা নির্ম্মিত হইয়া আছে। তাহার নাম 'চৈথককা চবুতারা'। উহা জারোল নগরের নিকটবর্ত্তী।

শারীরক্রিয়া-তত্ত্ব।

(পঞ্চমখণ্ড, ৫৬১ পৃষ্ঠার পর।)

মনুষ্য নির্ম্মিত সকল কল অপেক্ষা মানবদেহের যন্ত্রকার্য্যে এই উৎকর্ষ আছে—ইহার আত্মনবীকরণ ও আত্মসংস্করণ শক্তি আছে। কোন এঞ্জিনের চক্র বা তোলকদণ্ড (Lever) মেরামত করিতে হইলে সমস্ত যন্ত্রব্যাপার বন্ধ করিতে হয়, কিন্তু শরীরের কোন ব্যাধিত, কুরুণ বা ক্ষয়প্রাপ্ত তন্তুর (Tissue) সংস্কার কার্য্য, মনোচিত সংস্কারক্ষম উপকরণ পাইয়া, জীবনী প্রক্রিয়া নির্ব্বাহের সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনিই সম্পন্ন হইতে থাকে। অপিচ, এই জীবন্ত যন্ত্রের এমনি বিচিত্র ক্ষমতা আছে যে যোগ্য যোজ্যতার, অর্থাৎ যে বস্তু যাহার উপযোগী তদুভয়ের পরস্পর মিলন-প্রবণতা যে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জন্মে, তাহার কতকগুলি দুর্জ্ঞেয় নিয়মানুসারে ভক্ষ্য বা ভেষজ দ্রব্য হইতে উপযোগী সংস্কারক বস্তু সকল আহৃত হইয়া যেখানকার সংস্কার আবশ্যক, সেই দেহকণ, বা সেই তন্তুতে প্রযুক্ত হয়; আবার অন্যদিকে অব্যবহৃত ও অকর্ম্মণ্য অংশগুলি আকৃষ্ট হইয়া, শরীর হইতে অপসারিত হয়; অথচ যন্ত্রব্যাপার স্থগিত হয় না, এবং যেটীর নি-

কোন কর্তৃত্বের কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না। ফলতঃ, নিজদেহের উপর মনুষ্যের এত অল্প-মাত্র কর্তৃত্ব আছে যে যৎকালে তিনি সংজ্ঞা শূন্য অবস্থায় থাকেন, তখনও জীবন রক্ষার্থ যেসকল প্রক্রিয়া একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাদের বিরাম হয় না। সুপ্তাবস্থায় কোন কোন ক্রিয়া স্থির ভাবে থাকে, কিন্তু এক-কালে রহিত হয় না। হৃদয় আঘাত করিতে থাকে, ধমনীগণ ধ্মাত হইতে থাকে, শোণিত প্রবাহিত হইতে থাকে, ফুসফুসদ্বয় ও বক্ষঃপ্রাচীর বিস্তৃত হইতে থাকে, ত্বক্ স্বিন্ন হইতে থাকে, নির্দ্দিষ্ট দেহকরণগুলি আবর্জ্জনা ত্যাগ করিতে থাকে। বাহিক কার্য্য সম্বন্ধে যেরূপ অপচয় আছে, আভ্যন্তরিক কার্য্যেরও পরিণাম স্বরূপ ও পরিমাণানুরূপ তাদৃশই অপচয় হইয়া থাকে। এই প্রকারে আমরা যে কোন দিক্ হইতে এই জটিল নরদেহ যন্ত্রের আলোচনা করি, দেখিতে পাই যে আমাদের জীবনরক্ষা করিতে হইলে, এবং সমুদয় জীবনী ক্রিয়াব সুস্থভাবে নির্ব্বাহ করিতে হইলে, উপচয় ও অপচয়েব—আহার্য্য ও বলের—তুল্যতা রক্ষা করা নিয়ত আবশ্যক। দেহের রচনা কার্য্যে যে সকল আঙ্গিক ও অনাঙ্গিক * পদার্থের সন্নিবেশ আছে, এবং উহাদিগের পোষণার্থ আমরা যে সমস্ত ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করি, এতদুভয়ের দ্বারা ঐ তুল্যতা রক্ষা হইয়া থাকে।

মানবদেহ অন্যান্য আঙ্গিক বস্তুর ন্যায় অঙ্গার, উদজান, অম্লজান, যবক্ষারজান এবং অল্প পরিমাণে ধাতব পদার্থে বিরচিত। যে মনুষ্য মধ্যম পরিমাণে (অর্থাৎ ১৫৪ পৌণ্ড) ভারি, তাহার শরীরে অঙ্গার ২১ পৌণ্ড; উদজান ১৪ পৌণ্ড; অম্লজান ১১১ পৌণ্ড; যবক্ষারজান ৩।। পৌণ্ড; ফস্ফর ১৮ পৌণ্ড কঠিনী (Calcium চূর্ণের মূল উপাদান) ২ পৌণ্ড; সোডা, পোতাস্, লৌহ, গন্ধক, হরিতাখ্য গ্যাস বিশেষ (Chlorine) এবং আর গুটিকতক মূলভূত † ৮ পৌণ্ড। কিন্তু ইহারা মূলভূতরূপে অধিগত হয় না, পরস্পরের সহিত সংযুক্তাবস্থাতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং শরীরের অভ্যন্তরেই পৃথগ্ভূত ও পুনঃ সংযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব এই চেতনা বিশিষ্ট কায়বিধানকে কেবল যে চলন্ত কল বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে এমন নহে, পরন্তু ইহাকে একটী রাসায়নিক কারখানা বলিলেও বলা যায়। এই কারখানায় দেহের ও দেহাহৃত বস্তু সকলের উপাদানভূত পরমাণু নিচয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে নিয়তই পরিবর্ত্তন হইতেছে; নিয়তই গ্যাস, দ্রব ও অদ্রব সমূহের রূপান্তর হইতেছে; নিরন্তর বিয়োগ ও সংযোগ, আকর্ষণ ও ব্যাকর্ষণ চলিতেছে। ইতিপূর্ব্বে যে আঙ্গিক

* যে সকল বস্তু উদ্ভিজ্জ ও জন্তু শরীর ভিন্ন প্রকৃতির অন্যত্র উৎপন্ন হয় না, রসায়নব্যবসায়ীরা তাহাদিগকে আঙ্গিক, ও তদন্য পদার্থকে অনাঙ্গিক আখ্যা দিয়া থাকেন। ইংরাজীতে যথাক্রমে ইহাদিগকে Organic ও Inorganic কহে।

† যে সকল পদার্থ রাসায়নিক ব্যবচ্ছেদ ক্রিয়া দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে বিশ্লিষ্ট হয় না, অথবা এ পর্য্যন্ত হয় নাই, রসায়নবেত্তারা তাহাদিগকে মূলভূত কহে। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Elements কহে।

ও অনাঙ্গিক পদার্থের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহারা নানাবিধ অনুপাতে সংমিশ্রিত হইয়া ৮৮ পৌণ্ড জল এবং ৬৬ পৌণ্ড ঘন দ্রব্য উৎপন্ন করে। ঘন বা অদ্রব গুলি পৌষ্টিকা, শ্বেতসারক, মেদ ও ধাতব, * এই কয় বর্গে বিভক্ত হয়। ১৫৪ পৌণ্ড ভারবিশিষ্ট সুস্থকায় মানবের দেহ পোষণার্থ পৌষ্টিকা ২০০০ গ্রেণ, শ্বেতসারক ৪৪০০ গ্রেণ, মেদ ১২০০ গ্রেণ, ধাতব ৪০০ গ্রেণ, এবং জল ৩৮,৫০০ গ্রেণ; অথবা প্রকারান্তরে এবং আর এক হিসাব অনুসারে মাংসকারক বস্তু ৪ ঔন্স, শ্বেতসার ১২ ঔন্স, নবনীত ও মেদ ৫ ঔন্স, শর্করা ২ ঔন্স, এবং খনিজ ১ ঔন্স—এই গুলির প্রয়োজন হয়। কিন্তু বয়স, লিঙ্গজাতি, আকার, কার্য্য, স্বাস্থ্য ও দেশ ভেদে এই পরিমাণের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। মনুষ্য যখন কঠিন পরিশ্রম করে, তখন তাহার বেশি খাদ্যের প্রয়োজন হয়; যে সকল কার্য্যে সমধিক পৈশিক চালনা হইয়া থাকে, তাহাতে যত যবক্ষারজানিক খাদ্যের প্রয়োজন হয়, একস্থানে বসিয়া যে সকল কার্য্য হয়, তাহাতে ততটা হয় না। বর্দ্ধিত নরনারী অপেক্ষা বর্দ্ধিষ্ণু বালক বালিকারা অধিকতর খাদ্যের আবশ্যকতা রাখে। কারণ ইহাদিগকে শুদ্ধ জীবন রক্ষা করিতে হয় না, অপিচ দেহের স্ফুরণ, বর্দ্ধন, শক্তিসঞ্চয়, এবং ক্রিয়া বিস্তার, এ সকলেরও উপায় করিতে হয়।

অতএব শরীরের উপাদানভূত মূলভূত সমূহের অন্যোন্য সংযোগ বিষয়ে কতিকতক কথা বক্তব্য। উদজান ও অম্লজান সংযুক্ত হইয়া জল উৎপন্ন করে; ইহা শরীর-রচনার এক প্রধান সাধন, এবং শারীর-ক্রিয়া সমূহের যথোচিত নির্ব্বাহ করণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ইহা সমস্ত তন্তুতে পরিব্যাপ্ত, বহির্ভাগ সকলকে আর্দ্র রাখে, ঘন খাদ্যকে দ্রাবিত করে, শোণিত রচনায় প্রচুর পরিমাণে সহায়তা করে, মূত্রসঙ্গে যে সকল আবর্জ্জিত কণিকা অপসারিত হইবে তাহাদিগকে দ্রবাবস্থায় ধারণ করিয়া রাখে, এবং ফুস্‌ফুস ও চর্ম্ম হইতে উদ্বমন অবস্থায় অতিরিক্ত উষ্ণতাকে বাহিরে বহনকরিয়া শরীরের তাপ প্রশমিত করে। প্রস্তুত, অর্থাৎ প্রাকৃতিক, জল বহুল পরিমাণে দেহ মধ্যে গৃহীত হইয়া থাকে, তদ্বিবেচনায় ইহার বিশুদ্ধতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক। পৌষ্টিকাবর্গ উৎপাদনে অঙ্গার, উদজান, অম্লজান ও যবক্ষারজান, এবং কচিৎ ঈষন্মাত্র ফস্‌ফর ও গন্ধক * সম্মিলিত হইয়া থাকে। উক্ত বর্গ প্রাণিশরীরে শ্লেষ্মবসিক (Colloidal) অর্থাৎ শৃঙ্গরস বা শিরিষের ন্যায় আটা আটা পদার্থ বিশেষ রূপে অবস্থান করে; শোণিতের শ্বেতবর্ণ, স্থিতিস্থাপক, আকারদ সৌত্রিকাতে * এই পদার্থ বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সন্তানিকা † নামক তন্তুলা আর একটি প-

* ইংরাজীতে ইহাদিগকে যথাক্রমে Proteid, Amyloids, Fat ও Minerals কহে।

* Plastic fibrine—শোণিতের নিম্নোপাদান সমূহের বিবরণ কালে ইহার বিশেষ অর্থ অবগত হইবে। ইহা শোণিতের উপাদান বিশেষ।

† Syntonin ইহা ক্ষান অর্থাৎ বিশুদ্ধ তি-

দার্থে গতিশীল পেশী সমূহ নির্ম্মিত। অপিচ শার্ঙ্গরস, অণ্ডশ্বেত * রূপে তরল অবস্থায়, আস্থিক বিধান সমূহের আংশিক উপাদান স্বরূপে অবস্থিতি করে; এবং জীবন্ত দেহের নৈসর্গিক তাপাংশ দ্বারা উহার তরলত্ব রক্ষিত হইয়া থাকে। আবার এই শার্ঙ্গরসিক পদার্থ 'জিলাটিন' রূপে চূর্ণ-ফস্ফরক † রূপী ধাতব বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া কঙ্কাল, উপাস্থি, আবরকত্বক্, পেশী ও পেশীতানক সমূহের আস্থিকাংশের নির্ম্মাণ করে। অন্তরঙ্গ (Viscera অভ্যন্তরস্থিত করণ) সমূহের আবরকত্বক্, চর্ম্ম—সংক্ষেপতঃ দেহের সমস্ত সক্রিয় বিধান গুলিই শার্ঙ্গরসিক। পৌষ্টিকা বর্গ প্রকৃতির অন্যত্রও প্রাপ্য, যথা ভক্ষ্যশস্য সমূহে 'গ্লুটেন' রূপে; পনীর ও দ্বিদল (দা'ল) শস্যে পানীর্য্য (Casein) রূপে, ইত্যাদি। ইহাদের সমস্ত গুলিই যবক্ষারজানিক, মাংসকারক, ও তন্তুপোষক। ইহাদের সকলেরই উৎপত্তিস্থান উদ্ভিদ্ মণ্ডল; জন্তুশরীরে কোন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত হয় না, অথবা কোন শিল্পজাত রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা একাল পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু তাহারা প্রাকৃতিক উদ্ভিদ্ বস্তু, এবং উদ্ভিদাকারে খাদ্যরূপে পরিগৃহীত হইলে জান্তব ভাবে পরিণত হয়। যবক্ষারজান ব্যতিরেকে, অঙ্গার, উদজান ও অম্লজান সম্মিলিত হইয়া শ্বেতসারক বর্গ উৎপন্ন করে। শ্বেতসার (Starch), দাক্ষিণিক *, শর্করা, ও গঁদ, এই সকল দ্রব্যে উক্ত যবক্ষারজান-রহিত যৌগিক বস্তু সন্নিবিষ্ট আছে। শ্বেতসারক বর্গ বলপ্রদ হইলেও, প্রধানতঃ উষ্ণতা প্রদ; কারণ এই যৌগিক পদার্থে অতিরিক্ত অঙ্গারাংশ আছে, ও তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা উত্তাপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। উপরি-উক্ত দ্রব্যগুলির মধ্যে প্রথমোক্ত অর্থাৎ শ্বেতসারের এই বিশিষ্টতা আছে যে উহা স্বীয় সহজ আকারে শোণিতে প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু তদর্থে শর্করারূপে পরিবর্ত্তিত হওয়ার আবশ্যকতা রাখে। এই পরিবর্ত্তন মুখ-লালার দ্বারা সম্পাদিত হয়; সে কারণে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যে অধিক পরিমাণে শ্বেতসার থাকে, তাহাদিগকে বিলক্ষণ রূপে চর্ব্বণ করা প্রয়োজনীয়। মেদও অযবক্ষারজানিক, এবং শক্তি ও তাপ উভয়-প্রদ, বিশেষতঃ শেষোক্তটি—এবং এ বিষয়ে শ্বেতসারক বর্গ অপেক্ষাও ক্ষমবান্,

সহ বলিয়া ইহার নাম সন্তানিকা দেওয়া গেল।

* Albumen ডিম্বের শ্বেতভাগ এই পদার্থের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া ইহাকে অণ্ডশ্বেত আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

† Phosphate of lime ইহা ফস্ফর ও চূর্ণ এই দুই পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হয়।

* (Dextrin) বা (British gum) ইহা শ্বেতসার দ্রবণীয়রূপে প্রস্তুত। রসায়নশাস্ত্রে আলোক রশ্মির প্রাকৃতিক গতি বিশেষকে মেরবায়ণ (Polarization) বলা যায়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ানুসারে এই পদার্থ প্রস্তুত হইবার সময়ে মেরবায়ণ-ক্ষেত্র (Plane of polarization) দক্ষিণাভিমুখে আবর্ত্তিত হয় বলিয়া ইহাকে দাক্ষিণিক আখ্যা দেওয়া গেল। (Dextrin) শব্দেরও ঐ ব্যুৎপত্তি।

কেন না তাপোৎপত্তি কার্য্যে উদজান ও অঙ্গার উভয়েরই ক্ষয় হইয়া থাকে। পরন্তু মেদ প্রাণি-তন্ত্রের আর একটি বড় গুরু প্রয়োজন সম্পন্ন করিয়া থাকে; ইহা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে মেদময় তন্তু বা চর্ব্বির আকারে সঞ্চিত হয়। এই চর্ব্বি সুস্থ শরীরের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, এবং উহার সঞ্চয়ের অভাব ব্যাধির লক্ষণ বা নৈমিত্তিক কারণ রূপে গণ্য হইতে পারে। সেই জন্যেই কোন কোন রোগে—যথা দুরস্থি (Rickets) ও ক্ষয় (Consumption)—কড্‌লিভার তৈল অথবা অন্য মেদ দ্রব্য স্বাভাবিক অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। দেহ-রচনায় যে সকল খনিজ দ্রব্য আছে, তাহারা পরিমাণে অপেক্ষাকৃত অনেক কম হইলেও, অনেকগুলি গুরু প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে, এবং দেহের বর্দ্ধন, স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অস্থির পার্থিব পদার্থ চূর্ণ-ফস্ফরক-রূপে অবস্থিত, এবং উহার পরিমাণ শতকরা চল্লিশ ভাগ; উহা কম হইলে (দুরস্থি রোগে যেমন হয়) অপর উপাদান জিলাটিন, অস্থি সংশ্লিষ্ট পেশী সমূহের সঙ্কোচন জন্য চাড় বহন করিবার উপযোগী সামর্থ্য বা দৃঢ়তা রাখিতে পারে না; তাহাতেই অস্থিগুলি নত ও বিরূপিত হইয়া পড়ে। শিশুদিগের হাঁটিতে শিখিবার উচিত সময়ে যদি অস্থিচয়ে ধাতু দোষ জন্য চূর্ণ ফস্ফরকের হীনতা থাকে, অথবা যদি তাহাদিগকে অযথা সময়ে, অর্থাৎ অস্থিগুলি উপযুক্ত সামর্থ্য প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, দাঁড় করাইবার কিম্বা হাঁটাইবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের জঙ্ঘা দেশ ধনুরাকৃতি হইয়া থাকে। "ব্যাগি" অর্থাৎ যবক্ষারো প্রয়োজনীয় উপাদান প্রদান করিতে পারে। সাধারণ লবণ স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক; উহার অভাবে পরিপাক ক্রিয়া স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হয় না, এবং উহার অব্যবহারে গুরুতর রোগ সকলের উৎপত্তি হয়। মানুষে এই একমাত্র ঘন খনিজ প্রাকৃতিক অবস্থায় গ্রহণ করিয়া থাকে। পৈশিক তন্তুর স্বাস্থ্য সংরক্ষার জন্য পোতাস প্রয়োজনীয়। শরীর কর্ত্তৃক ইহা টাট্‌কা শাক সব্‌জি হইতে আহৃত হইয়া থাকে, তাহাদিগেতে বিস্তর পরিমাণে পোতাস লবণ বর্ত্তমান থাকে। শাক সব্‌জি প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌ একবারে রহিত করিলে "স্কর্ভি" নামক কুষ্ঠ বিশেষ ও অন্যান্য রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এই সমস্ত বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে নানাবিধ ক্রিয়া সমন্বিত জীবনের সংরক্ষার্থ, গত্যাদি শক্তি সমূহের উৎপাদন, উত্তাপের বিকাশ, এবং ক্ষয় জন্য অভাবের পূরণার্থ, বিস্তর পরিমাণে খাদ্যের আবশ্যকতা। খাদ্য যথেষ্ট অথচ অনতিরিক্ত হইবে এবং উহা দেহতন্ত্রের প্রয়োজনের উপযোগী হইবে।

খাদ্যের প্রকার এক সমান হইবার দরকার নাই। মনুষ্য এরূপে সৃষ্ট যে প্রাণিমণ্ডলের ও উদ্ভিদ্‌ মণ্ডলের অশেষ বিধ প্রাকৃতিক উৎপন্ন আপন ব্যবহারে আনিতে পারেন। অথচ অধিক বৈচিত্র্যও অনাবশ্যক। খাদ্য যত সাদাসিদা হইবে, ততই শরীরের উপকারক। জীবনের প্রয়োজনীয়

দ্রব্যগুলি বিস্তীর্ণ রূপে বিতরিত আছে, এবং অতি সহজেই পাওয়া যায়; জীবনের বিলাস দ্রব্য সমূহে প্রায় রুচির অপকর্ষ সাধন করে ও জীবনী ক্রিয়া গুলির বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করে। সম্ভবতঃ, অশনের গুণ অপেক্ষা মাত্রার অল্পতাই ব্যাধি ও বিশৃঙ্খলার সমধিক কারণ-স্থলীয়—এবং "অশন" বলিতে ঘন, তরল ও বায়ব্য সমস্তই আমাদের অভিপ্রেত, যাহা কিছু ভুক্ত, পীত, বা শ্বসিত হয়। কিন্তু কি কি অশন হিত, এবং কি কি বা অহিত, তদ্বিষয়ে আমরা এস্থলে ঠিক্ ঠিক্ বিধান দিতে পারি না। (ক্রমশঃ)

সংসার-যাত্রা।

কৃষ্ণ-যাত্রা।

অনেক দিনের কথা। এক দিবস আপন বাটীতে বসিয়া সমবয়স্কগণসহ আমোদ প্রমোদ করিতেছিলাম, এমন সময় মা আসিয়া বলিলেন, "তুমি নিতান্ত অসার, এত বড় হইলে 'সংসারযাত্রা' কিরূপে নির্ব্বাহ হয় একবারও ভাবিয়া দেখ না।"

কথাটি আমার হৃদয়ে লাগিল। বন্ধুগণ বিরস বদনে ফিরিয়া গেলেন। আমি গালে হাত দিয়া ভাবিতে বসিলাম।

নিম্ব, চিরতা, কুইনাইন, ভর্ৎসনা আর ভাবনা, এই পাঁচটি ফল কোন্ বৃক্ষে জন্মে? যে বৃক্ষেই জন্মুক না কেন যদি আমার বাড়ীতে ঐরূপ গাছ আত্মজাও হয়, আমি উপাড়িয়া ফেলি। ইহার একটি ফলও আমি ভালবাসি না। আর কি কহিব, মনে হইলে হৃদয় ফাটিয়া যায়, মা—স্নেহময়ী, তিনিই আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্বাদ ভাবনাফলটি খাইতে দিলেন।

ভালবাসি না, কিন্তু মাতৃ-আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করা যায় না, খাইতে আরম্ভ করিলাম। গলাধঃকরণই দুঃসাধ্য, আর জীর্ণ করা এমনই কঠিন যে মার বাবারও সাধ্য নাই। যে জীর্ণ করিতে চাহিবে, সেই জীর্ণ হইবে। হরি হরি! এ বড় আশ্চর্য্য ফল!

প্রথম ভাবিলাম, এই এত বড় দেশ, এদেশে দশজনে কিরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। দেখিলাম রাম, যদু, কালু সকলেই বিবাহ করিয়াছে, সকলেরই সন্তান সন্ততি আছে। তখন আমার ধারণা হইল সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের অর্থ বিবাহ করা এবং সন্তানোৎপাদন *। মা আমাকে বিবাহ করান নাই কেন? আমি যে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহে অক্ষম সে দোষ কি আমার?

আবার ভাবিলাম, তাহা হইলে মা আমার উপর দোষারোপ করিতেন না, নীরব থাকিতেন। 'সং—সার—যাত্রা'। আমিত অসার, মা আমার বলিয়া রাখিয়াছেন।

* বক্তৃতা করা বুঝি ভুলিয়াছ? প্রধানটির নামই মনে থাকে না? মূর্খ!

শ্রীকৃষ্ণ দাস।

তবে যাত্রার দলে সংসাজিলেও আমারদ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইল না, বরং সমসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে।

আমি বড় তেজস্বী। কোন অপমানের কারণ হইলেই সংসার পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে কাশীবাসী হই। মনে মনে এক বার ঐরূপ বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়াছিলাম, তখন ভাবনা কলটি বিশ্বেশ্বরের মস্তকে অর্পণ করিয়া আসিয়াছি। পুনরায় তাহা গ্রহণে আমার অধিকার? খাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম কিন্তু মনে হওয়া মাত্র 'তোবা' করিয়া দূরে ফেলিয়া দিলাম।

বসিয়া আছি এমন সময় দূর হইতে 'নন্দের গোপাল' 'যশোদা' 'কৃষ্ণ' প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম কোন স্থানে কৃষ্ণযাত্রা হইতেছে। আমি এক যাত্রা লইয়া ব্যস্ত ছিলাম তাহার মধ্যে আর এক যাত্রার আবির্ভাব। শয়ন করিয়া একতানমনে গানের যখন যে অংশ শুনা যায় শুনিতে লাগিলাম। তখন স্বপ্নে বা জাগ্রত স্বপ্নে, স্মরণ হয় না, আমি সংসার-যাত্রা ও কৃষ্ণযাত্রা এতদুভয় মধ্যে এত সাদৃশ্য, সাদৃশ্য কেন ঐকমত্য দেখিলাম যে একটিকে অন্যটি হইতে বিভেদ করা যায় না।

কৃষ্ণযাত্রা কি? কৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত, দেবকী গর্ভে জন্ম হইতে নিম্বমূলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর অভিনয়, রাধাকৃষ্ণের প্রণয়, বিরহ, মান, মিলন। সংসারযাত্রা কি? মনুষ্যের জীবনবৃত্তান্ত এবং তাহার প্রত্যেক অধ্যায়ের ঘটনাবলীর বিবরণ। এক্ষণে এই দুইটি একরূপ কি না তাহাই দেখিতে হইবে।

দৈবকীগর্ভে বসুদেবের ঔরসে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। কৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র, গাঢ় অন্ধকার রজনীতে তাঁহার জনক তাঁহাকে রক্ষা করিতে স্থানান্তরে লইয়া চলিলেন, সদ্যপ্রসূত শিশু নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হইল, এবং নন্দের ভবনে আশ্রয় লাভ করিল। মনুষ্যও দৈবকী ও বসুদেবের সন্তান;—প্রকৃত পুরুষ পরমেশ্বরের ইচ্ছাযোনিতে তাহার উৎপত্তি। গাঢ় অন্ধকার-পরিবৃত অপরিজ্ঞাত অপর পার হইতে এপার আসিয়া সংসার নন্দভবন বা আনন্দভবন জ্ঞানে আশ্রয় ও বিশ্রাম লাভ করে।

কৃষ্ণের প্রথম জীবনে গোচারণ, গোস্বামী নন্দের জন্য, তাঁহার গোপালন। ক্ষীর সর নবনীত নন্দের, যশোদার অসাক্ষাতে যখন গোপনে কিয়দংশ ভক্ষণ করেন তখন তিনি চোর। তাঁহার হস্তে রজ্জু বন্ধন। এখানে যে যাহা কর তাহাও গোচারণ। ক্ষীরসরনবনীত সমস্তই অন্যের জন্য; মনুষ্য অন্যগত প্রাণ, তাহার পৃথগস্তিত্ব নাই। 'আমি' ও 'আমার' শব্দ নিরর্থক। রাজা প্রজার, প্রজা রাজার; শিক্ষক ছাত্রের, ছাত্র শিক্ষকের; বিচারপতি প্রার্থীর, প্রার্থী বিচারপতির; পিতা পুত্রের পুত্র, পিতার গোপাল। গোপাল ঘরে ঘরে; সংসার গোপালপূর্ণ। *

এই সংসারে কোথায়ও রাজ বেশ, কোথায়ও গোপাল বেশ, কিন্তু একই ম-

* গো শব্দের এক অর্থ পৃথিবী, মনুষ্য পৃথিবী চারণ করে, অর্থাৎ সংসার চরাইয়া খায়। আর এক অর্থ স্বর্গ, মনুষ্য স্বর্গ চারণ করে। শ্রীকৃষ্ণ দাস।

ষ্য, একই কৃষ্ণ বিশেষ নাই। কৃষ্ণ কোথায়ও সরল সখ্যনিরত কোথায়ও কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম মন্ত্রণা-নিযুক্ত; কোন স্থানে চৈতন্যের সাজে বৈরাগী, কোন স্থানে কণিক, চাণক্য, বিসমার্ক, বিকন্সফিল্ড রূপে রাজনীতি-প্রণেতা। কিন্তু গুরু গিরি গোবর্দ্ধনের ভারে সংসারের সকল কৃষ্ণই নতশির।

কৃষ্ণ চক্রধর, মনুষ্যও চক্রী। কৃষ্ণের দ্বাদশ চক্র, মনুষ্যেরও দ্বাদশ রাশিচক্র— চক্রে চক্রে লোকের অদৃষ্ট ঘূর্ণায়মান। নররূপী কৃষ্ণ কালিয়াদহের কালিয়া দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া যেমন ছট্‌ফট্ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণরূপী* নরও সেইরূপ ভাগ্য-কংস-প্রণোদিত হইয়া সুখ পদ্ম উত্তোলন আশয়ে এই কালিয়াদহ সংসারে সন্তরমান এবং দুঃখ দংশনে জর্জ্জরিত।

কংসের শাসনে মনুষ্য অস্থির। ছলে বলে কৌশলে মনুষ্যকে অনুসরণ করিতেছে, তাহার বিনাশ সাধনে সর্ব্বদা সচেষ্ট আছে। বাতুলতারূপ মত্ত হস্তীর তাড়না, বিলাসিনীরূপ পুতনা রাক্ষসীর কৃত্রিম ও কপট কৌশল, এ সমস্তই ভয়ানক। সংসার বিমুক্ত যোগনিরত মহাপুরুষ পুতনা বধ করিতে এবং তাহার নিয়োজক কংসকেও হত্যা করিতে সক্ষম। তিনি অষ্টাদশ আক্রমণে সুখ-দুঃখ রূপ সংসারের জরাসন্ধকে পরাজয় পূর্ব্বক তাহার সিংহাসন অধিকার করিতে পারেন। তিনি তাহার বিনাশ সাধনোপায় জানেন। আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় সংসারে অবিচ্ছিন্ন সুখ দুঃখ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া তাঁহার পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়।

কৃষ্ণার্জ্জুনে বড় প্রণয়, ললনাগণ অর্জ্জুন। অর্জ্জুন কৃষ্ণ-প্রিয় ললনাগণও কৃষ্ণাপ্রিয় * অর্জ্জুন বিবাহ জন্য সুভদ্রা-হরণ করেন, তাহারাও পরিণয়ার্থ সুভদ্রাহরণে † প্রয়াসিনী।

তাঁহারা সরলা নামে প্রসিদ্ধ অতএব অর্জ্জুন, ফাল্গুনে বসন্ত বিহারিণী অতএব ফাল্গুনী; হৃদয়ে জয় বাসনা বলবতী বলিয়া জিষ্ণু; মনুষ্যের কিরীটরূপিণী সুতরাং কিরীটী, ‡ সুন্দরী বলিলেই শুভ্রবর্ণ বুঝায় অতএব শ্বেত বাহন §। তাঁহাদের বীভৎস কার্য্যে ভয় ও ঘৃণা আছে অতএব বিভৎসু ¶। স্ত্রীলোকের জয় স্বতঃসিদ্ধ অতএব বিজয়। কৃষ্ণের সহিত এক হৃদয় ব-

---

* সাধু সাধু। যথার্থ বুঝিয়াছ। শ্বেতরূপী হইলে সর্ব্বদা জ্যোৎস্না। শ্রীকৃষ্ণ দাস।

* কৃষ্ণ অপ্রিয় যার। শ্রীকৃষ্ণ দাস।

† সুভদ্র আহরণ। শ্রীকৃষ্ণ দাস।

‡ কোন কোন পণ্ডিতের মতে ঘোমটা কিরীট; কেহ কেহ বিবিধ টুপী কিরীট বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। আবার কেহ কেহ চুলের খোপাই কিরীট বলিয়াছেন। আমার মতে এই শেষোক্ত মত বিশুদ্ধ।

শ্রীকৃষ্ণ দাস।

§ শ্বেতবাহন এদেশীয় ললনাগণ কিনা এবিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। বিলাতের এবং ইয়োরোপীয় অন্যান্য ললনাগণকে ন্যায়তঃ শ্বেতবাহন বলাযায়।

শ্রীকৃষ্ণ দাস।

¶ কলহ বীভৎস বলিয়া কেহ কেহ ললনার নাম বীভৎসু বলেন। শ্রীকৃষ্ণ দাস।

লিয়া কৃষ্ণ *। সংসারের প্রয়োজন সাধনে লঘুহস্ত, দুই হস্ত সর্ব্বদা কার্য্যনিরত অতএব সব্যসাচী †। আর স্বামীর সমস্ত ধন জয় করিয়া বলেন অতএব ধনঞ্জয়। ‡ তাঁহাদের কুঞ্চিত ভ্রূ গাণ্ডীব, কটাক্ষ পাশুপত মহাস্ত্র, নয়ন তূণ, জিহ্বা-সঞ্চালন জ্যানির্ঘোষ। কিরাতরূপী পশুপতিও সে বাণে অস্থির, অথচ সন্তুষ্ট—

(কমপরমবশং ?)

কৃষ্ণ রাধামন্ত্রে দীক্ষিত, রাধাই তাঁহার জীবনের অবলম্বন, মনুষ্যের পক্ষেও ঠিক্ সেইরূপ। মনুষ্যের সর্ব্বস্বময়ী এ রাধা কে?

রাধিকা মুদ্রা। রাজার ঘরে তাঁহার জন্ম রাজার আনন্দবর্দ্ধন, রাজমস্তক গৌরবের সহিত ধারণ করেন, রাজচিহ্নে বিরাজমানা, রাধা রাজনন্দিনী। রাজার বুকের ন্যায় সুধা, ¶ অংশুর ন্যায় প্রতাপ, রাধা বৃকভানুনন্দিনী। মুদ্রা সকলে গোপনে সাবধানে লুকাইয়া রাখে—রাধিকা গোপিনী। আয়ান ঘোষ § তাঁহার প্রকৃত স্বামী, অথচ আবার তাঁহার উপর শক্তিশূন্য। রাধিকা গৃহে, বনে, যমুনাতটে, কুটিরে, প্রাসাদে, কদম্বমূলে, কৃষ্ণের সঙ্গে বিচরণ করেন, রাধিকা কলঙ্কিনী।

বাল্যকালের অজ্ঞানাবস্থা অতিক্রমপূর্ব্বক যৌবন সোপানারূঢ়া রাধিকা কেমন সুন্দরী, যেন স্বর্ণ প্রতিমা। * যখন কৃষ্ণ রাধিকার জন্য, রাধিকা কৃষ্ণের জন্য উন্মত্ত, যখন—
"কিমপি কিমপি মন্দং মন্দ মাশক্তিযোগা-
দবিরলিত কপোলং জল্পতোর ক্রমেণ।
অশিথিল পরিরম্ভ ব্যাপৃতৈক দেশোক্ষ
ববিদিত গত যামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ।" †

তখন নবকৃষ্ণ তাঁহার জন্য ব্যাকুল না হইবে কেন? স্বর্ণবর্ণমণ্ডিতা, স্বর্ণাভরণভূষিতা রাধিকা কৃষ্ণের প্রণয়িনী, বালসহচরী, রসময়ী সুখদা। বালার্কের সৌন্দর্য্যে যাহার নয়ন মন প্রীত হয়, রাধিকার সেই যৌবনের অনুপম লাবণ্যে তাদৃশ প্রীতি লাভ না করিবে কেন? এই সময় রাধিকা বিলাস-সামগ্রী।

যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থায়, বার্দ্ধক্যে রাধা সর্ব্বপ্রকারের প্রয়োজনসাধিনী। প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধা রাধা শুভ্রবর্ণা, সুধাময়ীকৌমুদীমণ্ডিতা সরলা। রাধা গৃহিণী—সর্ব্বদা গৃহকার্য্য সাধনে নিযুক্তা। তাঁহার রজতকণ্ঠ ‡

---

* হৃদয়ের কৃষ্ণত্ব কৌটিল্য লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ কৃষ্ণ বলেন। বলি এত নির্দ্দয় হইব কি? শ্রীকৃষ্ণ দাস।

† বিবাদে বামহস্ত অধিক চলে এজন্য সব্যসাচী। শ্রীকৃষ্ণ দাস।

‡ অভাগা স্বামীর পৃষ্ঠে প্রহারেণ ধনঞ্জয়। শ্রীকৃষ্ণ দাস।

¶ খাদ মিশিয়া এই জন্যই বুঝি ষোল আনা দশ আনা হয়? শ্রীকৃষ্ণ দাস।

§ আইন-ঘোষ বা ঘোষিত আইন। শ্রীকৃষ্ণ দাস।

* এবুঝি মোহরের কল্যাণ হইতেছে? শ্রীকৃষ্ণদাস

† লেখক! তুমিত বড় কৃপণ। রাত্রিকালে শয়নে থাকিতেও বুঝি মোহরের তোড়া নিকটে থাকে! স্বপ্নে আলাপকর নাকি? শ্রীকৃষ্ণদাস

‡ টাকাকে বৃদ্ধা বলিলে? সে কিসে? শ্রীকৃষ্ণদাস

সর্ব্বদা কৃষ্ণকে আয়ত্ত করিতেছে, কৃষ্ণের কর্ণবিবরে সুধা ঢালিতেছে। তখনও এ-কবার হাসিতে হাসিতে কোন লঘু প্রয়ো-জন সাধনে রাধিকা কচি বালিকা *; ক্ষণে অলকনন্দা †; ক্ষণে দ্বাদশবর্ষীয়া ‡। কিন্তু সর্ব্বদাই বিশ্বস্তা ধাত্রীর ন্যায় প্রয়োজন সা-ধিনী এবং প্রীতিময়ী।

অর্থশাস্ত্ররূপিণী রাধাসহচরী রাধাকে বারবার বলিতেছেন :—

"ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
নাম সমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদুবেণুং
বহুমনুতে তনু তে তনুসঙ্গত পবনচলিত-মপিবেণুং।
পততিপতত্রে বিচলতিপত্রে শঙ্কিত ভব-দুপযানং
রচয়তিশয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানং।
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলং
চলসখি। কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীল নিচোলং।"

আর কি রাজনন্দিনী বসিয়া থাকিতে পা-রেন। ঝনঝন শব্দ হইবে (নূপুরে ?) ভয়ে অতি মৃদুপাদবিক্ষেপে কৃপণে যেমন গো-পনে টাকাগণনা করে অন্যে শব্দ শুনিতে নাপায় সেইরূপ সতর্কতার সহিত বাহির হইলেন। পর্ব্বতের ন্যায় অন্তরায় তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না; আকরের ন্যায় অন্ধতম অন্দর হইতে বাহির হইলেন। একবার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে অন্যের অজ্ঞাতসারে জানি না-কিরূপে এদিক ওদিক অনুসন্ধান করিতে করিতে কৃষ্ণের অনুসারিণী হইলেন। তখন রাজনন্দিনীর তাদৃশ ব্যগ্রতা, তাদৃশ চাঞ্চল্য, তাদৃশ অনুসন্ধানপরতা দেখিলে নিশ্চয়ই বোধ হয় তিনি অধীরা হইয়াছেন, কিছুই ভাল লাগেনা। তখন রাধা

"নিন্দতি চন্দন মিন্দু কিরণ মনুবিন্দতি খেদ মধীরং, ব্যালনিলয় মিলনেনগরলমিব, কলয়তি মলয় সমীরং।"

আবার

"সরসমসৃণমপি মলয়জ পঙ্কং
পশ্যতি বিষমিব বপুসি সশঙ্কং
শ্বসিত পবন মনুপম পরিণাহং
মদন দহনমিব বহতি সদাহং।"

আহা! এরূপ প্রণয়ের তুলনা কোথায়? আহা একবার রাজনন্দিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখ, কেমন সুন্দর! একবার রজত-কণ্ঠ শ্রবণকর, কেমন মধুর! একবার স্পর্শ কর, কেমন শীতল!

তুমি কি মুদ্রা-রাধাকে কখনও কাঁদিতে দেখ নাই? না দেখিয়া থাক তুমি অন্ধ। কার্পণ্য জটিলা এবং প্রাচুর্য্য *. কুটিলা। ননন্দিনী দ্বয়ের কঠিনশাসনে রাধিকার য-থেচ্ছ বিচরণের স্বাধীনতা থাকে না। সর্ব্বদা

---

* হুরানি বুঝি? শ্রীকৃষ্ণদাস

† সিকি হইবে? শ্রীকৃষ্ণদাস

‡ আধুলী নাকি? শ্রীকৃষ্ণদাস

* যথার্থ কথা। সকল বস্তু ঘরে থা-কিলে কে পরদ্বার সর্ব্বনাশ করিতে যাইরে বাব? খেতের ধান, পালিত গাভীর দুধ, নিজ হাতে ধরা মাছ, আর নদীর জল, বড় মিষ্ট, অতিমিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণদাস

বাক্য যন্ত্রণায়, দিবানিশি কাঁদিতে কাঁদিতে * সে সোণারবর্ণ, সে রজতশুভ্র উজ্জ্বল বর্ণ কালো হইয়া যায়। ননদিনীর অজ্ঞাতসারে কখন কখন বাহির হইয়া কৃষ্ণের সহিত প্রেমালাপে প্রাণরক্ষা হয়, নচেৎ সর্ব্বনাশ হইত। তাহাহইলে তাঁহার স্বামী-গৃহই তাঁহার সমাধি মন্দির হইত সংশয় নাই। প্রয়োজন-সখী সহায় না হইলে কৃষ্ণ কি কথনও রাধিকার ন্যায় মূল্যময়ী ললনা লাভ করিতে পারিতেন?

রাধিকার আটটি সখী। রাজশ্রী (১) কৃষিসুন্দরী (২) চাকরীবালা (৩) শিল্পদর্শনা (৪) প্রয়োজনময়ী (৫) রণদেবী (৬) চৌরবতী (৭) ভালবাসা (৮)। এতদ্ব্যতীত একজন দূতী আছে নাম বাণিজ্যময়ী (৯)। রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের মনোরঞ্জনার্থ একদা অষ্টসখী সহ হস্তীর আকার ধারণ করেন (১০), তাহার চিত্র দর্শনে পুণ্য আছে, নাম অর্থশাস্ত্র।

অনুসন্ধানকর, সংসারে পরপুত্রে পুত্রবতী যশোদা অনেক দেখিবে। আজ দেখ কোন অপরিজ্ঞাত অনাদৃত বংশের রাখাল বেশী বাল-কৃষ্ণ কত নন্দের শূন্য সিংহাসন অধিকার করিতেছে, আর যাহার প্রকৃত স্বত্ব সে কৃষ্ণ রাধাপ্রেমে বঞ্চিত হইয়া পুনরায় রাখাল বেশে বিচরীমাণ!

পুণ্যাহই রাসযাত্রা। নাচের কিন্তু, পুণ্যাহ। যাহার যে দিন আমদানি বৎসরান্তে সেই সুখের দিনই পুণ্যাহ। * এই রাস চক্রে কি মনোহর মায়াকাননই রচিত। যে দিকে তাকাইয়া দেখ কেবল রাধাময়। আজ বনদেবীআশা মনের সুখে মনের সাধে কুঞ্জরচনা করিতে বসিয়াছেন:—

"ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়-
সমীরে,
মধুকর-নিকর-করম্বিত কোকিল কূজিত
কুঞ্জকুটীরে।"

আজ

'বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।'

কথনও তিনি রাধিকার

'রজনীজনিতগুরুজাগরকষায়িতমলসনি-
মেষং'

নিরীক্ষণে ভাবমোহিত। দুঃখ দুর্দ্দশা পরিপূর্ণ অতীত সময়ের সহিত বর্ত্তমান সুখের তুলনা করিয়া তিনি অধিক সুখী। যখন 'শ্বেতবরণী শ্বেতাভরণী' রাধিকা, সেই 'ভর্ত্তুর্বিরহবিধুরা ইন্দীবরাক্ষী' রাধিকা 'উন্মত্তেব স্খলিতকবরী নিঃশ্বসন্তী বিশালং তত্রৈবাস্তে মুররিপুরিতি ভ্রান্তিদূতীসহায়া ত্যক্ত্বা গেহং ঝটিতি যমুনা মঞ্জুকুঞ্জং জগাম' এবং সেখানে প্রাণবল্লভ প্রিয়তমকে না পাইয়া 'পদ্মাকারং মুরহরপদস্যাঙ্কচিহ্নং ददर्श'; আর তদনুসরণে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছি-

---

*"কত কেঁদে মরবিলো! শ্যাম অনুরাগে!
ভেবেছ কি যাবে দিন সোহাগে সোহাগে?"
শ্রীকৃষ্ণদাস

(১) ললিতা। (২) চিত্রা। (৩) চম্পকলতা। (৪) বিশাখা। (৫) তুঙ্গবিদ্যা। (৬) রঙ্গদেবী। (৭) সুদেবী। (৮) ইন্দুরেখা। (৯) বৃন্দাদূতী। এই সকল নামের সার্থকতা কি সহজেই উপলব্ধি হইবে। শ্রীকৃষ্ণদাস

(১০) নবনারী কুঞ্জর। কোন্ শাস্ত্রে পুণ্য লিখে? কিতাবে না কোরাণে? শ্রীকৃষ্ণদাস

* যে পায় তাহার পুণ্যাহ, যে দেয় তাহার পাপাহ। শ্রীকৃষ্ণদাস

লেন, সে মিলনে কি অপূর্ব্ব সুখ! আবার সেই কৃষ্ণই যখন রাধা প্রেমের ভিখারী হইয়া অকস্মাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হন সে মিলন কেমন সুখদ! * রাধিকার আশ্বাস পূর্ণ রজত-মধুর প্রণয় কণ্ঠে কৃষ্ণের হৃদয় কি তখন সুধাসিক্ত হয় না? লক্ষ্মীরূপিণী সেই রাধা-সহবাসে কি বৈকুণ্ঠবিলাস ভুলিয়া যান না? মুদ্রা-রাধা লক্ষ্মী। লক্ষ্মী লোলা, স্থির থাকেন না। তাঁহার সর্ব্বদা অতি দ্রুত চক্রাকারে পরিবর্ত্তন। মুদ্রারাধা প্রণয়পাগলিনী। তিনি সুখ, তিনি দুঃখ, তিনি আলোক, তিনি অন্ধকার, তিনি সম্পদ, তিনি বিপদ। তাঁহার আশ্বাসপূর্ণা মোহিনী মূর্ত্তি নবকৃষ্ণের হৃদয়-পদ্মে অঙ্কিত, তিনি কমলাসনে পদ স্থাপন পূর্ব্বক মনুষ্যের অদৃষ্টের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন, মুদ্রা দেবী কমলাসনা কমলা। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদ্বারে প্রবেশ করেন, সুতরাং তিনি বিষ্ণু-ললনা †। যাহার ঘরে তিনি বিরাজ করেন সে শ্রীমান্, রাধা শ্রীস্বরূপা, কৃষ্ণ শ্রীপতি।

লক্ষ্মীছাড়া কৃষ্ণের বড় দুর্দ্দশা। কৃষ্ণ দ্বারকায় রাজা হইয়া বরদার সিংহাসনে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অদৃষ্টে 'ফের' ঘটিল লক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল, কৃষ্ণ বন্দী। বৃন্দাদূতীকে রাধার প্রিয় সহচরী বাণিজ্যময়ী বিনিময়-সর্ব্বস্বা বৃন্দাদূতীকে কৃষ্ণ প্রথমে চিনিয়াও চিনিলেন না, পরে চিনিলেন, কিন্তু সমুচিত প্রতিফল পাওয়ার পূর্ব্বে নহে। যখন বাণিজ্যময়ী

"এখন আমায় চিন্‌বে কেন, ওহে কৃষ্ণ
রাজমণি!"

বলিয়া মনে মনে হাসিতে হাসিতে গম্ভীর বদনে 'বেয়নেট' কটাক্ষের সঙ্গে 'দাসখত' খানি দেখাইল, তখন কৃষ্ণ নতি স্বীকার করিলেন। বিনীত, নিস্তেজ, মলিনবেশে সেই লক্ষ্মীছাড়া কৃষ্ণ মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় ভদ্রভাব আবরণে আপাত-অদৃশ্য বন্ধনে * বন্দী ও নির্ব্বাসিত হইলেন। তখন কোথায় তাঁহার চক্র, কোথায় বা নারায়ণী সেনা। যদুবংশীয়গণ অবাক্! †

কৃষ্ণ রুগ্ন, মৃতকল্প। বাঁচিবার ভরসা নাই। কত সতীর পরীক্ষা হইল, কেহই শতছিদ্র-পাত্র জলপূর্ণ করিয়া আনিতে পারিল না। ঐ দেখ, রাধা অসাধ্য সাধন করিতেছেন, রাধাই সতী। রোগ নিবারণ, কলঙ্ক—রাধানামের কলঙ্ক ভঞ্জন হইল। মুদ্রারূপিণী রাধার অসাধ্য কোন কর্ম্ম আছে? জাতি, মান, যশ, সকলই রাধার বাধ্য, রাধার কলঙ্ক? রাজার আদরের ধন, রাজার সর্ব্বস্ব ময়ী, তাঁহার আবার অপবাদ? ‡ রাজার গৃহে § যাহার জন্ম, রাজার সম্মানে যাহার

* আমার বিবেচনায় সে কালের কৃষ্ণ একালে বলরাম। হেট্ শিঙ্গা, কোট্ শ্বেতাম্বর, ঠিক হল। ঐ হলের এমন গুণ যে, রেবতী পাগল হইয়া বাহির হন। কৃষ্ণদাসের এই সিদ্ধান্ত।

† বিশধাতোঃ প্রবেশনাৎ। শ্রীকৃষ্ণদাস

* প্রেম-ডোর নহে। শ্রীকৃষ্ণদাস

† কৃষ্ণ জীবনের এঅংশ নূতন মহাভারতের হইবে। এ শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ কোন্ প্রেসে ছাপা হয়? শ্রীকৃষ্ণদাস

‡ ঠিক। বড় লোকের কলঙ্ক কি? শ্রীকৃষ্ণদাস

§ টাকশাল কি? শ্রীকৃষ্ণদাস

মান, তাহার বিরুদ্ধে কথা? রাধমান, রাবমান!

'অহো! দুরন্তা বলবদ্বিরোধিতা।'

রাধা আদ্যাশক্তি, রাধাবিহীন জগৎ গতিহীন। একদিনের জন্য রাধাকে মানিনী হইতে দেও, কোন নিভৃত পর্ব্বত গুহায় পলাইয়া থাকিতে দেও, সংসার নিশ্চল হইবে। দৈবকী গর্ভে জন্ম অবধি নিম্বমূলে,—সংসারের দুঃখ-তিক্ত-জীবনের শেষ প্রান্তে,—ব্যাধিরূপী কালের শায়কে নিহত হওয়া পর্য্যন্ত রাধাই কৃষ্ণ জীবনের বল, একমাত্র শক্তি। সে শক্তির অভাব হইলে কৃষ্ণের আর সম্বল কি? এই, বিষয়ের তীব্রবিষ পুতনা-স্তন্য পান করিয়াও কেবল রাধার মহিমায় কৃষ্ণ জীবন ধারণ করেন।

সংসার কৃষ্ণময় *। কৃষ্ণবর্ণ পিপীলিকা † গুলিন যেমন সারি সারি বিচরণ করে, কৃষ্ণগণও সেইরূপ অহোরাত্র চলিতেছেন। কিন্তু এ বিচরণশীল কৃষ্ণগণমধ্যে রাধিকার প্রণয়বিচ্ছিন্ন একটিও নহে। যদি কৃষ্ণ বিরাগগ্রস্ত হইয়া শোকে, তাপে, দুঃখে, যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হৃদয়ে নির্জ্জনে থাকিতে চান, রাধিকা হাসিতে হাসিতে পার্শ্বে উপবেশন করেন, একবারে রসভরে হৃদয়ের উপর গড়াইয়া পড়েন। আর তাঁহার বিলোল কটাক্ষ এমনই মনোহর, প্রণয় এমনই সুখকর যে সমস্ত মনোবেদনা তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া যায়, প্রণয়িনীর দেবকান্ত রূপে নয়ন সন্তুপ্ত হয়।

রাধিকার মান বড় ভয়ঙ্কর, মিলন আবার তেমনই মনোহর। রাজনন্দিনীসহবাসে কৃষ্ণও রাজা। তখন কত সুরম্য প্রাসাদ শ্রেণী, সুরঞ্জিত বিলাসভবন, সুখের বৃন্দাবন, আনন্দধাম মথুরা। আর যখন সেই ক্ষীরব্ধিতনয়া কৃষ্ণের প্রতি বিরক্তা মানিনী, তখন সংসারের ক্ষীরসরনবনীতে তাঁহার অধিকার? সে সমস্ত আপনা হইতে সৌভাগ্যশীলের জন্য; খাইতে চাও, বন্দী হইবে। *

রাধা মানিনী হইলে হতভাগা কৃষ্ণের বড় দুর্দ্দশা। বলিতেছেন, 'জহিহি কোপং'

'বৃথা বৃথা মানিনি! তে পরিশ্রমঃ'

'মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরং';

'মৃদুনলিনীদলশীলিতশয়নে
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে।
জনয়সি মনসি কিমিতি গুরু খেদং
শৃণু মম বচনমনীহিতভেদং।
হরিরূপযাতু বদতু বহু মধুরং
কিমিতি করোষি হৃদয়মতি বিধুরং।'

তথাপি মান ভঙ্গ হয় না। কৃষ্ণ নয়নজলে আপ্লুত হইয়া হাহাকার করিতেছেন, তাঁহার

* লেখক! তুমি একটি বোকা। বলরাম বুঝি চক্ষে দেখেনা। তিনি, বলে, বিক্রমে কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বুদ্ধিতে বলরাম। রেবতীবল্লভ কথায় সরল। বর্ণে ধবল। তাঁহার হল তাড়নায় পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হইতে চায়, আর সহ্য হয় না। শ্রীকৃষ্ণদাস

† শ্বেত পিপীলিকা অধিক ভয়ঙ্কর। তাহারা গুড় চিনির পরিবর্ত্তে খায় মাটি, কিন্তু বিনা প্রয়োজন ব্যতীতও যাহা তাহা দংশন করে, সর্ব্বস্ব কাটিয়া নষ্ট করে।

* গৌর বিনে গৌরব কোথায়?

শ্রীকৃষ্ণদাস

হৃদয় জলিয়া যাইতেছে * কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে প্রসন্না করিতে নাপারিয়া রহিতেছেন, আর্ত্তনাদে সমস্ত সংসার জাগরিত ও আর্দ্র করিয়া অতি কাতরস্বরে কহিতেছেন।

'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরং।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরং।
প্রিয়ে! চারুশীলে! মুঞ্চময়ি মানমনিদানং॥'

রাধিকা তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণবৎ কঠিন হৃদয়া, তথাপিও মান পরিত্যাগ করিতেছেন না। তখন নয়নধারায় বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া করযোড়ে, গললগ্নবস্ত্রে, অবনত মস্তকে কৃষ্ণ বলিতেছেন :—

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।"

এইরূপ কঠোর সাধনায় সিদ্ধকাম কৃষ্ণ রাধিকা সহবাস সুখ সম্ভোগে সমর্থ। কিন্তু যে অভাগা বৈষ্ণবদাসের * ন্যায় নিরীহ 'বচন-চাটু' তে 'পটু' নয়, তাহার ভাগ্যে রাধিকার বচনসুধাপান কোথায়? সুখ কোথায়, মান-ভঞ্জন কোথায়? দেখ, বৈষ্ণব দাসের হাত দুইখানি বড় দুর্ব্বল, সাগর সিঞ্চনে শুষ্ক করিতে পারে না, রত্ন মিলিবে কেন?

ঐ যে একটি সৌম্যমূর্ত্তি যোগনিরত মহাপুরুষ সংসার হইতে দূরে অবস্থান করিয়া প্রফুল্ল; রাধিকা শত অনুনয়ে শত বিনয়ে যাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, যাঁহার ঈশ্বরনিরতনয়ন একবারের জন্যও উন্মীলিত করিতে সমর্থ হইলেন না, বৈষ্ণবদাস আজ অবধি তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ এবং তাঁহারই পার্শ্বে উপবেশন করিবে। ভ্রাতা গৌর দাস রাধাসহ অর্থকাম লাভ করুন, কিন্তু বৈষ্ণবদাস বাবাজী বিদায়। পুনরায় যদি রজনী প্রভাত হয়, আর পশ্চিমের সূর্য্য পূর্ব্বদিকে আইসে; যদি সমস্ত পাপ তাপের অবসান হয়, উদরান্নের জন্য সমস্ত জীবন পরিশ্রম করিয়া এখন যেমন উদরান্ন যোটে না, এ সময় যদি সাতসমুদ্রের অপর পারে,—যে স্থান হইতে আসিয়াছে সেই স্থানে,—চলিয়া যায়, তবে বৈষ্ণবদাস ফিরিয়া আসিবে; নতুবা জন্মের মত, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্তে বিলীন হওয়া পর্য্যন্ত, হয় ত অনন্ত কালের জন্য বিদায়।

ভাই গৌর দাস! ফিরিয়া যাও। হৃদয় বেদনা আর সহ্য হয় না, শিক্ষার বিড়ম্বনা, মর্য্যাদার তিরোভাব, বণিগ্‌বৃত্তির আবির্ভাব আর সহিতে পারি না, বিদায় হইলাম। মাকে বলিও, তোমার বৈষ্ণবদাস পুণ্যভূমিতে পুণ্যকার্য্যে চলিয়া গিয়াছে; সে যদি কখনও মার অবস্থা ভাল করিতে, ভাল দেখিতে পায় ফিরিয়া আসিবে, তাঁহার চরণের আশীর্ব্বাদ থাকিলে এক সময় অবশ্য ফিরিয়া আসিবে, 'কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।'

শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী।

---

* কুথায়? শ্রীকৃষ্ণদাস

* বৌদ্ধদাস হইলেই ক্ষতি কি? অহিংসা পরমধর্ম্ম, পরমার্থ ভিক্ষা, শেষ আশ্রম সন্ন্যাস। আহার নিরামিষ। শ্রীকৃষ্ণদাস

(কৃষ্ণদাস পূর্ব্ব জন্মে মল্লিনাথ বা শ্রীধর-স্বামী ছিলেন।)

বাঙ্গালার ইতিহাস।

Ill fares it with the nation that cannot find writers of genius to tell its own story. Prescott.

ক্ক সূর্য্য প্রভবো বংশঃ ক্কচাল্পবিষয়ামতিঃ
তিতীর্ষুর্দ্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্।
কালিদাস।

আমরা বাঙ্গালার ইতিহাস নয় খণ্ডে বিভক্ত করিব ; যথা—

প্রথম খণ্ড।—উপক্রমণিকা। বাঙ্গালার উৎপত্তি—ভূতত্ত্ব—ভূগোল বিবরণ —অধিবাসী—ভাষা—সামাজিক বিবরণ।

দ্বিতীয় খণ্ড।—অনার্য্য—শূদ্র ও আর্য্য-শাসনকাল। প্রাচীনকাল হইতে অশোকচন্দ্র (লাক্ষ্মণের) দেবের নবদ্বীপ পরিত্যাগ পর্য্যন্ত।

তৃতীয় খণ্ড।—অধীন পাঠান শাসনকাল। মহম্মদ বখতিয়ার খিলজির লক্ষ্মণাবতী অধিকার হইতে বেরামখাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত। (১২০৫—১৩৩৬ খৃঃ অঃ।) *

চতুর্থ খণ্ড।—স্বাধীন পাঠান শাসনকাল। ফকিরদ্দিন আবোল মোজাফর মৌবারক সাহের† সুবর্ণগ্রাম অধিকার হইতে গ্যাশোদ্দিন আবোল মহম্মদ সাহের মৃত্যু পর্য্যন্ত। (১৩৩৬—১৫৩৮ খৃঃ অঃ)

পঞ্চম খণ্ড।—সেরবংশ ও আফগানদিগের শাসনকাল। সের সাহের বঙ্গাধিকার হইতে দাউদের অধঃপতন পর্য্যন্ত। (১৫৩৮—১৫৭৬ খৃঃ অঃ)

ষষ্ঠ খণ্ড।—মোগল শাসনকাল।········· আকবরের বঙ্গবিজয় হইতে সরফরাজ খাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত। (১৫৭৬—১৭৪০ খৃঃ অঃ)

---

* বখ্তিয়ার কর্ত্তৃক বাঙ্গলা বিজয়ের অব্দ সম্বন্ধে পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আমরা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক রিজবর টোমাস সাহেবের মতানুসরণ করিলাম।

† কোনও কোনও প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফকিরদ্দিনের পরিবর্ত্তে ইলিয়স সাহকে বাঙ্গলার প্রথম স্বাধীন-পাঠান নরপতি লিখিয়াছেন।

সপ্তম খণ্ড।—নবাবী কাল।..............আলিবর্দ্দি খাঁর রাজ্যাভিষেক হইতে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। (১৭৪০—১৭৬৫ খৃঃ অঃ।)

অষ্টমখণ্ড।—ইংরাজ কোম্পানীর শাসনকাল। দেওয়ানী প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

নবমখণ্ড।—ইংরাজ রাজকীয় শাসনকাল।... ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে।

প্রথমখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

বাঙ্গালার উৎপত্তি ও ভূতত্ত্ব।

যে সময় সরস্বতী তীরস্থিত পর্ণকুটীরে দেবী সরস্বতী জন্মগ্রহণ করেন—যে সময়ে সরস্বতী ও দৃশদ্বতীর সৈকত ভূমি, ভূমণ্ডলে সভ্যতার সৃষ্টিকর্ত্তা মহর্ষিদিগের উঞ্ছ শস্যে ও ধর্ম্ম পরায়ণ আর্য্য ঋষিদিগের যজ্ঞ-যূপে সুশোভিত থাকিত—যে সময়ে সেই জগৎ পূজ্য আর্য্য বৃন্দের সামগানে পঞ্চনদ বিধৌত প্রদেশ বিমোহিত হইয়াছিল—সে সময় বোধ হয় বাঙ্গালা জলচরের বাসস্থান ছিল।

জাগতিক সৃষ্টির প্রক্রিয়া পর্য্যালোচনা দ্বারা অনুমিত হইয়াছে যে সর্ব্বাগ্রে নীরগর্ভ হইতে শৈল উত্থিত হয়। তৎপরে শিখর-মূল শুষ্ক হইলে ও পর্ব্বতোৎপন্ন নদী সমূহের সাগর সঙ্গমে, সমুদ্র-স্রোতে নদী-স্রোত বাধা প্রাপ্ত হইয়া মন্দীভূত হয়; তখন স্রোতস্বতী-প্রবাহিত বালুকা ও কর্দ্দমরাশি নদী গর্ভে সঞ্চিত হইতে থাকে; এই রূপে ক্রমে ক্রমে নদীর উপরিভাগ পর্য্যন্ত পূর্ণ, ও শিখর মূলে স্তরে স্তরে মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া—সমতল জলাভূমিসকল গঠিত হইতে থাকে। জলাভূমির জন্য প্লাবন বিশেষ উপকারজনক। জলপ্লাবন দ্বারা ইহা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

যুন ঐতিহাসিক কুলগুরু হিরোদতস্ মৈসরীয় প্রবাদ অবলম্বন করিয়া মিসর সৃষ্টি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'মীনরাজার শাসন-কালে থীবি ভিন্ন সমস্ত মিসর সলিল, কর্দ্দম ও বনাকীর্ণ ছিল, ম্যার নামক হ্রদের নিম্নে সলিল ভিন্ন অন্য কিছুই দৃষ্টি গোচর হইত না। ক্রমে থীবি, ইথোপিয়া প্রভৃতি প্রদেশস্থ শৈলমূলে মৃত্তিকা সংলগ্ন হইয়া ও নীল প্রবাহিত কর্দ্দম সঞ্চিত হইয়া (১) সুবিখ্যাত মিসর সৃষ্টির সূত্রপাত হইল। বিস্তৃত জলরাশি সঙ্কুচিত হইয়া নীলনদের অঙ্গ ক্ষীণভাবে গঠিত হইতে লগিল।' হিরোদতস্ বলেন—'এই রূপে দশ সহস্র বৎসর মধ্যে লোহিত ও ভূমধ্য সাগরের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।'

মিসিসিপী নদীর মোহনায়, সেই নদীপ্রবাহিত কর্দ্দম রাশিতে ১৩৬০০ বর্গ মাইল

---

(১) ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সদ্যুক্তি সঙ্গত প্রমাণদ্বারা, নীলবক্ষবাসিনী মিসরের কর্দ্দিক স্তরের বয়ঃক্রম ১৩৫২৩ বৎসরে নির্ণয় করিয়াছেন।

বিস্তৃত একটি দেশ গঠিত হইয়াছে। অসাধারণ ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত সার চার্লস্ লায়েল বলেন এই দেশটি ৬৭০০০ বৎসরে গঠিত হইয়াছে।

সুবিস্তীর্ণ বাঙ্গালার জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে। বাঙ্গালার পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম তিনদিকেই পর্ব্বত শ্রেণী বিস্তৃত রহিয়াছে। উত্তর দিকে সিকিম, ভোট ও খস গারো পর্ব্বত, পূর্ব্ব দিকে চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও কাছাড় পর্ব্বত, পশ্চিমে রাজমহল ও ছোট নাগপুর প্রভৃতি অনতি-উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশ। * এক সময় এই ত্রিসীমা মধ্যবর্ত্তী স্থান বঙ্গোপসাগরের অগাধ জলরাশি দ্বারা পূর্ণ ছিল। প্রবাদ অনুস যে রাজমহলের নিকটবর্ত্তী মন্দর গিরি দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনের মন্থনদণ্ড। ইহা সত্যযুগ বা বৈদিক কালের ঘটনা। আর্য্য ও শূদ্রদিগের প্রথম বিরোধকালে যে ঐ শৈলের পাদমূলে বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গাভিঘাত হইত এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে। শতপথব্রাহ্মণে লিখিত হইয়াছে —সদানীরা নদীর পূর্ব্বদিকে জল প্লাবিত স্থান। † কোষকার অমরসিংহ ও হেমচন্দ্র, করতোয়াকে সদানীরা লিখিয়াছেন। মহাভারতের বর্ণনা দ্বারা সরযূর পশ্চিমস্থ কোন

---

* অধুনা বঙ্গপ্রান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশ গুলি বাঙ্গলার অন্তর্গত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে সে গুলি চিরকাল স্বতন্ত্র ছিল। বিশেষতঃ এ অধ্যায়ে আমরা প্রকৃত বা সমতল বাঙ্গলারই বর্ণনা করিতেছি এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাঙ্গলার চতুঃসীমা সম্বন্ধে বিস্তারিত রূপে লিখিত হইবে।

† শত পথ ব্রাহ্মণে আর্য্যদিগের পূর্ব্বদিকে আগমনেরও একটু সুন্দর ঐতিহাসিক সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে 'বিদেঘ মাথবের মুখে অগ্নিছিল। গোতমোরাহুগণ ঋষি তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। পুরোহিত পুনঃপুন ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা (বীতিহোত্রংত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি। অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে বিদেঘেতি।) অগ্নিকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু অগ্নি তাঁহার বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না। পশ্চাৎ ঘৃতের নাম শ্রবণমাত্র বৈশ্বানর মাথবের মুখ হইতে বহির্গত হইলেন। অগ্নি সেই স্থান হইতে, দগ্ধ করিয়া পূর্ব্বদিকে যাইতে লাগিল। (বিদেঘ মাথব তখন সরস্বতী নদীতীরে বাস করিতেন।) গোতমোরাহুগণ ও বিদেঘ মাথব সেই দহনশীল অগ্নির পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। অগ্নি সকল নদী দগ্ধ করিলেন। তিনি (অগ্নি) গিরির (বোধ হয় গিরিব্রজ) উত্তর দিকস্থ সদানীরাকে দগ্ধ করেন নাই। সেই নদী বৈশ্বানর কর্ত্তৃক দগ্ধ হয় নাই বলিয়া, পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ তাহা অতিক্রম করিত না। কিন্তু অধুনা অনেক ব্রাহ্মণ তাহার পূর্ব্বতীরে বাস করিতেছে। অগ্নি সেই নদীর পূর্ব্বদিক দগ্ধ করেন নাই বলিয়া সেই স্থান অক্ষেত্র এবং জলপ্লাবিত রহিয়াছে। কিন্তু এইক্ষণ তাহা ক্ষেত্র হইয়াছে, ব্রাহ্মণগণ তথায় যজ্ঞ করিতেছেন। সদানীরা গ্রীষ্ম শেষে কোপিত হয় এবং অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয় নাই বলিয়া শীতল থাকে। বিদেঘ মাথব বলিলেন 'আমি কোথায় বাস করিব?' পুরোহিত বলিলেন 'ইহার

একটি নদী সদানীরা নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু শত পথ ব্রাহ্মণের বর্ণনা দ্বারা বর্ত্তমান গণ্ডকী ই সদানীরা অবধারিত হইতেছে।

আর্য্যদিগের আর্য্যাবর্ত্তে প্রথম পাদ বিক্ষেপ কালে যে মিথিলা জল-প্লাবিত ছিল, শত পথ ব্রাহ্মণই তাহার সাক্ষ্য। সে সময় সমস্ত বঙ্গদেশ জলপ্লাবিত ছিল।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের অনেক গুলি উপনদী আছে। এই সকল নদী বাঙ্গলার তিনদিকের পর্ব্বত সমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইতেছে। কিন্তু যে সময় সমতল বাঙ্গলা বঙ্গোপসাগরের গর্ভে নিহিত ছিল, সেই সময় সেই সকল নদী সাগরে আত্ম সমর্পণ করিয়া বাঙ্গলার কলেবর গঠন সম্বন্ধে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু সংক্ষেপতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের আনীত কর্দ্দম রাশিতে বাঙ্গলার জন্ম।

বাঙ্গলার উত্তর ও পশ্চিমাংশের সর্ব্ব প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সেই অংশের মৃত্তিকার সহিত বঙ্গীয় বদ্বীপের মৃত্তিকার কিয়ৎ পরিমাণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; বিশেষতঃ বাঙ্গলা উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে ক্রমে ঢালু হইয়া গিয়াছে। সমতল বাঙ্গলার উত্তর সীমান্ত, সমুদ্র হইতে প্রায় ৬৬১ হস্ত উচ্চ, বাঙ্গলার উত্তর ও পশ্চিম ভাগ নদীর সংঘাতে ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে গঠিত হইয়াছে। কিন্তু সমতল বাঙ্গলার অধিকাংশ বা বদ্বীপ কেবল নদীর দ্বারা কিরূপে গঠিত হইয়াছে, তৎপ্রদর্শনার্থ আমরা পণ্ডিত-প্রবর সার চার্লস লায়েলের গ্রন্থের * কিয়দংশের সার ভাগ এস্থলে উদ্ধৃত করিব।

সমুদ্রের প্রবল স্রোতের প্রতিবলে বদ্বীপ ক্রমশঃ তন্মধ্যে অগ্রসর হইয়া নিজের আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারে; তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বৃহৎ বদ্বীপের বিবরণ বর্ণনা করিব। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র জগতের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত হইয়া, ভারতের নিম্ন-সমতল ভূমিতে পরস্পর আংশিক ভাবে মিশ্রিত হইয়া অবশেষে বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হইতেছে। ভারতে এই দুইটি নদ ও নদীই সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু এতদুভয় মধ্যে ব্রহ্মপুত্র গঙ্গা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বৃহত্তর। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রহ্মপুত্র ঢাকার পূর্ব্বে মেঘনা নদীর সহিত মিলিত ছিল। মেঘনা ব-দ্বীপ-বিধৌতকারী স্রোতস্বতীসমূহের অন্যতর। রেনেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মূল ব্রহ্মপুত্রকেই এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান স্রোতটি সেই স্থান হইতে বহু দূর উজানে ও সমুদ্র হইতে প্রায় ১০০ মাইল দূরে পদ্মার † সহিত মিলিত হইয়াছে।

পূর্ব্বতীরে বাস কর।' সদানীরা কোশল ও বিদেহ রাজ্যের সীমা। আর্য্যদিগের পূর্ব্বদিক আগমনের প্রমাণ স্বরূপ পণ্ডিতপ্রবর মূয়র সাহেব ও শতপথ ব্রাহ্মণের এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। (Muir's Sanskrit Texts. Part II. page 419-20.)

* Principles of Geology. By Sir Charles Lyell, Bart. M. A. F. R. S. Vol I page 470.

† আমরা পদ্মাকেই গঙ্গা বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। প্রাচীন লেখকগণও তাহাই

ডাক্তার হকার বলেন যে, এই ব্রোজ্ঞ ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে সরিয়া যাইতেছে। প্রাচীন মানচিত্রাবলোকন করিলে প্রতীতি হইবে যে, ইহা পূর্ব্বে পূর্ব্ব দিকেই অগ্রসর হইতে-ছিল।

এই বৃহৎ বদ্বীপের কোন অংশ ব্রহ্মপুত্র ও কোন্ অংশ গঙ্গা দ্বারা গঠিত তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা কঠিন। বঙ্গীয় বদ্বীপ আয়তনে মৈসরীয় বদ্বীপের দ্বিগুণ হইতেও অধিক। কলিকাতার পশ্চিমে প্রায় ১০০মাইল বিস্তৃত সমভূমি, এবং বদ্বীপের শীর্ষদেশ হইতে উত্তরাভিমুখে অনেক দূরাবধি প্রসারিত ভূমিখণ্ড, বদ্বীপ হইতে পৃথক্ রাখা হইল। কিন্তু প্রকৃত সেই সেই স্থানেও এই দুইটি নদনদী দ্বারাই গঠিত হইয়াছে।

যে স্থানে নদী বহু শাখা প্রশাখায় বি-ভক্ত হইয়া সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, সেই স্থানকেই বদ্বীপের শীর্ষ বলাযায়। বঙ্গীয় বদ্বীপের দুইটি শিরঃস্থান আছে। গঙ্গা-জাত শীর্ষদেশ রাজমহল হইতে ৩০ মাইল নিম্নে (জাটীতে); ও সমুদ্র হইতে ২১৬ মা-ইল দূরে। নদরাজ লৌহিত্যজাত শিরঃস্থান চড়াপুঞ্জির * নিম্নে, সাগর হইতে ২১৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

সমুদ্র নিকটবর্ত্তী বদ্বীপের ভূখণ্ড বহু-সংখ্যক লবণজলাস্রোতস্বতী দ্বারা খণ্ডিত। ভাগীরথী গঙ্গার একটি শাখা। ভাগীরথীর প্রশাখা সমূহের জল নিতান্ত অপরিষ্কার নহে। ভাগীরথীর শাখা প্রশাখা দ্বারা বি-ধৌত স্থানটি সুন্দরবন নামে খ্যাত। বনা-কীর্ণ সুন্দরবন জল ও স্থলচর শ্বাপদ প্রাণী দ্বারা পরিপূর্ণ।

গঙ্গার শাখা প্রশাখা গুলি অল্প সময়ের মধ্যে তীরভূমি ভাঙ্গিয়া গতিস্থান পরিবর্ত্তন করে। এবং আনীত কর্দ্দম ও বালুকা দ্বারা পূর্ব্ব নালাগুলি পূর্ণ করে। ইহা মেজর কোলব্রুক কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। (৭) তিনি লিখিয়াছেন ক-য়েকবৎসর মধ্যে ৪০ বর্গ মাইল একটি ভূখণ্ড গঙ্গাগর্ভে অদৃশ্য হইয়া যায়। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের জলের সহিত যে প্রচুর পরিমাণে

করিয়াছেন। কিঞ্চিদূন তিন শতাব্দর প্রা-চীন ব্লেভ ও ব্রোকের মানচিত্রে পদ্মা যে-রূপ গঙ্গার মূল স্রোতস্বতী ভাবে চিত্রিত অদ্যাপিও আমরা তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। তথাপি কেন যে গঙ্গার একটি শাখা পবিত্র ও মূল গঙ্গা অপবিত্র হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। শিশুকালে শ্রবণ করি-য়াছিলাম, পদ্মা শঙ্খাসুরের—ও হুগলী শাখা ভগীরথের গঙ্গা এবং সেই কারণেই অসুরের গঙ্গা অপবিত্র ও পদ্মা আখ্যা প্রাপ্ত হই-য়াছে। শাখা নদী ভাগীরথী আখ্যা ধারণ পূর্ব্বক কলুষনাশিনী বলিয়া খ্যাত হইয়া-ছেন। মূল সংস্কৃত রামায়ণে এই সকল গল্পের কোন উল্লেখ নাই।

* বঙ্গীয় বাবুগণ সাহেবদিগের অনু-করণ করিতে যাইয়া দেশীয় নামগুলিকে বিকৃত করিয়া তুলেন; যথা চড়াপুঞ্জিকে চিড়াপুঞ্জি, শ্রীহট্টকে ছিলহট, ত্রিপুরাকে টিপারা, চট্টগ্রামকে চিটাগাং, বর্দ্ধমানকে বর্ডোয়ান, মেদিনীপুরকে মিদনাপুর, বারা-ণসীকে বেনারাস ইত্যাদি।

(৭) Trans. of the Asiatic Society Vol VII. page 14.

বালুকাও কর্দ্দম আনীত হইয়া থাকে, অল্প সময়ের মধ্যে গঠিত চর গুলিই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কখন কখনও নদীর বাঁকের সম্মুখে বৃহৎ বালির চর পড়ে। কখনও বা সরল পথগামী স্রোত বাধা প্রাপ্ত হইয়া নদী-গর্ভেও চর সৃষ্টি করে। অনেক সময় একটি বড় বৃক্ষ কিম্বা একখানি নিমজ্জিত নৌকা নদীগর্ভে স্রোতের বাধা জন্মাইতে থাকে। স্রোতে আনীত কর্দ্দম রাশি তথায় ক্রমে সঞ্চিত হইয়া চর উৎপন্ন হয়। যে সকল স্থানে নদী-গর্ভে চর সৃষ্টি করিয়া বসুন্ধরা স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন, তাহার সন্নিকটেই আবার তীর ভাঙ্গিয়া যায়। এইরূপে এক দিকে চর বৃদ্ধি, অন্যদিকে বেলা ভূমি ভগ্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। প্রত্যেক বার্ষিক জলপ্লাবনে স্রোতগঠিত চর সকল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

বিজ্ঞবর রেনেল সাহেব বলেন—লক্ষ্মীপুরের নিম্নে, গঙ্গাও মেঘনার সাগরসঙ্গমে কতগুলি চর আছে। আয়তন ও উর্ব্বরতা যারা সেগুলি ওয়াইট দ্বীপের সমতুল্য।

এই দুই নদনদী-স্রোতে কোথাও বা নূতন দ্বীপ সৃষ্টি হইতেছে, কোথাও বা পুরাতন দ্বীপ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। নূতন দ্বীপ গুলি শীঘ্রই তৃণগুল্মে আচ্ছাদিত হইয়া ব্যাঘ্র, মহিষ, বরাহ, মৃগ প্রভৃতির বাসস্থান হইয়া পড়ে। এই জন্য উদ্ভিদ ও জীব জন্তুর দেহাবশেষ কখনও নদী স্রোতে নিক্ষিপ্ত হইয়া, নূতন গঠিত দ্বীপ সমূহের স্তরে স্তরে বদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

কখন কখনও বার্ষিক জলপ্লাবন কালে নদী স্রোত প্রবল সমুদ্র-স্রোতে (জোয়ারে) বাধা প্রাপ্ত হইয়া ভয়াবহ জলপ্লাবন সংঘটিত হইয়া থাকে, দ্বীপবাসীগণ বিশেষ রূপে এই দুর্ঘটনার আয়ত্তাধীন। বঙ্গদেশে এই শোচনীয় ঘটনা বারংবার সংঘটিত হইয়াছে। ইতিবৃত্তে আমরা যে কয়েকটি এইরূপ জলপ্লাবন জনিত দুর্ঘটনার সংবাদ পাঠ করিয়াছি; পাঠকদিগের গোচরার্থে তাহা এস্থলে বিবৃত করিলাম।

১। ১৫০৫ শকাব্দে (১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে) বাকলা চন্দ্রদ্বীপ (বাখরগঞ্জ) জল প্লাবিত হয়। নদীর জল ২৫। ৩০ হস্ত উচ্চ হইয়াছিল। প্রায় ২ লক্ষ প্রাণী বিনষ্ট হয়। আইন আকবরিতে ইহার বর্ণনা আছে। ভিনীশীয় বণিক সিজার ফ্রেডরিক এই জলপ্লাবন দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন প্রায় ১০। ১২ বৎসরান্তেই বঙ্গে এইরূপ এক একটি জলপ্লাবন হইয়া থাকে। (চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব ও দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস দেখ।) * * *

২। ১৬৫৯ শকাব্দ, আশ্বিন (৭। ১০। ১৭৩৭ খৃঃ অঃ) গঙ্গার মোহানা হইতে ৬০ মাইল উজান পর্য্যন্ত নদীর জল প্রায় ২৫ ২৬ হস্ত উচ্চ হইয়াছিল। ইহাতে ২০ সহস্র জাহাজ ও অন্যান্য নৌকা এবং তিন লক্ষ লোক বিনষ্ট হইয়াছিল।

(Piddington.)

৩। ১৬৮৫ শকাব্দ (১৭৬৩ খৃঃ অঃ।) মেঘনার জল ১২। ১৩ হস্ত উচ্চ হইয়া লক্ষ্মীপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী মনুষ্য, পশু ও গৃহাদি ভাসাইয়া নেয়। (Rennell)

৪। ১৭১৯ শকাব্দ—অগ্রহায়ণ। * * *

(Piddington)

৫ । ১৭২৭ শকাব্দ, চৈত্র । (১৬ । ৩ । ১৮০৫ খৃঃ অঃ ।) কলিকাতা সুন্দরবন প্রভৃতি স্থানে । (Buist)

৬ । ১৭৪৪ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ । বাখরগঞ্জ প্রদেশ জলপ্লাবিত হইয়া প্রায় ৫০ সহস্র মনুষ্য কালগ্রাসে পতিত হয় ।

(Piddington & Buist)

৭ । ১৭৪৫ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ । চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জ ও সুন্দরবন ।

৮ । ১৭৪৬ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ । চট্টগ্রামে অনেক লোক নষ্ট হইয়াছিল ।

(Buist)

৯ । ১৭৫২ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ । * * *

১০ । ১৭৫৪ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ । বাঙ্গলার দক্ষিণপ্রান্তে ৮ । ১০ সহস্র লোক নষ্ট হয় ।

১১ । " আষাঢ় । কলিকাতা অঞ্চলে ।

১২ । " কার্ত্তিক । " "

১৩ । ১৭৫৫ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ । কলিকাতা অঞ্চলে অনেক লোক নষ্ট হইয়াছিল ।

১৪ । ১৭৫৬ শকাব্দ, শ্রাবণ । কলিকাতা অঞ্চলে ।

১৫ । ১৭৬০ শকাব্দ, কার্ত্তিক । "

১৬ । ১৭৬১ শকাব্দ, আশ্বিন । সুন্দরবন বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ।

১৭ । ১৭৬২ শকাব্দ, বৈশাখ । কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে

১৮ । ১৭৬৪ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ । "

(Great Calcutta cyclone)

১৯ । ১৭৬৬ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ । নওয়াখালী ও চট্টগ্রাম ।

২০ । " ভাদ্র । কলিকাতা ।

২১ । ১৭৬৮ শকাব্দ, আশ্বিন । "

২২ । ১৭৬৯ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ । চট্টগ্রাম ।

২৩ । ১৭৭০ শকাব্দ, বৈশাখ । মেদিনীপুর ।

২৪ । ১৭৭১ শকাব্দ, কার্ত্তিক । ঢাকা ।

২৫ । ১৭৭২ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ । সুন্দরবন ।

২৬ । ১৭৭৫ শকাব্দ, আশ্বিন । মেঘনাতীরবর্ত্তী স্থানে । (ত্রিপুরাবাসিগণ ১২৬০ বঙ্গাব্দ স্মরণ করুন ।)

* * * * * **

২৭ । ১৭৮৬ শকাব্দ, আশ্বিন । ভাগীরথীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া ৪৮ সহস্র মানব ও ১ লক্ষ গবাদি পশু বিনষ্ট হয় । (কলিকাতাবাসিগণ ১৮৬৪খৃষ্টাব্দ স্মরণ করুন।)

* * * *

২৮ । ১৭৯৮ শকাব্দ, কার্ত্তিক । বাখরগঞ্জ ও মেঘনাতীরবর্ত্তী স্থান জলপ্লাবিত হইয়া একলক্ষ মনুষ্য ও বহুবিধ পশু বিনষ্ট হইয়াছিল । ইহাই—

The Backerganj cyclone.

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের জলে এত অধিক পরিমাণে মৃত্তিকা আনীত হয় যে, জগতের অন্য কোনও নদীর সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না । তাহার দুইটি কারণ আছে ; প্রথমতঃ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং তাহাদের উপনদী সমূহ অতি উচ্চ পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত । রাইন নদী কন্‌ষ্টান্‌স হ্রদে ও রোননদীর জল জেনিবা হ্রদে পতিত হইয়া যেরূপ পরিষ্কৃত হয়, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের জল পরিষ্কৃত হইবার সেইরূপ কোনও উপায় নাই । দ্বিতীয়তঃ, মিসিসিপী প্রভৃতি নদী (যাহাদের জলমিশ্রিত কর্দ্দমের বিশেষ পরীক্ষা করা হইয়াছে ।) অপেক্ষা গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বিষুবরেখার অধিক নিকটবর্ত্তী ।

অধিকন্তু হিমগিরির দক্ষিণ উপতটে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া থাকে। বর্ষাকালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সাগরসঙ্গম স্থান হইতে প্রায় ১০০ মাইল দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রের জল ঘোলা হইয়া যায়। যদিচ এই নদীদ্বয়ের স্রোত ৩০ কিম্বা ৫০ ক্রোশ দূরে যাইয়া স্বচ্ছতা লাভ করে, তথাপি তাহার দক্ষিণেও অনেক দূর পর্য্যন্ত কর্দ্দমের সূক্ষ্ম অণুগুলি স্রোতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। সুতরাং নূতন স্তরের সাধারণ ঢালুতা অতি অল্প। উৎকৃষ্ট সামুদ্রিক চিত্র দর্শনে জ্ঞাত হওয়া যায় যে বদ্বীপের প্রান্ত স্থান হইতে ক্রমশঃ ১০০ মাইল পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই অল্পে অল্পে সাগরের গম্ভীরতা ৩ হইতে ৫০ ধনু * হইয়াছে। তৎপর কোনও স্থানে ৭০ কিম্বা ১০০ ধনু পর্য্যন্ত গভীরতা দৃষ্ট হয়।

বঙ্গীয় বদ্বীপের মধ্যদেশের সম্মুখে, উপকূল হইতে ৩০। ৪০ মাইল দূরে একটি সামুদ্রিক খাত আছে, তাহার নাম অতলস্পর্শ। ইহার পরিসর ১৫ মাইল। ১৮০ হইতে ৩০০ ধনু পরিমাণ রজ্জু নিক্ষেপ করিয়াও ইহার তলস্পর্শ হয় নাই। উপকূলস্থ তটের ৫ মাইল দূর হইতে অতলস্পর্শের ঢালুতা আরম্ভ হইয়াছে। নদী প্রবাহিত কর্দ্দমাক্তজল যে, সর্ব্বদা কেবল অতলস্পর্শের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় এরূপ নহে; বাণিজ্য বায়ু প্রভাবে কখনও বালুকা ও কর্দ্দমরাশি বদ্বীপাভিমুখে প্রবাহিত হয়। এবম্প্রকার অবস্থায় এই সামুদ্রিক খাত কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা নিতান্ত বিস্ময়জনক। বদ্বীপের তটপ্রান্ত হইতে ৮০ মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রের জল কর্দ্দমাক্ত। অতএব ইহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে যে, এই অতলস্পর্শ মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বালি ও কর্দ্দম সঞ্চিত হয়। বোধ হয় বঙ্গোপসাগরের এই স্থানের গভীরতা পূর্ব্বে অত্যন্ত অধিক ছিল, নাচেৎ কোন প্রকার প্রাকৃতিক ঘটনা দ্বারা এই স্থানটি বসিয়া গিয়া এই সামুদ্রিক খাত সৃষ্ট হইয়াছে। শেষোক্ত অনুমানটিই সমধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান বসিয়া যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভূমিকম্প দ্বারা চট্টগ্রাম প্রদেশের কিয়দংশ বিপর্য্যস্ত হওয়ার বিষয় আমরা "চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্বে" লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ১২৭৬ বঙ্গাব্দে পূর্ব্ব-বঙ্গে যে ভূমিকম্প হয় তাহাতে কাছাড় ও মণিপুরে কোনও কোনও স্থান বসিয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞবর ফারগিউসন সাহেব বলেন—"অতলস্পর্শ একটি জলপাত্র মাত্র। প্রবল সামুদ্রিক স্রোতোবেগে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে এবং স্রোতোবেগে ঐ স্থানে বালুকা ও কর্দ্দম সঞ্চিত হইতে পারে না।" পণ্ডিতপ্রবর লায়েল বলেন "যদি ফারগিউসন সাহেব স্রোতবেগের পরিমাণ বলিতে পারিতেন, তাহা হইলে সেই বেগ প্রভাবে এরূপ খাত প্রস্তুত হইতে পারে কি না বিবেচনা করা যাইতে পারিত।" লায়েলের বিবেচনায় আর একটি সহজ অনুমান আছে যে, পূর্ব্ব হইতেই দুই সহস্র কিম্বা তত্তোধিক গভীর একটি খাত ছিল। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের কর্দ্দমাক্ত জলস্রোত সেই অতলস্পর্শ পছছি

* প্রচলিত ভাষায় ধনুকে "বাঁও" বা "বেঁও" বলে।

দার পূর্ব্বেই সামুদ্রিক স্রোতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকা নিম্নে জমিয়া যাইত সুতরাং সেই কর্দ্দম অন্তঃস্পর্শ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া তাহা পূর্ণ করিতে অবসর পায় নাই।

যদিও কোনও কোনও স্থানে বাঙ্গলার কলেবর বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়, কিন্তু সেই বৃদ্ধির পরিমাণ নিতান্ত অল্প। কারণ নদীর স্রোত মন্দ হইলে সমুদ্রস্রোত আসিয়া নূতন মৃত্তিকারাশি গ্রাস করিয়া ফেলে। (ক্রমশঃ)

শ্রী—সিংহ।

বিলাতের পত্র।

লাম্বেত। ১লা মে, ১৮৮১।

প্রিয়তম, দেখিতে দেখিতে একবৎসর অতীত হইল। কাল চক্রে কত স্থানে কত কি হইল। কাল সহকারে তোমার ও মনের গতি ফিরিল। তুমি সময়ে সময়ে আমায় পত্র লিখিতে, আমি দূর দেশে থাকিয়া তোমার পত্র পাইয়া মানসিক শান্তি সম্ভোগ করিতাম; কিন্তু জানি না তুমি কি ভাবিয়া আমাকে এসুখ হইতে বঞ্চিত করিলে। যখনই 'মেল' আইসে, তখনই তোমার পত্র পাইবার আশয়ে আমি ব্যগ্র হইয়া পথ নিরীক্ষণ করিতে থাকি। এক মেলে আসিল না, ভাবিলাম দ্বিতীয় মেলে আসিবে। এইরূপ করিয়া একবৎসর কাটাইলাম, তোমার পত্র পাইলাম না। তোমার পত্র পাঠে আমি সুখী হই, তুমি কি আমার সেই সুখ হরণ করিয়া সুখ লাভ কর? তোমার মন ত ভাই তেমন নয়। তবে কি তুমি আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছ! তুমি দেশে যাইতে আমায় বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলে, আমি তোমার কথা শুনিনাই বলিয়া কি তুমি রাগ করিয়াছ? জন্ম ভূমির মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া সপরিবারে আমি তোমায় ইংলণ্ডে আসিতে বলিয়াছিলাম, বলিয়া কি তুমি ক্ষুণ্ণ হইয়াছ? তা ভাই রাগ করিও না। আমি অপরিণাম দর্শী যুবক। স্বাধীন ইংলণ্ডে পদার্পণ করায় আমার ক্ষীণ মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়াছিল, আমি প্রলাপ বকিয়াছিলাম। বৎসরেক কাল এদেশে বাস করিয়া আমি অনেক দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি! আমাদের দেশে পাড়া গাঁয়ে যে দলাদলি হইয়া থাকে তাত জান। আমি আগে ভাবিতাম নিষ্কর্ম্মা লোকেরা সময় কাটানের জন্য অনর্থক ঐ সকল দল বিদল উপস্থিত করিয়া থাকে। সহরের সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও বিসম্বাদ দেখিয়া ভাবিতাম এই জাতীয় দৌর্ব্বল্য নিবন্ধনই আমাদের দেশের ও সমাজের এ ঘোর হীনাবস্থা ঘটিয়াছে। কিন্তু এই সুসভ্য স্বাধীন সাম্রাজ্যেও এসকল দেখিয়া শুনিয়া আমার চোখ ফুটিল। মানুষের প্রকৃতি সকল সময়ে সকল দেশেই একরূপ। এই সুসভ্য ইংরাজজাতি, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, জ্ঞানে ও বুদ্ধিবলে অত্যুচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াও মানুষসুলভ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিনিচয় পরিহার করিতে পারেন নাই। গর্ব্ব, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল তাঁহাদের প্রখর জ্ঞানজ্যো-

তির পূর্ণবিকাশের প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাম্প্রদায়িক অনৈক্য, 'রক্ষণশীল' (Conservatives) ও উদার নৈতিক (Liberals) সম্প্রদায়ের বিদ্বেষভাব, কিংবা কুলীন (Lords) ও মৌলিক (Commons) দিগের বিবাদের কথা কহিতেছি না। যে সকল গুণ থাকায় ইংরাজজাতি সুসভ্যপদবীতে আরোহণ করিয়াছেন, যে বিজ্ঞানবলে বিশ্ব সংসারের প্রকৃতিপুঞ্জকে আপনার আয়ত্তাধীন করিয়া সততই জগতের হিত সাধিতেছেন, সেই নিগূঢ় সত্য লইয়াও অহরহঃ সম্প্রদায় সম্প্রদায়ে ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। আমরা সমাজের দাস, সমাজের ভয়ে ইচ্ছা সত্বেও সমাজসংস্করণ করিতে পারি না। বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা প্রভৃতি অহিতকর বিষয়ের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারি না বলিয়া ইংরেজেরা একবাক্যে আমাদিগকে তিরস্কার করিতে থাকেন। আমরা অশিক্ষিত ও অসভ্য। তাঁহারা সুশিক্ষিত ও সভ্য। প্রাচীন আচারের মূলদেশে কুঠারাঘাত করা আমাদিগের পক্ষে যেমন কষ্টকর, তাঁহাদের পক্ষেও তেমনি। বিজ্ঞানের শৈশবাবস্থায় কত যে নিরপরাধ প্রাণীর প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে তাহারও ইয়ত্তা নাই। মনুষ্য মাত্রেই স্বাধীনভাবে স্বমত প্রকাশ ও কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবে এই উদার রাজনীতি প্রচার না হইলে কখনই বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে পারিত না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরাই আবার মানুষ-সুলভ দৌর্ব্বল্যের বশবর্ত্তী হইয়া সেই বিজ্ঞানের উন্নতির প্রবল অন্তরায় হইতেছেন। ইঁহারাও আমাদের ন্যায় চিরাগত আচারের বশবর্ত্তী হওয়ায় নবাবিষ্কৃত অভিনব সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। বাল্যকাল হইতে ভূতে বিশ্বাস আছে বলিয়া, অন্ধকারে একাকী কোথাও যাইতে হইলে, গাছের পাতাটি নড়িলে, কখন বা নক্ষত্রালোকে নিজের ছায়াটি দেখিলে ঐ ভূত আসিল বলিয়া অমনি শিহরিয়া উঠি। ইঁহারাও আবার সুশিক্ষিত হইয়া অভ্যাসের দাস; যাহা পুরুষপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে তাহাই ভাল

অলিভার ক্রময়েল কম্পজ্বরে আক্রান্ত হইলেন। তখন কম্পজ্বরের মহৌষধ কুইনাইন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান পণ্ডিত বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করিলেন। ক্রময়েলের ব্যাধি তাঁহাদের ঔষধে আরোগ্য হইবে না স্থির হইল; তথাচ তাঁহাকে কুইনাইন সেবন করান হইল না। ক্রময়েলের মৃত্যু হয় সেও ভাল, তথাচ পুরাতন চিকিৎসা প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া নবাবিষ্কৃত ঔষধ প্রয়োগে তাঁহার রোগের শান্তি করা হইল না। ১৬৫৮ খ্রীঃ ইলণ্ডে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, আজও ইংলণ্ডে সেই ঘটনা ঘটিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও ইংলণ্ড সমগ্র পৃথিবী সমক্ষে আত্ম দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিলেন।

ভাই! জান যে গত বৎসর ১৯শে এপ্রিল তারিখে ইংলণ্ডের প্রধান সচিব,রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের অধিনেতা বেঞ্জামিন ডিজ্রেলী (লর্ড বিকন্সফিল্ড) জাতীয় সংগ্রামের সম্মুখ সমরে পরাজিত হইয়া ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। এবৎসর সেই

দিনে তিনি সমগ্র জগতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। ডাঃ কিড তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসক। রোগের প্রথম অবস্থায় তিনিই তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করেন। পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। লর্ড বিকন্স ফিল্ডের আত্মীয় স্বজন ভয় পাইলেন। ইংলণ্ডেশ্বরীও তাঁহার প্রিয়তম অমাত্যের উৎকট রোগের অবস্থা অবগত হইয়া সাতিশয় ব্যাকুলা হইলেন এবং ইংলণ্ডের একটি প্রধান য়্যালোপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ কোয়েনকে আদেশ করেন যে, তিনি ও ডাঃ কিড উভয়ে একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা করিবেন। ডাঃ কিড এক জন বিচক্ষণ ও সুদক্ষ চিকিৎসক; কিন্তু তিনি হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন বলিয়া প্রাচীন মতের চিকিৎসকেরা তাঁহাকে অতি হেয় ও অপদার্থ জ্ঞান করেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর আদেশ লঙ্ঘনকরা ডাঃ কোয়েনের সাধ্যাতীত; কিন্তু ভিন্ন মতাবলম্বী চিকিৎসকের সহযোগী হইতেও তাঁহার অপমান; সুতরাং তিনি বিষম বিপদে পড়িলেন। এমন সময়ে ডাঃ কিড সকল দিক বজায় রাখিবার জন্য স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিলেন যে তিনি সংপ্রতি কিম্বা ইতি পূর্ব্বে কথনও লর্ড বিকন্স ফিল্ডকে হোমিওপ্যাথি মতের ঔষধ সেবন করান নাই। অনন্তর ডাঃ কোয়েন, ডাঃ কিড, ডাঃ ক্রুস এবং রয়েল কলেজ অব্ ফিজিসিয়েনের অধ্যক্ষ ডাঃ জেনার এই সকল মহামহোপাধ্যায় চিকিৎসকেরা ঐক্যমতে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন; ব্রিটিসসাম্রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান ঔষধ প্রয়োগে-ও রোগের প্রতীকার হইতেছে না দেখিয়া একজন হাতুড়ে কৃত প্যাটেন্ট মেডিসিন (অবধৌতিক ঔষধ) ব্যবহার করিলেন। সেই ঔষধই বিকন্স ফিল্ডের আসন্ন কালীন গঙ্গোদক হইল; তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন; তাঁহার অত্যদ্ভুত জীবনচরিত সাঙ্গ হইল। ভাই! এইবার একবার নিবিষ্ট চিত্তে স্থির মনে ভাবিয়া দেখ দেখি কি হইল। ডাঃ কিড হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতেন বলিয়া যে সকল ভিষক্ শ্রেষ্ঠেরা তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া চিকিৎসা করিতেও অবমানিত মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা অবাধে একজন অজ্ঞ হাতুড়ে প্রচারিত অজ্ঞাত ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলেন। কে বলিতে পারে সেই অজ্ঞাত ঔষধ হলাহল নয়, এবং তাহাতেই লর্ড বিকন্স ফিল্ডের জীবনান্ত হইল না? ইংলণ্ডে এখন এই দুই সম্প্রদায়ের চিকিৎসকে ঘোরতর বাক্ বিতণ্ডা ও বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি মানুষ সহস্রগুণ উৎকর্ষ লাভ করিলেও কখন মনুষ্যত্ব পরিহার করিতে পারে না। সত্য বটে ইংরেজেরা আমাদের অপেক্ষা সহস্রাংশে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা সর্ব্বাংশে আমাদের অনুকরণীয় নহেন। বৎসরেক এদেশে বাস করিয়া আমি অনেক জানিতে পারিয়াছি। প্রথমে চটক দেখিয়া আমি যে মোহিত হইয়াছিলাম; নবানুরাগে মত্ত হইয়া প্রলাপ বকিয়াছিলাম, তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি। আমি স্বদেশে যাইব না তোমায় লিখিয়াছিলাম; কিন্তু এখন আবার লিখিতেছি যে,

যদি যে বিজ্ঞান বলে ইংরাজ আমাদের অপেক্ষা এতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন তাহার কণামাত্রও স্বদেশে লইতে পারি তাহা হইলেই স্বদেশে যাইব। আমার দ্বারা দেশের যদি কোনও হিত সাধিত না হয়, তাহা হইলে আর দেশে গিয়া কি করিব। হতভাগ্য ভারতের কুপুত্রের অসদ্ভাব নাই। সংপ্রতি ঋ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি লইয়া ইংলণ্ডে যে বিবাদ চলিতেছে তাহাতে উভয় প্রকার চিকিৎসা প্রণালী সম্যক প্রকারে অবগত হইতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা। ইংলণ্ডে পাঠ সমাপন করিয়া আমি একবার নাগরাজের সাম্রাজ্যে (আমেরিকায়) গমন করিব। তথায় সম্যক প্রকারে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিব। সংপ্রতি যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই আমার বড় মনঃপুত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে আজ্‌কাল্‌ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সকল দেশেই সমাদৃত হইয়াছে। তুমি ও তোমার আত্মীয়গণও এবিষয় সম্যক প্রকারে অবগত আছ; কিন্তু ভাই। আমি এ সম্বন্ধে তোমায় কিঞ্চিৎ না লিখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না।

শরীর ব্যাধি-মন্দির। মনুষ্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রোগের সৃষ্টি হইয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্তির নিমিত্ত যেমন আহার ও পানীয় দ্রব্যের আবশ্যক, রোগের শান্তির নিমিত্ত ও তেমনি ঔষধের আবশ্যক। সৃষ্টিকাল অবধিই আহার অন্বেষণ ও রোগ নিরাকরণের চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে হইতেছে। স্বাধীন ভারত, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শাস্ত্রেরও উন্নতি করিতেছিল। এক সময়ে ধন্বন্তরি, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি সুসন্তানগণও ভারতের ক্রোড়ে ক্রীড়া করিয়াছিল। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উন্নতি শশীও অস্তমিত হইল। ভারত পুনর্ব্বার অন্ধতমসে সমাচ্ছন্ন হইল। প্রাচীন গ্রীস সাম্রাজ্য সভ্য পদবীতে আরোহণ করিল। ভিষক্‌ শ্রেষ্ঠ হিপক্রাইটিস জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং চিকিৎসার দুইটি পথ জগতকে বলিয়া দিলেন। গ্রীসের পতনের পর ইটালীর অভ্যুত্থান হইল, এবং গ্রীসের সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করিয়া নবরঙ্গিণী নবরাগে প্রমত্ত হইয়া চারিদিকে প্রতিভা ছটা বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহার যৌবন প্রসূত ডাঃ গ্যালেন ১৩১ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রানুশীলন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে এক অতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন। হিপক্রাইটিস চিকিৎসার দুইটি পথ আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন, বিসদৃশ বা সদৃশ উভয় বিধ ক্রিয়া দ্বারাই রোগ প্রশমন করা যাইতে পারে, ডাঃ গ্যালেন বিসদৃশ ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া সম্যক প্রকারে তাহারই উন্নতি সাধন করেন। জ্বর রোগে রক্তের গতি প্রবল হয়, কোষ্ঠ বদ্ধ হয়, সুতরাং জ্বর চিকিৎসায় গ্যালেন এবং তাঁহার অনুচরেরা বিসদৃশ বা বিপরীত ক্রিয়া অর্থাৎ রক্ত মোক্ষণ ও বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা জ্বরের চিকিৎসা করেন। উদরাময়ে পাতলা বিরেচন হয়, সুতরাং তাঁহাদের মতে অহিফেন প্রভৃতি প্রয়োগ দ্বারা ভেদ বন্ধ করাই ব্যবস্থা। অর্থাৎ তাঁহারা বলেন যে, যে রোগ যে কারণ হইতে [illegible]

যে যে ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে, শরীরে ঔষধ দ্বারা তদ্বিপরীত ক্রিয়া উৎপন্ন করিলেই তাহার শান্তি হইবে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে এক রোগ ভাল করিতে গিয়া শরীরে নূতন আর একটি রোগের উৎপত্তি করিতে হইবে। সেই নূতন রোগের পরিণাম কি হইবে, কে বলিতে পারে? মনে কর একটি গিরিনির্ঝরিণী প্রবল স্রোতোবেগে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছে। সম্মুখে যাহা পড়িতেছে ভাসাইয়া লইতেছে। এখন এই স্রোতস্বতীর গতি রোধ করিবার অনেক উপায় আছে। প্রথমতঃ নদী যেরূপ বেগ সহকারে দক্ষিণ দিকে যাইতেছে, যদি সেইরূপ বেগবতী আর একটি নদী দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত নদীর স্রোতের সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত নদীর স্রোতঃ বন্ধ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ বহুসংখ্যক খাল বা নালা কাটিয়া জল নানাদিকে সঞ্চালিত করিলেও নদীর স্রোতোবেগ অধিক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিবে। তৃতীয়তঃ বাঁধ বাঁধিয়াও নদীর স্রোতোবেগ বন্ধ করা সম্ভব। কিন্তু এসকল উপায়ে নদীর স্রোতঃ বন্ধ বা হ্রাস করা অপেক্ষা যে, নদীর উৎপত্তি স্থল শুষ্ক করিয়া উহার বেগ নাশ করা সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় ইহা সহজেই অনুমেয়। শরীরে সমুৎপন্ন কোনও ভীষণ রোগকে যদি এই স্রোতস্বতীর সহিত তুলনা করা যায়; তাহা হইলে গ্যালেন এবং তাঁহার অনুচরেরা প্রথমোক্ত তিন উপায়ে রোগ প্রশমন করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু হানিমান ও তাঁহার শিষ্যেরা শেষোক্ত উপায়ই অবলম্বন করেন। প্রথমোক্ত তিন উপায় অবলম্বনে শরীরে যে একটি নূতন রোগোৎপত্তি হইবে তাহারই বা পরিণাম কি কে বলিতে পারে। বাঁধ বাঁধিয়া নদীর বেগ ক্ষণ কাল বন্ধ করা যাইতে পারে সত্য কিন্তু স্রোতোবেগে সেই বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে কিংবা জলাতিশয্য বশতঃ বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে একেবারে মহা প্রলয় উপস্থিত হয়। (দামোদর ও সিন্ধু নদীর বান-ডাকার বিষয় একবার মনে করিয়া দেখ)। আবার প্রবল জ্বর ভোগ কালে অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন করাইয়া জ্বর চাপা দেওয়ায় কিংবা বাহ্যিক প্রলেপ প্রভৃতি ব্যবহারে স্ফোটক প্রভৃতি বসিয়া যাওয়ায় যে অতি উৎকট রোগ উৎপন্ন হইয়া সময়ে সময়ে রোগীর প্রাণ নাশ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে তাহা অনেকেই অবগত আছেন। স্থির ভাবে গ্যালেন ও তাঁহার অনুচর বর্গের প্রদর্শিত রোগ বিনাশের অন্য দুইটি উপায় ও পর্য্যালোচনা করিলে উহাদেরও বিপদ সঙ্কুল অতি সহজেই অনুমিত হইবে। ফলতঃ রোগ শান্তি করিবার নিমিত্ত শরীরে অন্য এক রোগ সমুৎপন্ন করা কখনই যুক্তি সঙ্গত নহে।

হিপক্রাইটিসের দ্বিতীয় প্রণালী অনুসারে কেহই চিকিৎসা করিলেন না সুতরাং উহা প্রায় অপ্রকাশই রহিয়া আসিল। অনন্তর জর্ম্মণ দেশীয় চিরস্মরণীয় মহাত্মা হানিমান প্রচলিত (বিসদৃশ) ক্রিয়া দ্বারা আশানুরূপ রোগ প্রশমনে ভগ্ন মনোরথ হওয়ায় হিপক্রাইটিসের দ্বিতীয় প্রণালী অনুসারে (সদৃশ ক্রিয়া দ্বারা) চিকিৎসা করিতে মনন

করেন। সৌভাগ্যক্রমে সে সময়ে কম্প-জরের মহৌষধ কুইনাইন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। হানিমান রোগের সহিত ঔষধের কি সম্বন্ধ জানিবার জন্য কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত স্বয়ং সুস্থ শরীরে কুইনাইন সেবন করায় একদিন অকস্মাৎ কম্প জরে আক্রান্ত হয়েন। অনন্তর বারংবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, স্বয়ং কিংবা পরিবার বর্গের মধ্যে যে কেহ দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে অধিক মাত্রায় কুইনাইন সেবন করেন, তিনিই কম্পজ্বরে আক্রান্ত হয়েন। সুতরাং কুইনাইনে যে কম্পজ্বরোৎপাদিনী শক্তি আছে, সে বিষয় তাঁহার আর অণুমাত্রও সংশয় রহিল না। পরে ঐ প্রকারে যাবতীয় ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, সুস্থ শরীরে অধিক পরিমাণে যে ঔষধ সেবনে শরীরে যে যে বিকৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই সেই লক্ষণ আপনা হইতে শরীরে প্রকাশ পাইলে, সেই ঔষধ অত্যল্প মাত্র সেবন করিলে সেই সেই বিকৃত লক্ষণ তিরোহিত হয়। হানিমান বলেন যে, শারীরিক প্রকৃতি শরীর রক্ষণে সততই যত্নবতী। স্বাভাবিকী শক্তি প্রভাবে প্রকৃতি সততই শরীরের ক্ষতি পূরণ করিতেছে। কিন্তু রোগের আতিশয্য বশতঃ প্রকৃতির কার্য্য কারিকা শক্তি কতক পরিমাণে বিনষ্ট ও বিকৃতভাবাপন্ন হইলে সেই শক্তির পুনঃ সঞ্চারের জন্য সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত বা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের আবশ্যক। ঔষধ প্রভাবে প্রকৃতি অব্যাহতরূপে কাজ করিতে পারিলেই রোগ আরাম হইয়া যায়।

বলা বাহুল্য যে হানিমান জগতের এই হিতসাধনকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক সর্ব্বপ্রকারে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বর্গীয় পুরুষ, দুঃখী মানবের হিতার্থেই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার সদনুষ্ঠানের গতি রোধ করে কাহার সাধ্য? সহস্র সহস্র প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও তাঁহার প্রদর্শিত চিকিৎসা প্রণালী তাঁহার জীবদ্দশাতেই জনসমাজে সমাদৃত হইয়াছিল এবং অচিরে যে চিকিৎসা প্রণালীর সর্ব্বোচ্চাসন পরিগ্রহ করিবে তাহারও সূত্রপাত হইয়াছে। এমন কি হোমিওপ্যাথির প্রসাদে আজ কাল য়্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা পর্য্যন্ত স্বীকার করেন যে রোগীকে অত্যল্প মাত্র ঔষধ সেবন করান বিধেয় এবং রক্ত মোক্ষণ ও বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ ঘোরতর অনিষ্টকর।

কথায় কথায় আমি অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু উপসংহারে কাউণ্টমাটি প্রদর্শিত ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ না লিখিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। ইনিও য়্যালোপ্যাথি চিকিৎসার প্রধান অধিনায়ক ডাঃ গ্যালেনের ন্যায় ইটালী নিবাসী। ইনি বলোনা নগরের একটি সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব, বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিশেষতঃ শরীরতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব ও রসায়ন বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। তিনি দেখিলেন যে, প্রচলিত চিকিৎসার (য়্যালোপ্যাথি) চিকিৎসকেরা রোগের মূলচ্ছেদ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল রোগের উপদ্রব নিবারণেই সমধিক যত্নবান হন, এবং অধিকাংশ রোগেই তাঁহাদের রোগ প্রশমনের যত্ন বিফল হইয়া যায়। হোমিওপ্যাথি রোগের মূলদেশ আক্রমণ ক-

রিয়া যাবতীয় রোগে সমুৎপন্ন বিকৃত ল ক্ষণ সকল বিনাশ করিতেছে ও নিঃসন্দেহ উত্তরোত্তর বিনাশ করিতে থাকিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ রোগ ও রোগের যাবতীয় বিকৃত লক্ষণ প্রশমন করিয়াই নিবস্ত হয়েন; তাঁহারা বিকৃত ভাবাপন্ন শারীরিক প্রকৃতিকে স্বভাবাপন্ন করিবার প্রয়াস পান কিন্তু শারীরিক প্রকৃতি যাহাতে পুনর্ব্বার বিকৃত ভাবাপন্ন না হয়, তাহার কোনও উপায় অবলম্বন করেন না, সুতরাং ঔষধ প্রভাবে রোগ ভাল করিতে পারেন, কিন্তু কাহাকেও রোগের পুনরাক্রমণ হইতে রক্ষা ও রোগীকে নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্য সুখ সম্ভোগে অধিকারী করিতে সমর্থ হয়েন না। কাউণ্টম্যাটি ভাবিলেন কেবল রোগ ভাল করাই চিকিৎসার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। যত দিন ঔষধ প্রভাবে শরীর রোগের আক্রমণ হইতে বঞ্চিত না হইবে ততদিন চিকিৎসাশাস্ত্র কখনই সম্যক প্রকারে উন্নতিলাভ করিবে না। তিনি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই বিষয় চিন্তা করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, যে, মনুষ্যশরীর মেদঃ (Lymph †) ও শোণিত (Blood) এই দুইটি মাত্র উপাদানে নির্ম্মিত। এই দুইটি প্রধান তরল পদার্থের যোগে ও মিলনেই অস্থি, মেদ, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতির উৎপত্তি এবং ইহাদের উভয়ের বা একের বিকৃতিতেই শরীরে সর্ব্বপ্রকার রোগ জন্মে। সুতরাং কোনও ঔষধ বা দ্রব্য প্রভাবে ঐ দূষিত শোণিত বা লিম্ফের দোষ নিরাকরণ করিয়া উহাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি পুনঃসংবর্দ্ধন করিতে পারিলেই রোগ নিঃসন্দেহ ভাল হইবে। এবং ঔষধ প্রভাবে ঐ দুইটি উপাদান অবিকৃত রাখিতে পারিলেই শরীর রোগের হাতহইতে উন্মুক্ত থাকিবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নানা জাতীয় ওষধির (লতা, গুল্ম প্রভৃতির) গুণ ও ক্রিয়া বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের মধ্য হইতে সাতটি মূল ঔষধ এবং পাঁচটি বৈদ্যুতিক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং এ তদ্দ্বারাই যাবতীয় রোগ ভাল করিতেছেন। এ ঔষধ প্রভাবে কোনও রোগ ভাল হইলে সে রোগ আর সে মনুষ্যকেপুনরাক্রমণ করে না। তিনি বলেন, নিয়মিত রূপে তাঁহার শোণিত ও লিম্ফ শোধক ঔষধদ্বয় সেবন করিলে মনুষ্য শরীরে কোনও রোগ প্রবেশ করিতে পারিবে না। হানিমান প্রবর্ত্তিত প্রণালী অনুসারে তাঁহার নবাবিষ্কৃত ঔষধ প্রয়োগ এবং প্রয়োজন মত ওষধি নির্য্যাস, বৈদ্যুতিক পদার্থ ব্যবহার করেন বলিয়া এই চিকিৎসা প্রণালীর নাম ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথি রাখিয়াছেন। ২১। ২২ বৎসর মাত্র কাউণ্টম্যাটি এরূপ চিকিৎসা করিতেছেন এবং ইহারই মধ্যে এ 'নববিধানের' উন্নতিরও সহস্রসহস্র অন্তরায় সত্ত্বেও ইংলণ্ড আমেরিকা, রুসিয়া, পোলাণ্ড, জর্ম্মণি, অষ্ট্রিয়া, প্রভৃতি দেশ সমূহে তাঁহার ঔষধ ও চিকিৎসা প্রণালী প্রচারিত হইয়াছে। কাউণ্ট ম্যাটি প্রায় অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজের ঔষধ সে-

† লিম্ফ (Lymph) একপ্রকার দুগ্ধবৎ তরল পদার্থ, মেদ বা বসা এটি শরীরের একটি প্রধান উপাদান।

বন প্রভাবে এথন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থকায় থাকিয়া প্রচুর শারীরিক ও মানসিক শ্রম করিতে পারিতেছেন। জরার চিহ্নমাত্রও এ থনপর্য্যন্ত তাঁহার শরীরে প্রকাশ পায়নাই। ঈশ্বরকরুন তিনি সুদীর্ঘকাল জীবিতথাকিয়া তাঁহার এই মঙ্গলকর চিকিৎসা প্রণালীর সম্যক্ উন্নতি সাধন করিয়া যাউন।

আজ এই পর্য্যন্ত। এক বৎসর পরে তোমায় পত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়া যাহা কলমে আসিল তাহাই লিখিলাম। তুমিত জান যে সুহৃদের নিকট মনের কপাট আপনা হইতেই খুলিয়া যায়। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই, কিন্তু তুমি মুহূর্ত্তকের জন্যেও আমার নয়নান্তরাল হইতে পারনাই বিশেষতঃ গত রাত্রে তোমায় স্বপ্নে দেখিয়াছি। আমি দেখিলাম তোমাতে আমাতে কলিকাতায় যেন কাহারও আলয়ে একসঙ্গে আহার করিতেছি। আহার সাঙ্গ হইল। তোমার গাড়ী আসিল। তুমি গাড়ীতে উঠিতেগেলে, আমি তোমারসঙ্গে কিয়দ্দূর চলিয়া গেলাম। তুমি গাড়ীতে উঠিলে গাড়ী হন হন শব্দে পশ্চিমদিকে চলিয়া গেল। আমি বিষন্ন মনে আস্তে২ তদ্বিপরীত দিকে চলিলাম। অন্য মনস্কে যাইতে২ নরদমায় পড়িয়াগেলাম। অমনি ঘুম ভাঙ্গিল। তথন বেলা ৮ টা বেজেছে। তাড়াতাড়ি তোমার এই চিঠী ডাকে দিয়া বাসায় আসিয়া দেখি কে একখানা The Imperial Royal Dream Book আমার ঘরে রাখিয়াছে। সে খানির পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম To dream you fall denotes loss of place and goods; if you are in love, it denotes that you will never marry the present object of your affections.

আয়ুর্ব্বেদ।

(পঞ্চম খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যার পর।)

গর্ভাবস্থায় অধিকাংশ বায়ুবর্দ্ধক রুক্ষাদি বস্তু আহার করিলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া গর্ভস্থ সন্তানকে কুব্জ, অন্ধ, জড় ও বামন করিতে পারে। অধিকাংশ পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য আহার করিলে সন্তান পিঙ্গলবর্ণ ও তাহার মস্তক কেশশূন্য হইতে পারে; অধিকাংশ কফবর্দ্ধক দ্রব্য আহার করিলে সন্তান পাণ্ডুবর্ণ ও শ্বিত্রী (ধবল-রোগ যুক্ত) হইতে পারে। (৩৫)

গর্ভোৎপত্তিকালে পঞ্চভূতান্তর্গত তেজঃ ধাতু কোন কারণে দৃষ্টিভাগের সহিত মিলিত

(৩৫) বাতলৈশ্চ ভবেদ্গর্ভঃ কুব্জান্ধজড়বামনঃ। পিত্তলৈঃ খলতিঃ পিঙ্গঃ শ্বিত্রীপাণ্ডুঃ কফাত্মভিঃ। (বাগ্ভট)

না হইলে সন্তান জন্মান্ধ হয়, এবং তৎকালে ঐ তেজঃ ধাতু রক্ত আশ্রয় করিলে চক্ষু রক্ত বর্ণ, পিত্তাশ্রয় করিলে পিঙ্গলবর্ণ, শ্লেষ্মাশ্রয় করিলে শ্বেতবর্ণ, এবং বাতাশ্রয় করিলে বিকৃতচক্ষুঃ (ট্যারা) হয়। (১) এবং কোন দোষাভিঘাতদ্বারা গর্ভিণীর শরীরের যে যে ভাগ পীড়িত হয়, গর্ভস্থ সন্তানেরও সেই সেই ভাগ পীড়িত হইতে পারে। (২)

পুত্রাদিগর্ভার লক্ষণ।

গর্ভের দ্বিতীয় মাসে পুত্রগর্ভা রমণীর গর্ভ বর্ত্তুলাকৃতি বোধ হয়। এবং দক্ষিণ চক্ষুঃ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়। এবং দক্ষিণ স্তনে প্রথমতঃ স্তন্য নিঃসৃত হয়। দক্ষিণ উরু সুপুষ্ট ও মুখবর্ণ পরিষ্কৃত হয়, এবং বাহুল্যরূপে পুংনামধেয় বস্তুতে অভিলাষ জন্মে।

কন্যাগর্ভা রমণীর দ্বিতীয় মাসে গর্ভ দীর্ঘাকৃতি বোধ হয়, এবং পূর্ব্বে পুত্রগর্ভার যেসমস্ত লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার বিপরীত লক্ষণ হয়।

ক্লীবগর্ভা রমণীর দ্বিতীয় মাসে গর্ভ অর্ব্বুদাকৃতি (গোলাকার ফলের অর্দ্ধ খণ্ডাকৃতি) বোধ হয়। পার্শ্বদ্বয় উন্নত হয় এবং উদরের সম্মুখ ভাগ অধিকতর বৃহৎ হয়।

যুগ্মগর্ভা রমণীর উদর দ্রোণীর আকৃতি অর্থাৎ মধ্য ভাগ নিম্ন হয়। (৩)

পুত্র, কন্যা ও ক্লীব হওয়ার কারণ।

শুক্র ও আর্ত্তব শোণিতের সংযোগকালে শুক্রের আধিক্য থাকিলে পুত্র, আর্ত্তবের আধিক্যথাকিলে কন্যা এবং উভয়ের সাম্যাবস্থায় নপুংসক সন্তান জন্মে। (৪)

যুগ্মসন্তান উৎপত্তির কারণ।

স্ত্রী পুরুষের সংযোগকালে গর্ভাশয় পতিত বীজ (শুক্র) গর্ভাশয়স্থ বায়ুকর্ত্তৃক দুই ভাগে বিভক্ত হইলে দুই জীবের সঞ্চার হইয়া থাকে। (৫)

বিবিধ বর্ণ উৎপত্তির কারণ।

পঞ্চভূতান্তর্গত তেজঃধাতু, পার্থিবাদি

---

(১) তত্রদৃষ্টিভাগমপ্রতিপন্নংতেজো-জাত্যন্ধং করোতি, তদেব রক্তানুগতং রক্তাক্ষং পিত্তানুগতং পিঙ্গাক্ষং শ্লেষ্মানুগতং শুক্লাক্ষং বাতানুগতং বিকৃতাক্ষ মিতি।(সুশ্রুত)

(২) দোষাভিঘাতৈর্গর্ভিণ্যাঃ যোযো ভাগঃ প্রপীড্যতে। সস ভাগঃ শিশোস্তস্য গর্ভস্থস্য প্রপীড্যতে। (ঐ)

(৩) তত্রযস্যাদক্ষিণে স্তনে প্রাক্পয়োদর্শনং ভবতি দক্ষিণাক্ষিমহত্বঞ্চ পূর্ব্বঞ্চ দক্ষিণং সক্থি উৎকর্ষতি, বাহুল্যেন পুন্নামধেয়েষু দ্রব্যেষু দৌহৃদমভিধ্যায়তি ** প্রসন্নমুখবর্ণতা চ ভবতি তাং ব্রূয়াৎ পুত্রমিয়ং জনয়িষ্যতীতি তদ্বিপর্য্যয়ে কন্যাং। যস্যাঃ পার্শ্বদ্বয় মুন্নতং পুরস্তান্নির্গতমুদরং প্রাগভিহিতলক্ষণঞ্চ তস্য নপুংসকমিতি বিদ্যাৎ। যস্যামধ্যে নিম্নং দ্রোণীপ্রভৃতমুদরং সা যুগ্মং প্রসূয়তে ইতি। (সুশ্রুত)

(৪) তত্রশুক্রবাহুল্যাৎ পুমানার্ত্তববাহুল্যাৎ স্ত্রী, সাম্যাদুভয়ো র্নপুংসক মিতি। (সুশ্রুত)

(৫) বীজেঽম্বর্ব্বায়ুনাভিন্নে দ্বৌজীবৌ কুক্ষিমাগতৌ। যমাবিত্যভিধীয়েতে ধর্ম্মেতরপুরঃসরৌ। ঐ

ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ বর্ণের উৎপত্তি করে। গর্ভোৎপত্তি কালে তেজঃ-ধাতু অধিকাংশ জলীয় ধাতুর সহিত মিলিত হইলে গর্ভ গৌরবর্ণ হয়. ঐ তেজঃ-ধাতু অধিকাংশ পার্থিব ধাতুর সহিত মিলিত হইলে গর্ভ কৃষ্ণবর্ণ হয়। অধিকাংশ পার্থিব ও আকাশীয় ধাতুর সহিত মিলিত হইলে কৃষ্ণ শ্যামবর্ণ হয়, এবং ঐ তেজঃধাতু অধিকাংশ জলীয় ও আকাশীয় ধাতুর সহিত মিলিত হইলে গৌর-শ্যাম বর্ণ হয়। (১)

কেহ কেহ বলেন গর্ভাবস্থায় গর্ভিণী অধিকাংশ যেরূপ বর্ণের দ্রব্য আহার করে, তৎসন্তানও সেই সেই বর্ণ বিশিষ্ট হয়। (২)

শরীর মধ্যে পিতৃজ, মাতৃজ, রসজ, ও আত্মজভাগ নিরূপণ।

কেশ, শ্মশ্রু, লোম, অস্থি, নখ, দন্ত, শিরা, ধমনী, স্নায়ু ও শুক্র, এই সমস্ত পিতৃজ।

মাংস, রক্ত, মজ্জা, মেদ, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র, নাভি, হৃদয়, ও মলমার্গ, এই সমস্ত মাতৃজ।

শরীরের উপচয়, বর্ণ, বল এবং দেহস্থিতি ও ক্ষয় এই সমস্ত রসজ।

জ্ঞান, বিজ্ঞান, আয়ু, ইন্দ্রিয়, ও সুখ দুঃখাদি আত্মজ। (৩)

---

(১) তত্রতেজোধাতুঃ সর্ব্ববর্ণানাং প্রভবঃ সযদা গর্ভোৎপত্তাব্বাতুপ্রায়োভবতি তদাগর্ভং গৌরং করোতি, পৃথিবীধাতুপ্রায়ঃ কৃষ্ণং পৃথিব্যাকাশধাতুপ্রায়ঃ কৃষ্ণশ্যামং তোয়াকাশধাতুপ্রায়ঃ গৌরশ্যামং।

(সুশ্রুতঃ।)

(২) যাদৃগ্বর্ণমাহারমুপসেবতে গর্ভিণী তাদৃগ্বর্ণপ্রসবাভবতীত্যেকে ভাষন্তে। (সুশ্রুতঃ)

(৩) গর্ভস্যকেশশ্মশ্রুলোমাস্থিনখ দন্তশিরাস্নায়ুধমনীরেতঃপ্রভৃতীনি স্থিরাণি পিতৃজানি। মাংসশোণিতমেদোমজ্জহৃন্নাভিযকৃৎপ্লীহান্ত্রগুদপ্রভৃতীনি মৃদূনি মাতৃজানি। শরীরোপচয়োবলং বর্ণঃ স্থিতি হানিশ্চ রসজানি। ইন্দ্রিয়াণি জ্ঞানং বিজ্ঞানমায়ুঃ সুখ দুঃখাদিকঞ্চাত্মজানি। সুশ্রুত।

(ক্রমশঃ।)

ভাল-মানুষ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রায় চারিবৎসর হইল, বান্ধবে ভাল-মানুষ নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই চারিবৎসরের মধ্যে লেখকের অবস্থার নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অবস্থার পরিবর্ত্তনে, মতের পরিবর্ত্তনও অনুল্লঙ্ঘনীয়। সাংসারিক সুখের অবস্থায় যে কথা, যে ভাব, যে তর্ক লেখকের মনে উপস্থিত হইবে, দুঃখের অবস্থায় সেই কথা, সেই ভাব ও সেই তর্ক কখনই মনে উদিত হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন, বয়োধিকতায় জ্ঞানের বিকাশ ও পরিস্ফূর্ত্তি। ইংরাজেরা স্পর্দ্ধা করেন যে, তাঁহাদের মতের কোন কালেও দ্বৈধত্ব দেখা যায় না—বাল্যকালে যিনি যে মত অবলম্বন করেন, বার্দ্ধক্যেও তিনি সেই মত পরিত্যাগ করেন না। যাঁহারা একথা বলেন (ইংলণ্ডে কি রাজনৈতিক, কি দার্শনিক, কি ঐতিহাসিক, সকলেই একথা লইয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন) তাঁহারা হয় আত্মশ্লাঘাপ্রিয়, নাহয় জড়বুদ্ধি। "বাল্যকালেই আমি জ্ঞানের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলাম" ইহা আত্মাভিমানীর কথা। 'আমার জ্ঞানের উন্নতি হয় নাই বা হইবেও না' ইহা জড়বুদ্ধির কথা। আর একথা যে মিথ্যা, তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যায়। শেক্ষপীয়র বাল্যকালে রসপূর্ণ, উচ্ছলিত, উদ্বেল, উদ্ভ্রান্ত কবিতা লিখিয়াছিলেন। সে কবিতায় কেবল উদ্দাম সচঞ্চল যৌবনের ভাবব্যক্তি। আর বৃদ্ধকালে সেই শেক্ষপীয়র মানবের ঈর্ষ্যা, কুটিলতা, ক্রোধ, অহঙ্কার, কৃতঘ্নতা, বৈরাগ্য প্রভৃতি চিত্রিত করিয়াছিলেন। মিল্‌টন যৌবনের প্রারম্ভে মধুর চটুল 'ল্যালেগ্রো' লিখিয়াছিলেন। 'ল্যালেগ্রো' যেন ভাবের আবেশে নৃত্য করিতেছে। আর বৃদ্ধকালে সেই দরিদ্র অন্ধ কবিই কি গম্ভীর কি শোকাবেগপূর্ণ গীত গাইয়াছেন! জনসন দরিদ্রাবস্থায় 'লণ্ডন' নামক কবিতা লিখেন। লণ্ডনে কেবল গালাগালি, তিরস্কার ও ঘৃণাব্যঞ্জক শ্লেষ। আবার জনসনই ধনশালী হইয়া 'Vanity of human wishes' লিখেন। 'ভ্যানিটীর' শ্লেষ অপেক্ষাকৃত কোমল এবং সদুপদেশপূর্ণ। আর গ্লাড্‌ষ্টোন্ বা ব্রাইট্ রাজমন্ত্রী হইবার পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, রাজমন্ত্রী হইয়াও তাহাই বলিতেছেন কি? ফলতঃ যখন সামান্য ক্ষুদ্র বৃক্ষটীও এক ভাবে চিরকাল থাকিতে পারে না, তখন বুদ্ধিবৃত্তিশালী, সুখদুঃখাভিভূত মনুষ্য যে এক ভাবে থাকিতেই পারে না, এবিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

যদিও আমার নানাবিষয়ে নানা-

প্রকার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তথাপি মনুষ্য যে সংসারে থাকিয়া বা সংসার ছাড়িয়া ভাল-মানুষ হইতে পারে না, এই মতটী আমার মনে ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূতই হইতেছে। আমি পূর্ব্ব দুই প্রবন্ধে ভাল-মানুষ হইবার পক্ষে কি কি প্রতিবন্ধক আছে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধে আরও কতকগুলি দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধক দেখাইব।

(ক) জাতীয় প্রতিবন্ধক। পৃথিবীস্থ জাতিগণ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উন্নীত হইতেছে। কোন জাতি সভ্যতার নিম্ন সোপানে অবস্থিত থাকিয়া উলঙ্গবেশে ভ্রমণ, আমমাংস ভক্ষণ, মনুষ্য ভোজন প্রভৃতি পৈশাচিক ক্রিয়ায় নিয়োজিত রহিয়াছে। তদূর্দ্ধস্থ কোন জাতি আমমাংস বা মনুষ্য ভোজন পরিত্যাগ করিয়া ফলমূল ভক্ষণ করিতে শিখিতেছে এবং মন, আত্মা, ভাষা প্রভৃতি দুরবগাহ্য তত্ত্বের অস্পষ্ট আলোক দেখিতে পাইতেছে। আবার তদূর্দ্ধস্থ কোন জাতি এই মাত্র অগ্নির ব্যবহার শিক্ষা করিয়া রন্ধনের প্রথম আভাস পাইতেছে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে মন, আত্মা, ভাষা, দয়া, মায়া প্রভৃতি ভাবের অস্ফুট আলোক কিঞ্চিৎ স্ফুটভাবে প্রতিলক্ষিত করিতেছে। এই রূপে ক্রমশঃ উন্নীত হইতে হইতে পোলাও-কোর্ম্মা-কটলেট-পুডিংভোজী অস্ত্রশস্ত্রশালী, দার্শনিক-কবি-ঐতিহাসিক—কল্লোলিত জাতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও জাতিতে জাতিতে এইরূপ স্বর্গ নরক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি কোন এক নির্দ্দিষ্ট জাতির অন্তর্ভূত ব্যক্তি সমূহের মানসিক বা নৈতিক অবস্থা অনেকাংশে প্রায় একরূপ। ফিউজীয় বা লাপলাণ্ডীয়দের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভেদ আছে কিন্তু তথাপি সমস্তজাতির মধ্যে এমত কতকগুলি বিশেষ গুণ আছেই যদ্দ্বারা তাহাদিগকে অন্য অন্য জাতি হইতে পৃথক করিয়া লওয়া যাইতে পারে। একজন ইংরাজ ডিউক্ ও একজন ইংরাজ চাসা উভয়ে অনেক প্রভেদ। কিন্তু তথাপি উভয়েই ইংরাজ বলিয়া উহাদের কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। রুটী, মাংস, চেয়ার, টেবিল, কাঁটা, চাম্‌চা, পেণ্টালুন ইত্যাদি ইংরাজ-ডিউক ও ইংরাজ চাসা উভয়েরই সাধারণ সম্পত্তি; আবার ইংরাজীয় সাহস, উদ্যম, স্বাধীনতা-প্রিয়ত্ব, বল, ক্লেশ সহিষ্ণুত্ব, সত্যপ্রিয়ত্ব, আত্মনির্ভর, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়ত্ব অল্প বা অধিক পরিমাণে ডিউক্ ও চাসা উভয়েই দেখিতে পাওয়া যায়। ডিউক্ রৌপ্যের চাম্‌চা ব্যবহার করেন, চাসা টিনের চাম্‌চা ব্যবহার করে, ডিউকের মাংসে নানাপ্রকার মস্‌লা, চাসার মাংসে তাহা নাই; ডিউকের চেয়ার, টেবিল উত্তম কাষ্ঠ নির্ম্মিত, চাসার তাহা নয়; চাসার সাহস অদম্য, ডিউকের তাহা নয়, চাসা নিষ্ঠুরতাকেও ঘৃণা করে না, ডিউক ঘৃণা করেন, চাসাতে ও ডিউকে এই রূপের প্রভেদ। কিন্তু প্রভেদ অপেক্ষা সাদৃশ্য অনেক অধিক এবং এই জন্যই ডিউক ও চাসা উভয়েই জন-বুল নামে অভিহিত হয়েন।

আমাদের মধ্যেও জমিদারে প্রজায় কত প্রভেদ। জমিদারের কোঁচা ভূলুণ্ঠিত ও সুকুঞ্চিত, তাঁহার ঘর বাড়ীরই বা কত শোভা, তাঁহার সদাব্রত, অতিথিসেবা ও

দুর্গাপূজাতে সমারোহই বা কত, তাঁহার হৃদয়ে প্রজাবাৎসল্যই * বা কত, পরিবারস্থ সকলের প্রতি তাঁহার যত্নই বা কি প্রগাঢ়, তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যেরও সীমা নাই। আবার চাসা মলিন বস্ত্র পরিহিত, জানুর নিম্নে বস্ত্র কখনও পঁহুছে কি না সন্দেহ। পর্ণকুটীরে শয়ন, কদন্ন ভোজন, উদর-পূর্ত্তি এবং মহাজনের ঋণ-শোধ-বিষয়িনী চিন্তা প্রভৃতি চাসার জীবনের সার কথা। তথাপি জমিদারে ও প্রজায় সাদৃশ্য কত তাহাও একবার ভাবিয়া দেখুন। উভয়ের আচার ব্যবহার অনেকাংশে একরূপ। দুই বেলা খাওয়া, মধ্যে একবার কিঞ্চিৎ জলযোগ করা, মেজেয় শয্যা পাতিয়া উপবেশন ও শয়ন, আহারান্তে তাম্বূল চর্ব্বণ ও তামাকু-সেবন উভয়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, এক পরিবারে ভাই ভগ্নী প্রভৃতি লইয়া বাস করিবার বাসনা, ব্রাহ্মণ,সজ্জন, দরিদ্র,আতুর প্রভৃতিকে যথাসাধ্য দান করিবার বাঞ্ছা, শ্রাদ্ধে, বিবাহে, অন্নপ্রাশনে যথাসাধ্য সমারোহ করিবার অভিলাষ, কলহের প্রতি বিতৃষ্ণা, শান্তির প্রতি অনুরাগ, একটু উদ্যমরাহিত্য, একটু আলস্য, একটু সাংসারিক বিষয়ে বৈরাগ্য, একটু মিথ্যার প্রতি অক্রুদ্ধতা প্রভৃতি গুণ ও দোষ জমিদার ও প্রজা উভয়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় পক্ষের স্ত্রীলোকের মধ্যেও একইরূপ শালীনতা, পতিভক্তি, গৃহকর্ম্মে অনুরাগ, গুরুজনের প্রতি শুশ্রূষা দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে হ্যাট্-কোট্-পরিহিত, চুরটপায়ী, ইংরেজানুকারণিক, মদ্যপ, বেশ্যারত, সধবার একাদশী-প্রোক্ত অটল বাবুর ন্যায় জমিদার বা জমিদার-পুত্রের কথা বলা হইল না। আবার জমিদারদ্বেষী, রেণ্টাল আন্দোলনকারী মেমোরিয়েল লেখক প্রজাবর্গের কথাও বলিলাম না। দশ বৎসর পূর্ব্বে জমিদার ও প্রজা যেমন যেমন ছিলেন তাহাই বলিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে দেখা যাইতেছে বাঙ্গালী জমিদার ও বাঙ্গালী প্রজায় অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। ফলতঃ কোন এক নির্দ্দিষ্ট জাতির ব্যক্তিসমূহ মধ্যে সাদৃশ্য অবশ্যম্ভাবী। এখন প্রত্যেক জাতিতেই ভাল-মানুষ হইবার পক্ষে কতকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। ইংরেজ উগ্র প্রকৃতি, নির্দ্দয়, আত্মপ্রিয়, সহানুভূতিবিহীন। ফরাসিস চঞ্চল, রিপু-পরতন্ত্র, আমোদ প্রিয়, ভোগবিলাসী, সুখেচ্ছু ও কামুকতা-প্রবণ। জর্ম্মণ উদ্যম শূন্য, [গেটে জর্ম্মণদিগকে হামলেটের ন্যায় উদ্যমহীন বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন—(See Wilhelm Meister Vol I)], প্রতিভাশূন্য, সাংসারিক বিষয়ে বিরক্ত। ইতালীয় চতুর, ভোগবিলাসী, মিথ্যাপ্রিয়। বাঙ্গালী ভীরু, কাপুরুষ, বাগাড়ম্বর-প্রিয়, অলস, নিরুদ্যম, অপরিণামদর্শী এবং কাহারও কাহারও মতে মিথ্যাবাদী প্রতারক ইত্যাদি।

যখন জাতিস্থ সমুদয় ব্যক্তিই প্রায়

* বর্ত্তমান জমিদারেরা অনেকে প্রজাপীড়ক বলিয়া খ্যাত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকেই প্রজাবৎসল, অন্ততঃ প্রজাপীড়ক জমিদারের সংখ্যা আমাদের দেশে বোধ হয় অল্প।

এক প্রকৃতির এবং যখন প্রত্যেক জাতিতেই ভালমানুষ হইবার কতকগুলি প্রতিবন্ধক আছে, তখন ইচ্ছা করিয়া কোন এক নির্দ্দিষ্ট জাতির কোন এক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি কিরূপে ভালমানুষ হইতে পারেন? জাতীয় প্রতিবন্ধক গুলি তিনি কিরূপে অতিক্রম করিবেন? যাহা জাতীয় সম্পত্তি তাহা ইচ্ছা করিয়া পরিত্যাগ করা যায় না। মধ্য আফ্রিকার নিগ্রো কি ইচ্ছা করিয়া শ্বেতাঙ্গ হইতে পারে? না ইচ্ছার বলে তাহার স্থূল ওষ্ঠ সূক্ষ্ম হইবে, না ইচ্ছার বলে তাহার বিস্তৃত দন্ত পংক্তি সুচিক্কণ মুক্তার গাঁথনির ন্যায় সুসজ্জিত হইবে? যেমন শারীরিক বিষয়ে তাহার ইচ্ছা অফল-প্রদ, মানসিক বিষয়েও সেইরূপ। মানসিক যে সকল প্রবৃত্তি আমরা জাতি হইতে প্রাপ্ত হই, সে প্রবৃত্তি গুলি অতি প্রচ্ছন্নভাবে আমাদিগের রক্তের মধ্যে কার্য্য করিতে থাকে। আমাদের সাধ্য কি যে আমরা সেকল প্রবৃত্তিকে নিরস্ত করিয়া রাখি?

এক্ষণে জাতীয় প্রতিবন্ধক কিরূপ তাহা এক প্রকার বুঝা গেল এবং জাতীয় প্রতিবন্ধক কিরূপ দুরতিক্রম্য তাহাও কতক অনুভূত করা গেল। কিন্তু এই জাতীয় প্রতিবন্ধক সম্বন্ধে দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। আপত্তি দুইটি গুরুতর এবং তাহাদের খণ্ডনও বাঞ্ছনীয়। সুতরাং যথা ক্রমে আপত্তি দুইটির কথা বলা যাইতেছে।

প্রথম আপত্তি ও তাহার খণ্ডন।—যদিও জাতীয় ব্যক্তিগণ অনেকে সমপ্রাকৃতিক, তথাপি তাহাদের মধ্যে অনেক ভিন্ন প্রকৃতির লোকও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন কুরূপ পরিবারের মধ্যে সুরূপ পাওয়া যায়, দুর্ব্বল পরিবারের মধ্যে বলবান পাওয়া যায়, মূর্খ পরিবারের মধ্যে বিদ্বান পাওয়া যায়, সেইরূপ অলস জাতির মধ্যে পরিশ্রমী, নিরুদ্যম জাতির মধ্যে উদ্যমশীল প্রভৃতি পাওয়া যাইতে পারে। একথা অস্বীকার করি না। কিন্তু একটী প্রশ্ন এই যে, এইরূপ বৈষম্য কাহারও ইচ্ছাধীন কি না? এই যে ভিন্নপ্রাকৃতিক ব্যক্তি, ইনি কি ইচ্ছা করিয়া নিজ চেষ্টায় এইরূপ ভিন্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা জন্মাবধিই ইনি এই ভিন্ন প্রকৃতির লক্ষণ দেখাইতেছেন। আমার বোধ হয় এইরূপ ভিন্ন-প্রকৃতি স্বাভাবিক ইচ্ছা বা যত্ন সম্ভূত নহে। বৃক্ষ লতাদির মধ্যে এইরূপ বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যেতর প্রাণিগণের মধ্যেও ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে এবং বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, এইরূপ ব্যক্তিগত বৈষম্য স্বাভাবিক নিয়ম *। যাহা স্বাভাবিক নিয়ম তাহা ইচ্ছার বলে কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে ইচ্ছা সম্ভূত বলা অন্যায়।

এই আপত্তির আর এক অংশ এই যে জাতীয় একজন ভিন্ন-প্রাকৃতিক ব্যক্তি সমস্ত জাতির মতের, ভাবের, নীতির পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। সমস্ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ ইহার বলবৎ দৃষ্টান্ত। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, নানক, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাত্মারা কতলক্ষ লো-

* See Darwin's origin of Species Chapter on Variability.

কেকে নিজমতে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদের দৃষ্টান্তে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জাতীয় প্রতিবন্ধক মনুষ্যের চেষ্টায় নিরাকৃত হইতে পারে।

এই আপত্তি গুরুতর হইলেও খণ্ডনসাধ্য। প্রথম কথা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদের অনেক শাসন অমূলক ও অব্যবহার্য্য। "তোমার দক্ষিণ গণ্ডে কেহ আঘাত করিলে, তাহাকে বামগণ্ড ফিরাইয়া দিবে।" "অরাবপ্যুচিতংকার্য্যংআতিথ্যংগৃহমাগতে"। "ছেত্তুঃ পার্শ্বগতা চ্ছায়াং ন সংহরতি দ্রুমঃ" "উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকং" "সহস্র গুণমুৎস্রষ্টুং আদত্তে হি রসং রবি" প্রভৃতি নীতিমালা কখনও কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। সুতরাং যদিও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা এই সকল "বাঁদি গদ্" অনবরত আওড়াইয়া থাকেন, আমরা এগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারি। এই সকল "বাঁদি গদ্" বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই আমাদের বিবেচ্য। কোন একটী বিশেষ জাতি ধরুন, এবং দেখা যাউক সেই জাতি মধ্যে কিরূপ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং সেই সেই ধর্ম্মে সেই সেই জাতির মতের বা নীতির কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। হিন্দুদের সমাজের কথাই প্রথম আলোচনা করা যাউক। হিন্দুদের মধ্যে যে কয়টি ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে, তাহাদের নাম—বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ, চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত নব প্রণালীর বৈষ্ণব, রামমোহন প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম, কেশব প্রবর্ত্তিত নববিধান *—ইহাদের সকলগুলিই হিন্দুদের মধ্যে মতান্তর, এক জাতিত্ব প্রভৃতি ঘটাইয়াছে। কিন্তু মূলে ইহারা হিন্দুধর্ম্মেরই প্রকারভেদ মাত্র। ইহাদের সকলের মূলেই সাংসারিক বিষয়ে বিতৃষ্ণা ও বৈরাগ্য। কেবল বিতৃষ্ণা ও বৈরাগ্যের প্রকার-ভেদ। ফলতঃ আমার বিশ্বাস যে, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা জাতির প্রকৃতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া তাহার দার্ঢ্য সম্পাদন করেন। জাতীয় সকলের মনে যে ভাব, যে মত অস্ফুটভাবে কার্য্য করে, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সেই ভাব, সেই মত গুলি স্ফুট ভাবে পরিলক্ষিত করিয়া তাহাদের আখ্যা প্রদান করেন। এবং জাতির সহিত তাঁহাদের এইরূপ ঐকমত্য থাকে বলিয়া তাঁহারা জীবন কালেই সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পূজ্য বলিয়া গণ্য হয়েন। যদি তাঁহারা কেহ পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেন, সে চেষ্টা প্রায়ই বিফল হয়। এবং কখনও কখনও চেষ্টা সফল হইলেও ঐ পরিবর্ত্তন বহুকাল স্থায়ী হয় না। আমাদের দেশে (বাঙ্গালায়) ব্রাহ্মদের ইতিহাস আলোচনা করিলেও এ কথার যথার্থতা উপলব্ধ হয়। রামমোহন রায় আমাদের জাতীয় বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিলেন যে, সাংসারিকতা ও ধর্ম্মালোচনা, ইহারা পরস্পর বিরোধী নয়। পরন্তু যে যত ধার্ম্মিক সে তত (সদুদ্দেশ্যপূর্ণ) সাংসারিক বিষয়ে মনোযোগী। এই মত অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মেরা সকল সৎকার্য্যে যোগ দিতে আরম্ভ করিল। স্কুল সংস্থাপন, মদ্যপান নিবারণী সভা, বালিকা

---

* উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, মান্দ্রাজ, বম্বে প্রভৃতি দেশে যে যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহা বাহুল্য ভয়ে বলিলাম না।

বিদ্যালয়, জাতিভেদ-বিনাশ এ সমস্তই ব্রাহ্মদের দ্বারা সংসাধিত হইত। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যেই ব্রাহ্মদের মতে কতদূর আমাদের চিরন্তন জাতীয়ভাব আসিয়া ঢুকিয়াছে দেখুন। কেশব বাবুর মতে বৈরাগ্যই (তিনি বৈরাগ্য কথা ব্যবহার করেন না, কিন্তু যে সম্পূর্ণ ঈশ্বর-মগ্ন, তন্ময়, সে বৈরাগী ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?) ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বৈরাগ্য চাহেন না, তাঁহারা চাহেন উন্নতি। আর কয়েক বৎসর পরে তাঁহারা যে ধর্ম্মের (যাহা সাধারণ লোকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে, i e Theology & not religion) সঙ্গে সকল সংস্রব বিচ্ছিন্ন করিবেন তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না। ফলতঃ তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মের সহিত বিচ্ছেদের ভাব এখনই কতক কতক বুঝিতে পারা যায়। উকীল ব্যারিষ্টার যাহার নেতা, যাহার আচার্য্যেরা মিল, স্পেনসারের শিষ্য, এবং শুদ্ধ যুক্তি প্রয়োগ যে ধর্ম্মের ভিত্তি, সে ধর্ম যে কিছু দিন পরে ধর্ম বলিয়া অভিহিত হইবে না তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ফলতঃ যে ধর্ম্মে বৈরাগ্য নাই, সে ধর্ম্ম আমাদের দেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে না। এইরূপে, যে ধর্ম্ম সংগ্রাম, হত্যা প্রভৃতির উপদেশ না দেয়, তাহা বলশালী বিক্রম-সিংহ আরবীয় ও মঙ্গলীয়ের নিকটে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। এবং যদিও একরূপ ধর্ম্ম অন্যরূপ জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহাও মৌখিক।

ইউরোপে আজি কতকাল খৃষ্টধর্ম্ম চলিতেছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের শিক্ষা—শান্তি, ক্ষমা দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রণয় প্রভৃতি। কিন্তু আজিও ইউরোপে যদি একজন অন্য এক জনকে বলে, তোমার চুলগাছিটী বাঁকা, অথবা তোমার চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ, অথবা তোমার নাসিকা খন্দ ভাবাপন্ন, তৎক্ষণাৎ দুই জনে ভদ্র লোকের মত দুই পিস্তল লইয়া দুইজনকে গুলি করিবেন। ইউরোপে শান্তির ভাব, ক্ষমার ভাব এতই প্রবল যে যদি কেহ এইরূপ সামান্য কারণে অন্যকে হত করিতে বা আপনি হত হইতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে তিনি সমাজমধ্যে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণিত হন। এবং এইরূপে কেহ কাহাকে হত্যা করিলে, তিনি ইংলণ্ড ভিন্ন ইউরোপের অন্য কোন দেশে দণ্ডিত হন না। আজি দুই হাজার বৎসর হইল, খ্রীষ্ট ধর্ম ইউরোপে চলিতেছে, কিন্তু এখনও ইউরোপীয়েরা জাতীয়-স্বভাব অতিক্রম করিতে শিখেন নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, যে ইচ্ছা বা চেষ্টায় নিজেরও মত পরিবর্ত্তিত হয় না, অন্যেরও হয় না।

দ্বিতীয় আপত্তি উত্থাপিত বা খণ্ডিত করিবার পূর্ব্বে পাঠককে একটি কথা বলিতে চাই। এই প্রবন্ধে যে সকল মত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহাদের বিপরীত মতগুলি এতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, এবং ঐ বিপরীত মতগুলির যাথার্থ্য বিষয়ে মনুষ্য এত অসন্দিহান যে, সময়ে সময়ে আমারই মনে বিনা কারণে আমার যুক্তির উপর আমারই সন্দেহ হয়। "What a man has done, man may do" "Where there is a will, there is a way" প্রভৃতি মতগুলি এত আশ্বাস-প্রদ ও আমাদের মনে

এত বদ্ধমূল যে, অন্য মত আমরা হৃদয়ে ধারণা করিতেই পারি না। কিন্তু এই মত গুলি যে ভ্রান্ত, তাহাও আবার আমরা অনেক সময়ে নিজেই বুঝিতে পারি। নেপোলিয়ন পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, তাঁহার মুখের কথায় কোটি কোটি লোক পরিচালিত হইত। তুমি আমি ত সহস্র চেষ্টা করিয়াও পাঁচজনকে পরিচালিত করিতে পারি না। আমার বেতনভোগী ভৃত্য, আমার ভরণীয়া, পালনীয়া স্ত্রী, আমার কুপোষ্য (বা সুপোষ্য) জ্ঞাতিবর্গ, ইঁহাদিগকেও ত সহস্র চেষ্টা করিয়া পরিচালিত করিতে পারি না। "Where there is a will, there is a way"! হরি! হরি! ভাল হই, লোকের প্রশংসা লাভ করি ইহা কাহার না আন্তরিক ইচ্ছা? কয় জনে ভাল হয়? ইহার অধিকাংশই স্তোক বাক্য। তোমাকে ভুলাইয়া লইয়া যাওয়ার উপায়। তোমাকে অনেক আশা দিয়া অল্পদানে সন্তুষ্ট করা। কিন্তু ইহাতে যে কত অনিষ্ট হয় তাহা অনেকে বুঝিয়া দেখেন না। অনবরত অসাধ্য বিষয়ে চেষ্টা করিতেছি এবং অনবরত বিফল হইতেছি, ইহাতে যে কি মনস্তাপ, কি আত্মগ্লানি, কি বিরক্তি, কি আয়ুহ্রাস, কি যাতনা, তাহা যাঁহারা ভুগিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। যাহা আমাদের আয়ত্ত তাহা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে দাও, যাহা অনায়ত্ত তাহাও স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ কর। মনুষ্য-জীবন বহুদিন-ব্যাপী নয়। এই পঞ্চাঙ্গুলী-পরিমিত স্থানের যদি অঙ্গুলী-পরিমিত সময় অনায়ত্ত কার্য্যে ব্যয়িত কর, তাহা হইলে আয়ত্ত কার্য্যে ব্যয়িত করিবে কি? যথার্থ উন্নতি করিতে হইলে অগ্রে উন্নতির পথটি পরিষ্কার করা উচিত, এবং এই পথে ধার্ম্মিকেরা, নৈতিকেরা যে কাঁটা খোঁচা ফেলিয়াছেন সে গুলি অগ্রে বিদূরিত করা আবশ্যক। এজন্য ভ্রান্ত মতগুলি প্রিয় হইলেও সেগুলি ত্যাগ করা আবশ্যক এবং ঠিক্ ঠিক্ মত গুলি অপ্রিয় হইলেও সেগুলি গ্রহণ করা আবশ্যক।

"দ্বেষ্যোপি সম্মতঃ শিষ্টস্তস্যার্ত্তস্য যথৌষধং
ত্যাজ্যোদুষ্টঃ প্রিয়োপ্যাসীৎ অঙ্গুলীবোরগ
ক্ষতা" রঘু

এক্ষণে দ্বিতীয় আপত্তির উল্লেখ করা যাউক।

ইতিহাসের প্রত্যেক পত্রেই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, জাতিগণ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উন্নীত বা অবনত হইতেছে। সুতরাং আত্মোন্নতি জাতীয় নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অসম্ভব হইলেও জাতি সংহতিতে অসম্ভব নয়। ইংলণ্ডীয়েরা প্রথম উইলিয়মের সময় যে অবস্থাপন্ন ছিল, এখন আর সেরূপ নয়। কিম্বা ফরাসিসেরা চতুর্দ্দশ লুইর সময় যে অবস্থাপন্ন ছিল, এখন আর সেরূপ নয়। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জাতীয় প্রতিবন্ধক জাতীয় নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপর খাটে, সমস্ত জাতিসংহতির প্রতি খাটে না।

এ আপত্তি সম্বন্ধে অনেক গুলি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথম উত্তর—জাতীয় উন্নতি এক এবং দেশীয় উন্নতি আর। ইংলণ্ডের উন্নতিকে জাতীয় উন্নতি কিরূপে বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের প্রথম অধিবাসী কেল্টজাতি। কে-

ল্টদের অধিকাংশই স্যাক্সন মহাশয়দের অ-স্ত্রাঘাতে পরলোকে গমন করিয়াছেন। কেবল কয়েক জন ওয়েলসের পর্ব্বত মালায় এবং কয়েক জন আয়র্লণ্ডে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করেন। ওয়েলস বা আয়র্লণ্ডের অধিবাসীরা আজিও কেল্টীয় স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ তাঁহারা আজিও পূর্ব্বের ন্যায় কল্পনা-প্রিয়, আড়ম্বরশীল, অপরিণামদর্শী, চঞ্চল ও অল্পেই অধীর। আজিও পার্ণেল সাহেবের বক্তৃতাকে ইংরাজেরা কেল্ট-কল্পনা-বহুল বলিয়া অভিহিত করেন। "Celtic love of declamation" "love of empty rhodomontade" ‡ আইরিশদের বর্ক্তৃতা আজিও এইরূপ অভিহিত হয়। এবং ইহা যে প্রকৃত কথা সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। কেল্টের পর স্যাক্সন আসিলেন। স্যাক্সন আজিও উদ্যম পূর্ণ, বিচক্ষণ, বিবেচক, পরিণামদর্শী ও উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বলদর্পে দর্পিত। কলিকাতায় লাল বাজারের গোরা ও লণ্ডনে "নৃশংস দস্যু" (Ruffian—used by London Spectator) এবিষয়ের সাক্ষী। স্যাক্সনের পর আসিলেন নর্ম্মান। নর্ম্মানদের রক্ত যেমন স্যাক্সনদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, (নর্ম্মান রক্ত ও স্যাক্সনরক্তের অনুপাত ১:১০০০ অর্থাৎ হাজার ফোঁটা স্যাক্সনরক্তে এক ফোঁটা নর্ম্মান রক্ত পাওয়া যাইতে পারে) সেইরূপ নর্ম্মানদের রীতি চরিত্রও স্যাক্সনদের সহিত প্রায় একরূপ বেমালুম সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে। যেখানে এতগুলি জাতির একত্র অবস্থান, সেখানে নির্দ্দিষ্ট কোন জাতির কি উন্নতি হইয়াছে কিরূপে বুঝা যাইবে। ইউরোপের আধুনিক সকল জাতিই প্রায় এইরূপ। ফ্রান্সে অগ্রে গল, পরে রোমীয়, পরে ফ্রান্ক। ইটালিতে আগে পিলাস্জি, পরে ইট্রুস্কান প্রভৃতি, পরে লাটিন, পরে ইটালীয়, পরে গথ, লম্বার্ড প্রভৃতি। গ্রীসে আগে ডোরিয়ান প্রভৃতি, পরে ভিনিস ও নর্ম্মান,পরে মুসলমান, পরে স্লাভোনিয়ান। অন্য অন্য দেশেও প্রায় এইরূপ। আসিয়ায় এইরূপ জাতিবিপর্য্যয় বড় অধিক ঘটে নাই। চীনীয় ভ্রাতারা আজিও যেমন, বোধহয় পঞ্চলক্ষ বৎসর পূর্ব্বেও সেইরূপ ছিলেন। চীনে পরিবর্ত্ত প্রায় কিছুই হয় নাই। ভারতবর্ষেও জাতিব্যত্যয় বড় হয় নাই কারণ যদিও ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছে, তথাপি তাহারা সমাজে জাতি মধ্যে প্রবেশ-লাভ করিতে পারে না। বাস্তবিক আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি (লেখক ব্রাহ্মণ) যে আজিও আমাদের শিরায় মনু, বশিষ্ট, অত্রি, আঙ্গিরস প্রভৃতির রক্ত প্রধাবিত হইতেছে। হিন্দুদের মধ্যে যাহারা শূদ্র তাহাদের মধ্যে অনেক জাতিব্যত্যয় ঘটিয়াছে। অনেক শূদ্রের জন্ম আর্য্য ও অনার্য্য সম্মিলনে,অনেক শূদ্রের জন্ম উচ্চ আর্য্য ও নিম্ন আর্য্য সম্মিলনে। বাস্তবিক শূদ্রের মধ্যে যে আকারগত বা বর্ণগত বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও একথা প্রমাণীকৃত হয়। "কোন শূদ্র ব্রাহ্মণের ন্যায় বা ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও গৌরকান্তি, কমনীয়াবয়ব," "কোনকটি কৌ-

‡ London Spectator. October 8. 1881. Page 1271.

মুদী শালী।" আবার কোন শূদ্র সাঁওতা-লের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, বীভৎসাকার এবং দীর্ঘ ও বিস্তৃত দন্তপংক্তি শালী। শূদ্রদের মধ্যে কোন কোন শ্রেণীর জাতিব্যত্যয় হইয়াছে বলিয়া সমস্ত শূদ্রদের কত উন্নতি হইয়াছে দেখুন। ঘোষ, বসু, মিত্র মহাশয়দের দৌরাত্ম্যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানেরা অন্ন পান না। কি কালেজে, কি কর্ম্ম স্থলে, কি বিদ্যাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠায়, সর্ব্বত্রই শূদ্র মহাশয়েরা ব্রাহ্মণদের সম-প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা জেতা। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা (যাঁহারা বাস্তবিক ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য অর্থাৎ ভট্টাচার্য্য বা তৎশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণেরা) পূর্ব্বেও যাহা ছিলেন, এখনও প্রায় তাহাই। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, যেখানে কোন এক জাতি কূপস্থ মণ্ডূকের ন্যায় একা এক ভাবে কাল কাটাইয়াছেন, সেখানে তাঁহার বড় উন্নতি হয় নাই। এবং যে জাতি, সমস্ত পৃথিবীকে এক পরিবার-ভুক্ত মনে করিয়া আপনাকে অন্য অন্য জাতির সহিত সম্মিলিত করিয়াছে, অথবা ঘটনা ক্রমে আপনি অন্য জাতির সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, সে থানেই সেই জাতি ক্রমশঃ উন্নীত হইয়া পৃথিবীর উপর আধিপত্য করিতেছে। সুতরাং জাতীয় উন্নতি, জাতির উপর নির্ভর করে না। অন্য জাতির সহিত সম্মিলিত না হইলে, কোন এক নির্দ্দিষ্ট জাতি উন্নতিলাভ করিতে পারে না।

দ্বিতীয় উত্তর—জাতীয় উন্নতি অনেক সময়ে ঘটনাধীন, ইচ্ছাধীন নহে। একদা জেম্‌স্‌ আউট্‌রাম এক যুদ্ধে গিয়াছিলেন। বিপক্ষ পক্ষ হইতে অনবরত গোলাগুলি বর্ষণ হইতেছে। জেম্‌স্‌ আউট্‌রামের সম্মুখে একটী হুঁকা বা গুড়্‌গুড়ি ছিল। একটী গুলি আসিয়া ঐ গুড়্‌গুড়িতে লাগিল। যদি ঐ গুলিটী গুড়্‌গুড়িতে না লাগিত তাহা হইলে সেই দিনই জেম্‌স্‌ আউট্‌রামের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইত, এবং তাহা হইলে তিনি মিউটিনীর সময়ে যশোলাভও করিতে পারিতেন না, এবং আজি তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিও গড়ের মাঠকে অলঙ্কৃত করিতে পারিত না। তাহা হইলে তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন আর কেহই তাঁহার নামও শুনিত না। কিন্তু এক হুঁকায় কত কায করিল। শুদ্ধ যে ব্যক্তিবর্গের প্রতি এই কথা খাটে তাহা নহে, জাতির প্রতিও এই কথাই প্রযুক্ত হইতে পারে। যদি আর্য্যেরা এই দেশে আসিয়া অনার্য্যদিগকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতেন, যদি মিথ্যা জাত্যহঙ্কারে প্রলোভিত হইয়া শূদ্রদের প্রতি কঠোর নিয়মের ব্যবস্থা না করিতেন, যদি শূদ্রের ব্যবসায় কেবল—

"একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃকর্ম্ম সমাদিশৎ
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া"
মনু ১। ৯১।

তিন বর্ণের অনসূয় পরিচর্য্যা বলিয়া স্থিরীকৃত না হইত, যদি শূদ্রের নাম রাখিতে হইলেও জুগুপ্সিত নামের ব্যবস্থা না হইত, যদি ব্রাহ্মণ, শূদ্র, আর্য্য, অনার্য্য এক জগতের পরিবার বলিয়া সকলকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিয়া সকলে সকলের সহিত মিলিত হইত, তাহা হইলে ইহাদের সম্মিলনে, আজি কি এক সুমহৎ জাতি সমুদ্ভূত হইত, তাহা হইলে এই আর্য্যানার্য্য সম্মিলিত জাতিই

"পারিত শাসিতে, হাসিতে হাসিতে
সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে।"

অথবা আকবরের পর যদি আরও দুই এক জন আকবর দিল্লীর সম্রাট্ হইত, যদি হিন্দু মুসলমান,ধর্ম্মবিভেদ সত্বেও পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইত, তাহা হইলেই বা আজি কি এক জাতি সমুথিত হইত। হিন্দুর বুদ্ধি, মুসলমানের বল, হিন্দুর শান্তি, মুসলমানের অধৈর্য্য, হিন্দুর ধৈর্য্য, মুসলমানের ব্যাঘ্রবিক্রম, এসমস্ত যদি একত্র হইত তাহা হইলেই বা কি না হইত। যেমন জলে তৈলে একত্র মিলিত না হইয়া একটী অন্যটীর উপর ভাসিয়া থাকে, সেইরূপ অনার্য্যের উপর আর্য্য ভাসিল, হিন্দুর উপর মুসলমান ভাসিল এবং আজি হিন্দু মুসলমানের উপর ইংরাজ ভাসিতেছে। দেখুন কি ঘটনাচক্র। অগ্রে আসিলেন ধর্ম্মান্ধ আর্য্য—বেদ বেদ করিয়া অজ্ঞান। তাঁহার বিশ্বাস—বেদ স্বষ্ট্যর্থ পৃথিবীর স্বষ্টি, বেদ রক্ষার্থ পৃথিবীর রক্ষা, এবং যে দিন বেদ বিনাশ হইবে সে দিন পৃথিবীরও বিনাশ। তাহার পর আসিলেন মুসলমান। কোরাণ যদি তুমি বিশ্বাস কর ভালই, নতুবা আমি তোমাকে কাটিয়া ফেলিতে পারি, কারণ তাহাতে আমার পুণ্য বই পাপ নাই। মুসলমান হিন্দুর অপেক্ষা সহস্র গুণে ধর্ম্মান্ধ। তাহার পর আসিলেন খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টান মুখসর্ব্বস্ব। মুখে ভ্রাতৃভাব কিন্তু কার্য্যে যদি তোমার ৫০০৲ টাকা বেতন হয়, এবং আমার ৪০০৲ টাকা বেতন হয়, তবে তোমাতে আমাতে বিবাহ কিরূপে হইতে পারে। সুতরাং একেবারে ধর্ম্মান্ধ না হইলেও খ্রীষ্টান ধনান্ধ বা মানান্ধ। এই তিন অন্ধ-জাতি ঘটনাচক্রে একত্র আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। যে যাহার পথে চলিতেছে, কাহারও সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই। ঘটনাচক্রের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনেই এসমস্ত পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত। কিন্তু যেখানে ঘটনাচক্রের এরূপ কুটিল দৃষ্টি, সেখানে তুমি-আমি সহস্র ইচ্ছা করিলেও, সহস্র কবিতা লিখিলেও কোন ফল হইবে না।*

তৃতীয় আপত্তি ও তাহার খণ্ডন—অনেক দেশে অল্পদিনের মধ্যেই জাতীয় উন্নতির লক্ষণ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেই কত উন্নতি হইয়াছে দেখুন। যে দেশে ব্রাহ্মণেরা "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া হাত পা ছাড়িয়া বসিয়া থাকিত, আজি সেই দেশে ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়াণ আসোসিয়েসন, ইঃ আসোসিয়েশন প্রভৃতি সংস্থাপিত হইয়া, আমাদের 'দাবি দাওয়া' লইয়া তুমুল আন্দোলন হইতেছে। যে দেশে ভারতচন্দ্র কবিকুল-শিরোমণি বলিয়া গণ্য ছিলেন, সেই দেশে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি চাঁদের হাট কবিত্বের বিমল (কভুবা সমল) সুধা বর্ষণ করিতেছে। যে দেশে স্ত্রীলোকেরা বিধবা হইবার ভয়ে পুস্তক স্পর্শ করিত না, আজি সেই দেশেই ভুবনমোহিনী প্রভৃতি কবিত্বে ভুবন মোহন করিতেছে। আজি আমাদের দেশ ধন-ধান্য-পরিপূর্ণ। আর চাই কি? বাহির হইতে দেখিলে আর কিছুই চাহিবার

---

* ঘটনা চক্রের লীলা সম্বন্ধে আরও অনেক প্রকারের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে সমস্ত সহজেই অনুমেয় বলিয়া বাহুল্যভয়ে লিখিলাম না।

নাই। কিন্তু কিছু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখ দেখি কিছু চাই কি না। ভাই বঙ্গবাসী! তুমি নিজ বক্ষে হস্ত দিয়া বল দেখি তোমার কি উন্নতি হইয়াছে? যাহা ইংরেজে পূর্ব্বে করে নাই বা ভাবে নাই, এমন কয়টি কার্য্য তুমি করিয়াছ বা ভাবিয়াছ? পরের ভাষা শিখিতে তুমি চিরকালই নিপুণ। কিন্তু শিক্ষা ছাড়িয়া দিলে, তুমি আর কি লইয়া স্পর্দ্ধা করিতে পার? তাহার পর তোমার মানসিক বা নৈতিক উন্নতিই কি হইয়াছে? তুমি কি গভীর চিন্তা করিতে শিখিয়াছ? গভীর চিন্তা করা দূরে থাকুক, যাহা গভীর চিন্তা-প্রসূত, তাহা কি তুমি আদর করিতে শিখিয়াছ? যে অভ্যাসের বলে পৃথিবীতে মনুষ্য কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, সে অভ্যাস তোমাদের কয়জনের আছে? কয়জন সে অভ্যাস অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছ? তোমার জাতীয় ভীরুতা কি কমিয়াছে? তুমি বলিবে কমিয়াছে, তবে সে দিনও কি জন্য পাঁচজন নিরস্ত্র, নিরবলম্ব ইংরাজ তোমাদের পাঁচহাজার সুশিক্ষিত, লাটী (গরানকাঠের চলা) ধারী যুবাকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাবর্ত্তিত করিল? তুমি কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে শিখিয়াছ? সত্যপ্রিয়ত্ব তোমার কতদূর আগাইয়াছে? মনে করিও না তোমাদিগকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য এসমস্ত কথা লিখিতেছি। আমি আমার নিজের মধ্যেই বড় উন্নতি দেখিতে পাই না। আমিও তোমাদের অনেকের মত টটা টিটা ইংরেজী শিখিয়াছি এবং প্রয়োজন পড়িলে হাঁপাইয়া কোঁতাইয়া দুই চারিটা (Progress) সম্বন্ধে বক্তৃতাও করিতে পারি। কিন্তু আমি নিজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি, বাস্তবিক উন্নতি প্রায় কিছুই হয় নাই। বাহিরের চাক্‌চিক্য ব্যতীত ভিতরে বড় কিছু লাভ হয় নাই।

যেন স্বীকারই করিলাম যে, আমাদের বাস্তবিকই উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু এ উন্নতিও ত ঘটনাধীন। ইংরেজ এখানে আসিয়াছে বলিয়াই তোমার এ উন্নতি হইয়াছে। তুমি বলিবে ঘটনাধীন, তাহাতে ক্ষতি কি? উন্নতির অতীত কারণ খুঁজিয়া কি দরকার? ভবিষ্যৎ খাঁটি থাকিলেই হইল। ঠিক্ কথা। কিন্তু ভবিষ্যৎ ও অতীত একই সূত্রে সম্বদ্ধ। অতীত যেমন হইবে, ভবিষ্যৎও তাদৃশই হইবে। "As you will sow, so will you reap" যেমন বপন করিবে, তেমন ফলও পাইবে। যে ঘটনায় ইংরাজ এখানে আসিয়াছে, ঠিক্ সেই ঘটনায় ফ্রান্স মিসর দেশ দিয়া এবং রুসিয়া মধ্য আসিয়া দিয়া এখানে আসিতে চেষ্টা করিতেছে। কোন রাজ্যের সম্পদ চিরস্থায়ী নয়।

"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী?
রঘুপতেঃ ক গতোত্তর কোশলা?"

গ্রীশ, রোম, আসিরীয়া, ব্যাবিলোনীয়া, ভারতবর্ষ, মিসর এ সকল দেশ এখন কোথায়? যেমন জীবের পক্ষে জন্মিলে মরণ নিশ্চয়, সেইরূপ জাতির পক্ষে অভ্যুত্থান ও পতন নিশ্চয়। যখন ইংরেজ, অন্তর্বিবাদ বা বহির্ব্বিবাদ বলে তোমার দেশ ছাড়িয়া যাইবে, তখন কি আর তুমি বর্ত্তমান উন্নতিকে উন্নতি বলিবে? যদি ফ্রান্স রাজা হয় তাহা হইলে তোমরাই লিখিবে—

"আজি আমাদের কি শুভদিন উপস্থিত, আজি আমরা 'Republic' এর শাসনে অবস্থিত। মিল, স্পেন্‌সার মূর্খ। আজি আমরা ঐ মূর্খদের সহবাস ত্যাগ করিয়া কুজেঁ, হিউগো প্রভৃতির পরিচর্য্যা করিব। হ্যালাম্, মেকলে ত্যাগ করিয়া গিজো, থিয়ার্স অবলম্বন করিব। ইত্যাদি।" আবার রুসিয়া রাজা হইলেও ঐরূপ Count Balavatsky, Gorschacoff প্রভৃতির গুণানুবাদ করিবে। তোমাদের উন্নতি ঘটনাধীন, সুতরাং টলটলায়মানা। প্রত্যেক বায়ু হিল্লোলে বৃক্ষচ্যুত পত্রের ন্যায় নানাদিকে ঘুরিয়া বেড়াইবে। এরূপ উন্নতিকে আমি উন্নতি বলি না।

তবে কি কোথাও জাতীয় উন্নতি হয়নাই?—হইয়াছে। যে জাতি বলবান,যে জাতি বুদ্ধিশালী ও সাহসী সেই জাতি ক্রমশঃ উন্নীত হইতে হইতে আজি পৃথিবীর রাজা হইয়াছে। আর যে জাতি দুর্ব্বল সে জাতি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে বা হইতেছে। উন্নতি বলের দিকে হইয়াছে। "ভাল-মানুষের" দিকেও মৌখিক উন্নতি হইয়াছে। কার্য্যতঃ বড় উন্নতি হয় নাই।

জাতীয় প্রতিবন্ধক সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি। এক্ষণে অন্য অন্য প্রতিবন্ধকের কথা অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব।

খ—সামাজিক প্রতিবন্ধক।—যিনি যে সমাজে বাস করেন, সেই সমাজের অবস্থা তাঁহার অবস্থাকে অনেক পরিবর্ত্তিত করে। হিন্দুদের সমাজ আজি সাতশত বৎসর পরাধীন। পরাধীনতার যে সমস্ত দোষ তাহা জাতি মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কাহার সাধ্য যে সেই সমস্ত দোষের প্রতিকূলে গমন করে? দেশ-শাসন প্রণালীর প্রতি ঔদাস্য,রাজাজ্ঞায় সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারের সন্তোষ প্রদর্শন, আত্মকষ্ট গোপন এবং অন্যের নিকট স্বাধীনভাবে নিজ কথা প্রকাশ করনে অনিচ্ছা, সাধ্যমত ফাঁকি দিবার চেষ্টা, বলে না পারি কৌশলে পারিব ইত্যাকার বিশ্বাস প্রভৃতি নানা দোষ আমাদের চরিত্র মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কেহ ইচ্ছা করিয়া এই সমস্ত দোষের মূলোচ্ছেদ করিতে পারেন না। যদি কখন আমরা আত্মশাসন প্রাপ্ত হই, এবং যদি কখন শত শত বৎসর নিরুপদ্রবে ঐ আত্মশাসন প্রণালীর ফলাফল ভোগ করিতে পাই, তাহা হইলে ঐ সমস্ত ঘটনা-বলে, আমাদের চরিত্র-জাত দোষকণ্টক উন্মূলিত হইতে পারে। নতুবা কেবল বাক্যাড়ম্বর সার। শুদ্ধ যে নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে ঐ কথা প্রযুক্ত হইল, তাহা নহে। আমাদের মানসিক প্রবৃত্তি, বুদ্ধি শক্তি প্রভৃতি সমস্তই এইরূপ সামাজিক দোষে কলুষিত হইয়া রহিয়াছে।

গ—পারিবারিক প্রতিবন্ধক।—আমার পিতা মাতা যে প্রকৃতির, আমার বন্ধুবর্গ এবং আমার কুটুম্ব স্বজন আমাকে যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, আমি ইচ্ছা করিয়াও তাহার প্রতিকূলাচরণ করিতে পারি না। আমরা যে শুদ্ধ পিতা মাতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে উত্তরাধিকার লাভ করি, তাহা নহে; তাঁহাদের নীতি, তাঁহাদের বুদ্ধিও আমাদের নীতি ও বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়। যদি ঘটনাক্রমে আমি সচ্চরিত্র পিতা মাতা

হইতে জন্মলাভ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার চরিত্রেও ঐ সততা লক্ষিত হইবে। এবং যদি আমার পিতা মাতা সৎ হইয়াও বাল্যকালে আমার শিক্ষার প্রতি অযত্ন করিয়া থাকেন, অথবা আমাকে আলালের ঘরের দুলাল প্রস্তুত করাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার ভবিষ্যৎ অনেক গুলি দোষ, অনেক গুলি কুচরিত্রের বীজ আমার পিতা মাতাই আমার হৃদয়ে রোপিত করিয়া গিয়াছেন। অথবা যদি বাল্যকালে ঘটনা ক্রমে আমরা সৎসঙ্গী প্রাপ্ত হই, তাহা হইলেও ক্রমে আমার চরিত্রের উপাদান সেই সময়েই সংগৃহীত হইয়া থাকে। এই রূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এসমস্ত সহজেই অনুমেয়।

অতএব হে নৈতিক শিক্ষক এবং হে ধার্ম্মিক শিক্ষক! তোমরা অধ্যয়ন গৃহে বা বেদীতে বসিয়া দুই চারি বক্তৃতাতে জাতীয় স্বভাব উন্নত করিবে, এ আশা করিও না। চরিত্রোন্নতির পক্ষে কতগুলি প্রতিবন্ধক এবং সেই প্রতিবন্ধক গুলি কিরূপ দুরতিক্রম্য তাহা বুঝিয়া দেখ। শুদ্ধ মুখের কথায় এ সমস্ত প্রতিবন্ধক দূরীভূত হইতে পারে না। একটি বৃক্ষ হইতে উপদেশ লাভ কর। যখন বৃক্ষ হইতে সুফল আশা করা যায়,তখন কি কেহ তাহার ফুল বা ফল লইয়া টানাটানি করে? বৃক্ষ হইতে সুফল লাভ করিতে হইলে, বৃক্ষমূলে জলসেক করিতে হইবে। বৃক্ষমূলে সার নিক্ষেপ করিতে হইবে, যাহাতে বৃক্ষের উপর সূর্য্যোত্তাপ পরিমিত রূপে পড়িতে পারে সেই চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা যদি তুমি বৃক্ষশাখা বা ফলফুল লইয়া তাহাদের মধ্যেই উন্নতির উদ্যোগ আরম্ভ কর, তাহা হইলে শাখা ভগ্ন হইবে, ফলফুল বিনষ্ট হইবে এবং বৃক্ষের উন্নতিও হইবে না। যদি যথার্থ উন্নতির ইচ্ছা কর,তাহা হইলে ঘটনার মধ্যে বৈজাত্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা কর। চরিত্র-বৃক্ষমূলে যে সকল ঘটনা কণ্টক আজি কত শত বৎসর ধরিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে সে সমস্ত উন্মূলিত কর। ঘটনা যদি সেই রূপই থাকে, তাহা হইলে ঘটিত ফলও সেই রূপই হইবে। অনেকে মনে করেন, বাঙ্গালীর উন্নতি অসম্ভব। ইহার অর্থ এই যে, যে সকল ঘটনায় বাঙ্গালী এরূপ হইয়াছে তাহার দূরীকরণ অসম্ভব। অসম্ভব কি না, তাহা চেষ্টা করিয়া পরীক্ষা করা উচিত। কিন্তু অসম্ভব না হউক, বাঙ্গালী বা হিন্দুর উন্নতি অতীব কষ্টসাধ্য।

যদি কেহ এ প্রবন্ধের এতদূর পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বলিবেন --'তবে এখন কি কর্ত্তব্য?' তিনি বলিবেন—

"Where then shall hope and fear their objects find?
Must dull suspense corrupt the stagnant mind?
Must helpless man, in ignorance sedate,
Roll darkling down the torrent of his fate?"

'কাহাতে করিব আশা কাহাতে বা ভয়?
সন্দেহে নিশ্চেষ্ট মনে জীব কিসে রয়?
অজ্ঞানে সন্তুষ্ট হয়ে, নিরাশ মানব,
অন্ধ মত ভাসিবে কি, অদৃষ্টের স্রোতে?'

আমি উত্তর করি—না। তবে এক কথা যে, যে বিষয়ে উন্নতি অসম্ভব, সে বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে উন্নতি সম্ভব তাহা অবলম্বন করা যাউক'। আমরা যেরূপ 'ভাল-মানুষ' হইবার আশা করি, অর্থাৎ নিজে সম্পূর্ণরূপ শুদ্ধ চরিত্র হইব, সদাত্মা হইব, পৃথিবীর পাপে কলুষিত হইব না, কাহারও অনিষ্ট করিব না, প্রাতঃস্নায়ী পূত ব্রাহ্মণের ন্যায় পৃথক্ আসনে বসিয়া কলুষভয়ে, অশুদ্ধি ভয়ে অন্য কাহাকেও স্পর্শও করিব না, এবং যে 'ভাল-মানুষের' ভাব প্রকাশিত ভাবে বা অপ্রকাশিত ভাবে আমাদের মধ্যে কার্য্য করিতেছে সেইরূপ ভালমানুষ হওয়া মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। রঘুতে বর্ণিত ভাল-মানুষের বিষয় বিবেচনা করুন। 'প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ' যাঁহার অন্তঃপুর রমণী-কুল পরিপূর্ণ 'অবরোধে মহত্যপি,' তিনি একথা কিরূপে বলেন? তাঁহার 'অবরোধ মহৎ' হওয়ায় প্রজার লাভ কি?

'অগৃধ্নু রাদদে সোঽর্থং'

অগৃধ্নু কি না, জানা যাইবে কি রূপে? যে অর্থ গ্রহণ করিল, সে অর্থ গ্রহণবশতঃই গৃধ্নু। কার্য্য দেখিয়া চরিত্র নির্ণয় হইবে। মনের ভাব দেখিয়া কিরূপে চরিত্র নির্ণয় হইতে পারে? 'অসক্তঃ সুখমন্বভূৎ' মনে অনক্ত কিন্তু কার্য্যে সুখ ছাড়িতে পারি না। যদিও রাজাদের পক্ষে ঐ সকল বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তথাপি কালিদাস যে ঐসমস্ত গুণকে সচ্চরিত্রের পরাকাষ্ঠা মনে করিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সংসারে থাক কিন্তু পদ্মপত্রে জলবৎ বিচ্ছিন্ন থাকিও, আপনাকে অকলুষ রাখিও। ইহাই আমাদের দেশে নীতিশিক্ষকের পরামর্শ। হিন্দুর, বৌদ্ধের, বৈষ্ণবের ও কৈশব ব্রাহ্মের এই একই শিক্ষা। আপনাকে যথাসাধ্য কলুষস্পর্শ হইতে দূরে রাখিও। আমরা এই প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, এ আশা আকাশকুসুমবৎ নিষ্ফল। সুতরাং এ সম্বন্ধে আশা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়ে আশা বাঁধিতে হইবে। যে আশায় কেহ কখন সফল হয়নাই, এবং সম্ভবতঃ যে আশায় কেহ কখনও সফল হইবেও না সে আশা (মধুর হইলেও) বর্জ্জনীয়া। কিন্তু এ আশা পরিত্যাগ করিয়া আর কি আশা অবলম্বন করা যাইতে পারে?

শুদ্ধ যে আমাদের দেশেই এই "ভালমানুষত্ব" লাভ করিবার আশা ছিল, তাহা নহে। ১৫ই অক্টোবরের "লণ্ডন স্পেক্টেটর" বলিতেছেন—"The stoic morality, perhaps also to some extent, the early christian morality fostered a purely individual sense of rightness··· The teachers of that age sought to make men look for rightness only within····It is evident that if this is accepted not as an important side of truth, but as the whole truth there is no such thing as a social code. We are not members of each other, there is no common moral life." অর্থাৎ, "ষ্টোইকদের মধ্যে এবং বোধ হয় প্রথম প্রথম খ্রীষ্টানদের মধ্যেও যে নীতি প্রচলিত ছিল, তাহাতে কেবল ব্যক্তিগত বিশুদ্ধতা

(সততা) পরিপোষণ করিবার পরামর্শ দিত। সেই সময়ের শিক্ষকেরা মনুষ্যকে স্ব স্ব আন্তরিক সততার দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিতেন। যদি এই নীতিকে, নৈতিক ব্যবস্থামালার প্রয়োজনীয় অংশ না বলিয়া, সমস্ত নীতির সমষ্টি বলা যায় তাহা হইলে সামাজিক ব্যবস্থা বলিয়া একটা কথা থাকে না। আমরা পরস্পরকে পরস্পরের সহচর (অংশ) বলিয়া মনে করিতে পারি না, এবং সাধারণের মধ্যে নৈতিক জীবন থাকে না।"

আমরাও এই আত্মোৎকর্ষের যথাসাধ্য প্রতিবাদ করিতেছি। লণ্ডন স্পেক্‌টেটর ইহার ফলাফল দেখিয়া ইহাকে দোষ দিয়াছেন, কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি যে ইহা কার্য্যতঃও অসম্ভব। সংসারে থাকিয়াই বল, বা সংসার ছাড়িয়াই বল, এইরূপ অকল্মষত্বলাভ করা অসম্ভব। কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থেরও এই মত। কিন্তু তিনি আরও বলেন, এইরূপ অকল্মষত্ব যদি কেহ লাভ করে, তাহাতে প্রশংসা বা শ্লাঘার বিষয় কিছুই নাই। তিনি কবি, তিনি যুক্তি প্রয়োগ করেন না, তিনি কেবল চিত্র প্রদর্শন করেন মাত্র। শুনুন তাঁহার চিত্র কিরূপ।

১ম চিত্র—সংসার পরিত্যাগ করিয়া বা সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়া অকল্মষত্ব লাভকরা;

"A picture had it been of lasting ease
Elysian quiet, without toil or strife,
No motion, but the moving tide, a breeze,
Or merely silent nature's breathing life.
Such, in the fond illusion of my heart,
Such picture would I at that time have made
And seen the soul of truth in every part
A faith, a trust, that could never be betrayed" (১)

কবি যৌবনকালে মনুষ্যচরিত্রের এই ভাবকে প্রশংসা করিতেন। মনুষ্য সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকিবে, তাহার মধ্যে স্বর্গীয় শান্তি বিরাজ করিবে, কাহারও সহিত কলহ বিবাদ থাকিবে না, যেমন নদীবক্ষে বায়ুর মৃদুমন্দ গতি, সেইরূপ মনুষ্যজীবনেও একটি মৃদুমন্দগতি থাকিবে, এই মাত্র। কবি মনুষ্যজীবনের এই ভাবকেই প্রকৃত ভাব বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস করিতেন। আর কিছু হও বা না হও ভাল-মানুষ হও, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে (তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুর পর) তাঁহার এই মতের পরিবর্ত্তন হইল। তিনি বলিতেছেন—

১—উপরি উদ্ধৃত ইংরেজী কবিতার অনুবাদ; যথাঃ—

আঁকিতাম চিত্রে, আমি সুদীর্ঘ বিরাম,
স্বর্গীয় পবিত্র শান্তি; শ্রান্তি দ্বন্দ্বহীন,
জোয়ার উচ্ছ্বাস কিম্বা, বায়ুর হিল্লোল,
অথবা সে প্রকৃতির নিস্তব্ধ নিশ্বাস,
ইহা ভিন্ন অন্য গতি না থাকিত চিত্রে
নির্ব্বুদ্ধি চিত্তের ভ্রমে, আঁকিতাম ইহা,
সে সময়ে ঐ চিত্র, হইত অঙ্কিত।
মনে হত আঁকিয়াছি প্রকৃত ঘটনা।
এ বিশ্বাস কিছুতেই টলিত না মোর।

২য় চিত্রঃ—

"So, once it would have been, 'tis so no more
I have submitted to a new control
A power is gone which nothing can restore
A deep distress*hath humanised my soul." (২)

এখন আর তিনি ঐ নিশ্চলতা বা নিশ্চিন্ততাকে জীবনের উৎকর্ষ বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার মন এক্ষণে humanised হইয়াছে অর্থাৎ তিনি এক্ষণে মনুষ্যকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন। এখন আর তিনি নিজের উন্নতি লইয়া ব্যস্ত নহেন। তিনি অন্যকে ভালবাসিতে চাহেন। এইরূপে তাঁহার মত ও তাঁহার বিশ্বাসের গতি দেখাইয়া তিনি নিজ কর্ত্তব্য ব্যাখ্যা করিতেছেন।

"Farewell, farewell, the heart that lives alone
Housed in a dream, at distance from the kind
Such happiness, wherever it be known
Is to be pitied, for 'tis surely blind.
But welcome fortitude, and patient cheer
And frequent sights of what is to be borne !
Such sights or worse as are before me here ;*
Not without hope we suffer & we mourn."(৩)

আমরাও প্রায় এই কথাই বলি। মনুষ্য হইতে দূরে একা বাস করায় সুখ নাই, লাভও নাই। সংসারেই সাহস অবলম্বন করিয়া,ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া,সানন্দচিত্তে, কখনও বা সুখ-দোলায় আরোহণ করিয়া, কখনও বা দুঃখকণ্টকে বিদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইবে। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে, কি আশায় ? " ভালমানুষ " হইবার আশা কতক থাকিতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ " ভালমানুষ " হওয়া অসম্ভব। অতএক অন্য আশা কর। সে আশা এই যে, অন্যের ব্যবহারে লাগ। এই মনুষ্য-জীবন ক্ষণিক। ইহাতে মাহাত্ম্য প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ সদ্গুণের আশা বিড়ম্বনা।

---

* His brother's death.

(২) পূর্ব্বে ছিল এই ভাব, নাহি আজি তাহা
নূতন শাসনে আজি, হয়েছি আবদ্ধ।
মনের সে শান্তি মম, গিয়াছে ঘুচিয়া,
দারুণ বিষাদে পড়ি, শিখিয়াছি আজি,
নয়প্রেমপূর্ণ চিত্ত হয়েছে আমার ৩

* He was seeing the picture of Peele castle in a store .

(৩) চাহিনা সে চিত্ত যাহা একা করে বাস,
স্বপ্নালীক গৃহে, দূরে লোকালয় ছাড়ি।
এ সুখ যাহার আছে, (যেথানে সে থাক্)
অনুকম্পা-যোগ্য সেই অন্ধমতি নর।
আসুক সাহস কিন্তু, ধৈর্য্য, প্রসন্নতা,
অবশ্য ভুগিব যাহা, আসুক তা সদা,
আসুক এমনই দৃশ্য, দেখিতেছি যাহা,
অথবা এ হতে ক্রূর আসে, তাও ভাল।
যত কষ্ট ভুগি মোরা, কিবা যত শোক
সকলেরই মধ্যে আছে আশার মাধুরী।

কিন্তু এককার্য্য সকলের দ্বারাই কতকদূর সম্ভব। যাহার যতদূর ক্ষমতা, আইস সেই ক্ষমতা টুক লইয়া আমরা একে অন্যের ব্যবহারে লাগি। দুষ্কর্ম্ম, দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারি না বলিয়া শুদ্ধ মনে মনে অনুতাপ করায় লাভ নাই। কারণ সহস্র চেষ্টা করিয়াও যাহা আমাদের রক্তের সঙ্গে গ্রথিত, তাহা ত্যাগ করিতে পারিব না। তবে যাহা আমাদের ক্ষমতাধীন, আইস তাহাতেই এই বৃথা, অসার জীবনের কিঞ্চিৎ সদ্ব্যবহার করি। করিয়া লাভ কি? লাভ,—

১ম। অঘটনীয় কার্য্য হইতে অবসর লইয়া সম্ভবপর কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়া।

২য়। এইরূপ পরের কার্য্য সংসারের সঙ্গে মিশিয়া করিলে, জাতীয় উন্নতির মূলে যে সকল ঘটনাভূত প্রতিবন্ধক আছে, সেই সমস্ত ঘটনার নিরাকরণ করা যাইতে পারে।

ফলতঃ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের জ্ঞাতব্য কতকগুলি বিষয় মাত্র আমাদের বুদ্ধিগোচর হইতে পারে। ঈশ্বর কি, আত্মা কি প্রভৃতি বিষয় মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। জ্ঞানজগতে যে কথা, নৈতিক জগতেও সেই কথা। যে সকল নীতি এক্ষণে শিক্ষিত হইতেছে, অর্থাৎ অকাম হও, অনাসক্ত হইয়া সুখ অনুভব কর প্রভৃতি, এ সমস্ত মনুষ্য ক্ষমতার দুষ্প্রাপ্য। মনুষ্য যেরূপ জ্ঞানজগতে আলোচনার সীমা কমাইয়াছে অর্থাৎ ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, পৃথিবী, শরীর প্রভৃতির তত্ত্ব মীমাংসা করিতেছে, সেইরূপ নৈতিক জগতেও অকামত্ব, ভালমানুষত্ব প্রভৃতি আকাশ কুসুম পরিত্যাগ করিয়া, অন্যের উপকার, অন্যের সুখবর্দ্ধন, দুঃখনাশ প্রভৃতি যাহা মনুষ্যের ক্ষমতার আয়ত্ত, সেই সমস্ত নীতিই অবলম্বন করিতে হইবে।

শ্রীনীঃ—

প্রকৃতি বিজ্ঞান।

মেঘ।

কখনও কখনও প্রত্যূষে সুশীতল প্রাতঃসমীরণ সেবনে উৎসুক হইয়া ভাগীরথীপুলিনে বসিয়া জলরাশির প্রবাহলীলা দেখিতে দেখিতে ঊর্দ্ধে নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতাম, হায়! প্রাতঃ সময়ে সুনীল আকাশপটে পলমরেখার ন্যায় ঐ শুভ্র, সুকোমল মেঘরাশি কি প্রয়োগে প্রবল ঝটিকাদির অগ্রদূত? বিদ্যুতের মোহন রূপ, মৃগতৃষ্ণার জলাশয়-প্রলোভন, সৌন্দর্য্যে বিনাশের সম্মিলন যেরূপ পরিণামবিরুদ্ধ, নির্ম্মল আকাশে পূর্ব্বোক্ত আপাত-নিরীহ মেঘরাশিও সেইরূপ। প্রমোদের পরিণাম যে দুঃখ হইবে, গলিত-ধাতু-প্রস্রবণ যে তুষারে আবৃত থাকিবে, সুগন্ধ শোভনীয় পুষ্পে যে কালকূট রহিবে, বহুদর্শিতা ভিন্ন তাহা কে পরিজ্ঞাত করাইতে পারে? অ-

ন্যান্য জাতীয় মেঘ অপেক্ষা উহা দেখিতে অতিশয় সুন্দর, সতত নির্ম্মল আকাশেই উহা প্রকাশ পায়, এবং দুষ্টা বারবিলাসিনীর ন্যায় সুদূর হইতে ক্ষণমাত্র দর্শন দিয়া ভবিষ্যৎ অনিষ্টের সুত্রপাত করিয়া যায়। উহার আকার ঘোটকীর লাঙ্গুলের ন্যায় বলিয়া ইংলণ্ডে উহার নাম Mare's tail cloud। উহার আকার বক্ররেখার ন্যায় বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা উহার Cirrus নাম দিয়াছেন। এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, আদিরসপ্রিয় প্রসিদ্ধ ভারতে উহার কিরূপ নামকরণ হইবে। আমাদের সুবিজ্ঞমণ্ডলী বিচারকালে সর্ব্বদা "দেশ কাল রূপ পাত্র" বিবেচনা না করিয়া কোন বিষয়ে মত দেন না, এই জন্য উহার বিবরণ সমস্ত বিশদ রূপে বর্ণনা করিয়া, উহার নামকরণ সম্বন্ধে সমুৎসুক হৃদয়ে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

গিরি উপরে গিরি দেখিতে যেরূপ, Cumulus নামে অন্যতম মেঘরাশিও দেখিতে সেইরূপ। উহার মূর্ত্তি গম্ভীর ও প্রশান্ত; সূর্য্যালোকে শুভ্র ও সমুজ্জ্বল; সূর্য্যাস্তে ভীষণ ও কৃষ্ণবর্ণ। সচরাচর উহা সূর্য্য উঠিবার কএক দণ্ড পরে আকাশে প্রকাশ হয়, মধ্যাহ্নে যখন সূর্য্য অতীব প্রখর হয়, তখন উহা সমধিক উচ্চতা অবলম্বন করে; এবং ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়া সূর্য্যাস্ত সময়ে বিলীন হয়। যদি উহা বিশেষ উচ্চতা অবলম্বন ও কলেবর বৃদ্ধি না করে, এবং উহার উপরিভাগে গোলাকৃতি হয় ও দিনমানে তাপের সময় প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সেই দিন যে নিরুপদ্রবে যাইবে তাহাই কহিয়া দেয়। কিন্তু ঐরূপ না হইয়া যদি উহা শীঘ্র শীঘ্র আপন কলেবর বৃদ্ধি করে, ও সুদূরে না রহিয়া নিম্নগামী হয়, ও প্রদোষ সময়ে বিলীন হইতে না ইচ্ছা করে, তাহা হইলে বৃষ্টির আশা করা যায়। এইরূপ অবস্থায় যদি অসংলগ্ন পশমসদৃশ মেঘশাখা বিচ্ছিন্ন হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইতে থাকে, তাহা হইলে বৃষ্টি যে নিকটবর্ত্তী তাহা প্রকাশ করে। এতদ্ভিন্ন জলভারে মন্থরীভূত Nimbus নামে যে কৃষ্ণবর্ণ নিবিড় মেঘ রাশি, ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বিমানে পরিভ্রমণ করে তাহার নিকটও আমরা সর্ব্বদাই জল পাইয়া থাকি।

যে লম্বিত মেঘমালা নিম্নদেশ হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া স্তরবদ্ধ হয়, উহা Stratus নামে খ্যাত। বিরহ বিধুর পূর্ব্বদিক, দিবাকর বিরহে, লম্বিত মেঘমালা রূপ এক বেণী ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় দীন অবস্থা প্রকাশ করিবার উল্লেখ যে কখনও কখনও সংস্কৃত কাব্যে পাওয়া যায়, উহা বোধ হয় এই মেঘ। ইহা প্রায় সূর্য্যাস্ত সময় হইতে প্রকাশ পাইয়া রজনীর সহিত ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই ইহার অপর একটি নাম Cloud of night। যাবতীয় মেঘ অপেক্ষা ইহা পৃথিবীর অধিক অনুগত; এবং পার্ব্বতীয় দেশে ইহা প্রায়ই শৈলপৃষ্ঠে সুখে শয়ন করিয়া রজনী অতিবাহিত করে। জনপ্রবাদে ইহা প্রকাশ আছে যে, ইহা রাত্রিকালে শয্যাবরণার্থ পর্ব্বত-জাত শাল বৃক্ষের নব নব পল্লবসকল আহরণপূর্ব্বক জড় করে। এই প্রবাদ যে কতদূর সত্য তাহা সুবিজ্ঞ সহৃদয় পাঠক মাত্রেই বুঝিবেন।

মিশ্রমেঘ।

পূর্ব্বোক্ত সীরাস ও কিউমিউলাস্ সহযোগে যে নূতনরূপ মেঘের উৎপত্তি হয় উহাকে সিরকিউমিউলাস্ কহে। উহা, সিরসের অংশ সকল স্বতন্ত্র হইয়া কিউমিউলাসের সংযোগে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার মেঘকদম্বে বিমানের চারিদিকে প্রকাশ পায়। এই মিশ্র মেঘকদম্ব নিদাঘ সময়ে সততই পরিদৃষ্ট হয়। উহারা সিরাস অপেক্ষা সুশ্রী। উহাদিগের গঠনপ্রণালীর সৌন্দর্য্য ও মৃদু মন্দ গতির মধুরতা এরূপ যে, প্রেমাগমে প্রমদাগণের রূপসম্পত্তি ও ধীরগতির সহিত তুলনার বিশেষ যোগ্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ কবিবর কালিদাস উহাদিগকে লক্ষ্য করেন নাই, সুতরাং ভারত-সাহিত্যে উহারা উপমার মধ্যে চলিত নাই। যাহাহউক গতানুশোচনা না করিয়া, অল্প বৃষ্টির পর সূর্য্যালোকে উহারা যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে আমরা এইক্ষণে তাহাই দেখিতে বর্ত্তমান বঙ্গীয় কবিরত্নদিগকে অনুরোধ করি।

সিরাস ও ষ্ট্রেটাস সহযোগে যে মিশ্র মেঘের উৎপত্তি হয়, উহাকে সিরোষ্ট্রেটাস কহে। ইহাকে চিনিতে হইলে, ইহার অবয়ব অপেক্ষা গঠন-প্রণালীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করা আবশ্যক; কেন না, মেঘ স্বভাবতঃ বহুরূপী, মুহূর্ত্তে নানা আকার ধারণ করে। ইহার অবয়ব দীর্ঘাকৃতি কিংবা ঈষৎবক্র ও পরিধির ভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম। এই মেঘরাশিও ঝটিকাদির অগ্রদূত; এবং ইহার রাশিগত আধিক্য ও সাময়িক স্থায়িত্ব অনুসারে ঝটিকাদির সময় একরূপে নিরূপিত হয়। কখন কখন ইহা সিরাস ও কিউমিউলাসের সহিত একত্রে ঝটিকাদির সময়ে প্রকাশ পায়, এবং তাহাতেই ঝটিকাদির স্থায়িত্ব নির্ণীত হয়; কেন না যদি সিরোকিউমিউলাস্ শীঘ্র অদৃশ্য হইয়া ইহাকেই সমরক্ষেত্রে রাখিয়া যায়, তাহা হইলে অধিক ঝড় ও বৃষ্টি প্রত্যাশা করা যায়। যদি সিরোষ্ট্রেটাস পরাভূত হইয়া সমরস্থল হইতে প্রস্থান করে, তাহা হইলে ঝড়ের সময় যে অতীত ও শুভ সময় নিকটবর্ত্তী তাহাই ঘোষণা করে।

নিম্বাস নামে পূর্ব্বে যে জলদরাশির উল্লেখ করা হইয়াছে উহা কিউমিউলাস, সিরাস ও ষ্ট্রেটাস এই তিন প্রকার মেঘের শুভ সংযোগে ঘটিয়া থাকে। এই মেঘই সতত পৃথিবীকে শস্যশালিনী, এবং শুষ্ককণ্ঠ নিদাঘচাতকের তৃষ্ণা নিবারণ করে। উহা সততই ধূম্র বা নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া দেখিতে সুন্দর নহে বটে, কিন্তু,

'রূপেতে কি করে তার, গুণেরই প্রশংসা যার'.

(ক্রমশঃ) শ্রী—

বৌদ্ধ শাস্ত্র।

বৈদিক ধর্ম্মই আর্য্যগণের সর্ব্বপ্রাচীন ও প্রধান ধর্ম্ম। যৎকালে আর্য্যগণ অভ্রংলিহ হিমালয়ের তুষারধবল শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তৎসময়েই বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য বিষয় সকলও সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসেন। তাঁহারা ক্রমশঃ ভারতক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইলে তাঁহাদের সনাতন ধর্ম্মও সেই সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধমূল হইয়া গেল। সেই সময় হইতেই উহা নানারূপ শাখা প্রশাখাদি বিস্তার করিয়া ক্রমশঃ মহাবৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে; অনেকে ইহা সমূলে বিনষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শাখা প্রশাখাদি নষ্ট করিলে ইহা আপনা হইতেই ধ্বংশ হইয়া যাইবে, এই মানসে সময়ে সময়ে শাখা প্রশাখাদি কর্ত্তন করিয়াছেন— মূলোৎপাটনেরও নানারূপ চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু মূল বৃক্ষের তাহাতে কিছুই হয় নাই। যদিও উহা কিছুকাল নূতনাঙ্কুর উদ্গমন করিতে অশক্ত হইয়াছিল, তথাপি কিছুদিন পরেই উহা দ্বিগুণতর তেজে নব পল্লব সমুদ্গত করিয়া সেই ভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু বৈদিকধর্ম্ম অটল অচলবৎ দণ্ডায়মান থাকিলেও ইহার মধ্যে কুসংস্কারমূলক নূতন নূতন বিষয় প্রবেশ লাভ করিয়া ইহাকে এরূপ কলঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহা আমূল সংশোধন না করিলে আর উপায়ান্তর নাই—শীঘ্রই সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। বৈদিক সময়ের প্রথমাবস্থায় যে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, মহাভারতে তাহার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি অসংখ্য জাতি বর্ত্তমান ছিল না, শূদ্রগণ এবং অবলা স্ত্রীজাতিও বেদ উচ্চারণে সমর্থ ছিল; তখন সকলেই একধর্ম্মাবলম্বী, একবর্ণীয় এমন কি এক পরিবারভুক্ত মত ছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ কুসংস্কার প্রবেশপথ পাইতে লাগিল এবং জাতিভেদ প্রথা দেশে দেশে প্রচলিত হইয়া মহা অনর্থের মূল হইল। ক্রমে বৈদিক প্রতি কার্য্যেই পশুবধ হইতে লাগিল, অদ্য কোন লোক কোন যজ্ঞ করিবেন, একটি গো বলি দেওয়া হইল—কল্য একটি উষ্ট্র উৎসর্গীকৃত হইল; এইরূপ বৈদিক শাস্ত্রের প্রতি পৃষ্ঠা, প্রতি পংক্তি পশুরক্তে রঞ্জিত। এই সকল স্বচক্ষে দর্শন করিয়া সময়ে সময়ে দুই এক জন সহৃদয় লোকের অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের সঞ্চার হইল। গৃহপ্রাঙ্গণে, সাধারণ চত্বরে, লোকপরিপূর্ণ প্রশস্ত রাজবর্ত্মে, যে স্থানেই গমন করেন, সেই স্থানেই এই ভয়ানক নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করিয়া দুই এক জন লোক দুঃখে শোকে জর্জ্জরিত হইলেন; কি প্রকারে তাহাদিগকে এই দুর্নিবহ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিতে পা-

রেন তাহারই জন্য সচেষ্টিত হইলেন; কিন্তু সমুদয় লোকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া সহজ ব্যাপার নহে; কে নির্ব্বাক পশুগণকে উদ্ধার-নিমিত্ত সমুদয় জগৎ বিসর্জ্জন দিতে পারেন? এমন স্বার্থশূন্য দেববৎ মানব জগতে কেহ ছিলেন কি?—অবশ্য ছিলেন; তিনি জগজ্জন পূজিত শাক্যসিংহ। বৈদিক ধর্ম্মের এইরূপ অবনতি সন্দর্শনে তাঁহার বিশাল মানসক্ষেত্রে করুণার সঞ্চার হইল; কিসে পশুগণ এই ভয়ানক অত্যাচারের পরুষ হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারে তিনি তাহার উপায় চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলেন; যে ধর্ম্ম আমূল পশুবধে কলঙ্কিত, সে ধর্ম্ম তাঁহার নিকট অলীক ও অসার বলিয়া উপেক্ষিত হইল; তিনি নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপনে ব্রতী হইলেন,—কিন্তু কার্য্যটি সহজ নহে। কে পার্থিব ধ্রুব সুখে জলাঞ্জলি দিয়া অনিশ্চিত সুখের প্রত্যাশায় ধাবমান হইতে পারেন? কে এই নিমিত্ত স্বার্থশূন্য, আত্মত্যাগ-মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ঐহিক সুখ অবহেলায় পরিত্যাগ করিতে পারেন? আত্মত্যাগের এই জলন্ত দৃষ্টান্ত কে প্রদর্শন করিলেন? ইনি কপিলবস্তু নগরের অধিপতি শুদ্ধোদন রাজার এক মাত্র পুত্র গৌতম-বুদ্ধ। যৎকালে ভারতবর্ষীয় সমুদয় লোক ভয়ঙ্কর কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া গর্হিত কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর, গৌতম তৎকালে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আত্মবিসর্জ্জন করিতে সমুদ্যত হইলেন। যখন ভারত ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িকের আবাসস্থান; যখন পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি ছিল না, যখন সমাজস্থ কোন লোকের উপর অবধ্য অত্যাচার করিলে ইহার অপর কাহারও হৃদয়ে আঘাত লাগিত না, যৎকালে দুর্দ্দমনীয় ব্রাহ্মণের লৌহমুদ্গর অন্য সকলেরই মস্তক চূর্ণীকৃত করিত, যখন স্বার্থপর ব্রাহ্মণই স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন, যে সময়ে তাঁহারা বদন হইতে যাহা নিঃসৃত করিতেন তাহাই বেদবৎ পূজনীয় হইত, সেই ভয়ঙ্কর সময়ে সমাজকে সম্পূর্ণরূপে সংস্করণ করিবার সময় আসিল। বুদ্ধদেব ইহার জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন; সঙ্গে কেহ নাই—কেবল জ্ঞানের অলৌকিক, অমোঘ যুক্তি; জ্ঞানাস্ত্র ভিন্ন তিনি অন্য কোন অস্ত্রই গ্রহণ করেন নাই। ইহার জন্য তিনি না করিয়াছেন কি? তাঁহার পিতা বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর—তিনিই তাঁহার এক মাত্র উত্তরাধিকারী—সুতরাং তাঁহার সম্মুখে বিশাল রাজ্য, পার্শ্বে প্রণয়প্রতিমা প্রণয়িনী গোপা এবং তাহার প্রেম ক্রোড়ে সুকুমার পুত্রের চাঁদমুখ—চতুর্দ্দিকে হৃদয় বন্ধুগণের অকৃত্রিম ভালবাসা। কিন্তু এসকল কিছুই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিল না; ইহলোকে যাহা কিছু সুখের নিদান বলিয়া অনুমিত হইতে পারে, বুদ্ধদেব তৎসমুদায়েরই অধিকারী ছিলেন, কিন্তু সম্মুখবর্ত্তী সহস্র সহস্র লোকের ভীষণ যন্ত্রণা তাঁহার মনকে ক্লিষ্ট করিল,—কি উপায়ে তাহাদের পরম সুখ লাভ হয় তাহাই তাঁহার চেষ্টা হইল। তিনি সমুদয় পার্থিব সুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন,—সুখ কোথাও নাই; আপনার হৃদয় অন্বেষণ

করিলেন—সর্ব্বনাশ—হৃদয় শূন্য—হৃদয় অভাবে পরিপূর্ণ; কিসের অভাব তাহা তখন তিনি অবগত নহেন, কি দিলে তাহার পূরণ হইবে তাহা তাঁহার অজ্ঞাত; কেবল তিনি চতুর্দ্দিক শূন্যময়ই দর্শন করিতে লাগিলেন; মন কিছুতেই শান্ত হইল না—হৃদয় অশান্তির আলয়স্বরূপ হইল;—যত চিন্তা করেন, ততই অশান্তির ভিন্ন ভিন্ন ভীষণতর মূর্ত্তি সকল তাঁহার সম্মুখে ক্রীড়া করিতে লাগিল। ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন তাঁহার মনে প্রকৃত ধর্ম্মভাবের অভাব হইয়াছে; বৈদিক ধর্ম্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলেন, তাঁহার মন পরিতৃপ্ত হইল না—সেই অভাব সেইরূপই প্রবল রহিয়া গেল; কাজেই তিনি ইহার বিশেষ প্রতিকারে সচেষ্ট হইলেন এবং তদুদ্দেশে ক্রমে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। তিনি রাজ্য ধন, পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সমুদয় ত্যাগ করিয়া এবং সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া যতিবেশে একাকী ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন; হিন্দুগণের প্রধান তীর্থ বারাণসী প্রভৃতি স্থলে নানাবিধ বৈদিক পণ্ডিতের সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া, কিছুতেই মনের শান্তি পাইলেন না। পরিশেষে নিজের বিবেক ও যুক্তি অনুসারে এক অভিনব ধর্ম্ম আবিষ্কার করিলেন,—তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের শান্তি হইল, মন প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল; সেই নব ধর্ম্মে লোককে দীক্ষিত করিবার জন্য তিনি ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিলেন,—যে স্থানে গমন করেন তাঁহার সুযুক্তি পরিপূর্ণ উপদেশ সকল, সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিল, ক্রমে রাজা প্রজা সকলেই এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল, কেবল দুই চারি জন গোঁড়া ব্রাহ্মণের হস্তলিখিত পুঁথির মধ্যে উহা আপনার প্রভা বিকীর্ণ করিতে লাগিল মাত্র। তাহাও সামান্য, এমন কি সেই সময়ে হিন্দুধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল—যেখানে যাও সেই স্থানেই বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত কথোপকথন হইতেছে, সেই স্থানেই তর্কবিতর্ক চলিতেছে। কোথাও স্তম্ভ, কোথাও চৈত্য, কোথাও বিহার—যেখানেই যাও সেই খানেই বৌদ্ধধর্ম্মের চিহ্ন। ক্রমে ইহাই রাজ ও সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইল; বুদ্ধদেবের শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল; সদুপদেশ দানে তিনি সকলকেই মোহিত করিলেন; মায়ামোহের মোহিনীমন্ত্রে সকলেই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, সকল লোকেরই হৃদয়ে প্রকৃত ধর্ম্মভাবের আবির্ভাব হইল—সকলেই তাঁহার উদার মত আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন—তাঁহার নীতি নিচয় সর্ব্বদা আলোচিত হইতে লাগিল; সমুদয় সর্ব্বনাশের মূল জাতিভেদ প্রথা কিছু দিনের জন্য ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

কিন্তু বুদ্ধদেব স্বয়ং যে সকল সদুপদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন তাহা তাঁহার জীবিতাবস্থায় গ্রন্থবদ্ধ হয় নাই, তিনি নিজেও কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই—তবে তাঁহার নির্ব্বাণের পর তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য কর্ত্তৃক নানাবিধ সুন্দর গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তৎস-

মুদয়েরই প্রভায় আজি জগৎ চমৎকৃত হইতেছে, লোকের গাত্র বুদ্ধদেবের নামে আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে—শাস্ত্র সকল সকলেরই আলোচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত অগষ্ট কোমত্ (Auguste Comte) সকলকেই জীবনে এক একবার বৌদ্ধ শাস্ত্র সকল আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন; বৌদ্ধ শাস্ত্র সকল নানাদেশ বিদেশে পণ্ডিত সমিতিতে সমালোচিত হইতেছে। এই ধর্ম্ম এক্ষণেও পৃথিবীর প্রায় তৃতীয়াংশ লোকের উপাস্য হইয়া রহিয়াছে। বাস্তবিক আমরা যখনই বুদ্ধদেবের সুযুক্তি পরিপূর্ণ জ্ঞান গর্ভ উপদেশ নিচয় পাঠ করিয়াছি তখনই বিমোহিত হইয়াছি। যে দেশ বুদ্ধদেব রূপ মহাজ্ঞান সন্ন্যাসী উৎপাদন করিয়াছেন তাহাকে কোটী কোটী প্রণাম করিয়াছি। মন আনন্দরসে আপ্লুত হইয়াছে। শাক্যসিংহ যে দেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন আমরাও সেই দেশ বাসী মনে করিতে অহঙ্কার আপনা হইতেই মানস ক্ষেত্রে সমুদিত হইয়া থাকে। খ্রীষ্টান গণের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল যেরূপ নীতি নিচয় জন্য সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে, বৌদ্ধ শাস্ত্রের অভ্যন্তরে আমরা তাহা হইতেও উৎকৃষ্টতর উপদেশ সকল দর্শন করিয়া মোহিত হই।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই; তাঁহার নির্ব্বাণের পর তদীয় শিষ্যগণ তাঁহার উপদেশ বাক্য সকল লিপিবদ্ধ করেন। বুদ্ধদেব তৎকাল-প্রচলিত মাগধী (পালি) ভাষায় বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন এবং নির্ব্বাণের সময়ও বলিয়া গিয়াছিলেন "আমি যেরূপ ভাষা উচ্চারণ করিয়াছি গ্রন্থ লিখিতে হইলেও সেই ভাষাই ব্যবহার করিবে—কদাচ অন্যথাচরণ করিও না।" সুতরাং অধিকাংশ বৌদ্ধ গ্রন্থই পালি ভাষায় রচিত। তাঁহার নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর তদীয় তিনজন শিষ্য কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথম তাঁহার উপদেশ সকল লিপিবদ্ধ হয়। প্রথম, বিনয় পিটক; ইহাতে বুদ্ধদেবের জীবন চরিত, এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুবৃন্দের নিমিত্ত সর্ব্ব সৎকর্ম্ম পদ্ধতি লিখিত আছে, ইহা উপালি নামক শূদ্র কর্ত্তৃক রচিত; বিনয় পিটকের অন্তর্গত নানাগ্রন্থ আছে। দ্বিতীয়, সূত্র পিটক; ইহাতে বুদ্ধদেবের জ্ঞানগর্ভ নীতি ও উপদেশ নিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে; তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ এই গ্রন্থ প্রনয়ন করেন; ইহার অন্তর্গত ধর্ম্মপদ, সূত্রনিপাত প্রভৃতি নানাবিধ সুন্দর গ্রন্থ আছে। তৃতীয় অভিধর্ম্ম পিটক; ইহাতে বিজ্ঞানাদি ঘটিত বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে; কাশ্যপ নামা তদীয় ব্রাহ্মণ শিষ্য ইহার প্রণেতা; ইহারও অন্তর্গত নানাবিধ গ্রন্থ আছে *। এই গ্রন্থ গুলিই প্রধানতঃ ত্রিপিটক নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অদ্য আমরা যে উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি এক্ষণে তাহাতে প্রবৃত্ত হইলাম। বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত যত গুলি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে 'সূত্র পিটকের' অন্তর্গত 'ধর্ম্মপদ' ও 'সূত্র নিপাত' গ্রন্থ দ্বয়

* ঐতিহাসিক রহস্য ২য় ভাগ, ১৪৪ পৃঃ —১৪৬ পৃষ্ঠা।

জাতি উৎকৃষ্ট ; অদ্য আমরা এই দুই খানি পুস্তক সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ধর্ম্মপদ গ্রন্থ খানি সম্পূর্ণ সুন্দর উপদেশে পরিপূর্ণ; অনেকে অনুমান করেন ইহা স্বয়ং বুদ্ধদেব প্রণীত ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, তিনি স্বয়ং কোন গ্রন্থই রচনা করেন নাই, কিন্তু গ্রন্থ খানি এরূপ সদুপদেশ পূর্ণ যে ইহা বুদ্ধদেব রচিত বলিতেও কোন ক্রমেই সঙ্কিত হওয়া যায় না ; এমন কি ধর্ম্মপদ শাক্যসিংহ প্রণীত না হইলেও তাহা যে তদীয় কোন উপযুক্ত শিষ্য প্রণীত তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; বোধ হয় তাঁহার নির্ব্বাণের পরই কোন মহাজন ইহা প্রণয়ন করেন। ইহার উপদেশ সকল পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইহা যেন বুদ্ধদেবের বদন হইতেই অনর্গল নিঃসৃত হইয়াছে ; এসম্বন্ধে ভট্ট মোক্ষমূলার কি বলিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম *। আচার্য্য বুদ্ধ ঘোষ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ সকলের টীকা প্রণয়ন করিবার সময় এই ধর্ম্মপদ গ্রন্থ হইতে অনেক স্থল উদ্ধৃত করিয়াছেন ; ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে ইহা অন্ততঃ সে সময়েরও অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে এবং চতুর্থ শতাব্দীতে তাহা এতাদৃশ মান্যত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে বুদ্ধ ঘোষ তাহা হইতে স্থল বিশেষ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বৌদ্ধ শাস্ত্র ব্যতীত এরূপ নীতি গ্রন্থ দুর্লভ ; পণ্ডিত বর শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন বলিয়াছেন ' বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপদ খৃষ্টের নীতি শাস্ত্রের সমতুল্য †।" এই গ্রন্থ পালি ভাষায় রচিত ও ষড়বিংশ ক্ষুদ্র অধ্যায়ে বিভক্ত ; তৎসমুদায়ে ৪২৩ শ্লোক আছে। প্রত্যেক অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় আখ্যাত ; যথা ;—পুষ্প, ঔৎসুক্য, শান্তি ইত্যাদি। এই ষড়বিংশ অধ্যায়ের মধ্যে কতক গুলিতে বৌদ্ধ নীতি ও অপর গুলিতে সাধারণ নীতি বিবৃত হইয়াছে ; সাধারণ নীতি নিচয় এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ;—ঔৎসুক্য নামধেয় দ্বিতীয় অধ্যায়ের একস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে 'ঔৎসুক্য নির্ব্বাণের পথ, ঔদাসীন্য মৃত্যুর নিদান ; যাঁহারা উৎসাহশীল তাঁহারা অমর আর উৎসাহ বিহীন লোক জীবনমৃত তুল্য ; চিন্তাশীল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, মহাজ্ঞানী সাধুসকল চরম সুখ নির্ব্বাণাধিকারী।' ‡। পুষ্প নামধেয় চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে 'মধু

* We can not see any reason why we should not treat the verses of the *Dhammapad*, if not as the utterances of Buddha, at least as what were believed by the members of the council under Asoka in 242 B. C. to have been the utterances of the founder of this religion.

Sacred Books of the East Vol. X. Part I.

† Buddha's *Dhammapada* or the "path of virtue" is on a par with the moral code of Jesus Christ.

A Lecture on the modern Buddhistic research.

‡। ধর্ম্মপদ। ২য় অধ্যায় (২১—২২ শ্লোক)

মক্ষিকা সুন্দর প্রস্ফুটিত পুষ্প ম্লান না করিয়াও তাহা হইতে যেরূপ অবাধে মধু সংগ্রহ করিতে পারে, সাধুগণ সেইরূপ করিয়া গ্রামে বাস করুক। যেমন সুন্দর কান্তি ও সুগন্ধ বিশিষ্ট অথচ ফলহীন পুষ্প দেখিতে মনোহর ও মুগ্ধকর হইলেও কার্য্যতঃ ফলহীন, নীতিপথভ্রষ্ট ব্যক্তির বাক্যও সেইরূপ। আবার ফলবান, সুন্দর ও সুগন্ধ বিশিষ্ট পুষ্প সকল যেমন দেখিতেও মনোহর ও মুগ্ধকর, নীতি পথানুযায়ী ব্যক্তির বাক্য সকলও সেইরূপ সুমিষ্ট ও সারবান (৫)।' এইরূপ ধর্ম্মপদের যে অধ্যায় পাঠ কর তাহাতেই সুন্দর উপদেশ বাক্য সকল দেখিতে পাওয়া যাইবে; তাহাই সুন্দর নীতি পরিপূর্ণ। সুনীতি সম্পন্ন এমন রমণীয় গ্রন্থ জগতে সুদুর্লভ। খ্রীষ্টিয়ানগণের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল যেরূপ সদুপদেশপূর্ণ, বৌদ্ধগণের ধর্ম্মপদ তাহা হইতেও মনোহর নীতি নিচয়ে অলঙ্কৃত। নেজেরেথের জ্ঞানসন্ন্যাসী যীশুখ্রীষ্ট যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া জগৎ মাতাইয়াছেন কপিলবস্তুর বোধিসত্ত্ব তাঁহার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সেই সকল উপদেশ ও তাহা হইতেও সুন্দর নীতি নিচয় অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ধন্য বুদ্ধদেব! তোমার অপার মহিমা কীর্ত্তন করা কি মৎসদৃশ লোকের পক্ষে সম্ভব? খৃষ্ট ও গৌতমের নীতি সকলে যেমন অতি সুন্দর সৌসাদৃশ্য আছে; আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহাদের অবস্থা ও ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ ঐক্য আছে—তাহা পরে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। আমরা যে ধর্ম্মপদ গ্রন্থের সমালোচনা করিতেছি উহা অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ফসবুল সাহেব ইহা সর্ব্ব প্রথম ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন—এই অনুবাদ এক্ষণে বহুমান ও সমাদর পাইয়া থাকে; ইহা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক বিল সাহেবও চীন ভাষায় অনুবাদিত ধর্ম্মপদের কিয়দংশ অনুবাদ করেন—কিন্তু ইহা তত সমাদৃত হয় নাই। সিংহলের আচার্য্য মুথুকুমার স্বামী ইহার অধিকাংশ স্থল অনুবাদ করেন। ইদানীং অধ্যাপক মোক্ষমূলার সাহেব ইহার সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গলা ভাষায় ইহা এখনও অনুবাদিত হয় নাই; তবে যেরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে ইহাও যে শীঘ্র এই ধনে ধনী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে সুত্তনিপাত গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে অগ্রসর হইলাম। ইহাতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদিম অবস্থার বিশেষ বিবরণ ও তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্ম কিরূপ মহান্ ছিল তাহা সুন্দর রূপে বিবৃত হইয়াছে; ধর্ম্মপদের ন্যায় ইহাও অতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং ইহারও গ্রন্থকর্ত্তার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সুত্তনিপাত পাঁচ ভাগে বা খণ্ডে বিভক্ত; প্রত্যেক খণ্ড পুনরায় কতিপয় অধ্যায়ে বিভক্ত; এইরূপে সমুদায় গ্রন্থে ৫৫টি অধ্যায় আছে।

সুত্তনিপাত কতদিন পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে তাহা জ্ঞাত হইবার কোন উপায়ই

(৫) ধর্ম্মপদ। ৪র্থ অধ্যায় (৪৯—৫২ শ্লোক।

নাই ; তবে ইহার খণ্ড বিশেষের রচনা প্রণালী ও ভাষা দেখিলে ইহা যে অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। ইহার তৃতীয় খণ্ড মহাভাগের কিয়দংশ এবং অথকভাগ অভিহিত সমুদায় পঞ্চমখণ্ড অতি প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয় ; কেন না ইহার রচনা প্রণালী ও ভাষার সহিত বৈদিক ভাষার কিয়দংশে ঐক্য আছে, সংস্কৃতের সহিত ততটা নাই। এ-সম্বন্ধে ডাক্তার ফস্‌বুল সাহেব যাহা বলিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম (৬)। সূত্র নিপাত গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় পদার্থ ; ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের আদিম বিবরণ অতি সুন্দর রূপে বিবৃত এবং প্রাথমিক বৌদ্ধ যতিগণের একটি সুন্দর চিত্র প্রদান করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী বৌদ্ধধর্ম্মের শৃঙ্খলা ইহাতে নাই, কেবল আদিম ধর্ম্মেরই সুন্দর বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের সূত্র পাতের চিত্র সকল যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে ইহাতে সেইরূপ ধর্ম্মের মূল যুক্তি সকলও পরিপাটীরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে ; মহাত্মা ফস্‌বুল সাহেবও এই কথাই বলিয়াছেন (৭)। সূত্রনিপাতে বুদ্ধদেবের এইরূপ বর্ণনা আছে ; আমরা এই স্থলে উক্ত গ্রন্থের মূল মর্ম্ম গ্রহণ করিলাম ; ইহাতে বুদ্ধদেব নানারূপে চিত্রিত হইয়াছেন ;—তিনি বোধিসত্ব—বৈদিক ধর্ম্মের অসারতা দর্শনে তাহাতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া যাহাতে মনুষ্যগণ প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারেন তজ্জন্য সচেষ্টিত ; তিনি এই জন্য সন্ন্যাসী ; প্রভুতা, ধন, ঐশ্বর্য্য পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সকলকে ধর্ম্ম পথগামী করিবার জন্য সন্ন্যাসী ; তিনি কুসংস্কার বিচ্যুত ; দার্শনিক প্রলোভ তাঁহাকে মোহিত করিতে পারে না ; তাঁহার কিছুতেই সন্তোষ বা অসন্তোষ নাই—তিনি সুখ ও দুঃখের বশীভূত নহেন ; লালসা ও ভোগাভিলাষ তাঁহার নিকট হইতে দূরে প্রস্থান করিয়াছে ; তিনি সকল

৬। The collection of discourses *Sutta Nipata* which I have here translated is very remarkable as there can be no doubt that it contains some remnants of Primitive Buddhism. I consider the greater part of the *Mahavagga* and nearly the whole of the *Atthakavagga* as very old. I have arrived at this conclusion from two reasons, first, from the language and secondly from the contents.

Sacred Books of the East Vol. X. Part I.

৭। In the contents of the *Sutta Nipata*, we have, I think, an important contribution to the right understanding of Primitive Buddhism, for we see here a picture, not of life of monasteries, but of the life of hermits in its first stage. We have before us not the systematizing of the later Buddhist church, but the first germs of a system the fundamental ideas of which come out with sufficient clearness. Sacred Books of the East.

অবস্থাতেই গম্ভীর ও সমুদ্রের ন্যায় স্থির— কিছুতেই বিচলিত নহেন; শাক্যসিংহ শান্তির সাক্ষাৎ অবতার এবং শান্তিই পরম সুখ জ্ঞানে তিনি শান্তি ক্রোড়ে শয়ন (নির্ব্বাণ) করিলেন। সুত্রনিপাতের স্থূল মর্ম্ম এই; এবং এগুলি অতি সুন্দর ও বিষদ রূপে চিত্রিত হইয়াছে।

সুত্র নিপাতের মতে লালসা মাত্রই পাপ; অথচ মনুষ্য জীবিত থাকিলে লালসার বশীভূত হইতেই হইবে—সুতরাং পাপজনিত পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুরও অধীন হইতে হইবে; সেই জন্ম ও মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে চেষ্টা করাই পুরুষার্থ। বুদ্ধদেব বলিয়া গিয়াছেন বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিমার্গানুসারী লালসা হইতে নিবৃত্ত থাকাই সুখ; এবং মৃত্যুর সময় আত্মা সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংশ হইয়া গেলেই পরম সুখ। প্রবল বায়ু বেগে দীপ শিখা নির্ব্বাপিত হইলে পর যেমন তাহার আর কোন চিহ্নই থাকে না, মৃত্যু হইলে মনুষ্যেরও সেইরূপ হওয়া আবশ্যক—তাহার যেন কোন চিহ্নই না থাকে। সুত্র নিপাতে এইরূপ কত সুন্দর ও মনোহর সদুপদেশ সকল সঞ্চিত আছে—তজ্জন্য গ্রন্থ খানি চিরকাল আদরের সামগ্রী হইয়া থাকিবে। বাস্তবিকই ধর্ম্মপদ ও সুত্র নিপাতের ন্যায় নীতি গ্রন্থ জগতে দুর্লভ; যে দেশ এইরূপ রত্ন নিচয় প্রসব করিয়াছেন তাঁহার চরণে কোটী কোটী প্রণাম করি; তাঁহার ন্যায় পবিত্র দেশ আর কোথায়? কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সেই রমণীয় দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও এমন শত শত গ্রন্থের নাম পর্য্যন্তও অবগত নহি। জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্র সকল সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতের নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া নেপালে উপস্থিত হইলে তথাকার এক বৌদ্ধ যতি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে ৮৪০০০ সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল—একণে সে সমুদয় দুষ্প্রাপ্য; একথা কতদূর বিশ্বাস্য তাহা বলিতে পারা যায় না। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে কেবল নয় খানি পুস্তক (যাহা নবধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত), অতীব প্রয়োজনীয়। সেই নয়খানি পুস্তক, যথা;— ১ম প্রজ্ঞাপরমইতং; ২য় ললিত বিস্তার; ৩য় সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক; ৪র্থ সুবর্ণ প্রভাস; ৫ম সদ্ধর্ম্ম লঙ্কাবার্ত্তা; ৬ষ্ঠ গন্ধব্যূহ; ৭ম দশ ভূমীশ্বর; ৮ম সমাধিরাজ; এবং ৯ম তত্ত্বগাথা—গাহিয়কো। ইহাদের মধ্যে অনেক গুলি গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছে। বরনুর্ফ, সিমিজ, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মহোদয় গণ ইহার অনেক গুলি অনুবাদ করিয়াছেন।

বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্তির সময় উপদেশ দিয়াছিলেন 'আমি যে ভাষায় উপদেশ দিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিবার সময় সেই ভাষাই ব্যবহার করিবে' সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত অধিকাংশ গ্রন্থই মাগধী বা পালি ভাষায় রচিত হইয়াছে; বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থ সকলের তালিকা করা সুকঠিন; পালি ভাষায় যে কত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? অনেক মহোদয় পালি ভাষায় রচিত অনেক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন; আমরা সেই সকল মহাজন গণের নাম এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব উপসংহার করিলাম। জর্জ্জ টুরনার,

চাইলডার্স, কসবুল, মোক্ষ মুলার, রুক প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ; বাবুবাসুদেব, মুথু কুমার স্বামী প্রভৃতি দেশীয় মহাজন গণ অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন। আমরা আশা করি শীঘ্রই দেশীয় মহোদয়গণ এই বিষয়ে অধিকতর অগ্রসর হইবেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

রাজপুতানার ইতিহাস।

২১৮ পৃষ্ঠার পর।

১৩৬৪ খৃঃ অব্দে খৈয়ৎসিংহ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। হামীরের অনেকগুলি গুণ তাঁহার শরীরে বিদ্যমান ছিল। লীলা পত্তনের অধিকার ভুক্ত অজমীর ও জাহাজপুর অধিকার করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেন। মণ্ডলগড় ও দশোর পূর্ব্বে মিবারের অধীন ছিল, তিনি তাহা পুনরধিকার করিলেন। সমস্ত চপ্পন প্রদেশ আপন অধিকারে আনিলেন। বাক্রোলের নিকটে এক যুদ্ধে তিনি দিল্লীশ্বর হুমায়ুনকে পরাজিত করেন। বনাউদার হরবংশীয় অধ্যক্ষের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া ছিল, কিন্তু কোন মনোবাদ সূত্রে উক্ত অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক খৈয়ৎ সিংহ হত হয়েন।

১৩৭৫ খৃঃ অব্দে লক্ষ রাণা মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজপদ লাভ করিয়াই মেরুবরের পার্ব্বত্য প্রদেশ অধিকার করতঃ বিরাটগড় নামক দুর্গ উৎসন্ন করিয়া সেই স্থানে বেদ্নোর নগর সংস্থাপন করেন। এই সময়ে এমন একটী ঘটনা উপস্থিত হয় যে, তাহাতে তিনিও যারপর নাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং রাজ্যেরও ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়। চপ্পনের ভীলদিগের নিকট হইতে খৈয়ৎ সিংহ যে ভূভাগ অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন তাহার অন্তর্গত জাওরা নামক স্থানে টীন ও রূপার খনি আবিষ্কৃত হয়। সে সময়ে ধাতু খনন করা নিতান্ত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস ছিল। লক্ষরাণা লোকের সেই চিরন্তন বিশ্বাসের প্রতি অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক অসন্দিগ্ধ চিত্তে ধাতু খনন করাইতে লাগিলেন। সকলের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে বহুকাল হইতে তথাকার আকরে সপ্তধাতু বিদ্যমান ছিল, কিন্তু ধর্ম্মভয়ে কেহই তাহাতে হস্তক্ষেপ করে নাই। কিন্তু সপ্তধাতুর কোন প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্বর্ণ আদৌ ছিল বলিয়াই বোধ হয় না। রৌপ্য, টীন, তাম্র, সীস ও পারদ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গিয়াছিল। টীনের সহিত কিছু কিছু রৌপ্যও পাওয়া যাইত।

অম্বরের যুদ্ধে লক্ষ রাণা নাগরচলের সংকলা রাজপুতদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মহম্মদ শাহ লোদীর সহিত যুদ্ধে

তিনি আপনার অদ্ভুত রণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, এবং বেডনোরে তিনি সম্রাট সেনার উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন। পবিত্র ভূমি গয়ার যুদ্ধে তিনি অসভ্যদিগের দ্বারা বিগতজীবিত হন। লক্ষ বিস্তীর্ণ খ্যাতি প্রতিপত্তি সম্পন্ন নরপতি ছিলেন। শিল্পের উৎসাহ ও রাজ্যের উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার আন্তরিক যত্ন ছিল। তিনি প্রজা লোকের উপকারের জন্য রাজ্যের নানা স্থানে উত্তম উত্তম সরোবর খনন, এবং জল প্লাবন হইতে দেশ রক্ষার জন্য অনেক বাঁধ ও সেতু প্রস্তুত করেন। তাঁহার নির্ম্মিত অনেক সুদৃঢ় দুর্গ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। দুর্দ্দান্ত আলাউদ্দীন কর্তৃক বিধ্বংসিত দেবমন্দির ও প্রাসাদ সমূহ পুনঃসংস্কারের জন্য তিনি আকরজাত বহুধন ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি যে প্রাসাদে বাস করিতেন তাহার কিয়দংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহাতে ভীম রাণা ও পদ্মিনীর প্রাসাদ তুল্য শিল্পনৈপুন্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। তৎপ্রতিষ্ঠিত বহুকারুকার্য্যসমন্বিত বিবিধ সৌন্দর্য্যভূষিত ব্রহ্মার মন্দির অদ্যাপি সম্পূর্ণ অবয়বে বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহা ব্রহ্মের ওঁকার মূর্ত্তির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, সুতরাং তন্মধ্যে কোন দেবমূর্ত্তি ছিল না, এই জন্যই তাহা নিষ্ঠুর যবনদিগের প্রখর দৃষ্টির সম্মুখে পতিত হয় নাই।

লক্ষরাণার অনেক সন্তান সন্ততি হয়, তাঁহারা সকলেই প্রায় স্থানে স্থানে অধ্যক্ষ পদ লাভ করিয়া আপন আপন বংশ বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম চণ্ডা, কিন্তু চণ্ডা বর্ত্তমানে যে কারণে কনিষ্ঠ পুত্র মুকল চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই কৌতুকাবহ ব্যাপার পর অধ্যায়ে পাঠকবর্গের গোচর করা যাইতেছে।

সপ্তম অধ্যায়।

লক্ষরাণা অতি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। একদা লক্ষরাণা অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ সিংহাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মাড়োয়ার রাজ রণমল্লের নিকট হইতে বৈবাহিক সম্বন্ধসূচক যৌতুক আসিয়া উপস্থিত হইল। রণমল্ল চণ্ডার উদ্দেশে এই যৌতুক প্রেরণ করিয়াছিলেন। চণ্ডাকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদানেই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। যে সময়ে যৌতুক সহ দূত আসিয়া উপস্থিত হয়, সে সময়ে চণ্ডা রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন না। বৃদ্ধ রাণা রণমল্লের দূত মুখে সমস্ত সমাচার অবগত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, চণ্ডা ত্বরায় আসিয়া বৈবাহিক যৌতুক গ্রহণ করিবেন। বৃদ্ধরাণা হাসিতে হাসিতে পরিহাস রসিকতার সহিত নিজ শ্বেত শ্মশ্রুতে হস্ত বিন্যাস পূর্ব্বক দূতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বোধ হয় তোমরা এই অশীতিপর ধবলশ্মশ্রু বৃদ্ধের জন্য বৈবাহিক যৌতুক আনয়ন কর নাই!" এই কথা তিনি বার বার কহিতে লাগিলেন, সভাস্থেরাও তাহাতে আমোদ প্রকাশ করিয়া তাহার পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিতে লাগিল। চণ্ডা আসিয়া এই সকল সমাচার অবগত হইলেন। পরিহাসের সহিত রাণা যে কার্য্য করিয়াছেন, ধর্ম্মভয়ে চণ্ডা তাহাই প্রকৃত

জ্ঞান করিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধসূচক যৌতুক গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। বৃদ্ধ দেখিলেন, রণমল্লকে যৌতুক প্রত্যর্পণ করিলে তাঁহাকে নিতান্ত অবমানিত করা হয়, সুতরাং স্বয়ং সেই যৌতুক গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন। চণ্ডও তাঁহাকে এবিষয়ে অনুরোধ ও তজ্জন্য নিজের যারপর নাই ক্ষতি স্বীকার করেন। চণ্ডার অনুরোধ রক্ষার জন্য রাণা তাঁহাকে এরূপ স্বীকার করাইয়া লন যে, "এই বিবাহে আমার যে পুত্র জন্মিবে, সেই সিংহাসনের অধিকারী হইবে, তুমি কেবল রজপুত সদস্যের প্রধান হইয়া সর্ব্বদা রাজা ও রাজ্যের অভ্যুদয়ের জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিবে।" মহানুভব চণ্ডা তাহাই স্বীকার করিলেন। তিনি একলিঙ্গ স্মরণ করিয়া পিতার মনোরথ সিদ্ধি সম্বন্ধে স্বীকৃত হইলেন।

রাণার ঔরসে রণমল্লের কন্যাগর্ভে মুকুল জন্ম গ্রহণ করিলেন। যখন মুকুলের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর মাত্র, তখন রাণা যবনদিগের হস্ত হইতে গয়াধাম রক্ষার জন্য যাত্রা করিলেন। এই যাত্রাই যে তাহার মহাযাত্রা, জানিতে পারিয়া তিনি চণ্ডাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুকুলকে কোন্ কোন্ প্রদেশের আধিপত্য দেওয়া যায়।" তাহাতে ধর্ম্মজ্ঞানী চণ্ডা কহিলেন, "কেন, মুকুল তো রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী, চিতোরের সিংহাসনই তাহার প্রাপ্য।" লক্ষ রাণা এই কথা শুনিয়া গয়া গমনের পূর্ব্বেই মুকুলের শিরে রাজছত্র ও কপালে রাজটীকা প্রদান করিবার আরোজন করিলেন। মুকুল সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে সকলেই তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে আসিল। চণ্ডা সর্ব্ব প্রথমে আসিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তাঁহার এই শীলতার জন্য তিনি তদবধি রাজপুত সদস্যের প্রধান হইলেন, রাজনৈতিক কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার আদেশই বলবৎ থাকিবে এইরূপ নিয়ম হইল, রাজ সনন্দ মাত্রে তাঁহার স্বাক্ষর সর্ব্বোপরি বিরাজ করিবে এরূপ স্থিরীকৃত হইল। তদবধি মিবারেশ্বরদিগের সমস্ত রাজ সনন্দ ও আদেশ পত্রাদিতে সালুম্ব্রার * রাজচিহ্ন রাণার স্বাক্ষরের উপরে সন্নিবেশিত হইয়া থাকে।

পিতৃ সমক্ষে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, চণ্ডা কখনই তাহার তিল মাত্র অতিক্রম করেন নাই। পিতার গয়া যুদ্ধে গমন ও পতনের পর তিনি কেবল অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুকুল ও তদীয় রাজ্যের শুভানুধ্যানেই নিয়ত রত থাকিতেন। চণ্ডার অপ্রতিহত প্রভাব দর্শনে মুকুল-জননী চণ্ডার প্রতি নিতান্ত দ্বেষ পরবশ হইলেন। প্রকৃত পক্ষে রাজজননী রাজার অপ্রাপ্ত ব্যবহার কালের অভিভাবিকা; তিনি দেখিলেন, সমস্ত রাজকার্য্যই চণ্ডার আদেশানুসারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহাতে দিন দিন তাঁহার ঈর্ষা পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি একবারও মনে ভাবিলেন না যে, চণ্ডার সেই পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা জন্যই তিনি রাজজননী হইয়াছেন। চণ্ডা সেরূপ দুরূহ প্রতিজ্ঞা না

* চণ্ডার বংশধরেরা চণ্ডাবৎ নামে পরিচিত। তাহারা সালুম্ব্রার অধ্যক্ষ।

হইলে তিনি কখনই মিবার রাণার জননী হইতে পারিতেন না। তাঁহার মনে এরূপ সন্দেহ জন্মিল যে, চণ্ডা স্বয়ং সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহার আদেশ ব্যতীত কোন রাজকার্য্যই নির্ব্বাহিত হয় না, ফলে চণ্ডা সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছেন, রাণা নামে মাত্র আছেন; রাণার সমস্ত ক্ষমতা চণ্ডা স্বয়ং গ্রাস করিয়াছেন। মুকুল-জননীর এবম্বিধ মনের ভাব অবগত হইয়া চণ্ডা তাঁহাকে কহিলেন, "আমি অদ্যাবধি রাজধানী পরিত্যাগ করিলাম, আপনি সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণ করুন। সাবধান, সিসদীয়ার অধিকার যেন অক্ষুণ্ণ রহে।" চণ্ডা এই কথা বলিয়া মাণ্ডুরাজের নিকট গমন করিলেন, তথায় তিনি যারপর নাই সমাদর প্রাপ্ত হইলেন, মাণ্ডুরাজ তাঁহাকে হালর প্রদেশ দান করিলেন।

চণ্ডা এবম্প্রকারে স্থানান্তরিত হইলে মুকুলের মাতুল যোধা ও মাতামহ রণমল্ল আসিয়া মিবারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। চণ্ডার অপ্রতিহত প্রভাবে ইহারা এতদিন মিবারাভিমুখে আগমন করেন নাই, এখন সুযোগ পাইয়া স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দৌহিত্র মুকুলকে ক্রোড়ে লইয়া রাও রণমল্ল প্রত্যহ রাজসিংহাসনে বসিতে লাগিলেন। শিশু ক্রীড়ার উদ্দেশে প্রস্থান করিলে বৃদ্ধ রণমল্লের মস্তকোপরি রাজছত্র শোভা পাইতে থাকে। রাজধাত্রী এই বিষয় অবলোকন করিয়া রাজমাতার নিকট গমন পূর্ব্বক ক্রোধবিস্ফারিত নেত্রে কহিতে লাগিল, "বাপ্পা রাওয়ের ছত্র সিংহাসন কি এত দিন বৃদ্ধ রণমল্ল ও তদীয় বংশের জন্য বিদ্যমান ছিল!। অচিরাৎ আপনার পুত্র সিংহাসনচ্যুত হইবে এবং রাঠোর বংশীয়েরা রাণা উপাধি লাভ করিয়া মিবার সিংহাসন অধিকার করিবে।' রাজজননী তখন দিব্য চক্ষে সমস্ত দেখিতে পাইয়া পিতাকে তিরস্কার করিলেন, তাহাতে এই ঘটিল যে, তাহার পুত্রের ভবিষ্যত জীবন সম্বন্ধে তাহার ঘোরতর সন্দেহ জন্মিল। এই সময়ের আর একটী আকস্মিক ঘটনাদ্বারা এই সন্দেহ আরো বদ্ধমূল হইল। চণ্ডার দ্বিতীয় ভ্রাতা রঘুদেব কৈলবর ও কোবারি প্রদেশের অধ্যক্ষ ছিলেন। যাবতীয় সামন্তের মধ্যে তিনি সমধিক ক্ষমতা বিশিষ্ট থাকায় বৃদ্ধ রণমল্লের দ্বেষে পতিত হন। তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য রণমল্ল প্রথমেই উদ্যত হইলেন। তাঁহার নিকট এক রাজ পরিচ্ছদ প্রেরিত হইল। তিনি তাহা পরিধান করিবার অবসরে হত হইলেন। তিনি ধার্ম্মিক, সাহসী ও সুন্দর পুরুষ ছিলেন। তিনি এই সকল কারণে মিবার মধ্যে অতিশয় সমাদৃত ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। এইরূপে তাঁহার জীবনাবসান হওয়ায় সকলেই যার পর নাই অনুতপ্ত হইয়াছিল। তদবধি তিনি পিতৃদেবগণের মধ্যে গণনীয় হন। বৎসরের মধ্যে দুই দিন সকলেই তাঁহার মূর্ত্তির পূজা করিত।

এই বিপদ সময়ে রাজমাতা স্বীয় সপত্নী পুত্র চণ্ডাকেই স্মরণ করিলেন। চণ্ডা যদিও মিবার হইতে দূরে বাস করিতেন, তথাপি তিনি মিবারের অভ্যুদয় ও অপ্রাপ্ত বয়ঃ

রাণা মুকুলের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিশূন্য ছিলেন না। সর্ব্বদাই তিনি মিবারের অনুসন্ধান লইতেন, মিবারের বর্ত্তমান অবস্থা তাঁহার অবিদিত ছিল না। চিতোরের ব্যক্তীয় প্রধান ও বিশ্বস্ত পদে রণমল্লের অনুচরেরাই নিযুক্ত ছিল। বৃদ্ধ রাও চারিদিক্ বাঁধিয়া কার্য্য করিতেছিলেন। চণ্ড যখন মিবার হইতে চলিয়া যান, তখন তাঁহার সঙ্গে দুই শত মৃগয়াবিলাসী বলবান আহিরী গমন করিয়াছিল। ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা অতি প্রাচীন কাল হইতে চিতোরের রাণাদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। ইহাদের পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ চিতোরের দুর্গ মধ্যে বাস করিত, তাহাদের সহিত সাক্ষাতের ভান করিয়া চণ্ডার সহচরগণ দুর্গমধ্যে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়। চণ্ডার উপদেশানুসারে তাহারা বিবিধ ছল কৌশল বলে দ্বাররক্ষক দিগের বিশ্বাস ভাজন হইয়া বিবিধ নিম্ন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। চণ্ড রাজমাতাকে এইরূপ পরামর্শ দিলেন যে, 'প্রতিদিন পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামনিচয়ের লোকদিগকে ভোজন করাইবার জন্য যেন শিশু রাণা দুর্গ হইতে বাহিরে আসেন, ক্রমে২ যেন দুর্গ হইতে দূরে আসিয়া পড়েন, এবং দীপান্বিতার দিন যেন চিতোর হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে গোসুন্দা নামক স্থানে ভোজের আয়োজন হয়।''

চণ্ডার উপদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য হইতে লাগিল। নির্দ্ধারিত দিন উপস্থিত হইল, গোসুন্দা নগরে ভোজ হইল, সন্ধ্যা উপস্থিত, কিন্তু চণ্ডার কোন চিহ্নই দৃষ্ট হইল না। রাজধাত্রী ও পুরোহিত প্রভৃতি যাঁহারা এই গুপ্ত অভিসন্ধির মধ্যে ছিলেন, তাঁহারা চণ্ডার অনাগমন জন্য নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহারা চিতোরি নামক উচ্চভূমিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ৪০ চল্লিশ জন অশ্বারোহী পুরুষ দ্রুতবেগে আগমন করিতেছে। সেই অশ্বারোহী সম্প্রদায়ের অগ্রে অগ্রে ছদ্মবেশী চণ্ডা আসিতেছেন। চণ্ডা সঙ্কেত দ্বারা শিশু রাণাকে সমযোগ্য সমাদর করিয়া রামপল নামক দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলে প্রহরীগণের প্রশ্নে এই উত্তর করিলেন যে, আমরা প্রতিবেশীবাসী, গোসুন্দার রাজ ভোজ দেখিতে আসিয়াছিলাম, এক্ষণে রাণাকে গৃহে পৌঁছিয়া দিতে যাইতেছি। প্রহরীগণ এ কথায় বিশ্বাস করিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ চণ্ডার পশ্চাৎবর্ত্তী অশ্বারোহীগণ উপস্থিত হওয়ায় ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল। প্রধান দ্বাররক্ষক ভট্টীসামন্ত হত হইল। রাঠোরেরা চারিদিগে পলায়ন করিতে লাগিল, কিন্তু চণ্ডার অনুচরবর্গের হাতে কেহই রক্ষা পাইল না।

রাঠোর বৃদ্ধ রণমল্লের মৃত্যু সাতিশয় রহস্য জনক। তিনি রাণীর জনৈক রূপযৌবনসম্পন্না সহচরীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করেন। এই কারণে সেই রমণীর হৃদয়ে প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগরিত থাকে। এই ভয়ানক রজনীতে তিনি প্রেম, সুরা ও অহিফেন এই ত্রিবিধ মাদকে অভিভূত হইয়া সেই রমণীকে আলিঙ্গন করত শয়ন করিয়া আছেন। এই ভয়ানক ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও তাঁহার কর্ণে স্থান পাইতেছে না। রমণী উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া সাব-

ধানে শয্যা হইতে উত্থান করত বৃদ্ধের উ-ষ্ণীষবসন দ্বারা পালঙ্গের সহিত তাঁহাকে বন্ধন করিয়া চলিয়া গেল। চণ্ডার কতিপয় অস্ত্রধারী অনুচর সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র বৃদ্ধের চৈতন্য হইল। তখন তিনি কোন প্রকারে কষ্টে সৃষ্টে বন্ধনমুক্ত হইয়া ক্রোধে দীপ্ত স্বরে অস্ত্রধারীদিগের প্রতি তাড়না করিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন, তাহারা তাঁহারই জীবলীলা হ-রণ করিতে আসিয়াছে, তখন আর কি করেন, নিকটে কোন অস্ত্র পাইলেন না, একখানি পিতলের বাসন দ্বারাই তিন চারি জন আক্রমণকারীকে ধরাশায়ী করিলেন। দূর হইতে এক গুলি আসিয়া তাঁহাকে ভূতল শায়ী করিল। তাঁহার পুত্র যোধা এই স-কল ব্যাপার দর্শন করিয়া দ্রুতগামী তুরঙ্গ-মের আশ্রয়ে পলায়ন করিলেন।

যোধা রাও নিজ রাজধানী মণ্ডোর নগর পরিত্যাগ করিয়া হরবা সংকলার শরণাপন্ন হইলেন। চণ্ডার প্রতিহিংসার এই স্থানেই অবসান হইল না, তিনি মণ্ডোর নগর আ-ক্রমণ করিলেন। কিছু দিন অবরোধের পর কান্তজী ও মুঞ্জতাজী নামক তাঁহার পুত্র-দ্বয় বহু সৈন্য সহ আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। রাঠোর দিগের বিশ্বাস-ঘাতকতার উপযুক্ত পুরস্কার হইল, দ্বাদশ-বৎসর কাল মণ্ডোর মিবারের অধিকারভুক্ত রহিল। এই যোধা কর্তৃক যোধপুর সংস্থা-পিত হয়।

হরবা সংকল পরম ধার্ম্মিক বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সদাব্রত ছিল, যে সময়ে অনুচরবর্গসহ যোধা তাঁহার শরণাপন্ন হই-লেন তখন অতিথিসেবা সম্পন্ন হইয়া গি-য়াছে। হরবা তখন কি করেন, অনেক অ-তিথি সমাগত দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, নিকটবর্ত্তী বন মধ্যে যে মজদ্ বৃক্ষ আছে, তাহার পত্রাদি রন্ধন ক-রিলে সুখাদ্য প্রস্তুত হয়। ঐ বৃক্ষে এক প্রকার বর্ণও প্রস্তুত হয়। তখন হরবা ঐ বৃক্ষ আনয়ন পূর্ব্বক ময়দা, চিনি ও মস্‌লা দিয়া রন্ধন করাইলেন। অনুচরবর্গ সহ যোধা তাহা আহার করিয়া তৃপ্ত হইলেন। নিদ্রা দেবীর আশ্রয়ে চিতোরের হৃদয়ভেদী বিবরণ বিস্মৃত হইলেন। প্রাতঃকালে তাঁ-হারা গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, সকলের শ্মশ্রু বর্ণবিশেষে রঞ্জিত হইয়াছে, হরবা সংকল কহিলেন, "শ্বেত শ্মশ্রু রঞ্জিত হ-ইয়া যেমন যৌবনের পরিচায়ক হইয়াছে, সেইরূপ তোমাদের আশাও আবার নবীভূত হইয়া সুফল প্রদান করিবে। অচিরকাল মধ্যে তোমরা অধিকারচ্যুত প্রদেশসমূহের উদ্ধার সাধন করিতে পারিবে।"

এই আশ্বাস বাক্যে রাঠোরদিগের অ-তিশয় সাহস বৃদ্ধি হইল। হরবা সংকল তাহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে মিয়োর সামন্তের নিকট লইয়া গেলেন। ঐ সামন্তের অশ্বশালায় একশত অতি উৎকৃষ্ট ঘোটক ছিল। তিনিও যোধা রাঠোরের পক্ষাবলম্বন করায় তাঁহারা আপনাদিগের বল বৃদ্ধি জানিয়া আশ্বাসিত হইলেন। প্র ভুজী নামক আর এক সামন্ত আসিয়াও তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিলেন। যোধা শীঘ্রই জানিতে পারিলেন যে, তিনি নিজ রাজধানী মণ্ডোরের উদ্ধার সাধনের উপ-

যোগী বলসম্পন্ন হইয়াছেন। তখন তিনি হঠাৎ যাইয়া মণ্ডোর আক্রমণ করিলেন। প্রথম উদ্যমেই চণ্ডার জ্যেষ্ঠ পুত্র হত হইলেন। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র এই আকস্মিক বিপদ দর্শনে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন না, গড়বারের সীমায় বিপক্ষ দ্বারা বিগতজীবিত হইলেন। মণ্ডোরের এক রাজপুত্রের জন্য চিতোরের দুই বীর পুত্র বিনষ্ট হইল। যোধা নিজ রাজধানীতে স্থাপিত হইলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, মিবারের সহিত যুদ্ধে কখনই জয়লাভ করিতে পারিবেন না। মিবার প্রভূত ক্ষমতাশালী। তাহার সমকক্ষ হইতে পারেন তাঁহার এমন শক্তি নাই। সুতরাং সন্ধি করাই স্থির করিলেন। তিনি স্বীয় অপরাধের নিষ্ক্রয় স্বরূপে গড়বারের সীমা পর্য্যন্ত মিবাররাজকে অর্পণ করিলেন। যে স্থানে চণ্ডার দ্বিতীয় পুত্রের পতন হয় তাহাই উভয় রাজ্যের সীমা হইল। ইহাতে সমস্ত গড়বার প্রদেশ মিবারের অধিকারভুক্ত হইল, তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ থাকিয়া শেষে এই ফলবান রাজ্য মিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইল।

১৩৯৮ খৃঃ অব্দে মুকল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি রাণার উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে ভারতবর্ষে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়ে বিখ্যাত তৈমুরলঙ্গ মধ্য আসিয়ায় আপনার ক্ষমতা অপ্রতিহতরূপে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। রায়পুর ক্ষেত্রে মুসলমানেরা মুকলের নিকট পরাভূত হয়। মুকল জয়লাভে প্রোৎসাহিত হইয়া সেই যাত্রায় সম্বর ও তদন্তর্গত লবণহ্রদ করতলস্থ করিয়া আপনার অধিকার বিস্তৃত করেন।

মুকল লক্ষরাণার আরব্ধ রাজপ্রাসাদ সম্পন্ন করেন, এক্ষণে উহা ধ্বংসাবস্থায় পতিত আছে। পশ্চিমের গিরিশ্রেণীর উপর তিনি চতুর্ভুজের এক উৎকৃষ্ট মন্দির প্রস্তুত করেন।

মুকলের তিন পুত্র ও লাল বাই নাম্নী অপরূপ রূপ লাবণ্যবতী এক কন্যা ছিল। গাগ্রোণের খিচি সামন্তের সহিত এই কন্যার বিবাহ হয়। বিবাহের সময় খিচি সামন্ত এই প্রার্থনা করেন যে, বিপক্ষের আক্রমণ সময়ে যেন তিনি রাণার আশ্রয় প্রাপ্ত হন। যখন মালবেশ্বর হুশং খিচি রাজধানী আক্রমণ করেন, তখন খিচি সামন্তের পুত্র ধীরাজ রাণার সাহায্য প্রার্থনা করেন। সে সময়ে কতকগুলি পার্ব্বত্য অসভ্য দিগের বিদ্রোহ দমনের জন্য রাণা মুকল মাদারিতে অবস্থান করিতেছিলেন। ধীরাজের প্রার্থনা ফলবতী হইল। মাদারিতেই মুকলের লীলা খেলার অবসান হয়। এই স্থানেই তিনি নিরপরাধে স্বসম্পর্কীয় লোক দ্বারা হত হন। তদ্বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

মুকলের পিতামহ খৈরৎ সিংহের এক নীচ জাতীয়া উপপত্নী ছিল। তাঁহাকে সূত্রধর কন্যা বলিয়াই সকলে জানিত। খৈরৎ সিংহের ঔরসে ঐ সূত্রধারিণী গর্ভে চাচা ও মাইরা নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। এই প্রকার জারজ সন্তানেরা "মি-

বারের পঞ্চম পুত্রগণ ' নামে অভিহিত হইত। রাণার নিকট তাহারা স্নেহসূচক ব্যবহার ও বিশ্বস্ত কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইত। কিন্তু রাজসভায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সামন্ত পুত্রেরাও তাহাদের অপেক্ষা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইতেন। মাদারিতে চাচা ও মাইরা মুকলের সপ্ত সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়ক ছিল। কতিপয় সামন্ত বিদ্বেষ পরায়ণ হইয়া তাহাদিগের দমনের চেষ্টায় ছিলেন। একদা রাণা সামন্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া উপবন বিহার করিতে করিতে কোন একটী বৃক্ষ বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চোহান সামন্তকে সেই বৃক্ষের নাম জিজ্ঞাসা করিলে, চোহান অজ্ঞানতার ভান করিয়া রাণার কর্ণে কহিলেন, চাচা ও মাইরাকে জিজ্ঞাসা করুন। মুকল অসন্দিগ্ধ চিত্তে চাচা ও মাইরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ' পিতৃব্য! এই বৃক্ষের নাম কি ? ' ভ্রাতৃদ্বয় ইহাতে যার-পর নাই অপমানিত বোধ করিলেন; তাঁহারা ভাবিলেন, আমরা সূত্রধারিণীর গর্ভজাত বলিয়া আমাদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে। তাহারা ক্রোধে অন্ধ হইয়া রাণাকে বিনষ্ট করিবার জন্য যত্নবান হইল। সেই দিনই যখন রাণা দেবারাধনায় মগ্ন ছিলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। এক আঘাতে তাঁহার বাহু ছিন্ন হইয়া পড়িল, দ্বিতীয় আঘাতে তিনি জীবনশূন্য হইয়া পতিত হইলেন। জারজ নরাধমেরা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া চিতোর অধিকারের চেষ্টায় গমন করিল, কিন্তু তাহারা নগর প্রবেশে সমর্থ হইল না, পুরদ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

এই হত্যা ব্যাপারের মূলে একটি গূঢ় চক্রান্ত আছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। রাণার উত্তরাধিকারী কুম্ভ সময় থাকিতে সাবধান হইয়াছিলেন দেখিয়া অনেকে উক্ত প্রকার অনুমান করিয়া থাকেন। বিশ্বাসঘাতকেরা মাদারির দুর্গে প্রত্যাগমন করিল। এই ঘোরতর বিপদের সময়ে কুম্ভ মাড়োয়ারের রাঠোর দিগের বন্ধুত্বের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসে তাঁহার অতিশয় উপকার হইয়াছিল। বিশ্বাসঘাতকেরা এই বলসংযোগ দর্শনে ভীত হইয়া মাদারি হইতে পায়ী নামক স্থানে পলায়ন করত তত্রত্য পর্ব্বতোপরি রাতাকোট নামে এক দুর্গ সংস্থাপন করিয়া বাস করে। এখানে থাকিয়া তাহারা চারিদিকের লোকের উপরে ঘোরতর দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। এই সময়ে তাহারা সুজা নামক জনৈক চোহানের কুমারী দুহিতা হরণ করিয়া লইয়া যায়। সুজা অনেক অনুসন্ধানে তাহাদের বাসস্থান দেখিয়া কুম্ভের নিকট অভিযোগ করে। রাঠোরকে সঙ্গে লইয়া কুম্ভ তাহাদের প্রতি ধাবমান হন। সেই দুর্গম গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে সকলের যার পর নাই ক্লেশ হইয়াছিল। তথাপি তাঁহারা প্রতিহিংসা বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সে সকল ক্লেশ মনেই করেন নাই। রজনীযোগে তাঁহারা দুর্গ আক্রমণ করিয়া পুর প্রবেশ করিলেন। বিশ্বাসঘাতকেরা কোন প্রকার রণোদ্যোগের সময় পাইল না। চাচা ও মাইরা হত হইল। রাতাকোটের লুণ্ঠিত দ্রব্য সামগ্রী বিজয়ীদিগের মধ্যে বিভক্ত হইল। (ক্রমশঃ।)

মদ্যমোদক।

(বাঞ্ছারামের শেষ বাঞ্ছা।)

"বম্ বম্ বম্, হর হর হর,
মত্ত—দেবগণ সুরার লাগিয়া;
অনাদি, অনন্ত, সৃষ্টির ঈশ্বর,
কারণ-সাগরে ছিলেন ভাসিয়া।"—কবি।

বিকার।

দাদা জলধর!

বম্ বম্ বম্ হর হর হর,—কিন্তু ভায়া তুমি বড় পাথুরে বোকা! নতুবা তোমার নিরানন্দ সংসারে আজি কেন হটাৎ এত আনন্দ;—গণ্ডস্থল স্ফীত, চক্ষু দুটি ছুটিয়া বাহির হইতেছে,—কেন আজি এ হাঁসির লহর ঝলকে ঝলকে, হলকে হলকে উথলিয়া উঠিতেছে;—কি দেখিয়াই বা ঢলিয়া ঢলিয়া তুমি সেই লহরে ভাবে গদ্‌গদ, গলিয়া গলিয়া পড়িতেছ? আবার ও কি!—ও চক্ষের চাহনি ওরূপ কেন, এযে আদর ধরে না! কি ইঙ্গিত হইতেছে?—কি আমোদ! হরি হরি! তাই বটে, মদ দেখিয়াছ, মদের প্রিয় মাতাল দেখিয়াছ! ভাল, তাহাই হউক। কিন্তু, মূর্খ! আমি তোমাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি, এত আনন্দ, এত হাসি, ভাল নহে —চির নিরানন্দ মধ্যে এত তুফানময়ী আনন্দ ক্ষণিক ও ক্ষণস্থায়ী হইয়া

* ভাবিতব্যশূন্য ভাষাপ্রিয় সাম্প্রদায়িক সমালোচক উন্মাদ করিবার ইহা মহৌষধ। মূল্য ৩॥০, অপাঠ্য গ্রন্থরচকগণের নিকট অর্দ্ধ মূল্য। কমিসন শতকরা ১০১\ অর্থাৎ ঘরের কড়ি দিয়া বিদায়;—এবং সমালোচক বাবুকেও সেই সঙ্গে।

সাধারণের উপকারার্থে এই প্রকাশিত মহৌষধ 'গ্রীক এবং হিন্দু' লেখকের পচা কাগজের থলির ভিতর পাওয়া যায়। ইহা কাহার প্রস্তুত, থলির মালিকই বলিতে পারেন। ইহা বহুরূপী জলধর দাদার মদের লড়াইয়ের কোন কাহিনী হইবে, কি অন্য কিছু, তাহা বড় একটা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাহা হউক মালিকত্বের অস্থিরতা হেতু, আমিই ইহাতে সহি করিয়া মালিকত্বের প্যাটেণ্ট লইলাম, অতঃপর আর যেন কেহ ইহার অনুকরণ বা নকল না করেন; তাহা হইলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। ইতি।—বাঞ্ছারাম।

থাকে; উহাতে শয়তানি—শয়তানি গন্ধ কয়, এত আনন্দ ভাল নহে। তুমি দুর্ভাগ্য! মধুক্রম পাইয়া, মধুক্রমে বসিয়া, মধুপান তোমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না; কেবল মাছির বিষ্ঠায় দন্ত-ওষ্ঠ আঠায় জড়িত করিয়া মুখ বিকৃত করিতেই তোমার জীবন শেষ হইল।—কি আক্ষেপ! দেখ, তোমাকে দেখিলে দুঃখও হয়, হাঁসিও পায়! তুমি বলিতেছ রাগও হয়?—না, তাহা হইলে নিরাগ হইব কখন!

অবিনশ্বর অনন্ত গর্ভদিয়া আমার জীবন-গতি হইলেও, নশ্বর সময়চক্র আমার অধিষ্ঠানভূতা ও অবলম্বনীয়া। এবং সেই চক্রের নিয়ত আবর্ত্তনশীল স্বভাব হেতুই আমার এই গতিবৈচিত্র;—এজন্য কখনও উঠি, কখনও পড়ি; কখনও দেখি, কখনও দেখাই; কখনও হাঁসি,কখনও কাঁদি; তাই আমি এসংসারে কখনও জ্ঞানী, কখনও পাগল; কখনও আমীর কখনও ফকির; কখনও বা হরিবোল দিয়া হাটের মাঝে ভাবতরঙ্গে গড়াগড়ি দিয়া থাকি! আমার এ জীবন গতির পরিমাণ?—আদি ছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু অন্তভাগে অনন্ত। মধুর মদ্য,—মদিরা এ অনন্ত গতির উদ্দেশ্য এবং সঙ্গিনী, উভয়ই। মদিরে! তুমি আমার পক্ষে দান্তের বিয়াত্রিশ, মহম্মদের জিব্রেইল। মুর্খে তোমার মর্ম্ম কি বুঝিবে! তোমার মানস-মূর্ত্তি মানসনেত্রে যে একবার দেখিবে, সে কি তোমায় কখনও ছাড়িতে না ভুলিতে পারে?—ভাবে ঢলাঢল, অত্র সন্দেহ নাস্তি। তুমি না থাকিলে, না জানি এ দুরন্ত কাল-তরঙ্গে কে আমার পথ দেখাইয়া লইয়া যাইত,না জানি তোমার অভাবে সে তুরঙ্গের কোন্ অন্ধতম গুহায় বিলুপ্ত হইয়া যাইতাম! তুমি আমার এমনি বন্ধু,—চিরং জীব। কিন্তু আজি তুমি এমন হইলে কেন? টক্, তিক্ত, কটু, কষায় ইত্যাদি, ইত্যাদি। কোন্ পাষণ্ড আজি তোমার এ মূর্ত্তিবৈরূপ্য সাধন করিল! কেন তুমি আজি এরূপ বিরূপ মূর্ত্তিতে উদর গুহায় জড়সড়, লুকাইত, এমন তোলপাড় আরম্ভ করিয়া ফিরিতেছ! স্থিরোভব। স্থির হইবে না?—কেন?

অবলম্বনভূতা সময়-চক্রের গতি প্রভাবে, আমার এই জীবন-গতি কখনও স্বর্গের উর্দ্ধ প্রান্ত, কখনও বা নরকের অধঃপ্রান্ত দিয়া। নরক মার্গে নরকচর গণের স্পর্শ বারণার্থে,আমাকে কতই না হো হা করিয়া নরকচর তাড়াইতে তাড়াইতে যাইতে হইতেছে; কিন্তু ঐ দেখ, তথাপি তাহারা খেউ খেউ শব্দে পশ্চাতে পশ্চাতে আমার পদসঞ্চার অনুসরণ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। আবার ঐ দেখ, মদিরে! তোমাকে দেখিয়া কতই হাঁসিতেছে, কতই হাত তালি দিতেছে, কত কি বলিতেছে, কত অঙ্গ ভঙ্গি করিতেছে—যেন ধনুষ্টঙ্কারের রোগী! তুমি ও সকল শুনিও না; কিন্তু কই? চোখের মাথা খাও! তুমি কি তাই তবে এত ভয় পাইয়া, আজি আমার এই উদর-গুহায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া তোল পাড় করিতেছ? অধঃপাতে যাও! ভয় নাই, ভয় নাই, পাগলি! ভয় কি! উহাদের ঐ খেউ খেউ,খেউ খেউ মাত্র; স্পর্শ করিতে পারিবে না। ক্ষণেক স্থির হও, এভাব বেশি ক্ষণ

থাকিবে না; এখানেই যদি ভয় বিস্ময়ে অধঃপাতে যাও, তবে গন্তব্য স্থানে যাইবার উপায়?—জানিতেছ না, তাহা হইলে তুমি আমি দুজনকেই যে যাইতে হইবে; দুজনেরই যে গয়া গঙ্গা এখানে হইবে,—একেবারে যাইতে হইবে তাহা ভাবিতেছ না? তাই বলি, আবার বলি, স্থির হও। পার্শ্বস্থ এ নরক দৃশ্য, এ নরক রব, না সহিতে পার চক্ষু ঢাক, কাণে আঙ্গুল দেও; দেখিয়া দেখিও না, শুনিয়া শুনিও না; যাহা সাহসে না পারিলে, তাহা কৌশলে সম্পন্ন কর; কৌশলেরও সার্থকতা আছে, সে সার্থকতা এইরূপে।—উদ্দেশ্য ভুলিও না। এই দেখ, আবার এই আমরা দেখিতে দেখিতে উচ্চমার্গে উঠিলাম। মদিরে! এখন তোমার ভয় ছাড়,—উদর গুহা ঠাণ্ডা হউক; একবার তোমার সেই ভাব-গম্ভীর মোহিনী মূর্ত্তি খানি বাহির কর; সকলকে একবার দেখাও, দেখুক সকলে; দেখুক যে, তোমার সে মূর্ত্তি কি মনোমোহিনী, প্রমোদিনী, তাহা ভুলিবার জিনিস কি না। নরক মার্গের ন্যায় এখানে দর্শকের সংখ্যা অধিক নহে। এখানে দেখিবার লোক অল্প। কিন্তু যতই অল্প সংখ্যক হউক, যে কয়টি দেখিবে তাহারা দেবতা; এবং যে চক্ষে তোমায় দেখিলে ভুলিতে পারা যায় না, যে চক্ষে দেখিলে মোহিত হইতে হয়, তাহারা তোমাকে সেই চক্ষেই দেখিবে। সঙ্গিনী! প্রিয়তমে! তবে উঠ উঠ, স্বীয় মনোরমা মূর্ত্তি ধারণ কর, প্রাণ শীতল হউক। হে মদ,—হে মদ; বম্ বম্ বম্ হর হর হর, দেও বাবা, হে মদ্!

উচ্ছ্বাস।

মদিরে! আমার সে দিব্য চক্ষু কোথায়? বাড়ী ফেলিয়া আসিয়াছ! যাও, আবার যাও, সেই অনন্তধামে আমার পিতৃভবনে, যথায় বিদেশগামী যাত্রিগণ বিদেশ গমনার্থে সমবেত হইয়া অনুজ্ঞা প্রতিক্ষা করিতেছে, তথা হইতে আমার সেই দিব্য চক্ষু লইয়া আইস।—আমি একবার এই উচ্চ গগণমার্গে অনন্ত শোভা সন্দর্শন করিব।

মেঘেরসঙ্গে সূর্য্য এতক্ষণ অনেক হাতাহাতি করিয়া, এই কতক্ষণ হইল, অস্তপর্ব্বত শিখরে গমন করিয়াছেন। রৌদ্র কিছু মাত্র নাই। আকাশে যে দুএকখানি মেঘ সূর্য্যরঙ্গে রঞ্জিত হইয়াছিল, তাহারা ক্রমে পাংশু, পরে শুভ্র, শেষে ঈষৎ নীলিম ভাব ধারণ করিয়াছে। সান্ধ্যসমীরণ নূতন জলকণায় মন্থর গতি। খাসিয়া খাসিয়া শালবন হইতে কুসুম গন্ধ আনিয়া নাকের কাছে ধরিতেছে। দৃশ্যের দূরপ্রান্তে গগণসোপানে আলম্বিত নবীন মেঘ মালা ভূমিস্পর্শ করিয়া ঝুলিতেছে। উহাদের নীলবর্ণ নবীন রাগে প্রদোষের অন্ধকার মিশ্রিত হইয়া দিগ্বলয়কে কেমন ঘোরাল করিয়া তুলিতেছে। পাখিটি ডাকিতেছে,—তাও ধীরে ধীরে, তালে তালে; পাতাটি নড়িতেছে,—তাও আস্তে আস্তে, বিনা রবে।—প্রকৃতি যেন আজি শ্যামসোহাগিনী বৃন্দাবনের রাধাসুন্দরী হইয়া শ্যামের আশায় রূপের ছটা বিস্তার করিতে বসিয়াছেন; ঠোঁটে ঠোঁট লাগাইতে পারিতেছেন না, পাছে তাম্বুল রাগ নষ্ট হইয়া শ্যামের দৃষ্টিতে না পড়ে। অথবা ইনি আমাদের আফিস-বাবু, আটপহরে পোষাক

ছাড়িয়া, পোষাকি বেশে থরে থরে আফিস সাজাইয়া, তেজঃ-গম্ভীর কাঁদ কাঁদ-বিনীত-ভাবে তত্ত্বাবধায়কের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রকৃতি! তোমার আফিসের তত্ত্বাবধায়ক কে? এত জিজ্ঞাসা করি, এত দেখিতে চাই, তথাপিত একটিবারও তাহাকে ভাল করিয়া দেখাইলে না!

এই সন্ধ্যারাগে ঐ পর্ব্বত শৃঙ্গে, মদিরে! দেখ দেখি, যথায় ঐ আকাশে পাহাড়ে মিশামিশি, অন্ত এবং অনন্তের আজি কেমন সমাবেশ সাধন হইয়াছে।* দেখ দেখ, একবার চাহিয়া দেখ, এ যুগল দৃশ্যে তোমার জন্মান্তরীণ কথা মনোমধ্যে উদয় হয় কি না। কি অপূর্ব্ব ভাব,—মায়া দেবীর লীলা কি অদ্ভুত! অন্ত মুচ্‌কে হেঁসে, আধ ঘোমটায়, নাচিয়া নাচিয়া, অনন্তের গলা ধরিয়া খেলা করিতেছে, দেখিলে আমাতে আমার জ্ঞান থাকে না। আর অনন্ত?—বিরাট দেহ, বিরাট বেশ; মুকুটচূড় আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, পদতলে শেষনাগ, গম্ভীর গর্জ্জনে দিগ্বলয় কম্পমান—হিমাদ্রি ডুবিতেছে, মন্দর উঠিতেছে। ভাব-গাম্ভীর্য্য মাধুর্য্যে ভয়, বিস্ময়, হর্ষ, বিষাদ, ইত্যাদি যুগপৎ সমুৎপাদন করিয়া দর্শকের হৃদয় আকুলিত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু তথাপি অনন্ত অন্তে এ বিরোধ-স্বভাবে এমন মিল?—এমন লৌহ চুম্বকের প্রণয়?—আবার এত মনোহর? পাগলি, তাহাই; নতুবা সন্ন্যাসি এবং সংসারী, উভয়ই কি একেবারে ও একাধারে হইতে পারিতাম, না হইবার দরকার হইত! বল এবং তেজ, কাঠিন্য এবং কোমলতা, রৌদ্র এবং শান্তি, হর্ষ এবং বিষাদ, চৈতন্য এবং জড়তা, কাল এবং কালী, পুরুষ এবং প্রধান,—ইহার-ই উহা সামঞ্জস্য, ইহার-ই উহা সমাবেশ। এখন একবার দেখ দেখি এযুগল দৃশ্য কি অদ্ভুত! এ মিলন পার্ব্বণে আনন্দে একবার হরিহরি বোল দাও। দে মদ—দে মদ, বম্ বম্ বম্ হর হর হর, দেও বাবা, দে মদ!

* নিগেটিব এবং পজিটিব একত্র মিলন হইলেই ফলের উৎপত্তি হয়। অন্ত অনন্তের এ মিলনে আজি যে অপূর্ব্ব ফলের উৎপত্তি হইয়াছে, পাঠকবর্গকে বোধ করি তাহার অধিক পরিচয় দিতে হইবে না। এখন এ ফল ভোগে আসিবে কার? বাঁশ হইলেই যে ঠাকুরের কাঠাবর উঠে এমন নহে, মেথরের ঝাড়ুর জন্যও দরকার হয়;—সৌভাগ্য ক্রমে বঙ্গভূমে মেথরও অনেক।—বাপ্পারাম।

বাসনা।

মদিরে! আইস আজি আমরা অনন্তকে ধরিব। উহা যে রোজ্ রোজ্ আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যায়, দেখিও আজি যেন তাহা হইতে না পারে। আইস তবে, আজি উহাকে ধরিবই ধরিব,—এমন সুযোগ আর হইবে না; সুধু ধরিব না, আজি উহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিব। অনন্তকে এখন হাতে নোতে দেখা পাইয়া, আজি কখনই উহাকে পলাইতে দেওয়া হইবে না। দিব্য চক্ষুত আছেই আছে—লুকাইবে কোথায়? কিন্তু মদিরে, বড়দর্শনের মুক্তগাছটি একবার লইয়া আইস,

উহাকে এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিব যে, পুলিস হারি মানে, কোন মতেই পলাইবার সুযোগ না পায়। কিন্তু এ কি! এ কি! সহসা কে এমন গহন গভীর মুখ ব্যাদান করিয়া রক্ত চক্ষে আস্ফালন করিতে করিতে আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে!—কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! যেন কৃষ্ণ-রেখা বেষ্টিত সৌরমূর্ত্তি, আদি নাই, অন্ত নাই; সূর্য্য উপাড়িয়া, নক্ষত্র গিলিয়া অঘোর নৃত্য, বেগপ্রকম্পনে বিশ্বচরাচর টলটলায়মান; নীহারিকাপুঞ্জও লূতাতন্তুবৎ বসনাঞ্চল সংলগ্নে বিলীন হইয়া যাইতেছে। বোম কেদার! বাবা বাঞ্ছারাম, উহা কি আমাকে তবে গ্রাস করিতে আসিতেছে? আবার এ কি! এ আগুণের ঝলক কোথা হইতে আসিল,—কোথা হইতে আসিয়া এমন ঝলসাইতে লাগিল! হায়, হায়! দেখিতে দেখিতে এক ঝলকেই আমার বড়দর্শনরজ্জু—মদিরে আমার বড়দর্শনরজ্জু কোথায়? আমার বড়দর্শন রজ্জু পুড়িয়া ছারখার! অগ্নি অঙ্গস্পর্শ করিল!—অনন্ত জ্বালা জ্বলিল, আগুণ, আগুণ, জ্বলিয়া মরি! জ্বলিয়া মরি! অনন্ত, ক্ষান্ত হও আমি নহি—ক্ষান্ত হও দোহাই দোহাই, আমার আমিত্ব লোপ করিও না! রক্ষা কর—রক্ষা কর!—দোহাই—দোহাই!—আর না—আমার আমিত্ব যায় যে!

মদিরে! সঙ্গিনি! ম্রিয়মান হইও না। অনন্ত ভেলকি দেখাইয়া পলাইয়া গেল, কি করিব?—ভেলকির উপর শক্তি খাটে না। মতুবা পাযও যদি একবার দাঁড়াইয়া সম্মুখযুদ্ধ করিত, তাহা হইলে, একবার দেখাইতাম, এবং তুমিও একবার দেখিতে পাইতে যে আমি কতবড় বীরপুরুষ, এবং আমার বীরত্বই বা কি সুন্দর! ভাল, অনন্ত পলাইয়াছে, পলাক; যাহা গিয়াছে তাহার হাত নাই! কিন্তু ঐ যে অন্ত দেখিতেছ, উহাকে ধরিয়া তোমার দাসানুদাসী করিয়া দিব,—কেমন তাহা হইলে তোমার মন উঠিবে না? অন্ত আসিলেই অনন্ত আপনা হইতে আসিবে, কাণ টানিলেই মাথা আসিয়া থাকে। আইস, আমরা আজি এই অন্তময়ী অবনীকে আমূলত পরিদর্শন করিয়া উহাকে আয়ত্ত করিব। কিন্তু এক কথা তদুপযুক্ত স্থান কোথায়?—কোথায় বসিয়া দেখিলে সমস্ত এককালে আয়ত্ব এবং নজরে আসিবে?—চিন্তাকুলতায় সংজ্ঞাশূন্য! স্নেহময়ী মায়া দেবী সানুকূলা, দর্শনস্থানের উপযুক্ত ধ্রুবতারায় নীত করিয়া অদৃশ্যা। আঃ এ উপযুক্ত দর্শন স্থানই বটে! আনন্দে, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশস্থ—স্বভাবজ্ঞ ও তদুপলব্ধিশক্ত চিত্তযুক্ত মনকে সহকারী করিয়া, ধ্রুবতারার কিনারা ঘেঁসিয়া বসিলাম। দিব্য একখানি নবরজ্জু বিনায়িত খাটিয়া পৃষ্ঠে তোড়—জোড় সঙ্গে সুখাসনে সমাবিষ্ঠ! আমূলত অবনী পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমুদ্যত, এখন দেখ একবার, কেমন দেখায়।

ভাবিয়াছিলাম, এক দৃশ্যে আমূলত অবনীদর্শনে নাজানি কতই শোভা সন্দর্শন করিতে পাইব।—এদিকে ধবলকুট হিমাদ্রি শৃঙ্গ, শত শৃঙ্গে গগণ পরিমান করিতেছে; ওদিকে সমুদ্র তরঙ্গ ষষ্ঠি হস্ত উচ্চতায় দ্বিগুণ বেগে, আমেজনের পথে প্রবিষ্ট হইয়া, মেরু হইতে মেরু ব্যাপ্ত আণ্ডিসের চরণ ধৌত করিতে চলিয়াছে। উত্তরে ঐ তুষারধবল

মেরুস্থান, বৈধবায়ান ক্লিষ্টমনে, জন্মান্তরীণ সুখ কামনায়, আরোরা বোরিয়েলিস রূপ দীপ দানে, অনন্ত-পদে পুষ্পোপহার প্রদান করিতেছে; আবার অন্যদিকে ঐ পূর্ব্ব সমুদ্রে, নরপূজা-খাদক সাধুগণের পূজনপাত্র নারায়ণশীলা নির্ম্মাণ করিয়া, পলাকীটেরা গগণস্তূপে স্তূপাকার করিয়া তুলিতেছে। *এদিকে গহন গিরি হেক্লার ঐ গগণমার্গে ঘন-গম্ভীর অগ্নি-উদ্গীরণ; ওদিকে আবার ঐ শত বজ্র নির্ঘোষে, পর্ব্বতশির লঙ্ঘন করিয়া, সহস্র ইন্দ্র-ধনুনিনিন্দিত নায়াগ্রার জলপ্রপাত। দুলিতে দুলিতে, ভাসিতে ভাসিতে, উত্তর সমুদ্র বাহিয়া, ভল্লুক-চূড় দুরন্ত হীমশিলা তাপ আকাঙ্ক্ষায় দক্ষিণ সমুদ্রমুখে চলিয়াছে; আবার ওদিকে ঐ উহাকে আহারীয় জ্ঞানে দক্ষিণ সমুদ্র বাহিয়া অজগর তিমি করাল মুখ বিস্তার করিয়া উত্তরসমুদ্র মুখে ছুটিয়া আসিতেছে। পর্ব্বে পর্ব্বে, স্তরে স্তরে, স্থল, জল, বন, পর্ব্বত, নদী, গুহা, ক্ষেত্র, মরু, পৃথিবীর পৃষ্ঠতলে ব্যাপিয়া অধিষ্ঠান; আর মাঝে মাঝে তাহার শ্বেত পীত নীল লোহিত দ্বিপদগণের বিচরণ,—সুখ, দুঃখ, শোভা, বিলাস, দ্বন্দ্ব, কলহ, ভয়, ত্রাস,প্রেম, কুত্ব, পরবাদ আদি নানা রঙের বিবিধ ভঙ্গিতে, যেন টু দিয়া দিয়া বিশ্বগৃহে বালকের দল লুকচুরি খেলায় উন্মত্ত হইয়া, পরস্পরের চক্ষে ধুলা দিবার প্রবৃত্ত হইয়াছে। • হরি হরি! কিন্তু কই?

* ক্ষোভ করি এই কয়েক পংক্তি আধুনিক জাতীয় লেখক দিগের বোম্বেটে বাঙ্গালার অনুকরণে লিখিত।—বাঞ্ছারাম।

কোথায় বা সে জলকল্লোল,—কোথায় বা মেঘবাহনে বিদ্যুৎ ঘোষ! ভাবিয়াছিলাম, এ সুবিস্তার অবনী পুতুল সাজান সুন্দর একটি মণিহারির দোকানে পরিণত হইয়া আমার সমক্ষে উপস্থিত,—আমার আয়ত্তাধীনে আসিবে! বোম্ ভোলা!—কিন্তু কই?

অশান্তি।

কিন্তু কই?—কত কি দেখিব বলিয়া যে বসিয়াছিলাম, সে সকল কোথায়? সম্মুখে এ কি দেখিতেছি,—এত যাহা দেখিতেছি, কাঠ আঁটা কাগজের উপরে দুইটি গোলক মাত্র অঙ্কিত! সে নায়াগ্রা কোথায়, আমেজন কোথায়, উত্তর সমুদ্র কই, শতশৃঙ্গে সে হিমালয়ই বা কোথায়? আর সে পলাকীট, সে পলাদ্বীপ, সে সকলই বা কই? এযে দেখি কেবল হিজি বিজি রাঙা কাল রং মিশান কালির আঁচড়! গ্রাম কই, নগর কই, দেশ কই?—এযে কেবল ছোট বড় রাশি রাশি বর্ণযোজনা,—কালির আঁচড়! লুকোচুরি খেলাপ্রিয় সে শিশুর দল কই? যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা কই? এ যে কিছুই হইল না। হা বিধাতঃ! এ যে কিছুই হইল না! সত্য সত্যই আমার বীরত্ব কি তবে এই পর্য্যন্ত! অন্ত আয়ত্ত করাই এত কঠিন, আমি আবার অনন্তকে আয়ত্ত করিতে যাই! আমায় ধিক! আমার বাসনায় ধিক! যে বাসনা শক্তির সঙ্গে পরিমাণ না রাখিতে পারে, সে বাসনায় ধিক! যে বাসনা হয় কি জন্য? সে বাসনা যে মূল হইতে উঠিয়া অনাহত নাহাক না-

হাক আমাকে জ্বালাতন করিয়া যাইতেছে, —যাহা জ্বালাতন করা ভিন্ন আর কিছুই জানে না,—তাহার মূল, নির্ম্মূল না হয় কেন ?

আর মদিরে! কালামুখি! তুমিই যত নষ্টের গোড়া! তুমিই আমাকে অযথা প্রলোভনে এরূপ মজাইতে বসিয়াছ। যদি আমার সামর্থ্যের অতীত, তবে কেন তুমি আমাকে এমত করিয়া মাতাইয়া এ শকটে, এখানে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলে? রাঁড়ি!—তবে যাও, এই তুমিও অধঃপাতে যাও! বোতল শূন্যগর্ভে নিক্ষিপ্ত। বোতলটি খেদে, অভিমানে, রাগে, ঘুরিতে ঘুরিতে, ফুলিতে ফুলিতে, কোথায় যে লুকাইয়া গেল, আর দেখিতে পাইলাম না। তখন বিষাদভরে অনেকক্ষণ তাহার সেই পতন-পথে চাহিয়া রহিলাম, দৃষ্টি বিস্ফারিত হইল, কিছুই দেখিতে পাইলাম না; কেবল গগণের দূরপ্রান্তে মোহ-তিমির ভেদ করিয়া কালসমুদ্রের একটি মাত্র তরঙ্গবলক বিদ্যুৎবৎ নয়নপথে পড়িল, আর কিছুই পড়িল না! তাহাও যেমনই সায়াহ্নিক স্তিমিত সৌরকরবৎ মলিন প্রভায় দেখিতে দেখিতে কোথায় বিলীন হইয়া গেল। নষ্ট ধনের মর্ম্ম এখন আমার হৃদগত হইতেছে। আমি সহায়শূন্য! সঙ্গিশূন্য, এই অপরিচিত দেশে একাকী বসিয়া রহিলাম; চারিদিকে তিমিরজাল গাঢ়তর, গাঢ়তর হইয়া আসিয়া আবরিত করিল; প্রলয় বায়ু বেগভরে স্বন্ স্বন্ করিয়া বহিতেছে, আবার থাকিয়া থাকিয়া নরকচরগণের দূর অস্ফুটশব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। শিরে ঝঞ্ঝাবায়ু, উপরে কালমেঘ দিক্‌সমূহ অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। আমি পথশ্রান্ত, জীবনশ্রান্ত, কোথা যাই, কে আমার রক্ষা করে। স্নেহময়ী মায়াদেবি! মা তুমি কোথায়!

আকাশবাণি।

পাষণ্ড! নির্ব্বোধ! তুমি বোতলের প্রতি যে অবমাননা প্রকাশ করিয়াছ, তোমার কখনও মঙ্গল হওয়া উচিত হয় না। কিন্তু এ বিশ্বরাজ্যের রাজা যিনি, তিনি স্বয়ং মঙ্গলময়, তিনি শিব, তাই তোমার রক্ষা। এ বালকের ন্যায়, এ কাপুরুষের ন্যায়, তুমি এখন কেন কাঁদিয়া আকুল হইতেছ?—আপন দোষে! বোতলকে পুনর্ব্বার উঠাইয়া লও, এবার গলায় বাঁধিয়া রাখ, তবে যাবে মঙ্গল হইবে। দোষ তোমার বোতলের নহে, দোষ তোমার দ্বিচক্রের নহে, দোষ তোমার নিজের। দোষ তোমার বাসনার নহে, দোষ তোমার শক্তির নহে, দোষ তোমার ষড়দর্শন বা যে কোন দর্শনের নহে, দোষ তোমার বাসনার দর্শনাতীত অবলম্বন ভিত্তির অভাবের। পথিককে, গন্তব্য স্থানের ঠিক থাকিলে, পথবাহনে প্রতি পদক্ষেপ জরিপ, এবং পথপ্রতিরোধক প্রত্যেক কুকুর শিয়ালকে নিপাত করিয়া যাইতে হয় না; প্রত্যুত যে করে সে কখনও যথাকালে যথাস্থানে পৌঁছিতে পারে না। বাসনার দ্বারা সামর্থ্যের পরিমাণ করিও না, সামর্থ্যের দ্বারা বাসনার পরিমাণ করিও; যেহেতু বাসনা অনন্ত, সামর্থ্য অন্তবিশিষ্ট। অন্ত মণ্ডলের উপযোগিতা রক্ষা হেতু, কাল অনন্ত হইলেও, চন্দ্র সূর্য্য পরিমাণে

যেমন তাহাকে অন্ত-বিশিষ্টের ন্যায় আকার ধারণ করিয়া তদ্বৎ কার্য্য করিতে হইতেছে; তোমার বাসনাকেও তদ্রূপ, সামর্থ্যের পরিমাণে অন্ত-বিশিষ্ট করিয়া, তদ্বৎ কার্য্য করাইয়া লও। আকাশে ফাঁদ পাতিতে যাইও না, আপন ফাঁদে আপনি পড়িবে। শত পর্ব্বে যে পর্ব্বত আরোহণ সাধ্য, তাহার প্রথম পর্ব্বেই পদ দিয়া, দ্বিতীয় পদে শততম পর্ব্বে আরোহণ করিতে যাইও না। স্বীয় পদবিক্রমে চলনক্রিয়া আবদ্ধ রাখিয়া উঠিতে থাক, তাহা সময়-সাপেক্ষ বটে, কিন্তু চূড়ায় উঠিতে পারিবে; নতুবা পর্ব্বত ঘায়ে চূর্ণ হইয়া তোমার আমিত্ব লোপ পাইবে। অতএব যাও, যষ্টি হস্তে, পদসঞ্চারে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া, স্বচ্ছন্দে গমন কর; কি অন্ত কি অনন্ত কেহই তোমাকে গন্তব্য পথ দান করিতে আপত্তি করিবে না। পৃষ্ঠ পার্শ্বে দৃষ্টি করিতে অনামনস্ক হইও না; স্বচ্ছন্দে গমন কর। তোমার মঙ্গল হউক।

শাস্তি।—মদের বাজার।

আকাশবাণি নিরস্ত হইল।—দূরশ্রুত গীতবাদ্যধ্বনি যেন ধিরে ধিরে দূর-আকাশে মিশাইয়া গেল। আমার চটক হইল, চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। পশ্চাতে তাকাইয়া দেখি, ধ্রুব তারা আমার খাটিয়ার তল হইতে সরিয়া গিয়াছে। আমি সেই শূন্যমার্গে 'নমস্তো নতস্তো' খাটিয়া বাহনে ঝুলিতে লাগিলাম। ভায়া, হরিশ্চন্দ্রের আমি কি শুভ স্বর্গারোহণ! চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র প্রবলবেগে স্থানচ্যুত হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম ও ঘাত, প্রতিঘাতে খণ্ড খণ্ড, দিপিতে দ্বিপিতে দপ্ ৰূপ্ করিয়া, ভূত-সাগর-গর্ভে ছুটিয়া তাহাতে বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল। ত্রিবিক্রমস্বরূপী এক বিরাট পুরুষ সেই সাগর তটে বসিয়া, হুঙ্কারে সমস্ত সাগর শোষণ করিয়া ফেলিলেন;—কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, কি দুষ্কর কার্য্য! সেই পুরুষ-প্রভাবে ভূত-সাগরও ভূতে মিশাইয়া গেল।

ওদিকে আবার ঐ গহন-গভীর কাল তিমীরাবৃত আকাশ গর্ভ ভেদ করিয়া কোন্ জ্যোতিষ্কের ঐ জ্যোতিপুঞ্জও উদ্ভাবিত হইয়া উঠিতেছে যে, তাহার দৃষ্টি মাত্রেই এ দারুণ তিমীর এরূপ ম্লান হইয়া আসিল? আবার সম্মুখে একি! আমি একাল ধরিয়া যাহা কিছু করিয়াছি, বলিয়াছি ও ভাবিয়াছি, তাহা দারুণ দুই অগ্নি শিখারূপে লক্ লক্ জিহ্বায় আকাশ লেহণ করিতে করিতে আমার দিকে প্রবলবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। একটি বিমল স্বর্ণকান্তি, যত উর্দ্ধে উঠিতেছে, ততই স্ফীত হইয়া আসিতেছে; আর একটি নীল লোহিত লৌহ-জ্যোতি, উত্তরোত্তর যত উঠিতেছে ততই ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে; শেষে স্বর্ণকান্তি শিখার প্রাবল্যে উহা পরাস্ত হইয়া, এক বিকট মূর্ত্তি বিকট বেশ বিকট-দৃষ্টি অগ্নি-জিহ্ব পুরুষের অঙ্গে গিয়া লয় প্রাপ্ত হইল। স্বর্ণকান্তি শিখা তখন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর, তাহা হইতে আরও উজ্জ্বল হইয়া আমাকে আবরিত করিল। আহা! কি মধুর সুস্নিগ্ধ শিখা, স্পর্শে যেন দেবত্ব লাভ! পরে যে আমাকে সেই শিখা আবরিত করিয়া অনন্ত প্রভাবে কোথায় লইয়া চলিল, তাহা অনন্ত দেবই

জানেন। আমি চলিলাম, হাঁসিতে হাঁসিতে চলিলাম, ঢুলিতে ঢুলিতে খাটিয়া বাহনে সুখাসনে বসিয়া চলিলাম। কি তৃপ্তি! কি শান্তি! কিন্তু কই, আমার মদের বোতল?—তাকাইয়া দেখি আমার ওষ্ঠেই সংলগ্ন! ব্রাভো! দে হরি বোল! দে মদ! বোম্ বোম্ বোম্ হর হর হর,—দেও বাবা, দে মদ! ইতি।

শ্রীবাঞ্ছারাম।

মহম্মদের উত্তরাধিকারিগণ।

(১৯০ পৃষ্ঠার পর।)

নবম অধ্যায়।

বলদৃপ্ত মুসলমানগণ নিতান্ত সামান্য অবস্থা হইতে অতি অল্প সময়ে একটি সমরকুশল জাতিতে পরিণত হইল। পশ্চিমে বহু বিস্তৃত রোম সাম্রাজ্য শ্লথশরীর বৃদ্ধের ন্যায় পতনোন্মুখ; পূর্ব্বে প্রাচীনতম ভারতবর্ষ নানা জাতি, নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যে মিশ্র ভগ্নাংশে পরিণত; মধ্যস্থলে ভীষণ অনল জলিয়া উঠিল, আর কে তাহা নির্ব্বাণ করে। গ্রীকগণের অস্তিত্ব রোমে বিলীন, পারসীক সাম্রাজ্য গ্রীসের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিলাসের সুকোমল অঙ্কে নিদ্রিত; চারিদিক অরক্ষিত। আবার খৃষ্টীয়ধর্ম্মের এই সময়ে বহু প্রচার আরম্ভ হইল। উত্তরকালে খৃষ্টিয়ানগণ রণে ক্ষত্রীয় হইয়াছে সত্য কিন্তু প্রথম সময়ে ঠিক সে রূপ ছিল না। নবপ্রচারিত ধর্ম্মের নূতন অনুচরগণ সর্ব্বত্রই সেই ধর্ম্মপ্রণেতার অনুকরণ প্রয়াস পায়, সুতরাং অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রথম সময়ে শান্তির অনুসরণ করে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম, চৈতন্যের ধর্ম্ম, জৈন ধর্ম্ম, হিব্রু জাতীয় লোকের ধর্ম্ম, প্রাথমিক খৃষ্টীয়ধর্ম্ম, সমস্তই শান্তিবিধায়ক। অধিকাংশ ধর্ম্মপ্রচারক চৈতন্যের ন্যায়, সুতরাং মহম্মদপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বা গুরুগোবিন্দের গঠিত ধর্ম্ম যেমন সশস্ত্র প্রচারিত তেমন অন্য ধর্ম্ম নহে। এই জন্যই মুসলমান, ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, জয় লাভে অধিক কৃতকার্য্য।

একদিকে উল্লিখিতরূপ সুযোগ, অন্য দিকে অনবরত যুদ্ধ বিদ্যায় নিযুক্ত থাকাতে কষ্টসহিষ্ণুতা ও অভিজ্ঞতা; একজন মুমূর্ষু বৃদ্ধ, অন্যজন উন্নতিশীল যুবক;—কে কৃতকার্য্য হইবে সহজেই বুঝা যায়।

কিন্তু তাহা বলিয়া মুসলমানগণ অনায়াসে কিছুই লাভ করিতে পারে নাই। রক্ষা করিতে সময় সময় কষ্ট হইলেও ভারতসাম্রাজ্য লাভ করিতে ইংরেজ জাতি যেমন অনায়াসে, বিনাযুদ্ধে, বিনাব্যয়ে, আলপিনের বিনিময়ে প্রাপ্ত হইয়াছে; মুসলমান, আলপিনের অগ্রভাগে যে মৃত্তিকা বিদীর্ণ হয়, তাহাও তাদৃশ অনায়াসে প্রাপ্ত হয় নাই। যুদ্ধে তাহারা ক্ষত্রীয়ের নিয়ম বা অনু-প্রতি-

ষ্ঠিত নিয়ম পালন করে নাই সত্য; তাহারা অকারণে আক্রমণ করিয়াছে, ছল, চাতুর্য্য অবলম্বনে বা অন্যায় যুদ্ধেও কুণ্ঠিত হয় নাই; তথাপি যুদ্ধ করিয়াছে।

সময় অনুকূল হইলেও প্রতিপক্ষ সামান্য ছিল না। মুসলমান দরিদ্র,—ধন অর্দ্ধেক বল। মুসলমান অস্ত্রের সাহায্যে অস্ত্র-বল এবং ধনবল উভয়ই প্রদর্শন করিবে, তাহাদের সামান্য অসুবিধা নহে। যে বলে কার্থেজ্ চূর্ণ হইয়াছে, গ্রীসের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইয়াছে, সমস্ত সভ্য জনপদ, অরণ্য, মরু, সমুদ্র প্রভৃতি আজ্ঞাধীন হইয়াছে, ভারতবর্ষ ব্যতীত বিজ্ঞাত ভূভাগ যাহার অনধিকৃত নাই, সেই রোম মুসলমানের প্রধান প্রতিপক্ষ। সম্পদে অতুল, লোকসংখ্যা অনন্ত, ক্ষমতা অসীম। মুসলমান অল্পসংখ্যক, মরুবাসী, দরিদ্র; রোমের বিজ্ঞান আছে, যন্ত্র আছে, নানা প্রকার কৌশল আছে। মুসলমানের সম্বল হস্ত, আর অস্ত্র। ভল্ল, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র গুলিও তেমন উৎকৃষ্ট নহে; সৈন্যগণের শিক্ষাও সুশৃঙ্খল ছিল না। শরীরের বল উৎসাহে শতগুণ বর্দ্ধিত, সাহস অপরিমেয়, ধর্ম্মে সুদৃঢ় আস্থা, জীবনে অনাদর এবং জীবনান্তে পরলোকের রমণীয় চিত্র, এই মুসলমানের মন্ত্র বল।

মুসলমানের রণকৌশল পরীক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সুযোগ উপস্থিত হইল। ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম দণ্ডায়মান না হইলে ধর্ম্মে কতদূর দৃঢ় আস্থা তাহা পরীক্ষিত হয় না; মুসলমানগণের এক্ষণে সেই পরীক্ষা গ্রহণার্থ নিয়তি দেবী আসন গ্রহণ করিলেন। ক্রুসেডের সূত্রপাত হইল; খলিফা সিসারিয়ার পরিবর্ত্তে জরুজিলম্ অবরোধের আদেশ করিলেন। ইষা, মুষা, মহম্মদ যেস্থান পবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যে স্থানে প্রেরিতগণের সমাধিমন্দির বর্ত্তমান আছে, প্রকৃতির প্রিয়, ঈশ্বরের প্রিয়, সকলের প্রিয় সেই স্থান আক্রমণ নির্ণয় হইল। খৃষ্টীয় পৃথিবীর আদিপুরুষ মুসলমান জগতের আদিপুরুষের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত, ধর্ম্মের জন্য প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ। হতভাগ্য চিতোরের ন্যায় জরুজিলেমের অদৃষ্টে যে শত আক্রমণ সহ্য করিতে হইবে তাহারই সূচনা হইল। খৃষ্টশক্তি ও মুসলমানশক্তির সংঘর্ষণে যে ভীষণানল, যে অনির্ব্বাপিত অগ্নিশিখা রাবণের চিতার ন্যায় চিরকাল প্রজ্জলিত রহিবে এই তাহার সূত্রপাত।

শোণিতস্বাদপ্রাপ্ত শার্দ্দূল আর রণোন্মত্ত সৈন্য উভয়ই সমান। মুসলমান সৈন্যগণ উপর্য্যুপরি জয়লাভে নিতান্ত দুর্দ্দম্য ও ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং এক্ষণে দীর্ঘকাল সংগ্রাম চলিবে এইরূপ সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া তাহাদের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। আবুওবীদা জরুজিলেম্ অবরোধজন্য পাঁচ সহস্র সৈন্য সহ ইজেদ্ আবু সোফিয়ান্কে পাঠাইয়া পরে পাঁচদিন পর্য্যন্ত অগণ্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। জরুজিলেম্বাসিগণ দেখিল সমস্ত পূর্ব্বদেশের ভীতিস্বরূপ দুর্দ্দান্ত ইস্লেম্ সৈন্য আসিতেছে। তাহারা নগর হইতে বহির্গত হইয়া আক্রমণ বা দূত পাঠাইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিল না। প্রাচীরোপরি যন্ত্রাদি স্থাপন এবং অন্যান্য নানাপ্রকারে রক্ষা কার্য্য

করিতে লাগিল। ইজেদ্ নগর সমীপে উপস্থিত হইয়া যথানিয়মে তূর্য্যধ্বনি করিলেন, এবং মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ অথবা কর প্রদান ইহার কোনটী নগরবাসিগণ করিতে প্রস্তুত জানিতে চাহিলেন। উভয় প্রস্তাবই ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য হইল। সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিত, কিন্তু ইজেদ্ তাহা না করিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া মুসলমানগণ ঈশ্বরোপাসনা করিল। সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল 'ঈশ্বর এই পবিত্র ভূমি তোমাদিগকে দিবার জন্য রাখিয়াছেন, তোমরা প্রবেশ কর।'

দশ দিন অবরোধ এবং অবিশ্রান্ত আক্রমণেও কোন ফল দর্শিল না। পরিশেষে আবুওবীদা সমগ্র সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই এক লিখিত ঘোষণা পাঠাইলেন 'ঈশ্বর একমাত্র, মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত, সকলে তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস কর, নচেৎ করদ হও। অন্যথা আমি এরূপ সৈন্য তোমাদিগের বিরুদ্ধে চালিত করিব যে, তোমরা শূকর মাংস যেরূপ ভালবাস, তাহারা মৃত্যু তদপেক্ষা অধিক ভালবাসে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে, যে পর্য্যন্ত তোমাদের যোদ্ধৃগণকে নিহত এবং বালক বৃন্দকে দাস না করিব সে পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হইব না।'

রোম সম্রাট ইলিয়স্ আড্রিয়ান্ জরুজিলেম্ নগরী পুনর্নির্ম্মাণ করিলে ঐ নগরীকে ইলিয়া বলিত। মুসলমান সেনাপতির ঘোষণা "ইলিয়ার অধিবাসিগণের প্রতি" প্রচারিত হইল।

জরুজিলেম্ নগরীর প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ সোফ্রোনিয়স্ বলিলেন, যে এই পবিত্র নগরীর বিরুদ্ধে শত্রু ভাবে অস্ত্রধারণ করে সে ঈশ্বরবিরোধী। সুতরাং তিনি নগরীর দৃঢ়তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আক্রমণকারিগণকে অবজ্ঞার সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। য়ার্ম্মুক হইতে পলায়িতগণ নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; নগরের চতুর্দ্দিকে মরুভূমি গভীর পরিখা ছিল, এবং সর্ব্বোপরি, খৃষ্টের সমাধিমন্দির রক্ষা করিতে পবিত্র ধর্ম্মভাবে সকলেই উদ্দীপ্ত ছিল। রোমীয়গণ সহজে নত হইবে কেন?

শীতের চারি মাস গত হইল; প্রত্যেক দিন যুদ্ধ হইতে লাগিল। আক্রমণকারিগণ শীতে, বিপক্ষের যন্ত্র নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রাঘাতে, অতর্কিতবিপক্ষ আক্রমণে নিতান্ত উপদ্রুত হইলেও তাহাদের অধ্যবসায় অটল রহিল। অনন্তর ধর্ম্মাধ্যক্ষ সোফ্রোনিয়স্ নগর প্রাচীরে দণ্ডায়মান হইয়া আবুওবীদাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "আপনি কি জানেন না যে, এ একটি পবিত্র নগরী; যে এই নগরীর প্রতি অত্যাচার করে ঈশ্বর তাহাকে তাহার প্রতিশোধ দেন।"

আবুওবীদা বলিলেন "আমরা জানি এই স্থান প্রেরিতগণের; এখানে তাঁহাদের দেহ সমাহিত আছে; আমরা জানি এই স্থান হইতে রজনীতে মহম্মদ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। আমরা ইহাও জানি যে, আপনাদিগ হইতে এ স্থান লাভ করা সম্বন্ধে আমাদের অধিক অধিকার, এবং ঈশ্বর অন্যান্য স্থান যেমন আমাদিগের হস্তে প্রদান করিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত এস্থান সেই-

রূপ প্রদান না করিবেন সে পর্য্যন্ত বিরত হইব না।”

আর ভরসা নাই দেখিয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষ নগর সমর্পণে সম্মত হইলেন; কিন্তু প্রস্তাব করিলেন যে, খলিফা স্বয়ং সন্ধিপত্র সাক্ষর করিবেন এবং নগরী স্বয়ং আসিয়া অধিকার করিবেন।

যখন এই নূতন নিয়ম খলিফাকে জ্ঞাপন করা হইল, তিনি বন্ধুবর্গকে আহ্বান করিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। ওসমান জরুজিলেমের অধিবাসিগণকে ঘৃণা করিতেন; তিনি তাহাদের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অসম্মত ছিলেন। কিন্তু আলী বলিলেন এই পবিত্রনগরী খৃষ্টিয়ানগণের নিকট অতি পবিত্র; সন্ধির প্রস্তাবে অসম্মতি ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া অধিক সৈন্যদল নগরমধ্যে প্রবেশ করাইতে, এবং প্রাণপণে নগর রক্ষায় প্রস্তুত হইতে পারে। অপিচ, সৈন্যগণ দীর্ঘকাল দেশ হইতে অনুপস্থিত, খলিফাকে দেখিতে পাইলে তাহারা হৃষ্ট ও উৎসাহিত হইবে, শীতকালের সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া যাইবে, সুতরাং খলিফার যাওয়াই কর্ত্তব্য।

খলিফা আলীর বাক্য সঙ্গত বোধ করিলেন, এবং যাইতে সম্মত হইলেন। আরবীয় ইতিহাসপ্রণেতাগণের মধ্যে কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, এরূপ কিংবদন্তী ছিল যে, খলিফার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এক ব্যক্তি জরুজিলেম অধিকার করিবে। খলিফা সেই জনশ্রুতির প্রতি আস্থা স্থাপন পূর্ব্বক গমন করিলেন। যেরূপই তাঁহার উদ্দেশ্য হউক না কেন, তিনি ঐ নগরী স্বয়ং গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মদীনা হইতে তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ আলীকে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন; এবং যথারীতি উপাসনা সমাপনান্তে মহম্মদের সমাধিমন্দির সন্দর্শন পূর্ব্বক রওনা হইলেন।

এই অসাধারণ পরাক্রান্ত মুসলমানপতির অভিনির্য্যাণ এরূপ সামান্যবেশে, সামান্য অবস্থায় সম্পন্ন হইল যে, কে আর বিবেচনা করিতে পারিত যে ইহাঁরই দণ্ডচালনায় সম্রাটগণের সিংহাসন কম্পিত এবং রাজগণের রাজমুকুট স্খলিত হইয়াছে,—সমস্ত পূর্ব্বদেশীয় লুপ্তদ্রব্য ইহাঁর করতলস্থ। অতি সামান্য পরিচ্ছদ, যৎসামান্য খাদ্য এবং সামান্য অতি প্রয়োজনীয় বস্তু নিচয় একটি ব্যাগে লইয়া যাইতে লাগিলেন। রজনীতে বৃক্ষ তলে, অথবা সামান্য পশম নির্ম্মিত তাঁবু মধ্যে একটি সামান্য মাদুরে নিদ্রা যাইতেন, আবার প্রত্যুষে উপাসনা সমাপনান্তে রওনা হইতেন।

যখন আরবদেশের মধ্যদিয়া গমন করিতে লাগিলেন, অনেকে আসিয়া তাঁহার নিকট অনেকবিষয় অভিযোগ করিতে লাগিল; খলিফা ন্যায়বাণ বিচারপতির ন্যায় প্রত্যেকের উপযুক্ত বিচার ও সমুচিত দণ্ড বিধান করিতে লাগিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন একব্যক্তি দুই ভার্য্যা গ্রহণ করিয়াছে; তাহারা একটি অন্যটির সহোদরা। পৌত্তলিকগণের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত থাকিলেও ইহা মুসলমানশাস্ত্রবিরুদ্ধ ছিল। ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বে পৌত্তলিক ছিল, পরে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ওমার তাহাকে

এবং তাহার দুইভার্য্যাকে সমক্ষে আনাইয়া সমুচিত শাসন করিলে, সে বলিল, এ নিয়ম সে জানিত না। ওমার তাহা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন, ‘ হয়ত একটিকে পরিত্যাগ কর নচেৎ তোমার শিরশ্ছেদ হইবে।’

‘ হায়! কি অশুভদিনে আমি এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম! ইহাতে আমার কি উপকার হইল?’ ঐ ব্যক্তি এইরূপ বলিবা মাত্র ওমার তাহার সমীপস্থ হইয়া আপন যষ্টি দ্বারা দুইবার আঘাত করিলেন এবং বলিলেন ‘ হে ঈশ্বরদ্বেষী, আপনার শত্রো! তুমি এই শাস্তি হইতে নীতি শিক্ষা কর। ভবিষ্যতে ঈশ্বরপ্রেরিত সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা কহিতে অধিক সম্মানের সহিত কহিও। এই ধর্ম্ম ঈশ্বরসৃষ্ট, সমস্ত উত্তম লোকে ইহা গ্রহণ করিয়াছে।’

অনন্তর খলিফা তাহাকে দুই স্ত্রীর মধ্যে কোনটিকে রাখিবে নির্ব্বাচন করিতে দিলেন। কিন্তু সে তাহাতে অপারগ হইল দেখিয়া চিঠি খেলাইয়া নির্ণয় হইল। তাহাকে বিদায় করার সময় আদেশ করিলেন, ‘ যে কেহ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করে, তাহার শাস্তি মৃত্যু; সুতরাং ধর্ম্মের প্রতি আস্থা রাখিবে। আর তোমার স্ত্রীর ভগ্নিকে যে অদ্য পরিত্যাগ করিলে, যদি তাহাকে পুনরায় স্পর্শ কর তবে প্রস্তরাঘাতে তোমার জীবন নাশ করিব।’

খলিফা একস্থানে দেখিতে পাইলেন কথকগুলি লোক করদানে অসমর্থ হওয়াতে, কেহ মুসলমানগণ তাহাদিগকে রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপে দণ্ডায়মান রাখিয়াছে। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পাইলেন, বাস্তবিক তাহারা করদান করিতে পারে, তাহাদের এরূপ সামর্থ্য নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া মুসলমানগণকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন " যে যাহা না পারে, তাহাকে তাহা করিতে বাধ্য করিও না, কারণ মহম্মদ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্যকে এই সংসারে কষ্ট প্রদান করে সে নরকাগ্নির ভীম যন্ত্রণায় যৎপরোনাস্তি কষ্ট পায়।"

আবুওবীদা জরুজিলেম হইতে একদিবসের পথ ব্যবধানে গিয়া খলিফার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। তিনি সকলকে উৎসাহিত ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রভাতে উপাসনান্তে বলিলেন ‘ ঈশ্বর যাহাকে সৎপথে চালিত করেন, তাহার বিপদ নাই; কিন্তু তিনি যাহাকে বিপথে পাঠান তাহার উপায় নাই।’ একজন বৃদ্ধ খৃষ্টিয়ান সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলিল ‘ ঈশ্বর কাহাকেও বিপথে পাঠান না।’

ওমার তাহার কথার কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু তাঁহার লোকদিগের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, ‘ বৃদ্ধ পুনরায় এরূপ বলিলে তাহাকে দ্বিখণ্ড করিবে।’ বৃদ্ধ বিবেচনা পূর্ব্বক নীরব রহিল। মুসলমানের তরবারের নিকট ন্যায়শাস্ত্র নাই!

শিবিরে প্রবেশ সময়ে ওমার দেখিতে পাইলেন কথকগুলি আরবীয় লোক তাহাদের স্বদেশের সামান্য পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পট্টবস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়াছে। খলিফা আদেশ করিলেন, কর্দ্দমস্থানের মধ্য-

দিয়া তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া তাহাদের সীরিয়ার স্বর্ণলব্ধ পট্টবস্ত্র তাহাদের শরীর হইতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে।"

খলিফা জরুজিলমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "হে সর্ব্ব শক্তিমান পরমেশ্বর! আমাদিগকে এস্থান সহজে জয় করিতে দেও।' অনন্তর পট্টগৃহ স্থাপন করিয়া অনাবৃত মৃত্তিকায় উপবেশন করিলেন। ভুবনবিজয়ী, নবাগত, বীরগণের নায়ককে দেখিবার জন্য খৃষ্টিয়ানগণ দলে দলে আসিতে লাগিল। সৈন্যগণ আশঙ্কা করিতে লাগিল যে খৃষ্টিয়ানগণ খলিফাকে হত্যা করিবার জন্য আসিয়াছে, সুতরাং তাহাদিগের আগমন প্রতিরোধে প্রয়াসী হইল। কিন্তু খলিফা তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন "ঈশ্বর যাহা আদেশ করিয়াছেন তদ্ব্যতীত আমাদের আর কোন বিপদ ঘটিবে না; তোমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।"

খলিফা উপস্থিত হইবামাত্রই নগর সমর্পিত হইল। সন্ধির প্রস্তাবনায় নগর হইতে আগত প্রতিনিধিগণ সেই রাজাধিরাজ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নৃপতিকে, তালুতে কেশশূন্য, কদর্য্য পশমনির্ম্মিত গৃহে নগ্ন ভূমিতে উপবিষ্ট, এবং সামান্য পরিচ্ছদ পরিহিত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল।

নগর সমর্পণের বিষয় গুলি ওমার লিখিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে সন্ধি করার সম্বন্ধে তাহাই আদর্শ হইল।

সমর্পিত নগরে খৃষ্টিয়ানগণ অভিনব উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। মন্দিরদ্বার পথিকগণের জন্য উন্মুক্ত রহিবে, তাহাতে মুসলমানগণ দিবা রাত্রি যখন ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারিবে। ঘণ্টা শ্রবণোপযুক্ত রূপে ধীরে ধীরে বাদন করা যাইবে, উচ্চৈঃশব্দ করা যাইবে না। ক্রস মন্দিরের পুরোভাগে স্থাপন করিতে, অথবা প্রকাশ্য রূপে রাজপথে প্রদর্শন করিতে পারিবে না। খৃষ্টিয়ানগণ তাহাদের সন্তানগণকে কোরাণ শিক্ষা দিতে অথবা তাহাদের ধর্ম্মের বিষয় প্রকাশ্যরূপে বলিতে পারিবে না; তাহাদের স্বধর্ম্মে শিষ্য করিতে অথবা আত্মীয় স্বজনকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। তাহারা মুসলমানের পরিচ্ছদ —তাহাদের ন্যায় টুপি, পাদুকা শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিতে পারিবে না; মস্তকের কেশও মুসলমানের ন্যায় করিবে না; কটিবন্ধ দ্বারা প্রভেদ বুঝা যাইবে। তাহারা কোনরূপ মোহরাদিতে আরবী অক্ষর ব্যবহার করিবে না, মুসলমানের ন্যায় 'সেলাম' করিবে না, মুসলমানের পদবী দ্বারাও আহূত হইবে না। মুসলমান একজন উপস্থিত হইলে তাহারা দণ্ডায়মান হইবে এবং সে উপবেশন না করা পর্য্যন্ত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিবে। প্রত্যেক মুসলমান ভ্রমণকারীকে তিন দিন তাহাদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ না করিয়া অতিথি স্বরূপ সেবা করিতে হইবে। তাহারা মদ্য বিক্রয় করিতে, অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করিতে অথবা অশ্বারোহণ সময়ে অশ্ব পৃষ্ঠে 'জিন' ব্যবহার করিতে পারিবে না; এবং যে ভৃত্য মুসলমানের চাকর ছিল তাহারা এরূপ ভৃত্যও রাখিতে পারিবে না।

একদল ভ্রাম্যমান, মরুবাসী আরবীয়ের দলপতি, একদা মহাসমৃদ্ধ, গৌরবকীরিট পূর্ব্বদেশের ' নগররত্ন জরুজিলমের প্রতি এইরূপ অপমানজনক এবং ঘৃণনীয় নিয়ম স্থাপন করিলেন! রণোন্মাদ মুসলমানগণ সে সময়ে জয়লাভ করিলে ঈদৃশ নিয়মেই সন্ধি সংস্থাপন করিত। তাহাদের ধর্ম্ম-প্রাসাদের মূল স্তম্ভই অন্য ধর্ম্মাবলম্বী এবং তাহার ধর্ম্মের প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রদর্শন।

খৃষ্টিয়ানগণ এমনই নিস্তেজ ও হীনবীর্য্য হইয়াছিল যে, এই সমস্ত অসম্মানজনক* নিয়মেই সম্মত হইল। তখন খলিফা তাহাদিগের প্রাণ, সম্পত্তি রক্ষা করিবেন এবং তাহারা উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আপন আপন ধর্ম্ম পরিচালন করিতে পারিবে বলিয়া ভরসা দিলেন।

ওমার সলোমান নির্ম্মিত সেই সুরম্য নগরীতে পদব্রজে বৃদ্ধ সোফ্রোনিয়সের সহিত প্রাচীন তত্ত্বসমূহ এবং প্রাসাদাদি সম্বন্ধে আলাপ করিতে করিতে চলিলেন। সোফ্রোনিয়স্ খলিফার প্রতি যথোচিত সম্মান ও ভদ্রতা দেখাইলেন; কিন্তু খৃষ্টিয়ান ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন ওমারের অপরিষ্কার অবস্থা এবং মাদুরের ন্যায় কদর্য্য পশমে নির্ম্মিত মেষচর্ম্মসংযুক্ত অপকৃষ্ট পরিচ্ছদ দৃষ্টে তিনি আন্তরিক বিতৃষ্ণাই বিরক্ত হইয়াছিলেন। আবার যখন 'পুনরুত্থান' মন্দিরে সেই " অপরিষ্কার আরব " উপবেশন করিলেন, তখন তাঁহার ঘৃণা অদম্য হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, " হায়! প্রেরিত ডেনিয়াল যে শোচনীয় পরিণাম গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, এই সেই ঘৃণনীয় পরিণাম।"

কথিত আছে সোফ্রোনিয়সকে শান্ত করিতে খলিফা তাঁহার নিজের পরিচ্ছদ পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত সোফ্রোনিয়সপ্রদত্ত পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিধান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

ওমারের সত্তার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত তাঁহার খৃষ্টিয়ান মন্দির দর্শনোপলক্ষে বর্ণিত আছে। যখন তিনি সোফ্রোনিয়স সহ ' পুনরুত্থান ' মন্দিরে দণ্ডায়মান ছিলেন, তখন তাঁহার উপাসনার সময় উপস্থিত হইল; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় উপাসনা করিবেন? সোফ্রোনিয়স্ বলিলেন " আপনি যেখানে আছেন।" ওমার অস্বীকার করিয়া চলিয়া গেলেন। সোফ্রোনিয়স্ তাঁহাকে কনষ্টাণ্টাইনের মন্দিরে লইয়া গেলে সেখানেও উপাসনা করিতে অসম্মত হইয়া বাহির হইবার সময় পূর্ব্বদ্বার সমীপস্থ সোপানোপরি উপাসনা সমাপন করিলেন। অনন্তর তিনি সোফ্রোনিয়সের দিকে তাকাইয়া তাঁহার এরূপ করার কারণ বলিলেন যে, "যদি আমি ঐ দুই মন্দিরের কোন মন্দিরে উপাসনা করিতাম মুসলমানগণ তৎক্ষণাৎ সেই মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক অধিকার করিয়া মন্দিরটি মুসলমানগণের উপাসনা মন্দিরে পরিণত করিত।"

মন্দির সম্বন্ধে সন্ধির নিয়ম পালনে ওমার এতদূর সতর্ক ছিলেন যে,তিনি যেস্থানে উপাসনা করিয়াছেন সেই মঞ্চোপরি এক সময়ে একাধিক মুশলমান উপাসনা না করে তৎসম্বন্ধে একখানি লিখিত দলীল সোফ্রোনিয়সের হস্তে আপনা হইতে প্রদান করিলেন। কিন্তু মুসলমানদিগের অনুরাগের

আতিশয্য বশতঃ পরে আর সে আদেশ স্মরণ রহিল না ; মঞ্চগুলির অর্দ্ধাংশ, মন্দিরের কিয়দংশ লইয়া উত্তর কালে খলিফার সেই পবিত্রীকৃত স্থানোপরি মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অনন্তর খলিফা পূর্ব্বে যে স্থানে সলোমানের মন্দির ছিল তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া সেখানে এক মসজিদ নির্ম্মাণ করাইলেন। উত্তর কালে পরবর্ত্তী খলিফাগণ ঐ মন্দিরের আয়তন বৃদ্ধি এবং সৌষ্ঠব সাধন করিতে করিতে এমনই উৎকৃষ্ট করিয়া উঠাইয়াছিলেন যে, কর্ডোভার ভুবনবিখ্যাত অতুল্য মন্দির ব্যতীত আর কোন মন্দিরই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। হিজিরা ১৭ সনে, খৃষ্টীয় ৬৩৭ সালে জরুজিলম মুসলমান গণের অধিকৃত হয়। (ক্রমশঃ।)

শারীর-ক্রিয়া-তত্ত্ব।

(২৬২ পৃষ্ঠার পর।)

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

যথাস্থানে সজ্জিত, এবং উপাস্থি ও বন্ধনীচয়ের দ্বারা একত্র পরিবদ্ধ কঙ্কালরূপী অস্থি সমূহের উপর শরীরের সর্ব্বাঙ্গীন আকৃতি ও সংস্থিতি নির্ভর করে। দেহের মৃদু অংশ সমূহের অবলম্বন ও অবয়ব বিধানার্থ ইহারা ফ্রেম বা কাঠামের কার্য্য করে; সুকুমার করণ সমূহের অবস্থান ও রক্ষার জন্য ইহারা গহ্বর নির্ম্মাণ করিয়া দেয়,—যথা, মস্তিষ্কের রক্ষার্থ করোটী বা খুলি ; মেরুদণ্ডীয় মজ্জ রক্ষার্থ কশেরুক প্রণালী বা শির দাঁড়া; চক্ষুর রক্ষার্থ গোকক্ষ বা কোটর ; কর্ণের রক্ষার্থ শঙ্খাস্থির কোষ্ঠ ; হৃদয় ও ফুস্‌ফুস দ্বয়ের রক্ষার্থ বৃক—ইত্যাদি। সমস্ত শরীরের ও তাহার অবান্তর অংশ সমূহের গতিবিধি নির্ব্বাহার্থ ইহারা সন্ধি (কব্‌জা) প্রস্তুত করিয়া দেয় ; এবং পেশা সমূহের ক্রিয়া সৌকার্য্যার্থ তোলক দণ্ডের কার্য্য করে। এই অস্থিগুলি, সংখ্যায় ২০০ বা কিঞ্চিদধিক। ভিন্ন ভিন্ন শারীর-ক্রিয়াতত্ত্ববেত্তাদিগের গণনানুসারে সংখ্যার তারতম্য হইবার হেতু এই যে, কতকগুলি অস্থি যৌগিক ; প্রথম বয়সে তাহাদের খণ্ড পরস্পরা পৃথক্‌ থাকে, উত্তর কালে মিলিত হইয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন কায়াংশে ইহাদের গঠন ও আকার বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে, এবং একটীর সহিত আর একটী যাহাতে ঠিক্‌ মানানসই হয়, ও একটীর উপর আর একটী অনায়াসে খেলিতে পারে, অপিচ বন্ধনী সকল দৃঢ়রূপে লগ্ন হইতে পারে, এরূপ প্রকারে অতি বিচিত্র কৌশলের সহিত ইহারা কল্পিত হইয়াছে।

অন্যান্য তন্তু হইতে ঘনসারত্ব ও অনম্যতা গুণে অস্থির বিভিন্নতা আছে। এই কারণে তাহারা মৃদু ও নমনীয় তন্তু সকলকে ধারণ

করিতে পারে, এবং শরীরস্থ গহ্বর সমূহের মধ্যে কোষিত করণসমূহকে রক্ষা করিতে পারে। ইহাদের রচনায় অধিক পরিমাণে (প্রায় দুই তৃতীয়াংশ) চৌর্ণিক লবণ (Salts of lime) থাকার দরুণ ইহাদের এই দুই গুণ উৎপন্ন হয়। যদি সম্পূর্ণরূপে এই পদার্থ নির্ম্মিত হইত তাহা হইলে উহারা মার্বেল ও চূর্ণ প্রস্তরের ন্যায় প্রস্তরবৎ ও ভঙ্গুর হইত; কিন্তু ইহারা কিয়দংশে চূর্ণ ফস্ফরক (Phosphate of lime) এবং চূর্ণাঙ্গারক (Carbonate of lime) এ দুয়ের সহিত ঘনসন্নিবিষ্ট ও তজ্জন্য দৃঢ়ীভূত সংযোজক-তন্তু নামক তন্তুর কর্তৃক বিরচিত। এই সংযোজক তন্তু কথিত বা সিদ্ধ করিলে জিলাটিন পাওয়া যায়, এবং সেই কারণে ইহাকে উক্ত নামও দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার দরুণ আস্থের বিধানের ঘাতসহত্ব এবং কিয়ৎ পরিমাণে স্থিতি স্থাপকতা জন্মে। এই জন্য মৃত্তিকার উপর করোটী খণ্ড প্রক্ষেপ করিলে উহা পুনরাবর্তন করে, এবং বক্রতা নিবন্ধন পুনঃপ্লবনের আধিক্য হইয়া থাকে। দীর্ঘাস্থি সকল ন্যূনাধিক বক্র, এবং তজ্জন্য কিয়ৎ পরিমাণে স্থিতি স্থাপক। কণ্ঠাস্থি ও পঞ্জকাচয়ে এই ধর্ম্ম বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়। বিহঙ্গদিগের কণ্ঠাস্থি স্প্রিঙের ন্যায় কার্য্য করে, এবং উড্ডয়নের পর পক্ষদ্বয়কে যথাস্থানে পুনঃস্থাপিত করে। আরব বালকেরা উষ্ট্রের পঞ্জকা লইয়া উৎকৃষ্ট [illegible] করিয়া থাকে। এবম্প্রকারে সংযোজক তন্তু কঠিন পার্থিব তত্ত্বকে স্থিতিস্থাপকত্ব প্রদান করে। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চৌর্ণেয় (Calcareous) ও জান্তব পদার্থের পরিমাণের বিস্তর বিভিন্নতা হয়। শৈশবাবস্থায় অত্যল্প মাত্র চূর্ণের সঞ্চয় হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন অস্থিসমূহ প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপাস্থিময়ই থাকে। এই কারণে উহারা কোমল ও নমনীয় থাকে, ভগ্ন না হইয়া নমিত হয়। বাল্যকাল এবং যৌবনে নিয়তই চূর্ণ সঞ্চয় হইতে থাকে; প্রৌঢ় বয়সে উত্তীর্ণ হইবার পর তবে অস্থিসংভাবন প্রক্রিয়া সংপূর্ণ হয়। এ কারণ অস্থি ভগ্ন হইলে পুনঃ সংস্কার অপেক্ষাকৃত সহজে হইয়া থাকে, এবং এই কারণেই যদি ব্যাধিনিবন্ধন অস্থি সকল অপ্রকৃষ্ট রূপে বর্দ্ধিত হয় তাহা হইলে বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধ ও পথ্য ব্যবহার করিতে পারিলে সে দোষের প্রতিকার হইবার সম্ভাবনা। এতদ্দ্বারা অনুমিত হইবে যে, বালকদিগের খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে অস্থিবিধায়ক বস্তু থাকা আবশ্যক—যথা যব, গম, দ্বিদলশস্য ইত্যাদি। প্রাচীন বয়সে সংযোজক তন্তু অল্পতর এবং প্রথম বয়স অপেক্ষা চূর্ণের ভাগ অধিক থাকে। একারণে অস্থি সকল ভঙ্গুর ও সহজে ভগ্ন হয়, এবং একবার ভগ্ন হইলে সহজে সংস্কৃত হয় না। অতএব প্রবৃদ্ধ বয়সে অস্থিভঙ্গ হইলে বাল্যাবস্থার তাদৃশ দুর্ঘটনা অপেক্ষা অধিক শঙ্কার বিষয় হয়।

অস্থির আর একটি বিশেষ ধর্ম্ম লঘুত্ব। যদি সকল অস্থি সান্দ্র ও অচ্ছিদ্র হইত তাহা হইলে তাহারা সুখসঞ্চালনের অনুপযোগী ভার বিশিষ্ট হইত, এবং আশ্রয় ও সহকারী না হইয়া বোঝার ন্যায় ও শরীরের চালনার প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইত। এই কারণে তাহাদের অধিকাংশ ফাঁপা। দীর্ঘাস্থিগুলির

একটি কাণ্ড ও দুইটী প্রান্ত আছে। বহির্ভাগ নিবিড়-সন্নিবিষ্ট আস্থের বিধানাত্মক; কিন্তু কাণ্ড বা চোঙের অন্তর্ভাগে একটি দীর্ঘীকৃত গহ্বর আছে, ইহাকে মজ্জাপথ প্রণালী বলে। এই প্রণালী এক প্রকার অতি সুকুমার, রক্তাশয়-বহুল ও সূত্রময় তন্তুতে পরিপূর্ণ। এই তন্তু মেদ-পরিসিক্ত ও মজ্জা নামে পরিচিত। বৃত্তাকার প্রান্তভাগ সচরাচর বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া কিয়ৎপরিমাণে কন্দুকাকার ধারণ করিয়া থাকে; ইহার নির্মাণে কাণ্ডের বহির্ভাগের নিবিড় সন্নিবিষ্ট অস্থিময় পর্দা ক্রমশঃ পাৎলা হইয়া গিয়া তন্নিম্নে একপ্রকার নিবিড় জালোত (জালের ন্যায় বুননি যুক্ত) এবং স্পঞ্জবৎ বুননিবিশিষ্ট অস্থিময় পত্র ও সূত্র সন্নিবিষ্ট থাকে। ইহাকে অস্থির জালবৎ তন্তু (Cancellous tissue) কহে। সেই সকল পাত ও সূত্র এরূপ ভাবে সংস্থাপিত যে, যে রেখাক্রমে অস্থির উপর চাপ পড়ে উহারা নিয়ত সেই রেখাক্রমে অবস্থিত থাকে; এবং সেই জন্য অতিশয় শিথিল ও লঘু হইলেও অস্থিগুলি সমধিক ভারেও ভগ্ন হয় না। এইরূপ, একখণ্ড কাষ্ঠ যদি অনুপ্রস্থ ভাবে স্থাপিত না হইয়া যে ভাবে উহা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে, অর্থাৎ ঊর্দ্ধাধঃ বা লম্বভাবে রক্ষিত হয়, তাহা হইলে অনেক ভার সহিতে ও বিস্তর দম রাখিতে সক্ষম হয়। এক প্রকার কৃতপূর্ব্ব পরীক্ষা দ্বারা এই জালবৎ তন্তুর শক্তির বোধ জন্মিতে পারে। ৫৪ গ্রেণ ওজনে এই তন্তুর এক ঘন ইঞ্চ, প্রধান সূত্রগুলিকে সরলভাবে স্থাপিত করিয়া রক্ষিত হইয়াছিল; উহার উপর ৫ হন্দর (Cwts) ভার স্থাপন করিলেও উহা কিছুমাত্র প্রণত হয় নাই; ৬ হন্দরে চাপাইলে অর্দ্ধ ইঞ্চমাত্র নমিয়াছিল। এতদ্বারা জানা যাইতেছে উহা যেমন অতিশয় লঘু, তেমনি অতিশয় দৃঢ়। ইহার বয়ন বা বুননির বিরল সন্নিবেশও ইহার সংঘট্ট বা ধাক্কা নিবারণ ক্ষমতার একটি কারণ। সান্দ্র, নিরবকাশ, হস্তিদন্ত নির্ম্মিত দুটী ভাঁটা একত্র রাখিয়া একটিতে আঘাত করিলে সেই আঘাতবেগ অপরটীতে সংক্রামিত হয়; কিন্তু ঐ ভাঁটা যদি জালবৎ তন্তু নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে উহা অল্পমাত্রই বেগ সংক্রামিত করিত এবং আঘাতের ধাক্কা সামলাইয়া লইত। অস্থি স্বাভাবিক স্থানে ও স্বাভাবিক ভাবে থাকিলে, এবং মজ্জাপূর্ণ থাকিলে, এইরূপ সংঘট্ট জন্য ধাক্কা সামলাইবার ক্ষমতা যে অধিক হইবে তাহা বলা বাহুল্য। শরীরের সর্ব্বপ্রকার প্রচণ্ড পরিচালন এবং ইহাতে যে সকল টক্কর ও ধাক্কা লাগিবার সম্ভাবনা তৎসমূহের জন্য এই ক্ষমতা নিরতিশয় প্রয়োজনীয়। প্রান্তদ্বয়ের এইরূপ গঠন দ্বারা এবং কাণ্ডের অন্তঃশূন্যতা বিধান দ্বারা অস্থিগুলি লঘূকৃত হইয়াছে, অথচ তাহাদের দৃঢ়তা ও প্রতিরোধ শক্তি রক্ষিত হইয়াছে। অধিকন্তু, তাহাদের গাত্রে যে সকল পেশী ও কণ্ডরা (Tendon) সংলগ্ন থাকে তাহাদের দৃঢ় বন্ধনেরও উপায় বিধান করা আছে। যেখানে উপাস্থি আছে সেই সেই স্থান ব্যতীত অস্থির বহির্গাত্রের চতুর্দ্দিকে সংযোজক তন্তুময় একটি পাৎলা, শক্তসহ ঝিল্লী বা আবরক ত্বক্ আছে; ইহাকে পর্য্যস্থি (Periosteum) বা অস্থ্যাবরক ত্বক্ কহে, এবং

ইহা দ্বারা অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা অস্থির বহির্গাত্র মসৃণ হওয়াতে ঘর্ষণ প্রতিরোধের অল্পতা হয়; এবং ইহাকে মধ্যবর্ত্তী স্বরূপে আশ্রয় করিয়া ইহার ভিতর দিয়া রক্তবহা নাড়ী সকল বিভক্ত ও উপবিভক্ত হইয়া অস্থির পুষ্টি বিধানার্থ তদন্তস্থিত অতি সূক্ষ্ম নলাণু সমূহে প্রবেশের ও তন্মধ্য হইতে নিষ্ক্রমণের যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া থাকে। ইহারই সাহায্যে বন্ধনীগুলি অস্থিগাত্রে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। পর্য্যস্থি সমধিক আহত হইলে প্রদাহ উপস্থিত হয় (ইহা আমবাত অর্থাৎ Rheumatism নামক রোগের অন্যতর কারণ) এবং অস্থির পোষণক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ হয়। ইহা স্থায়ী হইলে অস্থির সেই অংশটুকে অস্থিপূতি রোগ (Necrosis) অর্থাৎ অস্থির বিনাশ, উপস্থিত হয়; এবং পূয জননের অত্যন্ত সম্ভাবনা হয়। এবম্প্রকারে আমাদের শরীরের গুটিকত বৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দায়ক ও অসাধ্য রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

কঙ্কালের সমুদায় অস্থিগুলি বন্ধনী দ্বারা অথবা উপাস্থি দ্বারা একত্র বদ্ধ আছে, এবং যে যে স্থলে তাহারা পরস্পরের উপর খেলিয়া বেড়ায় সেই সেই স্থলে ঘর্ষণ প্রতিরোধ হ্রাস করিবার জন্য এক পর্দা উপাস্থি আছে। উপাস্থির প্রান্ত দিয়া একটী সুকুমার ঝিল্লী গিয়াছে, ইহাকে "অণ্ডরসক্রক্ষ" ঝিল্লী বা থলী কহে; ইহা হইতে অল্প পরিমাণে এক প্রকার স্নৈহিক তরল পদার্থ ক্ষরিত হইয়া থাকে; ডিম্বাভ্যন্তরস্থ শ্বেত অংশের ন্যায় বলিয়া ইহাকে 'অণ্ডরস' কহে। সন্ধি সকলকে স্নেহাক্ত করিয়া ঘর্ষণ প্রতিরোধ নিবারণ করা এই দ্রব দ্রব্যের কার্য্য। আণ্ডরসিক আমবাত নামে এক প্রকার বিশেষ-আমবাত আছে; আণ্ডরসিক থলী সমূহে, বিশেষ করিয়া জানুসন্ধি স্থিত তৎসমূহে, অপৌষ্টিক দ্রব দ্রব্যের সঞ্চয় নিবন্ধন এই ব্যাধি জন্মে; সেই সঞ্চিত দ্রব্য অতিশয় উত্তেজনা জনন করে, নানাবিধ চেষ্টাতেও সহজে অপসারিত হয় না, এবং অনেক সময়ে গুরুতর বৈধানিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে। আণ্ডরসিক ঝিল্লীর তরুণ প্রদাহ কালে এই দ্রবের সঞ্চয় হইয়া থাকে, এবং তজ্জনিত অতিশয় বেদনা হইয়া থাকে। ক্রোষ্টুশীর্ষ বা শিবমুণ্ড, কফোণি-সন্ধি-বাত, এবং গৃঞ্জন বা গাজর নামে পরিচিত ব্যাধি সমূহের কারণ এইরূপ প্রদাহ।

এই অস্থি ও বন্ধনী বিনির্ম্মিত শরীরের কঠিন কাঠামা তিন অংশে বিভক্ত—১ মস্তক বা করোটী; ২ পৃষ্ঠবংশ, মেরুদণ্ড, বা কাশেরুক স্তম্ভ; এবং ৩ প্রান্ত সমূহ।

কাশেরুক বা মেরুদণ্ডীয় স্তম্ভ একটী দীর্ঘ নল; ইহা পৃষ্ঠদেশের মধ্য রেখা বহিয়া নিম্নগামী হইয়াছে, ও অবটু বা গ্রীবার পুণ্ডলি হইতে পৃষ্ঠাধঃ পর্য্যন্ত অস্থিময় আ'লের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইয়াছে, এবং অনায়াসে হস্তদ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। ইহা একখণ্ড অনবচ্ছিন্ন সরল অস্থি নহে; তাহা হইলে শরীর অবনত করা অসাধ্য হইত। পরন্ত ইহা তেত্রিশ খানি চেপ্টা, বৃত্তপ্রায়, অনিয়তাকার অস্থি-ঘটিত; এই অস্থিগুলিকে কশেরুকা কহে, এবং ইহাদের অধিকাংশেরই একটী প্রবর্দ্ধন বা উন্নতাংশ

আছে, যদ্দারা তাহারা পরস্পর আটকান থাকে। যে সকল বন্ধনী ও পেশী দ্বারা শরীর আশ্রিত,অবনত ও ভ্রাম্ত হইয়া থাকে, তাহারা এই সকল প্রবর্দ্ধনে সংলগ্ন থাকে। কশেরুকাচয় একটীর উপর আর একটী এরূপ ভাবে স্থাপিত আছে যে,তাহারা সকলে মিলিয়া একটী খাড়া চোঙ নির্ম্মাণ করিতেছে; এই চোঙের ছিদ্রমধ্যে মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত মেরুদণ্ডীয় রজ্জু স্থাপিত। প্রত্যেক কশেরুকা যুগলের ব্যবধানে একটী করিয়া উপাস্থিময় ক্ষুদ্র গদি আছে; এবং ভ্রমণ কূর্দ্দনাদি কালে মেরুদণ্ডীয় স্তম্ভে যে সমস্ত ধাক্কা লাগে এই গদি সেই সকল ধাক্কার বেগ প্রতিহত করিয়া থাকে। কশেরুকাচয় গ্রীবা হইতে নিম্নাভিমুখে ক্রমশঃ বড় ও মজবুত হইয়া গিয়াছে, এবং সরল লম্ব রেখা হইতে এরূপ ভাবে বক্রীকৃত হইয়াছে যে, শরীরের নিম্নাংশের উপর যে অধিক ভার নিক্ষিপ্ত হয় তাহা বহন করিতে পারে; তদ্দারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে মনুষ্য উন্নত অবস্থানে অর্থাৎ দণ্ডবৎ ভাবে থাকিবার জন্য অভিপ্রেত হইয়াছে। অতএব পৃষ্ঠবংশ মধ্যস্থলীয় উন্নত স্তম্ভের ন্যায় বিরাজ করিতেছে এবং ইহার চতুর্দ্দিকে দেহের সমুদায় করণ গুলি সজ্জিত রহিয়াছে। ও তৎপ্রতি তাহারা অবলম্বনের জন্য নির্ভর করিয়া থাকে।

পৃষ্ঠবংশে যে সমস্ত ব্যাধি জন্মিয়া থাকে তন্মধ্যে এক প্রকার ব্যাধি সংঘট্টন হইতে উৎপন্ন হয়। কশেরুকাচয়ের মধ্যস্থিত উপাস্থি গুলি এরূপ স্থিতিস্থাপক যে তাহারা সামান্য ধাক্কার বেগ রোধে সমর্থ, কিন্তু সংঘট্টন যদি বেশি আকস্মিক বা বেশি প্রচণ্ড হয় (যথা, অতিশয় উচ্চ স্থান হইতে লম্ফ প্রদান, অথবা বেগভরে নিম্নগামী অশ্বের হঠাৎ রশ্মি সংযমন) তাহা হইলে এক বা তদধিক কশেরুকা স্থানভ্রষ্ট হইতে পারে, অথবা কশেরুকান্তর উপাস্থি গুলি প্রদাহাপন্ন হওয়ায় পৃষ্ঠবংশের স্থায়ী অনিষ্ট উৎপন্ন হইতে পারে। যাহাকে সচরাচর কুব্জ (কুঁজা) বলে, তাদৃশ পৃষ্ঠবংশের বক্রতাও এই জাতীয় ব্যাধির অন্তর্গত। পতন, আঘাত, শৈশবাবস্থায় উৎক্ষেপণ বা তোলা খেলান, অথবা তাৎকালিক কোন স্থানীয় আঘাত বা অভিঘাত, এই সকল গুলি অনেক সময়ে উপরি উক্ত ব্যাধির কারণ হইয়া থাকে; ইহাদের ফল সর্ব্বত্র তৎকালে টের না পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কিছু কাল পরে প্রকাশ হইয়া থাকে। অসুস্থ শরীর শিশুদিগেরই এই দুরবয়বতা সচরাচর লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার সহিত বেদনা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে না; কিন্তু যদি স্কন্ধদেশে ধাক্কা বা অদীর্ঘ লম্ফ জন্য বেদনা অনুভূত হয়, তাহা হইলে ঔপাস্থিক বা আস্থিক তন্তুর কোন প্রকার পীড়া থাকা সম্ভব, এবং তাদৃশ পীড়ার পরিণাম স্বরূপ পূযোৎপত্তি হইতে পারে। সুচিকিৎসা দ্বারা বর্দ্ধিষ্ণু শিশুর রুগ্ন অস্থিগুলি সারসমন্বিত করা যাইতে পারে, কেবল আকার দোষ মাত্র রহিয়া যায়। আবার কোন কোন স্থলে রোগে অস্থি গুলিকে এতদূর আয়ত্ত করিয়া ফেলে যে তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া যায় এবং মেরু দণ্ডীয় রজ্জুকে পাড়িয়া ফেলে। মেরুদণ্ডের অনুপার্শ্ব বক্রতা আর একটী

সচরাচর জায়মান রোগ; যে সকল কাজে বা খেলায় শরীরের এক পার্শ্ব অপেক্ষা অপর পার্শ্বের অধিক পরিচালনা হইয়া থাকে, তৎসমূহ দ্বারা এই রোগ অনায়াসেই উৎপন্ন হইতে পারে। এক বাহুদ্বারা ছেলে কোলে করা, অধিক কাল একদিকের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকা, ইত্যাদি কারণে বক্রতা উৎপন্ন হইতে পারে। কিসে এরূপ হয় তাহা সহজেই বুঝান যাইতে পারে। কশেরুকান্তঃ-উপাস্থি এতদূর সঙ্কোচ্য যে, একজন পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য যদি সারাদিন তাহার শরীরের ভার দণ্ডায়মান থাকিয়া বহন করে, তাহা হইলে তাহার উচ্চতা প্রায় আধ ইঞ্চি কমিয়া যায় এবং কিছুকাল বিশ্রামাবস্থায় শয়ন করিয়া না থাকিলে পূর্ব্বতন উচ্চতা পুনঃ প্রাপ্ত হয় না। যদি প্রতিদিন এক পার্শ্ব অপেক্ষা অপরপার্শ্বে অধিক ভার পড়ে, তাহা হইলে সেই দিকের উপাস্থি অধিক সঙ্কোচিত হইবে, এবং যদি তাহার স্থিতিস্থাপকত্ব গুণ নষ্ট হইয়া যায় এবং বন্ধনী ও পেশী সকলের তানশীলতা (Tension) অপগত হয় তাহা হইলে বক্রতা জন্মিবে। উপযুক্ত চিকিৎসা করিতে অবহেলা করিলে ব্যাধি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে; বিশেষতঃ তরুণ বয়সে, কারণ তৎকালে নমনশীলতার আধিক্য থাকে। পরন্তু যদি উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধায়ক ব্যায়ামিক ও ভৈষজিক ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করা হয়, তাহা হইলে বক্রতার বৃদ্ধি নিবারণ করা যাইতে পারে। যন্ত্রাদির দ্বারা কৃত্রিম অবলম্ব প্রদান অল্পই আবশ্যক হয়, এবং অনেক সময়ে বরং অনিষ্টই করিয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

কর্ত্তাভজা।

জীবশক্তি এক অদ্ভুত পদার্থ। অয়স্কান্ত মণি যেমন স্বশক্তি প্রভাবে লৌহ আকর্ষণ করে, এই শক্তি প্রভাবে একজন লোক অসংখ্য লোকের জীবনের উপর এরূপ আধিপত্য করে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে এই শক্তি প্রভাবে এক এক জন লোক সহস্র সহস্র লোকের মন এরূপ আয়ত্ত করিয়া ফেলে যে, উক্ত ব্যক্তি যাহা আদেশ করেন, তাহারা তৎক্ষণাৎ অবিচারিত রূপে পালন করিয়া থাকে। ভল্লুক পালকেরা যেরূপ নাসিকাতে রজ্জু সংযোগ করিয়া ভল্লুক দ্বারা যদৃচ্ছা ভাব ভঙ্গী ও নৃত্যাদি করাইয়া থাকে, জীবশক্তিসম্পন্ন লোকেরাও তদ্রূপ অপর লোকদ্বারা ইচ্ছামত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া লয়েন। ইহারা যাহার প্রতি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন, সে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় অবনত মস্তকে তাঁহার বশংবদ হয়। যাহাহউক প্রবন্ধান্তরে আমরা এবিষয়ের সুদীর্ঘ সমালোচন করিব। সংপ্রতি প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি। লোকে নানা ধারণ

চয় দিয়া থাকেন, নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক তাহার অন্যতম মূর্ত্তি।

অন্যূন সার্দ্ধশত বর্ষ গত হইল নদীয়া জিলার অন্তর্গত ঘোষপুর নামক গ্রামে "কর্ত্তাভজা" নামে এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। কাঁচড়াপাড়া ও মদনপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের ক্রোশেক পূর্ব্বদিকে ঘোষপুর গ্রাম অবস্থিত। ঐ গ্রামে রামশরণ পাল নামে সদ্গোপ জাতীয় একজন কৃষিজীবী বাস করিত। রামশরণ অতি সাধুচরিত্র, ধর্ম্মপরায়ণ এবং কৃষ্ণভক্তছিলেন। তিনি কৃষক হইলেও স্বীয় চরিত্রগুণে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামস্থ বহুলোকের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এমন কি ঐসমস্ত লোক রামশরণের অতিমাত্র বাধ্যছিল। রামশরণের বয়ঃক্রম যখন প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর, তখন তদীয় পত্নী ঘোরতর পীড়ায় আক্রান্তা হন। রামশরণ গোচারণে গিয়াছিলেন, শুনিতে পাইলেন, তাঁহার স্ত্রীর মুমূর্ষু কাল উপস্থিত, আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে প্রাঙ্গণে বহির্গত করিয়াছে। রামশরণ অতি মাত্র শোকাকুলিত মনে ত্রস্ত ভাবে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় একজন তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামশরণ এত ব্যস্ত হইয়া কোথায়যাইস্?" রামশরণ সন্ন্যাসীকে যথাবিহিত অভিবাদন পুরঃসর স্বীয় ভার্য্যার অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন, 'সত্বর একঘটী জল আন্।' জল লইয়া আসিলে সন্ন্যাসী কহিলেন, 'এই জল তোর স্ত্রীর শরীরে ঢালিয়া দে, তবেই বাঁচিয়া উঠিবে।' রামশরণ জল লইয়া গেলেন বটে, কিন্তু পত্নীর অঙ্গে না ঢালিয়া ব্যস্ততা নিবন্ধন মৃত্তিকাতে ঢালিলেন। ক্ষণমধ্যে রামশরণ-পত্নী গতাসু হইলেন। তখন রামশরণ সন্ন্যাসীর নিকট সমস্ত নিবেদন করিলেন। সন্ন্যাসী রামশরণের মৃত স্ত্রীর নিকট গমনপূর্ব্বক যেস্থানে জল ঢালা হইয়াছিল, তত্রত্য কর্দ্দম লইয়া শবের সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিলেন। গোপপত্নী তৎক্ষণাৎ সুপ্তোত্থিতার ন্যায় নিরাময়শরীরে গাত্রোত্থান করিলেন। সন্ন্যাসী উক্ত ভাগ্যবতীকে কহিলেন 'সতীমা আমি তোমার গর্ভে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিব।' অতঃপর চকিতের ন্যায় সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইলেন। এই হইতে রামশরণ-পত্নীকে লোকে 'সতীমা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে পর, গোপজায়া অন্তঃস্বত্বা হইলেন। কালক্রমে একটি পুত্র প্রসূত হইল; সন্ন্যাসীর নির্দেশ অনুসারে ঐ পুত্রের নাম রামদুলাল রাখা হইল। কথিত আছে শিশু রামদুলালের অঙ্গে মহাজনের অনেক গুলি লক্ষণ ছিল, এবং বাল্যক্রীড়াকালে উক্ত শিশু নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শন করিত। জনৈক দ্বৈপায়ন গ্রন্থকার * কহিয়াছেন, "প্রৌঢ়াবস্থায় ব্যক্তিবিশেষে যে সকল মহত্বচিহ্ন লক্ষিত হয়, শৈশবেই তাহার অঙ্কুর উদ্গম হইয়া থাকে। রবর্ট ক্লাইব, জর্জ ষ্টিবিন্সন্ প্রভৃতির জীবনবৃত্তান্ত

* De Quincy. Poet Wardsworth expresses the same idea in—"Child is the father of man."

পাঠ করিলে, এইমতটি অলীক বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক, রামদুলাল যে, কালে একজন বিখ্যাত লোক হইবে, তদীয় আত্মীয় স্বজন অনেকের মনেই এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ষোড়শবর্ষবয়ঃক্রমকালে রামদুলাল আপনাকে ভগবানের অবতার বলিয়া প্রচার করিয়া দিলেন। তদবধি তাঁহার নাম হইল "কর্ত্তা" এবং তদীয় শিষ্যেরা "কর্ত্তাভজা" নামে বিখ্যাত। হইল রামদুলালই "কর্ত্তাভজা" সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রবর্ত্তক, কিন্তু লোকে রামশরণকেই প্রবর্ত্তক বলিয়া থাকে।

রামশরণের বংশধরেরা "কর্ত্তা" বলিয়াই অভিহিত হইয়া আসিতেছেন, অপর কাহারই কর্ত্তা হইবার সাধ্য নাই। কর্ত্তা বিবাহ করিতে পারেন; ইচ্ছা হইলে বহুপত্নীও গ্রহণ করিতে পারেন; এমন কি কর্ত্তার পক্ষে পরকীয়া-শক্তিও দোষাবহ নহে; কেন না সে সকল কর্ত্তার 'লীলাখেলা।' কর্ত্তাভজারা নিম্নলিখিত গাথাটি ত্রিসন্ধ্যা জপ করেন। এই মূলমন্ত্রটির নাম 'ষোল আনা' অর্থাৎ এই মন্ত্র প্রভাবে সম্পূর্ণ ষোলকলা মুক্তিলাভ হয়।

"গুরু সত্য। আর সব অসত্য।
গুরো! যা করাও করি তাই।
তুমি যা খাওয়াও, তাই খাই।
তুমি যথা যাওয়াও তথা যাই।
গুরুসত্য, গুরুসত্য। আর সব অসত্য।"

কর্ত্তাভজারা সুরাপান ও মাংসোপযোগ করেন না। কিন্তু সংপ্রতি যিনি কর্ত্তা আছেন, তাঁহার [illegible] সবই চলে। পূর্ব্বেও ইহাদের [illegible] নিষিদ্ধ ছিল না; সংপ্রতি নৌকায় ও ডেঙ্গায় উভয় স্থানেই গমনাগমন হইয়া থাকে। কর্ত্তা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপ করিতে পারেন; কিন্তু শিষ্যেরা কর্ত্তাভজন ভিন্ন আর কোন ধর্ম্ম কার্য্য করিতে পারে না। কর্ত্তাভজারা ঈশ্বরের চিন্ময়ত্ব ও নিরাকার স্বীকার করেনা; সাকার বাদীদিগের ন্যায় তাহারা বলিয়া থাকে "হাওয়ার আবার উপাসনা কি?" কর্ত্তাভজাদিগের মতে পরস্ত্রীসংসর্গ পাপ নহে। তাহারা বলে কর্ত্তা সকলের পিতা, আমরা সকলে পরস্পর ভ্রাতা ও ভগিনী, কেহই আমাদের পর নাই; সুতরাং 'পর স্ত্রী' 'পর পুরুষ' একথার কোন অর্থই নাই। পুরুষে পুরুষে, বা স্ত্রীতে স্ত্রীতে, প্রেমে যখন দোষ নাই, তখন স্ত্রী পুরুষে প্রেম কেন দোষাবহ হইবে? বিশেষতঃ আমরা ঈদৃশ প্রেমদ্বারা প্রাকৃতজনগণের ন্যায় ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করি না; এতদ্বারা কর্ত্তারই প্রীতি বর্দ্ধন করি। কর্ত্তা প্রতি ঘটে আছেন, সুতরাং এতদ্বারা তাঁহারই সুখোৎপত্তি হয়। ইহাতে কাম গন্ধ নাই, ইহা বিশুদ্ধ প্রেম। এই সকল কথার প্রমাণ জন্য তাহারা চৈতন্য চরিতামৃত হইতে—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।"

ইত্যাদি বচন আবৃত্তি করিয়া থাকে। ইহারা স্বীয় সম্প্রদায়স্থ লোক ভিন্ন অপরের নিকট আপনাদের ধর্ম্ম মত পার্য্যমাণে প্রকাশ করে না। এ বিষয়ে নরোত্তম দাসের—

"আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা" বাক্যটি ইহারা অনুশাসন স্বরূপ

মনে করে। কিন্তু "ফ্রিমেসন" দিগের ন্যায় ইহাদের মধ্যে এক প্রকার সঙ্কেত আছে, তদ্দারা স্বদলস্থ লোকদিগকে অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারে। কর্ত্তাভজা দিগের প্রতিবর্ষে "দোল" ও "রাস" দুইটি মহাপর্ব্ব আছে। কর্ত্তাই দোলমঞ্চে আরোহণ ও রাসে বিহার করেন; কর্ত্তাভজারা স্ত্রী পুরুষে রাখাল ও গোপিনী স্বরূপ ক্রীড়া করে। কর্ত্তাভজারা যে কেবল ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করে এরূপ নহে, আপনাদিগকে পরস্পর 'দাদা' ও 'দাদী' সম্বোধন করে।

রাস ও দোলের সময় ঘোষপাড়াতে বহু সংখ্যক যাত্রী উপস্থিত হয়। এবং কর্ত্তাকে বহুমূল্য উপঢৌকন ও অর্থ প্রদান করে, রাস ও দোলের মধ্যে দোলের সময়ই অধিক সমারোহ হইয়া থাকে, যাত্রিগণ কর্ত্তার সেবার কারণ নানাবিধ মিষ্টান্নপরিপূর্ণ এক একটি মালসা সাজাইয়া দেয়, তাহাকে 'মালসা ভোগ' বলে। কর্ত্তাভজারা কর্ত্তার প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া অবশেষে নানাজাতি একত্র হইয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করে, ইহাতে তাহারা কিছুমাত্র দোষ বোধ করে না।

যেসকল পাঠক পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে শকটে আরোহণ পূর্ব্বক কলিকাতা যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন যে, কাঁচড়াপাড়া ও মদনপুর ষ্টেসনে প্রায় সর্ব্বদাই বহুতর যাত্রী অবতরণ করে। ইহাদের কেহ কেহ (তন্মধ্যে ভেকধারী বৈষ্ণবই অধিকাংশ) পণ্ডিত দেবানন্দ গোস্বামীর পাঠ দর্শনার্থী; কিন্তু অধিকাংশই কর্ত্তাভজা দলস্থ যাত্রী। যাত্রী ও শিষ্যদিগের প্রদত্ত উপহার ও অর্থে বৎসর ৬। ৭ হাজার টাকা আদায় হয়। এতদ্ব্যতীত প্রতি কর্ত্তাভজা-পরিবারকে বর্ষে২ কর্ত্তাকে কিছু কিছু দিতে হয়। প্রত্যেক প্রদেশে কর্ত্তার এক এক জন প্রতিনিধি থাকেন, তাঁহাদের নাম 'মহাশয়'। এই মহাশয়েরা প্রাগুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঘোষপাড়া প্রেরণ করেন। বঙ্গদেশের নানা স্থানে গৃহী ও ভিক্ষুক দলস্থ প্রায় দশ সহস্র কর্ত্তাভজা আছে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে অতি দূরপ্রদেশ হইতে নবযুবতী কুলবধূগণ রাস ও দোলের সময় ঘোষপাড়া গমন করিয়া থাকে। ঘোষপাড়াতে 'হিমসাগর' ও 'দাড়িম্ব বৃক্ষ মূল' দুইটি স্থান পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে সাগরের জল প্রক্ষেপে রামশরণের মৃতভার্য্যা পুনর্জ্জীবিতা হন তাহার নাম হিমসাগর। এবং প্রাগুক্ত দাড়িম্ব বৃক্ষ মূলে সন্ন্যাসীর আদেশক্রমে 'সতী মাকে' সমাহিত করা হয়। কর্ত্তাভজা দিগের বিশ্বাস যে হিমসাগরের জল স্পর্শ ও তাহাতে অবগাহন করিলে সর্ব্ববিধ পাপ ক্ষয় হয়, এবং উহার জল ও দাড়িম্ব বৃক্ষ মূলের মৃত্তিকা ধারণ করিলে অন্ধ, খঞ্জ, বধির ও গলিত কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগবিশিষ্ট ব্যক্তিরা অচিরে নিরাময় হয়।

কর্ত্তাভজা দিগের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া কতিপয় বর্ষ হইল নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর নামক স্থানে বলরাম হাড়ী নামে এক ব্যক্তি "বলরামভজা" নামে এক নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। অল্প

কাল মধ্যেই এই সম্প্রদায় নদীয়া, বর্দ্ধমান ও পাবনা জেলাতে অনেক বিস্তৃত হইয়াছে ভরসা করি কোন পাঠক ইহাদের বিবরণ বান্ধবে প্রচার করিবেন। (শ্রীজ—)

বৈষয়িক নীতি।

শিশু চিরদিন শিশু থাকিবে না। বালকও চিরদিন বালক থাকিবে না। শৈশবাবস্থা অতীত হইলে বাল্যাবস্থা, বাল্যাবস্থা অতীত হইলে যৌবনাবস্থা, যৌবনাবস্থা অতীত হইলে বার্দ্ধক্য। জীবিত থাকিতে হইলে ক্রমশঃ এই কয়েকটি অবস্থা পাইতে হয়। শিশুকাল নিতান্ত পরাধীন। বাল্যকাল অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। ক্রমশঃ যত বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, মনুষ্য ততই স্বাধীন হয়েন, অর্থাৎ ততই তাঁহাকে আপন ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে হয়। ক্ষমতা সত্বে অন্যের উপর নির্ভর করা নীচতা। নীচতা মনুষ্যত্বের অঙ্গ নহে, উহা স্বভাবের বিকৃত ভাব ও দীর্ঘকাল বিকৃত অবস্থার বিরস পরিণাম। সুতরাং মনুষ্যকে আপন ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিতে হইবে, বাঁচিতে হইলে জীবনোপায় চেষ্টা করিতে হইবে। পৃথিবীতে মনুষ্যের জীবনোপায় নানা প্রকার; কেহবা চিকিৎসা, কেহবা রাজনীতি, কেহবা বাণিজ্য, কেহ বা শিল্প, কেহ বা কৃষিকার্য্য, কেহ বা কারুকার্য্য, কেহ বা শারীরিক, কেহ বা অন্যান্য রূপ মানসিক পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া আপন পোষ্য ও আত্মীয় জনের ভরণপোষণ করেন। মনুষ্য আপন সাধ্য ও অবস্থামত যে কোন জীবনোপায় অবলম্বন করুন তাহাতে অসুখের, লজ্জার বা হীনতার বিষয় কিছুই নাই, কিন্তু উহা নিতান্ত সৎ হওয়া আবশ্যক। হীন ও পরিশ্রমে অনিচ্ছুক ব্যক্তিরাই অসৎ জীবনোপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাতে যদিও কখন কখন কোন কোন লোক সফল-মনোরথ হইয়া সৎপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী হয়, তথাচ উহার পরিণাম প্রায়ই দুঃখময় হয়; কেন না সত্যের স্থায়িত্ব এবং সততার সাহস ও পবিত্রতা অসৎপথে যে কখনই প্রাপ্ত হইবার নহে, তাহা প্রকৃতিসিদ্ধ।

যেহেতু বালক চিরদিন বালক রহিবে না, এই জন্য প্রথমতঃ শিক্ষার আবশ্যক। প্রথম শিক্ষার উদ্দেশ্য বালককে পৃথিবীর অপরিচিত বিষয় সকল জ্ঞাত করা, উহাকে চিন্তা করিতে ও সদসদ্বিষয় সকল উপলব্ধি ও প্রভেদ করিতে সক্ষম করা। বালক এইরূপে প্রথমতঃ শিক্ষিত হইলে, পিতা মাতা বা গুরুজন তাহাকে কোন বিশেষ শিক্ষার জন্য দীক্ষিত করেন। এই বিশেষ শিক্ষাই তাহার জীবনোপায়ের ভিত্তি স্বরূপ। জীবনোপায়ের সাধারণ-চলিত নাম "বৈষয়িক কার্য্য"। বৈষয়িক কার্য্যে শিক্ষা

পূর্ব্বোক্ত সাধারণ-শিক্ষা অপেক্ষা কঠিন ও জটিল; কেন না প্রথমতঃ যে সকল লোকদিগের মনের প্রকৃতি, মত, রুচি, বিজ্ঞতা, শঠতা প্রভৃতি কিছুই পরিজ্ঞাত নহে, তাহাদিগের সহিত নিত্য কার্য্য করিয়া সফল-মনোরথ হওয়া সহজ বিষয় নহে। দ্বিতীয়তঃ কোনরূপ বিষয় কার্য্য সমাধা করিতে হইলে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু যেহেতু সাধারণ লোকের কোন না কোন বৈষয়িক কার্য্যে শিক্ষিত না হইলে বাঁচিবার উপায় নাই, অতএব উক্ত কার্য্য সম্বন্ধীয় কতকগুলি সাধারণ নীতি পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। যেরূপ কোন ব্যক্তি দূরদেশে যাইতে হইলে সেই দেশে যাইবার কি উত্তম উপায়, পথমধ্যে কোন্ কোন্ স্থলে নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারা যায়, কিরূপ অবস্থায় থাকিলে ব্যয় অল্প হয় এবং সেই দেশে উপস্থিত হইলে তত্রস্থ লোকদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে প্রভৃতি সমাচার সকল লওয়া আবশ্যক, সেইরূপ বাল্যকাল অতীত হইলে, যৌবনাবস্থায় কোন বৈষয়িক কার্য্যে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে বৈষয়িক কার্য্যসম্বন্ধীয় কতকগুলি সাধারণ নীতি অবগত থাকিলে পাঠদ্দশা হইতে সহসা অবস্থান্তরিত হইবার কষ্ট সমধিক অল্প হইতে পারে, এবং সংকল্পিত বৈষয়িক কার্য্য অজ্ঞব্যক্তিদিগের অপেক্ষা সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

বৈষয়িক নীতিসমষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

মনুষ্য যে কোন বৈষয়িক কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন না কেন. সেই কার্য্য সমাধা করিতে প্রথমে যে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইবে তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। যদি ভাগ্যক্রমে উহাতে ততদূর পরিশ্রম না আবশ্যক হয়, ভাল; যদি ততদূর আবশ্যক হয়, ক্ষতি নাই; যেহেতু তিনি পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত আছেন। পরিশ্রম দ্বারা অতি কঠিন ও জটিল বিষয় সকল ক্রমশঃ সহজ হয়; এবং লোকে প্রখর বুদ্ধিমান না হইলেও পরিশ্রম সহায়ে অল্প দিনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

প্রথম কোন দুরূহ কার্য্য করিতে গেলে পরিশ্রম করা যেরূপ আবশ্যক, আত্মাভিমান বিবর্জ্জিত হওয়াও সেইরূপ উচিত। কর্ম্মে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যদি কোন ব্যক্তি আত্মাভিমানী হইয়া কহেন "আমি এই কর্ম্ম সমস্তই বুঝিয়াছি," তাহা হইলে তিনি যে নিষ্ফল-পরিণাম হইবেন তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় নাই।

পরিশ্রমে কার্য্য সহজ হয় বটে, কিন্তু পদ্ধতি না থাকিলে কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। পদ্ধতিহীন মনুষ্য সর্ব্বদাই নিরবকাশ ও সর্ব্বদাই সশঙ্কচিত্ত; কেন না কোন্ সময়ে কোন্‌রূপ কার্য্য করিতে হইবে যে ব্যক্তি তাহা না জানেন, তাঁহার অধিকাংশ কর্ম্ম প্রায়ই অসমাপিত অবস্থায় থাকে, সুতরাং সে ব্যক্তি দিন রাত্র পরিশ্রম করিয়া কর্ম্ম আয়ত্তে আনিতে পারে না ও তাহাকে প্রায়ই সভয় অন্তঃকরণে কালযাপন করিতে হয়। বৈষয়িক লোকদিগের কর্ম্ম নানাপ্রকার ও কর্ম্মের সংখ্যা ও পরিমাণ য-

থেষ্ট ; সময়ের পরিমাণ ও গতি একরূপ ; নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে, এরূপ অবস্থায় সময়েরসহিত কর্ম্মের বিভাগ না করিলে এবং কর্ম্ম সকল প্রথানুসারে না করিলে কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সময়ের সহিত কার্য্যের বিভাগ এবং পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য কিরূপে করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত সার ওয়াল্‌টর এস্‌কটের ও সার উইলিয়ম জোন্‌সের জীবনী পাঠে বিশেষ অবগত হওয়া যায়। উক্ত পদ্ধতি সম্পন্ন মহাত্মারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাধারণ লোকাতীত কার্য্য সমাধা করিয়াও প্রতিদিন যথেষ্ট বিশ্রামের সুখ অনুভব করিতেন।

বৈষয়িক কার্য্য অরুচিকর হইলেও উহা শিক্ষা করিতে এবং কার্য্যের ভার পড়িলে উহা সমাধা করিতে বিশেষ যত্নবান হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কেননা যত্ন বা অনুরাগ না থাকিলে কোন কার্য্য সুন্দররূপে সমাহিত হয় না। রুচিকর কার্য্য লোকের অদৃষ্টে সর্ব্বদা ঘটে না। কবি বা দার্শনিকের অদৃষ্টে সামান্য কেরাণিগিরি বা ওজনসরকারি ঘটিয়া থাকে। এইরূপ কার্য্য বিশেষ অপ্রীতিকর হইলেও অবস্থা বৈগুণ্যে যদি তাঁহাদিগকে উহা করিতে বাধ্য হইতে হয়, তাহা হইলে যত্নের সহিত উহা করাই শ্রেয়ঃ। কোন কর্ম্ম প্রথমে অরুচিকর হইলে, পরিশেষে রুচিকর হইতে পারে ; না হইলে যতদিন উপস্থিত কর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর্ম্ম পাইবার সুযোগ না হয়, ততদিন তাহাই অবলম্বন করিয়া থাকা উচিত। আরও কোন আপাত তুচ্ছকর্ম্ম যত্নের সহিত করিতে করিতে ক্রমশঃ উহা হইতে ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায় হয়। বিস্তর লোক সামান্য সরকারি গিরি করিয়া পরিশেষে মুচ্ছুদ্দি হইয়াছে। সৌভাগ্য লোকের একেবারে আসে না। যাঁহারা সক্ততা, যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত কর্ম্ম করেন তাঁহারাই সুসঙ্গতিপন্ন হয়েন।

কর্ম্ম যে কোনরূপ হউক না কেন, অহঙ্কার শূন্য হইয়া উহা উত্তমরূপে পরিচিত হওয়া প্রথমে কর্ত্তব্য। ইহাতে যদি কালবিলম্ব হয়, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই ; যেহেতু অপক্ক অবস্থায় কোন কার্য্য করিতে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। উপস্থিত বিষয় উত্তমরূপে পরিচিত হইলে তদানুষঙ্গিক বিষয় সকলের সর্ব্বদা অনুসন্ধান করা ও স্মরণে উপস্থিত রাখা উচিত ; তৎপরে যে যে কারণে উক্ত কার্য্য কোন্ সময়ে ফলবান্‌হইয়াছে এবং কোন্ সময়ে নিষ্ফল হইয়াছে তাহাও অবগত হওয়া উচিত।

কর্ম্ম করিতে গেলে কিয়ৎপরিমাণে সাহস থাকা উচিত। সাহস ব্যতিরেকে কোন কার্য্য লাভবান্ হয় না, কিন্তু এই সাহস বিজ্ঞতার সহিত চালনা করিতে হইবে। এক সময়ে আমি দেখিতেছি কোন শস্য উত্তমরূপ জন্মে নাই ; বাজারে যাহা মজুত আছে, তাহা অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হইবে ; এরূপ অবস্থায় কোন ব্যবসায়ী সাহস করিয়া যদি উহা বিস্তর পরিমাণে অগ্রে কিনিয়া রাখে, তাহা হইলে কিছু দিন পরে যে তাহার লাভ হইবে ইহার আর সংশয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া 'আঙ্গুরের একচেটে' করা বিজ্ঞতার কার্য্য

নহে; কেন না যে সামগ্রী নিত্য ব্যবহারে আইসে, এবং যাহা কিছুদিন ধরিয়া রাখিলে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই; তাহাতেই সাহস করা বিজ্ঞতার কার্য্য।

বৈষয়িক লোকের মিথ্যাবাদী হওয়া কোন মতে উচিত নহে। ইহাতে লোকের মান থাকে না ও ব্যবসায়ের যথেষ্ট অনিষ্ট হয়। মিথ্যাবাদী লোক আপাততঃ প্রীতির ভাজন হইতে পারে, কিন্তু যখন লোকে জানিবে ঐ ব্যবসায়ী মিথ্যাবাদী, তখন তাহাকে কেহই শ্রদ্ধা করিবে না। সুতরাং ব্যবসায় স্থলে কোন বিষয়ে কথা কহিতে হইলে, পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়া কহা আবশ্যক, এবং কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইবার পূর্ব্বে অঙ্গীকার প্রতিপালনের ক্ষমতা আছে কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া প্রতিশ্রুত হওয়া উচিত। সত্যই ব্যবসায়ের ভিত্তি ও ভবিষ্যৎ উন্নতির বীজ স্বরূপ।

বৈষয়িক ব্যক্তির ধীর প্রকৃতি হওয়া আবশ্যক। ক্রোধী বা উদ্ধত ব্যক্তির বৈষয়িক কার্য্যে অনেকস্থলে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা। ক্রোধ কালে বিবেচনা থাকে না; এই সময়ে বিপক্ষ ব্যক্তি তাঁহার মনের অকপট ভাব সহজে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ঠকাইতে পারে। উদ্ধত ব্যক্তির লক্ষ্য আপন আত্মাভিমানের উপর থাকে, সুতরাং তিনিও শীঘ্র প্রবঞ্চিত হয়েন। বিপক্ষ ব্যক্তি তাঁহার আত্মাভিমানের কিঞ্চিৎ পোষকতা করিলেই, তিনি বালকের ন্যায় তাহার আয়ত্তে আসিয়া পড়েন।

আপন ক্ষমতার উপর বিশ্বাস কিয়ৎ পরিমাণে থাকা আবশ্যক; কেননা যে ব্যক্তি আপন কার্য্যের উপর বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাঁহাকে সর্ব্বদাই পরের আশ্রয় চাহিতে হয়। কিন্তু 'আমি যাহা করিয়াছি বা যাহা করিতে উদ্‌যোগ করিতেছি তাহাই যে সম্পূর্ণ রূপে ঠিক,' এরূপ অবিচলিত বিশ্বাসও দোষ; কেন না এরূপ অনেক বিষয় আছে যাহা সেরূপ আমি ভাবিতেছি কিংবা আমি যে ভাব লইতেছি তাহার অন্যমত হইতে পারে; এই জন্য নূতন, কঠিন বা জটিল বিষয় সকল সমাধা করিবার পূর্ব্বে, পরামর্শের যোগ্য ব্যক্তিদিগের স্বতন্ত্র২ মত লইলে, উক্ত বিষয় সকলের 'চারিদিক' দেখা হয়; তৎপরে যে মত বিশেষ সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই অনুসারে কার্য্য করা বিধেয়।

অনেক বৈষয়িক কার্য্য আছে যাহা অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়, ঐ সকলকে সামান্য বা তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নহে; বরং তাহাদিগের উপর সর্ব্বদা লক্ষ্য থাকা কর্ত্তব্য। সামান্য বিষয় লোকে সামান্য জ্ঞান করে বলিয়া, প্রতারণা করিবার জন্য বিপক্ষগণ উহাতেই লক্ষ্য রাখে, এবং সুযোগ পাইলে প্রতারণা করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। বস্তুতঃ পরিপক্ক বৈষয়িক লোকের নিকট এক পয়সার বিষয় যেরূপ আদরের বস্তু, সহস্রমুদ্রার বিষয়ও সেইরূপ।

যখন যে কার্য্য করিতে হয় তাহা মনোযোগের সহিত করা আবশ্যক। যদি কোন কারণে মন বিচলিত থাকে, তাহা হইলে সেই উৎকণ্ঠিত অবস্থায় বরং কার্য্য না করাই ভাল, তথাচ অমনোযোগের সহিত কোন কার্য্য করিয়া পরিশেষে উৎকণ্ঠিত চিত্তকে অধিক উৎকণ্ঠিত করা অনুচিত।

বৈষয়িক কার্য্য যেরূপ সৎহওয়া আবশ্যক, বিষয়িজন সেইরূপ নির্ম্মল চরিত্র হওয়া উচিত। যাঁহার যে কয়েকটি দোষ আছে, তাঁহাতে প্রতারণা প্রবেশের যেন সেই কয়েকটি ছিদ্র আছে। দোষ ভীরুতার আশ্রয়, এবং প্রবঞ্চনা ভীরুতার নিত্য ভক্ষ্য বস্তু।

কর্ম্ম-স্থলে সাধারণ লোকের সহিত কিরূপে ব্যবহার করিতে হয় তাহাও অবগত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কার্য্যোপলক্ষে বহু জনের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। ঐ সকল লোকে প্রচ্ছন্ন ভাবে আসিয়া কথাবার্ত্তা কহে। উহাদিগের মন কি প্রকার, উহারা কি প্রকার ধাতুর লোক, তাহা প্রথমতঃ জানা থাকে না; সুতরাং তাহাদিগের সহিত ব্যবহার অতি সতর্কতার সহিত করা উচিত। কোন ব্যক্তি অমর্য্যাদা করিবেনা। ভদ্র ও বিনয়ী হইয়া সকলের সহিত ব্যবহার করিবে, এবং যেং স্থলে দয়া ও ক্ষমার আবশ্যক হয়, সেইং স্থলে স্বার্থের প্রতি যতদূর যতলক্ষ্য রাখিতে পারা যায়, সেই মত করিয়া দয়া বা ক্ষমা প্রকাশ করিবে। লোককে প্রথমে ভাল বলিয়া বিবেচনা করিবে বটে, কিন্তু যতদিন তাঁহার স্বভাবের বিশেষ পরিচয় না পাওয়া যায়, ততদিন সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করিবে না; কেন না এরূপ বিস্তর ব্যক্তি আছে, যাহারা আপাত সুহৃদের ন্যায় ব্যবহার করিয়া পশ্চাতে সাধ্যমত অনিষ্ট করে। এই স্বার্থপর পৃথিবীতে প্রায় সকলেই স্বার্থসাধনের জন্য ব্যগ্র, সহসা নিঃস্বার্থের বা আত্মীয়ের ব্যবহার দেখিলে তাহাদিগের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিবে বটে, কিন্তু বিশেষ সতর্কথাকিবে যেন সুন্দর সিরাস (Cirrus) মেঘের ন্যায় তাহারা প্রভাতে নির্ম্মল আকাশে প্রকাশ হইয়া প্রদোষে প্রবল অনিষ্টের উৎপত্তি না করে। বিনয়ী হইয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিবে, এবং সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়া আপনাকে ও আপন স্বার্থকে রক্ষা করিবে। কোন লোকের গ্লানি শুনিয়া সহসা তাহা বিশ্বাস করিবে না। যাহার গ্লানি বা প্রশংসা পরমুখে শুনিবে, তাহা স্মরণ রাখিবে, কিন্তু স্বয়ং ব্যবহারে উপলব্ধি না করিলে বিশ্বাস করিবে না; কেন না লোকে স্বার্থসাধনের জন্য বিশ্বাস স্থলে অবিশ্বাস জন্মিয়া দিবার চেষ্টা পায় এবং অন্য লোকের দ্বারা আপনার সুখ্যাতি কীর্ত্তন করাইয়া অতি সাধু ও ভদ্র বলিয়া পরিচিত হইবার চেষ্টা পায়। যদি এইরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারে তাহা হইলে পশ্চাতে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিতোপদেশ বর্ণিত ধর্ম্মশীল ব্যাঘ্রের ন্যায় কার্য্য করে। পৃথিবী ধূর্ত্ততা পূর্ণ বটে, কিন্তু উহাতে সজ্জনও বিস্তর আছে; যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সন্দিগ্ধচিত্ত তাহাকে অন্যায় সন্দেহের জন্য সর্ব্বদা কষ্ট পাইতে হয়; পক্ষান্তরে যেজন সকলকেই সাধু ও সৎ বলিয়া অন্যায় বিশ্বাস করেন, তিনিও সর্ব্বদা প্রতারিত হয়েন, অতএব বিচক্ষণতা ও সতর্কতার সহিত লোকের ব্যবহার করা উচিত। ক্রমশঃ—

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।

বিবিয়ানা চলন।

ইংরাজী লিখিয়া বাঙ্গালী বাবুরা যেমন ইংরাজী চাইল চলনের অনুকরণ করিতেছেন, বাঙ্গালী বধূরাও তেমনি করিয়া থাকেন। যাঁহারা ইংরাজরমণীদের আচার ব্যবহার অনুকরণ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে বিবি বলিব। বাবুর বৈঠকখানা যেমন ইংরাজী ড্রইং রুমের নকল, বাঙ্গালী বিবির শয়নকক্ষও তেমনি ইংরাজী বিবির বেড্ রুম ও ড্রেসিং রুমের নকল। তেমনি খাট, তেমনি সোফা, তেমনি রকিং চেয়ার, তেমনি সর্ব্বাবয়বের প্রতিবিম্ব ধারণক্ষম বৃহৎ আর্শী, তেমনি আলনা, তেমনি ড্রেসিং টেবিল, তেমনি আলমারি। বাবুরা আল্‌বার্ট ফ্যাশনে টেরি ফিরাণ, বিবিরাও ফিরিঙ্গি খোঁপা বা টেল্ করেন। বাবুরা বুট পরেন, বিবিরাও স্লিপর বা লেডিস্ শূজ্ পরেন। উভয়েই রঙ্ বিরঙ্গের মোজা পরেন। বাবুরা ধুতির উপরে গলা খোলা কোট পরেন বিবিরাও শাড়ীর উপরে জাকেট্ পরেন। বাবুরা 'মিত্রির' পড়েন, বিবিরা 'জামাই বারিক' পড়েন। বাবুরা 'হারমণি ফ্লুট্' বাজান, বিবিরা 'পিয়ানো' বাজান। বাবুরা ব্রাণ্ডি খান, বিবিরা পোর্ট সেবন করেন। আবার বাবু বিবি উভয়ে গাড়ি চড়িয়া বায়ু সেবন করেন, ও 'ক্রস্‌মাস ইভে' উইল্‌সন্ হোটেলে পায়ের ধূলা দেন। আমরা ইহাকে ইংরাজী সভ্যতার নকল বলি।

কিন্তু ইহা ইংরাজী সভ্যতার বহির্ভাগ। ইংলণ্ডের ইংরাজী সভ্যতা ও তদনুযায়ী আচরণ ও এদেশবাসী ইংরাজ-সমাজের আচার ব্যবহার এক নহে। ইংরাজেরা এদেশে যেরূপে চলেন, আমরা তাহাই দেখি। সুতরাং তাহারই অনুকরণ করিতেছি। তাই বাঙ্গালী বধূরা বিবি হইয়া ছেলে কোলে করেন না, পাছে কাপড় ময়লা হয়; রান্না ঘরে পা দেন না, পাছে হাতে কালি লাগে; অনেকে আল্‌তা পরা ত্যাগ করিয়াছেন, পাছে মোজা লাল হইয়া যায়; নিজের হাতে ভাত বাড়েন না, পাছে নখের মাথা খয়ে যায়; আপনি পান সাজেন না, পাছে চম্পক কলিকাসদৃশ অঙ্গুলির অগ্রভাগে খয়েরের দাগ লাগে। খাটে শুইয়া শুইয়া উলের কাজ করা, 'জামাই বারিক' বা তথাবিধ অন্যান্য নাটক পড়া, স্বামী বিদেশে থাকিলে, 'প্রিয়তম' বলিয়া পত্র লেখা তাঁহাদের কাজ। যেমন প্রাচীন ভারতের বৈদিক ধর্ম্ম ক্রমশঃ অবনতি প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান কুসংস্কারপূর্ণ হিন্দুধর্ম্ম হইয়াছে, তেমনি ইংলণ্ডের উচ্চ ইংরাজী সভ্যতা ভারতবর্ষে আনীত ও বাঙ্গালীদের দ্বারা অনুকৃত হইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে পূর্ব্ব বর্ণিত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমাদের কথা এই, ইংরাজী সভ্যতা এদেশে আনীত হইয়াছে বটে, কিন্তু অবিকল আনীত হয় নাই। ভারতবর্ষবাসী ইংরাজদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার ইংলণ্ডবাসী ইংরাজ-সমাজের আচার ব্যবহার হইতে অনেক ভিন্ন। দুই একটি দৃষ্টান্ত বলি; মনে কর, ডেবিড সাহেব কেম্প সাহেবের মেমকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, 'কল্য প্রাতে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে ঘোঁড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে যাইবেন?' যদি কেম্প সাহেব আপত্তি করেন, তবে বড় অভদ্রতা হয়, কিন্তু যদি ইংলণ্ডে ডেবিড্ সাহেব এরূপ প্রস্তাব করিতেন, কেম্প সাহেব তাঁহাকে তদ্দণ্ডে অর্দ্ধ চন্দ্র দিয়া বিদায় করিতেন। ইংলণ্ডে আর একটি রীতি এই, কর্ত্তার অনুপস্থিতি কালে কোন বন্ধু তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিবেন না, যদি একাদি ক্রমে কোন বন্ধু অনেকবার এরূপ করেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহার চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ করিবে। কিন্তু এদেশে তাহা হয় না। এদেশের ইংরাজ-সমাজের কতকগুলি রীতি ইংলণ্ডের ইংরাজ সমাজের সম্পূর্ণ বিপরীত। এদেশের ইংরেজেরা এক এক জন নবাব বিশেষ; নবাবেরা বিলাস ভোগের যত উপায় আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, ইংরাজেরা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক করিয়াছেন। ভিন্নতা এই, নবাবদিগের বিলাসপরায়ণতায় পশুবৃত্তির নিতান্ত প্রাদুর্ভাব ছিল, ইংরাজদের বিলাসপরায়ণতায় সুরুচির লক্ষণ বাহুল্য দৃষ্ট হয়। অর্থ-বাহুল্যে যত প্রকার সুরুচি অনুমোদিত সুখভোগ হইতে পারে, এদেশে ইংরাজেরা সে সমস্ত ভোগ করিয়া থাকেন। এদেশে পরিশ্রমের মূল্য অল্প। এই জন্য এক এক জন ইংরেজের বাড়ীতে এক এক রেজিমেণ্ট ভৃত্য। আফিসে যেমন সেক্রেটারি, আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি আছে, ইংরাজদের বাটীতে তদ্রূপ পাচক, সহকারী পাচক; বেয়ারা, সর্দ্দার বেয়ারা, খানসামা, খিদমদগার, কোচমান, সহিস, ঘাসিয়াড়া, মেথর, মেথরাণী, বড় আয়া, ছোট আয়া আছে। এতদ্ব্যতীত ভিস্তি, এক একটি ছেলের জন্য এক এক জন চাকর, চাপরাসী, দ্বারবান, ও কুলি থাকে। এক এক কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চাকর, খানসামার কাজ বাবুর্চ্চি করিবে না, ভিস্তির কাজ খিদমদগার করিবে না। কিন্তু ইংলণ্ডে এত ভৃত্য রাখিবার ক্ষমতা অতি অল্প লোকের, আর রাখিবার প্রয়োজনও নাই, এত ভৃত্য রাখিতে গেলে কেবল ভৃত্যের বেতন দিতে সহস্র টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু এদেশে দুইশত টাকার অধিক লাগে না। আমাদের দেশের ন্যায় ইংলণ্ডেও সমস্ত গৃহকার্য্য নিজে করা বা ভৃত্যের দ্বারা করান, গৃহিণীর প্রধান কর্ত্তব্য। সেদেশে মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্র লোকের বাড়ীতে এক জন বই দাসী থাকে না; গৃহিণীকে রন্ধনকার্য্যে তাহার সাহায্য করিতে হয়। বাজার করিতে হয়, পরিবেশন করিতে হয়, কাপড় সেলাই করিতে হয়, ছেলেদের পড়া বলিয়া দিতে হয়, কন্যাদিগকে শিল্প, সঙ্গীত ও বাদ্য যন্ত্রের শিক্ষা দিতে হয়। এদেশের ইংরেজ গৃহিণীরা এসকল ভৃত্যের দ্বারা করান। নিজে গায়ে ফু দিয়া বেড়ান, স্বামীর সঙ্গে থিয়েটারে যান, ঘোড়দৌড় দে-

খিতে যান। এদেশের ফিরিঙ্গিরা এই বিকৃত ইংরেজী সভ্যতা, বা ইংরাজী-নবাবীর অনুকরণ করিয়া কষ্ট পাইতেছেন। সেক্রেটারি টকার সাহেবের স্ত্রী ও মেম, আর তাঁহার আফিসের দুইশত মুদ্রা বেতনভোগী ডিক্রুজ সাহেবের স্ত্রী ও মেম, সুতরাং বিবিয়ানা চলনে চলিবেন না কেন? ফলতঃ বিকৃত ইংরেজী সভ্যতার অনুকরণ করাতেই কলিকাতার ফিরিঙ্গিরা পুলিস কোর্ট এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। ফিরিঙ্গিদের গৃহ বিবাদের মীমাংসা পুলিসকোর্টে, ফিরিঙ্গিদের দাম্পত্য কলহের মীমাংসা পুলিস কোর্টে, পরিত্যক্তা ফিরিঙ্গি স্ত্রী পুলিস কোর্টের মারফতে স্বামীর নিকট হইতে খোরাকির টাকা পায়, ইংরাজদিগকে যেমন সুয়েজের খালদিয়া স্বদেশে যাইতে হয়, ফিরিঙ্গি সাহেব হোটেলে সুরাপান করিলে পুলিস কোর্টে পায়ের ধুলা দিয়া তাঁহাকে গৃহে যাইতে হয়। এদেশের বাঙ্গালী খৃষ্টিয়ানেরাও অনেক পরিমাণে ফিরিঙ্গিদের ন্যায় বিপদ্‌গ্রস্ত হইবার পথে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহারা ইংরেজী সভ্যতার নকল করেন, ফিরিঙ্গিদের ন্যায় টেবিলে শাক চর্চ্চড়ি ভাত খান। স্ত্রী পুরুষে নাম ধরা ধরি করেন; পাদরি সাহেব তাঁহাদের গৃহবিবাদের মীমাংসাকারী; তাঁহাদের বিবাহভোজে কেক, সন্দেশ, উভয়ই চাই। আমি বলি, দুই নৌকায় পা দিলে যে দশা হয়, ইহঁাদের সেই দশা।

মূল কথা এই, আমাদের দেশে বিকৃত ইংরেজী সভ্যতার অনুকরণ হইতেছে। প্রকৃত ইংরাজী সভ্যতা অনেক পরিমাণে অনুকরণের যোগ্য, তাহা স্বীকার করি, প্রকৃত ইংরাজ সমাজের অনেক আচার ব্যবহার অনুকরণীয়, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু আমাদের দেশীয় ভদ্র লোকেরা যাহাকে প্রকৃত ইংরাজী সভ্যতা বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, এবং যে সকল সামাজিক রীতি নীতিকে প্রকৃত ইংরাজ সমাজের রীতি নীতি বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা বাস্তবিক প্রকৃত নহে। এদেশীয় জল বায়ুর দোষে ইংরাজ চরিত্রের ও ইংরাজ আচরণে অনেক বিকৃতি জন্মিয়া গিয়াছে; আমরা তাহারই অনুকরণ করিতেছি, ও আমাদের স্ত্রীলোকদিগকেও তাহার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্তি দিতেছি। তাহার এই ফল হইবে যে, ফিরিঙ্গি সমাজ যে সকল দোষে দুষ্ট, আমাদের সমাজেও সেই সকল, বরং তাহা অপেক্ষা শোচনীয় দোষ প্রবেশ করিবে, বাঙ্গালী বধূ বিবি হউন, তাহাতে আমরা আপত্তি করি না; চন্দ্র পুলি ত্যাগ করিয়া, হার্ট কেক্ দিয়া জলযোগ করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; পদকমল দুখানি অলক্তে রঞ্জিত না করিয়া মোজা দিয়া আবৃত করিয়া রাখুন, তাহাতেও আমাদের কোন আপত্তি নাই; পাদমূলচুম্বিত কেশরাশি দ্বারা একাবেণী না করিয়া 'নগেন্দ্র শিখরে যথা খগেন্দ্র শোভন' বৎ ফিরিঙ্গি খোপা করুন, তাহাতেও কোন আপত্তি নাই; কিন্তু তাঁহারা যেন গৃহিণীর প্রধান কর্ত্তব্য না ভুলেন। গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়ান বিবিয়ানা চলন নহে, হাতে কালি লাগিবার ভয়ে রন্ধনশালায় না যাওয়া বিবিয়ানা চলন নহে, কাপড় ময়লা

হইবার ভয়ে ছেলে কোলে না করা বিবিয়ানা চলন নহে; নিষ্কর্ম্মে বসিয়া নাটক পড়া, বা তাস পেটা বিবিয়ানা চলন নহে। যে সুন্দরী প্রকৃত গৃহিণী, যে সুন্দরী স্বামী, পুত্র ও পরিবারস্থ অন্য সকলের সুখ সচ্ছন্দতা বিধান জন্য দিবারাত্র ব্যস্ত, যে সুন্দরী কেবল বিলাস বাসনা তৃপ্তির জন্য কোন কর্ম্ম করেন না, আমি বলি, তিনিই প্রকৃত বিবি;—তিনি শাড়ী পরুন, আর গৌন পরুন; মোজা পায়ে দিন, আর আলতা পরুন, আমি বলি তিনিই প্রকৃত বিবি। এক্ষণে আমাদের বধূ মহলে বিবিয়ানা চলনের দিকে যে ঝোঁক পড়িয়াছে, সাবধান না হইলে বড় বিপদ ঘটিবে।

ইংলণ্ডে আবার একরূপ এক দল বিবিও আছেন, কেবল বিলাস বাসনার তৃপ্তিসাধন করা যাঁহাদের একমাত্র কার্য্য। তাঁহারা কেবল ফ্যাশন খুঁজিয়া বেড়ান, নাচ, ভোজ, থিয়েটর, বাগান, এই সকল লইয়া তাঁহারা ব্যস্ত। আমাদের দেশের বধূদিগকে যে প্রকার বিবিয়ানা চলন শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে, তাহা, আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, উক্তরূপ বিবিয়ানা চলনের নির্য্যাস মাত্র। বলিতে কি, আমি কলিকাতা নগরে অনেক বাঙ্গালী বিবিকে নিতান্ত নির্লজ্জ ভাবে গাড়িতে বেড়াইতে দেখি। ইংলণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে যে সকল অশ্লীল ছবি হয়, অনেকের শয়নকক্ষে তাহা বিরাজ করে। উপসংহারে বলি, যে সকল বাবু বধূগণকে বিবি করিতেছেন, তাঁহারা যেন একবার ভাবেন যে, এ বিবিয়ানা চলন বিলাতের প্রকৃত ও ভদ্র সমাজের বিবিয়ানা চলন নহে।

শ্রী—

আদেশ ও দিব্যজ্ঞান।

সংপ্রতি আদেশ সম্বন্ধে বহুবিধ তর্ক হইতেছে। তর্কের বিষয়টি অশ্রদ্ধেয় নহে; যেহেতু ইহাতে যে গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্য আছে, তাহা যে-কোন বৈষয়িক ব্যক্তিমাত্রই ইচ্ছামত উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহেন সত্য, কিন্তু ইহার অস্ফুট সংস্কার ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে থাকাতে উপস্থিত প্রস্তাব সাধারণের বিবেচ্য হইতে পারে। মনের সাময়িক ক্রিয়ার নির্ম্মলতা বা মলিনতা উহার সাময়িক অবস্থার সাপেক্ষ হইলেও আত্মার উন্নতির বেলা যেরূপ সুদূরলক্ষ্য, উহার অবনতির বেলাও সেইরূপ। ইতিহাস এতাবৎকাল উন্নতির পরাকাষ্ঠা দর্শাইতে পারে নাই, অবনতিরও পরাকাষ্ঠা দর্শাইতে পারে নাই; কেননা উভয় পক্ষেই আশা অপরিতৃপ্ত আছে। দ্বৈপায়ন ব্যাস, সক্রেতিস বা কেনিলনের আত্মার উন্নতি দেখিয়া আমরা সমধিক চমৎকৃত ও প্রীত হই বটে, কিন্তু আত্মার উন্নতির অসীমতা, উহার প্রশান্ত সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তা এতাবৎকাল আমা

দিগের কল্পনার বিষয় রহিয়াছে। যেরূপ প্রকৃতির প্রাতঃশোভা-দর্শনার্থী ব্যক্তি পার্ব্বতীয় স্থানে আসিয়া পর্ব্বতমূলে দাঁড়াইয়া সুনীল সুরঞ্জিত আকাশ পটে প্রাতঃ-অরুণের প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে পর্ব্বত দেশে উঠিয়া উহা দেখিতে ইচ্ছুক হয়েন, আমরা সেইরূপ উন্নত মহাত্মাদিগের বিশুদ্ধ চিন্তারূঢ় হইয়া উন্নতির অসীমতা কল্পনা করিয়া থাকি,আশা পরিতৃপ্ত হয়না। পক্ষান্তরে কন্‌সঁতাত-ডে-অবিনীর * ন্যায় অতি অল্প দুরাত্মা নিজ দুষ্কর্ম্মে মাতৃক্রোড়—পৃথিবী—কলুষিত করিয়াছিল; তথাচ উহার কন্যার প্রতি স্নেহ অতল অবনতির বেলা আচ্ছাদন করিয়া অস্পষ্ট রাখিয়াছে। ইতিহাস যদিও উন্নতি ও অবনতির পরাকাষ্ঠা দর্শাইতে পারে নাই,তথাচ স্বর্গ ও নরকের ন্যায় এই দুই শব্দের সংস্কার সমাজে প্রভেদ রাখিয়া উহাদিগের ক্রমাধিক সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। স্বার্থ বিসর্জ্জন, চিত্ত শুদ্ধি ও সমাধি যে পরিমাণে হৃদয় অধিকার করে, সেই পরিমাণে আত্মার সংস্করণ ও উন্নতি সাধন হইতে থাকে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অননুভূত অপার্থিব দিব্য আলোক আসিয়া আত্মার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। উক্ত সৌন্দর্য্য মহাজনদিগের চিন্তা ও ক্রিয়ায় প্রকাশিত হইয়া সমাজে প্রতিফলিত হয়। সমাজ উহার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া অবৈধ-স্বার্থসংযম এবং সাধারণ হিতেচ্ছায় বা কল্যাণ বিধানে যত্নবান্ হয়। সাংখ্যের ভাষ্যে আত্মার চতুর্ব্বিধ অবস্থা বর্ণিত আছে, যথাঃ—

"সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্ রজসা স্বপ্ন মাদিশেৎ
প্রস্বাপনং তু তমসা তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্।"

অর্থাৎ জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও সমাধি। অতি অল্প চিন্তা করিলেই উপলব্ধ হইতে পারা যায় যে, এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার মধ্যে প্রথমটি আত্মার বৈষয়িক অবস্থা, চতুর্থটি উহার দেব অবস্থা, তৃতীয়টি উহার শান্তির অবস্থা এবং দ্বিতীয়টি প্রথম ও চতুর্থের পরিজ্ঞাপক স্বরূপ। * সংপ্রতি চিন্তা যেরূপ বিবেক শক্তির স্ফুটতা সম্পাদন করে, সমাধি সেইরূপ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সুবিকাশ সম্পাদন করে। পৃথিবীতে এতাবৎ কাল

* "This wretch, having commenced by gambling and drunkenness, completed his ruin in the Dutch musicoes, in the company of abandoned women. After this he married a poor creature whom he subsequently killed. He played his word of honour. He had only one thing left—his religion: he sold it. * * * He sold his faith—he sold his father—he sold by degrees, all he could sell. His father disintherited and cursed him. What mattered that? He had something left to sell–his country, France. He entered into a secret understanding with * *, and was thrown into prison &c. &c.

* যদি কেহ আপনাকে আপনি বিশেষরূপে জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে প্রতিরজনীর স্বপ্নবিবরণ প্রকটিত করিয়া রাখিলে আত্মোন্নতি সুস্পষ্টরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন।

শতপ্রকার মঙ্গলকর নীতি প্রসূত হইয়াছে উহারা সমস্তই উন্নত আত্মার ফল বা আত্মার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিভা স্বরূপ। যে জন মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারেন—"দাতব্যমিতি যদ্দানং দায়তেঽনুপকারিণে।" তাঁহার চিত্ত যে সমধিক উন্নত ও ন্যায় রূপ যজ্ঞে তিনি যে স্বার্থের আহুতি প্রদান করিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য। ফেনিলন্ যিনি সক্রেতিসের জিহ্বা দ্বারা নিম্নলিখিত * উপদেশ মালা প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি সমাধি বলে কত আত্মোন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার চিন্তাতেই সুপ্রকাশ। এইরূপ চিন্তা দ্বারা সমাজ উপকৃত হয়, এবং এই প্রকার চিন্তা আত্মার সমাধি বা দেব অবস্থায় হৃদয়ে উদয় হয়। যদি স্বার্থপর বিষয়ী জন উক্ত অবস্থা স্বয়ং উপলব্ধি করিতে সক্ষম না।

† I confess that distempers incident to man are two fold; one kind is involuntary, and therefore innocent; the other voluntary, and which of consequence makes the patient guilty, seeing that an evil disposition is the worst of all evils, and vice the most deplorable of distempers. The wicked man, by making others suffer, suffers himself, through malice, and is drawing on his head the most cruel tortures which the just gods can inflict on him. Such a one ought therefore to be pitied, more than an innocent sick man: innocence is the health of the soul, and will heal, or at least comfort you in the most sensible pains. Would you not pity a man, because he labours under the most grievous distemper? If his pain lay in his hand, or foot, you would compassionate him; but have no pity left for him, when the gangrene has reached his heart. We must not love their wickedness, but we should their persons, in order to cure them. By what you say yourself, you love mankind without knowing it; for pity proceeds from our seeing a beloved person in affliction. Do you know what it is that hinders you from loving wicked men? It is not your virtue, but the imperfection of your virtue: an imperfect virtue sinks under the weight of other men's imperfections. Our self-love hinders us from always bearing with what is so contrary to our taste & manners. We are angry with the ungrateful, because, through a principle of self-love, we want our favours to be acknowledged. Virtue in perfection takes a man off from himself, and makes him capable of always bearing with the weakness of others. Virtue when imperfect is mistrustful, criticising, severe and implacable; but when its chief aim is another man's good, then it is kind, affable, compassionate, and always the same; nothing surprises, nothing shocks it.

হউন, এইরূপ চিন্তা যে উন্নত চিন্তা ইহা স্বীকার করিবেন। মনুষ্যসম্ভব দেবভাব অস্বীকার বা উপহাস করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কলিকাতা কিছু কাল পূর্ব্বে জনৈক মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতের অসাধারণ স্মারকতা শক্তির পরিচয় পাইয়াছিল, ঐ শক্তি পৈশাচিক নহে, উহা মানুষিক শক্তি। মানসিক শক্তি অসাধারণ হইলেও উহা মানুষিক। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি অপার্থিব বিষয় সম্বন্ধে অপার্থিবরূপে প্রকাশ পায়, এবং কখন২ পার্থিব বিষয় সম্পর্কেও উহার ক্রিয়া পার্থিব নিয়মানুসারে সম্পাদিত হয় না। ভাবি অমঙ্গলের ছায়া উপস্থিত-কালে হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হওয়া, দূরস্থ প্রিয়জনের অকুশল সংবাদ পাইবার পূর্ব্বে হৃদয় উদ্বিগ্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রায়ই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলে দরিদ্র বা হৃতসর্ব্বস্ব ব্যক্তি একান্তমনে কোন কঠোর ব্যাধি হইতে বা উপস্থিত নিদারুণ দুঃখের অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশয়ে নিয়ত ঈশ্বরের আরাধনা করিতে করিতে কোন না কোন সময়ে পরিত্রাণের উপায় জ্ঞাত হয়, এমন কি দৈববাণীর ন্যায় হতাশ হৃদয়ে আশ্বাসের বাক্য যে শুনিতে পায় ইহা আমি কিয়ৎপরিমাণে স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছি এবং অতি বিশ্বস্তসূত্রে একটি উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা নিম্নে প্রকটিত করিতেছি। কলিকাতাস্থ কোন ভদ্র পরিবারে একটি জটিল মোকদ্দমা বর্দ্ধমানে উপস্থিত হয়, ঐ মোকদ্দমায় হারিলে বোধ হয় উক্ত পরিবার এককালে নিঃস্ব হইত। মোকদ্দমা যেরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহাতে ও হাকিমের ভাব ভঙ্গিতে এরূপ প্রকাশ পায় যে সেই মোকদ্দমার পরিণাম সফল হওয়া দুরূহ। মোকদ্দমার প্রায় এক মাস পরে হুকুম হয়। ইতি মধ্যে উক্ত পরিবারের কর্ত্তৃজনের অন্তঃকরণের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা লেখা বাহুল্য। 'রায়' প্রকাশ হইবার দুই দিবস পূর্ব্বে বাটীর প্রাচীনা কর্ত্রী পূর্ব্বাবধি নিত্য পূজার পরে পারিবারিককুশল ও মোকদ্দমা উপলক্ষে একান্ত মনে উহার মঙ্গল কামনা করিতেন। উক্ত দিবস প্রায় দুই প্রহর দুইঘণ্টা অতীত হইয়াছে, তিনি আরাধনায় নিমগ্ন আছেন এমন সময়ে সহসা তন্দ্রার অবির্ভাব হইল, এবং সেই কালে তিনি যেন শুনিলেন যে কোন ব্যক্তি আসিয়া কহিলেন 'ভয় নাই মঙ্গল হইবে' উক্ত ঘটনা শুক্রবারের অপরাহ্নে হয় এবং পরবর্ত্তী রবিবার প্রায় দশ ঘটিকার সময় তারে সমাচার আসিল মোকদ্দমা অনুকূল হইয়াছে। এরূপ স্থলে আদেশ স্বীকার করিলে মূর্খতা প্রকাশ হয় না, বরং অস্বীকার করিলে ধৃষ্টতা প্রকাশ হয়। কিন্তু আদেশ বা দিব্যজ্ঞানে এক পক্ষে নিরন্তর সমাধির যেরূপ আবশ্যক, পক্ষান্তরে অপার্থিব বা ঐশ্বরিক কোন ঘটনা থাকা সেইরূপ আবশ্যক। দিব্যজ্ঞান সমাধির বিষয় অনুসারে নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক রূপে প্রকাশ পায়। যে মহাত্মা যেরূপ বিষয়ে ব্রতী হয়েন এবং তিনি সেই সেই বিষয়ে যে পরিমাণে একান্তচিত্ত হয়েন, সত্যের স্বর্গীয় জ্যোতি সেই পরিমাণে তাঁহার হৃদয় আলোকিত করে। কিন্তু ঐ উন্ন-

তির অবস্থায় যদি তিনি আপনাকে সমধিক উন্নত জ্ঞান করেন, তাহা হইলে, যে মুহূর্ত্ত হইতে উক্তরূপ অভিমানের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার উন্নতির বেগাবও অবরোধ হইবে। এই আত্মাভিমান নিতান্ত অপরিহার্য্য বলিয়া অনেকেরই আত্মারূপ কুসুম বিকাশোন্মুখ অবস্থায় অভিমানরূপ তুহিন পাতে নষ্ট হইয়া যায়। কাহারো বা অর্দ্ধ বিকশিত অবস্থায় ঐরূপ ঘটে, অধিকাংশের কোরকে পবিশুষ্ক হয়, এই প্রধান অন্যতম কারণেই প্রফুল্ল আধ্যাত্মিক কুসুম অদ্যাপিও নয়নগোচর হয় নাই। আধ্যাত্মিক উন্নতি বৈষয়িক, সামাজিক বা পার্থিব জ্ঞানের উন্নতির সহিত পরিমিত নহে। উহা যে স্বতন্ত্র উন্নতি তাহাও ইতিহাস মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে; কেননা তাহা হইলে ইদানীন্তন কালে সাংখ্য, পতঞ্জলি, প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের আবির্ভাব হওয়া উচিত, কিন্তু তদনুরূপ নহে। আধ্যাত্মিক উন্নতি স্বতন্ত্র উন্নতি; এবং উহাই দয়া শ্রদ্ধা ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণের স্বর্গীয় সুমিষ্ট প্রস্রবণ স্বরূপ। এদেশীয় লোকদিগের কোমল প্রকৃতি, সদা দয়া ও ক্ষমাশীলতা প্রাচীন আর্য্যগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির ফল। তাঁহারা বিষয় বাসনা, আত্মসমৃদ্ধি বা সামাজিক সমৃদ্ধির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি পাত করেন নাই, যদি করিতেন তাহা হইলে আমাদিগের প্রকৃতি অন্তরূপ হইত ও সমাজ বৈষয়িক উন্নতি লাভ বিশেষ পরিমাণে করিত। যাহা হউক প্রাচীনেরা সমাধি দ্বারা অনেক স্থলে দিব্যজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এবং উহার সংস্কার সমগ্র হিন্দু মাত্রেরই হৃদয়ে আছে। উক্ত সংস্কার অশ্রদ্ধা বা উন্মূলন না করিয়া উহার সত্যাসত্য বিবেচনা করা আবশ্যক। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে দিব্যজ্ঞান সমাধি কালে চিত্তে উদয় হয়। এই জ্ঞান বিষয় ভেদে নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক রূপে প্রকাশ পায়। আধ্যাত্মিক দিব্যজ্ঞান আত্মার অবিনশ্বরতা, পরলোক, ঈশ্বরের সহিত উহার সম্বন্ধ, ঈশ্বরের নৈকট্যে উহার সুখ ও তদ্বৈপরীত্যে দুঃখ, এই সকল প্রকাশ করে। এই দিব্যজ্ঞান ধর্ম্মের বীজ, নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি, এবং যদৃচ্ছাচারিতার সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র স্বরূপ। পৃথিবী যেরূপ সূর্য্য-বিরহিত হইয়া জীবিত থাকিতে পারে না, সমাজ সেইরূপ উক্ত জ্ঞানের অভাবে জীবিত থাকিতে পারে না। সমাজ হইতে ইহা পৃথক কর মনুষ্য-জীবন দুর্ভার—সমাজ বিশৃঙ্খল ও কোলাহলময়—পৃথিবী স্বার্থপরতা, দাম্ভিকতা, যদৃচ্ছাচারিতা, বিরোধ ও নিষ্ঠুরতার পিশাচভূমি—সকল সম্বন্ধ উচ্ছিন্ন—ভ্রাতৃভাব বিচ্ছিন্ন—শান্তি অস্তগত—আশা তিরোহিত—আদি অন্তহীন—অন্ত আদিহীন—সত্য অলীক—অলীকই সত্য—নিত্য অনিত্য—অনিত্যই নিত্য—যাহাই ইন্দ্রিয় সেব্য তাহাই সুখ—যাহা দৈহিক বল বা মানসিক চতুরতায় প্রাপ্তব্য তাহাই স্বাধিকারভোক্তব্য। ক্রমশঃ—

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী

বিপুল ব্রহ্মাণ্ড।

(সৌর ও নাক্ষত্রিক জগৎ)

কৃষ্ণপক্ষের রজনীযোগে নিরম্বুদ নভোমণ্ডল অসংখ্য হীরকখণ্ডে মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। চন্দ্রোদয়ে ঐ সকল জ্যোতিষ্কের জ্যোতিঃ যারপর নাই নিষ্প্রভ ও মলিন দেখায়; এবং নিশাবসানে একেবারেই নয়নান্তরাল হইয়া যায়। স্থির ভাবে অভিনিবেশ সহকারে ঐ সকল জ্যোতির্ম্ময় গগনচারি পদার্থপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টি-যোজনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, উহাদের অধিকাংশই মৃদুবাতাভিতাড়িত বাতির আলোকের ন্যায় চঞ্চল জ্যোতিঃ বিকাশ করিতে থাকে, আর অত্যল্প মাত্রেই কেবল "নির্ব্বাত নিষ্কম্প" দীপশিখার ন্যায় স্থির প্রভা উদগীরণ করে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত উহাদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিলে আবার দেখা যায়, যে, যাহারা স্থির ভাবে আলোক প্রদান করে, তাহারা প্রতি রাত্রিতেই স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত হইতেছে। কিন্তু যাহারা অস্থির ভাবে আলোক দান করে, তাহারা সেই একস্থানেই অবস্থিত রহিয়াছে। কখন বা বৃন্তচ্যুত শ্বেত-পুষ্পের ন্যায় উহার দুই একটি ভূতলে পতিত হইতেছে দেখা যায়। কখন বা সপুচ্ছ অভিনব আকৃতির অন্যবিধ জ্যোতিষ্ক কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত আকাশে সমুদিত হইয়া মানবগণকে সন্ত্রাসিত ও ব্যাকুলিত করিয়া তুলে, এবং যেমন অতর্কিত ভাবে দেখাদেয়, তেমনি আবার মাতৃ-কোলেই বিলীন হইয়া যায়। এসকল জ্যোতিষ্ক কি? কোথায়? কতদূরে অবস্থিত? অনুসন্ধিৎসু মানব মন আগ্রহ সহকারে এই প্রশ্নোত্তর প্রাপ্তির প্রয়াসী। সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে মনুষ্য প্রতিদিন ঐ সকল পদার্থ দেখিতেছে; অকূল পাথারে নাবিকগণ উহাদের সাহায্যে দিক্ নিরূপণ করিতেছে; যামিনী যোগে জ্যোতিষ্ক-নিঃসৃত আলোকলাভ করিয়া গোমেষপালকেরা পশু চারণা ও কৃষকগণ হলচালনা প্রভৃতি কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য ধনাগমের ও পার্থিব সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধির প্রধান সোপান; যাহার সাহায্যে সাংসারিক সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তাহার প্রতি সহজেই সংসারি-লোকের মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্যেই হয়ত প্রাচীন জাতিরা নিয়তকাল মনোবিজ্ঞানানুশীলনে নিযুক্ত থাকিয়াও বাহ্যবিজ্ঞানের এই একটি প্রধান শাখার উন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানকুশল ইউরোপীয়েরা অন্যান্য বাহ্যবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্ব্বিদ্যার সমধিক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। সামান্য মানবের চর্ম্ম চক্ষুঃ অধিকদূর দেখিতে পায়না, সেই অভাব পূরণ

করিবার নিমিত্ত তাঁহারা উদ্ভাবনী শক্তি প্রভাবে দূরস্থ পদার্থ সমূহ স্পষ্ট দেখিবার নিমিত্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, নানা প্রকার গবেষণাদ্বারা উত্তাপ,আলোক, শব্দ,বিদ্যুৎ প্রভৃতির যথাযথ স্বরূপ ও প্রকৃতি পরিজ্ঞাত হইয়াছেন ; এবং গণিতের অখণ্ড প্রমাণ দ্বারা ঐ সকল জ্যোতিষ্কের স্বরূপ, প্রকৃতি, কার্য্যকলাপ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় সম্যক্ প্রকারে নির্ণয় করিয়াছেন।

শুনিলে বিস্ময় জন্মিবে, পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, ঐ যে সুনীলগগণে অসংখ্য তারকামালা ঝিকিমিকি করিতেছে,কাঁপিতে কাঁপিতে চঞ্চলভাবে আলোক প্রদান করিতেছে, উহার এক একটি এক এক আলোকময় তেজঃপুঞ্জ সূর্য্য ! সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি যেমন অহর্নিশ প্রবলবেগে ঘুরিতেছে, সূর্য্যও আবার সৌরজগৎ সমভিব্যাহারে উহার কোনটিকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতেছে। সূর্য্য যেমন পৃথিবী, পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক চন্দ্র এবং মঙ্গল, বুধ, শনৈশ্চর প্রভৃতি গ্রহগণকে আলোক ও তেজঃপ্রদানে আলোকিত ও উত্তপ্ত করিতেছে, ঐ এক একটি নক্ষত্রও আবার পৃথিবী ও চন্দ্রের ন্যায় কত শত গ্রহ ও উপগ্রহকে আলোক ও তেজঃ প্রদান করিতেছে।

কোন একটি বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তর-মধ্যস্থিত অত্যুচ্চ সৌধশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া ঊর্দ্ধে ও চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে বোধ হইবে, যেন এক অতি বিস্তীর্ণ নীলবর্ণ চন্দ্রাতপ মস্তকোপরি অত্যুচ্চ প্রদেশে বিরাজ রহিয়াছে। ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে মনে হইবে যে সেই চন্দ্রাতপ ক্রমে ক্রমে নিম্নাভিমুখ হইতে হইতে চারিদিকে পৃথিবী প্রান্ত সংস্পর্শকরিয়া রহিয়াছে। সেই চন্দ্রাতপের মধ্যদেশে ও চারিদিকে ঝাড় লাণ্টনের ন্যায় অসংখ্য আলোক জ্বলিতেছে। দর্শক যে স্থানে অবস্থিত তাহার ঠিক বিপরীত দিকে আমেরিকা প্রদেশে আর এক ব্যক্তি সেই প্রকার সেই স্থানের কোন বিস্তীর্ণ প্রান্তরস্থিত অত্যুচ্চ সৌধশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া যদি নৈশগগণ পর্য্যবেক্ষণ করেন, তবে পূর্ব্বোক্ত দর্শকের ন্যায় তাঁহারও বোধ হইবে যে, মস্তকোপরি সেই প্রকার আলোকমালা পরিশোভিত বিচিত্র নীল চন্দ্রাতপ গগণ-পরিসরে বিস্তৃত হইয়া আবার পৃথিবী-প্রান্ত সংস্পর্শ করিতেছে। দর্শক ও তাঁহার আমেরিকাবাসি বন্ধু উভয়েই পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া গগণ নিরীক্ষণ করিতেছেন। এখন মনেকর, যে বৃহৎ মৃৎরাশি দর্শকদ্বয়কে পরস্পর পৃথক করিয়া দিতেছে, যদি সেই মৃৎরাশি ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতেথাকে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দর্শক, তাঁহার আলোকমালা-বিরাজিত চন্দ্রাতপের সহিত ক্রমে ক্রমে তদীয় বন্ধুর সমীপবর্ত্তী হইতে থাকিবেন। অবশেষে সমস্ত মৃত্তিকা অপসারিত হইয়া গেলে, তাঁহার বন্ধুর পায়ের সহিত তাঁহার পা মিলিত হইয়া যাইবে। তাঁহার মস্তকোপরিস্থিত, পৃথিবী প্রান্তসংস্পৃষ্ট চন্দ্রাতপের চতুঃপার্শ্ব তাঁহার বন্ধুর চন্দ্রাতপের চারি পার্শ্বের সহিত মিলিত হইবে। তিনি তখন ঊর্দ্ধ ও অধোদেশ,—উভয় দেশই এক সঙ্গে দেখিতে পাইবেন। কেবল মাত্র প্রভেদ এই যে,

তাঁহার অধোদেশ তাঁহার বন্ধুর ঊর্দ্ধদেশ, এবং তাঁহার ঊর্দ্ধদেশ বন্ধুর অধোদেশ বলিয়া মনে হইবে। বন্ধুর অধঃ ঊর্দ্ধ ও তাঁহার নিকট তদ্বিপরীত বোধ হইবে।

পৃথিবীর যে খণ্ডেই যিনি নৈশ গগন পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তিনিই ঠিক্ এই দুই দর্শকের ন্যায় আকাশের অর্দ্ধাংশ মাত্র দেখিতে পাইবেন। মনুষ্যের নয়নজ্যোতিঃ সুদূর প্রসারি নয় বটে, কিন্তু পৃথিবীর আকার, এবং সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতির দূরত্ব বিজ্ঞান বলে নির্ণীত হওয়ায় আকাশ কতদূর বিস্তৃত কতক পরিমাণে বোধগম্য হইতে পারে। বিমানচারী তেজঃপুঞ্জ পদার্থ সমূহের মধ্যে সূর্য্য পৃথিবীর সমধিক নিকটবর্ত্তী। কেবল মাত্র নয়কোটি দশ লক্ষ মাইল দূরে স্থিত। এও কিছু কমদূর নহে। যদি অতিদ্রুতগামী বাষ্পীয় শকট দিবারাত্র অবিশ্রান্ত ২৫ পঁচিশ মাইল করিয়া যাইতে থাকে, তাহা হইলেও সূর্য্যমণ্ডলে পৌঁছিতে প্রায় দশহাজার বৎসর লাগিবে। দ্রুতগামী বাষ্পীয় যানে গমন করিলেই পৃথিবী হইতে পুরুষ পরম্পরা অতীত হইয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র ১৯,০০০,০০০,০০০,০০০ উনিশ শঙ্খ দূরে অবস্থিত। নয়কোটি দশ লক্ষ মাইল ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটিবৃত্ত অঙ্কিত করিলে, সে বৃত্ত যে কত বৃহৎ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। পৃথিবী নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ২৮৬,০০০,০০০ আটাইশ কোটি যাটি লক্ষ মাইল ব্যাপিয়া প্রবল বেগে ঘুরিতেছে। কিন্তু ইহাও সূর্য্য হইতে দূরবর্ত্তী গ্রহ নহে। এপর্য্যন্ত যতগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে নেপচুন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরে। এই গ্রহটি ২৮০ ,০০০,০০০ আটাইশ অর্ব্বুদ মাইল দূরে থাকিয়া ১৬৫ একশত পঁয়ষট্টি বৎসরে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে। ধূমকেতু গুলিন সময়ে সময়ে সূর্য্য ও পৃথিবীর অতি নিকটবর্ত্তী হয় বটে, কিন্তু কখন কখন আবার অনন্ত কালের জন্য অনন্ত আকাশের অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশে গিয়া পড়ে। পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি পরিবৃত সূর্য্যের নাম সৌর জগৎ। এই সৌর জগৎ কত বৃহৎ ও কত দূর বিস্তৃত হয়ত পাঠক তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে পারিলেন। এই সুদূরব্যাপী বৃহৎ পদার্থপুঞ্জময় সৌর জগৎ আবার পশ্চিমাকাশে হারকিউলিস নামক নক্ষত্র প্রদেশের অভিমুখে নিয়তই প্রধাবিত হইতেছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সূর্য্য সৌর জগতের কেন্দ্রস্থিত নক্ষত্র ; এবং আকাশে যত নক্ষত্র আছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ততগুলি জগৎ থাকা যার পর নাই সম্ভব পর। এখন আকাশে যত নক্ষত্র ব্রহ্মাণ্ডে তত জগৎ ; নক্ষত্র সকল পৃথিবী হইতে যত দূরে স্থিত, জগৎ আকাশের ততদূর ব্যাপী। সুতরাং আকাশের বিপুলত্ব নির্ণয় করিতে হইলে, আকাশে কত নক্ষত্র তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। আমরা পৃথিবীর একদেশে মাত্র অবস্থান করিয়া চক্ষে যেসকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহাই অসংখ্য ও গণনাতীত বলিয়া মনে হয়। দর্শনেন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত অসংখ্য নক্ষত্র দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অনন্ত আকাশে আরও যে কত নক্ষত্র আছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিলে সময়েসময়ে আকাশে অনেক নূতন নক্ষত্র নয়ন গোচর হয়, সে সকল নক্ষত্র যে নূতন সৃষ্ট হইল, এমন নয়, অনন্ত আকাশের অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশে থাকায় উহার আলোক পৃথিবীতে আসিতে এত দীর্ঘকাল লাগিয়াছে। এবিষয় বিশদরূপে বুঝাইতে হইলে, এস্থলে বলা আবশ্যক যে, জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের পরমাণু সমষ্টি সততই আন্দোলিত হওয়ায় তাপ ও আলোকের উৎপত্তি হয়। একখণ্ড কাষ্ঠের সহিত অন্য একখণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে যে অগ্নি প্রজ্বলিতহয়, তাহা সকলেই জানেন। পদার্থের পরমাণু সমষ্টির আন্দোলন সঞ্জাত আলোক ও তেজঃ কোন পদার্থ নহে। পদার্থের ক্রিয়া বিশেষ। নিষ্কম্প ও প্রশান্ত সরোবর সলিলে উপলখণ্ড নিক্ষেপ করিলে জলীয় পরমাণু সমষ্টি আন্দোলিত হইয়া সরসীবক্ষে তরঙ্গমালা সমুৎপন্ন করে। এই তরঙ্গমালা আবার চতুঃপার্শ্বস্থ সলিলেব স্থির ভাব বিনাশ করিয়া অসংখ্য তরঙ্গ উদ্ভূত করিতে থাকে; এবং এইরূপ অভিনব তরঙ্গমালা প্রতি স্থানেই উৎপন্নহইয়া তটাভিঘাত না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত সরোবর তরঙ্গভঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে। উপলখণ্ডাভিঘাতজনিত তরঙ্গ আবার ক্ষণেক পরেই বিলয় পায়। কিন্তু বিলয় পাইতে না পাইতেই যদি সেই স্থানের সলিল আবার আন্দোলিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোদ্ভূত তরঙ্গ জলের সহিত মিশাইয়া যাইতে না যাইতেই আবার নূতন তরঙ্গ সমুৎপন্ন হইবে, সুতরাং সরোবর সলিল পূর্ব্ববৎ প্রশান্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে না। আন্দোলিত হইলে জলে যেমন তরঙ্গ সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ আলোকময় পদার্থের পরমাণু সমষ্টি নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হওয়ায় তাহা হইতে সততই আলোকহিল্লোল সমুৎপন্ন হইতেছে। যেস্থানে আলোকহিল্লোল উৎপন্ন হয়, তথায় অন্য পদার্থ না থাকিলে সেই হিল্লোল ক্রমে ক্রমে সেই উৎপত্তির স্থলেই বিলীন হইয়া যাইত। কিন্তু অনন্ত আকাশ, স্থিতিস্থাপক গুণোপেত ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত সূক্ষ্মতম বায়ুবৎ ইথার নামক পদার্থে সমাচ্ছাদিত। আলোকময় পদার্থের পরমাণুর আন্দোলনসঞ্জাত আলোক হিল্লোল, সেই অনন্ত বিশ্বব্যাপী ইথারে আঘাত করায় অসংখ্য আলোকহিল্লোল সঞ্জাত হইয়া প্রবলবেগে চারিদিকে প্রধাবিত হইতে থাকে। জলের হিল্লোলের ন্যায় আলোক হিল্লোলও কোনরূপ বাধা পাইলে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অন্য দিকে গতি বিস্তারকরে। আলোক হিল্লোল যখনই আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে আঘাতকবে তখনই আমরা উহা দেখিতে পাই। এবং সেই মুহূর্ত্তেই আলোকের উৎপত্তিস্থান আলোকময় বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের উপলব্ধি হয়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে, আলোক প্রতি সেকেণ্ডে১৮০,০০০ একলক্ষ আশী হাজার মাইল পথ গমন করে। অর্থাৎ উহা এত দ্রুতগামী, যে প্রতি সেকেণ্ডে পৃথিবীকে প্রায় ৮ আটবার করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে প্রায় ৪ চারি বৎসর অতীত হয়, সুদূরবর্ত্তী নক্ষত্র হইতে আলোক আসিতে কোটি কোটি বৎসর অতীত হইয়া

যায়, অনন্ত আকাশের অসীম প্রান্ত হইতে আলোক আসিতে অনন্তকাল অতিবাহিত হইবে। সুদূরে অবস্থান নিবন্ধন পণ্ডিতেরা এখনও নূতন নূতন নক্ষত্র দেখিয়া থাকেন, এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত এইরূপ দেখিতে থাকিবেন।

পাঠক,এখন একবার ভাবিয়া দেখ, অনন্ত আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র বিরাজিত। অসংখ্য নক্ষত্রকে পরিবেষ্টন করিয়া অসংখ্য জগৎ ঘুরিতেছে। অল্পায়ুঃ মনুষ্য এই অনন্ত জগতের জগদেক পার্শ্বের অত্যল্প প্রদেশে মাত্র অবস্থিত। সমগ্র পৃথিবীর সহিত তুলনা করিলে মনুষ্য-আকৃতি পদার্থের অণু হইতেও সূক্ষ্মতর; সৌর জগতের সহিত তুলনায় পৃথিবী অণুমাত্রও উপলব্ধি হয় কিনা সন্দেহ। এবং নাক্ষত্রিক জগতের সহিত উপমা করিলে সৌর জগৎ যে কতদূর সূক্ষ্মতম তাহা ধারণা শক্তির অতীত। অকূল সাগরের কূল আছে, অনন্ত আকাশের কূল কিনারা কিছুই নাই। সাগর সলিলে ভাসমান জলবুদ্বুদের ন্যায় অসংখ্য জগৎ অনন্ত আকাশে ভাসমান রহিয়াছে। জলবুদ্বুদের সংখ্যা করা মনুষ্যের ক্ষমতার অতীত; অসংখ্য জগতেব সংখ্যা করাও বিজ্ঞান শাস্ত্রের সীমার অতীত। এই অসংখ্য জগতেব আধার বিপুল ব্রহ্মাণ্ড—অনন্ত আকাশ—যে কি কাণ্ড তাহা কে বলিবে।

শ্রীসূ—

সারদা।*

কে তুমি, মাতঃ, পঙ্কেরুহবনে
বিরাজ সুমলিন সাজে, গো,
ভারত-কিরীটে প্রবর চারুমণি
মানস-সরসী মাজে, গো?

আজিকে তব ও মুরতি সুন্দর
হেরি তিমির-চির-নিলীনা, গো!
ত্রিদিব সুন্দরী কোন পাপে এ'
পঙ্কিল ধামে সুদীনা, গো?

ভারত অম্বর এককালে ছিল
সুবিমল বিপুল ব্যাপিত, গো,
খর সৌর করে; পূর্ণিম চন্দ্রমা-
কৌমুদীমাধুরী হাসিত, গো!

কোথায় সে দিন, অহহ, অধুনা
ছাদিল এ'হেন চির-ভীষণে
সান্দ্র অমানিশা ঘোরতমে পূরি'
নিবিড়জলদদল আবরণে!

নবীনা মাধবী মরুবার-অন্তরে
বালু-অবলুণ্ঠিতা, ম্লানা,

* বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতির ব্রজবোলীর ন্যায় 'জাতি' বা 'মাত্রাবৃত্তির' ছায়ানুকারী ছন্দোবৎ পঠিত হইবে।

আহতা তাপিতা হুতাশন-পবনে,
ব্রততী-পল্লব-দল-পরিহীনা ;

(কণ্টককঠোরোপরি পতনে)
শিরীষ কুসুম কোমল পেলব,
চ্যুতবৃন্ত, নীরস তনু-বরণ !
রাজীবরাজী ভাসে চরণতলে
অপগত পরাগ-কিরণ ;

চাঁচর চিকুরভার আলুলায়িত ;
আননলক্ষ্মী সুবিষাদিতা ;
ভালতটে অবতংসে ঝকে
মণিদাম, বিভা বিনিরাসিতা !

শারদ চন্দ্রমা রাহুর কবলে !
এ' দুখ ভারতে ঘুচিবে কবে ?
পুন' তব অর্চ্চন হইবে পূরব-সম ;
জাগিবে ভকত তনয় সবে ;
হিয়াকমলে পুন' ভকতি পরিমল
উঠি' ব্যাপিবে দেশ পূরব ভাবে ?

পীযূষলোচনে অশ্রু ধারা ঝরে,
কুহেলী-আবৃতা প্রভাত-তারা ;
কপোলে কালিমা, অধরে বিষাদহাস,
তড়িত-অপগমে আঁধার-পারা !

ভারতের আজি অনেক স্থলে দেখি
তব পদ-অঙ্ক বহুদিন হইতে
বিলুপত হ'য়েছে ভারতকমলায়
চিরতরে অন্তরধান-সহিতে !

আর্য্যপুত্রমন্দিরে অনেক দিনাবধি

শ্রুতিবিবরপথে নাহিবহে
পদকোকনদে মঞ্জিম মঞ্জীরে
বিনোদ নিনদ মধুর প্রবাহে !

তব কর-শোভনা বীণা চারুতরা
লুঠি'ছে অঙ্কে সুদীন বেশে,
ছিন্ন তন্ত্রদাম, খেলেনা সে'রূপে
হৃদয়ে শয়নে ললিত বিলাসে,

বাজে না মধুরে স্বরগ-সুধাস্বরে
অভূতপূরব সুনবীন তানে,
চিতকোষ পূরি' বলে না মধুকথা,
না হরে মরম মধুরিম গানে !
যেন পাগলিনী দু'খিনী কি দু'খে,
মগ্না জননী কি শোক ধ্যানে ?

স্বাধীনতা দেবী ভারতলক্ষ্মী-সনে
রাজিবে উলা'সে আবার কবে
উভ'পারশে তব পূরব-দ্যুতি ধরি' ?
সে'রূপ হেরি' জনম সফলিবে !

কল্পনা-মরালী পক্ষ-পটহ
বাদনে তোমার জয়ঘোষিবে।
ভকতিনিধি তুমি ;—ভকতবিনা কে
অন্ধ ভারত ভূমি উজালিবে !

আজিকে পামর ভারত-সুত, রে,
কেমনে ভুলিলি এ'হেন ধনে,
অকৃতজ্ঞ হইলি, কেমনে শোধিবি
কি দিয়া জননীর পূরব-ঋণে ?

মন'-কুসুমবন আজিকে বিজন ;

আঁধিয়ারা প্রকৃতি কাঁদয়ে, গো ;
বিষন্ন ভুবন ; দিগঙ্গনাগণ
হাহাকারে দিগন্ত পূরয়ে, গো ;
অধিষ্ঠাত্রী আর বনদেবী সুন্দরী
গলাগলি করি' বিলাপয়ে, গো !

চরমফুলাঞ্জলি কোন্ দিনে তব
অরপি' চরণে, ভাসয়ে, গো,
অধীন ভারত অকূল পাথারে,—
সংযত নিগড়ে যাপয়ে, গো !

বহে না পবন পূরব দিনমত
নিরমল স্বাধীন ভাবে এ ;
পঙ্কিল, দূষিত, পূতিগন্ধময়
ভারতে তটিনী বাহে এ ;
দবাগ্নি-বাড়ব-গৈরিকবহ্নি-সম
দহয়ে ভৈরব দাপে এ।

যে' দিনে কুক্ষণে তব প্রতিমামঠ
ভাঙ্গিয়াছে, মাতঃ, আর্য্যসুতে, গো,
সে' ক্ষণ-অবধি ভারত-ভবনে
ভীষণ দুর্দ্দিন বিরাজে, গো !
সে' ক্ষণ-অবধি জাতীয় বন্ধন
সাধে পরিয়াছে গলে চরণে,

জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম-উদ্ধারে
সে' ক্ষণ-অবধি বিমুখরণে,
দাসত্ব জম্বুক-বৃত্তি লভে'ছে
সিংহসুত, অহ, ইষ্টজ্ঞানে !

সে'ক্ষণ-অবধি মিথ্যা-প্রবঞ্চনা
প্রধান গৌরব-ব্যবসা' বলি'
ল'য়েছে, নয়নে অঞ্জন মুছিয়া
চিত্রিয়াছে গন্ধে ললাটে কালী।

জাতি-পতাকা ছিন্ন ভগ্নধ্বজ
ভগ্নপ্রাকার মূলে লুঠি'ছে, গো !
তব এ'দশাতে সাতশত বরষ
অনিবার নিরয় ভোগি'ছে, গো,
ভারত ; সে'বধি কত দুর্ঘটনা
বিষম ভাগধেয়ে ঘটি'ছে গো !

মানস ভুবন আজি তমোবৃত ;
নিবে'ছে বহুদিন গৃহের প্রদীপ !
মা, তব পূজনে কত প্রতিবন্ধক ;
ভারতভাগ্যে সকলি প্রতীপ !

বাল্মীকি ব্যাস দ্বিতীয় তপন সম
আর উদয়ে নাহি ময়ূখ ব্যাপি' !
আজি তোমার নিকুঞ্জ সদনে
কলকণ্ঠ কোকিল ডাকে না আর ;
পঙ্কজ কাননে মত্তষট্পদ
মঞ্জুল গুঞ্জর করে না বিথার !

সৌমেরব নভে স্থির তড়িত ঝলা
কালিদাস, মাঘ, হর্ষ কবি
বিদ্যাপতি বিহ্লন, চন্দ্‌ বর্দ্দাই,
বিকাশে প্রোজ্জ্বলে,—ভারবি,

ভট্টি, ভবভূতি, ধাবক, ভরত,
শূদ্রক, বিশাখ, ক্ষেমীশ্বর
না উঠিল আর বাঁধি বীণাতার,
ঝঙ্কারে পূরি' নবীন স্বর,

অশ্রু তব মুছি, "শোভি" পদযুগ
নবীন ফুলে চর্চ্চি নব চন্দনে!
ডুবেছে ভারতরবি চির-অস্ত সাগরে;
প্রভাতিল না নিশা নব অরুণ-সনে।

কপিল, কণাদ, পতঞ্জলি, মনু,
গোভিল, গোতম নির্নাম এবে;
চিরতিমিরাবৃত মনোমিলয়ের
কবাট রুদ্ধ খুলিবে কবে!

ম্লেচ্ছপীড়নে অধর্ম্ম-অত্যাচারে
শাসিছে ভারত চণ্ডপ্রতাপে;
অভিনব কোন শুক, নারদ, শঙ্কর
ভারত-দু'খে দু'খী পরাণ সমাপে!

ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর, আর্য্যভট্ট বুধ,
জললেখা-সম লুপ্ত বরাহ, মিহির;
যশোদেবী-সনে সবি শুকায়েছে;
ভস্ম হয়ে উড়ে সে'মানমন্দির!

স্বাধীনতা দেবী-বিমুখতা-সহ
সকলি তিরোহিত; আছে খালি,
অম্ব ভারতি, তব দীরঘ শ্বাস,
লোচনে বিপুল লোর প্রণালী!

এককালে ছিল এ আর্য্যসদনে
সুখনিদান কীরতি-বসতি;
আজিকে অনার্য্যতা, পরপদলেহন,
স্বীয়লোহশোষণ, কলুষ বিস্তৃতি!

অহহ, ভারত! পড়ে কি, গো, মনে
সেদিন, সেযুগ-আদিম দিনে?

পরম বন্দ্যপাদ আর্য্যপিতামহ-
নিবহ অমর সম যে শুভক্ষণে

প্রবেশিলা তব এ পুণ্যের ভূমে
সমহিম গৌরব অবতরণে,
বর্ষ আর্য্যখণ্ড উত্তর-কুরু,
সে স্বরগ হ'তে পূতপদ-অর্পণে

পঞ্চনদ দেশে; অখিল বসুধায়
ব্যাপিলা বিক্রম, ভীমরণে
দস্যু, দানব, কিরাত, শবর
তাড়ি' অনার্য্য ম্লেচ্ছগণে।

মূর্ত্তি মহাবল, পরাক্রমপূর্ণ,
হল-মুষল-যন্ত্র এক করে,
কৃপাণ রণশস্ত্র, আর্য্যপতাকা
শোভয়ে ভৈরবে দর্পে অপরে;

সঙ্গে গোধন, অশ্ব, পশুদল;
বেষ্টিত পুত্র-কলত্র-স্বজনে;
মুখে সাঙ্গবেদ; পবিত্র হুতাশন
গরজে পুরতঃ পূত-আধানে।

অহহ, পুনঃ কবে তাঁসবার সম
ভারতে উঠিবে আর্য্যজাতি
গাঢ় সুপতি ত্যজি, তাড়িবে পিশাচে
পরম ভকতিভরে পূজি ভারতী!

সে শুভ সমুত্থান-পদবীতে আবার
বিজয়তোরণ নিশান-ফুলমালে,
স্বাধীন সাহসে জয়গীতি গাহি,
আরোপি' পূর্ণঘটকদলীদলে

আত্মসার সহ, মঙ্গলাচরিবে
শঙ্খ-ভেরী-রবে মেলি' সকল ?

কি অশুভক্ষণে বিকট বিধুন্তুদ
কবলীকৈল শশলাঞ্ছনে!
আর কি কভুরে, গ্রহণ মোচনে
বাণীমুখ দীপিবে অকলঙ্কহসনে!

মরি, কি পড়ে মনে অতুল প্রতাপে
তাড়িয়া রাক্ষস-অসুরগণে,

শাসিলা ভারত সুরয বংশী
চণ্ডধন্বা যত রাঘব বীর!
এ'দিকে কুমারী, মেরু ওপারে,
যবদ্বীপাবধি কাশ্যপী তীর

পৌরব যাদব একদিন, হায়,
একছত্রা কৈলা ভারত ভূমি!
স্বাতন্ত্র্যদ্যুতি সে আবার রাজিতে
আর কি দেখিবে, সারদে, তুমি ?

আর্য্য অবতংস নন্দ, চন্দ্রমা,
অশোক, সুমিত্র, পুলোম-অর্চ্চি
ধরা অধিকারিলা দমি যবনবৃন্দে,
অরাতিনিকরে কৈলা নিরর্চ্চি,

তুলি জয়স্তূপ গৌরবকেতন,
দিকবিদিকে ব্যাপি ময়ূখ।
কি ঘোর-দুর্দ্দিন-কবলে, ভারত!
আজি বিলয়গত সে সব সুখ!

বিক্রম-আদিত্য আর্য্যকুল-আদিত্য
কোথায় শকারি প্রবীরবর,
কীর্ত্তির মন্দিরে তুঙ্গতম
লিখিলা নাম অনশ্বর,
যশঃকুসুমদামে দিগবধূরগল
ধবলিত করিয়া স্থাপিলা শান্তি,
সরস্বতীপদ প্রতিষ্ঠি পূজিলা
বাণীসুতগণে (অক্ষয় কান্তি),

উজ্জ্বলে দীপিলা ভারত মুখ
বিতাড়ি বিক্রমে শক-যবনে,—
অধুনা দেখ আসি তব সে সাধের দেশ
চিরতরে ব্যাপ্ত শকসূনুগণে!
তব পদ-অঙ্ক আজি বিলুপত
ভারতে অলক্ষ্মী-প্রবেশ সনে!

আর কি উদিবে শারদ যামিন
পূর্ণস্থিরদ্যোত শশলাঞ্ছন
ভারত-গৌরব-সুবিপুলগগনে
প্রবীর-ঋষভ শালিবাহন!

হিন্দুসূর্য্যপতি বাপ্পা মহাবীর
মুসলমানে বাঁধি দাসত্ববন্ধনে
বিপুল সাম্রাজ্য সুদূরে বিস্তারিলা।
মরিরে, সেদিন পড়ে কি মনে!
হিন্দুকুলে, অহ, শেষরবি ভোজ
প্রতীচী নভে উঠি নিবিল ক্ষণে!

অন্তর্বিবাদে কি বিষময় ফল
উপজে,—ভারত দেখিলা সে দিন,
বীর পৃথুরায় সমরসিংহ শূর
অরাতি-শত নাশি পড়িলা যে দিন
ভৈরব আহবে পাঠান দস্যু-সহ;

তদবধি ভারত অন্তরে ক্ষীণ!

চন্দ্ চারণ অনন্ত বিলাপিলা
ভাসি অশেষ আঁখি আসারে!
তা সনে সে' বধি অসীম সময়ন্তরে
দুর্ভগে ভারত নয়ন ঝরে!

মূর্চ্ছিত ভারত-হৃদি একদিন
রণসঙ্গা যোধ আর শিবজীর সহ
উঠে ছিল এক বহ্নিস্ফুলিঙ্গ,
ভারত ভাগ্যে কালে লোপিল স্নেহ!

প্রভাত তারক উঠিতে উঠিতে
চির-অন্ধ-কুহেলী হল মগন!
আচার্য্য মাধব মহারাষ্ট্রে আর
জাগাবে দেশ হিতৈষণ
বীণারস্বননে অচল কন্দরে
অটবী কান্তারে পুরি' নদীপুলিন!
পুণ্যভূমি হল রৌরব ধাম
নাজানি ভালে আছে পরে কি লেখন!

আজিকে ভারত শ্মশানভূমি,
বিসারি রাজিছে দগ্ধ শরীর!
এর মাঝে এক চিলিয়েনওয়াল্লায়
জ্বলেছিল চিতাবহ্নি অধীর!
আজি প্রতিকূলে তেজঃ নির্ব্বাপিত,
স্পন্দহীন তনু অসাড় থির!

কুমারসিংহ শূর বীরপরাক্রমী
ক্ষত্রকুল মাঝে এক রতন,
কিঞ্চিত ইন্ধন সমীরণযোগে
সে'ভস্ম হইতে কি দহন

জ্বালিছিলা সেদিন—সাক্ষ্য দিছে কাল,
অনন্ত তনু, খুলি তীক্ষ্ণ নয়ন।

গৌড়, প্রতিষ্ঠান, অবন্তী, চিতোর,
পাটলীপুত্র, কাঞ্চী, ধারা,
অযোধ্যা, কৌশাম্বী, কপিলবাস্তু,
হস্তিনা, মথুরা, দ্বারা,
মাহীষ্মতী করে চৌদিকে ধূধূ
বিকটদর্শন মরুর পারা!

শিপ্রা, জাহ্নবী, শোণ, নর্ম্মদা,
যমুনা ,সরযু, লোহিতাকারা
অবিরত বাহিছে ভারত সাগরে,
বীচীরবে কাঁদি' লোচনধারা!

যে' কুরুক্ষেত্রে ভারত বসুধায়
বীরশূন্যা হ'তে হেরেছ, মাতঃ!
সে' স্থানেশ্বরে ভারতলক্ষ্মী
হইলা জনমতরে অন্তর্হিত;
আবার দেখিলে শেষ অনলকণা
পাণিপথ-প্রান্তরে বিলীন হ'তে,
মহারাষ্ট্র-কেতন আশার নিদান
শতধা বিচূর্ণি' ভাঙ্গি' পড়িতে!

তদবধি বিগ্রহ তোমার ভগ্ন,
ধরণীশায়ী, পঞ্জরসার!—
বিজয়াদশমী সায়ম তমসে
গরাসিল কোন্ অতল পাথার!

সে' পূর্ণমধুরিমা কলধৌত প্রতিমা
মন-সাধে নিরখিতে পাব আবার
পুরঃশিখরে অমার বিগমে

নিরমল হসনে চারু উষার ?

মাতঃ সারদে, তব এ দশা-সনে
যে ক্ষণ হইতে দুর্দ্দিন ঘোর
রাজিছে ভীষণে আর্য্য পুণ্যধামে,
সে ক্ষণ অবধি পিশাচ চোর
সমাজ-বিশৃঙ্খলা, সেচ্ছাচার, পীড়ন
পশেছে অন্তরে ভাঙ্গিয়া দোর !

পরবলতাড়নে, অন্ধকুসংস্কারে
আর্য্যকুলনারী দুঃখ-নিলীনা,
স্বাধীন ভাবে সম্ভ্রমসহিতে
সাধিতে বাসনা শকতিহীনা !
অহহ,কি দু'খ ! কহিতে মরম ফাটে !—
আর্য্য কুলদেবী আজিকে দীনা !

হৃদয় পূরি' শ্বাস ফেলিতে নারয়ে
আর্য্যকুল মাতা আজি মলিনা !
নদীর উপকূলে জলটুকু ছুঁইতে—
তাতেও বদ্ধপদ, বিষাদক্ষীণা,
সূর্য্যচন্দ্র-মুখ দরশিতে বারণ,
পবন পরশিতে কভু পারে না,
মনঃপ্রাণ লোচনে পাণিপদ শ্রবণে
মরম হৃদয়ে মুখে সবে বিহীনা !

নিগড় বন্ধনে, দহন দাহনে,
গরল জারণে, আঁখির লোরে,
শোণিত শোষণে, পাশব পীড়নে,
কারাবরোধে ছটফটি' ঘোরে !

অকূল পাথারে কে, গো, উধারে,
শবরের বাগুরা-বদ্ধ হরিণী !
মরুবারে লতা, গহনে পরিমল,
মরি, কণ্টকমুখে বিদ্ধ নলিনী !

চরণে মঞ্জীর, বীণ্ পাণিপল্লবে,
মুখে তব, বাণি, বন্দন গীতি
ভারত নারীর অধুনা নীরব ;
চৌদিকে বসতি করয়ে ভীতি !

ভারত সরসে হৈমপঙ্কজিনী
দময়ন্তী, সতী, সাবিত্রী, সীতা,
জীবন অরপয়ে প্রাণপতি তরে
কই আর বিকশি' গুণ ভূষিতা !
অতল নিরয়মাঝে অন্ধতমে বৃত
রতন রাজী কি পাপে নিহিতা !

ভারত-অম্বরে স্থির সৌদামিনী
লীলাবতী, খনা, বেদবতী,—
মাতঃ বীণাপাণি, তব চির সেবিকা
দেবী আত্রেয়ী কোথা মনীষামতী !

কোন্ দুর্গাবতী প্রবীর-বিক্রান্তা
স্বদেশ-স্বজাতি-প্রেম-তরে
অরাতি-সহিত উৎসৃজয়ে প্রাণ
সম্মুখ তুমুল ঘোর সমরে,
কালী করালী রণদেবী সমা
কোটি যবনে পাড়ি' খড়্গাবরে !

কই সে পদ্মিনী ভারত রমণী
পতিরে উধারয়ে শত্রু করে,
প্রেমঋণ শোধিতে সখীগণ-সহিতে
জীবন পণ করে চিতাপরে ?

ভারতললনা-শেষনামযোগ্যা
(বেশী দিন নহে) লছিমা বাই
আর্য্যবামাভুজে, বক্ষঃস্থলে, প্রাণে
কি ক্ষমতা ধরে বীর-অলঙ্কারে

ভারতক্ষেত্রে ভৈরব সমরে,
অহহ, গৌরবে দেখাইলা ভুবনে
বলিতে ভয় করে, কি বলিব তাই।
আমরা বাঙ্গালী জাতি, অধীনতা দাসত্ব
মোদেরি ভূষা, দিতে তুলনা নাই!
করপদরসনা-নয়নতনুপ্রাণ-
বিহীন; সুখে, হায়, সময় কাটাই!

ভারত-কামিনী কই, গো, ধরমরতা
অলঙ্কারচয় যতনে খুলে
রণপ্রহরণ-নিরমাণ-কারণ,
কোদণ্ড-শিঞ্জিনী রচয়ে চুলে?

রণসাজে সাজায়ে, প্রাণপতিরে,
স্বয়ং চলে সাথে বীরসঙ্গিনী,
যুঝে অকুতোভয়ে বীরেশবেশে!
ভারতধাত্রী শূরপ্রসবিনী,
রিপুর নিগড় তৃণ মনে গণি,
সমরপে জীবন অনলশায়িনী!

মাতঃ সারদে, কত দিনে পুনঃ
এ দু'খ-কালানল নিবিবে, গো!
বিমলহসনে সুমাধুরী ধরি,
বদনসুষমা তব দীপিবে, গো!
আর্য্য-ইন্দিরা-সুতনু-কালিমা
ভারততিমির-সহ লোপিবে, গো!

একক্কালে পুরা (অনেক দিনগত)
ভারত-গৌরব ভুবন ব্যাপি'
আছিল তপন-সম বিকীরি' ময়ূখ;
সুরভিময় ছিল যশের ঝাঁপি!

উড়েছিল দর্পে বৌদ্ধ-কেতন
শান্তি-একতায় বাঁধিয়া দেশ।
অগণ্যস্তূপ রাজী দাঁড়ায়ে গভীরে
মহিমা বিকাশিল বিশালবেশ।

কোন নবধর্ম্ম নূতন জাতি গঠি'
ভারত হইতে ধায় না আর,
বক, পারস্য, মিশ্র, গিরীক্, রোম,
জীপাঙ্গ, তিব্বত, চীন, তাতার,
পূর্ব্ব উপদ্বীপে, যব, সুমাত্রে
উজ্জ্বল জ্যোতি' করে না বিথার!
সে দিন দীপিল নানক, চৈতন্য
শেষ প্রভাধামে অস্ত গিয়া।
যবনম্লেচ্ছ-করে, অহহ, সকলি
চিরদিন তরে গেছে লোপিয়া!
হায়, যত বৈভব, ঘুচিয়াছে সব,—
অতল দহে গেছে কি ডুবিয়া!

মানসে উদিলে দুরস্বপনসম
সে সব কাহিনী পুরাণগাথা
অন্তরলীন-বহ্নি-শমী-সম
দহয়ে হিয়াকোষ অসীমব্যথা।
কতযুগ গেল, দেশধর্ম্মজাতি
রাজ্য উলটিল, ভারতি, তোমার
বিশীর্ণ তনুছ্যুতি রহিল তেমন,
প্রাণশূন্য বিগ্রহে প্রতিষ্ঠিয়া প্রাণ
প্রকৃত পূজা, মাগো, হইল না আর!

হিন্দুভূগোল-ঐতিহাসিক।

(তৃতীয় প্রস্তাব।)

ঐতিহাসিক হিন্দুভূগোল আমরা রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বনপূর্ব্বক লিখিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রস্তাবে শুদ্ধ রামায়ণ হইতে ভৌগোলিকতত্ত্ব সংগ্রহ করা গেল।

রামায়ণে ভারতবর্ষের বহির্ভাগস্থ এই কয়েকটি দেশের উল্লেখ দেখা যায়। উত্তরকুরুবর্ষ, বাহ্লিক, বনায়ু, পহ্লব ও দরদ। এতদ্ব্যতীত সমস্ত স্থানগুলি ভারতবর্ষের মধ্যেই অবস্থিত। ক্রমে তাহাদিগের উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ নিম্নলিখিত দেশ ও নগর বা গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কেরল, কুরুজাঙ্গাল, মিথিলা (বিদেহ), জম্বুপ্রস্থ, তোরণ, কেকয়, সৌরাষ্ট্র, সৌবীর, বিদর্ভ, মহোদয়, বাহিক, রাজগৃহ, সিন্ধু, প্রলম্ব, নিষাদ, পঞ্চাল, প্রয়াগ, শৃঙ্গবেরপুর, মৎস্য, বীরমৎস্য, কাম্বোজ, কৌশাম্বি, কিষ্কিন্ধ্যা, অভিকাল, সঙ্কাস্যা, ব্রহ্মদত্ত, বিশালা, কুলিঙ্গ, কাশী, কোশল, কুশলাভ, গিরিব্রজ, একশাল, হস্তিনাপুর, উজ্জিহানা, নন্দিগ্রাম, বরূথ, কাম্পিল্য, দশার্ণ, অবন্তী, পুষ্কর, অন্ধ্র, জনস্থান, লঙ্কা, সুরসেন, মদ্রদেশ, অপরতাল, বৎসদেশ, ধর্ম্মারণ্য, মলদ, করূষ, মগধ, গয়া, পুণ্ড্র, ব্রহ্মমাল, মহীষিক, গোকর্ণ, চোল, দ্রাবিড়, তেজোভিভবন, ঐলধান, শল্যকর্ষণ, অংশুধান, সর্ব্বতীর্থ, লৌহিত্য, বিনত, হস্তিপৃষ্ঠক।

২য়তঃ। নিম্নলিখিত নদীগুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গণ্ডকী, কৌষিকী, মন্দাকিনী, হ্লাদিনী, পাবনী, নলিনী, সীতা, সিন্ধু, ভাগীরথী, গোমতী, ইক্ষুমতী, সরযূ, শাল্মলী, শবদণ্ডা, সরস্বতী, শতদ্রু, বিপাশা, শিলা, শিলাবহা, তমসা, আগ্নেয়ী, আকুর্ব্বতী বা অক্রুরবতী, অলর্ক, অত্রি, বাহিকা, ভোগবতী, কপিবতী, কুত্তিক, স্থাণুমতী, উত্তানিকা, মাগধী বা শোণা, বেদশ্রুতি, স্যন্দিকা, মালিনী, কুলিঙ্গা, উত্তরগা, গোদাবরী, ইরাবতী, বৈতরণী, কোটীকুষ্টিকা, কালিন্দী।

৩য়তঃ। নিম্নলিখিত কতিপয় পর্ব্বতের উল্লেখ আছে।—হিমালয়, হিমবান, কৈলাস, চিত্রকূট, মৈরু, বিন্ধ্য, গন্ধমাদন, মহেন্দ্র, মন্দর, মৈনাক ও ঋষ্যমুখ।

৪র্থতঃ। কতিপয় অরণ্যেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।—দণ্ডকারণ্য, চৈত্ররথকানন, পঞ্চবটী ও ভারুণ্ড।

রামায়ণের চারি স্থানে গমনাগমনের যে চারিটি পথ বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা ভারতব

র্ষের ভূগোল সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের রামায়ণের অনুবাদ হইতে ঐ চারিটি পথের বর্ণনা ক্রমে সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকটন করিতেছি।

নিম্নলিখিত পথে শ্রীরাম লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত জনকরাজভবনে গমন করিয়াছিলেন।

অযোধ্যা হইতে বহির্গত হইয়া প্রথম রাত্র সরযূর দক্ষিণ তীরে বিশ্রাম করিলেন। তথা হইতে গমন করিতে করিতে একটি আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেই আশ্রমটি পূর্ব্বে কামদেবের ছিল, এবং সেই স্থানে কাম অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত এই প্রদেশের নাম অঙ্গদেশ।" এই অঙ্গ দেশ গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গম স্থানে অবস্থিত। তথা হইতে নৌকারোহণ পূর্ব্বক তিন জনে গঙ্গা পার হইলেন। গঙ্গা পার হইয়া তাঁহারা তাড়কার জঙ্গল নামে "অতি দুর্গম, ঝিল্লিকাগণ সংযুক্ত, ভৈরব শ্বাপদাকীর্ণ এবং ভীষণ বিহঙ্গরবে শব্দায়মান, সিংহ, ব্যাঘ্র বরাহ বারণ প্রভৃতি পরিপূর্ণ" একটি অরণ্য অতিক্রম করিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে বিশ্বামিত্র "সিদ্ধাশ্রমকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য তাপসের সহিত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।" "মহর্ষিগণ বহুদূর অতিক্রম করিয়া শোণ নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন।" "এই সুরম্য নদীর আর একটি নাম মাগধী। এই নদী মগধ দেশ হইতে নিঃসৃত ও পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া এই পাঁচটি শৈলের মধ্যে মালার ন্যায় কেমন শোভা পাইতেছে।" এই শোণ নদীর তীরে গিরিব্রজ। তথা হইতে গমন করিতে করিতে গঙ্গার উত্তর তীরে বিশালা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। এবং তথা হইতে মিথিলারাজ্যে প্রবেশ করিলেন।

পিতৃসত্য পালনার্থ রাম লক্ষ্মণ ও সীতাসহ রথারোহণে তমসাতটে উপস্থিত হইলেন। তমসানদী অযোধ্যার দক্ষিণে অবস্থিত। তমসা পার হইয়া "কোশলদেশের অন্ত্যসীমায় উপনীত হইলেন। এবং পবিত্রসলিলা স্রোতস্বতী বেদশ্রুতি পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। অদূরে সাগরগামিনী গোমতী প্রবাহিত হইতেছে। উহার কচ্ছদেশে গোসকল সঞ্চরণ করিতেছিল, রাম উহা পার হইয়া হংস-ময়ূর-মুখরিত স্যন্দিকা নদী অতিক্রম করিলেন।" তথা হইতে গমন করিতে করিতে "কোশলদেশ অতিক্রম করিলেন, এবং মন্দবেগে সুরম্যোদ্যান-শোভিত সুসমৃদ্ধ শৃঙ্গবের পুরে উপনীত হইলেন।" সেই স্থলে গঙ্গাপার হইয়া 'সুসমৃদ্ধ শস্যবহুল বৎসদেশে' উপস্থিত হইলেন। তৎপর গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে উপনীত হইলেন। প্রয়াগে একরাত্র ভরদ্বাজের আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া, যমুনার পর পারে দশক্রোশ দূরে চিত্রকূট পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। বহুদিন তথায় বাস করিয়া রাম দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন; এবং তথা হইতে অগস্ত্যের নির্দ্দেশমতে পঞ্চবটী কাননে যাইয়া বাস করেন।

রামের বনগমন ও দশরথের মৃত্যুর পর দূতেরা ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন করিবার নিমিত্ত অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত

হইয়া 'মালিনী নদী অতিক্রম পূর্ব্বক অপরতাল নামক দেশের পশ্চিম ভাগদিয়া প্রলম্বদেশের উত্তরে যাইতে লাগিল। অনন্তর পঞ্চালদেশে উপনীত ও হস্তিনা পুরে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পশ্চিমাভিমুখে কুরুজাঙ্গলের মধ্যদিয়া চলিল।' 'যাইতে যাইতে স্রোতস্বতী শরদণ্ডার সন্নিহিত হইল।' দূতেরা শরদণ্ডা পার হইবারপর 'অভিকাল ও তেজোভিভবন নামক দুইটি গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া ইক্ষ্বাকুদিগের পৈত্রিক নদী ইক্ষুমতী পার হইল। 'তৎপর বাহ্লিকদেশের মধ্য দিয়া সুদামন্ পর্ব্বতে গমন করিল।' পরে বিপাশা ও শাল্মলী নামে দুইটি নদী, তড়াগ, দীর্ঘিকা প্রভৃতি দর্শন করিতে করিতে রাত্রিকালে গিরিব্রজ অথবা রাজগৃহ নগরে প্রবিষ্ট হইল। দূতমুখে বার্ত্তা পাইয়া ভরত নিম্নলিখিত পথে অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

'মহাবীর ভরত রাজগৃহ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে নির্গত হইয়া, সর্ব্বাগ্রে সুদামানাম্নী এক নদী পার হইলেন। পরে হ্লাদিনী নামে পশ্চিম বাহিনী অতি বিস্তীর্ণা এক নদী উত্তীর্ণ হইয়া, শতদ্রুলঙ্ঘন করিলেন। অনন্তর ঐলাধান নামক গ্রামে আর একটি নদী পার হইয়া, অপর পর্ব্বত নামে জনপদ সকল অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পরে শিলা ও আকুর্ব্বতী নাম্নী দুই নদী সন্তরণ করিয়া, অগ্নিকোণে শল্যকর্ষণ নামক একদেশে উপস্থিত হইলেন। এই দেশে শিলাবহা নামে এক নদী প্রবাহিত হইতেছিল; সত্য-প্রতিজ্ঞ ভরত পবিত্র হইয়া, সেই নদী সন্দর্শন ও অনেকানেক পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া, চৈত্ররথ কাননে গমন করিলেন। অনন্তর গঙ্গা সরস্বতী-সঙ্গমে উপস্থিত হইয়া বীরমৎস্য দেশের উত্তরে যেসকল গ্রামছিল, তৎসমুদায় অতিক্রম করিয়া ভারুণ্ড নামক বনে উপনীত হইলেন। পরে পর্ব্বত পরিবৃতা বেগবতী স্রোতস্বতী কুলিঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, অদূরে কালিন্দী প্রবাহিত হইতেছেন।'

কালিন্দী পার হইয়া 'উৎকৃষ্ট যানে শূন্য প্রায় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে অংশুধান গ্রামে গমন পূর্ব্বক, তথায় গঙ্গা পার হওয়া দুষ্কর দেখিয়া, প্রাগ্‌টপুরে চলিলেন এবং ঐ স্থানে গঙ্গা পার হইয়া, কুটিকোষ্টিকা নদীতে উপনীত ও সৈন্যগণের সহিত তাহা উত্তীর্ণ হইয়া, ধর্ম্মবর্দ্ধন গ্রামে যাইতে লাগিলেন। তদনন্তর তোরণ নামক গ্রামের দক্ষিণ ভাগদিয়া জম্বুপ্রস্থে, জম্বুপ্রস্থ হইতে বরূথ জনপদে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ স্থানের এক সুরম্য বনে বিশ্রাম করিয়া যথায় প্রিয়ক নামক বৃক্ষ সকল রহিয়াছে, উজ্জিহানা নগরীর সেই উদ্যানে চলিলেন।' এই স্থানে আসিয়া এক বেগগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক সৈন্যদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া সর্ব্বতীর্থ গ্রামে উপস্থিত হইলেন, তথা হইতে উত্তরগা ও অন্যান্য নদী পার হইয়া হস্তিপৃষ্ঠক গ্রামে উপনীত হইলেন। তৎপর কুটিকা নদী উত্তীর্ণ হইয়া, 'লৌহিত্য গ্রামে কপীবতী, একসাল গ্রামে স্থাণুমতী এবং বিনত গ্রামে গোমতী অতিক্রম করিলেন। অনন্তর কলিঙ্গ নগরে সালবন পার হইয়া রাত্রি শেষে অযোধ্যার সন্নিহিত হইলেন।'

অতঃপর আমরা প্রাগুক্ত কয়েকটি স্থানের অবস্থিতি নির্ণয় করিতে চেষ্টা পাইব। পূর্ব্বে যেসকল দেশ, নগর, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতির উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার সকল গুলিই যে বাস্তবিক, আমরা একথা বলিতে সাহস করি না। আর যদি বাস্তবিক ও হয়, তথাপি অধুনা অনেক স্থানের চিহ্নও বর্ত্তমান নাই। কাল সহকারে অনেক স্থান হয়ত ভিন্ন ও বৈদেশিক নামে অভিহিত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলীর গবেষণা দ্বারা যতগুলি নির্ণীত হইয়াছে, তন্মধ্যে আমরা যতগুলি পারিয়াছি, তাহাই নিম্নভাগে প্রকটন করা গেল। এ বিষয়ে সুবিজ্ঞ লিখক শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জন্য অনেক দূর পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাকে শতং ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক আমরা তদীয় 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত' নামক অমূল্য রত্নস্বরূপ গ্রন্থের সাহায্যগ্রহণে বিরত হইব না। এবং ভরসা করি তিনি এরূপ স্বাধীনতা গ্রহণ জন্য আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

উত্তরকুরুবর্ষ—রামায়ণের চতুর্থকাণ্ডে উত্তরকুরু সম্বন্ধে লিখিত আছে যে 'যে স্থানে সপ্তর্ষিগণ অবস্থান করেন, যে স্থানে মন্দাকিনী নদী প্রবাহিতা, যে স্থানে রম্য দেবর্ষি-চরিত পরিকীর্ত্তিত এবং যে স্থানে চৈত্ররথ বন আছে, তাহারই নাম উত্তরকুরুবর্ষ। মন্দাকিনী নদী কেদারনাথ পর্ব্বতের নিকট। চৈত্ররথ পর্ব্বত গঙ্গাসরস্বতী-সঙ্গমের নিকট। সুতরাং রামায়ণের বর্ণনা দ্বারা উত্তরকুরুবর্ষের অবস্থিতির কোনও নির্ণয় হইতেছে না। কিন্তু রামায়ণের অপর এক স্থানে, সীতার অন্বেষণার্থ দূতপ্রেরণ সময়ে সুগ্রীব কহিতেছেন ;—

"কুরুস্থানসমতিক্রম্য উত্তরে পয়সানিধিঃ।"

ইহাতে কেবল এই পাওয়া গেল যে, উত্তর কুরু অতিক্রম করিলেই উত্তরে মহাসমুদ্র। শ্রীযুক্ত মুইর সাহেব উত্তরকুরু সম্বন্ধে রামায়ণ, মহাভারত, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং নানা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত সংগ্রহ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা এই বোধ হয় যে উত্তরকুরুবর্ষ বর্ত্তমান কাসগরের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত ছিল।

বাহ্লিক—গ্রীফিথ সাহেব বলেন, তদানীন্তন বক্ট্রিয়া বা আধুনিক বাল্ক্ এই নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

বনায়ু—কেহ কেহ ইহাকে পারস্যদেশের প্রাচীন নাম বলেন। কিন্তু অমরকোষে অশ্বের প্রসঙ্গে লেখা আছে 'বনায়ুজাঃ পারসীকাঃ কাম্বোজা বাহ্লিকা হয়াঃ।' এতদ্দ্বারা পারস্য ও বনায়ু স্বতন্ত্র দেশ বলিয়া স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। গ্রীফিথ সাহেব বলেন ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর কোণে ইহা অবস্থিত ছিল।

পহ্লব—ইহাও বোধ হয় ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছিল। লাসেনের মতে হিরোডোটস্-উক্ত পার্ত্তুস ও পহ্লব একই দেশ। অত্রত্য বাসীরাই পহ্লবীভাষা ব্যবহার করিত।

দরদ—গ্রীফিথ সাহেব ইহাকে বর্ত্তমান দর্দিস্থান বলিয়া অনুমান করেন।

সংপ্রতি ভারতবর্ষের অন্তর্নিবিষ্ট কয়েকটি স্থানের নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

অঙ্গ—রামায়ণের বালকাণ্ডে লিখিত আছে যে গঙ্গাসরযূসঙ্গম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অঙ্গদেশ অবস্থিত। টড সাহেব উহাকে বর্ত্তমান তিব্বত্ বা আবা মনে করেন। গ্রীফিতের মতে উহা ভাগলপুরের নিকট ছিল। এই শেষোক্ত মতটিই আমাদের নিকট অধিক প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়।

অন্ধ্র—হিয়ংসিয়ং কোশল হইতে ৭৫ ক্রোশ দক্ষিণে যাইয়া 'অন্তলো' দেশ প্রাপ্ত হন। কনিংহাম সাহেব মনে করেন, উহাই অন্ধ্রদেশ। ইহার আধুনিক নাম তৈলঙ্গ। ইহার প্রাচীন রাজধানী বরাঙ্গল ছিল। ইহার বিস্তার ২৫০ ক্রোশ বলিয়া বর্ণিত আছে।

অপরতাল—হিয়ংসিয়ং-উক্ত গোবিসিনা হইবে। উহা নাইনিতালের দক্ষিণ ও বেরেলির উত্তর। ইহার অপর নাম কাশীপুর।

অংশুধান—এই গ্রামটি যমুনার উত্তরে ও গঙ্গার দক্ষিণে কোন স্থানে ছিল বলিয়া বোধ হয়।

অবন্তী—শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে অবন্তীর অবস্থান সম্বন্ধে লিখিত আছে :—
'তাম্রপর্ণীং সমাসাদ্য শৈলার্দ্ধ শিখরোর্দ্ধতঃ।
অবন্তীসংজ্ঞকোদেশঃ কালিকা তত্র তিষ্ঠতি।'
সুতরাং মালবের প্রাচীন নাম অবন্তী বলিয়া বোধ হয়। কারণ তাম্রপর্ণী নদী মালব দেশের অন্তর্গত।

আগ্নেয়ী ও আকুর্ব্বতী—বালকাণ্ডের বর্ণনানুসারে ইহাদিগকে পঞ্জাবের সন্নিহিত ক্ষুদ্র নদী দ্বয় বলিয়া বোধ হয়। ইহারা শতদ্রুর পূর্ব্বদিকে।

অভিকাল—নগরটি কুরুক্ষেত্রের নিকট এবং ইক্ষুমতী নদীর পূর্ব্বভাগে অবস্থিত ছিল।

ইরাবতী—বর্ত্তমান রাবি নদী।

ইক্ষুমতী—গ্রিফিথের মতে কুরুক্ষেত্রের নদী বিশেষ। এই নামধেয় অপর একটি নদী আছে।

উত্তানিকা বা উত্তরিকা—লাসেন বর্ত্তমান রামগঙ্গা বলিয়া অনুমান করেন।

একশাল—এই গ্রামটি বর্ত্তমান গরা নদীর অব্যবহিত সান্নিধ্যে ছিল।

ঋষ্যমুখ—কিষ্কিন্ধায় একটি পর্ব্বত। ইহারই নিম্নভাগে পম্পাসরোবর ছিল।

কলিঙ্গ—'উত্তরে উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমা হইতে আরম্ভ করিয়াদক্ষিণে দ্রাবিড়ের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত সমুদ্র উপকূল ভাগে ব্যাপ্ত। প্রাচীন চালুক্য রাজবংশ এখানে রাজত্ব করিতেন।' রাজমহেন্দ্রী এই রাজবংশের রাজধানী ছিল। মহেন্দ্র পর্ব্বত এই দেশে অবস্থিত। হিয়ংসিয়ং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে এদেশের রাজধানীর গঞ্জামহইতে যেরূপ দূরত্ব লিখিত আছে, তাহাতে বোধ হয় চৈনিক পরিব্রাজক রাজমহেন্দ্রী নগর দর্শন করিয়া থাকিবেন। শ্রীককোল নামেইহার অতি প্রাচীন একটি নগর ছিল।

করুষ—বৃত্রাসুর বধান্তে গঙ্গাতে স্নান করিয়া সুরপতি এই স্থলে করুষ অর্থাৎ ক্ষুধাত্যাগ করেন, এই জন্য ইহার নাম করুষ হয়। রামায়ণের বালকাণ্ডে দেখা যায়, এই নগরটি ভীষণ জঙ্গলাবৃত হইয়াছিল, ঐ জঙ্গলের নাম তাড়কার জঙ্গল। হিয়ংসিয়ং এখানে মহাসরঃ (মহোসলো) নগর নামে

এক নগর দেখিতে পান কনিংহামের নির্দ্দেশানুসারে মহাসরঃ (বা মাসার গ্রাম) আরার ৩ ক্রোশ পশ্চিমে ছিল। অতএব প্রতীতি হইতেছে যে করুষ ও মলদ নগর যেস্থানে ছিল, এইক্ষণ সেই স্থানে আরা জেলা হইয়াছে।

কপীবতী—গ্রীফিথ সাহেবের মতে বর্ত্তমান গরানদীর এই নাম ছিল।

কাম্বোজ—গ্রীফিথ সাহেব অনুমান করেন যে অরোচেসিয়াবাসীদিগের অপর নাম কাম্বোজ। কনিংহাম নির্ণয় করিয়াছেন যে অরোচিসিয়ার একটি নগর গজনি। তাহা হইলে অরোচিসিয়া আফগানিস্থানের অংশবিশেষ হইয়া পড়ে, তথাকার ভাষা পুস্তু। কিন্তু মুর সাহেবের মতে কাম্বোজ বাসীদিগের ভাষা সংস্কৃত মূলক ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। সুতরাং গ্রীফিথ সাহেবের অনুমান গ্রাহ্য করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। প্রফুল্ল বাবু যে অনুমান করেন উহা খাম্বাজ উপসাগরের সান্নিধ্যে কোন স্থান হইবে, সে অনুমান অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

কাশী—বর্ত্তমান বারাণসী বা কাশী প্রদেশ।

কাম্পিল্য—ব্রহ্মদত্তের রাজধানী। বদাযুন ও ফরাক্কাবাদের মধ্যে অবস্থিত ছিল বলিয়া কনিংহাম অনুমান করেন।

কালিন্দী—যমুনার নামান্তর।

কিষ্কিন্ধ্যা—গ্রীফিথের মতে বর্ত্তমান মহীসুরের অংশ বিশেষ। কুত্তিকা, বা কুত্তিনা বর্ত্তমান রামগঙ্গার পূর্ব্ববর্ত্তী তোয়দা বিশেষ।

কুরুজাঙ্গল—পঞ্চালের পশ্চিমদিকে ছিল। প্রফুল্ল বাবুর মতে থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী কোন দেশ। মহাভারত আদিপর্ব্বে এই দেশের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে।

কেরল—মালাবার ও কানাড়া প্রদেশ। দাক্ষিণাত্যে পরশুরাম কর্ত্তৃক প্রথম এই স্থানে ব্রাহ্মণবাস স্থাপিত হয়।

কেকয়—গ্রীফিথ সাহেবের মতে ইহা রাজগৃহের নামান্তর মাত্র। কৈকেয়ীর পিতা অশ্বপতি এইদেশের অধিপতি ছিলেন। ইহা শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্ত্তী ছিল।

কৈলাস—হিমালয় পর্ব্বতের শৃঙ্গ বিশেষ।

কোশল—কাশীর উত্তর হইতে বর্ত্তমান অযোধ্যা প্রদেশ সমগ্র কোশল নামে অভিহিত ছিল। অথবা সরযূর উভয় তীরবর্ত্তী ভূভাগের নাম কোশল। দক্ষিণ ভাগের নাম দক্ষিণ কোশল; উত্তর ভাগের নাম উত্তর কোশল। দক্ষিণ কোশলে রামের রাজধানী ছিল। কোশল সম্বন্ধে নানামত আছে। উইলসন সম্পাদিত বিষ্ণু পুরাণ এবং কনিংহমের ভারতের প্রাচীন বৃত্তান্তে বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কোটিকোষ্টিকা—গঙ্গার শাখা বর্ত্তমান কোহ নদী হইবে।

কৌশাম্বী—যমুনাতটস্থ বর্ত্তমান কুসুম নগর বলিয়া কনিংহম সাহেব অনুমান করেন। রত্নাবলী নাটকের নায়ক বৎসরাজার রাজধানী এখানে ছিল।

গয়া—বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। মগধের দক্ষিণে ছিল।

গিরিব্রজ—জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। গঙ্গা ও শোণনদের সঙ্গমস্থলে আধুনিক বৈভারগিরি, বিপুলগিরি, রত্নগিরি, উদয়গিরি এবং

শণগিরি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। মহাভারতে এই পঞ্চগিরির নাম অন্যরূপ ছিল। বর্ত্তমান রাজগৃহ নগর হইতে প্রায় সার্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত ছিল বলিয়া ফাহিয়ান অনুমান করেন।

গোকর্ণ—প্রফুল্ল বাবু মালাবার উপকূলের প্রদেশ বিশেষ বলিয়া অনুমান করেন।

গোমতী—ঋগ্বেদে যে গোমতীর কথা উল্লেখ আছে, অধ্যাপক রথের মতে তাহা সিন্ধুনদের একটি শাখা। কুমায়ুনে আর একটি গোমতী আছে। তাহা অযোধ্যার গোমতী হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মুর সাহেব অনুমান করেন। রামায়ণোক্ত গোমতী অধুনা গুম্তি নামে খ্যাত। ত্রিপুরাতে এতদ্ব্যতীত আর একটি গোমতী নদী আছে। উহা অত্যন্ত বক্র বলিয়া কেহ কেহ উহাকে "ধুমতী" বলেন।

গোদাবরী—দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ নদী বিশেষ।

গন্ধমাদন—এই পর্ব্বতটি মেরু পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

চোল—করমণ্ডল কূলের অধিকাংশ। দ্রাবিড়ের দক্ষিণভাগে অবস্থিত। কনিংহমের ভারতের প্রাচীন ভূগোলগ্রন্থে এতৎসম্বন্ধে নানামত বিবৃত হইয়াছে।

চিত্রকূট—বুন্দেলখণ্ডের কামতা পাহাড়। এই পাহাড়ের একটি গিরিনদীর নাম মন্দাকিনী।

জনস্থান—চিত্রকূট পর্ব্বত সন্নিহিত অরণ্য। এই বনে খরদূষণ বাস করিত।

তমসা—এই নামে ভারতবর্ষের অনেক গুলি নদী আছে। এখানে যেটির উল্লেখ হইয়াছে, উহা এলাহাবাদের কিঞ্চিৎ নিম্নে গঙ্গাসহ মিলিয়াছে। ইহার আধুনিক নাম টন্‌স (Tons)।

দণ্ডকারণ্য—চিত্রকূট পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে স্থিত মহারণ্য।

দশার্ণ—টলিমি ও পেরিপ্লুসের "দসারিণ" এবং দশার্ণ একই দেশ বলিয়া উইলসন বিবেচনা করেন। ইহা বর্ত্তমান ছত্রিশ গড়ের অংশ বিশেষ। বেত্রবতী তটে বিদিশা নগরী ইহার রাজধানী ছিল। মালব দেশের অন্তর্গত ভিল্‌সা গ্রামের নামই বোধ হয় পূর্ব্বে বিদিশা ছিল।

দ্রাবিড়—কঙ্কণ ও ধনকোটের দক্ষিণে দ্রাবিড় দেশ। ইহার রাজধানী কাঞ্চীপুর ছিল। পূর্ব্বে পাণ্ড্য, চোল ও চের প্রভৃতি রাজ্য ইহার অন্তর্গত ছিল।

ধর্ম্মারণ্য—রামায়ণে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নিকট ইহার অবস্থিতি নির্ণীত আছে। কামরূপ ও আসামের কিয়দংশের নামই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ছিল। সুতরাং ধর্ম্মারণ্য কামরূপের মধ্যে বা নিকটে হইবে।

নলিনী—গঙ্গার একটি ক্ষুদ্র শাখা পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিতা ছিল।

নন্দিগ্রাম—বর্ত্তমান অযোধ্যার একটি নগর, ইহার আধুনিক নাম নান্দগেয়ন (Nandgaon)

পঞ্চবটী—দণ্ডকারণ্যের দক্ষিণাংশ, এখান হইতে সীতা হৃতা হইয়াছিলেন।

চম্পা—মহীসুরে প্রাচীন ঋষ্যমুখ পর্ব্বতের পাদদেশে এই সরোবরটি ছিল।

পঞ্চাল—বর্ত্তমান রোহিলখণ্ড, রাজধানী অহিচ্ছত্রা ছিল।

পুষ্কর—বর্ত্তমান আজমীরের নিকট, এখানকার পুষ্কর হ্রদ অতি প্রসিদ্ধ।

প্রলম্ব—হিয়ংসিয়ং-উক্ত মাদাবর। উক্ত মাদাবর বিজ্‌নোরের নিকট পশ্চিম রোহিলখণ্ডের অংশ।

পুণ্ড্র—বাঙ্গলার পশ্চিমসীমাস্থিত প্রদেশগুলির সাধারণ নাম ছিল।

প্রয়াগ—গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্থিত আলাহাবাদ।

পাবনী—গঙ্গার পূর্ব্বগামী শাখানদী বিশেষ।

বঙ্গ—এখনকার বঙ্গের দক্ষিণ ভাগ।

বৎসদেশ—প্রয়াগের পশ্চিম হইতে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশের নাম বৎস দেশ ছিল। পূর্ব্ব লিখিত কৌশাম্বি নগর এই দেশেরই রাজধানী ছিল।

বাহিক—বিপাশা ও শতদ্রু মধ্যস্থলে ও কেকয়ের উত্তর।

বিশালা—গঙ্গার উত্তর এবং গণ্ডকী নদীর পূর্ব্ব ও মিথিলার দক্ষিণস্থ ভূভাগের নাম। প্রাচীন বিশালার বর্ত্তমান নাম ‘ বিসার ’।

বিন্ধ্য—প্রসিদ্ধনামা পর্ব্বত।

বিপাশা—বর্ত্তমান বিয়াস (Beas) নদী।

বীরমৎস্য—হিয়ংসিয়ং-এর শ্রুঘ্ন প্রদেশ বলিয়া অনেকে বোধ করে। বর্ত্তমান অম্বালা ও তাহার পূর্ব্বোত্তর প্রদেশই শ্রুঘ্ন বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

বিদর্ভ—বর্ত্তমান বিরারের অংশবিশেষ।

ব্রহ্মমাল—বিন্ধ্য পর্ব্বত সান্নিধ্যে ছিল।

বেদশ্রুতী—তমসা ও গোমতীর মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র নদী বিশেষ।

বৈতরণী—উড়িষ্যার প্রসিদ্ধনামা নদী।

ভারুণ্ড—এই ভীষণ বনটি বীরমৎস দেশের উত্তরে স্থিত ছিল।

ভাগীরথী—প্রসিদ্ধ গঙ্গার শাখা।

মলদ—পূর্ব্বোক্ত তাড়কার জঙ্গলে এটিও অবস্থিত ছিল।

মৎস্য—এই দেশ সম্বন্ধে দ্বিবিধ মত দৃষ্ট হয়। একমতে বর্ত্তমান জয়পুর; দ্বিতীয় মতে গুজরাট সন্নিহিত কোন দেশ।

মদ্রদেশ—বিয়াস ও ঝিলম নদীর মধ্যগত দেশ। শাকল ইহার প্রাচীন রাজধানী ছিল।

মগধ—রামায়ণের সময় পাটনা জিলার দক্ষিণস্থ ভূভাগের নাম মগধ ছিল। এই দেশের অপর নাম পলাশ।

মহেন্দ্র—দাক্ষিণাত্যের গিরিবিশেষ।

মন্দাকিনী—চিত্রকূটের গিরিনদী বিশেষ।

মহোদয়—কর্ণেলটড বলেন কুশনাভ গঙ্গাতীরে মহোদয় নগর স্থাপন করেন। উক্ত রাজার কন্যাগণ পবন কর্ত্তৃক তথায় কুব্জ হওয়াতে, উহার নাম কান্যকুব্জ হয়। গ্রীফিথও তম্মতস্থ।

মহীষিক—গ্রাফিথের মতে বর্ত্তমান মহীশূরের কিয়দংশ।

মাগধি বা শোণা—বর্ত্তমান শোণ নদী বলিয়া রামানুজ অনুমান করেন।

মালব—বর্ত্তমান সময়েও ঐ নাম আছে।

মালিনী—গ্রীফিথেরমতে সরযুর শাখা। বর্ত্তমান নাম চুকা। মেগস্থেনিস্ ইহাকে এরিনসস্ (Erenesos) নাম দিয়াছেন।

মেরু—হিমালয় প্রদেশে অবস্থিত। সম্ভবতঃ কৈলাসের ন্যায় উহাও হিমালয়ের শৃঙ্গবিশেষ হইবে।

মৈনাক—দক্ষিণ মহাসাগরে স্থিত। পুরাণে ইহাকে হিমালয়ের পুত্র বলিয়াছে।

মিথিলা—(বিদেহ) বর্ত্তমান ত্রিহুত জিলা। ইহার প্রাচীন আর একটি নাম তীরভুক্তি। বোধ হয় ত্রিহুত নামটি এই প্রাচীন নাম হইতে উৎপন্ন।

রাজগৃহ—কেকয়ের নামান্তর।

লঙ্কা—বর্ত্তমান সিংহল, বা সিলোন।

লৌহিত্য—এই গ্রামটি রামায়ণের বর্ণনানুসারে গরা নদী তটে ছিল বলিয়া বোধ হয়।

শতদ্রু—বর্ত্তমান সাট্‌লেজ (Sutlej)নদী।

শরদণ্ডা—এই নদীটী বর্ত্তমান থানেশ্বরের নিকট ছিল।

শাল্মলী—বাঙ্গলাদেশ প্রচলিত রামায়ণ মতে উহা বিপাশার নামান্তর।

শৃঙ্গবেরপুর—"স্যন্দিকা ও গঙ্গার মধ্যে প্রয়াগের ধার পর্য্যন্ত শৃঙ্গবেরপুর। নিষাদরাজ গুহকের রাজধানী,এক্ষণে সংরুর নামে খ্যাত। বর্ত্তমান আলাহাবাদ প্রদেশের মধ্যে পড়িয়াছে।"

সঙ্কাস্যা—বর্ত্তমান কালী নদী (প্রাচীন-কালিন্দ্রী) তটে স্থিত ছিল। রামায়ণের বালকাণ্ডে উহা ইক্ষুমতী তটে স্থিত ছিল বলিয়া উল্লেখ দেখাযায়। ইহাতে বোধ হয় ইক্ষুমতীকালিন্দ্রীর নামান্তর। কনিংহমের মতে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চবিংশ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে। হিয়ংসিঙ্‌ ইহাকে সেঙ্‌-কিয়া-সাই নাম দিয়াছেন।

সরযূ—রামানুজের মতে এই নদী অযোধ্যার পশ্চিমভাগে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিক দিয়া পূর্ব্বদিকে অঙ্গদেশে আসিয়া গঙ্গার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। রামায়ণে দৃষ্ট হয় ইহাও হিমালয়ে উৎপন্ন। গ্রীকেরা ইহাকে সেরাবস (Sarabos) নাম দিয়াছে।

স্যন্দিকা—বর্ত্তমান সাই (Sai) নদী বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

সীতা—পশ্চিম বাহিনী গঙ্গার অতি ক্ষুদ্র একটি শাখা।

সরস্বতী—সরহিন্দস্থিত কাগার নদীর তোয়দা। বর্ত্তমান নাম সারস্থতী (Sursooty)

সিন্ধু—এখনো পূর্ব্বনামে বিখ্যাত নদ। আবার সিন্ধু নামে একটি দেশও ছিল। উহা বর্ত্তমান সিন্ধু প্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে, বাইবলে ইহার নাম হন্দু।

সূরসেন—বর্ত্তমান মথুরা প্রদেশ। এরিয়ানোক্ত সূরসিনাই।

সৌবীর—বর্ত্তমান রাজপুতনার দক্ষিণ ভাগ। পরে ইহার নাম বদরী হয়। হিয়ংসিয়ং ইহাকে ওসালি, মিসরীয়েরা ইহাকে সফির এবং বাইবলে অফির বলিয়াছে।

সৌরাষ্ট্র—বর্ত্তমান সুরাটপ্রদেশ (Surat)

হস্তিনাপুর—বর্ত্তমান দিল্লীরনিকটছিল।

(চতুর্থ প্রস্তাব)

ব্যাসদেবের সময়ে এদেশে ভূগোলের কিরূপ আলোচনা ছিল, ভীষ্ম পর্ব্ব পাঠ করিলে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যায়। অতএব আমরা প্রথমে মহাভারতের ভীষ্ম

পর্ব্ব (কালীসিংহের অনুবাদিত) হইতে সংক্ষেপ করিয়া ভৌগোলিক তত্ব উদ্ধৃত করিব; পরে উইলসন প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তন্মধ্যে যেসকল স্থানের আধুনিক নাম ও অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বিবৃত করিব।

মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতেছেন :—

'জম্বুদ্বীপের অপর নাম সুদর্শন দ্বীপ। ঐ দ্বীপ চক্রাকার, নিতান্ত দুর্লক্ষ্য, নদী ও জলে সমাচ্ছন্ন। মেঘসন্নিভ পর্ব্বত, বিবিধ নগর, সুরম্য জনপদ, ও ফল পুষ্পে সুশোভিত পাদপনিবহে সমাকীর্ণ ও চতুর্দ্দিকে লবণ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত।' 'এই জম্বুদ্বীপের দুই অংশ পিপ্পলস্থান ও দুই অংশ মহাশশস্থান।'

'(১) হিমালয়, (২) হেমকূট (৩) নিষধ (৪) বৈদূর্য্যময় নীল (৫) শশিসঙ্কাশ শ্বেত, ও সর্ব্বধাতু সম্পন্ন (৬) শৃঙ্গবান্ এই ছয়টি পর্ব্বত একাকার। এই সকল পর্ব্বত পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত আয়ত।' 'এই ছয় পর্ব্বত সহস্র২ যোজন অন্তরে অবস্থিত; তন্মধ্যে নানা জনপদ প্রতিষ্ঠিত ও সকল প্রকার প্রাণী অধিষ্ঠিত আছে; ইহাই ভারতবর্ষ। হিমালয়ের উত্তরে হৈমবৎবর্ষ, ও হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ। নীলপর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধ গিরির উত্তরে মাল্যবান্ পর্ব্বত; উহা পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। তদ্রূপ গন্ধমাদন পর্ব্বতও নীলপর্ব্বতের দক্ষিণ এবং নিষধ পর্ব্বতের উত্তরে অবস্থিত হইয়া পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ রহিয়াছে।' সুমেরু 'নীল ও নিষধ পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত আছে। উহা ভূগর্ভে ষোড়শ যোজন প্রবিষ্ট ও ঊর্দ্ধে চতুরশীতি যোজন উন্নত।' 'ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বু, ও উত্তরকুরু এই চারিটি দ্বীপ ইহার পার্শ্বদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে।'

সুমেরু পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে কর্ণিকার বন বিরাজিত। সুমেরুর শিখর হইতে 'ভাগীরথী অনবরত অতি গম্ভীর ভয়ঙ্কর ঝর্ঝর স্বরে মহাবেগে চন্দ্রমা হ্রদে নিপতিত হইতেছেন। তাহা হইতেই সাগর সদৃশ ঐ মহাহ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে।' সুমেরুর পশ্চিম পার্শ্বে কেতুমালবর্ষ; হিমালয়ের দক্ষিণে ভারতবর্ষ উত্তরে হৈমবৎবর্ষ; হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ; নিষধ পর্ব্বতের উত্তরে ইলাবৃতবর্ষ; নীলপর্ব্বতের উত্তরে শ্বেতবর্ষ; শ্বেত পর্ব্বতের উত্তরে হৈরণ্যকবর্ষ, তাহার পর ঐরাবতবর্ষ। এই সাতটিবর্ষ শরাসনাকার ধারণ করিয়া ভূপৃষ্ঠে সন্নিবেশিত আছে। গন্ধমাদনের উত্তরে বহুতর গণ্ডশৈল আছে। হেমকূট-কৈলাস নামে রমণীয় অতি বিশাল এক পর্ব্বত আছে। তাহার উত্তরে মৈনাক-পর্ব্বতসন্নিহিত হিরণ্যশৃঙ্গ নামে এক পর্ব্বত, তাহার পার্শ্বে বিন্দুসর নামে এক সরোবর।

'শশস্থানের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটিবর্ষ আছে; নাগদ্বীপ ও কাশ্যপদ্বীপ শশস্থানের কর্ণ স্বরূপ; শশস্থানে তাম্রপর্ণী নামে শিলা ও মলয় পর্ব্বত সন্নিবেশিত আছে। শশস্থান জম্বুদ্বীপের দ্বিতীয় দ্বীপ বলিয়া পরিগণিত।' সুমেরুর উত্তর ও নীল পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তরকুরু। এই

উত্তরকুরুবর্ষে ক্ষীরি নামে এক প্রকার বৃক্ষ আছে সুমেরুর পূর্ব্বপার্শ্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ, তাহাতে ভদ্রশালবন ও কালাম্র নামে উন্নত একপ্রকার বৃক্ষ আছে। নীলপর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধের উত্তর জম্বুদ্বীপ। উহাতে সুদর্শন নামে জম্বুবৃক্ষ আছে বলিয়া উহাকে সুদর্শন দ্বীপও কহে। তত্রত্য জম্বু-নদ সুমেরুকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক উত্তর কুরুতে প্রবাহিত হইতেছে। মাল্যবান্ পর্ব্বতের শিখর দেশে সম্বর্ত্তক নামে কালাগ্নি নিরন্তর প্রজ্বলিত; তথায় অনেকগণ্ড শৈল আছে। ঐ পর্ব্বত ৫০ সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ। শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের তিনটি শৃঙ্গ। শৃঙ্গবানের উত্তরে সাগরপারে ঐরাবতবর্ষ। শ্বেত পর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধ গিরির উত্তরে রমণকবর্ষ। নীল পর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধের উত্তর হিরণ্ময়বর্ষ, তথায় হৈরণ্বতী নামে এক স্রোতস্বতী আছে।

ভারতবর্ষে 'মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, গন্ধমাদন, বিন্ধ্য, ও পারিপাত্র এই সাতটিকুলপর্ব্বত। ইহাদের সমীপবর্ত্তী সারবান্ বিচিত্র সানুযুক্ত সহস্র২ পর্ব্বত আছে; ঐ সমুদায় জনসমাজে অবিজ্ঞাত। এতদ্ভিন্ন বহু সংখ্যক অপরিজ্ঞাত ক্ষুদ্র২ পর্ব্বত আছে।

ভারতবর্ষে যে সমুদায় নদী আছে। 'গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, বাহুদা, মহানদী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, দৃষদ্বতী, বিপাশা, বেত্রবতী, কৃষ্ণবেণী, ইরাবতী, বিতস্তা, পয়োষ্ণী, দেবিকা, বেদস্মৃতা, বেদবতী, ত্রিদিবা, ইক্ষুমালবী, করীষিণী, চিত্রসেনা, চিত্রবহা, গোমতী, গণ্ডকী, কৌশিকী, নিশ্চিতা, কৃত্যা, নিচিতা, লোহতারিণী, রহস্যা, শতকুম্ভা, সরযু, চর্ম্মণ্বতী, চন্দ্রভাগা, হস্তিসোমা, দিক্, শরাবতী, পয়োষ্ণী, পরা, ভীমরথী, কাবেরী, চুলকা, বীণা, শতবলা, নীবারা, মহিতা, সুপ্রয়োগা, পবিত্রা, কুণ্ডলা, সিন্ধু, রাজনী, পুরমালিনী, পূর্ব্বাভিরামা, বীরা, ওঘবতী, পলাশিনী, মহেন্দ্রা, পাটলাবতী, করীষিণী, অসিক্নী, কুশচীরা, মকরী, প্রবরা, মেনা, হেমা, ধৃতবতী, পুরাবতী, অনুষটা, শৈব্যা, কাপী, সদানীরা, অধৃষ্যা, কুশধারা, সদাকান্তা, শিবা, বীরবতী, বাস্ত, সুবাস্ত, গৌরী, কম্পনা, হিরণ্বতী, বরা, বীরঙ্করা, পঞ্চমী, রথচিত্রা, জ্যোতিরথা, বিশ্বামিত্রা, কপিঞ্জলা, উপেন্দ্রা, বহুলা, কুচীরা, মধুবাহিনী, বিনদী, পিঞ্জলা, বেণা, তুঙ্গবেণা, বিদিশা, কৃষ্ণবেণা, তাম্রা, কপিলা, শলু, সুবামা, বেদাশ্বা, হরিস্রাবা, মহোপমা, শীঘ্রা, পিচ্ছলা, ভারদ্বাজী, কৌশিকী, সোণা, বহুদা, চন্দ্রমা, দুর্গা, মন্ত্রশিলা, ব্রহ্মবোধ্যা, বৃহদ্বতী, যবক্ষা, রোহী, জাম্বুনদী, সুনসা, তমসা, দাসী, বসা, বরুণা, অসী, নালা, ধৃতমতী, পূর্ণাশা, মহানদী, তামসী, বৃষভা, ব্রহ্মমেধ্যা, বৃহদ্বতী, কৃষ্ণা, মন্দবাহিনী, ব্রহ্মাণী, মহাগৌরী, দুর্গা, চিত্রোপলা, চিত্ররথা, মঞ্জুলা, বাহিনী, মন্দাকিনী, বৈতরণী, কোশা, মুক্তিমতী, মনিঙ্গা, পুষ্পবেণী, উৎপলাবতী, লোহিত্যা, করতোয়া, বৃষকা, কুমারী, ঋষিকুল্যা, মারিষা, সরস্বতী, মন্দাকিনী, ও সর্ব্বসঙ্গা"।

ভারতবর্ষের জনপদ গুলি এইঃ—"কুরু পাঞ্চাল, শাল্ব, মাদ্রেয়জাঙ্গল, শূরসেন, কলিঙ্গ, বোধ, মাল, মৎস্য, মুকুট্য, সৌবল্য,

কুন্তল, কাশী, কৌশল, চেদি, মৎস, করূষ, ভোজ, সিন্ধুপুলিন্দ, উত্তম, দশার্ণ, মেকল, উৎকল, পাঞ্চাল, কৌশিজ, নৈকপৃষ্ঠ, ধুরন্ধর, সোধ, মদ্রভুজিঙ্গ, অপরকাশি, জঠর, কুকুর, দশার্ণকুকুর, কুন্তি, অবন্তি, অপরকুন্তি, গোমন্ত, মন্দক, ষণ্ড, বিদর্ভ, রূপবাহিক, অশ্বক, পাংশুরাষ্ট্র, গোপরাষ্ট্র, করীতি, অধিরাজ্য, কুনাদা, মল্লরাষ্ট্র, কেরল, বারপাশ্য, অপবাহ, চক্র,বক্রাতপ, শক, বিদেহ, মাগধ, স্বক্ষ, মলয়, বিজয়, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, যকৃল্লোম, মল্ল, মুদেল্ল, প্রহ্লাদ, মাহিক, সাশিব, বাহ্লীক, বাটধান, আভীর, কালজোষক, অপরান্ত, পরান্ত, পহ্লব, চর্ম্মমণ্ডল, অটবীশিখর, মেরুভুত, উপাবৃত্ত, অনুপাবৃত্ত, স্বরাষ্ট্র, কেকয়, কুট্টাপরান্ত, মাহেয়, কক্ষ, সামুদ্রনিস্কুট, অন্ধ, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, অঙ্গমলজ, মাগধ, মানবর্জক, মুহ্য, মন্তর, প্রাবৃষেয়,ভার্গব, পুণ্ড, ভার্গ,কিরাত, সুদেষ্ট, যামুন, শাক, নিষাদ, নিষধ, আনর্ত্তনৈঋত, দুর্গল, প্রতিমাস্য, কুন্তল, কুশল, তীরগ্রহ, সুরসেন, ঈজক, কন্যাকাগুণ, তিলভার, সমীর, মধুমন্ত, সুকন্দক, কাশ্মীর, সিন্ধুসৌবীর, গান্ধার, দর্শক, অভীসার, উতুল, শৈবাল, বাহ্লিক, দর্ব্বী, বানবাদর্ব্ব, বাতজ, আমরথ, উরগ, বাহুবাধ, কৌরব্য, সুদামা, সুমল্লিক, বধ্র, করীষক, কুলিন্দোপত্যকা, বাতায়ন, দশার্ণ, রোমা, কুশবিন্দু, কচ্ছ, গোপালকক্ষ, জাঙ্গল, কুরুবর্ণক, কিরাত, বর্ব্বর, সিদ্ধ, বৈদহ, তাম্রলিপ্ত, ঔড্র, পৌণ্ড্র, সৈসিকত, ও পার্ব্বতীয়'।

অতঃপর জন্মেজয় দক্ষিণ দিগস্থ কতিপয় জনপদের নাম করিতেছেন। যথা—'দ্রাবিড়, কেরল, প্রাচ্য, মূষিক, বনবাসক, কর্ণাটক, মাহিষক, বিকল্প, মূষক, ঝিল্লিক, কুন্তল, সৌহৃদ্য, নলকানন, কৌকুট্টক, চোল, কোঙ্কণ, মালবানক, সমঙ্গ, কর, কুক্কুর, অঙ্গার, মারিষ, ধ্বজিনী, উৎসবসঙ্কেত, ত্রিগর্ত্ত, শাল্বসেন, বক, কোকরক, প্রোষ্ঠ, সমকোবশ, বিন্ধচুলক,পুলিন্দ,কল্কল, মালব, মল্লব, অপরবল্লভ, কুলিন্দ, কালব, কণ্টক, করট, মূষক,তনবাল, সনীয়, আঘট, স্থ য়, অলিন্দ, পাশিবাট, তনয়, সুনয়, দশীবিদর্ভ, কান্তীক, তঙ্গন, পরতঙ্গণ, উত্তরম্লেচ্ছ, অপর ম্লেচ্ছ, ক্রূর, যবন,চীন,কাম্বোজ, সকৃদ্গ্রাহ, কুলল্ম,হূন,পারসিক, রমণ, চীন, দশমালিক, যোনিবেশ, দরদ, কাশ্মীর, পত্তি, খশীর, অন্তচার, পহ্লব, গিরিগহ্বর, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, স্তনযোষিক, প্রোষক, কলিঙ্গ, তোমর, হংসমার্গ ও করভঞ্জক।' (ক্রমশঃ।)

শ্রীজ—

স্বায়ত্তশাসন।

২

আমরা স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে গত সংখ্যার বাঙ্গবে কয়েকটি কথা বলিয়াছি। এবারও কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

স্বায়ত্তশাসন মোটের উপরে যে অতি বাঞ্ছিত বস্তু, তাহা মূর্খেও বুঝিতে পারে। এই পৃথিবীতে যাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সেই বলিবে যে, পরের অধীন থাকা অপেক্ষা স্বাধীন থাকাই ভাল ও বাঞ্ছনীয়। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, পিঞ্জরের পাখীও স্বর্ণপিঞ্জরের স্বর্ণশৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া স্বায়ত্তভাবে বৃক্ষে বৃক্ষে উড়িয়া বেড়াইতে ভালবাসে। কিন্তু তথাপি এদেশের অধিবাসীরা স্বায়ত্তশাসন-রূপ সম্পদলাভের জন্য উদার-নৈতিক বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট অযুতজিহ্বায় আবেদন করে না কেন? তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছে যে, তাহাদিগের স্বজাতীয়েরা অহোরাত্র গলদ্ঘর্ম্ম পরিশ্রম করিয়া রাজকোষে বিবিধ কর রূপে যে অর্থ প্রদান করে, তাহা অনেক সময়েই রাজপুরুষদিগের ভ্রম কি কুসংস্কারবশতঃ নিতান্ত অন্যায়রূপে জলে যাইতেছে, তথাপি ইহাতে তাহারা ক্লিষ্ট কি ব্যথিত হয় না কেন? ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের প্রজাবর্গ স্বায়ত্তশাসনের উচ্চতম স্বর্গে অধিরূঢ় হইয়া এইক্ষণও আবার সেই লব্ধাধিকারের সীমাবিস্তারের জন্য আকাশের চন্দ্র সূর্য্য লইয়া টানাটানি করিতেছে; কিন্তু ভারতবাসী এই উচ্চ সম্পদের জন্য এক ফোটা অশ্রুজল ফেলিতেও অগ্রসর হয় না কেন? ইহার মুখ্য কারণ এই—শান্তিপ্রিয় ভারতবর্ষীয়েরা শান্তির সুকোমল শয্যায় চিরদিন লালিত হইয়া এমনই নিরীহ ও নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছে যে, যাহা উপার্জ্জন করিতে একটুকু কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তাহারা তাহার ধার দিয়াও যায় না, এবং দেশে স্বায়ত্তশাসনের বিকাশের সহিত জাতীয় জীবনের উন্নতি ও অধোগতির যে অতি বড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, ইহা মুহূর্ত্তের তরেও তাহারা ভাবিয়া দেখে না। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহিত ব্যক্তিগত জীবনের যে সম্পর্ক, স্বায়ত্তশাসনের ক্রমিক বিস্তারের সহিত জাতীয় জীবনেরও ঠিক্ সেই সম্পর্ক। আমরা আজি এই কথাটিই অতি সংক্ষেপে বুঝাইতে যত্ন করিব।

যাঁহার অতি সামান্য চিন্তা শক্তি আছে, তাঁহারই ইহা প্রতীতি হইবে যে, মানবজীবন অংশতঃ স্বায়ত্ত, অংশতঃ পরায়ত্ত। ইহা বিধাতার বিধি ও সমাজগঠনের ক্রম।

কিন্তু পরায়ত্তজীবনের স্বাভাবিক পরিণাম স্বায়ত্তজীবন। ইহাও বিধাতার বিধি এবং জীবন-যন্ত্রের স্বাভাবিকী গতি। এই গতির অবরোধ কিংবা এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিলেই প্রকৃতির বিড়ম্বনা।

শিশুর জীবন স্বভাবতঃই পরায়ত্ত। কেহ না ধরিলে সে উঠিতে কিংবা বসিতে পারে না,—কেহ হাত বাড়াইয়া হস্তাবলম্ব প্রদান না করিলে, সে এক পা অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় না। তাহাকে খাওয়াইলে সে খায়, তাহাকে চালাইলে সে চলে। কিন্তু তাহার জীবন কি চিরদিনই এইভাবে প্রবাহিত হয়? জীবনের যতই বিকাশ হইতে থাকে, তাহার হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, ক্রমে ক্রমে ততই তাহার বশে আসিতে আরম্ভ করে;—এবং যে এক সময়ে ত্রিপাদ-ভূমি পরিক্রমণ করিতে হইলে তিনবার অধঃপতিত হইত, সেই আবার কালসহকারে বামনরূপী বিরাট পুরুষের ন্যায় ত্রিপাদ-পরিক্রমে ত্রিভুবনকে আচ্ছাদিত ও আকম্পিত করিয়া তুলে। এই জন্যই বলিয়াছি যে পরায়ত্ত জীবনের স্বাভাবিক পরিণাম স্বায়ত্ত জীবন। যাঁহারা এইক্ষণ পুরুষ বলিয়া পুরুষের মধ্যে অগ্রগণ্য,—যাঁহাদিগের বাক্য জগতকে শাসিত করে, কার্য্য জগতকে আলোড়িত রাখে, যাঁহারা মনুষ্য-জগতের নেতা বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিত, তাঁহারা যদি চিরদিনই দুধের ছেলের মত জননীর দুগ্ধভার-পূর্ণ স্তনবৃন্ত মুখে দিয়া হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহাদিগকে কি বলিত? বোধ-হয় এতদিনে সকলেই তাঁহাদিগকে মনুষ্য-শিশু না বলিয়া মাংসপিণ্ড জ্ঞানে দূরে ফেলিয়া দিত। কেননা, এইরূপ চির-পরায়ত্ত ভাব প্রকৃতির বিড়ম্বনা।

শিষ্য অর্থাৎ শিক্ষার্থীর জীবনও প্রথমতঃ পরায়ত্ত। কারণ, মানবজীবন আরম্ভে পরায়ত্ত না রহিয়া পারে না। কিন্তু উহারও পরিণাম-ফল স্বায়ত্তজীবন। মনুষ্য যখন প্রথমে শিখিতে আরম্ভ করে, তখন সকল বিষয়েই তাহাকে গুরুবাক্য ও গুরু-শাসনের উপর নির্ভর করিতে হয়। গুরু না বলিয়া দিলে সে শব্দের অর্থ বুঝিতে পায় না, যন্ত্রপ্রয়োগে পটু হয় না, বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না এবং কি দিয়া কি করিতে হয়, তাহা তাহার বুদ্ধিতে প্রবেশ করে না। এই নিমিত্তই সে আপনার জীবনকে গুরুর ইচ্ছায়ত্ত করিয়া দিয়া তদীয় মুখপ্রেক্ষী হইয়া রহে। কিন্তু এইরূপ পরানুগত্যের উদ্দেশ্য কি?—না, স্বানুগত্যের সোপান-পরম্পরায় আরোহণের উচ্চাভিলাষ। যাহাকে চিরদিনই গুরুতাড়নার অধীন রহিতে হয়, সে শিষ্যপদ বাচ্য নহে। প্রকৃত শিষ্য আপনাকে জ্ঞানে ও গুণে গুরুস্থানীয় করিবার জন্যই যত্নবান্ রহে। নতুবা সে কুশিষ্য অথবা শিষ্যনামের বিড়ম্বনা।

জাতীয় জীবনেরও আরম্ভ এইরূপ। উহারও প্রথম শিক্ষা পরায়ত্ত-শাসন। যাঁহারা জাতি-বিশেষের মধ্যে বাহুবলে, বুদ্ধিবলে কিংবা বাক্যবলে বলীয়ান্, তাঁহারা জাতীয় তরণীর কর্ণধার-স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া চালনা করেন এবং সকলে সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের শাসনের অধীন হইয়া চলে।

অথবা কোন প্রবল পরাক্রান্ত জাতি দুর্ব্বল জাতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া লয় এবং সেই দুর্ব্বল জাতি ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, অনুরাগে হউক, বিরাগে হউক, উল্লিখিত প্রবল জাতির অধীন হইয়া রহে। ইহারা রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, বুকের রক্ত জল করিয়া সামগ্রী যোগায়; তাঁহারা শৈলশিখরের সুশীতল বিলাসগৃহে হাসিয়া খেলিয়া তাহা সেবন করেন; ইহারা গরু কি ঘোড়া হইয়া গাড়ী টানে, তাঁহারা হস্তপাদশূন্য জগন্নাথ হইয়া তাহার উপর বসিয়া থাকেন। ইহারা সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি হইয়া পীঠ পাতিয়া দেয়, তাঁহারা তদুপরি মুষ্টিঘাত কি যষ্টিঘাত করিয়া ব্যায়াম শিক্ষার সুখানুভব করেন। কিন্তু যেমন শিশুজীবন ও শিষ্যজীবনের শেষ পরিণাম স্বায়ত্তজীবন, সেইরূপ উল্লিখিত প্রকার পরায়ত্ত শাসনেরও শেষ-পরিণাম স্বায়ত্তশাসন। নহিলে পরায়ত্তশাসনের যাতনা, লাঞ্ছনা, তাড়না ও বিড়ম্বনা সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক হইয়া যায়। শিশুর যদি পুনঃ পুনঃ পদস্খলন হয়, তাহা হইলে পরিণামে সে হাটিতে শিখে, এবং সেই শিক্ষাতেই তাহার পদস্খলনের সার্থকতা। শিষ্য যদি একে আর করিয়া পুনঃ পুনঃ গঞ্জনা ভোগ করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সে প্রমাদশূন্য হয় এবং সেই ভ্রমশূন্য শিক্ষালাভই তাহার সমস্ত গঞ্জনার পুরস্কার। এইরূপ, পরায়ত্তশাসনেই যাহাদিগের রাজনীতি-শিক্ষা, তাহারা যদি অভাবের অঙ্কুশ-তাড়নায় উৎপীড়িত রহে, তাহা হইলে কালে তাহারা স্বায়ত্তশাসনে সামর্থ্য লাভ করে এবং সেই সামর্থ্যলাভই তাহাদিগের সকল যাতনার শেষ-দক্ষিণা। যদি ইহা না হইয়া শুধু যন্ত্রণা ভোগই সার হয়, তাহা হইলে চিরশৈশব ও চিরশিষ্যতার ন্যায় চিরপরাধীনতাই কি জাতীয় জীবনের পরিণতি বলিয়া অবধারিত হইবে?

ভারতবাসী এইক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্বায়ত্তশাসনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে নাই। ইহা কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষকের দোষ, কিয়ৎপরিমাণে শিষ্যের দোষ। যাহা হউক, সে কথা বলিয়া প্রয়োজন কি? স্বায়ত্ত শাসনের এক উপকরণ বাহুবল, ভারতবাসীর থাকিয়াও তাহা নাই। যাহারা ইদানীং তাহাদিগের প্রভুস্থানীয়, তাঁহারা সুশিক্ষিত সাপুড়িয়া নহেন। যদি তাঁহারা সাপুড়িয়ার মন্ত্রতন্ত্রে সুদীক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের পঞ্চাশ কোটি বাহুদ্বারা পরিরক্ষিত রহিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্তচিত্তে সাম্রজ্য করিতে পারিতেন। তাঁহাদিগকে ক্ষণকালের তরেও রুশভয়ে ভীত রহিতে হইত না। স্বায়ত্তশাসনের আর এক উপকরণ ধন বল। ভারতবাসী প্রবলতর বণিগ্‌জাতির সহিত জীবনসংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে বাধ্য হইয়া সে বলেও ক্রমে ক্রমে বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে কতকগুলি লোকে ইদানীং বুদ্ধিবলে ও বাক্যবলে বলিষ্ঠ পুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বাংশেই সাধারণের প্রতিনিধি রূপে নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য এবং সাধারণেরও তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। তাঁহারা আবগান যুদ্ধে সর ফ্রেডারিক রবা-

র্টের ন্যায় সৈন্যচালনায় সুপটু না হইলেও আবগান যুদ্ধের ২৫ কোটি টাকার অপব্যয় হইতে ১০ কোটি টাকা রক্ষা করিয়া জনসাধারণের উপকার করিতে সমর্থ। তাঁহারা বিচারে নিপুণ, অর্থবাদ শাস্ত্রের কূটার্থ উদ্ঘাটনে সুপণ্ডিত এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশে পরিপক্ক লোক। তাঁহাদিগের বুদ্ধির উপর অংশতঃ নির্ভর করিলে খোলাভাটির মত-গঙ্গা বিনাও রাজকোষ পরিপূর্ণ রাখা যাইতে পারে এবং তিন আনার নগদা মু'টের উপরে টেক্স না বসাইয়াও রাজ্য রক্ষা করা সম্ভবপর হইয়া উঠে। যদি গভর্ণমেণ্ট তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে প্রদেশীয় শাসন কার্য্যে সহযোগী করিয়া লন অথচ সাধারণের নিকট তাঁহাদিগের দায়িতার সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দেন, তাহা হইলেই এদেশে আপাততঃ স্বায়ত্তশাসনের আদিপ্রবর্ত্তনা কিংবা সূত্রপাত হইতে পারে। অন্ততঃ এটুকু হইতে কি প্রতিবন্ধক আছে, তাহা আমাদিগের বুদ্ধিগম্য হয় না। যদি স্বায়ত্তশাসনের চিরবান্ধব বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এদেশের শিষ্যভাবাপন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদিগকে এতটুকু অধিকার দিতেও কুণ্ঠিত হন এবং যদি এদেশের অধিবাসীরা এই অধিকারটুকু পাইবার জন্যও সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে শিখিয়া না থাকেন, তাহা হইলে ভারতের রাজনীতি সর্ব্বাবয়বে ও সর্ব্বতোভাবে পরিবর্ত্তিত হউক।

সংগীত।

যোগসংগীত।

১

ললিত—একতাল, ভজনের সুর।

কে রে বালা কিরণ-ময়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে বিহরে!
দিক্ প্রকাশ,
বিমল ভাস;
বিমল হাস অধরে।

নাচিতে নাচিতে হৃদয় ধায়,
আকাশ ভেদিয়া কোথায় যায়,
অপরূপ একি নয়নে ভায়,—
ভায় প্রাণের ভিতরে!

কেন দরদর নয়নে বারি,
প্রাণ ভোরে আহা হেরিতে নারি;
কেন কেন শূন্যে বাহু পসারি,
কেন তনু শিহরে!

কোথা সে আমার সাধের ভবন,
কোথা প্রাণ-প্রিয়া, প্রিয় পরিজন,
কোথা চন্দ্র তারা, কোথা ত্রিভুবন!
মগন সুধার সাগরে।

অহো! মহাযোগী, দাও প্রাণ খুলি,—
দাও বাল্মীকি শিরে পদধূলি!
গুরু-কৃপামোদ-ভরে ঢুলি ঢুলি

ভ্রমিব স্বপন-নগরে—
চিরজীবন ভ্রমিব স্বপন-নগরে॥

———

২

কালাংড়া—যৎ।

এমন, অপরূপ রূপ
কভু হেরি নাই নয়নে!
কে এ বালা,
করে খেলা
কনক-কমল-কাননে!

একি অপরূপ ঠাঁই!
চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই,
কোটি চন্দ্র হাসিতেছে
বিমল রূপের কিরণে।

আপনি আকাশ মাঝে
চারিদিকে বীণা বাজে,
দূরে দূরে ইন্দ্রধনু
দুলিছে নীল গগণে।

ধর গো আকাশ বালা,
মানস-কুসুম মালা!
পাশরি যন্ত্রণা জ্বালা
লুঠিব রাঙা চরণে।

———

নিসর্গসংগীত।

১

ললিত—কাওয়ালি।

(কৃষ্ণাপঞ্চমী ২৬এ পৌষ ১২৮৮।)

কি মহান্ অরুণ উদয়! (আজিরে)
(আহা!) উদার—উদার এ প্রলয়!

প্রগাঢ় মেঘেতে ঢাকা
ভানু নাহি যায় দেখা,
(কেবল) কিরণে কিরণে কিরণ্-ময়—
(মেঘরাশি) কিরণে কিরণে কিরণ্-ময়।

পালায়েছে সব তারা,
চাঁদ যেন দিশে-হারা,
(যেন) মায়ায় মোহিত সমুদয়॥

———

২

শারদ মধ্যাহ্ন।

গৌরসারঙ্গ—একতাল।

চরাচর-ব্যাপী অনন্ত আকাশে
প্রখর তপন ভায়।
দিগ্ দিগন্তর উদাস-মূরতি,
উদার স্ফূরতি পায়।

বিমল নীল নিথর শূন্য,
শূন্য—শূন্য—শূন্য—অগম শূন্য;
দূর—অতিদূর দুপাখা ছড়িয়ে
শকুন ভাসিয়া যায়।

শুভ্র শুভ্র অভ্র রাজি
ধবলা-শিখরী সাজি,
চলিয়াছে ধীরে ধীরে না জানি কোথায়!

নীরব মেদেনী, পাদপ নিঝুম্,
নত-মুখ ফুল ফল,
নত-মুখী লতা নেতিয়ে প'ড়েছে,
স্তবধ সরসী-জল;

শান্ত সঞ্চরণ, শান্ত অরণ্যানী,

মূক অণ্ডজ, মূঢ় পশু প্রাণী,
'ঘু ঘু—ঘু, ঘুঘু—ঘু' কাতরা কপোতী
করুণা করিয়া গায়।

স্তবধ নগর, স্তবধ ভূধর,
স্তব্ধ হয়ে আছে উদার সাগর,
ধূধূ মরুস্থলী, বিহ্বল হরিণী
চমকি চমকি চায়;
স্তবধ ভুবন, স্তবধ গগন,
প্রাণের ভিতর করিছে কেমন,
তৃষায় কাতর, কঠোর মরুত!
একটুও নাহি বায়।

বিরাম দায়িনী, কোথা নিশীথিনী
স্নিগ্ধ চন্দ্র তারা-নক্ষত্র-মালিনী,
মহা মহেশ্বর করুণা রূপিণী
মোহিনী মায়ার প্রায়!
লয়ে এস সেই মেদুর সমীর,
ঝুরু—ঝুরু—ঝুরু, মধুর, অধীর;
স্নেহ-আলিঙ্গনে জুড়াব জীবন,
জুড়াব তাপিত কায়॥

শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী।

বাঙ্গালার ইতিহাস।

(২৭৯ পৃষ্ঠার পর।)

বঙ্গীয় ব দ্বীপের কোন অংশে কিংবা সমুদ্র-প্রান্ত হইতে ৪০০ মাইল মধ্যে কঙ্করের ন্যায় কোন প্রকার স্থূল পদার্থ দৃষ্টি গোচর হয় না। কিন্তু কলিকাতার গর্ভে ৮৩ হস্ত নিম্নে কঙ্কর মিশ্রিত কর্দ্দম দৃষ্ট হইয়াছে।

১২৪৪ বঙ্গাব্দে ইংরেজ রাজপুরুষগণ দ্বারা কলিকাতাস্থ 'ফোর্ট উইলিয়ম' দুর্গ মধ্যে বোমা নামক যন্ত্র দ্বারা 'আর্টিজান'* কূপ খনন করা হইয়াছিল। তদ্দ্বারা ভূগর্ভের অবস্থা যেরূপ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে তাহা আমরা টীকায় সন্নিবেশিত করিলাম।† তদালোচনায় অনুমিত হইবে যে, বঙ্গের দ-

* ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ভূপঞ্জর পরীক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার অল্প পরিসর অত্যন্ত গভীর কূপ খনন করিয়া থাকেন। ফ্রান্সের অন্তর্গত আর্টস পূর্ব্বে আর্টিসিয়াম (আর্টিজিয়াম) নামে পরিচিত ছিল। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথমতঃ সেই স্থানে এবম্প্রকার অনেক গুলি কূপ খনন করা হয় বলিয়া, এই সকল কূপ 'আর্টিজান' কূপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

† প্রথম স্তর ···৬৫০ হস্ত নিম্ন পর্য্যন্ত।	সাধারণ মৃত্তিকা।
দ্বিতীয় স্তর···৬৫০ হইতে ১৬৫০ হস্ত পর্য্যন্ত।	নীলবর্ণ আটাল মাটি। বর্ণ নিম্নভাগে ক্রমে গাঢ়।

ক্ষিণ ভাগ নদী-প্রবাহিত মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ হইয়াউঠিলে, তরুগুল্ম দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিল। কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা দ্বারা সেই স্থান জলমগ্ন হইয়া পড়ে। পুনর্ব্বার স্তরে স্তরে মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া অধুনা কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থান সমুদ্র-বক্ষঃ হইতে ১২।১৩ হস্ত উচ্চে উত্থিত হইয়াছে।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে প্রতি বৎসর

তৃতীয় স্তর	১৬৸০ হইতে ৩৫ হস্ত পর্য্যন্ত।	এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা। (১)
চতুর্থ স্তর	৩৫—৪২৸০ হস্ত পর্য্যন্ত।	চূর্ণ ও কঙ্কর বিশিষ্ট মৃত্তিকা; তাহার সহিত ২।১টা জলজ শম্বুক মিশ্রিত আছে।
পঞ্চম স্তর	৪২৸০—৫৩।০ হস্ত পর্য্যন্ত।	ঈষৎ হরিদ্বর্ণ মৃত্তিকা। এই স্তরের নিম্ন ভাগে কিঞ্চিৎ কঙ্কর দৃষ্ট হয়।
ষষ্ঠ স্তর	৫৩।০—৮৩ হস্ত পর্য্যন্ত।	অর্দ্ধ তরল বালুকা।
৭ম।৮ম স্তর	৮৩—১০১ হস্ত পর্য্যন্ত।	উপলখণ্ড সদৃশ স্থূল বালুকা রেণু বা কঙ্কর। স্রোতোবেগে ঘর্ষিত প্রস্তর খণ্ড।
নবম স্তর	১০১—১০৯ হস্ত পর্য্যন্ত।	লৌহময় মৃত্তিকা, উদ্ভিজ্জযুক্ত আটালমাটি।
দশম স্তর	১০৯—১১৩ হস্ত পর্য্যন্ত।	কোয়ার্জ (Quartz) ও ফেল্‌সপার (Felspar) নামক প্রস্তরযুক্ত সূক্ষ্ম বালুকা।
একাদশ স্তর	১১৩—১৩১ হস্ত পর্য্যন্ত।	লৌহযুক্ত আটাল মাটি।
দ্বাদশ স্তর	১৩১—১৪৮ হস্ত পর্য্যন্ত।	কোয়ার্জ, চূর্ণ প্রভৃতি প্রস্তর ও কঙ্করযুক্ত বালুকা।
ত্রয়োদশ স্তর	১৪৮—২৩২ হস্ত পর্য্যন্ত।	বালিয়া মাটি, চিক্কণ মৃত্তিকা ও বালিয়া প্রস্তর প্রভৃতির কয়েকটি স্বতন্ত্র স্তবকে এক স্তরে গ্রথিত করা হইয়াছে।

(১) বঙ্গীয় পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের পথপ্রদর্শক শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর ইহাকে বোদমাটি লিখিয়াছেন। ইহার ইংরেজি নাম Peat; এই মৃত্তিকা অগ্নি সংযোগে প্রজ্বলিত হইয়াথাকে। মিত্র মহোদয়ের বিবেচনায় ইহা এক প্রকার গলিত কাষ্ঠ মাত্র। বোদ মৃত্তিকার সহিত কয়েক খণ্ড রক্তবর্ণ কাষ্ঠ ও একখণ্ড অস্থি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্বেত্তা ওয়েলিক সাহেব রক্তবর্ণ কাষ্ঠখণ্ডগুলি সুন্দরী কাষ্ঠ নির্ণয় করেন। মিত্র মহোদয় বলেন 'ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে কলিকাতার ২০ হস্ত নিম্নে সুন্দর বনের ন্যায় একবন ছিল। সেই বন নদী প্রবাহিত মৃত্তিকা কিম্বা সমুদ্রোৎক্ষিপ্ত বালুকা বা উভয় পদার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া বোদমাটিরূপে পরিণত হইয়াছে।' প্রাপ্ত অস্থি খণ্ড বন্যপশুর হইবেক, কিন্তু পশুর জাতি নিরূপিত হয় নাই।

কি পরিমাণ মৃত্তিকা প্রবাহিত হয়, ইহা জানিবার জন্য পাঠকদিগের কৌতূহল জন্মিতে পারে। কিন্তু ইহা অভ্রান্তভাবে লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত দুরূহ। পণ্ডিতমণ্ডলী যত দূর নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন তাহা অসঙ্গত নহে।

সুবিখ্যাত এবারেষ্ট সাহেব ১০৫৪ শকাব্দে, সমুদ্র হইতে ৫০০ মাইল দূরে, গাঁজিপুরপ্রান্তে গঙ্গার জল অনেকবার পরীক্ষা করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে (সেকেণ্ড) প্রবাহিত জলের পরিমাণ এইরূপ লিখিয়াছেন—

বর্ষাকাল (৪ মাস) ৪৯৪২০৫ ঘনফীট।
শীতকাল (৫ মাস) ৭১২০০ "
গ্রীষ্মকাল (৩ মাস) ৩৬৩৩০ "

এতদ্দারা অনুমিত হইতেছে বর্ষাকালে গড়ে ৪ মাস প্রায় ৫০০০০০ ঘনফীট এবং অবশিষ্ট ৮ মাসে (শীত ও গ্রীষ্ম) গড়ে ৫৫০০০ ঘনফীট জলরাশি প্রতিমুহূর্ত্তে প্রবাহিত হয়।

বর্ষাকালে এই প্রবাহিত জলে যে কর্দ্দম মিশ্রিত থাকে তাহার গুরুত্ব ১/৪২৮ অংশ। জলাক্ত কর্দ্দমের গুরুত্ব শুষ্ক মৃত্তিকার অর্দ্ধেক; সুতরাং ১/৮৫৬ অংশ কিম্বা ৫৭৭ ঘন ফীট শুষ্ক মৃত্তিকা গাঁজিপুরপ্রান্তে গঙ্গাজলে প্রবাহিত হয় বলিয়া লিখা যাইতে পারে। এই গণনা অনুসারে প্রতি বৎসর গড়ে ৬৩৬৮০৫৭৪৪০ ঘনফীট মৃত্তিকা গঙ্গাজলে প্রবাহিত হইয়া থাকে।

এক বৎসরের প্রবাহিত মৃত্তিকা দ্বারা এক ফুট উচ্চ ২২৮॥০ বর্গমাইল ক্ষেত্র গঠিত হইতে পারে।

মিসর দেশের পিরামিড যদি গ্রাণিট প্রস্তর-নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে একটি পিরামিডের পরিমাণ ৬০০০০০ টন হইত। গঙ্গাস্রোতে প্রতি বৎসর যে কর্দ্দমরাশি প্রবাহিত হয় তাহার গুরুত্ব সেই পরিমাণ ৮২টি পিরামিড হইতেও অধিক। বর্ষার ৪ মাসের প্রবাহিত মৃত্তিকা তৎসদৃশ ৪০টি

চতুর্দ্দশ স্তর ২৩২—২৫৩ হস্ত পর্য্যন্ত।	বালিয়া মাটি। এই স্তরে প্রথমতঃ কুক্কুর জাতীয় পশুর বাহুর অস্থি ও তৎপর কচ্ছপের খোলা প্রভৃতি দেখা গিয়াছে।
পঞ্চদশ স্তর ২৫৩—৩১২ হস্ত পর্য্যন্ত।	এই স্তর কয়টি উপস্তরে বিভক্ত, প্রথমতঃ শম্বুক মিশ্রিত চুণে মাটি, তৎপর বোদমাটি সদৃশ এক প্রকার পদার্থের স্তর; ইহার নিম্ন হইতে পাথরিয়া কয়লা নির্গত হইয়াছিল। তদনন্তর কয়েকটি স্তর কঙ্করযুক্ত মৃত্তিকা।
ষোড়শ স্তর ৩১২—৩২০৮ হস্ত পর্য্যন্ত।	শম্বুকময় মৃত্তিকা, চুণে মাটি ও কঙ্করযুক্ত মৃত্তিকা।

৪৮১ ফুট বা ৩২০৮ হস্ত নিম্নে যন্ত্র ভগ্ন হওয়াতে খনন ও অনুসন্ধানের শেষ হয়।

পিরামিডের তুল্য। শুষ্ক মৃত্তিকার গুরুত্ব গণনা করিয়া এবারেষ্ট সাহেব বলেন, প্রতি বৎসর গঙ্গায় যে মৃত্তিকা প্রবাহিত হয়, তাহার গুরুত্ব প্রায় ৩৫৬৩৬১৪৬৪ টন বা ৬০টি পিরামিডের তুল্য হইবে।

১৭২৫ শকাব্দে এট্না নামক জ্বালামুখী * হইতে যে পরিমাণ ধাতুনিঃস্রব হইয়াছিল, জগতের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া তাহার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। পণ্ডিতপ্রবর ফেরেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ কালে ১৪০০০০০০০ ঘনগজ ধাতু এট্না হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। এই পরিমাণ অনুসারে গণনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, তৎসদৃশ ৫টি অগ্ন্যুৎপাতে যে পরিমাণ ধাতুস্রাব হইতে পারে, একবৎসরে গঙ্গার জলে সেই পরিমাণ মৃত্তিকা প্রবাহিত হইয়া থাকে!

কর্ণেল ষ্ট্রাচি সাহেব বলেন, এবারেষ্ট সাহেব যেস্থানে পরীক্ষা করিয়াছিলেন সেই স্থান যে কেবল সমুদ্র হইতে ৫০০ মাইল দূরে এমত নহে, গঙ্গার প্রধান প্রধান উপনদী—উত্তর দিকহইতে ঘর্ঘরা, গণ্ডকী, কুশী এবং দক্ষিণদিক হইতে হিরণ্যবাহু বা সোন সেই পরীক্ষিত স্থানে সম্মিলিত না হইয়া, তাহার নিম্ন প্রদেশে (ভাটিতে) গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ঘর্ঘরা, গণ্ডকী, কুশী প্রভৃতি নদী সমূহ হিমালয়ের যে প্রদেশে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই প্রদেশে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া থাকে। অতএব আমরা বলিতে পারি, গাঁজিপুরপ্রান্তে গঙ্গার জল পরীক্ষা করিয়া এবারেষ্ট সাহেব প্রবাহিত মৃত্তিকার যে পরিমাণ অবধারণ করিছেন, প্রকৃত পক্ষে গঙ্গার জলে তদপেক্ষা অন্যূন ৪।৫ গুণ অধিক মৃত্তিকা প্রবাহিত হইয়া থাকে।

মেজর উইলকক্স সাহেব ব্রহ্মপুত্রের জল পরীক্ষা করিয়াছেন। * তাঁহার পরীক্ষার কেন্দ্র স্থান গোয়ালপাড়া। † উইলকক্সের পরীক্ষার ফল পর্য্যালোচনা দ্বারা অনুমিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মপুত্রে প্রবাহিত কর্দ্দমের পরিমাণও গঙ্গায় প্রবাহিত কর্দ্দমের সমতুল্য।

প্রোক্ত পরীক্ষা সত্য বলিয়া স্বীকার

---

* পাঠকগণ দেখিবেন আমরা সর্ব্বদাই Volcano কে 'জ্বালামুখী' শব্দে পরিচয় করিয়া আসিতেছি। (চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব, প্রথম অধ্যায়।) এমন—প্রাচীন—সুন্দর শব্দটি পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গীয় লেখকগণ কেন তৎপরিবর্ত্তে নবনির্ম্মিত 'আগ্নেয় গিরি' শব্দ ব্যবহার করিতেছেন? স্থূলদৃষ্টিতে 'আগ্নেয় গিরি' অর্থ=অগ্নি সম্ভূত পর্ব্বত।

* Asiatic Researches. Vol. XVII. page 466.

† পরীক্ষাটি উপযুক্ত স্থানে হয় নাই। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান উপনদী ত্রিস্রোতার প্রবাহিত কর্দ্দমের ফল আমরা প্রাপ্ত হইতেছি না! বিশেষতঃ রায়েল যখন মেঘনার পরিবর্ত্তে যমুনাকে ব্রহ্মপুত্রের মূল প্রবাহ লিখিয়াছেন, তখন বড়বক্রে প্রবাহিত কর্দ্দম রাশি স্বতন্ত্র পরিমাণ করিয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহিত কর্দ্দমের সহিত যোগ করা উচিত। যাহা হউক আমরা অত্যুক্তি কলঙ্ক প্রক্ষালনমানসে এই সকল পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি।

করিতেন, অত্যুক্তি কলঙ্ক প্রক্ষালন মানসে প্রবাহিত কর্দ্দমের এক তৃতীয়াংশ পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞবর লায়েল বলেন গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে প্রবাহিত কর্দ্দমের পরিমাণ ৪০০০০০০০ ঘন ফীট কিংবা গাঁজিপুরে পরীক্ষিত কর্দ্দমের ৬। ৭ গুণ অধিক হইবে। মিসিসিপী নদীপ্রবাহিত কর্দ্দমের পরিমাণ ইহার এক পঞ্চমাংশ মাত্র।

ষ্ট্রাচি সাহেব পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন, নদী দ্বয়ের প্রবাহিত কর্দ্দম দ্বারা 'ব' দ্বীপের ২৫০ মাইল দীর্ঘ ৮০ মাইল পরিসর বা ২০০০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান প্লাবিত হইয়া থাকে; তদতিরিক্ত ব দ্বীপের প্রান্তে সাগর মধ্যে ৪৫০০০ বর্গ মাইল স্থান ব্যপিয়া প্রবাহিত কর্দ্দম প্রক্ষিপ্ত হয়। অতএব সর্ব্বশুদ্ধ প্রতিবৎসর ৬৫০০০ বর্গ মাইল স্থানের উপরে নদী দ্বয়ের প্রবাহিত কর্দ্দম বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ৪০০০০০০০ ঘন ফীট কর্দ্দম প্রতিবৎসর গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর গড়ে এই পরিমাণ কর্দ্দম প্রবাহিত হইলে ৬৫০০০ বর্গমাইল ভূমি একফুট উচ্চ হইতে কিঞ্চিদূন ৪৬ বৎসরের প্রয়োজন। তদনুসারে ১৩৬০০ বৎসর পর্য্যন্ত সেই পরিমাণ কর্দ্দম প্রবাহিত হইলে, সেই পরিমাণ ভূমি ৩০০ ফীট বা ২০০ হস্ত উচ্চ হইবে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কলিকাতার দুর্গ মধ্যে ৪৮১ ফীট বা কিঞ্চিদূন ৩২০৮' হস্ত পর্য্যন্ত খনন করিয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের কৃত কার্য্যের শেষ সীমায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সুতরাং বঙ্গীয় ব দ্বীপ গঠিত হইতে যে ১৩৬০০ বৎসরের ও অধিক সময় অতীত হইয়াছে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

বঙ্গের কলেবর বৃদ্ধির জন্য গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র অসাধারণ চেষ্টা করিতেছে। * কিন্তু প্রকৃতি দেবী আমাদের প্রতি সম্পূর্ণ অনুকূল নহেন। নদ নদী দ্বয়ের মৃত্তিকা-প্রবাহের শক্তি অপেক্ষা বঙ্গের অধোগমনরূপ বিরোধী শক্তি সমধিক প্রবল। অতলস্পর্শতাই তাহার প্রধান কারণ। বঙ্গের ভবিষ্য ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা অসাধ্য। নদরাজ লৌহিত্য ও নদীকুলেশ্বরী গঙ্গা যদি একবার অতলস্পর্শতা পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে বঙ্গের কলেবর আশাতীত বর্দ্ধিত হইবে, কিন্তু নদ নদী দ্বয় অকৃতকার্য্য হইলে কালে বঙ্গ পুনর্ব্বার সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইবে। প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ) শ্রী—সিংহ।

---

* সাগর দ্বীপ অতিক্রম করিলেই সমুদ্রে আসিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু জল দর্শন করিলে এই অনুমান অসঙ্গত প্রতিপন্ন হইয়া যায়। লায়েল প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলাম, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের আনীত বালুকা ও কর্দ্দম দ্বারা ৩০। ৪০ ক্রোশ পর্য্যন্ত সমুদ্রের জল ঘোলা হইয়া যায়। এক্ষণে তাহা দর্শন করিলাম। যে শক্তিতে ও যে উপকরণে বাঙ্গালা গঠিত হইয়াছে এক্ষণও সেই উপকরণ লইয়া সাগর সলিলে ক্রীড়া করিতেছে। কোন প্রকার দৈবোৎপাত উপস্থিত না হইলে বাঙ্গালার বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

উড়িষ্যা যাত্রা (ভারতী ৫মভাগ, ৩৭৩ পৃষ্ঠা)

বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিক।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ দাউদসার মৃত্যু হয়। ১৫৯৩ অব্দে প্রসিদ্ধ মানসিংহ আকবর সাহের পক্ষ হইয়া বাঙ্গালা বিজয় করেন। এই ঘটনাদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তি ১৭ বৎসর, বাঙ্গালার ইতিহাসে কোনও প্রধান যুদ্ধ বিগ্রহাদি দেখা যায় না। কেবল এই কথা জানা যায় যে, এসময়ে বাঙ্গালার স্থানে স্থানে মোগল পাঠানে অনবরত যুদ্ধ চলিতেছিল। কখনো বা মোগলেরা জয়ী হইত, কখন বা পাঠানেরা। এই উভয় জাতির বিবাদ নিবন্ধন বঙ্গদেশ অশান্তির নিকেতন হইয়া উঠিয়াছিল। পাঠানরাজত্ব সময়ে এদেশে জায়গিরের সৃষ্টি হয়। স্থানে স্থানে অনেক প্রধান পাঠান জায়গিরদার ছিল। কিন্তু মোগল কর্ম্মচারিগণ অনেক পাঠানের হস্ত হইতে জায়গির কাড়িয়া লইয়া আপন আপন দলস্থ লোকদিগকে তাহা প্রদান করে। দাউদের উত্তরাধিকারী সুজফর সা প্রবলপ্রতাপ জায়গিরদারদিগের নিকট আয়ব্যয়ের হিসাব তলব করাতে, জায়গিরদারগণ ক্ষেপিয়া উঠে, এবং সুজাফরকে নিহত করে। সম্রাট্ আকবর প্রথমে তোড়লমলকে এদেশের শাসনকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। কিন্তু তোড়লমল বিশেষ কৃতকার্য্য না হওয়াতে, পরে তৎপদে প্রসিদ্ধ সেনানী আজিজকে নিযুক্ত করেন। আজিজ অদ্ভুত কৌশলে একে একে বিদ্রোহী জায়গিরদারদিগকে হস্তগত করিয়া ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে অনায়াসে তাণ্ডানগরী অধিকার করিলেন। এই অব্দে তোড়লমল কর্ত্তৃক মোগল সাম্রাজ্যের ‘ওয়াশিল তুমার জমা’ প্রস্তুত হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশ ১৮টি সরকারে, ও ৬৮২ মহলে বিভক্ত হয়; এবং এদেশের রাজস্ব ১০৬, ৮৫, ৯৪৪ টাকা নির্দ্ধারিত হয়।

স্বাধীন পাঠান-রাজত্ব ধ্বংসের সময় বাঙ্গালার কি অবস্থা ছিল, তাহা আমরা রাজকৃষ্ণ বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি কহেন এই সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশে পাঠান অধিকার বিস্তৃত হইতে পারে নাই। কারণ ‘পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও

* আমরা এই প্রবন্ধটি নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী হইতে সংগ্রহ করিব; (১) হণ্টর কৃত ‘ভারত সাম্রাজ্যের ভূবৃত্তান্ত’ (২) এসিয়াটিক রিছার্চ, (৩) বাখরগঞ্জের ইতিহাস, (৪) যশোহরের ইতিহাস, (৫) আইন আকবরি, (৬) ব্রজসুন্দর মিত্র প্রণীত চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ ও বঙ্গজ কায়স্থগণের বিবরণ, (৭) প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত, (৮) মুখর্য্যার মেগেজিনে লিখিত রাসবিহারী বসুর দুইটি প্রবন্ধ, (৯) ভারতচন্দ্র কৃত মানসিংহ এবং (১০) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস।

পঞ্চকোটে তাঁহাদিগের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই; দক্ষিণে সুন্দর-বন-সন্নিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দুরাজা ছিল; পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা আরাকাণরাজ ও ত্রিপুরাধিপতির হস্তে ছিল; এবং উত্তরে কুচবিহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল। * * * সাধারণ লোকের অবস্থা কিরূপ ছিল, ভাল করিয়া জানা যায় না। কিন্তু সমৃদ্ধিশালী লোক অনেক ছিল, এবং তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিত, এমন বোধ হয়। লিখিত আছে যে, হোসেনসার রাজ্যারম্ভ সময়ে এতদ্দেশীয় ধনিগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন, এবং যিনি নিমন্ত্রিত সভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন তিনি তত মর্য্যাদা পাইতেন। গৌড় ও পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্টালিকা লক্ষিত হয়, তদ্দ্বারাও তাৎকালিক বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। * * এবং গৌড়ে যেখানে সেখানে মৃত্তিকা খনন করিলে যেরূপ রাশি রাশি ইষ্টক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে, নগরবাসী বহু সংখ্যক ব্যক্তি, ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে বাস করিত, দেশে অনেক হিন্দু ভূম্যধিকারী ছিলেন, এবং তাঁহাদের বিস্তর ক্ষমতা ছিল।' হিন্দু জমিদারেরা যে পরাক্রমশালী ছিলেন, আইন আকবরিতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে যে, বাঙ্গালার জমিদারেরা প্রায়ই কায়স্থ ছিলেন; এবং তাঁহারা মোগল সম্রাটের সাহায্যার্থ ২৩, ৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫৮ পদাতি, ১১৭০ গজ, ৪২৬০ কামান, এবং ৪৪৮০ নৌকা যোগাইতেন। যাঁহারা সম্রাটের সাহায্যার্থ এই সকল সামরিক উপকরণ যোগাইতে পারিতেন, তাঁহাদের সমস্ত যুদ্ধোপকরণ যে অনেক অধিক ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কথিত আছে যে, বাঙ্গালার সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান জমিদারের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ জন ছিল; ইহাঁরাই 'দ্বাদশ ভৌমিক' বা 'বারোভূঞা' নামে প্রসিদ্ধ।

সি, ডবলিউ, বি, রুস নামক একজন সাহেব ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে 'বাঙ্গালার জমিদারী' নামে একখান পুস্তক লিখেন; উহাতেই প্রথমতঃ 'দ্বাদশ ভৌমিকের' উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উক্ত সাহেব অসংস্কৃতজ্ঞ হওয়াতে 'ভৌমিক' শব্দের অর্থ 'কৃষক' বলেন। কিন্তু সরজন সোর ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল যে প্রসিদ্ধ 'মিনিট' লিখেন, তাহাতে 'ভৌমিক' শব্দের অর্থ জমিদার বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের পুস্তকে ভৌমিকদিগের এই তালিকাটি দৃষ্ট হয়। (১) চন্দ্রদ্বীপে রাজা কন্দর্প নারায়ণ রায়, (২) যশোহরে রাজা প্রতাপাদিত্য, (৩) ভুলোয়ায় রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য, (৪) বিক্রমপুরে চাঁদ রায় কেদার রায়, (৫) পরগণা চাঁদপ্রতাপে চাঁদ গাজি, (৬) সরকার ভূষণায় মুকুন্দ নারায়ণ রায়, (৭) খিসরপুরে ইসাখাঁ মসনন্দ্ আলি, (৮) পরগণা ভাওয়ালে ফজলগাজি, (৯) সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ, (১০) রাজসাহী জিলার অন্তঃপাতী পুটীয়ার রাজা, (১১) উক্তজিলার অন্তর্গত তাহীরপুরের রাজা এবং (১২) দিনাজপুরের কায়স্থ রাজবংশ।

এই সকল ভৌমিকেরা কখন নবাবের

অধীন হইয়া তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ রাজস্ব প্রদান করিতেন; কখন বা নবাবকে অবহেলা করিয়া স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু সকল সময়েই রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় সমস্ত ভার স্বহস্তে রাখিতেন। সেনা, দুর্গ, ধর্ম্মাধিকরণ, যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতি সমস্ত রাজলক্ষণই তাঁহাদিগের ছিল। যখন তাঁহারা মুসলমানদিগের নিতান্ত অধীন হইয়াছিলেন, তখনও একবারে রাজলক্ষণহীন হয়েন নাই। তাঁহারা সৈন্য, গজ, কামান ও নৌকা প্রভৃতি দ্বারা প্রয়োজনানুসারে নবাবের সাহায্য করিতেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে পূর্ব্বাপর অভিষিক্ত হইয়া আসিতেছেন। রেণী সাহেব বলেন উড়িষ্যা ও আসাম পর্য্যন্ত বার ভূঞাদের জমিদারী বিস্তৃত ছিল। ডাক্তর বুকানন * ও কর্ণেল ডাল্টনও † আসামে বার ভূঞার জমিদারীর উল্লেখ করিয়াছেন। সংপ্রতি আমরা ক্রমান্বয়ে ভৌমিকদিগের বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

(১) চন্দ্রদ্বীপে কন্দর্পনারায়ণ রায়।

কন্দর্পনারায়ণ ও তদীয় উত্তরাধিকারীদিগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। 'চন্দ্রদ্বীপ' এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি প্রবাদ আছে।

প্রথম প্রবাদটি এই। পরগণা বিক্রমপুরের দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত তখন সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী কোনও গ্রামে চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ভগবতী মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন; ঘটনাক্রমে তিনি যে রমণীর পাণি-গ্রহণ করেন, তাঁহার নামও ভগবতী ছিল। চন্দ্রশেখর পূর্ব্বে একথা জানিতে পারেন নাই। যখন সে কথা জানিলেন, তখন চন্দ্রশেখর নিতান্ত শঙ্কিত ও স্তব্ধীভূত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি আমি পত্নীর উপাসক হইলাম? ইহা শুনিলে লোকে কি আমাকে নিতান্ত স্ত্রৈণ বলিয়া উপহাস করিবে না? অথবা আমার ইষ্টদেবতার নামে যে রমণীর নাম, তাঁহার সহিত কেমন করিয়াইবা পত্নীভাবে ব্যবহার করিব? ব্রাহ্মণ উভয় সঙ্কটে পড়িয়া অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন, প্রাণই পরিত্যাগ করিব। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত চন্দ্রশেখর একদা রজনী যোগে একখানি তরণীতে আরোহণ পূর্ব্বক অকূলার্ণবে ভাসিলেন। যামিনী প্রভাতে দেখিতে পাইলেন, নৌকা ভাসিতে ভাসিতে সমুদ্র মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কোনও দিকেই তীরদর্শন হয় না। কুত্রাপিও জনমানবের সমাগম নাই, যতদূর চান, যেদিকে চান কেবল বারিনিধির নীলাম্বু ধুধু করিতেছে। চন্দ্রশেখর প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় অকস্মাৎ দেখিতে পাইলেন, একটি ষোড়শী ধীবর-দুহিতা একটি ক্ষুদ্র তরণী বাহিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ব্রাহ্মণ দেখিয়া অবাক্। ধীবরকন্যাকে ডাকিয়া কহিলেন "তুমি রমণী হইয়া একাকিনী এই অকূলসাগরে কি সাহসে আগমন করিয়াছ? তোমার অসম সাহস দেখিয়া আমি

* পূর্ব্ব ভারতবর্ষ, ২য় বলেম ৬১২পৃষ্ঠা।
† বাঙ্গালার প্রাচীনতত্ত্ব ৮১পৃষ্ঠা।

অবাক্ হইয়াছি।" ধীবর-পুত্রী হাসিয়া কহিলেন "মহাশয়, আমি জেলের মেয়ে জাতব্যবসা কত্তে এসেছি, তাতে আবার ভয় কি? আপনি ব্রাহ্মণ হয়ে একাকী সমুদ্রে এসেছেন, আপনারইত দেখ্‌তে পাচ্ছি অসম সাহস।" ব্রাহ্মণ ধীবরকন্যার নিকট আপনার দুঃখের কথা কহিলেন। সে বলিল "ঠাকুর, তোমাকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি, আচ্ছা পাগল। তোমরাই না বলে থাক, শক্তীরূপিণী ভগবতী সকল স্ত্রীতেই বিরাজ করেন? তবে আবার ইষ্টদেবতার নামে স্ত্রীর নাম দেখিয়া মরিতে এসেছ কেন?" সামান্য বালিকার মুখে এইরূপ উন্নত শাস্ত্র-মর্ম্ম শুনিয়া চন্দ্রশেখর মনে মনে নিশ্চয় করিলেন, এ কখনও ধীবরকন্যা নহে, আমাকে উপদেশ দিবার জন্য স্বয়ং ভগবতীই ছদ্মবেশে উপস্থিত। তখন তিনি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ধীবরকন্যার নৌকাতে উঠিয়া, একবারে তাঁহার চরণে পতিত হইয়া কহিলেন, "মা তুমি কে? আমায় পরিচয় দেও।" ধীবরকন্যা অনেকক্ষণ ব্রাহ্মণকে প্রতারিত করিতে চেষ্টা করিলেন, ব্রাহ্মণ কিছুতেই ভুলিল না। তখন তিনি কহিলেন "আমি তোমার ইষ্টদেবতা ভগবতী। সন্দেহ দূর কর, গৃহে প্রত্যাগমন কর। আমি বর দিতেছি, এই স্থান চররূপে পরিণত হইয়া তোমার নামে প্রসিদ্ধ হইবে, তুমি ইহা সুখে অধিকার করিবে।" এই বলিয়া ভগবতী অন্তর্হিতা হইবামাত্র সেই স্থানে চর পড়িল। ভগবতীর আদেশানুসারে চন্দ্রশেখর তাহার নাম চন্দ্রদ্বীপ রাখিলেন।

দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামে একজন সন্যাসী আপন ভৃত্য দনুজমর্দ্দনদের সহিত দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেন। একদা তিনি রাত্রিকালে এক নৌকায় নিদ্রিত আছেন, এমন সময় ভগবতী আসিয়া তাঁহাকে স্বপ্নে কহিলেন, তোমার নৌকার তলে কতকগুলি বিগ্রহ আছে, তাহা তুমি উত্তোলন কর। পর দিন প্রাতে চন্দ্রশেখর দনুজমর্দ্দনকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে, দনুজমর্দ্দন তিনডুবে তিনটি দেবমূর্ত্তি উত্তোলন করেন। মাধবপাশার রাজবাটিতে অদ্যাপি সেই বিগ্রহ তিনটি বর্ত্তমান আছে। তাহার একটির নাম কাত্যায়নী, আর একটির নাম মদনগোপাল। কথিত আছে চতুর্থবার ডুবদিলে দনুজমর্দ্দন লক্ষ্মীর মূর্ত্তি উঠাইতে পারিতেন, এবং তাহা হইলেই তাঁহার বংশে রাজলক্ষ্মী চিরকাল অচলা হইয়া থাকিতেন। ভগবতীর আদেশ অনুসারে চন্দ্রশেখর দনুজমর্দ্দনকে কহিলেন, এই স্থানে একটি চর পড়িবে; তুমি তাহার নাম চন্দ্রদ্বীপ রাখিও এবং সেই খানে তুমি ও তোমার সন্তানগণ রাজা হইবে।

কোন্ সময়ে দনুজমর্দ্দন চন্দ্রদ্বীপে রাজা হন তাহার নির্ণয় হয় না। ব্রজসুন্দর বাবুর মতে বল্লাল সেনের কিছুকাল পরেই এই ঘটনা সংঘটিত হয়। তাহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, "প্রথমাবধি এ পর্য্যন্ত ১৮ জন রাজা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়াছেন, এবং কায়স্থদিগেরও ২২। ২৩। ২৪ পর্য্যন্ত পর্য্যায় অর্থাৎ বংশ সাধারণতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়।" ব্রজসু-

ন্দর বাবুর মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ স্থাপিত ও দনুজমর্দ্দন তাহার অধিপতি হন। ডাক্তর ওয়াইজ বলেন, "দনুজমর্দ্দন দে বঙ্গীয় কায়স্থদিগের প্রথম সমাজপতি হন, এবং তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।" উক্ত সাহেব আরো বলেন যে, "ইহা অসম্ভব নয় যে স্বর্ণগ্রামের যে দনুজরায়, বুলবান বাদসাহ যখন ১২৮০ অব্দে সুলতান মঘিজউদ্দীনের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তিনি ও দনুজমর্দ্দনদে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হইবেন।" এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে,দনুজমর্দ্দনদের প্রাদুর্ভাব কাল লইয়া এই দুই লেখকের বিশেষ মতদ্বৈধ নাই। যাহা হউক দনুজমর্দ্দন দে ও তদীয় বংশাবলীর বিবরণ বিবৃত করিয়া আমরা প্রবন্ধ দীর্ঘ করিব না। যাঁহাদিগের এ সকল বিষয় জানিবার ইচ্ছা থাকে, তাঁহারা ব্রজসুন্দর বাবুর গ্রন্থ পাঠ করিবেন। নিম্নে দনুজমর্দ্দনদের বংশোদ্ভব চন্দ্রদ্বীপের রাজাদিগের একটি তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

১। রাজা দনুজমর্দ্দন দে।
২। রাজা রমাবল্লভ রায়।
৩। রাজা কৃষ্ণবল্লভ রায়।
৪। রাজা হরিবল্লভ রায়।
৫। রাজা জয়দেব রায়।

দে-বংশীয় পঞ্চমরাজা নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করাতে দেহড়গতি নিবাসী তদীয় দৌহিত্র পরমানন্দ বসু রায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। পরমানন্দের পৌত্র এবং রাজা জগদানন্দের পুত্র রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ই আমাদিগের প্রথম ভৌমিক। অতএব সংপ্রতি কন্দর্পনারায়ণ রায়ের বিষয়ই আমরা বর্ণনা করিতেছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের একটি তালিকা দেওয়া অসঙ্গত বোধ হইবে না। বসুবংশের আদি পুরুষ কান্যকুব্জাগত কায়স্থ পঞ্চমের মধ্যে পূষণ বসু। পূষণ বসু হইতে কন্দর্পনারায়ণ পর্য্যন্ত ১৫ জন। যথা;—

পূষণবসু বা দশরথ বসু
|
দিবাকর বসু
|
বাভট বসু
|
তামাপহ বসু
|
অর্হপতি বসু
|
পুরু বসু
|
ভাই বসু
|
থাক বসু
|
কন্দর্প বসু
|
মার্কণ্ড বসু
|
উষাপতি বসু
|
বলভদ্র বসু
|
পরমানন্দ বসু পরে
রাজা পরমানন্দ রায়।
|
রাজা জগদানন্দ রায়
|
রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়।

দে-বংশীয় রাজারা যেমন বঙ্গজ কায়স্থদিগের সমাজপতি ছিলেন, বসুবংশীয়েরাও তদ্রূপ হইলেন। রাজা পরমানন্দ রায় কুলীন কায়স্থগণ সম্বন্ধে অনেকগুলি নিয়ম করেন। কুলীনদিগের গণনাস্থলে পূর্ব্বে

"ঘোষ" প্রথম, তৎপর ক্রমে বসু, গুহ, মিত্রের উল্লেখ হইত। যথা—

"ঘোষ,বসু,গুহ,মিত্র,কুলের অধিকারী।"

কিন্তু পরমানন্দ রায়ের সময় হইতে প্রথমে বসুর উল্লেখ হইতে আরম্ভ হয়। বসুবংশীয়েরা যে কেবল পূর্ব্ববঙ্গের সমাজপতি ছিলেন, এমন নহে। দক্ষিণ বঙ্গের সমাজপতিও তাঁহারাই ছিলেন। আইন আকবরিতে পরমানন্দ রায় "বাক্‌লার জমিদার-পুত্র" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে আরো লিখিত আছে যে, যখন ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে একটি ভয়ানক ঝড় (Cyclone) হয়, তখন পরমানন্দ রায় দৈবপ্রভাবে অদ্ভুতরূপে রক্ষা পান।

পরমানন্দের পুত্র জগদানন্দ রায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত গল্প আছে। উক্ত রাজা শক্তি উপাসক ছিলেন; তিনি গঙ্গার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যেন অন্তিম কালে গঙ্গাজলে তাঁহার তনুত্যাগ হয়। একদিন রাজা দেখিতে পাইলেন, গঙ্গার (পদ্মার) জল স্ফীত হইয়া, তাঁহার রাজধানী কচুয়া গ্রামাভিমুখে পর্ব্বতাকারে আসিতেছে। তখন জগদানন্দ নিশ্চয় জানিলেন, গঙ্গা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আসিতেছেন। নৃপতি তখন করপুটে গঙ্গাদেবীকে কহিলেন "মাতঃ যদি আমাকে গ্রহণ করিতে আসিয়া থাক, তবে আমাকে তোমার ক্রোড়ে গ্রহণ কর।" গঙ্গাদেবী মূর্ত্তিপরিগ্রহ পূর্ব্বক হস্ত প্রসারণ করিলেন; রাজা পরমানন্দ দেবীর করে আত্মসমর্পণ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি অন্তর্হিত হইলেন, নদীর জল নদীতে সরিয়া গেল। ডাক্তর ওয়াইজ বলেন,তিনি কোন কোন হিন্দুর মুখে শুনিয়াছেন যে, জগদানন্দের নদীতে মৃত্যুর কথা একজন গণক পূর্ব্বেই গণনা বলিয়াছিলেন। জগদানন্দ রায়ের দুহিতা কমলা কচুয়াতে এক সুবৃহৎ বাপী খনন করান, উহা অদ্যাপি কমলাদীঘী নামে বর্ত্তমান আছে।

জগদানন্দের জীবিত কালে, কি তাহার কিয়ৎকাল পরে ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে আকবর সাহর সৈন্যাধ্যক্ষ মুরাদ খাঁ চন্দ্রদ্বীপ জয় করিয়া সাম্রাজ্যভুক্ত করে। জগদানন্দের পুত্র প্রসিদ্ধ কন্দর্পনারায়ণ রায় কচুয়াতেই কতিপয় বর্ষ রাজত্ব করেন। পরে "মগদিগের উপদ্রব উপস্থিত হওয়াতে, রাজা কন্দর্পনারায়ণ ঐ স্থান পরিত্যাগ উচিত বিবেচনা করিয়া বরিশালের পূর্ব্বোত্তর কোণে বাসুবিকাটী গ্রামে এক রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় কিছুকাল বাস করেন। পরে তাহা ত্যাগ করিয়া ঐ জেলার মধ্যে পঞ্চক্রোশের নিকটবর্ত্তী হোসনপুরগ্রামে এক রাজধানী প্রস্তত করেন। তাহার পর ক্ষুদ্রকাটী নামক স্থানে এক রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় কিছুকাল অবস্থান করেন। তৎপর তথা হইতে মাধবপাশা নামক স্থানে উঠিয়া যান। এই স্থানে একজন গাজী উপাধিধারী মুসলমান বাস করিত। তিনি তাহাকে বধ করিয়া তথায় এক রাজধানী নির্ম্মাণ করেন,তাহাই এখন বর্ত্তমান আছে।*

শ্রীজ—

ক্রমশঃ।

* ৺ব্রজসুন্দরমিত্রকৃত চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ।

হিন্দুভুগোল।

(৩৮৪ পৃষ্ঠার পর।)

অষ্টম সংখ্যার শেষভাগে যে সকল নদী ও জনপদের উল্লেখ হইয়াছে, তন্মধ্যে পাঠকেরা একটি বিষয় লক্ষ্য করিবেন। কোন কোনটির দুইবার, কোনটির বা তিনবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে দুইটি অনুমান হয়। প্রথমতঃ একনামে দুই তিনটি স্থান থাকিতে পারে, যেমন সিন্ধু নামে একাধিক নদী দেখাযাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ লিপিকরের প্রমাদবশতঃও এরূপ হইতে পারে। আমরা এ বিষয় পরে বিশেষরূপে দেখাইব। আর একটিকথা, কোন কোন স্থানে একটি স্থান লিখিতে ভিন্নরূপ বর্ণবিন্যাস দেখা যায়। যেমন বাহ্লিক ও বাহ্লীক; শূরসেন ও সুরসেন; কুকুর ও কুক্কুর ইত্যাদি। দুই তিন বার যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দিতেছি।

স্থানের নাম।	কতবার।
সিন্ধুনদ ··· ··· ···	২
করীষিণী নদী··· ···	২
মহানদী ··· ··· ···	২
মন্দাকিনী ··· ···	২
সরস্বতী নদী ··· ···	২
মৎসদেশ ··· ···	২
কলিঙ্গ দেশ ··· ···	৩
মাগধ দেশ ··· ···	২
কুন্তল দেশ ··· ···	৩
সুরসেন দেশ··· ···	২
দশার্ণ দেশ ··· ···	২
কিরাত দেশ ··· ···	২
কেরল দেশ ··· ···	২
সূষক দেশ ··· ···	৩
চীন দেশ··· ··· ···	২
কাশ্মীর দেশ ··· ···	২
পহ্নব দেশ ··· ···	২

ইহার পর সঞ্জয় পৃথিবীর অন্যান্য ভাগের বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন। ইহার অনেক কথা পৌরাণিক ভূগোলের সহিত সমান। যাহাহউক, আমরা উক্ত বিবরণের স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রকটন করিতেছি।

বহু সংখ্যক দ্বীপে এই পৃথিবী ব্যাপ্ত আছে। জম্বুদ্বীপ ১৮৬০০ যোজন বিস্তীর্ণ। লবণ সমুদ্রের বিস্তার ইহার দ্বিগুণ। শাকদ্বীপের বিস্তার জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণ,উহার সাগর লবণ সমুদ্রের দ্বিগুণ। এই সাগরের নাম ক্ষীরসমুদ্র। শাকদ্বীপে মণিভূষিত সাতটি পর্ব্বত; এবং নানা রত্নের আকর বহু নদী আছে। যে সকল পর্ব্বত উহাতে আছে তন্মধ্যে মেরু সর্ব্বপ্রধান। উহার পশ্চিমে মলয় পর্ব্বত; তাহার পূর্ব্বদিকে জলধর পর্ব্বত; তাহার পর উন্নত রৈবতক পর্ব্বত; সুমেরুর উত্তরে শ্যামগিরি। শ্যামগিরির

পর অনেকগুলি পর্ব্বত আছে, তাহাদের বিস্তার উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। এই সকল পর্ব্বতে মহামেরু, মহংকাল, জলদ, কুমুদ, উত্তর, জলধার ও সুকুমার এই সাতটি বর্ষ অধিষ্ঠিত। রৈবত পর্ব্বতের কৌমারবর্ষ, শ্যামগিরির মণিকাঞ্চনবর্ষ, কেদার পর্ব্বতের মোদাকীবর্ষ ইত্যাদি। তাহার পর মহাপুমান্ পর্ব্বত, তাহার পরিমাণ জম্বুদ্বীপের সমান, সেই গিরি শাকদ্বীপের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। তথায় বহুশাখায় বিভক্ত গঙ্গা, সুকুমারী, কুমারী, সীতা, কাবেরকা, মহানদী, মণিজলা, ও চক্ষুবর্দ্ধনিকা নদী সকল প্রবাহিতা।

উত্তর দিকের দ্বীপসমূহে "ঘৃতসমুদ্র, দধিসমুদ্র, সুরাসমুদ্র, ও জলসমুদ্র সন্নিবেশিত আছে। উক্ত দ্বীপ সকল উত্তরোত্তর দ্বিগুণায়ত এবং সমুদ্রে পরিবেষ্টিত।" মধ্যম দ্বীপে গৌরপর্ব্বত এবং পশ্চিম দ্বীপে কৃষ্ণপর্ব্বত আছে। কুশদ্বীপের প্রথম পর্ব্বত গোমন্ত, দ্বিতীয় পর্ব্বত হেমগিরি, তৃতীয় কুমুদ, চতুর্থ পুষ্পবান্, পঞ্চম কুশেশয়, ষষ্ঠ হরি পর্ব্বত। উহাদের পরস্পরের দূরত্ব উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। কুশদ্বীপের প্রথম বর্ষের নাম ঔদ্ভিদ, দ্বিতীয়বর্ষ বেণুমণ্ডল, তৃতীয় সুরথাকার, চতুর্থ কম্বল, পঞ্চম ধৃতিমৎ, ষষ্ঠ প্রভাকর, সপ্তম কাপিল, এই সাতটি বর্ষ প্রধান।

ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চপর্ব্বত; তৎপর বামন, তাহার পর অন্ধকার, তদনন্তর মৈনাক, তৎপর গোবিন্দ, এবং তাহার পর নিবিড় পর্ব্বত বর্ত্তমান আছে। এই সমুদায় পর্ব্বতের পরস্পর দূরত্ব উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে কুশল দেশ, বামনে মনোনুগ দেশ, তাহার পর উষ্ণ দেশ, তাহার পর প্রাবরক দেশ, তাহার পর অন্ধকারক দেশ, তাহার পর মুনিদেশ, এবং তাহার পর দুন্দুভিস্বন দেশ প্রতিষ্ঠিত। ঐ দেশের অধিবাসিগণ সকলেই শুক্লবর্ণ। পুষ্করদ্বীপে পুষ্কর নামে এক মহাপর্ব্বত আছে। শ্বেতদ্বীপের পর সমনামে চতুরস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ মণ্ডল দৃষ্ট হয়।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, আমরা যে সকল দ্বীপ, পর্ব্বত, নদ, নদী, দেশ প্রভৃতির নাম মহাভারত হইতে উপরে উদ্ধৃত করিলাম, তাহার অনেক গুলিই কবিকল্পনা সম্ভূত; এবং ব্যাসদেব ভূতত্ত্বের ভাণ করিয়া ছাই ভস্ম যাহা মনে আসিয়াছে, তাহাই লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ আছে, তাহার অনেকগুলি প্রকৃত, অপরাপর স্থলের যাহা বলা হইয়াছে, ব্যাসদেবের মস্তিষ্ক ভিন্ন তাহাদের অস্তিত্ব আর কুত্রাপিও নাই। যাহা হউক, সংপ্রতি আমরা প্রাগুক্ত স্থান নিচয়ের কয়েকটির যথাসাধ্য নির্দ্দেশ করিতেছি।

মহেন্দ্র পর্ব্বত—করমণ্ডল উপকূলে স্থিত ছিল। এই স্থানে পরশুরাম বাস করিতেন। এই পর্ব্বতশ্রেণী উড়িষ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর সরকার দিয়া গন্দোয়ানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গঞ্জামের নিকট যে অংশ তাহা এখনো মাহিন্দ্রমালী নামে খ্যাত।

মলয়—পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের দক্ষিণাংশ।

শক্তিমৎ—ইহার কিছুই নির্ণয় হয় না। কোন কোন হস্তলিপি গ্রন্থে এই পর্ব্বতের নাম শুক্তিমৎ আছে। এবং সভাপর্ব্বে অ-

র্জ্জুনের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে এক শুক্তিমৎ পর্ব্বতের উল্লেখ আছে।

সহ্য—পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের উত্তরাংশ।

ঋক্ষ—গন্দোয়ানার পর্ব্বতশ্রেণী। অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে এই স্থলে গন্ধমাদনের উল্লেখ আছে। সুতরাং ঋক্ষ ও গন্ধমাদন একই পর্ব্বত বলিয়া অনুমান করা যায়।

পারিপাত্র বা পার্য্যাত্র—বিন্ধ্যাচলের উত্তর ও পশ্চিমাংশ এই নামে খ্যাত ছিল।

মৈনাক—শোণ নদীর উৎপত্তিস্থান এই জন্য উক্ত নদীর অপর নাম মৈনাকপ্রভা।

দেবগিরি—দিওঘর (Deoghur) বা ইলোরা।

ঋষ্যমূখ—দাক্ষিণাত্যে। পম্পাসরোবর ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

শ্রীশৈল বা শ্রীপর্ব্বত—কৃষ্ণা নদীর নিকটবর্ত্তী।

চিত্রকূট—বুন্দেলখণ্ডে স্থিত ছিল। ইহার আধুনিক নাম কাম্‌তা পাহাড়।

গোবর্দ্ধন—মথুরার নিকট।

রৈবত—বিন্ধ্যপর্ব্বতের পশ্চিমাংশ হইতে বিস্তৃত হইয়া যমুনাতট পর্য্যন্ত। হেমচন্দ্রকোষে ইহাকে গির্ণর এবং টড সাহেব ইহাকে আর্ব্বলী পর্ব্বত বলেন।

নীলপর্ব্বত—উড়িষ্যাতে। কাহারও মতে বর্ত্তমান নীলগিরি।

রামগিরি—নাগপুরে ছিল। ইহার আধুনিক নাম রামটেক।

নাগপর্ব্বত—রামঘরের পূর্ব্বদিকে ছিল।

গোমন্ত—পশ্চিমঘাটের প্রাচীন নাম।

অর্ব্বুদ—গুজরাটস্থিত আবু পর্ব্বত।

অতঃপর কতিপয় নদীর পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

সরস্বতী—থানেশ্বরের উত্তর পশ্চিম সারসুতী, কাগার, বা গগ্‌গর নদী।

বাহুদা—মহাভারতের একস্থানে উল্লেখ আছে যে,ইহা হিমালয় হইতে উৎপন্ন। বনপর্ব্বে তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গোপলক্ষে এই নামে দুইটি নদীর উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে একটি বোধ হয় সরস্বতীর নিকট, অপরটি তাহার পূর্ব্বভাগে ছিল। হেমচন্দ্রকোষে ইহার দুইটি নাম আর্জ্জুনী ও শ্বেতবাহিনী। মহানদের একটি প্রধান তোয়দার নাম ধবলী বা ধোলী। হেমচন্দ্র প্রদত্ত নামের অর্থও "শ্বেতবর্ণা"। এই সাদৃশ্য দেখিয়া কর্ণেল উইলফোর্ড সাহেব অনুমান করেন যে,বাহুদা ও মহানদ একই নদী। মহানদ মালদহের কিঞ্চিৎ নিম্নভাগে গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

দৃষদ্বতী—মনুতে উল্লেখ আছে যে, সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যস্থিত দেশের নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। উইলসন সাহেব অনুমান করেন যে,দৃষদ্বতী যমুনার পশ্চিমে ছিল। মহাভারতের তীর্থযাত্রা পর্ব্বে লিখিত আছে;—

"দক্ষিণেন সরস্বত্যা দৃষদ্বত্যুত্তরেণ চ।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিবিষ্টপে॥"

এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে, এই নদী কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণ সীমা ছিল। উক্ত পর্ব্বে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, কুরুক্ষেত্রে প্রবাহিত কৌশিকীর সহিত দৃষদ্বতীর সঙ্গমস্থল একটি প্রধান তীর্থ-স্থান। কর্ণেল উইলফোর্ডের মতে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী উভয়ই হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া একত্র মিলিত হইয়া কাগার

নাম ধারণ করিয়াছে এবং দক্ষিণ পশ্চিম দিগে প্রবাহিত হইয়া মরুভূমিতে লয় পাইয়াছে।

চন্দ্রভাগা—বর্ত্তমান চিনাব।

বিপাসা—বর্ত্তমান বিয়া।

ইরাবতী—বর্ত্তমান রাবি।

বিতস্তা—বর্ত্তমান ঝিলম।

পয়স্বিনী—বিষ্ণুপুরাণ মতে ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। কিন্তু বায়ু ও কূর্ম্মপুরাণে বিন্ধ্য বা সাতপুরা পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হওয়ার উল্লেখ আছে। মহাভারতের এক স্থলে দৃষ্ট হয় যে, কৃষ্ণানদীর উৎপত্তি স্থলে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। অপরস্থলে আছে যে, ইহা দণ্ডকারণ্যের সীমান্ত হইতে প্রবাহিত হইয়াছে, সুতরাং গোদাবরীর উৎপত্তি স্থলের নিকট ইহার উৎপত্তি অনুমিত হয়। ইহা বিদর্ভের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে এবং যুধিষ্ঠির এই নদীতে অবগাহন পূর্ব্বক বৈদূর্য্য পর্ব্বতে এবং নর্ম্মদা নদীতে গিয়াছিলেন। এই সকল বিবরণ হইতে উইলসন সাহেব অনুমান করেন ইহা বর্ত্তমান পাইনগঙ্গা (Payin-ganga) হইবে।

দেবিকা বা দেবা—বর্ত্তমান গোগরা।

বেদস্মৃতা এবং বেদবতী—উভয়ই পারিপাত্র পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। কোন কোন হস্তলিখিত গ্রন্থে বেদবতীর নাম বেদসিনী বা বেতসিনী আছে। ইহারা শণ নদের নিকটে হইবে।

ত্রিদিবা—কূর্ম্ম পুরাণমতে পারিপাত্র হইতে, বায়ুপুরাণমতে মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন।

ইক্ষুমালবী—কোন কোন হস্ত-লিপিতে ইক্ষুমালিনী, কোনটিতে ইক্ষুলা, কোনটিতে কৃমী। বায়ুপুরাণমতে ইক্ষুলা মহেন্দ্রগিরি হইতে উৎপন্ন। মৎস্য পুরাণের ইক্ষুদা ও ইক্ষুমালবী বুঝি একই নদী।

গোমতী—অযোধ্যায় প্রবাহিত।

ধোতপাপা—হিমালয় হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত আছে।

নিশ্চিতা—বায়ু ও মৎস্য পুরাণানুসারে নিশ্চিতা বা নির্ব্বীরা হিমালয় হইতে উৎপন্না। কোন কোন পুস্তকে ইহার নাম মিচিতা এবং নিঃসৃতা।

শরাবতী—অথবা শতাবরী। উইলফোর্ড সাহেব বিবেচনা করেন ইহা বর্ত্তমান বেণগঙ্গা (Ban-ganga)।

পরা—বায়ুপুরাণে ইহার নাম পারা। মালব দেশের পার্ব্বতী নদী হইবে। কোন কোন পুস্তকে ইহার নাম বাণী বা বেণা।

ভীমরথী—বায়ুপুরাণানুসারে সহ্যাদ্রি হইতে উৎপন্না এবং দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিতা। বোধ হয় ইহা অরঙ্গাবাদের বিমা বা ভীমা (Beema) নদী হইবে।

বীণা—তাপী, বা তাপ্তী (তপতী Tapti) নদী।

সুপ্রয়োগা—বায়ুপুরাণ মতে সহ্যাদ্রি হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণদিকে প্রবাহিত।

সিন্ধু—দ্বিতীয় সিন্ধু বা মালবের কালীসিন্ধু। প্রথমটি অদ্যাপি প্রসিদ্ধ (Indus)।

পলাসিনী—কূর্ম্ম ও বায়ু পুরাণমতে শক্তিমান্ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। হিমালয়ের পূর্ব্বাংশ হইতে মহানদের তোয়দা বলাসন নদী উৎপন্ন। তাহা ও পলাসিনী একই নদী হইলেও হইতে পারে।

পাটলাবতী—কোন কোন পুস্তকে পিপ্পলাবতী। যদি ইহা বায়ু পুরাণোক্ত পিপ্পলা হয়, তবে ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন।

সদানীরা—বায়ু ও মৎস্য পুরাণমতে পারিপাত্র পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন।

বিশ্বামিত্রা—বৈদূর্য্য বা দক্ষিণ বিন্ধ্যাচল হইতে উৎপন্ন।

তুঙ্গবেণা—বোধ হয় তুঙ্গভদ্রা (Toombadra) হইবে। ইহার অপর নাম কুবেণা হইবে।

বিদিশা—মালবের বেস (Bess) নদী হইবে। উহা ভিল্‌সা নগরের নিকট বেটোয়ার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

সুবামা—উইলকোর্ডের মতে রামগঙ্গা নদী।

পিচ্ছলা—সোণা নদী মৈনাক, বা অমরকণ্টক হইতে উদ্ভূত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে গঙ্গার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

দুর্গা ও মন্ত্রশিলা—উভয়ই বিন্ধ্যাচল হইতে নিঃসৃতা। মন্ত্রশিলার অপর নাম অন্তঃশিলা।

সুনসা—বায়ুপুরাণে ইহার নাম সুরণা। কূর্ম্ম ও মৎস্যে সুবসা, ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে উদ্ভূতা।

তমসা—ঋক্ষপর্ব্বতোৎপন্ন টন্স (Tonse) নদী।

বরুণা ও অসী—বারাণসীর পূর্ব্ব ও পশ্চিমে প্রবাহিতা ক্ষুদ্র নদীদ্বয় গঙ্গাসহ সম্মিলিতা। এই নদীদ্বয়ই বারাণসী নামের নিদান।

পূর্ণাশা—পারিপাত্র পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। অপর নাম বর্ণাশা।

মন্দবাহিনী—বায়ু পুরাণ মতে শক্তিমান্ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন।

ব্রহ্মাণী—কটকের নদী বিশেষ। ইহাকে ব্রাহ্মণীও কহে। বুকাননের পূর্ব্ব-ভারতবর্ষ নামক পুস্তকে দেখা যায় যে, দিনাজপুরে এই নামে এক নদী আছে। মহাভারতোক্ত ব্রহ্মাণী একটি তীর্থ। সুতরাং শেষোক্ত নদী হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

মহাগৌরী ও দুর্গা—উভয়ই বিন্ধ্যাচল হইতে উৎপন্ন। টলিমীর গ্রন্থে গোয়ারিস নামে মধ্যভারতে একটি নদী দৃষ্ট হয়, উহাই কি মহাগৌরী হইবে?

চিত্রোপলা—বায়ুপুরাণানুসারে ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন।

মন্দাকিনী—মহাভারতানুসারে চিত্রকূট হইতে উৎপন্ন। বায়ু পুরাণ মতে ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। সুতরাং এ দুটি স্বতন্ত্র নদী বলিয়া বোধ হয়।

বৈতরণী—কটকের নদী বিশেষ। মহাভারতে কলিঙ্গ দেশের নদী বলিয়া উল্লেখ আছে।

মুক্তিমতী—মৎস্যপুরাণ মতে শুক্তিমতী ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। কর্ণেল উইলফোর্ড বিবেচনা করেন ইহা কটকের স্বর্ণরেখা বা সুবর্ণরেখা বা সুবর্ণরেখার নামান্তর।

মনিঙ্গা—অপর নাম অনাগা ও সুরঙ্গা। মহাভারত মতে মৈনাক হইতে উৎপন্ন।

লৌহিত্য—ব্রহ্মপুত্রের অংশ বিশেষ।

করোতোয়া—দিনাজপুর ও রঙ্গপুর জিলায় প্রবাহিত পুণ্যতীর্থ বিশেষ। মাঘমাসে করোতোয়া-স্নান হয়।

কুমারী ও ঋষিকুল্যা—বায়ু, মৎস্য ও

কূর্ম্ম পুরাণ মতে শক্তিমান্ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। ঋষিকুল্যার অপর নাম ঋষিকা।

পুণ্যা—অথবা সুপর্ণা। বেহারের পনপন নদী বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, কিন্তু পর্ণানামেও উক্ত প্রদেশে একটি নদী আছে।

সংপ্রতি কতিপয় জনপদের অবস্থিতি ও আধুনিক নাম নির্ণয় করিতে চেষ্টা পাওয়া যাইতেছে। এক্ষণ আমরা উইলসনের বিষ্ণুপুরাণের টীকার সাহায্য লইয়াছি, সংপ্রতি আমরা হুইলারকৃত মহাভারত ও অপরাপর গ্রন্থেরও সাহায্য লইব।

পঞ্চাল—মনুর মতে পঞ্চাল ও কনোজ এক। কিন্তু মহাভারতের মতে দক্ষিণ দোয়াব, অর্থাৎ গঙ্গাযমুনার মধ্যস্থিত প্রদেশ। পঞ্চাল দুইভাগে বিভক্ত—উত্তর ও দক্ষিণ। আদি পর্ব্বে লিখিত আছে যে, দ্রোণাচার্য্য পঞ্চালেশ্বর দ্রুপদকে পরাভূত করিয়া তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লয়েন। পরে গঙ্গার উত্তর পারের অংশ স্বহস্তে রাখিয়া, গঙ্গার দক্ষিণ পারের চর্ম্মণ্বতী পর্য্যন্ত বিস্তৃত অংশ দ্রুপদকে প্রত্যর্পণ করেন। দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী মাকন্দী হইল। কাম্পিল্য নগরও এই অংশে ছিল। উত্তর পঞ্চালের রাজধানী অহিক্ষেত্র বা অহিচ্ছত্র ছিল। তলেমির আদি-সত্রস্ (Adisathrus) এবং অহিচ্ছত্র এক।

কুরুপঞ্চাল—দোয়াব বা উত্তর পঞ্চাল।

শাল্য—রাজাস্থান বা রাজপুতনার একাংশ।

মদ্র—হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে। সুতরাং কেহ কেহ ভোট বা ভুটান বলিয়া অনুমান করেন। শল্য এখানকার রাজা ছিলেন। ইহার অপর নাম মাদ্রেয় জঙ্গল।

শূরসেন—মথুরা। এরিয়ানের সুরসেনি হইবে।

কলিঙ্গ—করমণ্ডল উপকূলের একাংশ। পূর্ব্বোপদ্বীপের উপকথার ক্লিং, এবং তলেমির কলিগ, ও প্লিনীর কালিঙ্গী, এই কলিঙ্গই হইবে।

বোধ বা বাহু—বায়ু পুরাণানুসারে মধ্যভারতবর্ষে ছিল।

মাল—ইহার অপর নাম মালাবর্ত্ত। বায়ু ও মৎস্য পুরাণানুসারে মধ্যভারতবর্ষে। কর্ণেল উইলফোর্ড মেদিনীপুরের অন্তর্গত মালভূম, এবং উইলসন সাহেব ছত্রিশগড়ে স্থিত কোন স্থান বলেন।

মৎস্য—কলিকাতা মেগেজিনের মতে দিনাজপুর, রঙ্গপুর, ও কুচবিহার ইহার অন্তর্গত ছিল।

মুকুট্য—কোন কোন পুস্তকে শুকুট্ট, কুশণ্ড, কুশাঢ্য, কুশল্য ও কিসাধ্য। ইহা মধ্যভারতবর্ষে ছিল।

কুন্তল—মহাভারতের এক কুন্তল মধ্যভারতবর্ষে; দ্বিতীয়টি দাক্ষিণাত্যে। এসিয়াটিক রিছার্চমতে (৯ বং ৪২৭ পৃ) আদনি (Adoni) জিলার যে অংশে কুরগোদ (Curgode) অবস্থিত তাহার প্রতিই এই নাম বর্ত্তে। এতদনুসারে দশকুমারে বিদর্ভের মিত্ররাজ্যের অন্যতম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(কলিকাতা কোয়ার্টার্লি মেগেজিন ১৮২৭ সেপ্টেম্বর)

কাশিকোশল—বায়ু পুরাণ মতে মধ্য

প্রদেশে, এবং রামায়ণ মতে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। কিন্তু নাম দেখিয়া বোধ হয়,বারাণসী ও অযোধ্যার মধ্যে কোন দেশ হইবে।

চেদি—জঙ্গল মহালের অন্তর্গত চন্দৈল, নাগপুরের নিকট। পরে ইহার নাম রণস্তম্ভর হয়।

মৎস্য—কোন কোন পুস্তকে বৎস। কিন্তু বৎস ও মৎস্য দুইটি স্বতন্ত্র দেশ; তৃতীয় প্রস্তাবে দৃষ্টব্য। মৎস্য দেশও দুইটি আছে। একটি জয়পুর, অপরটি গুজরাট সান্নিধ্যে।

করূষ—বায়ু ও মৎস্য পুরাণানুসারে বিন্ধ্যাচলে অবস্থিত।

ভোজ—এই নামে অনেক দেশ। একটি বিন্ধ্যাচলে, একটি ধার রাজ্য, অপরটি পশ্চিম বিহারের ভোজপুর। আবার নর্ম্মদা নদী-তটে রুক্মীরাজ ভোজকোঠ নামে এক নগর স্থাপন করেন, তাহাকেও ভোজ কহে।

সিন্ধুপুলিন্দ—সিন্ধুনদতীরবর্ত্তী আরণ্য প্রদেশ। তলেমির মতে লাঠ বা লারিসের সন্নিহিত নর্ম্মদার তটবর্ত্তী প্রদেশ;খান্দেশ ও গুজরাটের একাংশের নাম পুলিন্দ।

উত্তম—বিন্ধ্যাচলে। অপর নাম উত্তামার্ণ।

দশার্ণ—ছত্রিশগড়।

মেকল—বিন্ধ্যপর্ব্বতে। রামায়ণ মতে আরও দক্ষিণে ছিল।

উৎকল—উড়িষ্যা।

পঞ্চাল—দক্ষিণ পঞ্চাল হইবে।

কৌশিজ—কুশি নদীর তীরে ত্রিহুতের যে ভাগ।

ধুরন্ধর—মহাভারত কর্ণপর্ব্বে যুগন্ধর নামে একটি নগরের উল্লেখ আছে। উহা এবং ধুরন্ধর যদি এক হয়, তবে উহার অবস্থিতি পঞ্জাবে ছিল।

সোধ—রাজপুতনা বলিয়া বোধ হয়। কারণ এখনও সোধ নামে একটি রাজপুত জাতি আছে।

অবন্তী—উজ্জয়িনী।

গোমন্ত—কোন কোন পুস্তকে গোমন্ত। গোওয়ার নিকটবর্ত্তী কঙ্কণ দেশের অংশ।

বিদর্ভ—বেরার ও খান্দেশের অধিকাংশ। বিদর নগরে এই নামের আভাস পাওয়া যায়।

রূপবাহিক—শক্তিমান পর্ব্বত হইতে রূপা নামে একটি নদীর উৎপত্তি হইয়াছে; তাহার নিকটবর্ত্তী কোনও স্থান হইবে।

গোপরাষ্ট্র—দক্ষিণ কঙ্কণের একটি প্রাচীন নাম গোপ বা গোব্। বোধ হয় তাহাই এই স্থান হইবে।

মল্লরাষ্ট্র—অপর নাম বল্লীরাষ্ট্র। ভীমের দিগ্বিজয়ে হিমালয়ের পাদ-দেশে পূর্ব্ব দিকে মল্লভূমির কথা লিখিত আছে। কিন্তু এরিয়ানোক্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মল্লি হইবে বলিয়া বোধ হয়। কেহ কেহ ইহা মহারাষ্ট্রের নামান্তর বলিয়া বোধ করেন।

শক—সিথিয়ান দিগের দেশ। হিন্দুকুশ পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত।

বিদেহ—মিথিলা বা ত্রিহুত।

মগধ—দক্ষিণ বিহার।

স্বক্ষ—অপর নাম সহ্য ও সুহ্ম। ত্রিপুরা এবং আরাকাণ।

মলয়—দক্ষিণ ঘাট।

বিজয়—অন্যান্য স্থলে প্রবিজয় নামে

একটি দেশ দেখা যায়, উহা পূর্ব্বদেশে ছিল।

অঙ্গ—ভাগলপুরের সন্নিহিত দেশ, ইহার রাজধানী চাম্পা ছিল।

বঙ্গ—পূর্ব্ববাঙ্গালা।

মল্ল—ভীমের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে এই নামে দুইটি স্থান দৃষ্ট হয়, উভয়ই পূর্ব্বদিকে। তন্মধ্যে একটি হিমালয়ের পাদদেশে, অপরটি অধিকতর দক্ষিণে।

মাহিক—অপর নাম মাহিষ। পুরাণ সমূহোক্ত মাহিষিক দক্ষিণ দেশে। রামায়ণের মাহিষিকীও দক্ষিণে। সহদেবের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে দক্ষিণ দেশে যে মাহিষ্মতীর উল্লেখ আছে, যদি তাহা ও মাহিক এক হয়, তবে উহার আধুনিক নাম মহিসুর। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে দক্ষিণাভিমুখে এক মাহিষ্মতীর উল্লেখ আছে, উহা নর্ম্মদাতীরস্থ চুলী-মহেশ্বর বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। কাহার কাহার মতে মাহী নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ।

সাশিব—অপর নাম ঋষিক। রামায়ণে উত্তর ও দক্ষিণে এই নামে দুইটি দেশ আছে। কিন্তু উত্তর সাশিবই অর্জ্জুন জয় করিয়া আটটি অশ্ব গ্রহণ করেন। অর্জ্জুন-দিগ্বিজয় প্রসঙ্গ দেখ।

বাহিক—শতদ্রু হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ। বাহ্লীক এস্থলে লিপি প্রমাদ হইবে।

বাটধান—বায়ু পুরাণ প্রভৃতি অনুসারে উত্তরে; কিন্তু নকুলের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে পশ্চিমে দৃষ্ট হয়।

আভীর—পুরাণ সমূহ অনুসারে উত্তরে; রামায়ণ ও মহাভারতানুসারে পশ্চিমে। সুরাট হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সমগ্র স্থান।

কালতোষক—উত্তর প্রদেশে।

অপরান্ত—হিরোডোটসের অপরিতি গান্ধার বলিয়া অনুমিত হয়।

পহ্নব—অপর নাম পহ্লব। ভারতবর্ষ ও পারস্যের মধ্যগত দেশ।

চর্ম্মমণ্ডল—অপর নাম চর্ম্মখণ্ড। বায়ু প্রভৃতি পুরাণ মতে উত্তরে।

মেরুভূত—প্রকৃত নাম মরুভূম, সিন্ধু প্রদেশের নামান্তর।

স্বরাষ্ট্র—প্রকৃত নাম সৌরাষ্ট্র, আধুনিক সুরাট।

কেকয়—বিপাশা নদীর পশ্চিমে।

মাহেয়—মাহী নদীর সন্নিহিত স্থান। অপর নাম কি মাহিক?

কক্ষ—অপর নাম" কচ্ছ। আধুনিক কাচ (Cutch)

অন্ধ—অন্ত্য বা অন্ধ্র। বর্ত্তমান তৈলঙ্গ প্লিনি ইহাকে অন্ধ্রী বলেন।

মাগধ—পূর্ব্ব প্রদেশ বিশেষ। অনেক পুস্তকে ইহার নাম মলদ।

ভার্গব—পূর্ব্ব দেশে।

পুণ্ড্র—নিম্নলিখিত জিলা গুলি ইহার ইহার অন্তর্গত ছিল। রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, নদীয়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুরের একাংশ, জঙ্গল মহাল, রামগড়, পচেতি, পেলামো, এবং চুনারের একাংশ।

ভার্গ—পূর্ব্বদেশে।

নিষধ—বিদর্ভ বা বেরারের নিকট ছিল। নলোপাখ্যান ৯ম অধ্যায়ে নলরাজ দময়ন্তীকে

নিষাদের যেরূপ দিক নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা এই ;—বিন্ধ্য পর্ব্বত ও পয়স্বিনী নদীর নিকট নিষাদ দেশ। অবন্তী, বিদর্ভ ও কোশলে যাইতে হইলে ঋক্ষ পর্ব্বত পার হইয়া যাইতে হয়।

নিষাদ—ভিল জাতি যে স্থানে বাস করে। ইহা অরণ্যময়।

অনর্ত্ত নৈঋত—পশ্চিমে ছিল। কচ্ছ ও গুজরাটের অংশ।

প্রতিমাস্য—মৎস্যদেশের সম্মুখভাগে। প্রতিমৎস্য নামান্তর।

কুশল বা কোশল—রামায়ণোক্ত কোশল সরযূর উভয় তীরবর্ত্তী। মহাভারতে প্রাক্কোশল ও উত্তর কোশল ব্যতীত, পূর্ব্ব ও দক্ষিণে দুইটি কোশলের উল্লেখ আছে। পুরাণাদিতে বর্ণিত কোশল বিন্ধ্যপর্ব্বতসানুতে অবস্থিত। বায়ুপুরাণে ও পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে লিখিত আছে যে, কুশ বিন্ধ্যসানুস্থিত কুশস্থলী বা কুশাবতীতে রাজত্ব করিতেন। কুশের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন বুঝাইবার জন্য রঘুবংশেও ঐ বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী সময়ে অযোধ্যার দক্ষিণের ভূভাগের নাম যে কোশল হইয়াছিল, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। কারণ রত্নাবলী নাটকে উল্লেখ আছে যে, বৎসরাজের সেনানী বিন্ধ্যাচলে কোশলেশ্বরকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। পুরাণে সপ্তকোশলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ছত্রিশগড়ের অন্তর্গত রত্নপুরে একখানি তাম্রলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, কোশলেশ্বর পৃথ্বীদেব মলহরি মণ্ডলের শাসনকর্ত্তা শ্রীদেবকে ৯১৫ সংবতে (৮৫৮ খৃষ্টাব্দে) মন্দিরনির্ম্মাণ, পুষ্করিণী-খনন ইত্যাদি করিবার জন্য এই সনন্দ দিতেছেন। এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, গঙ্গার দক্ষিণ পার পর্য্যন্ত কোশল রাজ্যের সীমা বিস্তৃত ছিল। তলেমির গ্রন্থে দক্ষিণদেশে কোন্তকশুলা (kontakoshula) নামে একটি স্থান দৃষ্ট হয় ;বোধ হয় ইহা সপ্তকোশলের একতম হইবে।

ঈজিক—অপর নাম ইতিক। বোধ হয় দক্ষিণ দেশস্থ বায়ুপুরাণোক্ত ঈষিক বা ঐষিক হইবে।

কাশ্মীর—বর্ত্তমান কাশ্মীর।

হরিদ্বার—বর্ত্তমানেও এই নাম।

মণিপুর—অধুনাও এই নামে পরিচিত।

সিন্ধুসৌবির—পঞ্জাবে ছিল।

গান্ধার—আধুনিক কান্দাহার।

দর্শক—উইলসন সাহেব দ্বারকা মনে করেন।

আভীর—কাশ্মীরের দক্ষিণ পশ্চিমে।

উতূল—অপর নাম উলূত এবং কুলূত ; পশ্চিমে ছিল। রামায়ণের কুলুক বা কৌলুত ইহাই হইবে।

বাহ্লীক—মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে এই স্থান ঘোটকের জন্য বিখ্যাত বলিয়া উল্লেখ আছে। অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে এই স্থান দুরভিগম্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আধুনিক বোখারা ও মৈমান অশ্বের জন্য প্রসিদ্ধ। অতএব অনেকে ইহাকে আধুনিক বল্খ বিবেচনা করেন।

দর্ব্বি—আভীরের নিকট ছিল, অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গ পাঠ করিলে এরূপ বোধ হয়।

সুদামা—এই নামে এক পর্ব্বত রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডেও দৃষ্ট হয়। ইহা পঞ্জাব বা বাহীক দেশে ছিল।

বাতায়ন—রামায়ণোক্ত বনায়ু।

রোমা—রোম রাজ্য কি?

গোপাল-কচ্ছ—পূর্ব্বদেশে ছিল বলিয়া ভীমের দিগ্বিজয়ে দৃষ্ট হয়।

কুরুবর্ণক—রামায়ণোক্ত কুরুজাঙ্গল।

বৈদেহ—নামান্তর দাহ। বোধ হয় সিথিয়ার দাহি হইবে।

তাম্রলিপ্ত—মেদিনীপুর ও তমলুক জিলা চতুর্থ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত একটি বৃহৎ বন্দর বলিয়া প্রসিদ্ধ। দশকুমার চরিত ও বৃহৎ কথায় ইহার উল্লেখ আছে।

ঔড়—উড়িষ্যা।

দ্রাবিড়—মান্দ্রাজ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে সমস্ত করমণ্ডল উপকূল।

কেরল—মালাবার উপকূল।

প্রাচ্য—গঙ্গার পূর্ব্বদিকে।

মূষিক—কোচিন ও ত্রিবাঙ্কোড়।

বনবাসক—তলেমির বনাস্থি। সুন্দজিলায় এখনও এই নগরীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

কর্ণাটক—বা আধুনি কার্ণাটিক।

মাহিষক—মহীসুর।

হস্তিনাপুর—আধুনিক দিল্লীর ৩০ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে ছিল। ভরতাত্মজ হস্তী এই নগর নির্ম্মাণ করেন।

ভিলদেশ—নিষাদ দেশ।

বারণাবত্ত—আধুনিক এলাহাবাদ। ঐ স্থানে এখনও একটি প্রশস্ত সুরঙ্গ আছে, লোকে বলে সেই পথে পাণ্ডবেরা জতুগৃহ হইতে প্রস্থান করেন।

একচক্রা—আরার জিলা।

বিরাট—গুজরাটে। ইহার অপর নাম মৎস্য দেশ। কেহ কেহ বলেন ইহা বাঙ্গলাতে ছিল। এবং হস্তিনাপুর হইতে ইহার দূরত্ব ৩০০ ক্রোশ ছিল।

খাণ্ডবপ্রস্থ—যমুনার তীরে হস্তিনাপুরের দক্ষিণে ছিল। সিথিয়ান ও নাগারা এখানে বাস করিত।

ইন্দ্রপ্রস্থ—দিল্লী ও কুতবের মধ্যে।

কুরুক্ষেত্র—পানিপথ।

প্রভাস—দ্বারকার সান্নিধ্যে।

প্রমিলারাজ্য—মেওয়ার।

চোল—আধুনিক করমণ্ডল উপকূলের দক্ষিণাংশ। ইহার অপর নাম চোলমণ্ডল।

কোঙ্কণ—কঙ্কণ দেশ। এই নামে সাতটি দেশ আছে।

ত্রিগর্ত্ত—উত্তরে ছিল। রাজতরঙ্গিণীতে আছে যে, কাশ্মীর হইতে অনেক দূর নহে। আধুনিক লাহনি।

বক—অপর নাম ব্যক এবং বৃক। বায়ুপুরাণের মতে মধ্যভারতবর্ষে ছিল।

বিন্ধ্যচুলক—অপর নাম বিন্ধ্যপালক ও বিন্ধ্যমূলিক। বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে ছিল।

মল্লব—অপর নাম বল্লভ। রাজপুতানাস্থিত বল্লভী নগর হইবে।

কুলিন্দ—উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ছিল।

কন্টক—কুণ্ডল, করণ্ট, এবং মণ্ডক ইহার নামান্তর। পূর্ব্বদেশে ছিল।

সৃঞ্জয়—অপর নাম পুতিসৃঞ্জয়। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ছিল।

কান্তীক—অপর পুস্তকে কাক। সিন্ধুনদের তীরস্থ দেশ বিশেষ।

তক্ষণ ও পরতক্ষণ—উত্তরপশ্চিমাঞ্চলস্থ পর্ব্বতদ্বয়। রামায়ণে উত্তরে তক্ষণ পর্ব্বতের অবস্থিতি ছিল বলিয়া লিখিত আছে।

যবনদেশ—আইয়নিয়া। এসিয়ামাইনরস্থ গ্রীকদিগকে যবন কহিত।

চীন—চীনতাতার। রামায়ণ, মনুতে এবং পুরাণে এই দেশের উল্লেখ আছে।

কাম্বোজ—রামায়ণ প্রস্তাব দেখ।

পারসিক—পারস্যদেশ হইবে।

দরদ—সিন্ধুনদের উৎপত্তিস্থান সন্নিহিত দর্দ্দিস্থান।

খসীর—খসিয়া পাহাড় হইবে।

গিরিগহ্বর—কাবুল হইতে বাসিয়ান পর্য্যন্ত।

আত্রেয়—দিনাজপুরস্থ আত্রেয়ী নদী সন্নিহিত প্রদেশ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

হুন—ইন্দু সিথিয়া, পঞ্জাবে।

মহাভারতের যে সকল স্থানে রীতিমত ভৌগলিক তত্ত্ব বিবৃত আছে, আমরা অতঃপর সেই সকল স্থানের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম ক্রমে প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে সভাপর্ব্বস্থ পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় হইতে একত্রিংশত্তম অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ধনঞ্জয় প্রথমতঃ অনতিভয়ঙ্কর কর্ম্ম দ্বারা কুলিন্দবিষয়স্থিত মহীপালগণকে স্ববশে স্থাপন করিলেন। অনন্তর কুলিন্দ, কালকূট ও আনর্ত্তদেশ বশীভূত করিয়া তিনি সসৈন্যে মহীপাল সুমণ্ডলকে পরাজয় করেন। তৎপর সুমণ্ডল সমভিব্যাহারে শাকলদ্বীপে ও বিন্ধ্যভূধরসন্নিহিত পার্থিবদিগকে জয় করিলেন।" পরে প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশে "ভগদত্তকে পরাজয় করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া অন্তর্গিরি, বহির্গিরি ও উপগিরি এই সমস্ত স্থান আপন হস্তগত করিলেন।" তদনন্তর পর্ব্বতময় বৃহন্তরাজ্য, পৌরবপুরী, দস্যুনিবাস, পার্ব্বত্যপ্রদেশ, ম্লেচ্ছদিগের নিবাস, কাশ্মীরদেশ, ত্রিগর্ত্ত, দারু, কোকনদ ও অভীসার নগরী অধিকার করিলেন। তৎপর উরগদেশবাসী মহারাজ রোচমানকে পরাজিত করিয়া, এবং সিংহপুরে অগ্নিসংযোগ করিয়া "সুহ্ম ও সুমালা নাম্নী নগরী মন্থন করিতে লাগিলেন।" তদনন্তর বাহ্লীক, দরদ ও কাম্বোজ জয় করিলেন। পরে লোহ, পরম, কাম্বোজ, উত্তরঋষিক, নিষ্কুটপর্ব্বত ও হিমাচল জয় করিয়া ধবলগিরি-পৃষ্ঠে সেনানিবেশ করিলেন। ধবলগিরি অতিক্রম করিয়া দ্রুমপুত্ররক্ষিত কিংপুরুষবর্ষ, গুহ্যকপালিত হাটকদেশ, মানসসরোবরসন্নিহিত গন্ধর্ব্বরক্ষিত দেশসকল অধিকার করিলেন। এবং ঐ "সমস্ত গন্ধর্ব্ব নগর হইতে তিনি তিত্তিরি, কল্মাষ ও মণ্ডুক নামে প্রচুর অশ্বরত্ন করস্বরূপ লাভ করিলেন।" পরিশেষে হরিবর্ষ ও উত্তরকুরু পরাজয় করিয়া অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উত্তর দিকের দিগ্বিজয় সমাপ্ত হইল।

ভীম "পূর্ব্বদিগ্বিভাগে যাত্রা করিলেন এবং অনতিকালমধ্যে পঞ্চাল নগরে উপনীত হইয়া বিবিধ উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক

পাঞ্চালদিগকে স্ববশে আনিলেন। অনন্তর তিনি বিদেহ ও গণ্ডকদিগকে পরাজয় করিয়া অত্যল্পকাল বিলম্বেই দশার্ণদেশ অধিকার করিলেন।” তৎপর ভীমসেন পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়া অশ্বমেধের রোচমানকে পরাজয় করিলেন। তদনন্তর পুলিন্দনগরের সুকুমার ও সুমিত্র ভূপালদ্বয়কে পরাভূত করিয়া, চেদিরাজ শিশুপালের নিকট কর গ্রহণ করিলেন। তৎপর ক্রমে কুমাররাজ্যে শ্রেণীমান্, কোশলাধিপ বৃহদ্বল ও অযোধ্যাধিপতি দীর্ঘযজ্ঞকে পরাস্ত করিয়া, গোপালকক্ষ, উত্তরকোশল ও মল্লাধিপতিকে স্ববশে আনিলেন। পরে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে সমুদায় জলোদ্ভব দেশ অধিকার করিলেন। তদনন্তর ভীমসেন ভল্লাট, শুক্তিমান পর্ব্বত, কাশী, সুপার্শ্ব, মৎস্য, মলদদেশ ও পশুভূমি সকল জয় পূর্ব্বক, তথা হইতে প্রতিগমন করিয়া মদধার, মহীধর, সোমধেয়দিগকে পরাভূত করিলেন। অতঃপর উত্তরাভিমুখে যাইয়া বৎসরাজ, ভর্গাধীশ্বর, নিষাদপতি,মণিমান প্রভৃতি মহীপালদিগকে জয় করিতে লাগিলেন। পরে ক্রমে দক্ষিণ মল্ল, ভোগবান্ পর্ব্বত, শর্ম্মক, বর্ম্মক, বৈদেহক, জগতীপতি জনক ও শকর্ব্বরাদিগকে আত্মবশে আনিলেন। পরিশেষে সপ্তবিধ কিরাত, সুহ্ম ও প্রসুহ্মকদিগকে জয় করিয়া গিরিব্রজে যাত্রা করিলেন। তথায় জরাসন্ধতনয়কে হস্তগত করিয়া ও অঙ্গাধিপতি কর্ণকে পরাস্ত করিয়া, পর্ব্বতবাসী রাজগণকে বশীভূত করিলেন। মোদাগিরির রাজাকে সমরে সংহার,পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছবাসী মৌনজা রাজার পরাজয় সাধন করিয়া বঙ্গরাজ্যে গমন করিলেন; এবং তথায় সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বটাধিপতি প্রভৃতি এবং মহাসাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন। অবশেষে মহারাজ লৌহিত্যকে পরাভূত করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন।

সহদেব দক্ষিণদিকে গমন করিয়া মথুরা, মৎস্যদেশ, নিষাদভূমি, গোশৃঙ্গপর্ব্বত, নররাষ্ট্র ও কুন্তি-ভোজ জয় করিয়া চর্ম্মণ্বতীতীরে জম্ভকাত্মজকে সমরে পরাভূত পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় সেক ও অপরসেকদিগকে পরাজয় করিয়া নর্ম্মদা নদী অভিমুখে গমন করিলেন। তদনন্তর অবন্তীদেশ ও ভোজকটপুর অধিকার করিয়া কোশলাধিপতি, বেন্না নদীর তীরস্থ নৃপতি আরণ্যক ও অযোধ্যার পূর্ব্বাংশের অধীশ্বরদিগকে পরাজয় করিলেন। “তৎপরে নাটকেয় ও হেরম্বকদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মারুধ ও মুঞ্জগ্রাম বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। তৎপরে নাটবিক, নর্ব্বুক ও সেই সমুদায় আরণ্যক নৃপতিদিগকে জয় করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাতাধিপতিকে হস্তগত ও পুলিন্দদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সহদেব দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাণ্ড্যরাজকে পরাজয় করিয়া দক্ষিণাপথে প্রস্থান করিলেন।” অতঃপর কিষ্কিন্ধ্যানগরী হস্তগত ও মাহেশ্মতী পুরীর নীলরাজের সহিত সখ্য করিয়া, এবং ত্রৈপুররক্ষক ও সুরাষ্ট্রাধিপতিকে পরাজয় করিয়া ভোজকটস্থ রুক্মি ও ভীষ্মকের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের শাসন শিরোধার্য্য করিলেন। তৎপর বাসুদেবের নিকট নানা

দ্রব্যজাত গ্রহণ পূর্ব্বক "শূর্পাকার, তালাটক, ও দণ্ডক দিগকে বশীভূত করিলেন। তদনন্তর সাগরদ্বীপবাসী ও ম্লেচ্ছযোনিসম্ভূত ভূপতি, নিষাদ, রাক্ষস, কর্ণ, প্রাবরণ, নররাক্ষসযোনিজ কালমুখ, কোলগিরি, সুরভী পট্টন, তাম্রাখ্যদ্বীপ, রাসক পর্ব্বত ও তিমিঙ্গিল বশীভূত করিয়া এক পাদ পুরুষ, বনবাসী কেরক, পঞ্চয়ন্তী নগরী ও করহাটক, এই সকলকে কেবল দূতদ্বারা আপনার বশবর্ত্তী করিয়া কর আহরণ করিলেন। পরে পাণ্ড্য, দ্রবিড়, উড্র, কেরল, অন্ধ্র, তালবন, কলিঙ্গ, উষ্ট্র, কর্ণিক, রমণীয়া আটবীপুর, ও যবনপুর, দূতদ্বারা নিজায়ত্ত করিয়া কর সংগ্রহ করিলেন।" তৎপর সমুদ্রের কচ্ছ দেশে অবস্থিতি করিয়া লঙ্কাপতি বিভীষণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন; বিভীষণ পাণ্ডবশাসন শিরোধার্য্য করিয়া নানাবিধ রত্নাদি উপঢৌকন পাঠাইলেন। তৎসমুদায় লইয়া সহদেব ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নকুল খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রোহিতক দেশ জয় করিয়া, মরুভূমি সৈরীষক ও মহেত্থদেশ অধিকার করিলেন। তৎপর "দশার্ণ, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চকর্পট, মধ্যমক, বাটধান ও দ্বিজগণকে পরাজয় করিয়া প্রস্থান করিলেন। পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া পুষ্করারণ্যবাসী উৎসব সঙ্কেতনামকগণকে পরাজয় করিতে লাগিলেন। তৎপর সমুদ্রতীরস্থিত ও জনপদবাসী শূদ্র আভীরগণ,—যাহারা সরস্বতী নদী আশ্রয় করিয়া মৎস্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া পর্ব্বতবাসী সমস্ত পঞ্চনদ, অমর পর্ব্বত, উত্তর জ্যোতিষ, দিব্যকটপুর, ও দ্বারপালকে বশীভূত করিলেন। অনন্তর আজ্ঞাক্রমে রামঠ, হারহূণ, ও প্রতীচ্য ভূপালদিগকে আপনার বশে আনিলেন"। তৎপরে কৃষ্ণ ও যাদবগণের সহিত প্রীতিস্থাপন পূর্ব্বক মদ্রদিগকে পরাজয় করিলেন। অবশেষে সাগরগর্ভস্থ ম্লেচ্ছ, পহ্লব, বর্ব্বর, কিরাত, যবন ও শকদিগকে অধিকৃত করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িল, অত এব আমরা তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গ হইতে ধৌম্যের নিকট যুধিষ্ঠিরের তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণন প্রস্তাবটির স্থূল মর্ম্ম উদ্ধৃত মাত্র করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মহাভারতের আরও বহুল স্থানে বহু জনপদ, নদী, পর্ব্বত কানন প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তাহা ইচ্ছা করিলে পাঠকগণ মূলগ্রন্থ দেখিবেন।

ধৌম্য প্রথমতঃ পূর্ব্বদিগের তীর্থ বর্ণন করিতেছেন;—প্রথম তীর্থ নৈমিষারণ্য; উহার নিকট গোমতী, কৌশিকী, ও ফল্গু নদী, গয়শৈল, ব্রহ্মসরোবর, এবং ভাগীরথী নদীও আছে। দ্বিতীয় প্রধান তীর্থ গয়া; তৎপর আর কয়েকটি ক্ষুদ্র তীর্থের নামও আছে, যথা;—পঞ্চালদেশে উৎপলা নামে বন, কালঞ্জর পর্ব্বত, অগস্ত্য পর্ব্বত, কেদার নামে আশ্রম, কুণ্ডোদ পর্ব্বত, বাহুদা ও নন্দা নাম্নী নদী।

অনন্তর দক্ষিণ দিকের প্রধান প্রধান তীর্থের নাম হইতেছে। প্রথমতঃ গোদাবরী, তৎপর বেণা, ভাগীরথী, পয়োষ্ণী নদী।

পরে বরুণ স্রোতসপর্ব্বতে মাঠরবন, এবং তাহার উত্তরে পবিত্র কণ্বাশ্রমে প্রবেণী রহিয়াছে। শূর্পারকে বেদীতীর্থ, চন্দ্রাতীর্থ, অশোকতীর্থ আছে। পাণ্ড্যদেশে অগস্ত্যতীর্থ, বারুণ তীর্থ, ও কুমারী তীর্থ আছে। তাম্রপর্ণীতে গোকর্ণ হ্রদ, দেবসম পর্ব্বত, ও বৈদূর্য্য পর্ব্বত আছে। সুরাষ্ট্রদেশে চমসোদ্ভেদনতীর্থ, প্রভাসতীর্থ, পিণ্ডারক তীর্থ, উজ্জয়ন্ত পর্ব্বত, এবং ঐ প্রদেশেই দ্বারাবতী নগরী আছে।

তৎপরে পশ্চিমদিকের তীর্থের কথা হইতেছে। অবন্তীদেশে স্রোতস্বতী নর্ম্মদা আছে। তাহার নিকট এক বৈদূর্য্য শিখর আছে, ও শিখরের শির্ষ দেশে এক সরোবর আছে; তাহা হইতে বিশ্বামিত্র নদী নামে এক নদী প্রবাহিত হইয়াছে। তথায় একটি পবিত্র হ্রদ, মৈনাক পর্ব্বত, ও অসিতগিরি আছে। তৎপরে কেতুমালা, গঙ্গাদ্বার, সৈন্ধবারণ্য, ব্রহ্মসরোবর ও পুষ্কর তীর্থ আছে।

তদনন্তর উত্তর দিকের তীর্থ বর্ণন এই রূপে হইতেছে। এই প্রদেশে সরস্বতী ও কোবতী নদী প্রবাহিত হইতেছে, এবং প্লক্ষাবতরণ তীর্থ বিদ্যমান আছে। পরে অগ্নিশিরতীর্থ, দৃষদ্বতী নদী, পলাস তীর্থ, গঙ্গা দ্বার, ভৃগুতুঙ্গ ও বদরীতীর্থের উল্লেখ আছে।

ইতি চতুর্থ প্রস্তাব। শ্রীজ—

মৃণ্ময়ী।

অবতরণিকা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, এই জ্ঞানালোকসম্পন্ন সুসভ্য সময়ে, বিদ্যাভিমানী ব্যক্তিমাত্রেই বিজ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত—বিজ্ঞানের দুরুহ্ধার প্রশ্নসমূহের মীমাংসায় সর্ব্বদাই ব্যাপৃত। সাহিত্য, ইতিহাস ও ব্যবহারতত্ত্বে এক্ষণে সাধারণের পূর্ব্ববৎ আসক্তি নাই। কালিদাসের সুধাময়ী হৃদয়গ্রাহিণী কবিত্বরসমাধুরীতে নিরবচ্ছিন্ন নিমগ্ন থাকিতে, অথবা সেক্সপীয়রের চিত্তরঞ্জক বিচিত্র মানব চরিত্রের অনুধ্যান-জনিত আনন্দসম্ভোগে কেবল নিরত থাকিতে কেহই আর পূর্ব্ববৎ অভিলাষী হয়েন না। ইন্দুমতী বিয়োগে অজরাজের হৃদয়প্লাবিত নয়নজলের সহিত সকলেই অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করেন; সীজরের ভৌতিক মূর্ত্তির রোষকষায়িত লোচন দর্শনে সকলেরই হৃদয় সিহরিয়া উঠে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, মেগাস্থনিস, লিভি, ফার্দ্দুসীর গৌরব এখনও পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; এবং মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, মুসা প্রভৃতি ব্যবহারবিদ্‌গণও জগতে পূজ্য ও সমাদৃত হইতেছেন। মানবহৃদয় চিরদিনই আবেগ বিহ্বল মনুষ্যহৃদয়ের নিগূঢ়ভাবলহরীতে হাবু ডুবু খাইবে; রাজনৈতিক ও সমাজতত্ত্বের অনুশাসনও পৃথিবীর বিলয়কাল পর্য্যন্ত মনুষ্য সমাজ শাসন করিতে থাকিবে। কিন্তু সময় ধর্ম্মানুসারে মানবী মনীষার দিন দিন যতই

বিকাশ হইতেছে, ততই বাহ্যজগতের প্রতি মানবমণ্ডলীর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দৃষ্টি পড়িতেছে। লোকে এক্ষণে আর শুদ্ধ জ্ঞানের জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না; শক্তির সম্মিলনে, সেই জ্ঞানের বিশ্বব্যাপিনী কল্যাণীমূর্ত্তি চাহে। আধ্যাত্মিক-সৌন্দর্য্য আধিভৌতিক সৌন্দর্য্যের সহিত সম্মিলিত না হইলে যে সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতা হয় না, এই অত্যুদার স্থষ্টির রহস্য ক্রমে লোকচিত্তে প্রবেশ করিতেছে। বাহ্যজগৎ বা শক্তি অন্তর্জগৎ বা জ্ঞানকে সজীব করিলেই সমস্ত জীবলোক সজীব হইয়া উঠে, এবং জীবলোকের সজীবতাই বিশ্বজনীন অভ্যুদয়। ক্রমে সেই অভ্যুদয়ের দিকেই লোকের দৃষ্টি পতিত হইতেছে। লোকে এক্ষণে আর পুস্তক পাঠ করিয়া কেবল মনকে প্রফুল্ল করিতে চাহে না; জ্ঞানের ওজস্বী প্রভাব কেবল আন্তরিক বৃত্তিসমূহের ঔজ্জ্বল্য ও পুষ্টিসাধন করিয়াই যথেষ্ট হইল বলিয়া মনে করে না। যেসমস্ত বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্য নবাবিষ্কৃত যন্ত্রাদি দ্বারা পরীক্ষা করত ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত, এবং গণিতের অখণ্ডনীয় প্রমাণদ্বারা বোধ ও ধারণাশক্তির বিষয়ীভূত করাযায়, যাহাতে আন্তরিক বৃত্তিপরম্পরা ও বহিরিন্দ্রিয় উভয়েই পরিতৃপ্ত হয়, মানবগণ এক্ষণে একাগ্রচিত্তে সেই দিকেই চলিয়া পড়িয়াছে। কি বালক, কি তরুণবয়স্ক, কি বৃদ্ধ সকলেই এক্ষণে বিজ্ঞানের পক্ষপাতী। বোধোদয়পাঠনিরত স্থকুমারমতি শিশু হইতে কণাদ, গৌতম, কোম্‌ত, মীল প্রভৃতি অধ্যয়নকারী তেজস্বীবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই বিজ্ঞানানুশীলনে নিযুক্ত আছেন। বিজ্ঞান-বিষয়ক বিবিধ পুস্তক মানবসমাজে প্রকাশিত হইয়া দিন দিন বিজ্ঞান শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। বিজ্ঞানতরুর একটি প্রধান শাখা জ্যোতিষতত্ত্বের সিদ্ধান্ত ও গণিতভূগোলের পুষ্টিসাধনে এক্ষণে অনেকেরই যত্ন দেখা যাইতেছে। ভূতধাত্রী ধরিত্রী, এবং ব্যোমাবলম্বী নক্ষত্রপুঞ্জ সম্বন্ধে সকলেই দুই এক কথা বলিতে চাহেন; এবং অনেকেই, ইহার স্বরূপ, প্রকৃতি ও কার্য্যকলাপ বিষয়ক বিবরণ পরম্পরা অবগত হইতে একান্ত ইচ্ছুক। আমরা সেই তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকদিগের উদ্দীপ্ত কৌতুহল যথাকথঞ্চিৎ পূর্ণ করিবার মানসে এই সময় হইতে বিজ্ঞান-বিষয়ক দুই একটি প্রবন্ধ লিখিব মনন করিয়াছি। অদ্য ‘ মৃণ্ময়ীর ’ অবতারণা করা গেল।

হঠাৎ শীর্ষস্থ প্রবন্ধটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, পাঠক হয় ত মনে করিবেন, লেখক বুঝি বিজ্ঞান লিখিতে গিয়া নভেল লিখিতে আরম্ভ করিলেন! নতুবা এ রমণীকুলপ্রচলিত নায়িকার নাম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের শিরোভূষণ হইল কেন? লেখক কি পৃথিবীর অন্য কোনও নাম খুঁজিয়া পাইলেন না। এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই বলিব যে, ইহা নূতন নাম নহে, এবং অসঙ্গত বলিয়াও বোধ হয় না। মৃত্তিকাই পৃথিবীর প্রধান উপাদান, এবং পৃথিবী মৃত্তিকা দ্বারাই সংগঠিত; স্থতরাং পৃথিবীকে ‘ মৃণ্ময়ী ’ নামে অভিহিত করিলে ব্যাকরণদুষ্ট বা যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। অথচ পাঠকের মনে এক নূতন ভাবের উদয় হয়। এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়াই আমরা পৃথিবীকে

এই নায়িকা-সমুচিত রমণীয় নামে নামকরণ করিলাম। এক্ষণে এই বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনিচয় পাঠকবর্গের চিত্তবিনোদন করিবে কি না তাহা ভবিষ্যতের উদরকন্দরেই নিহিত রহিল।

প্রথম চিত্র।

সূচনা।

মৃণ্ময়ী পৃথিবী চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ এই ত্রিবিধ পদার্থেরই প্রসূতি। ইহার কোথায়ও জনাকীর্ণ সুরম্য হর্ম্ম্যপূর্ণ নগর, কোথায়ও বা শ্যামলশস্যপূর্ণ কান্তার; কোনও স্থানে পাদপবিহীন বালুকাপূর্ণ বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কুত্রাপি তরুলতাপরিশোভিত শ্বাপদকুলসঙ্কুল নির্জন বনপ্রদেশ, কোথায়ও স্নিগ্ধবারিকণাবিকারিণী গিরিনির্ঝরিণী, কোনও স্থানে উপলখণ্ডমণ্ডিত বন্ধুর উপত্যকা ভূমি, কুত্রাপি অত্যুচ্চ অভ্রভেদী পর্ব্বতশ্রেণী, আবার কোথায়ও বা ভীষণতরঙ্গায়িত অতলস্পর্শ মহাসমুদ্র। পৃথিবীবক্ষে অবস্থান করিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে আমরা নীলাকাশ নয়নগোচর করি, চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলে আবার বোধ হয়, যেন ঐ নীলাকাশ সকল দিকেই পৃথিবীপ্রান্ত সংস্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। দিবাভাগে জগৎলোচন সহস্ররশ্মি প্রখর করজাল বিস্তার করিয়া ভুবন আলোকিত ও তেজঃপূর্ণ করিল, এবং নিশাগমে অসংখ্য হীরকখণ্ড সদৃশ নক্ষত্রমালা নীলাকাশের অপূর্ব্ব শোভা সংবর্দ্ধন করিতে থাকে। প্রতিপচ্চন্দ্রমা কলানুক্রমে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে পৌর্ণমাসীর রজনীতে পূর্ণাবয়ব ধারণকরতঃ স্বকীয় সুবিমল শুভ্ররশ্মি বিস্তার পূর্ব্বক নক্ষত্রপুঞ্জকে নিষ্প্রভ ও মলিন করিয়া তুলেন। আমরা প্রতিদিনই প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত আকাশে সূর্য্য দেখিতে পাই; কোনও কোন দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় সূর্য্য দৃষ্টিপথের অতীত হইলেও একেবারে তদীয় আলোক ও তেজ লাভে বঞ্চিত হই না; কিন্তু প্রতি মাসে এক রাত্রিতে মাত্র পূর্ণচন্দ্র দেখি, এক রাত্রিতে একেবারেই চন্দ্র দেখিতে পাই না, এবং মাসের অবশিষ্ট কাল চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি দেখিয়া থাকি। কি দিবসে, কি রাত্রিযোগে গগনের যেরূপ অবস্থা আমরা এখন দেখিতেছি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পুরুষপরম্পরায়ও সেইরূপ দেখিয়া গিয়াছেন, এবং আমাদের বংশাবলীও সম্ভবতঃ সেইরূপ দেখিতে থাকিবেন। বস্তুতঃ পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে দেখিলে বিমানচারী পদার্থপুঞ্জের কোনও বিশেষ রূপান্তর হয় না। পৃথিবীপৃষ্ঠে বাস করিয়াও পৃথিবীর কোনও বিশেষ রূপান্তর আমরা দেখিতে পাই না। যে যমুনাপুলিনে যদুপতি গোপিনীমোহন বংশী ধ্বনি করিয়া গোপাঙ্গনাকুল আকুল করিয়া তুলিতেন, আজও সেই যমুনাপুলিন সেই এক স্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে; ভাগীরথী অদ্যাপিও সেই ভগীরথের খাত বিধৌত করিয়া সাগরোদ্দেশে যাইতেছেন; আজও সেই গগনভেদী হিমাচল পূর্ব্ববৎ ভারতের উত্তর সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। পুরাকালে বেদপরায়ণ আর্য্যেরা যখন মধ্য আসিয়া হইতে আগমন পূর্ব্বক ভারতে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহারা যে যে স্থলে হিমাচল ও

বিন্ধ্যাচল অবস্থিত দেখিয়াছিলেন, আমরাও সেই সেই স্থলে ঐ দুই পর্ব্বত অবস্থিত দেখিয়াছি; তাঁহাদের আগমন কালে গঙ্গা ও যমুনা যেরূপে প্রবাহিত হইত, এখনও ঠিক তদ্রূপই হইতেছে; এবং আমাদের পুরুষপরম্পরা অতীত হইয়া গেলেও সম্ভবতঃ ঐসকল প্রকৃতিপুঞ্জ যেমন আছে তেমনই থাকিবে। এজন্য আমরা মনে করি পৃথিবী, পার্থিব পদার্থ নিচয়, আকাশ ও আকাশের অধিবাসী গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি পদার্থপুঞ্জ চিরকালই একভাবে রহিয়াছে। কিন্তু প্রপঞ্চ জগৎ, ও জগতের প্রকৃতিপুঞ্জ নৈসর্গিক নিয়মের বশবর্ত্তী। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিপুঞ্জের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবি। জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রতি মুহূর্ত্তেই সংঘটিত হইতেছে। পদার্থের বিনাশ নাই বটে, কিন্তু উহার রূপান্তর অনিবার্য্য। ভূতধাত্রী ধরিত্রীর যে দিকেই আমরা দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই প্রকৃতির এই অমোঘনিয়ম পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, পৃথিবীর কোনও লোকাকীর্ণ জনপদ অরণ্যে এবং শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী জনপদে পরিণত হইতেছে। কোনও পার্ব্বত্য প্রদেশ মহাসমুদ্র হইয়া যাইতেছে এবং অতলস্পর্শ মহাসমুদ্র হইতে বিপুল গিরি উত্থিত হইতেছে। কোথাও দ্রুতগতী স্রোতস্বতী বালুকাপূর্ণ হইয়া সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। আবার কোথাও নূতন নদী প্রবাহিত হইয়া তীরভূমিকে নানাবিধ শস্যরত্নে বিভূষিত করিতেছে। সত্য বটে, এসকল পরিবর্ত্তন একদিনে সংঘটিত হয় না, এসকল সম্পন্ন হইতে যুগযুগান্তর অতিবাহিত হইয়া যায়। অল্পদিনেই হউক, আর অধিক দিনেই হউক জগতের ও পৃথিবীর যে রূপান্তর হয় সে বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

মনুষ্যের জীবন অত্যল্প কাল মাত্র স্থায়ি, এ অত্যল্পকালেও আমরা কিয়ৎপরিমাণে পূর্ব্বোক্তরূপ পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। পদ্মাতীরস্থ ব্যক্তি মাত্রেই অহরহঃ এরূপ পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এক রাত্রিতেই এক স্থানে ২। ৩ খানী গ্রাম একেবারে ঐ দুর্দ্দান্ত নদীর কুক্ষিগত হইয়া গেল; আবার কতিপয় বৎসরের মধ্যেই নদীবক্ষে একখানি শ্যামল শস্যপূর্ণ গ্রাম বসিল। যে অপ্রশস্ত তটিনীতটে কালীঘাট অবস্থিত, উহার নাম আদিগঙ্গা প্রসিদ্ধ; ঐস্থান দিয়াই পূর্ব্বে গঙ্গা প্রবাহিত হইত। সুন্দরবনের মধ্যেও মৃত্তিকাখনন কালে সময়ে সময়ে অতি সুন্দর সুন্দর অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস আবার বৃহৎ বৃহৎ পরিবর্ত্তন সংঘটনের প্রমাণ প্রদান করিতেছে।

যখন মনুষ্যের জীবনকালেই পৃথিবীর নানা স্থানে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, মহাসমুদ্র স্থলে পরিণত এবং স্থল মহাসমুদ্রে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন হিমাচল প্রদেশ যে পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতেই পর্ব্বতময় প্রদেশ হইয়া রহিয়াছে, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ ভূবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা বিজ্ঞানের অখণ্ড্য প্রমাণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, হিমাচলের অত্যুন্নত শৃঙ্গও এক সময়ে মহাসমুদ্রের কুক্ষিগত

ছিল। যে পার্ব্বত্য প্রদেশ, সকল সুখের আকর, স্বর্গপুরী বলিয়া পৌরাণিক ইতিবৃত্তে প্রকটিত হইয়াছে, যে রমণীয় প্রদেশ ভারত-বিজয়ী ইংরেজ জাতির আরাম-ভবন হইয়া রহিয়াছে, সেই প্রদেশও অতি দূরবর্ত্তী সময়ে মহাসমুদ্রের অন্তর্নিবিষ্ট থাকিয়া ভীষণ জলচরের আবাসস্থান ছিল।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, জগতের কোনও পদার্থই চিরকাল এক অবস্থায় থাকে নাই ও কখনই থাকিবে না। ব্যোমাবলম্বী পদার্থপুঞ্জ এবং আমাদের মৃণ্ময়ী পৃথিবীও কখনও চিরদিনই এক অবস্থায় থাকে নাই, ও থাকিবে না। পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম; জগতের যাবতীয় পদার্থই প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইতেছে। এ সকল পদার্থ যে ছিল না, এবং থাকিবে না, এ কথা বলিতে পারি না; কারণ পদার্থের বিনাশ নাই; পদার্থ অনন্ত কাল হইতেই রহিয়াছে; তবে আমরা যে অবস্থায় দেখিতেছি, এ অবস্থায় ছিল না ও থাকিবে না। মৃত্তিকাতে বীজ বপন করিলে বীজাঙ্কুরিত হয়; অঙ্কুর হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়; সেই বৃক্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া পুষ্প ফলে সুশোভিত হইয়া পরে শুকাইয়া যায়, এবং হয়ত পরিশেষে লোকের রন্ধন কাষ্ঠ হইয়া ভস্মাবশেষ ও অস্তাকুড়ের মৃত্তিকার সহিত মিলিয়া যায়। আমরা মনে করিলাম বৃক্ষের ঐ পরিণাম হইল, উহা বিলয় পাইল। কিন্তু বাস্তবিক উহা বিলয় পাইল না; রূপান্তরিত হইল মাত্র। যে সকল মূল পদার্থ অতর্কিত ভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিলিত হইয়া ঐ বৃক্ষ উৎপন্ন করিয়াছিল, রাসায়নিক ক্রিয়াপ্রভাবেই আবার উহাদের বিশ্লেষ ঘটায়, অতর্কিত ভাবেই উহারা স্থানান্তরিত হইয়া গেল। প্রাণিজীবনও এইরূপ। জন্ম, যৌবন ও মৃত্যু এই তিন অবস্থায়ই পরিবর্ত্তনশীল। তরুলতা প্রভৃতি উদ্ভিদই হউক, কি শরীরী জীবই হউক, সকলেই পরিবর্ত্তনশীল। জড়পদার্থের কতকগুলি পরমাণু-সমষ্টির মিলনে উৎপত্তি ও উহাদের বিশ্লেষণে বিনাশ; অর্থাৎ উৎপত্তি বা বিনাশ উভয়ই পদার্থের রূপান্তর মাত্র। কতিপয় মূল পদার্থ পরস্পর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংমিলিত ও বিয়োজিত হওয়ায় পৃথিবীস্থ যাবতীয় জড়পদার্থের অহরহঃ উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে। যে সকল মূল পদার্থের মিলনে জগতের সৃষ্টি, তাহাদের আদি নাই, অন্ত নাই, ক্ষয় নাই, ও বিলয় নাই। নানা সময়ে অভিনব নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উহারা সংসারে নানা রূপ লীলা খেলা করিতেছে। বিশ্বব্যাপী ঐ সকল মূল পদার্থ অণু বা পরমাণু আকারে কখন যে কোথায় যাইতেছে ও কি করিতেছে তাহার কিছুই ইয়ত্তা নাই। যে সকল মূল পদার্থের পরমাণু পরস্পর মিলিত হইয়া সেই বৃক্ষটি উৎপন্ন করিয়াছিল, তাহাদের কোন কোনটি হয়ত কোনও কালে জীব-শরীরে কিংবা সূর্য্য বা চন্দ্র-মণ্ডলে বিরাজ করিতেছিল, এবং পুনর্ব্বার বা তাহাই করিবে। পদার্থের বিনাশ নাই, প্রাণত্যাগ হইলে, অথবা শরীর ভস্মাবশেষ হইয়া গেলেও, আমাদের শরীরের উপাদান অবিনষ্ট থাকিবে, আবার হয়ত সূর্য্য কি চন্দ্র মণ্ডলে কিংবা অবনীতলে নূতন রূপ প-

রিগ্রহ করিবে, এচিন্তা অতীব আনন্দপ্রদ।

পৃথিবী চিরকাল একরূপ নাই বলিতে গিয়া আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, বর্ত্তমান সময় মৃণ্ময়ীর পূর্ণ বিকাশাবস্থা। মৃণ্ময়ীর উপাখ্যানে মৃণ্ময়ীর কেবল মাত্র বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করিলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই পাঠকদিগের নিকট অপরাধী হইতে হইবে, উপাখ্যানও অসম্পূর্ণ রহিবে। এজন্য আমরা মৃণ্ময়ীর জন্মবৃত্তান্ত পাঠকদিগের নিকট প্রকটিত করিতে চলিলাম।

শ্রীসু—

পাঠ্য এবং পাঠক।

(প্রাপ্ত।)

বঙ্গভাষার বর্ত্তমান অবস্থা কি? বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া যদি বঙ্গভাষার অবস্থা আলোচনায় প্রবৃত্ত হই; যদি ভারতচন্দ্রের সময়ে ভাষার কলেবর যেরূপ ছিল একবার বিবেচনা করিয়া দেখি; যদি পুরুষপরীক্ষা, ছাত্রবোধ, প্রবোধচন্দ্রোদয়, বিদ্যাকল্পদ্রুমের ভাষা পরীক্ষা করি, এবং তাহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাঞ্জল গ্রন্থসকল, অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধসমূহ পাঠ করিয়া দেখি এবং সর্ব্বশেষে ঐ সমস্তের সহিত বঙ্গদর্শন ও আর্য্যদর্শন প্রভৃতি পত্রিকার প্রথম প্রকাশের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তের ভাষা তুলনা করি, তাহা হইলে একবারে যুগান্তর দেখিতে পাইব। বার বৎসরে একযুগ, যদি এই হিসাবে গণনা করা যায়, তথাপি দেখিতে পাইব, প্রত্যেক যুগে যুগে কত উন্নতি, কত পরিবর্ত্তন। পৃথিবীর কোন দেশে, কোন ভাষা এরূপ দ্রুত উন্নত ও গঠিত হয় নাই।

এই উন্নতির কারণ অনুসন্ধান করিতে অধিক দূর যাইতে হইবে না। যেমন বলশূন্য ভারত পরকীয় বলে,—মুসলমান এবং ইংরেজের বলে,—প্রায় সহস্র বৎসর যাবৎ রক্ষিত হইতেছে, এই বঙ্গভাষাও ঠিক সেইরূপ পরকীয় বলে পুষ্ট এবং গঠিত। সংস্কৃত বঙ্গভাষার অস্থিমজ্জা, সংস্কৃত প্রাণ। পারসী এবং অন্যান্য মুসলমান-ভাষাও বাঙ্গালার পুষ্টিসাধনে অল্প চেষ্টা করে নাই। সর্ব্বশেষে ইংরেজী ভাষা বাঙ্গালার উন্নতির জন্য নিয়ত কার্য্য করিতেছে।

সংস্কৃত ভারতবর্ষের সকল অংশে ব্যাপ্ত ছিল; উর্দ্দু, হিন্দী, পারসী ভাষাও সংস্কৃতের নিকট ঋণী। সুতরাং সংস্কৃতভাষা যে বঙ্গভাষার সর্ব্বস্ব হইবে তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে সকল সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিত বঙ্গভাষার বাল্যকালে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থের অধিকাংশই বিভক্তিশূন্য সংস্কৃত হইয়াছে। আবার যাঁ-

হারা পারসী প্রভৃতি ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন, তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থে বহুল পরিমাণ পারসী শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির ব্রজবুলীময়ী বাঙ্গালা ভাষায় উভয়ই মিশ্রিত হইয়াছে। এক্ষণে ইংরেজীর সময়, সমস্ত দেশে ইংরেজী শিক্ষা, সুতরাং ভাষা ও ভাব অনেকাংশে ইংরেজী হইয়া চলিয়াছে।

শ্রীযুত কে, এম্ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি জীবিত গ্রন্থকারগণ মার্জ্জিত বাঙ্গালাভাষার প্রবর্ত্তক।* ইহাঁরা ভাষার গঠনে, অভিধান পূর্ণকরণে এবং ভাষার উন্নতি সাধনে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, বিশেষ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তথাপি বলিতে দুঃখ হয়, বঙ্গভাষার প্রথম ব্যাকরণ কিথ্ সাহেব প্রণীত; এখনও বাঙ্গালা গঠিত হয় নাই; ব্যাকরণ সম্পন্ন হয় নাই। বাঙ্গালা, না সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে পারে, না ইংরেজী ব্যাকরণ আদর্শ স্বরূপ লইতে পারে। এক নূতন ব্যাকরণ হইয়াছে, তাহাও অসম্পন্ন।

আর ভাষা? ভাষার প্রথম দৃষ্টান্ত ভারতচন্দ্রের কাব্য;—তরল, অগভীর, দোষপূর্ণ।† যদিও মেঘনাদবধ প্রভৃতি দুই একখানি মহাকাব্যে বীররস প্রভৃতি দেখিতে পাই, ভাষার স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা জন্য তাহাতেও কবির উন্নত হৃদয় সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয় নাই। কবি দুর্ব্বল ভাষার সহিত যে তাঁহার উন্নত কল্পনার সমাবেশ করিতে গিয়া নিতান্ত অসুবিধার সহিত চেষ্টা করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক পংক্তিতে বুঝা যায়। বৃত্রসংহার মহাকাব্য, কিন্তু তাহাতে তিলোত্তমা মেঘনাদের ছায়াবিশিষ্ট প্রতীয়মান হয়। এজন্য কবি নিন্দনীয় নহেন। তাঁহারও কল্পনা উপযুক্ত ভাষা প্রাপ্ত হয় নাই, বিকাশ হইতেও পারে নাই। কাজেই বাঙ্গালাভাষা গীতিকাব্যময়ী। কাব্যের যে অংশ sentemental অর্থাৎ ভাববহুল তাহাই বাঙ্গালির অধিক প্রিয়। করুণরস বঙ্গবাসীর সর্ব্বস্ব। ‡

* ষড়দর্শনসংবাদ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতার বাঙ্গালা এবং শকুন্তলা, সীতারবনবাস ও বহুবিবাহবাদের বাঙ্গালা একজাতীয় কি? যদি উভয়ই একজাতীয় বলিয়া অবধারিত হয়, তাহা হইলে রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির নাম পরিত্যক্ত হইল কেন? বাঃ সঃ

† এস্থলে কৃত্তিবাস ও কাশীদাসও পুষ্পাঞ্জলি পাইতে পারেন।

"বাঁধা গেল সাগর কটক হলো পার,
দিনে দিনে রাবণের টুটে অহংকার।"

এইরূপ পংক্তিনিচয়কে আমরা খাটি বাঙ্গালা বলিয়া আদর করিতে প্রস্তুত আছি। (সঃ)

‡ "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" অথবা রসই কাব্যের প্রাণ। এমন অবস্থায়, কাব্যানুরাগী বাঙ্গালি যদি কাব্যরসেরই অনুসন্ধান করে, তাহা বোধ হয় খুব অপরাধ নহে। তবে বাঙ্গালার সাধারণ পাঠকবর্গ কোন্ রসের জন্য সমধিক অধীর, এবং তাহারা কিরূপ বাক্যকে রসাত্মক বলে, তাহা প্রবন্ধকারও জানেন, আমরাও জানি। আমাদিগের বিবেচনায় করুণরস বাঙ্গালির সর্ব্বস্ব নহে। এদেশে করুণরসের বিশেষ আদর দেখিলে তত দুঃখিত থাকিবার কারণ ছিল না। (সঃ)

উপন্যাসের কথা বলিব কি? বঙ্গভাষায় উপন্যাস লিখিবার সময় হয় নাই।* বঙ্কিম বাবু বঙ্গের প্রথম উপন্যাসলেখক। বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। বাঙ্গালায় ইংরেজী ভাষার অবতারণ তাঁহা কর্ত্তৃকই প্রথম হইয়াছে। ভাষাও অনেকাংশে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। শুভক্ষণে১২৭৯ সনে তাঁহার বঙ্গদর্শন বাহির হইতে আরম্ভ হয়; সেই হইতে ভাষার নূতন জীবন, নূতন ভাব। বঙ্কিম বাবু কঠিন বৈজ্ঞানিক ভাবও অতি সরলভাবে বুঝাইতে পারেন। তাঁহার লেখনীর নিকট ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত। কিন্তু তথাপি তাঁহার উপন্যাসের সম্পূর্ণ প্রশংসা করিতে পারি না, কারণ এখনও উপযুক্ত উপন্যাস লিখিবার সময় হয় নাই। একে এদেশে ভূমি উর্ব্বরা; আহার্য্য তণ্ডুল, লোকের শরীর ও মস্তিষ্ক উভয়ই দুর্ব্বল,—অধিকক্ষণ কার্য্য করিতে পারে না। তাহাতে আবার বঙ্কিম বাবুর লিখিত উপন্যাস গুলি পাঠকের রুচি সেই তরল পাঠ্যের দিকে এমনই আকর্ষণ করিয়া লয় যে, আর গম্ভীর বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্তি থাকে না। তাঁহার বিষ-বৃক্ষ অনেকেরই বিষ-বৃক্ষ।† শতকরা পঞ্চাশ জন লোক তাঁহার পাঠক। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসে দুর্ব্বল বঙ্গভাষা আরও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল। তাঁহার বীরগণের উজ্জ্বলচিত্রও যেন ভাষার দোষে বঙ্গীয় বাবু হইয়া পড়ে। এ তাঁহার শক্তির

* কেন? বাঙ্গালি পরাধীন এই বলিয়া নাকি? তবে এই এক কথা বলা যাইতে পারে যে, যে দেশের কুল-ললনা প্রণয় ও পরিণয়ে স্বাধীনা নহে,—যেখানে ফুল না ফুটিতেই ফল ফলে, সেখানে প্রণয়রহস্যের প্রকৃতচিত্র অসম্ভব। কিন্তু আমরা ভ্রমর ও রোহিণীর চিত্রদর্শনের পর একথাও মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। এ সকল আলেখ্য যদি সর্ব্বাংশে বাঙ্গালির আলেখ্য এবং প্রণয়ের ভাল ও মন্দ উভয় মূর্ত্তির আলেখ্য না হয়, তাহা হইলে জানি না উপন্যাস কি? অপিচ যাহা আছে, যাহা হইতেছে, উপন্যাস শুধু তাহা লইয়াই গঠিত হয় না। যাহা ছিল ও হইয়া গিয়াছে, উপন্যাসে তাহা থাকিবে,—যাহা হইবে কিংবা হওয়া উচিত, যথার্থ উপন্যাসে তাহারও আদর্শপট আলিখিত হইবে। ইহার এক নিদর্শন আনন্দমঠ, আর এক নিদর্শন প্রতাপের চিত্র। যদি প্রবন্ধকার একথায়ও সায় না দেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিব যে, স্বর্ণলতা অথবা কল্পতরুও কি বাঙ্গালার জন্য অসাময়িক ও অসম্ভব বস্তু? (সঃ)

† বিষবৃক্ষ যে অনেকের পক্ষেই আগাগোড়া বিষবৃক্ষ তাহা আমরা জানি। কিন্তু সুযোগ্য প্রবন্ধলেখকও সে জন্য বঙ্কিম বাবুকে অনুযোগ দেন না, আমরাও বঙ্কিম বাবুর উপর কৈফিয়ত তলব করিতে রাজি নহি। বঙ্কিম বাবু যদি সুব্রাহ্মণের মত ভোজ্যান্ন যোগাইয়া কাহাকেও উকীল নিযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে সে যাহা বলিত, এক জন পুরাতন কবি অনেক দিন হয়, তাহা বিলাপচ্ছলে বলিয়া গিয়াছেন,

"ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতরতানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥" (সঃ)

দোষ নয়, কল্পনার দোষ নয়। যে কারণে হেম বাবু, নবীন বাবু অধিকক্ষণ উচ্চে থাকিতে পারেন না, ঠিক্ সেই কারণেই বঙ্কিম বাবুর গদ্য-কাব্যের উদ্দেশ্যও সফল হয় না। রমেশ বাবুর উপন্যাসে বঙ্কিম বাবুর গুণ নাই, দোষও নাই। তিনি ভাষা উন্নত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; কারণ ভাষা এখনও উপন্যাসের উপযোগী নয়।

আমার ইহা বলিবার উদ্দেশ্য নহে যে, তরল ভাষা উপন্যাসের অনুপযুক্ত। বরং তরল ভাষাই অনেকাংশে উপযোগী। কিন্তু বঙ্গভাষা এখন তরল করিবার সময় হয় নাই। বঙ্গে পাঠক নাই। পাঠক সম্প্রদায়ের মন গঠন করিতে, অধ্যয়নের অভ্যাস করিতে এক্ষণে যে সকল বিষয়ে অধিক চিন্তাশীলতার আবশ্যক, বঙ্গভাষায় সেরূপ পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। বঙ্গভাষায় একখানিও উপযুক্ত ইতিহাস নাই। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান নাই। বঙ্গভাষার অনেক অভাব। বঙ্কিম বাবু, রমেশ বাবুর ন্যায় শক্তিশালী ব্যক্তি ইতিহাস অথবা বিজ্ঞানের প্রতি মনোনিবেশ করিলে যে পরিমাণ দেশের উপকার করিতে পারেন, শত উপন্যাসেও তাহা হইবে না।*

গীতিকাব্য এবং উপন্যাসে বঙ্গীয় পাঠককে এমনই তরলপ্রকৃতি, এমনই দুর্ব্বল করিয়াছে যে, গম্ভীর বিষয়ে তাঁহাদের মন প্রবেশ করে না। * * * * * * * * * * * * * * * চারুপাঠ তৃতীয়ভাগ কয় জনে ক্রয় করিত? বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার, ধর্ম্মনীতি, ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়, বিজ্ঞানরহস্য, বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত, সাঙ্খ্যদর্শন, ন্যায় পদার্থতত্ত্ব, ঐতিহাসিক রহস্য, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস, জয়দেবচরিত, রাজস্থানের ইতিহাস † কয়খানা বিক্রয় হয়? অথচ ঐ সমস্ত যে অতি উৎকৃষ্ট এবং অবশ্যপাঠ্য পুস্তক একথা কে অস্বীকার করিবে? ‡

বাঙ্গালা ভাষার পাঠকের সংখ্যা অল্প। তাহারাও আবার অনেকে দরিদ্র; পুস্তক অন্যের নিকট হইতে লইয়া পাঠ করাই বার আনা পাঠকের অভ্যাস। পুস্তকাগার অতি অল্প, প্রশংসনীয় লাইব্রেরী কয়টি আছে? তাহাতে আবার পুস্তক ক্রয় করিতে যাহার যে সংস্থান আছে, তাহা যদি 'সরবৎ' পানে ব্যয় হয় তবে পুষ্টিজনক খাদ্যের জন্য উপায় কি?

আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, অনেক কৃতবিদ্য

* শরীরের সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণতার জন্য অস্থি পঞ্জরেরও যেমন প্রয়োজন, রক্তমাংস এবং শোভা-সৌন্দর্য্যেরও তেমনই প্রয়োজন। ইহার কোন্‌টি পরিত্যজ্য? (সঃ)

† এই তালিকার মধ্যে বিবিধ সমালোচন, শকুন্তলাতত্ত্ব, তত্ত্ববিদ্যা এবং সাম্য প্রভৃতি পুস্তকের নামগুলিও সন্নিবেশ করা বোধ হয় উচিত ছিল। (সঃ)

‡ এইবার আমরা লেখককে অভিবাদন করি। তিনি যদি শ্লথচিত্ত বাঙ্গালিকে এই সকল পুস্তক পড়াইতে পারেন, তবে বলিব যে তিনি বীর। কিন্তু বাঙ্গালায় শীঘ্র সে আশা বৃথা। (সঃ)

যুবক প্রাচীনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ স্পর্শও করেন না। বান্ধবে কোন উপন্যাস লিখিত হইত না বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিতেন। কোন কোন প্রবন্ধ-লেখকের প্রবন্ধ লক্ষ্য করিয়া গালি দিতেও শুনিয়াছি।* কালেজে অধ্যয়নের পরও যখন এইরূপ রুচি অনেকে প্রদর্শন করেন তখন আর বঙ্গীয় সাহিত্যের ভরসা কি?

* * * * * * *

* * * * * *

* * * * * * *

বঙ্গীয় পাঠ্য নির্ব্বাচনজন্য কলিকাতায় যে একটি কমিটি নিযুক্ত আছে, সাহিত্য মনোনীত করা তাহার কার্য্য নয়। যাহাতে ভাষার অঙ্গরাগ হইবে তাহাই কমিটির উদ্দেশ্য বহির্ভূত। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

শুনা যাইতেছে শিক্ষাবিভাগের উন্নতি-সাধন, দোষ গুণ বিচার জন্য একটি কমিসন বসিবে। এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে যেন হতভাগ্য বঙ্গভাষাও কমিসনর-গণের বিবেচনার বিষয় হয়। যাঁহারা বঙ্গভাষা প্রাণের সহিত ভাল বাসেন, উহার পুষ্টিসাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগের মত গ্রহণ না করিয়া মাত্র ডিপুটী ইন্স্পেক্টরগণের মতের প্রতি নির্ভর করিলে কাজ নির্দ্দোষ হইবে কেন?† লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকার, প্রধানপদস্থ বঙ্গবন্ধু মহোদয়গণ সাহায্য করিলে দোষ গুণ বিচারই বা কঠিন হইবে কেন?

আমি পাঠ্য পুস্তক বলিয়া কেবল স্কুলের পাঠ্য লক্ষ্য করিতেছি না; যে সকল পুস্তক সাধারণের পাঠ করা উচিত তাহাও পাঠ্য পুস্তক। তৎসম্বন্ধেও কমিটি এবং কমিসনর-গণের মতামত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।‡ নতুবা বঙ্গভাষা কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া অপরিপক্ক কৃষাণগণ যে ফলবান্ এবং শস্যশালী বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি ফেলিয়া দিয়া অকর্ম্মণ্য আগাছা এবং কণ্টকের আদর করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

পাঠকের রুচি মার্জ্জিত করা, এবং পাঠ্য-পুস্তকের উৎকর্ষ সাধন করা উভয়ই কর্ত্তব্য কর্ম্ম;—একটি উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বাহ্যিক বলে অপরিপক্ক অসম্পন্ন বঙ্গভাষা একরূপ ইচড়ে পাকাইয়াছে। অপেক্ষাকৃত পুষ্ট না হইলে এ ভাষা দ্বারা সমস্ত কার্য্য চলিবে না। কোন একটি বৈজ্ঞানিক বিষয় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হও, তোমার মাতৃভাষায় পারিবে না, ইংরেজীতে চিন্তা করার প্রয়োজন হইবে। কারণ তোমার অভিধানে শব্দ নাই, ভাষায় বল নাই। মরুভূমিতে জলাশয়ের ন্যায় দূরে দূরে যে

* ঠিক্ কথা! ঠিক্ কথা!

† যে সকল ডেপুটীরা বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন ধার ধারেন না, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে একথা খাটিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা রীতিমত বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের উপরেও লেখকের আপত্তি আছে কি? সঃ

‡ কখনই নহে। যাঁহারা বাঙ্গালাসাহিত্যের গঠন ও বিকাশ এবং সংবর্দ্ধন ও সংস্করণে অংশতঃ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা বিনা পথের পথিককে কখনই এমন উচ্চ অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না। সঃ

দুই চারিটি শব্দ পাও, খ্যাতনামা দুই চারি জন মহাত্মার প্রসাদাৎ মধ্যে মধ্যে যে শব্দ গুলি দেখিতে পাও, তাহাতেও কার্য্য চলে না, চলিতেছে না। চলিতেছে না বলিয়াই আজও বঙ্গবাসী Focal distance আধিশ্রয়ণিকবারধি অপেক্ষা সহজে বোঝে।

এই অভাব-পূরণের কি উপায় নাই? দুর্ব্বল ভাষা সবল, অসম্পন্ন ভাষা সম্পন্ন করিবার কি সম্ভাবনা নাই? যাঁহাদের প্রতিভা আছে, বঙ্গদেশ যাঁহাদিগকে ভক্তি বিশ্বাস করে, তাঁহারা চেষ্টা করিলে অবশ্য পারেন। যদি বঙ্গভাষার আশা না থাকিত তবে অসম্পন্ন ভাষায় মাইকেলের পদ্য, এবং ওজস্বল ও উদ্দীপনাময় গদ্য লিখিত হইত না; সোমপ্রকাশের মার্জ্জিত ভাষা, সাধারণীর উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা, নববিভাকরের বিশুদ্ধ ভাষা, ভারতমিহির এবং চারুবার্ত্তার সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিত হইত না। নবীন বাবুর পলাশীর যুদ্ধ, হেম বাবুর বৃত্রসংহার আশাপ্রদ সংশয় নাই। লেখক যেমন পাঠকের রুচি অনুসরণ করেন, পাঠকও সেইরূপ লেখকের প্রদর্শিত পথে গমন করেন। উভয়ে একদিকে, ভাষার উন্নতির দিকে মার্জ্জিত রুচি লইয়া অগ্রসর না হইলে বঙ্গভাষার উন্নতি হইবে না।

শ্রীঃ ন্যায়পঞ্চানন।

ইতিহাস শিক্ষা।

মনুষ্য স্বভাবতঃ সমাজ-প্রিয়। এই স্বভাবসিদ্ধ গুণই সামাজিকতার আদি কারণ। সভ্য কি অসভ্য, যে কোন দেশের প্রতি চাহি না কেন সকল দেশের মনুষ্যই সমাজসংবদ্ধ। সমাজ একবার সংবদ্ধ হইলে, উহার স্থায়িত্ব সম্পাদনের জন্য নিয়মের আবশ্যক; কেন না স্বার্থপরতা মনুষ্যকে সর্ব্বদাই যথেচ্ছাচারী করে। নিয়মের উদ্দেশ্য সমাজগত প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বার্থপরতাকে সীমাবদ্ধ করা, এবং উক্ত স্বার্থপরতা নিয়মিত সীমা অতিক্রম করিলে দণ্ডবিধান করা। সমাজের ভিত্তি এই রূপে একবার সুসংস্থাপিত হইলে, মনুষ্যগণ নির্ভয়ে আপনাপন দৈহিক ও মানসিক শক্তি অনুসারে শ্রমে নিযুক্ত হন; কিন্তু সকলের শক্তি সমান নহে, এই হেতু সমাজে ছোটবড় সকল প্রকার মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহার যে পরিমাণে বুদ্ধি, ক্ষমতা, উদ্যোগ, শ্রমশীলতা গুণ আছে, তিনি সেই পরিমাণে উন্নত হন, এবং যে সমাজে এইরূপ লোকের সংখ্যা অধিক, সেই সমাজই অধিক সুখী ও সম্পত্তিশালী। সমাজের প্রথম অবস্থায় দৈহিক পরিশ্রমের ফল সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়, যথা গৃহাদি নির্ম্মাণ, ক্ষেত্রপালন, কৃষিকার্য্যসাধন, আবশ্যক সাংসারিক সামগ্রী সকল গঠন ইত্যাদি। আর জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লিখিত ভাষা সংস্থাপন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান অনুশীলন, প্রভৃতি বুদ্ধি শক্তির কার্য্য লক্ষিত হয়। স্বদেশের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত সামগ্রী ভিন্ন দেশে বিক্রয়, ও ভিন্ন

দেশের সামগ্রী স্বদেশে আনয়ন ও তদ্দ্বারা স্বদেশের সুখসম্পত্তি ও বিলাসের পরিবর্দ্ধন হয়।

ব্যক্তিগত উদ্‌যোগ ও শ্রমশীলতা এবং ব্যক্তিগত সুখ ও শুভাকাঙ্ক্ষা যেরূপ প্রথমতঃ সমাজের উন্নতি সাধন করে, সমাজ প্রচুর ধনশালী ও বিলাসী হইলে, ব্যক্তিগত উদ্‌যোগ ও শ্রমশীলতার অপেক্ষাকৃত হ্রাস হয়; এবং যে শুভ ও সুখাকাঙ্ক্ষা প্রথমে সুনিয়ম স্থাপন, সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্র সকলের অনুশীলন ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে, তাহাই পরে লোভ, দাম্ভিকতা, পরহিংসা ও অত্যাচারের কারণ হইয়া সমাজের অবনতি সম্পাদন করে। রুম রাজ্যের অবস্থা কেবরিকাশের সময়ের সহিত অগাষ্টাসের সময়ের তুলনা করিলে, পূর্ব্বে যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহার সকলই সপ্রমাণ হইবে। যে শাস্ত্র দ্বারা পৃথিবীস্থ কোন দেশ বা জাতিগত সমাজের উন্নতি বা অবনতির বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাকে ইতিহাস কহে। ইতিহাসে যদি কেবল রাজগণের জীবনী, সন্ধি, বিগ্রহ, জয় প্রভৃতি রাজকার্য্য সকলের সমালোচন মাত্র হয়, তাহাকে প্রকৃত ইতিহাস কহা যায় না। প্রকৃত ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য সামাজিক ধর্ম্ম, নীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য ও সম্পত্তির উন্নতি বৃত্তান্ত বা সংক্ষেপে সভ্যতার বিবরণ। ব্যক্তিগত জীবনী যেরূপ ব্যক্তিগত অনুসরণীয় বা পরিহার্য্য, কোন দেশীয় ইতিহাস সেইরূপ অপর কোন দেশের পক্ষে অনুসরণীয় বা পরিহার্য্য। পদার্থ বিজ্ঞানের ন্যায় ইতিহাসও সত্যপরিচায়ক। ইতিহাসগত সত্য সমস্ত বাহ্য গোচর নহে; উহা অধিকাংশই অনুমান-উপলব্ধ; সুতরাং বুদ্ধি, চিন্তা ও কল্পনার সাপেক্ষ।

ব্যক্তিগত স্বভাবের ন্যায় কতকগুলি জাতিগত স্বভাব আছে। এই স্বভাব সকলের বিভিন্নতাবশতঃ তদ্দ্বারা জাতিগত অবস্থার উন্নতি বা অবনতির বিভিন্নতা হয়; সুতরাং জাতিভেদে ঐতিহাসিক রসও বিভিন্ন; এবং তদ্গত সত্য সকলও সর্ব্বদা এক রূপে প্রকাশিত হয় না। এই কারণেই ইতিহাস শাস্ত্র সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই পাঠ করা আবশ্যক। ইহাতে মনুষ্য স্বভাব-জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সামাজিক নীতির আবশ্যকতা, হৃদয়স্থ রিপু বা কুপ্রবৃত্তি সকলের সংযম বা সীমাবদ্ধ করণ, এবং দেশীয় কুপ্রথা ও কুসংস্কার সকলের সংস্করণ প্রভৃতির শিক্ষা হয়।

যেহেতু ইতিহাস মনুষ্যের স্বভাব, শক্তি ও প্রকৃতির বিবরণ স্বরূপ, উহা শিক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বদা সত্যপ্রিয় ও পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিজ্ঞতার সহিত শিক্ষা করা আবশ্যক। কোন্ মহৎ ব্যক্তি কোন্ দেশের রাজা ছিলেন, তিনি কিরূপ অট্টালিকায় বাস করিতেন, কিরূপ সভায় বসিয়া কিরূপে মন্ত্রিগণ লইয়া বিচার কার্য্য সম্পাদন করিতেন, এই সকল বিষয় জ্ঞাতব্য হইলেও উহারা ইতিহাস শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে। অকিঞ্চিৎকর বিষয় সকল পৃথক্ করিয়া, নীতিপূর্ণ বিষয় সকলের যাহাতে শিক্ষা হয়, শিক্ষার্থীদিগকে তাহাই বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিয়া দেওয়া শিক্ষকগণের কার্য্য। গ্রীস, রুম, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ইতিহাস পাঠে বিশেষফল লাভ হয়।

আয়ুর্ব্বেদ।

(২৮৮ পৃষ্ঠার পর।)

গর্ভের প্রতিমাসিক বিবরণ।

গর্ভাশয়ে প্রথমতঃ যাদৃক্ শুক্র ও আর্ত্তব শোণিত সংযুক্ত হয়, গর্ভের প্রথম মাসে উহা দ্রবীভূত হইয়া তাদৃক্ ভাবেই অবস্থিতি করে। *

গর্ভের দ্বিতীয় মাসে শুক্র ও আর্ত্তবশোণিতের ভূত পরমাণু সকল কফ, পিত্ত ও বায়ুদ্বারা পচ্যমান হইয়া ঘনীভূত হয়, সেই ঘনীভূত পদার্থ, শুক্রাধিক্য হেতু পিণ্ডাকারে (গোলাকারে) পরিণত হইলে পুংজাতীয়; রক্তাধিক্যহেতু দীর্ঘাকারে পরিণত হইলে স্ত্রীজাতীয় এবং উভয়ের সাম্যাবস্থাহেতু অর্ব্বুদাকারে (গোলাকৃতি ফলের অর্দ্ধ খণ্ডাকারে) পরিণত হইলে নপুংসক জাতীয় সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা।

তৃতীয় মাসে হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, ও মস্তক, এই পঞ্চ অবয়বের পাঁচটি স্থূল পিণ্ড জন্মে, এবং তাহাতে সূক্ষ্মরূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভাগ হয়।

চতুর্থ মাসে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, এবং এই অবধিই চেতনাধার হৃদয়ের প্রকাশ হেতু চৈতন্যেরও প্রকাশ হয়। এবং গর্ভস্থ সন্তানের কোন কোন ভোগে অভিলাষ জন্মে। এই অবধিই গর্ভিণীর দেহ দুই হৃদয় (আপনার ও গর্ভস্থ সন্তানের) বিশিষ্ট হয় বলিয়া তাহাকে দৌহৃদিনী, এবং তাহার তাৎকালিক অভিলাষকে "দৌহৃদ" বলা যায়। এই সময়ে গর্ভিণীর যে যে বস্তু ভোগে অভিলাষ জন্মে, তৎক্ষণাৎ তাহা দেওয়া উচিত। কারণ বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করিলে সন্তান বীর্য্যবান্, গুণবান্, ও দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারে। বাঞ্ছিত বস্তুর অলাভ হইলে গর্ভ ও গর্ভিণী উভয়েই কোনরূপ বিকার প্রাপ্ত হইতে পারে। †

* গর্ভাশয়ে নিপতিতং যাদৃক্ শুক্রং তথার্ত্তবং। তাদৃগেব দ্রবীভূতং প্রথমে মাসি তিষ্ঠতি। (ভাবপ্রকাশঃ)

† দ্বিতীয়ে শীতোষ্ণানিলৈরভিপ্রপচ্যমানানাং মহাভূতানাং সংঘাতো ঘনঃ সঞ্জায়তে। যদি পিণ্ডঃপুমান্ স্ত্রীচেৎপেশী নপুংসকঞ্চেদর্ব্বুদং ইতি। তৃতীয়ে হস্তপাদশিরসাং পঞ্চপিণ্ডকাঃ নির্ব্বর্ত্তন্তে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিভাগশ্চ সূক্ষ্মোভবতি। চতুর্থে সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগঃ প্রব্যক্ততরো ভবতি। গর্ভহৃদয়প্রব্যক্তভাবাচ্চেতনাধাতুরভিব্যক্তো ভবতি কস্মাত্তৎস্থানত্বাৎ গর্ভশ্চতুর্থে মাস্যভিপ্রায়মিন্দ্রিয়ার্থেষু করোতি, দ্বিহৃদয়াঞ্চনারীং দৌহৃদিনীমাচক্ষতে * * তস্মাৎসাযদ্যদিচ্ছেত্তৎ তস্যৈ দাপয়েৎ। লব্ধদৌহৃদাহি বীর্য্য-

পঞ্চম মাসে মনের শক্তি অধিকতর স্ফুরিত হয়। ষষ্ঠ মাসে বুদ্ধির প্রকাশ হয়। সপ্তম মাসে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অধিকতর স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হইয়া সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। (*) অষ্টম মাসে ওজোধাতু (রসাদি শুক্রান্ত সপ্তধাতুর সারভাগ) সঞ্চারিত হয়। এই মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে প্রায়ই জীবিত থাকে না। কারণ তাহার শরীরে ওজোধাতু সম্যক্‌রূপে পুষ্ট হইতে পারে না। ওজোধাতুই জীবনের প্রধান অবলম্বন, তদভাবে জীবিত থাকা অসম্ভব। (†) নবম, দশম, একাদশ, ও দ্বাদশ মাসই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার উপযুক্ত কাল। গর্ভ কোনরূপ বিকার প্রাপ্ত হইলে ইহা অপেক্ষা অধিককাল গৌণেও প্রসূত হয়। (‡)

মাতার রসবাহিনী নাড়ীর সহিত গর্ভস্থ শিশুর নাভিনাড়ী নিবদ্ধ থাকে। যেমন ক্ষেত্রমধ্যে প্রবাহিত জলপ্রণালীর জলদ্বারা ক্ষেত্রস্থ শস্যসমূহ পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ গর্ভস্থ শিশুর নাভিনাড়ী মাতার আহার্য্য রস ও বীর্য্য গর্ভমধ্যে বহন করে, তদ্দ্বারাই গর্ভের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয়।

শুক্র ও শোণিতের সংযোগ অবধি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, যেমন সলিলপূর্ণ সরোবরের উপস্নেহে সমীপবর্ত্তী তরুসমূহ পরিপোষিত হয়, তদ্রূপ মাতার সর্ব্বশরীরসঞ্চারি রসবাহিনী ধমনী

বন্তং চিরায়ুষঞ্চ পুত্রং জনয়তি। ** সাপ্রাপ্তদৌহৃদা পুত্রং জনয়েত গুণান্বিতং অলব্ধদৌহৃদাগর্ভে লভেতাত্মনিবাভয়ং। (সুশ্রুতঃ)

(*) মহামতি বাভটের মতে তৃতীয় মাসেই বাহু সক্থি ও মস্তকের অভিব্যক্তি হয়, এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ হয়, ও সুখ দুঃখের জ্ঞান জন্মে। এই মাসেই মাতার রসবাহিনী নাড়ীর সহিত গর্ভস্থ শিশুর নাভিনাড়ী নিবদ্ধ হয়। চতুর্থ মাসে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অভিব্যক্তি হয়। পঞ্চমাসে চৈতন্য জন্মে, ষষ্ঠ মাসে স্নায়ু, শিরা, রোম, বল, বর্ণ ও নখের অভিব্যক্তি হয়। সপ্তম মাসে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। (ক)

(†) এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে যদি অষ্টম মাসের প্রথম ভাগে ওজঃ-ধাতু সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তৎপরে মাসের শেষভাগে গর্ভ প্রসূত হয়, তবে সন্তান জীবিত থাকিতেও পারে।

(ক) ব্যক্তীভবতি মাসেঽস্য তৃতীয়ে গাত্রপঞ্চকং মূর্দ্ধা দ্বে সক্থিনী বাহূ সর্ব্ব সূক্ষ্মাঙ্গজন্মতু। সমমেবহি মূর্দ্ধাদ্যৈর্জ্ঞানঞ্চ সুখদুঃখয়োঃ। গর্ভস্য নাভৌ মাতুশ্চ হৃদিনাড়ী নিবধ্যতে। যয়া সপুষ্টিমাপ্নোতি কেদারইব কুল্যয়া। চতুর্থে ব্যক্ততাঙ্গানাং চেতনায়াশ্চ পঞ্চমে। ষষ্ঠেস্নায়ুশিরারোমবলবর্ণনখত্বচাং সর্ব্বৈঃ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণোভাবৈঃ পুষ্যতি সপ্তমে। (বাভট)

(‡) পঞ্চমে মনঃ প্রতিবুদ্ধতরং ভবতি ষষ্ঠে বুদ্ধিঃ সপ্তমে সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গপ্রবিভাগঃ প্রব্যক্ততরঃ। অষ্টমেঽস্থিরীভবত্যোজঃ তত্র জাতশ্চেন্নজীবেন্নিরোজস্ত্বান্নৈঋতভাগত্বাচ্চ ততো বলিং মাংসোদনমস্মৈ দাপয়েৎ নবমদশমৈকাদশদ্বাদশানামন্যতমস্মিন্ জায়তে, অতোঽন্যথা বিকারীভবতি। (সুশ্রুতঃ)

সমূহের উপস্নেহ দ্বারা গর্ভ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। (*)

মলের অল্পতাহেতু এবং পক্কাশয়ের সহিত বায়ুর অল্পযোগহেতু গর্ভমধ্যে বাত, মূত্র ও বিষ্ঠাত্যাগ হয় না। এবং জরায়ু দ্বারা মুখ আচ্ছন্ন, কফদ্বারা কণ্ঠ বেষ্টিত এবং দোষজনক বায়ুর পথ রুদ্ধ থাকা বশতঃ গর্ভস্থ শিশু রোদন করিতে পারে না। (†)

গর্ভস্থ শিশু মাতার নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, সঞ্চলন ও নিদ্রা দ্বারাই নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, সঞ্চলনও নিদ্রা লাভ করে।

শরীরের যথাযুক্ত সন্নিবেশ, দন্তেরপতন ও পুনরুদ্ভব, হস্তপদতলে রোমের অনুৎপত্তি, দৃষ্টি ও শরীরের অনতিবৃদ্ধি, শরীর ক্ষীণ হইলেও নখ ও কেশের অতিবৃদ্ধি, এই সমস্ত স্বাভাবিক, ইহার কারণ অনির্দ্দেশ্য। (‡)

(*) মাতুস্তু খলু রসবহায়াং নাড্যাং গর্ভনাভিনাড়ীনিবদ্ধা, সাস্য মাতুরাহাররসবীর্য্যমভিবহতি। তেনোপস্নেহেনাস্যাভিবৃদ্ধির্ভবতি, অসঞ্জাতাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগমানিষেকাৎ প্রভৃতি সর্ব্বশরীরাবয়বানুসারিণীনাং রসবহানাং তির্য্যগ্‌গতানাং ধমনীনামুপস্নেহো জীবয়তি। (সুশ্রুতঃ)

(†) মলাল্পত্বাদযোগাচ্চ বায়োঃ পক্কাশয়স্য চ। বাতমূত্র পুরীষাণি ন গর্ভস্থঃ করোতিহি। জরায়ুণা মুখেচ্ছন্নে কণ্ঠেচ কফবেষ্টিতে। বায়োর্মার্গনিরোধাচ্চ নগর্ভস্থঃ প্ররোদিতি। (ঐ)

(‡) নিশ্বাসোচ্ছ্বাসসংক্ষোভস্বপ্নান্ গর্ভেঽধিগচ্ছতি। মাতুর্নিশ্বসিতোচ্ছ্বাস সংক্ষোভস্বপ্নসম্ভবান্। সন্নিবেশঃ শরীরাণাং দন্তানাং পতনোদ্ভবৌ। তলেষসম্ভবোযশ্চ রোম্নামেতৎ স্বভাবতঃ। (সুশ্রুতঃ)

ধাত্রীবিদ্যা।

প্রাকৃত প্রসবের লক্ষণ।

স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় মধ্যে গর্ভস্থ ভ্রূণ ঈষৎবক্রভাবে যোনিদ্বার অভিমুখে মস্তক রাখিয়া শয়ান থাকে। এবং স্বভাবতঃ প্রসবকালে অগ্রে মস্তক নির্গত হইয়া থাকে। ইহাকেই প্রাকৃত প্রসব বলা যায়। ¶

আসন্ন প্রসবের লক্ষণ।

প্রসব হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে গর্ভিণীর অত্যন্ত গ্লানি বোধ, চক্ষু ও কুক্ষির শ্লথতা, আয়াস বোধ, অধোভাগের গুরুত্ব, অরুচি, প্রসেক, (মুখে জল উঠা) মূত্রের বাহুল্য, উরুদেশ, উদর, কটী, পৃষ্ঠ, হৃদয়, বস্তি, ও বঙ্ক্ষণ স্থানে বেদনা, যোনিদেশের ঈষৎ কম্পন, ও বেদনা বোধ হয়। তৎপরে প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া গর্ভোদক স্রাব হয়। §

গর্ভশোষের কারণ ও লক্ষণ।

গর্ভাবস্থায় অতিশয় শোক, উপবাস, ও রুক্ষাদি সেবন এবং যোনিস্রাব দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইলে গর্ভকে ক্রমশঃ শুষ্ক করে, সুতরাং উদর বর্দ্ধিত হইতে পারে না। ইহাকে সাধারণতঃ "নাগোদর" বলে। এইরূপ গর্ভ অধিক কালগৌণে অতিকষ্টে

¶ আভুগ্নোঽভিমুখঃ শেতে গর্ভো গর্ভাশয়ে স্ত্রিয়াঃ। সযোনিংশিরসা যাতি স্বভাবাৎ প্রসবং প্রতি। (সুশ্রুতঃ)

§ গ্লানিঃ শ্লথতা কুক্ষিচক্ষুষো রিত্যাদি। (বাভট)

প্রসূত হয়। অথবা কোন কালেও ভূমিষ্ঠ হয় না।

ঋতুকালে ও গর্ভাবস্থায় যে সমস্ত আহার ও আচরণ অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সেবন করিলে, এবং অভিঘাত, বিষমাশন (পরিমিতের অধিক বা অল্প ভোজন ও অকালে ভোজন) ও অন্যবিধ পীড়া দ্বারা গর্ভ আহত হইলে অকালে গর্ভপাত হইয়া থাকে। †

গর্ভপাত হওয়ার পূর্ব্বক্ষণে যোনিমার্গ দ্বারা বেদনার সহিত রক্তস্রাব হইতে থাকে, তৎপরে গর্ভপাত হয়। ‡

গর্ভের প্রথম মাস হইতে চতুর্থ মাসের মধ্যে দ্রবীভূতগর্ভ পতিত হইলে তাহাকে গর্ভস্রাব বলা যায়। এবং তৎপরে পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসে স্থিরশরীরগর্ভ পতিত হইলে তাহাকে গর্ভপাত বলা যায়। ¶

মৃতগর্ভের কারণ ও লক্ষণ।

মাতা মানসিক উপতাপ (ধনবন্ধুবিনাশাদি জন্য), আগন্তু উপতাপ (আঘাতাদি জন্য) ও কোন প্রকার উৎকট পীড়া দ্বারা পীড়িত হইলে উদর মধ্যেই ভ্রূণের মৃত্যু হইয়া থাকে। § ঐরূপে ভ্রূণের মৃত্যু হইলে গর্ভিণীর উদর শীতল ও স্তব্ধ, আধ্মাত (ফাঁপিয়া উঠা), বেদনাযুক্ত ও নিস্পন্দ হয়, এবং গর্ভিণীর ভ্রম, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, বিষণ্ণতা, নিশ্বাসত্যাগে নিতান্ত ক্লেশ ও নেত্রদ্বয় কোটরগত হয়। এবং স্বাভাবিক প্রসবকালে যেরূপ বেদনা হইয়া থাকে, মৃতগর্ভার তাদৃক্ বেদনা হয় না। **

মূঢ়গর্ভ বা নিরুদ্ধ গর্ভের লক্ষণ। ††

নানাবিধ কারণে গর্ভিণীর বায়ু দূষিত

শোকোপবাসরুক্ষাদ্যৈরথবা যোন্যতিস্রবাৎ। বাতে ক্রুদ্ধেকৃশঃশুষ্যেৎ গর্ভো নাগোদরস্তুতৎ। উদরং বৃদ্ধমপ্যত্র হীয়তে স্ফুরণং চিরাৎ ** বর্ষগণৈঃ কৃচ্ছ্রাজ্জায়তে নৈব বা। (বাভট)

† গর্ভিণ্যাঃ পরিহার্য্যাণাং সেবয়া রোগতোঽপিবা ** গর্ভে নিপতিতে॥ (বাভট)

গর্ভোবিষমাশনপীড়নাদ্যৈঃ পকং ক্রমাদিব ফলং পততি ক্ষণেন। (মাধবোদ্ধৃত)

‡ গর্ভে পততিরক্তস্য সশূলং দর্শনং ভবেৎ। (মাধবোদ্ধৃত)

¶ আচতুর্থাৎ ততোমাসাৎ প্রস্রবেদ্গর্ভবিদ্রবঃ। ততঃ স্থিরশরীরস্য পাতঃ পঞ্চমষষ্ঠয়োঃ। (সুশ্রুতঃ)

§ মানসাগন্তুভির্মাতুরুপতাপৈঃ প্রপীড়িতঃ। গর্ভোব্যাপদ্যতে কুক্ষৌ ব্যাধিভিশ্চ প্রপীড়িতঃ। (সুশ্রুতঃ)

** গর্ভে***মৃতেঽস্তরুদরং শীতং স্তব্ধাধ্মাতং ভৃশব্যথং। গর্ভাস্পন্দোভ্রমস্তৃষ্ণা কৃচ্ছ্রাদুচ্ছ্বসনং ক্লমঃ। অরতিঃ স্রস্তনেত্রত্ব মাবীনামসমুদ্ভবঃ। (বাভট)

†† সবিমুক্তবন্ধনো গর্ভাশয়মতিক্রম্য যকৃৎপ্লীহান্ত্রবিবরৈরবস্রংসমানঃ কোষ্ঠসংক্ষোভমাপাদয়তি তস্যা জঠরসংক্ষোভাৎ বায়ুরপানোমূঢ়ঃ পার্শ্ববস্তিশীর্ষোদরযোনিশূলানহে মূত্রসঙ্গানামন্যতমানাপাদ্য গর্ভং ব্যাপাদয়তি তরুণং শোণিতস্রাবেণ তমেব কদাচিদ্বিবৃদ্ধমসম্যগাগতমপত্যপথমনুপ্রাপ্তমনিরস্য মানমপান্য বৈগুণ্য সংমোহিতং গর্ভং মূঢ়গর্ভমিত্যাচক্ষতে। স যদা বিগুণানিলপ্রপীড়িত মপত্যপথ মনেকধা প্র-

ও প্রকুপিত হইয়া অমরা (ফুল) হইতে বিমুক্তবন্ধন সুতরাং যোনিবিবরাগত গর্ভকে বিকৃতাবস্থ অর্থাৎ স্বভাবতঃ ভ্রূণ গর্ভাশয় হইতে যেভাবে নির্গত হইয়া থাকে তাহার অন্যথাভাবাক্রান্ত করতঃ প্রাকৃতপ্রসবের ব্যাঘাত এবং যোনি ও জঠর প্রভৃতি স্থানে শূল ও মূত্র বন্ধ করিয়া থাকে, ইহাকেই মূঢ়গর্ভ বলা যায়।

এই মূঢ়গর্ভ নানাবিধ বিকৃতভাবে যোনিদ্বারে সংসক্ত হইয়া থাকে, তাহার সমস্ত প্রকার গতি সংখ্যা দ্বারা নির্ণয় করা সুকঠিন, তন্মধ্যে প্রধানতঃ অষ্ট প্রকার মূঢ়গর্ভগতি এস্থলে বিবৃত হইতেছে। যথা—

১। কোন ভ্রূণের প্রথমতঃ সক্থিদ্বয় যোনিমুখে বাহির হইয়া পড়ে, অন্য অঙ্গ বদ্ধ থাকে।

২। কাহারও এক সক্থি যোনিমুখে বাহির হয়, অপর সক্থি বক্রভাবে মধ্যে থাকিয়া যায়।

৩। কাহারও বা সক্থি ও শরীর বক্রভাবে মধ্যে থাকিয়া নিতম্বদেশ তির্য্যগ্‌ভাবে যোনিমুখে আসিয়া বদ্ধ হয়।

৪। কাহারও বা উদর অথবা পার্শ্ব বা পৃষ্ঠদেশ যোনিদ্বারে অগ্রে আসিয়া বদ্ধ হয়।

৫। কাহারও বা এক বাহু বাহির হইয়া পড়ে, অন্য অঙ্গ বদ্ধ থাকে।

৬। কাহারও বা বাহুদ্বয় অগ্রে বাহির হইয়া পড়ে, মস্তক উক্ত বাহুদ্বয়ের মধ্যে নতভাবে থাকিয়া যোনিদ্বার বদ্ধ করে।

৭। কাহারও বা হস্ত, পদ ও মস্তক একদা বাহির হইয়া পড়ে, অন্য সমস্ত শরীর বদ্ধ থাকে।

৮। কাহারও বা এক সক্থি যোনিমুখে বহির্গত হয়, অপর সক্থি গর্ভিণীর মলদ্বার অভিমুখে যাইয়া বদ্ধ হয়।

এই যে অষ্ট প্রকার মূঢ়গর্ভ গতি উল্লিখিত হইল, এতন্মধ্যে শেষ দুই প্রকার একেবারে অসাধ্য; অন্য ছয় প্রকার যথাবিহিত চেষ্টাদ্বারা প্রতীকৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু যদি গর্ভিণীর ইন্দ্রিয় শক্তি বিকৃত হয়, ও আক্ষেপক রোগ হয় অথবা যোনিসম্বরণ রোগ বা মক্কল্লশূল বা শ্বাস, কাস, ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে তবে ঐ ছয় প্রকার গতিও অসাধ্য হইয়া পড়ে। এবং যে মূঢ় গর্ভিণীর মস্তক অবনত হইয়া পড়ে,

---

ত্তিপদ্যতে তদা সংখ্যাহীয়তে। তত্র কশ্চিদ্দ্বাভ্যাং সক্থিভ্যাং যোনিমুখং প্রতিপদ্যতে কশ্চিদাভুগ্নৈক সক্থিরেকেন। কশ্চিদাভুগ্নসক্থি শরীরঃ স্ফিগ্‌দেশেন তির্য্যগাগতঃ কশ্চিদুরঃপার্শ্বপৃষ্ঠানামন্যতমেন যোনিদ্বারং পিধায়াবতিষ্ঠতে। অন্তঃ পার্শ্বাপবৃত্তশিরাঃ কশ্চিদেকেন বাহুনা। কশ্চিদাভুগ্নশিরাঃ বাহুদ্বয়েন, কশ্চিদাভুগ্নমধ্যো হস্তপাদ শিরোভিঃ। কশ্চিদেকেন সক্থ্না যোনিমুখ মভিপ্রতিপদ্যতে অপরেণ পায়ু মিত্যষ্টবিধা মূঢ়গর্ভগতি রুদ্দিষ্টাঃ সমাসেন। তত্রদ্বাবন্ত্যাবসাধ্যৌ মূঢ়গর্ভৌ শেষানপি বিপরীতেন্দ্রিয়ার্থা ক্ষেপক যোনিভ্রংশসম্বরণ মক্কল্লশ্বাসকাসভ্রমনিপীড়িতান্ পরিহরেৎ।** প্রবিধ্যতি শিরো যাতু শীতাঙ্গী নিরপত্রপাং নীলোদ্‌গতশিরা হন্তি স্যাগর্ভং সচ তাং তথা। (সুশ্রুতঃ).

এবং [illegible]শীতল হইয়া যায়, ও একেবারে লজ্জাশূন্য হইয়া পড়ে, এবং কুক্ষিমধ্যে লীনবর্ণ শিরা সমূহ সমুদ্গত দেখা যায়, তাহার নিশ্চয়ই ভ্রূণসহ জীবন বিনাশ হইবে।

প্রসবকালীয় কর্ত্তব্য।

আসন্ন প্রসবের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ উপস্থিত হইলে গর্ভিণীকে উত্তমরূপে তৈলাভ্যক্ত করিয়া এবং উষ্ণোদকে স্নান করাইয়া উত্তমরূপে পরিপাচিত যবাগূ (অন্নমণ্ড) পান করাইবে। তৎপরে মৃদু বিস্তীর্ণ শয্যায় মৃদু উপাধানে মস্তক রাখিয়া গর্ভিণী উত্তান ভাবে (চিত হইয়া) শয়ন করিবে। এবং সক্থিদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে সংকুচিত করিয়া রাখিবে। তৎকালে গর্ভিণীর নিকটে ভয়শূন্যা, বয়োবৃদ্ধা, প্রসবকার্য্যে কুশলা ও কর্ত্তিতনখা চারি জন পরিচারিকা উপস্থিত থাকিয়া গর্ভিণীকে আশ্বাস বাক্যাদি দ্বারা পরিচর্য্যা করিবে।*

তৎপরে গর্ভনাড়ী বন্ধন বিমুক্ত হইলে এবং শ্রোণী বঙ্ক্ষণ ও বস্তিশীর্ষে শূল জন্মিলে অল্প অল্প বেগে প্রবাহণ (কুন্থন) করিবে। তৎপরে গর্ভাশয় হইতে গর্ভ অধোমুখে নির্গমনোন্মুখ হইলে গাঢ়রূপে প্রবাহণ করিবে। তৎপরে গর্ভ যোনিমুখাগত হইলে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত ততোঽধিক গাঢ়তর রূপে পুনঃ২ প্রবাহণ করিবে। †

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে অকালে অর্থাৎ প্রকৃত প্রসব কাল উপস্থিত না হইলে যদি গর্ভিণী বেগে প্রবাহণ করে, তাহাতে নানাবিধ অনিষ্ট হইতে পারে। যথা ঐ গর্ভস্থ সন্তান বধির, মূক, স্রস্তহনু, মস্তকাহত, কাসশ্বাসাদি রোগগ্রস্ত, কুব্জ অথবা অন্য কোন বিকৃতাকার বিশিষ্ট হইতে পারে। ‡

গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও যদি শীঘ্র অমরা (ফুল) পতিত না হয়, তবে পার্শ্বদ্বয় পীড়ন অথবা স্কন্ধদ্বয় পীড়ন অথবা হস্তদ্বারা আকর্ষণ করিয়া শীঘ্র২ উহা নির্গত করাইবে। § কারণ উহা (ফুল) শীঘ্র পতিত না হইলে উদরস্ফীতি, শূল ও অগ্নি-

* প্রজনয়িষ্যমাণাং * * স্বভ্যক্তাং উষ্ণোদকপরিষিক্তামথৈনাং সম্ভৃতাংযবাগূমাকণ্ঠাৎ পায়য়েত্। ততঃকৃতোপধানে মৃদুবিস্তীর্ণে শয়নে স্থিতামাভুগ্নসক্থি মুত্তানামশঙ্কনীয়াশ্চতস্রঃ স্ত্রিয়ঃ পরিণতবয়সঃ প্রজননকুশলাঃ কর্ত্তিতনখাঃ পরিচরেয়ুরিতি। (সুশ্রুতঃ)

(†) * * ততোবিমুক্তে গর্ভনাড়ীপ্রবন্ধে সশূলেষু শ্রোণিবঙ্ক্ষণবস্তিশিরঃসু প্রবাহেথাঃ শনৈঃ শনৈঃ। ততোগর্ভনির্গমে প্রগাঢ়ং। ততোগর্ভে যোনিমুখং প্রপন্নে প্রগাঢ়তরং আবিশল্য ভাবাৎ। (সুশ্রুতঃ)

(‡) অকালপ্রবাহণাৎ বধিরং মূকং ব্যস্তহনুং মূর্দ্ধাভিঘাতিনং কাসশ্বাসশোষোপদ্রুতং কুব্জং বিকটং বা জনয়তি। (সুশ্রুতঃ)

(§) অথা পতন্তীমমরাং পাতয়েৎ পূর্ব্ববৎ ভিষক্। হস্তেনাপহরেৎ বাপি পার্শ্বাভ্যাং পরিপীড্যচ। ধুনুয়াচ্চ মুহুর্নারীং পীড়য়েৎ বাংসপিণ্ডিকাং। তৈলাক্তযোনেরেবং তাংপাতয়েন্মতিমান্ ভিষক্। (সুশ্রুতঃ)

মান্দ্যাদি নানাবিধ পীড়া হইয়া প্রসূতিকে বিপন্না করে। * অথবা কেশদ্বারা অঙ্গুলি বেষ্টন করিয়া ঐ অঙ্গুলি দ্বারা প্রসূতির কণ্ঠমধ্যে ঘর্ষণ করিবে, তাহাতে বমির বেগ হইলেই ফুল পড়িয়া যায়। †

সন্তান প্রসূত হইলে পরে উক্ত সন্তানের সর্ব্বাঙ্গ ও মুখ পরিষ্কৃত করিয়া অতি সাবধানতার সহিত নাভিনাড়ী ছেদন করিবে। নাড়ী ছেদনকালে উক্ত নাড়ীর অষ্টাঙ্গুল পর্য্যন্ত সূত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া পরে ছেদন করিবে। নাভিনাড়ী উক্ত রূপে বন্ধনপূর্ব্বক ছেদ না করিলে অধিক রক্তপাত হইয়া শিশু বিপন্ন হয়। ‡

মূঢ়গর্ভ চিকিৎসা।

মূঢ়গর্ভ চিকিৎসার ন্যায় ভয়ঙ্কর কষ্টকর কার্য্য আর কিছুই নাই। কারণ ইহাতে যোনি ও যকৃৎপ্লীহা অন্ত্রবিবর ও গর্ভাশয় মধ্যে কেবল হস্তস্পর্শ দ্বারা কার্য্য করিতে হয়। এবং ইহাতে গর্ভ ও গর্ভিণীকে রক্ষা করিয়া উৎকর্ষণ, অপকর্ষণ, স্থানাপবর্ত্তন, উৎকর্ত্তন, ছেদন, ভেদন, পীড়ন, [illegible] ও বিদারণ প্রভৃতি কার্য্য এক হস্ত দ্বারা করিতে হয়।

অতএব অধিপতির আজ্ঞা লইয়া চিকিৎসকের এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত এবং যে প্রকারে মূঢ়গর্ভ নির্ব্বিঘ্নে উদ্ধৃত করা যায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ ও সাবধান হওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্বে যে সংক্ষেপতঃ অষ্ট প্রকার মূঢ়গর্ভগতি উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন প্রকৃত প্রসবেও তিন প্রকার গর্ভগতি রো[illegible] হইতে পারে। যথা ভ্রূণের মস্তক, স্কন্ধদে[illegible] ও জঘন স্থান, যদি নির্গম দ্বার অপেক্ষা পরিমাণে অধিক স্থূলহয়, তাহা হইলেই ঐ স্থান বদ্ধ হইয়া থাকে। §

ক্রমশঃ।

শ্রীহরিমোহন দাস গুপ্ত

---

* প্রসূতায়া ন পতিতা জঠরাদপরা যদি। তদা সাকুরুতে শূলং আধ্মানং বহ্নিমন্দতাং। (ভাবপ্রকাশঃ)

† * * ততোনাভি নাড়ীং [illegible] অষ্টাঙ্গুলমায়ম্য সূত্রেণ বদ্ধা ছেদয়েৎ। (সুশ্রুতঃ)

‡ কণ্ঠমস্যাঃ কেশবেষ্টিতয়াঙ্গুল্যা প্রমৃজেৎ। (সুশ্রুতঃ)

§ নাতঃ কষ্টতমমস্তি যথা মূঢ়গর্ভশল্যোদ্ধরণং অত্রহি যোনি-যকৃৎপ্লীহা বিবরগর্ভাশয়ানাং মধ্যে কর্ম্ম কর্ত্তব্যং স্পর্শেন। উৎকর্ষণাপকর্ষণস্থানাপবর্ত্তন উৎকর্ত্তন ভেদনছেদনপীড়নর্জুকরণদারণানি [illegible] হস্তেন গর্ভং গর্ভিণীং বা হিংসতা তস্মাদ[illegible] পতি মাপৃচ্ছ্য পরঞ্চ যত্নমাস্থায়োপক্রমেৎ তত্র সমাসেনাষ্টবিধা মূঢ়গর্ভগতিরুদ্দিষ্ট স্বভাবগতা অপি ত্রয়ঃ সঙ্গা ভবন্তি, শিরো বৈগুণ্যাদংসয়োর্জঘনস্য বা। (সুশ্রুতঃ)